সায়েন্স ফিকশান স•ম•গ্র

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাতুলের জগৎ ◗ বেজি ◗ ফিনিক্স ◗ সায়রা সায়েন্টিস্ট ◗ সুহানের স্বপ্ন ◗ অবনীল ◗ নায়ীরা ◗ বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা

এতদিনে বলা যায়, নিশ্চিতভাবেই এ-কথা সর্বজনমান্যতা পেয়েছে যে এদেশে মুহম্মদ জাফর ইকবাল সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী-লেখক। ছোট করে বললে, কল্পবিজ্ঞানের লেখক। 'কপোট্রনিক সুখদুঃখ', তাঁর প্রথম কল্পবিজ্ঞান-গ্রন্থ, বেরিয়েছিল সে তো আজকে নয়। তারপর থেকে এ পর্যন্ত ৩০টিরও বেশি শিরোনামে এ-জাতীয় নানা বই প্রকাশিত হয়েছে বছরের পর বছর। তাঁর জনপ্রিয়তা তরুণ পাঠকসমাজে ঈর্ষণীয়। গোয়েন্দা-কাহিনী, রোমাঞ্চ-কাহিনী, অভিযাত্রা বা আবিষ্কারের কাহিনী, তদন্ত-কাহিনীর মতো বেশ পুরোনো সাহিত্যখাত (genre) ইত্যাদি একপাশে সরিয়ে রেখে এ এক নতুন সাহিত্যখাত তৈরি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা ভারি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ছিলেন, কিন্তু আমরা বুঝেই ফেলি যে সারাক্ষণ গুলতাপ্পি মারছেন। আমরা ঝুলে থাকি বিশ্বাস করা আর না-করার মধ্যিখানে। আবার সত্যজিৎ রায় যখন মানুষখেকো গাছ নিয়ে গল্প বলেন তখন ঐ গাছ অচেনা হলেও আমরা অবিশ্বাস করি না, কারণ জীববিজ্ঞানের সাক্ষ্যে তার সমর্থন পাই। কল্পবিজ্ঞান কিন্তু ঠিক এর সমগোত্রীয় নয়।

কল্পবিজ্ঞান তা হলে পাঠকদের মজায় কীসে? কী থাকে মুহম্মদ জাফর ইকবালের কল্পবিজ্ঞানে? এই যে আমরা বলতে-বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি 'কল্প' কথাটির সঙ্গে—এর অর্থ কী বুঝব? কল্প মানে কি কল্পনা? কিন্তু সৃজনশীল যে-কোনো আখ্যান রচনা তো কল্পনা দিয়েই তৈরি করতে হয়। 'কল্প' মানে যদি কল্পনা বা imagination হয় তবে 'কল্পকাহিনী' শব্দটির কোনো অর্থ থাকে না; সব কাহিনীই কল্পকাহিনী। তখন কল্প শব্দের অন্য অর্থ আবিষ্কার করতে হয়। আর তা হল—ফ্যান্টাসি। 'বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী'ই বলি কিংবা 'কল্পবিজ্ঞান'ই বলি, বিষয়টি হল—বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ফ্যান্টাসি নির্মাণ। লক্ষ করার বিষয়, এই নির্মাণকৌশলে এক বিশেষ চারিত্র্যের মননশক্তি ও কবিকল্পনার প্রয়োজন পড়ে। জুল্ ভের্ন-এর তা ছিল; আর সেটা বোঝা গেছে যখন তাঁর কল্পকাহিনী অনেক পরে বাস্তবে ঘটতে দেখা গেল। মুহম্মদ জাফর ইকবাল যে-সব কল্পকাহিনী লিখছেন সে-সব কি তবে ভবিষ্যতে কখনো ঘটবে? হয়তো ঘটবে, হয়তো নয়, ভবিষ্যৎই তা দেখাবে। তবে পড়তে-পড়তে এমন সম্ভাবনা মনের মধ্যে চেপে বসে যে, সে-সবের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শ্রীমতী সায়রা সায়েন্টিস্টের দু'-একটি উদ্ভাবনা, যেমন মালিশ-মেশিন, বাস্তবায়িত হলে কী মজাই না হত! কেউ কি বলতে পারে কখনো হবে না?

মুহম্মদ জাফর ইকবালের কল্পকাহিনী এক রকমের নয়। গ্রহান্তরের কল্পনাপ্রসূত বাস্তবতা তিনি যেমন আঁকেন, তেমনি জিনেটিক্স বিজ্ঞানের জ্ঞানকেও কাজে লাগান—'বেজি' গল্পে তার অসামান্য প্রমাণ। মানুষ মহাবিশ্বেরই অংশ, অথচ মহাবিশ্বকে সে এখনো তেমন ভালোভাবে জানে না। এই জানার উৎকাঙ্ক্ষাকে উস্কে দিয়ে লেখক আমাদেরকেও ভাবান। তাঁর কল্পজগতের অধিবাসী আমাদেরই ন্যায় 'পার্থিব' মানুষ, যদিও অন্য কোথাও অন্য কোনো পৃথিবীতে আমাদেরই আশা-বেদনা-ভালবাসা বুকে নিয়ে তাদের বসবাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

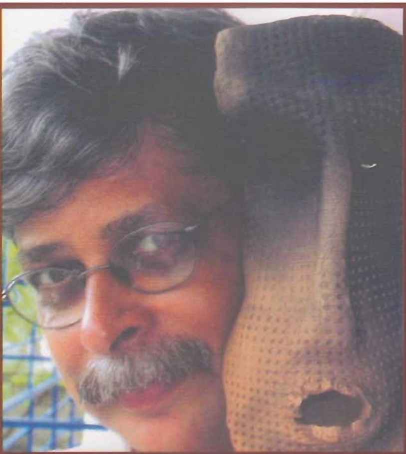

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচ.ডি. করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

তাঁর স্ত্রী ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

এ-জাতীয় নানা মাত্রার ও নানান স্বাদের কাহিনী যে মুহম্মদ জাফর ইকবালের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব হতে পেরেছে তার কারণ তিনি নিজে একজন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানী বলেই তিনি সুনিশ্চিতভাবে জানেন যে, অনন্ত মহাবিশ্ব ও মহাকালের খুব কমই মানুষ এখন পর্যন্ত জেনেছে এবং যতটুকুই সে জেনে গেছে তার বাইরে রয়ে-যাওয়া আরো বেশি অজানাকে সে তার মননশক্তি, উদ্ভাবনক্ষমতা ও তারই তৈরি বিজ্ঞান সহযোগে ক্রমে ক্রমে জানতেই থাকবে।

মুহম্মদ জাফর ইকবালের অসামান্যতা এখানেই যে, বিজ্ঞান-কবিকল্পনা-ফ্যান্টাসি ইত্যাদির আলকেমিতে কয়েক ফোঁটা হৃদয়রস সব সময়েই তিনি মিশিয়ে দেন এবং তার ফলে সকল কিছু এমন মানবীয়, হার্দ্য ও স্বপ্নভারাতুর হয়ে ওঠে যে কল্পকাহিনীর অদ্ভুতত্ব ছাড়িয়ে বহুদূর চলে যায়।

বর্তমান সংকলনে গ্রন্থভুক্ত আটটি বইয়ের অভিজ্ঞতা পাঠককে সে-কথাই বলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশান সমগ্র

চতুর্থ খণ্ড

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

৪

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ
১৬ ডিসেম্বর ২০০৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৬
তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮
চতুর্থ মুদ্রণ : অক্টোবর ২০০৯
পঞ্চম মুদ্রণ : মে ২০১০
ষষ্ঠ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১১
সপ্তম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১২
অষ্টম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৩

প্রচ্ছদ
জাকির আহমেদ

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০'র পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পূবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 446 - 095 - 6

SCIENCE FICTION SAMAGRA VOL IV [A Collection of Science Fiction]
by Muhammed Zafar Iqbal
Published by PROTIK. 38/2ka Banglabazar (1st floor), Dhaka-1100
Eighth Edition : April 2013. Price : Taka 500.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬৮০১৫৩৭০৭

Website : www.abosar.com, www.protikbooks.com
Online Distributor : www.rokomari.com, www.akhoni.com
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার লেখা সর্বশেষ আটটি সায়েন্স ফিকশান নিয়ে 'সায়েন্স ফিকশান সমগ্র'-এর চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হল। হিসেব করলে দেখা যাবে আমি গড়ে প্রতি বৎসর দুটি করে সায়েন্স ফিকশান লিখেছি। একজন মানুষ প্রতি বৎসর যদি দুটি করে সায়েন্স ফিকশান লেখে তা হলে বলতে হবে সে বেশি লিখছে—প্রয়োজন থেকে বেশি। এত বেশি লেখা স্বাভাবিক নয়।

কেন এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটি ঘটছে তার একটি ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। আমি লিখি মূলত বাচ্চাকাচ্চাদের জন্যে এবং যারা বাচ্চাকাচ্চাদের জন্যে লেখে তাদের কেউ গুরুত্ব দিয়ে নেয় না এবং আমাকেও নেয় নি। শিশুদের লেখক হিসেবে সবাই আমাকে নিরিবিলি থাকতে দিয়েছে। সায়েন্স ফিকশানগুলো ঠিক শিশুকিশোরদের জন্যে লেখা না হলেও গুরুগম্ভীর বয়স্ক মানুষেরা সেগুলি পড়েন বলে আমার জানা নেই। কাজেই দেশের প্রাপ্তবয়স্ক মূল জনগোষ্ঠীর আড়ালে থেকে আমার নিরিবিলি সময়টুকু বেশ কেটে যাচ্ছিল।

এর মাঝে একদিন আমি নিজেই একটা ভুল করে ফেললাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির সন্ত্রাস নিয়ে কিছু একটা ঘটেছে এবং তার কারণে রেগেমেগে পত্রিকায় আমি একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠালাম এবং সেটা "কলাম" হিসেবে ছাপা হল। আমি নিয়মিত লিখব সেরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না কিন্তু মাঝে মাঝেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা দেশে রেগে যাবার মতো ঘটনা ঘটতে লাগল এবং আমি কলাম লিখতে থাকলাম। কিছুদিনের মাঝেই আমি আবিষ্কার করলাম লোকজন আমাকে কলাম লেখক হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করেছে! একটা বইয়ের পাঠক সংখ্যা কয়েক হাজার কিন্তু সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা কয়েক লক্ষ তাই সায়েন্স ফিকশান লেখক হিসেবে আমার যেটুকু পরিচিতি ছিল কলাম লেখক হিসেবে পরিচিতি তার থেকে অনেকগুণ বেশি হয়ে গেছে, সেটা আমি টের পেতে শুরু করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

কলাম লেখক বললেই আমার চোখের সামনে সবজান্তা ছিদ্রান্বেষী চালবাজ ধরনের একজন মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে—আমি মোটেও সেরকম একজন মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে চাই নি। একবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়ে আমি কলাম লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম কিন্তু দেশে এমন সব ব্যাপার ঘটতে শুরু করে যে রেগেমেগে আবার আমাকে কলম নিয়ে বসতে হয়। আবার আমাকে কলাম লেখক হতে হয়।

পত্রপত্রিকায় এই কলাম লেখার কারণে এমন একটি ব্যাপার ঘটে যায় যেটা আগে ঘটে নি। ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে বয়স্ক মানুষেরাও আমার লেখা পড়ে ফেলতে শুরু করেন এবং প্রায় রাতারাতি আমার শিশুদের লেখক থেকে বড়দের লেখক হিসেবে প্রমোশন হয়ে যায়। তার দুর্ভোগটা আমি কিছুদিনেই টের পেতে শুরু করলাম। ঈদের আগে আগে পত্রপত্রিকার সম্পাদকরা ঈদ সংখ্যার লেখার জন্যে তাগাদা দিতে শুরু করলেন। যারা তাগাদা দেন তারা সবাই সম্মানী মানুষ, মুখের ওপর 'না' বলা যায় না তাই আমাকে গুরুগম্ভীর লেখালেখি শুরু করার চেষ্টা করতে হল। আমার কলম দিয়ে গুরুগম্ভীর লেখা একেবারেই বের হতে চায় না তাই আরো বেশি বেশি সায়েন্স ফিকশান বের হতে লাগল। এটাই হচ্ছে আমার বাড়াবাড়ি লেখার পেছনের গোপন ইতিহাস!

এই সংকলনের প্রথম সায়েন্স ফিকশানের নাম "ত্রাতুলের জগৎ"। ঠিক কী কারণ জানি না প্রচলিত জগতের সকল নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের চরিত্র সৃষ্টি করতে আমার খুব ভালো লাগে। এরকম একজন মানুষের সাথে আরো কিছু বিচিত্র চরিত্র জুড়ে দিয়ে এই বইয়ে আমি একটা জমজমাট কাহিনী দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি। তবে কাহিনীর মূল অংশটি হচ্ছে ত্রাতুলের "জগৎ"টুকু, যেটা আমার অন্যান্য সায়েন্স ফিকশান থেকে একেবারেই অন্যরকম।

সংকলনের দ্বিতীয় বইটির নাম "বেজি"। বইটিতে পাঁচটি ছোটগল্প এবং একটি ছোট উপন্যাস—যার নামে এই বইটির নাম দেওয়া হয়েছে। বেজি উপন্যাসটি অনেকেই বেশ পছন্দ করেছেন, তবে আমার ধারণা যারা সায়েন্স ফিকশানের সাথে সাথে ভয়ের উপন্যাসও পড়তে ভালবাসেন তারা এই উপন্যাসটা একটু বেশি পছন্দ করেছেন। বইয়ের অন্য গল্পগুলোর মাঝে "একটি মৃত্যুদণ্ড" গল্পটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। যে বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই গল্পটি লেখা হয়েছে সেটি ইদানীং আমার অনেক লেখায় উঠে এসেছে—সম্ভবত আরো অনেক দিন উঠে আসবে।

আমরা যে বিষয়টাকে সভ্যতা বলি সেটা ঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না সেটা নিয়ে মাঝে মাঝেই আমার সন্দেহ হয়। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে মানুষের বৈরী কোনো ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে পুরো সভ্যতাটাই পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে এবং তখন মানুষের সভ্যতা আবার নূতন করে একেবারে গোড়া থেকে শুরু হবে—এটা আমার একটা প্রিয় বিষয়। একটা ধ্বংসস্তূপ থেকে নূতন করে সভ্যতার জন্ম হওয়ার বিষয়টি প্রাচীন মিথোলজির 'ফিনিক্স' পাখির গল্পের মতো, তাই এই বিষয়ে লেখা সায়েন্স ফিকশানটির নাম দিয়েছি ফিনিক্স। এই বইটাতে যা বলতে চেয়েছিলাম তার পুরোটা বলতে পেরেছি বলে মনে হয় নি, সম্ভবত ভবিষ্যতে আরো একবার অন্য কোনোভাবে বলার চেষ্টা করব।

আমার পাঠকেরা যে চরিত্রটিকে নিয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশিবার লিখতে অনুরোধ করেছে সেটা হচ্ছে "বিজ্ঞানী সফদর আলী"। লেখালেখিতে একটা গ্রহণযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি হয়ে গেলে তাকে নিয়ে লেখালেখি করা একটি প্রচলিত পদ্ধতি আর্থার কোনান ডায়াল থেকে সত্যজিৎ রায়, সবাই করেছেন! কিন্তু ঠিক কী কারণ জানি না আমি সেটা করতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই পাঠকদের অনুরোধে তার কাছাকাছি একটা কাজ করেছি, "সায়রা সায়েন্টিস" নাম দিয়ে একজন বিজ্ঞানী সৃষ্টি করেছি। বিজ্ঞানী সফদর আলীর সাথে তার পার্থক্য মাত্র একটি জায়গায়—সফদর আলী ছিল পুরুষ সায়রা সায়েন্টিস্ট হচ্ছে মহিলা।

পৃথিবীতে এই মুহূর্তে মানুষজনের মাঝে নানা ধরনের বিভাজন রয়েছে—দেশ নিয়ে বিভাজন, ভাষা নিয়ে বিভাজন, ধর্ম কিংবা কালচার নিয়ে বিভাজন। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে মানুষের মাঝে বিভাজনটি কী নিয়ে হবে আমি মাঝে মাঝেই সেটা নিয়ে ভাবি। আমার ধারণা সত্যিই যদি একটা বিভাজন হয় তবে সেটি হবে মানুষের জিনেটিক কোডিং নিয়ে বিভাজন। সেই বিভাজনটি করে দেওয়া হলে পৃথিবীতে কী ধরনের জটিলতা হতে পারে "সুহানের স্বপ্ন" বইটিতে আমি সেটা কল্পনা করার চেষ্টা করেছি। আমি মানুষের মনুষ্যত্বে প্রবলভাবে বিশ্বাসী তাই যে জটিলতাই থাকুক তারা যে সঠিক সমাধান বের করে নেবে সেই বিশ্বাস থেকে কখনোই বিচ্যুত হই নি।

"অবনীল" সায়েন্স ফিকশানটি কোনো একটি ম্যাগাজিনের ঈদ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল। ঈদ সংখ্যায় বড় লেখার সময় নেই বলে অবনীলের আকার খুব ছোট—ছোট হলেও আমার ধারণা অবনীল পূর্ণাঙ্গ একটি কাহিনী হয়েছে। যদিও সবাই এটাকে সায়েন্স ফিকশান হিসেবে পড়েছে কিন্তু আসলে এটি পুরোপুরি মানবিক একটি কাহিনী। আমার ধারণা আমার পরবর্তী সায়েন্স ফিকশান "নায়ীরা' সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যাবে। আমি নূতন কিছু লিখলে কেউ কেউ সেটার প্রশংসা করে এবং অবধারিতভাবে কেউ কেউ সেটার কঠোর সমালোচনা করে। ঠিক কী কারণ জানি না অবনীল এবং নায়ীরা নিয়ে এখনো সেভাবে সমালোচনা করে নি!

"বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা" হালকা সুরে লেখা বেশ কয়েকটি গল্পের সংকলন। ঈদ সংখ্যার জন্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার চাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে একই চরিত্র দিয়ে এই গল্পগুলো লেখা হয়েছিল। পাঠকেরা এই গল্পগুলো কীভাবে নেন আমি জানি না কিন্তু আমি লিখে এক ধরনের মজা পাই। ভবিষ্যতেও যে আরো লিখব সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই!

পরিশেষে প্রতীক প্রকাশনীর আলমগীর রহমানকে আবার ধন্যবাদ সায়েন্স ফিকশানের চতুর্থ সংকলনটি বের করার জন্যে। প্রত্যেকবারই নূতন একটি বই বের হলে লেখকদের এক ধরনের আনন্দ হয়। আলমগীর রহমানের হাতে সায়েন্স ফিকশান সমগ্র বের হলে সেই আনন্দের একটি ভিন্ন মাত্রা থাকে। কারণ তাঁর প্রকাশিত বইগুলো হয় খুব সুন্দর। আমি লক্ষ করছি ইদানীং নিজের অজান্তেই আমি অপেক্ষা করতে থাকি কখন আবার আটটি সায়েন্স ফিকশান লেখা হবে, কখন আবার নূতন সায়েন্স ফিকশান সমগ্র বের করা হবে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
৭.৮.০৫
বনানী, ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

ত্রাতুলের জগৎ ০১
বেজি ৯১
ফিনিক্স ১৭৩
সায়রা সায়েন্টিস্ট ২৪১
সুহানের স্বপ্ন ৩২৫
অবনীল ৪০৫
নায়ীরা ৪৬৭
বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা ৫৪১
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাতুলের জগৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. ট্রাকিওশানহীন একজন যুবক

দুপুরবেলা এই এলাকাটিতে মানুষ, সাইবর্গ[১], এন্ড্রয়েড[২] আর রোবটের[৩] একটা ছোটখাটো ভিড় জমে যায়। বেশিরভাগ মানুষের চেহারায় ব্যস্ততা আর উদ্বেগের ছাপ থাকে। কারো কারো চেহারায় থাকে ক্লান্তি, অবসাদ, এমনকি হতাশা। কৃচিৎ এক-দুজনকে তারুণ্য বা ভালবাসার কারণে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে থাকতে দেখি, তাদের দেখতে আমার বড় ভালো লাগে—আমি এক ধরনের লোভাতুর দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। সাইবর্গগুলোর চেহারায় সব সময় এক ধরনের বিভ্রান্তির ছাপ থাকে। তাদের মানুষ অংশটি প্রতিনিয়ত যন্ত্র অংশটির সাথে এক ধরনের অদৃশ্য সংঘাতের মাঝে আটকা পড়ে আছে, সেই সংঘাতের ছাপটি তাদের চোখে-মুখে ফুটে থাকে। তাদের ভুরু হয় কুঞ্চিত, চোখে থাকে ক্রোধের ছায়া। তাদের পদক্ষেপ হয় দ্রুত এবং অবিন্যস্ত। আমার কাছে সবচেয়ে হাস্যকর মনে হয় এন্ড্রয়েডগুলোকে, তাদের চেহারা মানুষের মতো, সেই কথাটি মনে হয় তারা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। সব সময়ই তারা মুখে একটা মানবিক অনুভূতির চিহ্ন ফুটিয়ে রাখতে চায়—সেই অনুভূতিটি হয় চড়া সুরে বাঁধা। যখন ক্লান্তির ছাপ থাকার কথা তখন তাদের মুখে আসে গভীর অবসাদের চিহ্ন, যখন হালকা আনন্দ থাকার কথা তখন তাদের চোখে-মুখে আসে মাদকাসক্ত মানুষের বেপরোয়া উত্তেজনা, যখন বিরক্তির চিহ্ন থাকার কথা তখন তাদের মুখে থাকে দুর্দমনীয় ক্রোধের ছাপ! সেই তুলনায় রোবটগুলোকে দেখে অনেক বেশি স্বস্তি অনুভব করি। তাদের চেহারা যান্ত্রিক এবং ভাবলেশহীন, তাদের কাজকর্ম বা ভাবভঙ্গিতে কোনো জটিলতা নেই, তাদের আচার-আচরণে কোথায় যেন একটি শিশু বা পোষা কুকুরের সারল্য রয়েছে। আমি তাদের সাহচর্যকে পছন্দ করি না কিন্তু দূর থেকে দেখে এক ধরনের ছেলেমানুষি কৌতুক অনুভব করি।

আমার মনে হয় আমাকে দেখেও এই রোবট, এন্ড্রয়েড, সাইবর্গ বা মানুষগুলোর কপোট্রনে বা মনে বিচিত্র ভাবনার উদয় হয়। আমি সুউচ্চ সহস্রতল অট্টালিকার দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকি। এই রাস্তায় দুটো ইঁদুর, একটি কবুতর এবং কয়েকটি চড়ুই পাখির সাথে আমার ভাব হয়েছে। দুপুরে খাবার সময় আমি কিছু রুটির টুকরো ছড়িয়ে দিই এবং এই প্রাণীগুলো এক ধরনের আগ্রহ নিয়ে সেগুলো খায়। তাদের একেবারে সোজাসাপ্টা কাড়াকাড়ি করে খাওয়া দেখতে আমার এক ধরনের আনন্দ হয়। প্রাণীগুলো আজকাল আমাকে ভয় পায় না, আমার আস্তিনের নিচে নির্বিবাদে লুকিয়ে থাকে কিংবা আমার কাঁধে বসে

---

১ নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিচিরমিচির করে ডাকাডাকি করে। এই এলাকার রোবটগুলো ভাবলেশহীন মুখে আমাকে লক্ষ করে, কিন্তু তাদের সবুজ ফাটাসেলের চোখে আলোর তারতম্য দেখে আমি বুঝতে পারি তাদের কপোট্রনে খানিকটা হলেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং তারা নিজেদের ভেতরে কোনো একটা হিসাব মেলাতে পারে না। একজন অল্পবয়সী মানুষের সুউচ্চ অট্টালিকার দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে থাকার কথা নয়, তার শরীরের ওপর দিয়ে পশুপাখির ছোটাছুটি করার কথা নয়। রোবটগুলো কখনোই আমাকে বিরক্ত করে নি—কিন্তু সাইবর্গ এবং এন্ড্রয়েডগুলো মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছে, কখনো কখনো অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য কিংবা ক্রোধ প্রকাশ করেছে। আমাকে দেখে মানুষেরা অবিশ্যি সব সময়ই সহজাত সৌজন্যের কারণে নিজেদের অনুভূতি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেটি কখনো গোপন থাকে নি। আমি বুঝতে পারি তারা আমার জন্যে এক ধরনের করুণা এবং অনুকম্পা অনুভব করছে। প্রাচীনকালে মানুষ মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে জীবনবিমুখ হয়ে যেত—গত কয়েক শতাব্দীতে তার কোনো উদাহরণ নেই। এখন যারা সমাজের প্রচলিত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাস্তার পাশে পা ছড়িয়ে বসে পাখির সাথে কিংবা ইঁদুরের সাথে বসবাস করে তারা পুরোপুরি নিজের ইচ্ছেতেই করে। এটি এক ধরনের বিদ্রোহ, যে বিদ্রোহের কারণ জানা নেই। মানুষ সেই বিদ্রোহকে ভয় পায়, সেই বিদ্রোহীর জন্যে করুণা অনুভব করে।

আমি মানুষের করুণামিশ্রিত অনুকম্পার দৃষ্টি দেখে কিছু মনে করি না। কারণ আমি জানি আমি আমার চারপাশের এই অসংখ্য মানুষ, সাইবর্গ, এন্ড্রয়েড বা রোবট থেকে অনেক ভালো জীবন পেতে পারতাম, কিন্তু সেই জীবনে আমার কোনো আকর্ষণ নেই। আমি দেখেছি সেই জীবন প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন—প্রতিটি মানুষের জীবন এত সুনির্দিষ্ট, এত গতানুগতিক যে সেটি একটি সাজানো নাটকের মতো। আমি সেই সাজানো রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা হতে চাই নি। তাই একদিন শহরের কমিউনিটি কেন্দ্রে গিয়ে অভ্যর্থনা ডেস্কের মেয়েটিকে বলেছিলাম, "আমি আমার ট্রাকিওশানটি[৪] ফিরিয়ে দিতে চাই।"

মেয়েটি আমার কথা বুঝতে পারল বলে মনে হল না, খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "ট্রাকিওশান! ফিরিয়ে দেবে?"

মেয়েটির মুখ দেখে আমি এক ধরনের কৌতুক অনুভব করলাম, মনে হল আমার কথা শুনে সে আকাশ থেকে পড়েছে। আমি মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, "তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি মনে করছ ট্রাকিওশান নয়, আমি বুঝি আমার মস্তিষ্ক ফিরিয়ে দিতে এসেছি।"

মেয়েটি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "সেটা বরং আমি বুঝতে পারতাম। আজকাল জীবন এমন পর্যায়ে চলে এসেছে যে মাঝে মাঝে মনে হয় মস্তিষ্ক ছাড়াই দিন বেশ কেটে যাবে! কিন্তু ট্রাকিওশান—ট্রাকিওশান ছাড়া তুমি কেমন করে থাকবে?"

"আমার ধারণা খুব আনন্দে থাকব।"

মেয়েটি ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কি মাদকাসক্ত?"

"না। আমি এই মুহূর্তে মাদকাসক্ত নই। আমি পুরোপুরি সুস্থ মানুষ। আমার ট্রাকিওশানটি পরীক্ষা করলে তুমি দেখবে আমি মানুষটি খুব গবেট নই—"

"তা হলে কেন ট্রাকিওশান ফেরত দিতে চাইছ? তখন তোমাকে খুঁজে পাবার কোনো উপায় থাকবে না। তোমার যদি কোনো জরুরি প্রয়োজন হয়—যদি কোনো বিপদ হয়—"

"ঠিক সেজন্যেই ফেরত দিতে চাইছি।" আমি মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বললাম, "সব সময়ই কেউ না কেউ আমার ওপর নজর রাখছে, সেটা চিন্তা করলেই আমার রক্তচাপ বেড়ে যায়। আমি স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।"

মেয়েটি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "স্বাধীনভাবে?"

"হ্যাঁ! প্রাচীনকালের মানুষের শরীরে ট্রাকিওশান ঢুকিয়ে দেওয়া হত না। তারা দিব্যি বেঁচে ছিল।"

"কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষেরা নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে ফেলত। অদ্ভুত সব ভাইরাস আবিষ্কার করে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ মেরে ফেলেছিল। মানুষকে ক্লোন করতে গিয়ে—"

মেয়েটিকে আমি যতটুকু বুদ্ধিমতী ভেবেছিলাম সে তার থেকে বেশি বুদ্ধিমতী—ইতিহাসের অনেক খবর রাখে। তাই আমি যুক্তিতর্কের দিকে অগ্রসর না হয়ে বললাম, "তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষেরা সবাই সেরকম নির্বোধ ছিল না। তাদের মাঝেও অনেক খাঁটি মানুষ ছিল। প্রথম আন্তঃনক্ষত্র অভিযানের ইতিহাসটুকু পড় নি? মানুষ সেখানে কী রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিল তুমি জান?"

মেয়েটা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি বিপদের ঝুঁকি নিতে চাও?"

"ইচ্ছে করে নিতে চাই না। কিন্তু একটা ট্রাকিওশান আমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখছে, একটা হাঁচি দিলেও দুটি বাইভার্বালে[৫] করে তিনটি চিকিৎসক রোবট পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমি সেরকম অবস্থা থেকে মুক্তি চাই।"

মেয়েটা একটা ছোট যোগাযোগ মডিউল অন্যমনস্কভাবে হাত বদল করে বলল, "এটা নিশ্চয়ই বেআইনি?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না, বেআইনি না। যারা চার মাত্রার অপরাধী তাদের জন্যে বেআইনি। আমার রেকর্ড একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। ক্রিস্টালের মতো স্বচ্ছ।"

মেয়েটা হাল ছাড়ল না, বলল, "কিন্তু এটা শরীরের ভেতর থেকে বের করতে হলে নিশ্চয়ই চিকিৎসা কেন্দ্রে যেতে হবে। চিকিৎসক রোবট লাগবে—"

"তার কোনো প্রয়োজন নেই।" আমি মধুরভাবে হেসে বললাম, "তোমার চোখের সামনে আমি আমার হাতের চামড়া কেটে ট্রাকিওশানটা বের করে দেব।"

মেয়েটা এক ধরনের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল এবং আমি কিছু বলার আগেই সামনে রাখা একটা বোতাম স্পর্শ করে বলল, "তুমি একটু দাঁড়াও, আমি দুজন প্রতিরক্ষা রোবটকে ডাকি।"

আমি রোবটের সাহচর্য একেবারেই পছন্দ করি না। মানুষ—বড়জোর সাইবর্গকে আমি সহ্য করতে পারি কিন্তু ঠিক কী কারণ জানি না, আমি রোবটকে একেবারেই সহ্য করতে পারি না। আমি একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, "তুমি শুধু শুধু রোবটকে ডেকে পাঠালে। শুধু খানিকটা যন্ত্রণা বাড়ালে।"

"যন্ত্রণা বাড়ালাম?" মেয়েটি একটু উষ্ণ হয়ে বলল, "তোমার যদি কিছু একটা হয়?"

আমি চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেলাম দুটি কদাকার রোবট দ্রুত পায়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। কপালের পাশে কোম্পানির ছাপ এবং নম্বর, এগুলো চতুর্থ প্রজন্মের হাইব্রিড। কপোট্রনের নিউরাল নেটওয়ার্কে এদের তিন মাত্রার নিরাপত্তা বন্ধনী। রোবট দুটি নিঃশব্দে আমার দুপাশে এসে দাঁড়াল। আমি না তাকিয়েই বুঝতে পারি তাদের ফটোসেলের চোখ তেইশ থেকে সাতচল্লিশ হার্টজে কাঁপতে শুরু করেছে। আমাকে রক্ষা করার জন্যে এসেছে কিন্তু ব্যাপারটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি—আমাকে বিপদে ফেলে দেওয়া এদের জন্যে বিচিত্র কিছু নয়। ঝুঁকি নেওয়া আমার কাছে নিরাপদ মনে হল না। আমি মেয়েটির দিকে ঝুঁকে বললাম, "গুগোলপ্লেক্স[৬]।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"গুগোলপ্লেক্স?" মেয়েটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি মাথা নাড়লাম, "কিংবা স্কুয়ের সংখ্যা[৭]। সেটিও হতে পারে।"

"কী হতে পারে?"

"স্মৃতির বিভেদ। ট্রানসেন্ডেন্টাল সংখ্যার উদাহরণ হতে পারে। এক চার এক পাঁচ নয় দুই ছয় পাঁচ তিন পাঁচ..."

আমি প্রথম ত্রিশটা সংখ্যা বলা মাত্রই রোবট দুটি চাপা স্বরে গর্জন করে উঠল। বলল, "খবরদার। তুমি থামো।"

আমি থামলাম না, দ্রুত পরের দশটি সংখ্যা উচ্চারণ করলাম এবং প্রায় সাথে সাথে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। রোবট দুটি একেবারে মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল। আমি ঝুঁকি না নিয়ে সহস্রতম অংশ থেকে আরো দশটি সংখ্যা উচ্চারণ করে রাখলাম। মেয়েটি বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এখানে?"

"বিশেষ কিছু না। আমি রোবট দুটোকে অচল করে রাখলাম।"

মেয়েটি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বলল, "অচল করে রাখলে? কীভাবে?"

"তুমি যদি এই লাইনের লোক না হও তা হলে বুঝবে না। সব কপোট্রনেরই[৮] কিছু না কিছু সমস্যা থাকে। টেস্ট করার জন্যে রোবট কোম্পানিরা কিছু ফাঁকফোকর রেখে দেয়। সেগুলো গোপন থাকে না—বের হয়ে যায়। সেটা জানতে হয়—হিসাব করে সেটা ব্যবহার করা যায়—"

"কিন্তু—কিন্তু—"

আমি মেয়েটাকে বাধা দিয়ে বললাম, "এই রোবট দুটি বেশিক্ষণ অচল থাকবে না। এক্ষুনি আবার সিস্টেম লোড করে নেবে। কাজেই আমার বেশি সময় নেই।" আমি পকেট থেকে ছোট এবং ধারালো একটা চাকু বের করে হাতের ভেতরের দিকে নরম চামড়াটা একটু চিরে ফেলতেই সেখানে এক বিন্দু রক্ত বের হয়ে এল। রক্তের ওপর ছোট ট্রাকিওশানটি ভাসছে, খুব ভালো করে না তাকালে সেটি দেখা যায় না। আমি চাকুর মাথায় সাবধানে সেটি তুলে নিয়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিলাম। বললাম, "এই যে আমার ট্রাকিওশান।"

মেয়েটি কী করবে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ট্রাকিওশানটি খুব সাবধানে তার কোয়ার্টজের ডেস্কের ওপর রেখে বললাম, "সাবধানে দেখে রেখো—হারিয়ে গেলে বিপদে পড়বে।"

মেয়েটি ঠিক তখনো বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। আমার দু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রোবট দুটির দিকে তাকিয়ে আমার দিকে ঘুরে তাকাল, বলল, "তুমি যে কোনো রোবটকে অচল করে দিতে পার?"

"না। যে কোনো রোবটকে পারি না। নতুন সিস্টেম বের হলে একটু সময় লাগে।"

"কীভাবে কর?"

"চেষ্টাচরিত্র করে। কপোট্রনের গঠন জানা থাকলে পারা যায়।" আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, "তুমি চাইলে তোমাকেও শিখিয়ে দিতে পারি! তৃতীয় প্রজন্মের যোগাযোগ রোবট খুব সোজা। একটা লাল কার্ড নেবে আরেকটা সবুজ। লাল কার্ডটা চোখের সামনে দুবার নাড়াবে তারপর সবুজ কার্ড একবার। তারপর বলবে দোহাই দোহাই এন্ড্রোমিডার দোহাই—নয়ের পর সাত চাই।"

"নয়ের পর সাত?"

"হ্যাঁ। দেখবে রোবট ফেঁসে গেছে। পুরো আড়াই মিনিট।" আমি মুখে হালকা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললাম, "তবে সাবধান। আমি যতদূর জানি ব্যাপারটা হালকাভাবে বেআইনি। রোবটগুলোর মেমোরিতে থাকে না তাই ধরতে পারে না।"

আমি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রোবটটার সবুজ ফাটাসেলের চোখে হালকা আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পেলাম, যার অর্থ সেগুলো তাদের সিস্টেম লোড করতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মাঝেই সেগুলো জেগে উঠবে—আমাকে তার আগেই চলে যেতে হবে। আমি ডেস্কের ওপর পাশে বসে থাকা মেয়েটির দিকে চোখ মটকে বললাম, "বিদায়!"

"কিন্তু—কিন্তু—"

মেয়েটি আরো কিছু একটা বলতে চেয়েছিল কিন্তু তার আগেই আমি বড় হলঘর পার হয়ে বাইরে চলে এসেছি। আমার শরীরে কোনো ট্রাকিওশান নেই—আমার সাথে এই মেয়েটি আর কোনোদিন যোগাযোগ করতে পারবে না। শুধু এই মেয়েটি নয়, পৃথিবীর আর কেউই যোগাযোগ করতে পারবে না।

চড়ুই পাখিটি আমার কাঁধ থেকে নেমে আমার হাতের তালুতে আশ্রয় নিয়ে হাত থেকে খুঁটে খুঁটে কয়েকটি শস্যদানা খাচ্ছিল, ঠিক এরকম সময়ে আমার সামনে ক্রুদ্ধ চেহারার একটি সাইবর্গ দাঁড়িয়ে গেল। তার মাথার ডানপাশে মস্তিষ্কের ভেতর থেকে কিছু টিউব বের হয়ে এসেছে। বাম চোখটি কৃত্রিম, সেখানে ঘোলা লাল রঙের একটা আলো। সাইবর্গের দাঁতগুলো ধাতব। সে এক ধরনের যান্ত্রিক গলায় বলল, "তুমি কে? তুমি এখানে কী করছ?"

আমি তার দিকে না তাকিয়ে বললাম, "তুমি কে? তুমি এখানে কী করছ—আমি কি সেটা জানতে চেয়েছি?"

সাইবর্গটি ধাতব গলায় বলল, "না।"

"তা হলে তুমি কেন জানতে চাইছ?"

"এটি স্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর সব মানুষকে তার দায়িত্ব পালন করতে হয়। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করছ না। তুমি দুপুরবেলা এখানে পা ছড়িয়ে বসে আছ। পাখি নিয়ে খেলা করছ।"

আমি একটু কৌতূহল নিয়ে সাইবর্গটির দিকে তাকালাম, মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া টিউবগুলোতে কোম্পানির ছাপ দেওয়া রয়েছে। এটি সপ্তম প্রজন্মের ইন্টারফেস, এই সাইবর্গটির সিস্টেম অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। আমি ইচ্ছে করলে চোখের পলকে এটিকে বিকল করে দিতে পারি। যন্ত্র অংশটি বিকল করে দেওয়া হলে তার মানব অংশটি কী করে আমার খুব জানার ইচ্ছে হল, কিন্তু আমি জোর করে আমার কৌতূহলকে নিবৃত্ত করলাম। শহরের মাঝামাঝি এলাকায় ভর দুপুরবেলা আমি একটা হট্টগোল শুরু করতে চাই না। কিন্তু সাইবর্গটি নাছোড়বান্দার মতো লেগে রইল, কণ্ঠস্বর এক ধাপ উঁচু করে বলল, "তুমি এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি।"

"না দিই নি।"

"কেন?"

"কারণ প্রথমত আমার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, আমি যদি উত্তর দিই তুমি সেটা বুঝবে না।"

"কেন বুঝব না?"

"কারণ তুমি একটা সাইবর্গ। সাইবর্গের বুদ্ধিমত্তার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। একটা বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে সাইবর্গ তৈরি করা হয়েছিল এবং আমার ধারণা সেই উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।"

সাইবর্গটি তার গলার স্বর আরো এক ধাপ উঁচু করে আরো উষ্ণ হয়ে বলল, "তুমি কেন এই কথা বলছ?"

"কারণ তুমি সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে আমার সময় নষ্ট করছ। তোমার চেঁচামেচির কারণে আমার পোষা ইঁদুরটি লুকিয়ে গেছে। চড়ুই পাখিটি উড়ে ঐ বিল্ডিঙের কারনিসে বসে আছে। তুমি দূর হও।"

সাইবর্গটি প্রায় মারমুখী হয়ে বলল, "তুমি কেন আমার সাথে অপমানসূচক কথা বলছ? আমি তোমার সম্পর্কে মূল তথ্যকেন্দ্রে রিপোর্ট করে দেব।"

আমার এবারে একটু ধৈর্যচ্যুতি হল—কাজেই আমি সাইবর্গটির চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "ধু-ধু একটা প্রান্তর তার ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা পাথর গড়িয়ে যাচ্ছে।"

সাইবর্গটির ভালো চোখটিতে হঠাৎ একটি আতঙ্ক ফুটে উঠল। কাঁপা গলায় বলল, "কেন তুমি এ কথা বলছ?"

"পাথরটা ছয় টুকরো হয়ে গেছে। এখন ছয়টি ধু-ধু প্রান্তর। তার মাঝে ছয়টা পাথর গড়িয়ে যাচ্ছে।"

সাইবর্গটা চিৎকার করে বলল, "না, না—তুমি চুপ কর।"

"আকাশে তখন বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের রঙ নীল।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই সাইবর্গটি হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল এবং আমি তখন কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। যন্ত্রের অংশটি অচল হবার পর নিশ্চয়ই তার ভেতরের মানুষটি কাঁদছে। একটি সাইবর্গের ভেতরের মানুষটি কি সব সময়ই এরকম বিষণ্ন এবং হতাশাগ্রস্ত? আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, "তুমি কেন কাঁদছ?"

"আমাকে মুক্তি দাও। দোহাই তোমার—"

"আমি তোমাকে কেমন করে মুক্তি দেব?"

আমি কিছু একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। আমাকে ঘিরে ছোট একটা ভিড় জমে উঠেছে। বেশ কয়েকটি রোবট, সাইবর্গ এবং এন্ড্রয়েড দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে কিছু মানুষও রয়েছে।

কঠোর চেহারার একটি এন্ড্রয়েড বলল, "এই মানুষটি মেটাকোড[৯] ব্যবহার করেছে।"

আরো একটি এন্ড্রয়েড তাদের অভ্যাসমতো বাড়াবাড়ি বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমি নিজে শুনেছি।"

"নিরাপত্তা কেন্দ্রে খবর দিতে হবে।"

"কীভাবে খবর দেবে? তুমি দেখছ না এর শরীর থেকে কোনো সিগন্যাল আসছে না। এর শরীরে কোনো ট্রাকিওশান নেই।"

উপস্থিত সকল রোবট, সাইবর্গ, এন্ড্রয়েড এবং মানুষেরা বিস্ময়ের এক ধরনের শব্দ করল, আমি তখন বুঝতে পারলাম আমার এখান থেকে সরে পড়ার সময় হয়েছে। যদি এভাবে বসে থাকি তা হলে কিছুক্ষণের মাঝেই আবার কিছু প্রতিরক্ষা রোবট নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী চলে আসবে। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং ঠিক তখন শুনতে পেলাম কাছাকাছি একটা বাইভার্বাল এসে দাঁড়িয়েছে এবং তার ভেতর থেকে দুজন প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানুষ নেমে এসেছে। একজন গলা উঁচু করে বলল, "এখানে এত ভিড় কেন? কোনো সমস্যা হয়েছে?"

অন্য কেউ কিছু বলার আগেই আমি বললাম, "না বিশেষ কিছু হয় নি। একটা সাইবর্গের সিস্টেম ফেল করেছিল, সেটি আবার তার সিস্টেম লোড করে নিচ্ছে।"

প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানুষটি দাঁতের নিচে দিয়ে অস্পষ্ট গলায় সাইবর্গ প্রজাতির উদ্দেশে একটা কুৎসিত গালি উচ্চারণ করে বলল, "সেজন্যে এত ভিড় করার কী আছে? সবাই নিজের কাজে যাও।"

রোবট, সাইবর্গ আর এন্ড্রয়েডগুলো কোনো কথা না বলে সাথে সাথে বাধ্য মানুষের মতো সরে যেতে শুরু করল। মানুষদের একজন নিচু গলায় বলল, "সাইবর্গটার সিস্টেম এমনি এমনি ফেল করে নি। এই মানুষটি মেটাকোড ব্যবহার করে ফেল করিয়েছে।"

প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানুষ দুজন শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে আমার দিকে তাকাল, হঠাৎ করে তাদের ভুরু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। একজন মানুষ অনাবশ্যক রকম কঠিন গলায় বলল, "সত্যি?"

আমি মাথা নাড়লাম। কাজটি হালকাভাবে বেআইনি, বাড়াবাড়ি কিছু হওয়ার কথা নয়। প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানুষটি তবুও তার মুখে মোটামুটি একটা ভয়ংকর ভাব ফুটিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন মেটাকোড ব্যবহার করেছ?"

আমি মুখে একটা নির্দোষ সারল্যের ভাব ফুটিয়ে বললাম, "সাইবর্গটা আমাকে বড় বিরক্ত করছিল।"

"বিরক্ত করলেই তুমি মেটাকোড ব্যবহার করবে? কোথা থেকে তুমি এই মেটাকোড পেয়েছ?"

আমি হাসার ভঙ্গি করে বললাম, "পাবলিক টয়লেটে লেখা থাকে। নেটওয়ার্কের কথা তো ছেড়েই দিলাম।"

প্রতিরক্ষা বাহিনীর লোকগুলো আরো কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু তার আগেই সাইবর্গটা নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "এই মানুষটার ট্রাকিওশান নেই।"

প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানুষগুলো চমকে উঠে বলল, "কী বললে?"

"বলেছি যে ট্রাকিওশান নেই।"

মানুষ দুজন নিজেদের রনোগান[১০] বের করে আমার দিকে উঁচু করে কিছু একটা দেখে আবার শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে বলল, "সত্যিই নেই।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, বড় ধরনের অপরাধীরা শরীর থেকে ট্রাকিওশান সরিয়ে ফেলে, আমি বড় ধরনের দূরে থাকুক, ছোট অপরাধীও নই। কিন্তু এখন সেটা প্রমাণ করা যাবে না। প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানুষ দুটো এখন আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, আমার জিনেটিক কোড দিয়ে আমার তথ্য বের করে তথ্যকেন্দ্র থেকে নিঃসন্দেহ হবে। যতক্ষণ আমার পরিচয় নিয়ে নিঃসন্দেহ না হচ্ছে ততক্ষণ আমার সাথে দুর্ব্যবহার করতে থাকবে। আমি একটি নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম—যেদিন নিজের ট্রাকিওশান ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি সেদিন থেকে এই বাড়তি ঝামেলার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছি।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানুষ দুজন কিন্তু হঠাৎ করে তাদের মুখের কঠোর ভাবটুকু ঝেড়ে ফেলে কেমন যেন সদয় চোখে তাকাল, তারপর সহজ গলায় বলল, "ট্রাকিওশান খসিয়ে দিয়েছ?"

আমি মাথা নাড়লাম। একজন চোখ মটকে বলল, "ভালোই করেছ, এখন কোনো দায়দায়িত্ব নেই। ঝাড়া হাত-পা।"

আমি মানুষটার চোখের দিকে তাকালাম, মনে হল সেখানে এক মুহূর্তের জন্যে একটা ধূর্ত দৃষ্টি উঁকি দিয়ে গেল। মানুষটি তখন উপস্থিত মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে জটলা না করে সবাই যে যার কাজে যাও। মানুষটা নিজের জীবনকে সহজ করার জন্যে ট্রাকিওশান পর্যন্ত খসিয়ে এসেছে অথচ তোমরা তাকে শুধু যন্ত্রণাই দিয়ে যাচ্ছ!"

উপস্থিত মানুষগুলো এবং তার পিছু পিছু সাইবর্গটি সরে গেল, এখন এখানে আমি একা। প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানুষগুলো কী করে দেখার জন্যে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু তারা কিছুই করল না। সহৃদয় ভঙ্গিতে একটু হেসে বলল, "তোমার জীবন স্বাধীন হোক। শুভ হোক।"

আমি জোর করে মুখে ভদ্রতার হাসি টেনে বললাম, "ধন্যবাদ।"

মানুষ দুজন বাইভার্বালে করে সরে যাবার পর আমি আবার হাঁটতে শুরু করি। পাতাল নগরীর কাছাকাছি একটি কৃত্রিম হ্রদ রয়েছে, তার তীরে একটা বিস্তৃত অংশে বনভূমি তৈরি করা হয়েছে। আমি সময় পেলে সেখানে গিয়ে হ্রদের বালুবেলায় ঘুরে বেড়াই—শহরের ঠিক মাঝখানে যেরকম উটকো বিপত্তির জন্ম হয় সেখানে সেরকম কিছু হওয়ার কথা নয়।

আমি অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে বড় বিল্ডিংটার অন্য পাশে চলে এসে পেছন দিকে তাকালাম। মাটি থেকে কয়েক মিটার উঁচুতে একটা বাইভার্বাল স্থির হয়ে আছে। আমি বড় রাস্তাটার অন্যপাশে এসে আবার পেছন দিকে তাকালাম, বাইভার্বালটি নিঃসন্দেহে আমাকে অনুসরণ করছে।

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম। শরীরের ভেতরে রক্তস্রোতে ঢুকিয়ে দেওয়া একটা ট্রাকিওশান দিয়ে একজন মানুষকে বহু দূর থেকে চোখে চোখে রাখা যায়—সেটি নেই বলে একটি আস্ত বাইভার্বাল এবং কয়েকজন মানুষ মিলে আমাকে চোখে চোখে রাখছে।

কারণটা কী বুঝতে পারছিলাম না বলে আমি নিজের ভেতর এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করতে থাকি।

AMARBOI.COM

২. কিডন্যাপ

শহরতলিতে ছোট একটা রেস্টুরেন্টে আমি কিছু খেয়ে নিলাম—এখানে ভদ্র কিংবা সচ্ছল মানুষরা আসে না। যারা আসে তাদের সবাই সমাজের বাইরের মানুষ—অনেকেই মাদকাসক্ত। একটা বড় অংশ আছে যারা ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর[১১] ব্যবহার করে তাদের মস্তিষ্কে বড় ক্ষতি করে বসে আছে। অনেকেই চোখ ভালো করে খুলতে পারে না, হাত কিংবা পা নিয়ন্ত্রণের বাইরে কাঁপতে থাকে। কথা জড়িয়ে আসে। ভালো একটা চিকিৎসা কেন্দ্রে কিছু দক্ষ চিকিৎসক রোবট দিয়ে এদের অনেককেই সারিয়ে তোলা সম্ভব কিন্তু এই মানুষগুলোর সে ব্যাপারে উৎসাহ নেই। অনেকের ধারণা তা হলে জোর করে তাদেরকে সাইবর্গে পাল্টে দেওয়া হবে। কোনো মানুষ—তার যত সমস্যাই থাকুক কিছুতেই সাইবর্গ হতে চায় না।

রেস্টুরেন্টে নিরিবিলি খেয়ে আমি আমার শেষ সম্বলের কয়েকটি ইউনিট দিয়ে মূল্য পরিশোধ করে বের হয়ে এলাম। এই এলাকাটি সমাজবহির্ভূতদের এলাকা, চারদিকে আবছা অন্ধকার, আলোগুলো ভেঙে রাখা হয়েছে। আকাশের কাছাকাছি উত্তেজক পানীয়ের একটা বিজ্ঞাপন জ্বলছে এবং নিবছে, তার কিছু আলো এখানে ছড়িয়ে পড়েছে। দিনের বেলায় এই এলাকাটিকে অত্যন্ত নিরানন্দ এবং হতচ্ছাড়া দেখায় কিন্তু রাত্রিবেলায় আধো আলো এবং আধো অন্ধকারে এর মাঝে কেমন জানি এক ধরনের রহস্যের ছোঁয়া লেগেছে।

আমি রাস্তার পাশে উবু হয়ে বসে থাকা একজন মাদকাসক্ত মানুষকে পাশ কাটিয়ে কয়েক পা সামনে গিয়েছি, ঠিক তখন হঠাৎ করে একটি বাইভার্বাল নিঃশব্দে আমার পাশে নেমে এল। আমি কিছু বোঝার আগে তার গোলাকার দরজা খুলে যায় এবং এক জোড়া হাত আমাকে ধরে প্রায় হ্যাঁচকা টানে বাইভার্বালের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। প্রায় সাথে সাথে বাইভার্বালটি শূন্যে উঠে যেতে থাকে, আমি ত্বরণের প্রকৃতি দেখে বুঝতে পারি এটি খুব দ্রুত সরে যেতে শুরু করেছে।

আমি নিজের জীর্ণ পোশাকটিকে সমান করার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমাকে ডাকলে আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের কাছে যেতাম।"

বাইভার্বালের কন্ট্রোল প্যানেলে একটি নিরানন্দ সাইবর্গ বসে আছে, ভেতরে দুজন মানুষ। ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যায় দুজনের একজন পুরুষ অন্যজন মহিলা। এক সময় পুরুষ এবং মহিলার শারীরিক পার্থক্যটুকু খুব চড়া সুরে প্রকাশ করা হত—আজকাল খুব তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা না করলে সেটি ধরা যায় না। তার কারণ কী কে জানে। আজ থেকে এক শ বছর বা এক হাজার বছর পরে কী হবে? পুরুষ এবং নারীর পার্থক্য কি ঘুচে যাবে, নাকি পুরুষ এবং নারী ছাড়াও অন্য ধরনের প্রজন্মের সৃষ্টি হবে?

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বাইভার্বালের জানালা দিয়ে নিচে তাকালাম, আলোকোজ্জ্বল একটা বড় শহরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের যে সহজ সৌজন্যতা থাকা উচিত এদের মাঝে তা নেই। আমার সাথে কেউ একটি কথাও বলে নি, কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে কি না কে জানে। তবুও আমি ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাবে?"

মানুষ দুজন চুপ করে রইল, ভেবেছিলাম হয়তো উত্তরই দেবে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী ভেবে মহিলাটি কঠিন গলায় বলল, "সেটা তুমি নিজেই দেখবে।"

"আমার বিনা অনুমতিতে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসা বেআইনি কাজ।"

পুরুষ মানুষটি এবার কাঠকাঠ গলায় হেসে বলল, "তোমার শরীরে কোনো ট্রাকিওশান নেই। ইচ্ছে করলে তোমাকে আমি দরজা খুলে নিচে ফেলে দিতে পারি। কেউ কিছু জানবে না।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তুমি নিশ্চয়ই একটা এন্ড্রয়েড। কারণ একজন মানুষ কেউ জানবে না বলেই কখনোই আরেকজনকে খুন করে ফেলার কথা বলে না।"

পুরুষ মানুষটি আমার কথা শুনে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, আমার দিকে তার মাথাটা এগিয়ে এনে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তুমি যদি একটা মানুষ হতে তা হলে এই কথা বলতাম না। তুমি হচ্ছ অকর্মণ্য, অপদার্থ, মাদকাসক্ত একজন ফালতু মানুষ। তুমি এই সমাজের কোনো কাজে আস না। তুমি দুপুরবেলায় নোংরা একটা ইঁদুরকে কোলে নিয়ে রাস্তায় পা ছাড়িয়ে বসে থাক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ ১১ www.amarboi.com ~

আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, "সেটাই হয়তো সমাজের প্রতি আমার দায়িত্ব। অকর্মণ্য, অপদার্থ, মাদকাসক্ত, ফালতু হয়ে বেঁচে থাকা—যেন আমাকে দেখে সমাজের অন্যরা সতর্ক হতে পারে। এই সৃষ্টি জগতে তেলাপোকারও একটা ভূমিকা আছে, তুমি জান?"

পুরুষ মানুষটি ক্রুদ্ধ গলায় কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু মহিলাটি তাকে নিবৃত্ত করল। বলল, "আহ্! কেন খামকা ঝামেলা বাড়াচ্ছ?"

নিরাপত্তা বাহিনীর দুজন আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে গোল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

বাইভার্বালটি একটা ছোট শহরের ওপর একবার পাক খেয়ে নিচে নেমে এল। একটা হ্রদ পার হয়ে ছোট একটা পাহাড়ের পাদদেশে পুরোনো একটা অট্টালিকার পাশে এসে এটি স্থির হয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলা মাত্রই আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে নামানোর আগেই আমি নিচে নেমে এলাম। আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুজন সদস্য আমার পিছু পিছু হাঁটতে থাকে। বাইরের একটা বড় দরজায় কিছু গোপন কোড এবং রেটিনা স্ক্যান করিয়ে আমাদের ভেতরে ঢোকানো হল। একটা ছোট করিডর ধরে হেঁটে বড় একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সুইচ টিপে ভারী দরজা খোলা হল—ভেতরে নানা বয়সী কিছু মানুষ, চোখের দৃষ্টি দেখেই বোঝা যায় এদের সবাইকে ঠিক আমার মতো করে ধরে আনা হয়েছে। মানুষগুলো কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকাল। আমি কী করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু তার দরকার হল না। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানুষটি আমাকে ঘরের ভেতরে ঠেলে দিল। প্রায় সাথে সাথেই ঘরঘর করে ভারী দরজাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ভেতরের মানুষগুলো আমাকে এবং আমি ভেতরের মানুষগুলো যাচাই করে দেখতে শুরু করলাম। ঘরের ভেতর সব মিলিয়ে সাতজন মানুষ—দুজন মেয়ে এবং পাঁচজন পুরুষ। দুটি মেয়েরই চোখের দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থ, দেখে বোঝা যায় ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর ব্যবহার করে মস্তিষ্কের সর্বনাশ করে বসে আছে। দুজন পুরুষকে মনে হল পেশাজীবী অপরাধী, চোখে-মুখে একটু বেপরোয়া ভাব এবং হাতের আঙুলগুলো অদৃশ্য একটি লেজার ব্লাস্টার[১২] ধরে রাখার ভঙ্গি করে নড়ছে। অন্য মানুষগুলোকে মনে হল জীবন সম্পর্কে উদাসীন, একজনের মুখে একটু মৃদু হাসি এবং তাকে দেখে মনে হল পুরো ব্যাপারটি দেখে সে ভারি মজা পাচ্ছে। ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর ব্যবহার করে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে থাকা একটি মেয়ে ঘাড় বাঁকা করে একটা চোখ ঈষৎ খুলে বলল, "তোমার কাছে কি বিভিচুরাস[১৩] আছে?"

বিভিচুরাসের মতো ভয়ংকর একটি মাদকদ্রব্য পকেটে নিয়ে কারো ঘোরার কথা নয়, কিন্তু মেয়েটি এই ধরনের সহজ যুক্তিতর্কের উপরে চলে গিয়েছে। ঈষৎ খুলে রাখা চোখটি বন্ধ করে অভিযোগ করার ভঙ্গি করে বলল, "আমার স্টিমুলেটরটি নিয়ে গেছে।"

পেশাজীবী অপরাধীদের একজন জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে টিটকারি দিয়ে বলল, "বড় অন্যায় করেছে!"

মেয়েটি তার কথায় কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বিড়বিড় করে অনেকটা নিজের সাথে কথা বলতে থাকে। মুখে মৃদু হাসি লেগে থাকা মানুষটি তার মুখের মৃদু হাসিকে একটু বিস্তৃত করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে কেন এনেছে?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "জানি না।"

"তুমি কি কোনো অপরাধ করেছ?"

AMARBOI.COM

"এভাবে ধরে নিয়ে আসার মতো কোনো অপরাধ করি নি।"

মানুষটি সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, "তার মানে ছোটখাটো কিছু একটা করেছ।"

"তা করেছি। ট্রাকিওশানটা বের করে ফেলেছি।"

উপস্থিত যারা ছিল তাদের প্রায় সবাই আমার দিকে ঘুরে তাকাল। পেশাদার অপরাধীর মতো মানুষটি অদৃশ্য লেজার ব্লাস্টারের ট্রিগার ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে তুমি ওস্তাদ মানুষ!"

আমি তার কথায় কোনো উত্তর দিলাম না। মানুষটি তার ডান হাত দিয়ে গলায় পোচ দেবার ভঙ্গি করে বলল, "কিন্তু ধরা পড়ে গেছ ওস্তাদ, এখন তুমি শেষ।"

দ্বিতীয় পেশাদার অপরাধীটি বলল, "তোমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটেকুটে নিয়ে নেবে।"

"কিংবা একটা বেকুব সাইবর্গ বানিয়ে ফেলবে।"

"কিংবা তোমাকে শীতল ঘরে নিয়ে রেখে দেবে।" দ্বিতীয় পেশাদার অপরাধীটি দুলে দুলে হাসতে হাসতে বলল, "হয়তো তোমাকে ভিনজগতের মহাকাশের প্রাণীর কাছে বিক্রি করে দেবে।"

আমি এই অর্থহীন কথোপকথনে যোগ দিলাম না—আমি নিশ্চিত বাইরে থেকে আমাদের প্রত্যেকটি কাজকর্ম, অঙ্গভঙ্গি খুব যত্ন করে লক্ষ করা হচ্ছে, ঠিক কী কারণ জানি না, আমার মনে হল এই দলটির মাঝে নিজেকে আলাদা করে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলায় বিপদের ঝুঁকি আছে। আমি নীরবে এক কোনায় গিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইলাম। মুখে মৃদু হাসি লেগে থাকা দার্শনিকের মতো মানুষটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই, এরা বেশ ভালো যত্ন করে। এখানকার খাবার খুব ভালো।"

ভেতরে কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না, একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাবার পর যখন হাল ছেড়ে দেওয়া হয় তখন হঠাৎ করে সময়ের আর কোনো গুরুত্ব থাকে না। আমাকে যখন ডেকে নেওয়া হল তখন আমি অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে গিয়েছি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি যে আমি একটা বিশাল অরণ্যে হারিয়ে গেছি, যেদিকেই যাই সেদিকেই একটা বিশাল বৃক্ষ আমার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার পোশাক ধরে খুব রূঢ়ভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে আমাকে ঘুম থেকে তোলা হল, আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন মানুষ বলল, "চলো।"

কোথায় জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ হবে না বলে আমি কিছু জিজ্ঞেস করলাম না, নীরবে উঠে দাঁড়ালাম। আমি যখন ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম তখন অন্য মানুষগুলো এক ধরনের নিরুত্তাপ নিস্পৃহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমাকে একটি লম্বা করিডর ধরে হাঁটিয়ে ছোট একটি কিউবিকেলে নেওয়া হল। সেখানে আমাকে নগ্ন হতে হল এবং আমি বুঝতে পারলাম এক ধরনের ঝাঁজালো জীবাণুনাশক দিয়ে আমাকে পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরকে স্ক্যান করা হল, নানা ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে আমার শরীরের প্রায় প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করা হল, জিনেটিকে কোডিং করে নেওয়া হল, মেটাবলিজমের হার নির্ধারণ করা হল এবং সবশেষে নিওপলিমারের একটি পোশাক পরিয়ে একটি বড় হলঘরে পৌঁছে দেওয়া হল, সেখানে আমি প্রথমবার একজন সত্যিকারের মানুষ দেখতে পেলাম। মানুষটি একজন কমবয়সী মেয়ে। তার সোনালি চুল এবং আকাশের মতো নীল চোখ। মেয়েটি সুন্দর করে হেসে বলল, "আশা করছি তোমার কোনো অসুবিধে হয় নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিচু গলায় বললাম, "হলেই সেটি নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে!"

"তোমাকে কী বলে ডাকব? তোমার শরীরে কোনো ট্রাকিওশান নেই—তোমার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।"

আমি জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, "কিছু জান না বলেই তো আমাকে এনেছ। কী করবে করে ফেল—শুধু শুধু নামপরিচয় জেনে কী হবে?"

মেয়েটির চোখে-মুখে এক ধরনের বিস্ময়ের ছায়া পড়ল, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "আমার নাম ক্রানা। আমি এখানকার চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্বে আছি।"

"আমার নাম ত্রাতুল।" মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এটা আমার সত্যিকারের নাম।"

মেয়েটি সুন্দর করে হেসে বলল, "সত্যিকারের নাম না হলেও আমি কখনো জানব না।"

মেয়েটির কথাবার্তায় এক ধরনের সহৃদয়তার ছোঁয়া পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে তোমরা কেন এনেছ?"

মেয়েটি একটু বিব্রত হয়ে বলল, "আমি সত্যিই জানি না। মাঝে মাঝেই আমাকে কিছু মানুষকে পরীক্ষা করে তার শারীরিক অবস্থার একটা রিপোর্ট দিতে হয়। এর বেশি আমি কিছু জানি না।" ক্রানা নামের মেয়েটি ইতস্তত করে থেমে গেল—মেয়েটি নিশ্চয়ই আরো কিছু জানে কিন্তু আমাকে বলতে চাইছে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি আমার সম্পর্কে কী রিপোর্ট দিয়েছ?"

"তুমি নীরোগ স্বাস্থ্যবান হাট্টাকাট্টা একজন যুবক।"

"এবং—"

"এবং কী?"

"এবং মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে একটি ট্রাইকিনিওয়াল[১৪] বসানো সম্ভব।"

মেয়েটি আমার কথা শুনে ভয়ানকভাবে চমকে উঠল, অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তু-তু-তুমি কীভাবে জান?"

"জানি না। অনুমান করছি। আমাকে যেভাবে জীবাণুমুক্ত করা হল তাতে মনে হচ্ছে সম্ভবত শরীরে কোনো অস্ত্রোপচার করা হবে। মাথার পেছনে মনে হচ্ছে খানিকটা জায়গায় একটু বেশি করে চুল কেটেছে। এরকম জায়গায় ট্রাইকিনিওয়াল বসায়। তাই অনুমান করছি—"

মেয়েটি কিছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমি জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, "আমার শরীরে কোনো ট্রাকিওশান নেই—কাজেই আমাকে নিয়ে তোমরা যা খুশি করতে পার। ভয়ংকর কোনো এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে আমার থেকে ভালো একজন মানুষ কোথায় পাবে? কারো কাছে কোনো দায়বদ্ধতা নেই—একেবারে নিখুঁত একটি গিনিপিগ।"

মেয়েটি নিচু গলায় বলল, "শরীর থেকে ট্রাকিওশান সরিয়ে তুমি খুব ভুল করেছ ত্রাতুল।"

আমি মাথা নাড়লাম, "তুমি ঠিকই বলেছ ক্রানা। কিন্তু সেজন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই—আমি জেনেশুনেই এই ভুলটা করেছি।"

ক্রানা আমাকে যে কয়েকজন মানুষের কাছে পৌঁছে দিল তাদের চেহারা কঠোর এবং আনন্দহীন। অপারেশন থিয়েটারের মতো নানা ধরনের যন্ত্রপাতি বোঝাই একটা ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝামাঝি একটি স্বচ্ছ ধাতব টেবিলে শুইয়ে আমার দুটি হাত এবং পা স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে ফেলল। এখানে আপত্তি বা প্রশ্ন করার মতো কোনো সুযোগ বা পরিবেশ নেই। একটা চিকিৎসক রোবট আমার মাথাকে গোলাকার একটা টিউবে আটকে দেওয়ার সময় আমি মরিয়া হলে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কী করছ?"

আনন্দহীন চেহারার মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বলল, "একটু পরেই জানতে পারবে।"

আমি মানুষটির চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করে বললাম "তোমার নাম কী?"

আমার প্রশ্ন শুনে মানুষটি খুব অবাক হল। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "নাম? নাম দিয়ে তুমি কী করবে?"

"কৌতূহল।"

"কৌতূহল সংবরণ কর যুবক।"

"আমার নাম ত্রাতুল।"

"তোমার শরীরে কোনো ট্রাকিওশান নেই—কাজেই তোমার নাম ত্রাতুল না হয়ে কোলি ব্যাক্টেরিয়া হলেও কিছু আসে যায় না।"

আমি নিচু গলায় বললাম, "কিন্তু আমি একজন মানুষ।"

"মানুষ?" হঠাৎ করে নিরানন্দ চেহারার মানুষটি আনন্দহীন গলায় হাসতে শুরু করল।

মানুষটির ভব্যতাবিবর্জিত পুরোপুরি হৃদয়হীন আচরণটিতে আমি হঠাৎ করে এক ধরনের আকর্ষণ খুঁজে পেতে শুরু করলাম। চিকিৎসক রোবটটি যখন আমার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করছিল আমি তখন ভেতরের মানুষগুলোকে তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকি। হৃদয়হীন নিরানন্দ মানুষটির চেহারায় কোথায় যেন সরীসৃপের সাথে একটু মিল রয়েছে, হয়তো তার শীতল ভাবলেশহীন মুখ হয়তো উঁচু কণ্ঠার হাড় বা ফ্যাকাসে এবং বিবর্ণ মুখাবয়ব।

দ্বিতীয় মানুষটির অগোছালো চেহারা এবং চেহারার মাঝে এক ধরনের বিরক্তির ভাব পাকাপাকিভাবে লেগে আছে। মানুষটির চুল লালচে এবং মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তৃতীয় মানুষটি সম্ভবত মহিলা কিন্তু তাকে দেখে সেটি নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় নেই। চিকিৎসক রোবটটি যখন আমার মাথাটিকে বিশেষ গোলাকৃতি একটি হেলমেটের মতো যন্ত্রের মাঝে শক্ত করে আটকে ফেলার চেষ্টা করছিল তখন এই তিনজন মানুষ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সামনে বসে কোনো একটি কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

একসময় সরীসৃপের মতো দেখতে নিরানন্দ চেহারার মানুষটি বলল, "আমার সিস্টেম প্রস্তুত। পুরোটি চার্জ করা হয়েছে।"

লালচে চুলের অগোছালো চেহারার মানুষটি এক ধরনের বিরক্তির ভাব নিয়ে বলল, "আমিও প্রস্তুত। ডাটা সারিবদ্ধ করা হয়েছে।"

মহিলা বলে যাকে সন্দেহ করছিলাম সে প্রথমবার মুখ খুলল, চিকিৎসক রোবটটিকে বলল, "কাজ শুরু কর, ইলেনা।" তার কণ্ঠস্বর শুনে আমি এবারে নিঃসন্দেহ হলাম, মানুষটি আসলেই মহিলা।

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু বুঝতে পারলাম রোবটটি আমার মাথার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার মাথার পেছনে শীতল কিছু একটা স্পর্শ করল এবং হঠাৎ করে সেখানে প্রচণ্ড শক্তিতে কিছু আঘাত করল, আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। হঠাৎ করে মনে হল আমার সমস্ত চেতনা বুঝি লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি চেতনা হারালাম না, মাথার পেছন দিয়ে কিছু একটা আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করানো শুরু করেছে। আমার দুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত হঠাৎ করে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সমস্ত শরীরে আমি অপ্রতিরোধ্য এক ধরনের খিচুনি অনুভব করতে শুরু করলাম। আমার চোখের সামনে পরিচিত জগৎ হঠাৎ করে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। বিচিত্র কিছু নকশা, আশ্চর্য উজ্জ্বল কিছু রঙ চোখের সামনে খেলা করতে থাকে, সেগুলো নড়তে থাকে এবং মিলিয়ে যেতে থাকে, আমি উচ্চ কম্পনের কিছু শব্দ শুনতে থাকি এবং তার তীক্ষ্ণ ধ্বনি আমাকে অস্থির করে তোলে। হঠাৎ করে চারদিক নীরব হয়ে আসে, সেই ভয়ংকর নীরবতায় আমার সারা শরীর শিউরে ওঠে। আমি চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করি কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না, মনে হয় চারদিকে কুচকুচে কালো অন্ধকার। আমি নিজের ভেতরে এক ধরনের গভীর বিষণ্নতা অনুভব করতে থাকি, এক গভীর বিচিত্র হতাশা সমস্ত পৃথিবী, জগৎসংসার—সৃষ্টি জগতের সবকিছুর প্রতি এক অভিমান এক ধরনের তীব্র দুঃখবোধে আমার বুকের ভেতর হাহাকার করতে থাকে। হঠাৎ করে আমার মনে হতে থাকে কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি তাতেও কিছু আসে যায় না। এই জগৎসংসার, এই পৃথিবী, এই সৃষ্টি জগৎ বেঁচে আছে না ধ্বংস হয়ে গেছে তাতেও কিছু আসে যায় না। আমি আমার সমস্ত চেতনাকে অদৃশ্য কোনো একটি অস্তিত্বের কাছে সমর্পণ করে গভীর এক ধরনের শূন্যতায় নিমজ্জিত হয়ে গেলাম।

AMARBOI.COM

৩. রাজকুমারী রিয়া

আমি চোখ খুলে দেখতে পেলাম আমাকে ঘিরে তিনজন মানুষই দাঁড়িয়ে আছে। নিরানন্দ সরীসৃপের মতো মানুষটিকে হঠাৎ করে প্রাণবন্ত মানুষের মতো দেখাচ্ছে। লালচে চুলের বিরক্ত মানুষটিকেও কেমন জানি সহৃদয় মানুষ মনে হচ্ছে। যে মানুষটিকে পুরুষ না মহিলা বলে নিঃসন্দেহ হতে পারছিলাম না এখন হঠাৎ করে তাকে বেশ সুন্দরী একজন মহিলা মনে হল। নিশ্চয়ই আমার মস্তিষ্কে কিছু একটা করা হয়েছে যে কারণে গোমড়ামুখী নিরানন্দ তিনজন মানুষকেই হঠাৎ করে মোটামুটি সহৃদয় মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

মহিলাটি আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "তোমার এখন কেমন লাগছে?"

আমি মহিলাটির চোখের দিকে তাকালাম। মহিলাটির চোখে সত্যিকারের এক ধরনের উদ্বেগ। আমার জন্যে হঠাৎ করে এই মমত্ববোধ কেমন করে এল? আমি বললাম, "জানি না।"

নিরানন্দ মানুষটি বলল, "জানার কথা নয়। বুঝতে একটু সময় লাগবে।"

আমি মহিলাটির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কী?"

"আমার নাম রিকি।"

"তোমাকে আগে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি তোমার নাম বলতে চাও নি।"

রিকি অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হাসল, হেসে বলল, "আগে আর এখনের মাঝে একটা বড় পার্থক্য আছে।"

"কী পার্থক্য?"

"আগে তুমি ছিলে ট্রাকিওশান সরানো একজন ফালতু মানুষ—শব্দটার জন্যে কিছু মনে করো না।"

"এখন?"

"এখন তোমার মস্তিষ্কে একটা ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস বসিয়ে তোমার পুরো নিউরাল কানেকশান ম্যাপ করে নিয়েছি—তুমি এখন ফালতু মানুষ নও। রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।"

"তার মানে আমার আর একটা অস্তিত্ব তৈরি করে নিয়েছ।"

"বলতে পার।"

"এটা বেআইনি। এটা তোমরা করতে পার না।"

"অন্য কারো বেলায় সেটা সত্যি—তোমার জন্যে নয়। তুমি ভুলে যাচ্ছ শরীর থেকে ট্রাকিওশান সরিয়ে তুমি মানুষ হিসেবে তোমার সমস্ত অধিকার নিজে থেকে ছেড়ে দিয়েছ।"

লাল চুলের মানুষটা সহৃদয় ভাবে হেসে বলল, "তুমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। ট্রাইকিনিওয়াল বসিয়ে মস্তিষ্ক ম্যাপ করা হলে শরীরের ওপর খুব বড় অত্যাচার হয়।"

আমি কিছু বললাম না।

"তোমার শরীর এখন কেমন লাগছে?"

আমি উঠে বসার চেষ্টা করে বললাম, "একটু দুর্বল লাগছে।"

মহিলাটি আমাকে ধরে সোজা করে বসিয়ে দিয়ে বলল, "হঠাৎ করে উঠে বোসো না। ধীরে ধীরে ওঠ।"

আমি চারদিকে তাকালাম, সবকিছুই আগের মতো আছে তবুও কোথায় যেন সবকিছুকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। আমার মস্তিষ্কের মাঝে নিশ্চয়ই কিছু একটা পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমি মাথার পেছনে হাত দিয়ে সেখানে ছোট একটা ধাতব টিউব অনুভব করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী?"

"ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস। ভেতরে ছোট ক্ষতটুকু শুকিয়ে গেলে খুলে নিতে পারবে।"

আমার শরীর শিরশির করে ওঠে, মস্তিষ্কের সাথে সরাসরি সংযোগ করার জন্যে সেখানে একটি পোর্ট খুলে রেখেছে ব্যাপারটি চিন্তা করে আমার সারা শরীর গুলিয়ে ওঠে।

মহিলাটি উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "তুমি নিজে থেকে ইন্টারফেসটা খোলার চেষ্টা করো না কিন্তু—মস্তিষ্কের সাথে লাগানো আছে—চিকিৎসক রোবট ছাড়া আর কেউ খুলতে পারবে না।"

আমার রেগে ওঠার কথা ছিল কিন্তু কোনো একটা বিচিত্র কারণে আমি কেন জানি রেগে উঠতে পারলাম না। ভেতরে ভেতরে আমি কেমন জানি অবসন্ন এবং উদাসীন অনুভব করতে থাকি।

মহিলাটি লাল চুলের মানুষটিকে বলল, "শিরান, তুমি ত্রাতুলকে দাঁড় করিয়ে দাও।"

"ঠিক আছে, ক্লিশা।" শিরান নামের লাল চুলের মানুষটি আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। আমার প্রথমে মনে হল হাঁটুতে কোনো জোর নেই, আমি পা ভেঙে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু দুই পাশ থেকে দুজন আমাকে সময়মতো ধরে ফেলল। খানিকক্ষণ চেষ্টা করার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারলাম। দেয়াল ধরে ঘরের ভেতরে একটু ঘুরে এসে আমি তিনজন মানুষের দিকে তাকালাম, বললাম, "রিকি, শিরান এবং ক্লিশা—তোমরা আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে?"

ক্লিশা একটু ব্যাকুল চোখে বলল, "অবশ্যই বলব।"

"তোমরা আমাকে কেন এনেছ? আমাকে কী করেছ? এখন আমাকে দিয়ে কী করবে?"

ক্লিশা অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "দেখো ত্রাতুল, একটি খুব বড় প্রজেক্টে মানুষের কিছু অস্তিত্বের প্রয়োজন। আইন খুব কঠিন তাই আমরা সবার মস্তিষ্ক ম্যাপ করতে পারি না। তোমার ট্রাকিওশান নেই বলে তোমারটা করেছি। এর বেশি কিছু নয়।"

"আমার মস্তিষ্কের ম্যাপ মানে আমি। যার অর্থ এখন আমার দুটো অস্তিত্ব।"

"বলতে পার।"

"আমার অন্য অস্তিত্ব এখন কোথায়?"

"একটি বিশাল তথ্য কেন্দ্রে আছে।"

"কীভাবে আছে? সে কি কষ্টে আছে?"

ক্লিশা হাসল, বলল, "না সে কষ্টে নেই। তাকে কোনো ক্ষেত্র দেওয়া হয় নি। তার শরীর নেই, ইন্দ্রিয় নেই, কোনো কিছু অনুভব করার ক্ষমতা নেই।"

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম, "কিন্তু সেটি নিশ্চয়ই ভয়ংকর একটি অনুভূতি। একজন মানুষের কোনো কিছু অনুভব করার ক্ষমতা নেই আমি তো চিন্তাও করতে পারি না।"

শিরান নামের লাল চুলের মানুষটি আমার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "এখন এসব চিন্তা করে লাভ নেই। দেখো কত তাড়াতাড়ি নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পার। যত তাড়াতাড়ি তুমি দাঁড়াতে পারবে তত তাড়াতাড়ি তুমি তোমার নিজের জগতে যেতে পারবে।"

সবকিছু এখনো আমার কাছে খানিকটা দুর্বোধ্য মনে হতে থাকে। আমি অবিশ্যি সেটি নিয়ে মাথা ঘামালাম না। শিরান নামের মানুষটি সত্যি কথাই বলেছে, আমার মস্তিষ্কের আরেকটা কপি কোথাও থাকলেই কী আর না থাকলেই কী? আমি এখান থেকে বের হয়ে যাব—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কিছুক্ষণের মাঝেই আমি মোটামুটিভাবে হাঁটতে শুরু করলাম। নিজের শরীরের ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ ফিরে এল। হঠাৎ করে মাথা ঘুরিয়ে তাকালে মাথাটা একটু ঘুরে ওঠে। এ ছাড়া অন্য কোনো উপসর্গ নেই। ক্লিশা বলেছে কিছুক্ষণের মাঝে এ সমস্যাটিও থাকবে না।

ঘণ্টাখানেকের মাঝে আমি আমার নিজের পোশাক পরে বের হয়ে এলাম। রাত্রিবেলা আমাকে যখন এখানে এনেছে তখন বুঝতে পারি নি, দিনের বেলা দেখতে পেলাম পুরো এলাকাটি খুব সুন্দর। পাহাড়ের পাদদেশে চমৎকার একটি হ্রদ, হ্রদের পানি আশ্চর্য রকম নীল—দেখে ছবির মতো মনে হয়। পুরো এলাকাটি গাছপালা দিয়ে ঘেরা, রাস্তাগুলো জনশূন্য। মাঝে মাঝে নিচু হয়ে একটি-দুটি বাইভার্বাল উড়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া কোনো যানবাহন নেই। সূর্যের নরম একটা উত্তাপ, হ্রদ থেকে হালকা শীতল বাতাস বইছে, বাতাসে এক ধরনের জলে ভেজা গন্ধ। আমি রাস্তা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকি, এলাকাটিতে এক ধরনের শান্তি শান্তি ভাব ছড়িয়ে আছে। এখানে কয়েকদিন থেকে গেলে মন্দ হয় না।

আমি বড় রাস্তা থেকে সরে গিয়ে গাছপালায় ঢাকা ছোট একটি রাস্তা ধরে খানিকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকি। রাস্তাটি সম্ভবত হ্রদের তীরে গিয়েছে, গাছের পাতা বাতাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিরশির করে নড়ছে—শব্দটি শুনতে বড় মধুর লাগতে থাকে। বড় বড় শহরগুলো থেকে গাছপালা পুরোপুরি উঠে গিয়েছে—এখানে এসে হঠাৎ করে এর গুরুত্বটুকু নতুন করে মনে পড়ল। রাস্তাটি সরু হয়ে আর ঘন গাছপালার ভেতরে চলে এসেছে, গাছের ওপর পাখি কিচিরমিচির করে ঝগড়া করছে, আরো উপরে নীল আকাশে সাদা মেঘ। সব মিলিয়ে পরিবেশটি ভারি মধুর।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমি হঠাৎ করে গাছপালার ভেতর থেকে বের হয়ে হ্রদের সামনে চলে এলাম। সামনে বিস্তৃত বালুবেলা—সকালের নরম রোদে চিকচিক করছে। দূরে হ্রদের টলটলে পানি, পাহাড়ের ছায়া পড়ে পানিতে গাঢ় একটি নীল রঙ, দেখে মনে হয় বুঝি অতিপ্রাকৃত একটি দৃশ্য। এই অস্বাভাবিক সুন্দর দৃশ্যটি দেখে আমি কয়েক মুহূর্ত প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন বুকের ভেতর থেকে আটকে থাকা নিশ্বাসটি বের করে দিচ্ছি ঠিক তখন মনে হল একটি মেয়ের আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম। এই অপূর্ব প্রায় অলৌকিক সুন্দর একটি জায়গায় মেয়ে কণ্ঠের আর্তচিৎকার এত অস্বাভাবিক মনে হল যে আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম। মনে হল নিশ্চয়ই ভুল শুনেছি—কিন্তু ঠিক তখন আমি দ্বিতীয়বার একটি মেয়ের চিৎকার শুনতে পেলাম। এটি মনের ভুল নয়, সত্যি সত্যি কোনো একটি মেয়ে চিৎকার করেছে।

আমি মেয়েটির গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটতে থাকি। হ্রদের তীরের টানা বাতাসে ছোটবড়ো বালিয়াড়ি তৈরি হয়েছে। তার দুটি অতিক্রম করে তৃতীয়টির উপরে উঠতেই দেখতে পেলাম, বালিয়াড়ির অন্য পাশে কয়েকজন মানুষ মিলে একটি মেয়েকে টানাহ্যাঁচড়া করছে। আমি বালিয়াড়ির উপরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, "কী হচ্ছে? কী হচ্ছে ওখানে?"

মানুষগুলো ঘুরে আমার দিকে তাকাল এবং আমি দেখতে পেলাম এরা সত্যিকারের মানুষ নয়—এগুলো সাইবর্গ। মাথার পাশে যান্ত্রিক করোটি, সেখানে নানা ধরনের টিউবে কপোট্রন শীতল করার তরল প্রবাহিত হচ্ছে। কারো কারো একটি চোখ কৃত্রিম, সেখানে লাল আলো জ্বলছে। সাইবর্গগুলো একবার আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আবার মেয়েটিকে টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকে। একটি সাইবর্গ তার শক্তিশালী হাত দিয়ে মেয়েটিকে প্রায় শূন্যে তুলে নিয়ে ফেলে দিল। আমি সাইবর্গগুলোর এক ধরনের কুৎসিত যান্ত্রিক হাসি শুনতে পেলাম।

"কী করছ? কী করছ তোমরা?" বলে চিৎকার করতে করতে আমি বালিয়াড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে সাইবর্গগুলোর দিকে যেতে থাকি। একটা শক্তিশালী সাইবর্গ তার বাম পা দিয়ে মেয়েটিকে বালুতে চেপে ধরে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে খসখসে গলায় বলল, "তুমি কে? এখানে কেন এসেছ?"

আমি কাছাকাছি একটা বালিয়াড়ির উপর দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করে বললাম, "আমি যেই হই না কেন, তুমি মেয়েটিকে ছেড়ে দাও।"

"মেয়েটিকে যদি ছেড়েই দেব তা হলে ধরে আনলাম কেন?"

"আমিও সেটা জানতে চাই। কেন ধরে এনেছ?"

"দেখার জন্যে। অনেক দিন মেয়ে দেখি না।"

"দেখার জন্যে পা দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে রাখতে হয় না। তোমার গোবদা পা সরাও—মেয়েটিকে ছাড়।"

সাইবর্গটি একটা নোংরা মুখভঙ্গি করে বলল, "অন্যরকম করে দেখতে চাই।"

AMARBOI.COM

আমি ক্রুদ্ধ গলায় বললাম, "বাজে কথা বলো না। সাইবর্গ মাত্রই নপুংসক। মিছিমিছি অন্যরকম ভান করো না।"

"সব সময় তো নপুংসক ছিলাম না—এখন না হয় হয়েছি।"

"অনেক বাজে কথা হয়েছে। এখন মেয়েটিকে ছেড়ে দাও।"

সাইবর্গটি আমার কথায় কোনো গুরুত্ব না দিয়ে অন্য সাইবর্গগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মানুষটি খুব দুর্ব্যবহার করছে।"

সাইবর্গগুলো সম্মতির ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল। মেয়েটিকে মাটিতে চেপে রাখা সাইবর্গটি বলল, "সাইবর্গের সাথে দুর্ব্যবহার করলে তার শাস্তি পেতে হবে। এটাকেও ধরে আন।"

আমি তীক্ষ্ণ চোখে সাইবর্গগুলোকে লক্ষ করলাম, দেখতে ভিন্ন মনে হলেও এগুলো আসলে হাইব্রিড তিন মডেলের। এই মডেলগুলোর বড় ধরনের সমস্যা আছে। তা ছাড়াও এদের মেটাকোড এত সহজ যে ইচ্ছে করলেই এগুলোকে আমি চোখের পলকে বিকল করে দিতে পারি। কিন্তু এরা কী করে আমার দেখার ইচ্ছে করল, আমি কয়েক পা এগিয়ে দুই হাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমি দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি নোংরা আবর্জনা কোথাকার! এর মাঝে যদি এখান থেকে বিদায় না হও তোমাদের কপোট্রনের বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেব।"

দুটি সাইবর্গ মুখে অশ্লীল কথার তুবড়ি ছুটিয়ে বালিয়াড়ি ভেঙে আমার কাছে ছুটে আসতে থাকে, আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বমুহূর্তে ফিসফিস করে বললাম, "কালো গহ্বরে এনিফর্মের নৃত্য।"

সাইবর্গ দুটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল, একজন ফিসফিস করে বলল, "কী বললে? কী বললে তুমি?"

"আমি বলেছি কালো গহ্বর অর্থাৎ ব্ল্যাকহোলে[১৫] এনিফর্মের নৃত্য।"

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সাইবর্গ দুটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। আমি পা দিয়ে ধাক্কা দিতেই একটি সাইবর্গ বালিয়াড়ি দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আমি দ্বিতীয় সাইবর্গটিকে গড়িয়ে দেবার আগে কৌতূহলী হয়ে তার ব্যাগটিতে উঁকি দিলাম, সেখানে একটি মাঝারি আকারের অস্ত্র লুকানো আছে। কাজটি ঘোরতর বেআইনি, সাইবর্গকে এখনো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের মাঝে আনা যায় নি, তাদের কাছে কখনোই অস্ত্র থাকার কথা নয়। আমি ব্যাগটি থেকে অস্ত্রটি বের করে তাকে ধাক্কা দিতেই এই সাইবর্গটিও বালিয়াড়ি থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ল।

অন্য দুটি সাইবর্গ এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, আমি অস্ত্রটি তাদের দিকে তাক করে বললাম, "দশ সেকেন্ডের আর দুই সেকেন্ড বাকি আছে আবর্জনার পিণ্ড। এই মুহূর্তে দূর হও।"

আমার কথায় এবারে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। সাইবর্গ দুটি মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল, এরা দৌড়ে অভ্যস্ত নয়, বিশেষ করে বালুর উপরে দৌড়ানো খুব কঠিন, সাইবর্গ দুটি কয়েকবার পা হড়কে নিচে পড়ে গিয়েও থামল না।

আমি বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এলাম। মেয়েটি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে বালু ঝাড়ছে। আমি কাছে যেতেই বড় বড় চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলে বলল, "ধন্যবাদ। তুমি না এলে যে কী সর্বনাশ হত!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছু হত না।" আমি হাসার ভঙ্গি করে বললাম, "আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় ব্যর্থ আবিষ্কার হচ্ছে সাইবর্গ। মানুষ আর যন্ত্র মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে—লাভের মাঝে লাভ হয়েছে এটা মানুষও হয় নি যন্ত্রও হয় নি।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি জানি। এই ব্যাপার নিয়ে আমার অনেক দিনের কৌতূহল। কিছু কিছু জিনিস আমি জানি।"

মেয়েটি মাথার এলোমেলো চুলকে হাত দিয়ে খানিকটা বিন্যস্ত করার চেষ্টা করে বলল, "সেটি অবিশ্যি দেখতে পেলাম। এই দুটি সাইবর্গকে কী সহজে কাবু করে ফেললে।"

"মেটাকোড জানলে তুমিও পারবে।" আমি হাত দিয়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বললাম, "আমার নাম ত্রাতুল। কিন্তু আমি সেটা প্রমাণ করতে পারব না। আমার শরীরে কোনো ট্রাকিওশান নেই।"

মেয়েটি এবার মনে হল প্রথমবার সত্যিকার কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকাল, তার মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল এবং শুধুমাত্র এই হাসিটির কারণে আমার হঠাৎ করে মনে হল মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। আমি বললাম, "কী হল? তুমি হাসছ কেন?"

"আমি শুধু নেটওয়ার্কে শুনেছি কোনো কোনো মানুষ নাকি শরীর থেকে ট্রাকিওশান সরিয়ে ফেলে। কখনো কাউকে দেখি নি!"

"জেলখানায় গেলেই দেখবে। বড় বড় অপরাধীরা শরীরে ট্রাকিওশান রাখে না। রাখলেও ভুল ট্রাকিওশান রাখে—"

"কিন্তু সেটা তো অন্য ব্যাপার। অপরাধ করার জন্যে ট্রাকিওশান সরানো—"

আমি হেসে বললাম, "তুমি কেন ধরে নিচ্ছ আমি একজন অপরাধী না। আমি তো অপরাধী হতেও পারি—"

মেয়েটি একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, "আমার একবারও মনে হয় নি যে তুমি অপরাধী হতে পার।" তাকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখাল, ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি অপরাধী?"

আমি হেসে ফেললাম, প্রথমবার বুঝতে পারলাম মেয়েটির মাঝে এক ধরনের সারল্য রয়েছে যেটি আমি বহুদিন কারো মাঝে দেখি নি। বললাম, "তুমি কি মনে কর আমি অপরাধী হলে সেটি তোমার কাছে স্বীকার করব?"

"করবে না, তাই না?"

"না। অপরাধী হওয়ার পর প্রথম কাজই হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা।"

মেয়েটি খুব একটি নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে সেরকম ভঙ্গি করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, "তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই—আমি অপরাধী না। ঠিক করে বলতে হলে বলতে হয় যে বড় ধরনের অপরাধী না।"

"তার মানে ছোট ছোট অপরাধ করেছ?"

"হ্যাঁ, এই যে দুটি সাইবর্গকে অচল করেছি সেটাও ছোট একটা অপরাধ।"

"কিন্তু সেটা তো করেছ আমাকে বাঁচানোর জন্যে।"

"তবুও।" আমি মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কিন্তু তোমাকে সাহায্য করার জন্যে কেউ এল না কেন?"

"আমি বুঝতে পারছি না। গত কয়েকদিন থেকে আমার শুধু অঘটন ঘটছে। নিউরাল কানেকশান ম্যাপ করার পর থেকে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চমকে উঠে বললাম, "তোমার নিউরাল কানেকশান ম্যাপ করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে তোমার মাথাতেও ট্রাইকিনিওয়াল বসানো হয়েছে?"

"হ্যাঁ, এই দেখ।" মেয়েটি আমার সামনে তার মাথাটি এগিয়ে নিয়ে আসে, আমি তার ঘন কালো রেশমের মতো চুল সরিয়ে দেখতে পেলাম মাথার পেছনে ছোট একটা ধাতব সকেট লাগানো—এটা নিশ্চয়ই ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস—আমার মাথাতেও আছে।

আমি একটু অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল, মেয়েটা কেমন যেন ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? তুমি এরকমভাবে তাকিয়ে আছ কেন?"

"না, আমি একটু বোঝার চেষ্টা করছি। আমার নিউরাল কানেকশান ম্যাপ করেছে কারণ আমার মানুষ হিসেবে কোনো অধিকার নেই। কিন্তু তোমাকে কেন করল?"

"ও!" মেয়েটার মুখে নির্দোষ সারল্যের একটা হাসি ফুটে উঠল, বলল, "তার কারণ আমি হচ্ছি রাজকুমারী রিয়া!"

"রাজকুমারী রিয়া?"

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "সত্যিকারের রাজকুমারী নই—কিন্তু তবু নাকি আমি রাজকুমারী।"

"কেমন করে শুনি?"

"জিনেটিক কোডিং করে একেবারে নিখুঁত একজন মানুষ তৈরি করা হয়েছে তুমি জান?"

"হ্যাঁ, জানি। একটি মেয়েকে তৈরি করা হয়েছে। সেটা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে, নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে—"

"আমি সেই মেয়ে।"

আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম—খানিকক্ষণ আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, আমি নেটওয়ার্কে এই মেয়েটির ছবি দেখেছি, কালো চুল, কালো গভীর চোখ, মসৃণ ত্বক। ছবিতে শুধুমাত্র চেহারার সৌন্দর্যটুকু ধরা পড়ে—ভেতরের সৌন্দর্য ধরা পড়ে না। সামনাসামনি কথা বলে বোঝা যায় এই মেয়েটির ভেতরে একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। আমি খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বললাম, "তুমি সেই রিয়া?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি এখানে কেন?"

"আমি জানি না। আমার নিউরাল ম্যাপিং করে এখানে নিয়ে এসেছে। বলেছে এখানে এক সপ্তাহ থাকতে হবে। আমি কাউকে চিনি না, জানি না, যেখানেই যাই সেখানেই একটা অঘটন ঘটে।"

"অঘটন?"

"হ্যাঁ। আমি একটা ছোট গেস্ট হাউজে আছি সেখানে দুই দল মারামারি করল—একটা বিস্ফোরক আমার এই কনুই ঘেঁষে গিয়েছে, পেছনে একটা দেওয়াল ধসে গিয়েছে। গত রাতে গেস্ট হাউজের একটা বিম খুলে পড়েছে—একটুর জন্যে বেঁচে গেছি। দুপুরে খাবার গলায় আটকে গেল—নিশ্বাস বন্ধ করে মারাই গিয়েছিলাম, একজন এসে হেইমলিক ম্যানুভার[১৬] করে আমাকে বাঁচালো। এখানে কী হয়েছে তা দেখতেই পেলে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভুরু কুঁচকে রিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। রিয়া একটু হেসে বলল, "আমার কী মনে হচ্ছে জান?"

"কী?"

"আমাকে এরা তৈরি করেছে একেবারে নিখুঁত মানুষ হিসেবে।"

"হ্যাঁ।"

"মানুষের যেসব গুণ থাকার কথা সব নাকি আমার মাঝে দিয়েছে—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না!"

"কেন?"

"মাঝে মাঝে এমন সব চিন্তা আমার মাথার মাঝে আসে যেগুলো নিখুঁত ভালোমানুষের মাঝে আসার কথা নয়। যাই হোক—যা বলছিলাম, আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"এরা আমাকে পরীক্ষা করছে। এতদিন আমাকে আর আমার মাকে খুব ভালো করে রেখেছে, যত্ন করে রেখেছে। ভালো স্কুলে গিয়েছি ভালো মানুষের সাথে মিশেছি—সব সময় আমাকে চোখে চোখে রেখেছে। এখন আমার ওপর একটা পরীক্ষা করছে। বিপদ-আপদ অঘটন হলে আমি কী রকমভাবে ব্যবহার করি সেটা দেখতে চাইছে।"

রিয়া মেয়েটি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমতী, পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষের তো বুদ্ধিমত্তা থাকারই কথা—তার কথায় একটি যুক্তিও আছে। আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তুমি ঠিকই বলেছ। মনে হয় তোমাকে একটা পরীক্ষা করছে। তোমার ট্রাকিওশান নিশ্চয়ই সব তথ্য কোনো একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডারে পাঠিয়ে যাচ্ছে।"

রিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু রাতুল তুমি জান একটা জিনিস?"

"কী?"

"আমার কখনো যেটা হয় নি সেটা হচ্ছে।"

"কী হচ্ছে?"

"আমার কেন জানি ভয় করছে।"

"ভয়?"

"হ্যাঁ", রিয়ার বড় বড় কালো দুটি চোখে ভয়ের একটি আশ্চর্য ছায়া পড়ল। মেয়েটি পৃথিবীর নিখুঁত মানুষ, তার চেহারায় মানুষের অনুভূতির কী চমৎকার একটি প্রতিফলন হয়—আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকি। আমি একটা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, "কী নিয়ে ভয় রিয়া?"

"আমি সেটা জানি না। সেজন্যেই ভয়।"

আমার হঠাৎ খুব ইচ্ছে করল এই কোমল চেহারার মেয়েটিকে দুই হাতে শক্ত করে ধরে বলি, "তোমার কোনো ভয় নেই রিয়া—আমি তোমার পাশে আছি।" কিন্তু আমি সেটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

বালিয়াড়ির নিচে খচমচ করে এক ধরনের শব্দ হল—আমি তাকিয়ে দেখলাম সাইবর্গ দুটো ওঠার চেষ্টা করছে। রিয়া আমার কাছে এসে হাত ধরে বলল, "ঐ যে ওগুলো উঠে দাঁড়াচ্ছে।"

"পারবে না।" আমি বললাম, "আমার হিসেবে এখনো পনের মিনিট কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তা ছাড়া ওপর থেকে গড়িয়ে এসেছে, আমি নিশ্চিত কপোট্রনের কিছু যোগাযোগ নষ্ট হয়েছে। ভেতরে কিছু ভেঙেচুরে গেছে।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নষ্ট হয়ে তো ক্ষতিও হতে পারে, হয়তো আমাদের আক্রমণ করে বসল।"

"তার আশঙ্কা নেই—কিন্তু খামকা ঝুঁকি নেব না। চলো, আমরা যাই।"

রিয়া আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমার সাথে কিছুক্ষণ থাকবে?"

"অবশ্যই থাকব।" আমি নরম গলায় বললাম, "তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ—তোমার সাথে কিছুক্ষণ থাকা তো আমার জন্যে অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার।"

রিয়া কিছু না বলে বালিয়াড়ি ভেঙে হাঁটতে শুরু করল—আমি হাতের অস্ত্রটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে রিয়ার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করলাম।

৪. শূন্য দিয়ে ঘেরা

আমরা একটা প্রাচীন বাইভার্বালে করে শহরের মাঝামাঝি ফিরে এলাম। রিয়া যে গেস্ট হাউজে আছে সেটি ভারি সুন্দর, হ্রদের তীরে ছোট একটা কুটিরের মতো, চারপাশে গাছ দিয়ে ঘেরা। সামনে চমৎকার একটি ফুলের বাগান, সেখানে নানা রঙের ফুল। আমাদের রেটিনা যদি পতঙ্গের চোখের মতো আরো স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সংবেদনশীল হত তা হলে না জানি কী বিচিত্র রঙ দেখতে পেতাম।

রিয়া তার ঘরে গিয়ে যোগাযোগ মডিউলে তার মায়ের সাথে যোগাযোগ করল। খানিকক্ষণ কথা বলে আমার কাছে ফিরে এসে বলল, "কিছু একটা গোলমাল আছে।"

"গোলমাল?"

"হ্যাঁ"।

"কী গোলমাল?"

"জানি না।"

আমি রিয়ার দিকে তাকালাম, কিন্তু রিয়ার চোখে-মুখে কৌতুকের কোনো চিহ্ন নেই। সে বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কখনো এরকম হয় নি, যে তুমি জান কোথাও কিছু একটা সমস্যা আছে কিন্তু সমস্যাটি কী ঠিক ধরতে পারছ না?"

"হয়। অবিশ্যি হয়।"

"এখানেও সেই একই ব্যাপার। যেমন মনে কর মায়ের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারটা, আমি ইচ্ছেমতো করতে পারি না। এখানে এসে কথা বলতে হয়। যখন মায়ের সাথে কথা বলি তখন—"

"তখন কী?"

"না, কিছু না।"

"বলো কী বলতে চাইছ।"

"মনে হচ্ছে মা কিছু একটা গোপন করতে চাইছে, বলতে চাইছে না।"

"তোমার মা তোমার কাছে কিছু একটা গোপন করছেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিয়া দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি ঠিক তা বলি নি। বলেছি যে মনে হচ্ছে কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা করছেন।"

"সেটাই তোমার মনে হবে কেন?"

"যাই হোক—ছেড়ে দাও। আমাকে এখানে এক সপ্তাহ থাকতে হবে, দুদিন এর মাঝে পার হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে আর পাঁচদিন কাটিয়ে দেব। তোমার সাথে পরিচয় হয়েছে, এখন এত কষ্ট হবে না। তুমি মানুষটা চমৎকার।"

আমি রিয়ার দিকে তাকালাম—মেয়েটি খুব সরাসরি স্পষ্ট কথা বলে—ভদ্রতার নামে নিজেকে আড়াল করে রাখার যে পদ্ধতি আছে সেটি সে জানে না। আমি হেসে বললাম, "তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জান না। আমাকে দেখেছ বড়জোর দুই ঘণ্টা, আর বলে ফেললে আমি মানুষটা চমৎকার?"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ। আমি মানুষকে খুব ভালো বুঝতে পারি।"

"আমি একেবারেই পারি না। আমার ধারণা ছিল আমি মানুষটা অলস, অকর্মণ্য, ফাঁকিবাজ, বোকা—এক কথায় একেবারে ফালতু।"

রিয়া খিলখিল করে হেসে বলল, "অলস, অকর্মণ্য, ফাঁকিবাজ, বোকা আর ফালতু মানুষেরা চমৎকার হতে পারে না তোমাকে কে বলেছে?"

আমিও হেসে ফেললাম, বললাম, "তা ঠিক।"

"চলো কোথাও থেকে খেয়ে আসি। খোঁজাখুঁজি করলে নিশ্চয়ই ভালো একটা খাওয়ার জায়গা পাওয়া যাবে।" রিয়া চোখ নাচিয়ে বলল, "আমার কাছে অনেকগুলো ইউনিট, খরচ করতে হবে না?"

রিয়া খাবার জন্যে যে জায়গাটি খুঁজে বের করল আমি একা হলে কখনোই সেরকম জায়গায় যেতে সাহস পেতাম না। জায়গাটি হ্রদের উপরে ভাসছে, বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করে এক ধরনের আলো-আঁধারি রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। টেবিলের উপর খাবারের তালিকা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম—আমরা সচরাচর যেসব কৃত্রিম খাবার খাই এখানে তার কিছু নেই, সব খাবার প্রাকৃতিক! আমি ভয়ে ভয়ে রিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, "এরকম খাবার খাওয়ার মতো ইউনিট আছে তো?"

রিয়া খিলখিল করে হেসে বলল, "তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা করো না। আমি হচ্ছি রাজকুমারী রিয়া—সারা পৃথিবীর মাঝে একমাত্র নিখুঁত মানুষ—ইউনিটের অভাব বলে আমরা এক বেলা ভালো খাবার খেতে পারব না এটা তো হতে পারে না! তবে—" রিয়া একমুহূর্ত থেমে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার চিন্তা এখন কোনো না অঘটন ঘটে যায়।"

"কেন? অঘটন কেন ঘটবে?"

"তাই তো ঘটছে। সারা জীবনে আমার যতগুলো অঘটন ঘটেছে গত দুই দিনে তার থেকে বেশি ঘটে গেছে।"

আমি হেসে ব্যাপারটি উড়িয়ে দিলাম।

আমরা যখন খাবারের মাঝামাঝি পর্যায়ে আছি—একটি সুস্বাদু সত্যিকার তিতির পাখির মাংস সত্যিকারের জলপাই তেল এবং মশলায় হালকা করে রান্না করা হয়েছে, সেটি যবের রুটি দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছি ঠিক তখন রিয়ার কথা সত্যি প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রথমে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম, তারপর হঠাৎ করে ইতস্তত কিছু মানুষ ছোটাছুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে লাগল। রাগী চেহারার একজন ভয়ংকর দর্শন একটা অস্ত্র নিয়ে একবার ছুটে গেল, কিছুক্ষণ পর আবার সে ফিরে এল এবং আমরা তখন নিরাপত্তাকর্মীদের দেখতে পেলাম। ভয়ংকর দর্শন অস্ত্র হাতে রাগী চেহারার মানুষটি হঠাৎ একটি বিচিত্র জিনিস করে বসল, ঝটকা মেরে রিয়াকে আঁকড়ে ধরে নিজের কাছে টেনে নেয় এবং তার মাথায় ভয়ংকর দর্শন অস্ত্রটি চেপে ধরে চিৎকার করে বলল, "খবরদার। কাছে এলে এই মেয়ের মাথাটাকে উড়িয়ে দেব।"

আমি দেখতে পেলাম নিরাপত্তাকর্মীরা যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে গেছে। রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম, সেখানে ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই—বরং মনে হল একটু কৌতুক ফুটে উঠেছে। আমি নিশ্চিত নই কিন্তু মনে হল সে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে একটু হাসারও চেষ্টা করল। হয়তো বলার চেষ্টা করল, "বলেছিলাম না?"

নিরাপত্তাকর্মীরা অস্ত্র উদ্যত করে রেখে বলল, "তুমি কী চাও?"

মানুষটি ধমক দিয়ে বলল, "তুমি খুব ভালো করে জান আমি কী চাই। একটা চতুর্থ মাত্রার বাইভার্বাল নিয়ে এস এক্ষুনি।"

"কেন, বাইভার্বাল দিয়ে কী করবে?"

"আমি এই দ্বীপ থেকে পালাব। এখানে মানুষ থাকে?" রিয়া হঠাৎ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মানুষটির ভয়ংকর দর্শন অস্ত্রটাকে প্রায় অবহেলায় সরিয়ে দিয়ে বলল, "কী হয়েছে এই দ্বীপটায়?"

"বের হওয়া যায় না—এটার শেষ নাই—" মানুষটার কথা শেষ হবার আগেই নিরাপত্তাকর্মীরা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল—মানুষটি মরিয়া হয়ে গুলি করে বসল—আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম রিয়ার শরীরে গুলি লেগেছে, কিন্তু হুটোপুটি শেষ হবার পর দেখলাম রিয়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

রাগী চেহারার মানুষটি চিৎকার করতে লাগল "এটা নরক, জাহান্নাম, এটা ভূতের বাড়ি—কবরখানা—" কিন্তু কেউ তার কথার বিশেষ গুরুত্ব দিল না, সম্ভবত ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর ব্যবহার করে মস্তিষ্কের বারোটা বাজিয়ে রেখেছে। মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা সরিয়ে একটা কপোট্রনিক ইন্টারফেস বসিয়ে এখন তাকে একটা সাইবর্গ বানিয়ে ফেলতে হবে।

আমাদের খাবার পর্বটি সেখানেই শেষ করতে হল—দুজনের কারোরই আর সেখানে থাকার ইচ্ছে করল না। বের হয়ে আমি রিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, "এত বড় একটা ব্যাপার তুমি একটুও ঘাবড়ে যাও নি—"

"বড় ব্যাপার কে বলেছে? পুরোটা সাজানো নাটক।"

"সাজানো নাটক?"

"হ্যাঁ, তোমাকে বলেছিলাম না—আমি যেখানেই যাই সেখানেই অঘটন।" রিয়া হাসার চেষ্টা করে বলল, "এটাও তাই।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না—এটা তাই না। লোকটার হাতের অস্ত্রটি সত্যি। গুলিতে কতটুকু জায়গা ধসে গিয়েছিল দেখেছ? আমি ভেবেছিলাম তোমার গায়ে গুলি লেগেছে।"

"কিন্তু কখনো লাগে না। আমি তাই দেখছি—শেষ মুহূর্তে আমি রক্ষা পেয়ে যাই। যেন একটা নাটক হচ্ছে। আমি তার নায়িকা। শেষ দৃশ্য পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কোনো কথা না বলে রিয়ার পাশাপাশি হাঁটতে থাকি। রাত সেরকম গভীর হয় নি কিন্তু এর মাঝে চারপাশে নির্জনতা নেমে এসেছে। ঠিক কী কারণ জানি না, আমি হঠাৎ এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। অস্বস্তির কারণটুকু বুঝতে পারছি না বলে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করতে থাকি। কথা না বলে দুজনে অনেকটুকু হেঁটে গেলাম। একসময় রিয়া মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "কী হল, কথা বলছ না কেন?"

"ভাবছি?"

"কী ভাবছ?"

"মানুষটা কী বলছিল মনে আছে?"

"এই জায়গাটা নরক, এটা ভৌতিক দ্বীপ—সেটা?"

"হ্যাঁ!" আমি মাথা নাড়লাম, "মানুষটা বলছিল এখান থেকে বের হওয়া যায় না। মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন বলছিল? আমাদের কি এখানে আটকে রাখা হয়েছে? এটা কি বিশেষ একটা এলাকা? কেন এখান থেকে বের হওয়া যায় না?"

রিয়া ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী বলছ তুমি?"

"আমি কিছুই বলছি না, কিন্তু মানুষটার কথা আমাকে খুব ভাবনায় ফেলে দিয়েছে।"

"চলো তা হলে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।"

"না, ওখানে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, ওরা বলবে না।"

"তা হলে?"

"আমাদের নিজেদের বের করতে হবে।"

রিয়া আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বের করতে হবে?"

"আসলেই কি আমাদের আটকে রেখেছে নাকি।"

"কীভাবে বের করবে?"

"সোজা। একটা বাইভার্বাল নেব—সাইবর্গটাকে অচল করে সোজা এখান থেকে বের হয়ে যাব—দেখি কেউ আটকায় নাকি।"

আমি ভেবেছিলাম রিয়া এরকম একটা ব্যাপারে রাজি হবে না—কিন্তু দেখলাম সে সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল। আমরা তখন রাস্তার মোড়ে একটা বাইভার্বালের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রথম দুটি বাইভার্বালকে ছেড়ে দিতে হল—তার চালক একেবারে নতুন মডেলের সাইবর্গ, তাদের মেটাকোড এখনো আমার জানা নেই, এটাকে আমি অচল করতে পারব না। তৃতীয়টি পুরোনো বাইভার্বাল, চালকটিও তৃতীয় প্রজন্মের। আজ সকালেই এদের দুটিকে বালুবেলায় অচল করে এসেছি।

বাইভার্বালটি উপরে ওঠার তিরিশ সেকেন্ডের ভেতরে আমি সাইবর্গটি অচল করে দিয়ে তার নিয়ন্ত্রণটি হাতে নিয়ে নিলাম। শহরের উপরে একবার পাক খেয়ে আমি সেটিকে উড়িয়ে নিতে থাকি। রিয়া আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি বাইভার্বাল চালাতে পার?"

"না।"

"তা হলে কেমন করে চালাচ্ছ?"

"নিজেই চলছে—আমি শুধু বলছি কোন দিকে চলতে হবে!"

আমি রিয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, "যে জিনিস সাইবর্গ চালাতে পারে সেটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কোনো মানুষ চালাতে পারে। তুমি নিশ্চয়ই জান সাইবর্গের বুদ্ধিমত্তা একটা শিশুর সমান।"

আমি নিশ্চিত এরকম একটা পরিবেশে অন্য যে কেউ হলে ঘাবড়ে যেত কিন্তু রিয়ার ভয়ভীতি কম—কে জানে একজন নিখুঁত মানুষ, সম্ভবত সাহসী মানুষ।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক উড়িয়ে নেবার পর আমরা এই শহরটির শেষ মাথায় এসে উপস্থিত হলাম। নিচে রাস্তার আলো কমে এসেছে। আরো কিছুক্ষণ চালিয়ে নেবার পর হঠাৎ করে অন্ধকার কেটে এক ধরনের আলো ফুটে উঠল। আমরা সোজাসুজি এগিয়ে যেতে থাকি এবং হঠাৎ করে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি। যে জিনিসটিকে আমরা আলো হিসেবে ভাবছি সেটি সত্যিকার অর্থে আলো নয়—সেটি হচ্ছে অন্ধকারের অনুপস্থিতি। আমরা ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেলাম শহরটি হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে এবং তাকে ঘিরে এক ধরনের শূন্যতা। কোথাও কিছু নেই—ব্যাপারটি এত অস্বাভাবিক যে তাকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এটি কুয়াশার মতো নয় যে সবকিছু ঢাকা পড়ে আছে। এটি স্পষ্ট এবং এর মাঝে কোনো বিভ্রান্তি নেই। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ শেষ হয়ে গেছে। সেই ভয়ংকর শূন্যতা দেখে আমার সমস্ত চেতনা হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল, আমি চিৎকার করে বললাম, "রিয়া—চোখ বন্ধ কর।"

"কেন?"

"এটা দেখলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।"

রিয়া দুই হাতে আমাকে শক্ত করে ধরে বলল, "এটা কী?"

"এটা হচ্ছে শূন্যতা। এটা হচ্ছে সত্যিকারের শূন্যতা।"

"এখানে কেন?"

"আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে, কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু কী?" রিয়া ভয় পাওয়া গলায় বলল, "বলো এটি এখানে কেন?"

আমি বাইভার্বালটিকে ঘুরিয়ে শহরের ভেতরে নিয়ে এলাম—কিছুক্ষণের মাঝে অন্ধকার নেমে এল, নিচে রাস্তাঘাট, আলো, জনবসতি দেখা যেতে লাগল। রিয়া একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "রেস্টুরেন্টে যে মানুষটি আমাকে ধরেছিল সে নিশ্চয়ই এই শূন্যতা দেখে এসেছে।"

"হ্যাঁ, দেখে পাগল হয়ে গেছে।"

"আমরা কি পাগল হয়ে গেছি?"

আমি একটি নিশ্বাস ফেলে বললাম, "হয়ে গেলে মনে হয় ভালো হত।"

"কেন?" রিয়া ভয় পেয়ে বলল, "কেন তুমি এ কথা বলছ?"

আমি সাবধানে বাইভার্বালটিকে হ্রদের তীরে বালুবেলায় নামিয়ে এনে তার ইঞ্জিন বন্ধ করে দরজা খুলে দিলাম। প্রথমে রিয়া এবং তার পিছু পিছু আমি নেমে এলাম। আকাশে বড় একটা চাঁদ উঠেছে, হ্রদের পানিতে সেই বড় চাঁদের প্রতিফলন ঘটে পানি চিকচিক করছে। বিশাল বালুবেলা ধূসর একটি সুবিস্তৃত প্রান্তরের মতো—পুরো দৃশ্যটিকে খানিকটা অতিপ্রাকৃতিক বলে মনে হতে থাকে।

রিয়া আমার পাশে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, "কী হয়েছে ত্রাতুল, তুমি কেন বলছ আমাদের পাগল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল?"

"তুমি বুঝতে পারছ না?" কথা বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল, "তুমি এখনো বুঝতে পার নি?"

"না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার মনে আছে আমার এবং তোমার মাথায় ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস লাগানো আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস লাগিয়ে আমাদের মস্তিষ্কের ম্যাপিং করা হয়েছে?"

রিয়া মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, আমি জানি।"

"যার অর্থ আমাদের একটা অস্তিত্ব তৈরি করে একটা তথ্যকেন্দ্রে জমা করে রেখেছে।"

"হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে?"

"আমরা সেই অস্তিত্ব। আমরা সত্যিকারের ত্রাতুল নই, সত্যিকারের রিয়া নই।"

রিয়া একটা আর্তচিৎকার করে আমাকে ধরে ফেলল, তারপর থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। আমি গভীর মমতায় তাকে ধরে রেখে খুব সাবধানে বালুবেলায় বসিয়ে দিলাম। সে অপ্রকৃতিস্থের মতো আমার কাঁধে মাথা রেখে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। আমি রিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, "আমি খুব দুঃখিত রিয়া। আমি খুব দুঃখিত।"

আমি আকাশে পূর্ণ একটি চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই চাঁদ, চাঁদের আলো, হ্রদ, হ্রদের পানি, বালুবেলা সব কৃত্রিম, সব একটি বিশাল তথ্যভাণ্ডারের তথ্য। আমি এবং রিয়াও কৃত্রিম—আমাদের ভাবনা-চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট আসলে বিশাল কোনো এক যন্ত্রের ভেতরের হিসাব, আলো এবং ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণ, কিছু যান্ত্রিক পদ্ধতি।

গভীর হতাশায় আমার বুকের ভেতরে কিছু একটা গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। আমি আমার হাতের দিকে তাকালাম, কী আশ্চর্য—আমি আসলে সত্যিকারের আমি নই? কৃত্রিম একটা ছোট শহরের জগতে আটকে পড়ে থাকা কিছু তথ্য? ত্রাতুল এখন কোথায় আছে? সত্যিকারের ত্রাতুল?

AMARBOI.COM

৫. সত্যিকারের ত্রাতুল

আমি চোখ খুলে তাকালাম, দেখতে পেলাম আমাকে ঘিরে তিনজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, নিরানন্দ চেহারার সরীসৃপের মতো মানুষ, লালচে চুলের বিরক্ত চেহারার মানুষ এবং পুরুষ না নারী বোঝার উপায় নেই সেই মহিলা। চিকিৎসক রোবটটিকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমার মাথার পেছনে খুটখাট শব্দ শুনে বুঝতে পারছি সে কাছেই আছে।

নিরানন্দ চেহারার মানুষটি বলল, "তুমি এখন উঠে বসতে পার।"

আমি উঠে বসার চেষ্টা করতেই মাথার পেছনে কোথায় জানি যন্ত্রণা করে উঠল। সেখানে হাত দিতেই অনুভব করলাম, একটা ধাতব টিউব লাগানো। আমি দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, "জানোয়ারের বাচ্চা।"

নিরানন্দ চেহারার মানুষটি ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "কী বললে? কী বললে তুমি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সাবধানে উঠে বসতে বসতে বললাম, "বলেছি জানোয়ারের বাচ্চা। এটা একটা গালি। তবে যদি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কর তা হলে বুঝবে আসলে এটা ভুল গালি।"

"তুমি কী বলতে চাইছ!"

"আমি কী বলতে চাইছি সেটা তুমি বুঝবে বলে মনে হয় না। তবু যদি শুনতে চাও তা হলে শোন—পৃথিবীতে শুধু মানুষই অন্য মানুষকে অপ্রয়োজনে কষ্ট দেয়। অন্য কোনো পশুপাখি অপ্রয়োজনে নিজের প্রজাতিকে কষ্ট দেয় না। কাজেই তোমাদের জানোয়ারের বাচ্চা গালি দেওয়া হলে জানোয়ারকে অপমান করা হয়।"

মানুষটি আমার কথা শুনে এত অবাক হল যে বলার মতো নয়—আরেকটু হলে হয়তো তেড়ে এসে আমাকে আঘাত করে বসত কিন্তু অন্য দুজন তাকে থামাল। মহিলাটি খনখনে গলায় বলল, "ছেড়ে দাও। মাত্র নিউরাল কানেকশান ম্যাপিং হয়েছে, এখনো সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আসে নি। কী বলছে নিজেও জানে না।"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "কী বলছি, আমি খুব ভালো করে জানি। আমার মস্তিষ্ক ম্যাপিং করার তোমাদের কোনো অধিকার নেই।"

লাল চুলের বিরক্ত চেহারার মানুষটি বলল, "অধিকার, দায়িত্ব, ন্যায়-অন্যায় এসব বড় বড় ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা তোমার মুখে মানায় না। তুমি একজন ফালতু মানুষ—তোমার মস্তিষ্ক ম্যাপিং করে তবুও তোমাকে কোনোভাবে কাজে লাগানো গেছে।"

"আমার অস্তিত্বটিকে তোমরা কী করেছ?"

"সেই উত্তর আমরা তোমাকে দেব কেন? নেটওয়ার্কে করে তাকে তার জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"কোথায় পাঠিয়েছ? কোথায় রেখেছ? তাকে কি কষ্ট দিচ্ছ?"

"দিলেই কী আর না দিলেই কী? সে তো আর তুমি নও।"

আমি চিৎকার করে বললাম, "সে আমি। তাকে তোমরা কষ্ট দিতে পারবে না।"

মহিলাটি এতক্ষণ কোনো কথা বলছিল না, এবারে কঠোর গলায় বলল, "দেখ যুবক, তুমি বাড়াবাড়ি করছ। আমরা তোমার প্রতি অনুকম্পা করে তোমাকে মানুষ হিসেবে বাঁচিয়ে রেখেছি। ইচ্ছে করলেই তোমার মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরিয়ে সেখানে কপোট্রন বসিয়ে একটা সাইবর্গে পাল্টে দিতে পারতাম। সেটা করি নি—তার অর্থ এই নয় যে, ভবিষ্যতে করব না।"

"তোমরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?"

"হ্যাঁ! আমরা তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি। তোমাকে ভয় দেখাতে কোনো সমস্যা নেই। একটা পোষা কুকুরের অধিকার তোমার থেকে বেশি।"

আমি মহিলাটির শীতল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম—একটি ভালো সংগীত শুনলে বা চমৎকার একটা শিল্পকর্ম দেখলে যেরকম আনন্দ হয় মহিলাটির হৃদয়হীনতা দেখে আমার হঠাৎ সেরকম এক ধরনের আনন্দ হল—নিজের অজান্তেই হঠাৎ করে আমার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি হাসছ কেন?"

"আনন্দে।"

"আনন্দে? কীসের আনন্দে?"

"আমি তোমাকে সেটা বলব না। এটা আমার ব্যক্তিগত আনন্দ। তুমি সেটা বুঝতে পারবে না।"

"অনেক হয়েছে। এখন তুমি যাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে যাচ্ছি। আবার দেখা হবে।"

মহিলাটি মাথা নাড়ল, বলল, "না দেখা হবে না।"

আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয়ই দেখা হবে। আমার সাথে দেখা না হলেও আমার অন্য অস্তিত্বের সাথে দেখা হবে। আমি আবার আমার মাথার পেছনে হাত দিলাম, সেখানে ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেসটিতে এক ধরনের ভোঁতা যন্ত্রণা। আমি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় লাল চুলের মানুষটি বলল, "নিজে থেকে ইন্টারফেসটি খোলার চেষ্টা করো না আহাম্মক কোথাকার। মস্তিষ্কের সাথে লাগানো আছে—কিছু একটা গোলমাল হলে একেবারে পাকাপাকি অচল হয়ে যাবে।" লোকটি মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, "কে জানে সেটাই মনে হয় তোমার জন্যে ভালো!"

আমি কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। লম্বা করিডর ধরে হেঁটে বড় একটা দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজাটি খুলে গেল। বাইরে পাথর ছড়ানো ছোট রাস্তা। রাস্তা শেষ হয়েছে একটি গেটের সামনে। গেটটি ঠেলে খুলে আমি বের হয়ে এলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে আবার আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, পুরাতন একটি বিশেষত্বহীন দালান, দেখে বোঝার উপায় নেই এখানে অসহায় মানুষকে ধরে এনে তাদের মস্তিষ্কের নিউরাল কানেকশান ম্যাপিং করে রাখা হয়। আমার একটি অস্তিত্বকে ওরা তৈরি করে রেখেছে—সে কোথায় আছে কেমন আছে কে জানে। আমার না দেখা সেই অস্তিত্বটির জন্যে আমি আমার বুকের ভেতরে এক ধরনের গভীর বেদনা অনুভব করতে থাকি।

আমি পুরাতন সেই দালানটাকে পেছনে ফেলে হাঁটতে শুরু করলাম। পাশাপাশি উঁচু ঘিঞ্জি দালান—পুরো এলাকাটিতে এক ধরনের মন খারাপ করা ভাব। মাথার উপর দিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দ করে বাইভার্বাল উড়ে যাচ্ছে। রাস্তায় মানুষ, সাইবর্গ এবং এন্ড্রয়েড। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম কোথাও একটি গাছ নেই, একটু মাটি নেই, সভ্যতার নামে সবাই মিলে পৃথিবীটাকে কী নিষ্ঠুরভাবেই না পরিবর্তিত করে ফেলেছে। হেঁটে হেঁটে আমি নিজেকে ক্লান্ত করে ফেললাম—আমার পকেটে হাত খুলে খরচ করার মতো ইউনিট নেই। তাই খুঁজে খুঁজে একটা পাতাল ট্রেন বের করতে হল। টিকিট কিনে আমি ছোট একটা ঘুপচি বগিতে চেয়ারে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বসে থাকি। মাটির নিচে অন্ধকার গহ্বরের ভেতর দিয়ে ট্রেনটি সুপার কন্ডাক্টিং রেলের ওপর দিয়ে ভয়ংকর গতিতে ছুটে চলতে শুরু করে। বসে থাকতে থাকতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম আমার অস্তিত্বটি একটি ছোট ঘরের ভেতর আটকা পড়ে আছে, ঘরের ভেতর কয়েকটি বুনো কুকুর—তাদের মুখ দিয়ে সাদা ফেনা ঝরছে। আমার অস্তিত্বটি ঘরটির জানালার লোহার রড ধরে ঝুলে আছে, কুকুরগুলো হিংস্র চিৎকার করে আমার অস্তিত্বটিকে ধরার চেষ্টা করছে—পারছে না। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি—আমার অস্তিত্বটি কাতর গলায় আমার কাছে সাহায্য চাইছে কিন্তু আমি কিছু করতে পারছি না। এরকম সময়ে ট্রেনটি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল, আমি আমার নিজের শহরে পৌঁছে গেছি। আমি সিট বেল্ট খুলে বের হয়ে এলাম। আমার চারপাশে অসংখ্য মানুষ, সাইবর্গ আর এন্ড্রয়েড ব্যস্ত হয়ে হেঁটে যাচ্ছে—শুধু আমার কোনো ব্যস্ততা নেই।

মাটির নিচ থেকে উপরে উঠে দেখতে পেলাম চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমি এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি—হঠাৎ করে নরম একটি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে যাবার ইচ্ছে করতে থাকে। আমি শহরের উপকণ্ঠে আমার দুই হাজার তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে আমার ছোট খুপরির মতো ঘরটিতে এসে শরীরের কাপড় না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুলেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে কিন্তু আমার বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা নেই।

এভাবে কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম আমি জানি না। যখন আমার ঘুম ভেঙেছে তখন বাইরে রাত না দিন তাও আমি জানি না। আমি কোনোমতে বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে দিয়ে আমার শোবার ঘরে ফিরে এলাম। ভিডি মডিউলে[১৭] একটা লাল বাতি জ্বলছে এবং নিবছে যার অর্থ এখানে আমার জন্য অসংখ্য তথ্য জমা হয়েছে। আমার পরিচিত মানুষ বলতে গেলে নেই—এই তথ্যগুলোর বেশিরভাগ নানা ধরনের যন্ত্রপাতি থেকে এসেছে—এর মাঝে কখনোই প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য থাকে না। আমি একটি বোতাম স্পর্শ করে সেগুলো মুছে দিতে গিয়ে কেন জানি থেমে গেলাম—ঠিক কী কারণ জানি না, আমি তথ্যগুলো দেখতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন কাজের মাঝে এক ধরনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

ভিডি মডিউলের বেশিরভাগ তথ্য সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়—পৃথিবীর যাবতীয় অর্থহীন দ্রব্য মানুষকে গছিয়ে দেওয়ার এক ধরনের অসহনীয় প্রতিযোগিতা ছাড়া সেগুলো আর কিছু নয়। তথ্যগুলোর মাঝে হঠাৎ করে অবশ্য একটি পরিচিত মানুষের একটি ভিডিও ক্লিপ পেলাম, জিগি নামের একজন বাতিকগ্রস্ত মানুষ হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে আমার প্রায় বুকের ওপর চেপে বসে চিৎকার করে বলল, "কী খবর তোমার ত্রাতুল? তোমার কোনো দেখা নাই?"

জিগি আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, বাতিকগ্রস্ত এই মানুষটির যে আমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা আছে তা নয়—আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব বলতে গেলে একেবারেই নেই। জিগির সাথে আমার বন্ধুত্ব হওয়ার কথা নয়, তবুও একটি বিচিত্র কারণে তাকে আমার বন্ধু বলে মনে হয়। জিগির ভেতর যদি বিন্দু পরিমাণও শৃঙ্খলাবোধ থাকত তা হলেই তার প্রায় অস্বাভাবিক মেধাবী মস্তিষ্ক ব্যবহার করে একজন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গণিতবিদ কিংবা বিজ্ঞানী হতে পারত। কিন্তু তার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ব্যাপারে এতটুকু কৌতূহল নেই—তার প্রতিভাবান মস্তিষ্ককে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের কাজে না লাগিয়ে এন্ড্রয়েড আর সাইবর্গের মেটাফাইল খুঁজে বের করার কাজে ব্যস্ত রেখেছে। আমি আরো কিছুক্ষণ ভিডি মডিউলের একঘেয়ে এবং অর্থহীন তথ্যগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম—ঠিক যখন ভিডি মডিউলটি বন্ধ করে দিচ্ছি তখন হঠাৎ করে একটি ভিডিও ক্লিপে আমার দৃষ্টি আটকে গেল। এলোমেলো চুল, বিষণ্ন চেহারার একজন যুবকের ত্রিমাত্রিক ছবি ভেসে এসেছে, যুবকটি কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ত্রাতুল, আমি ত্রাতুল।"

আমি ভয়ানক চমকে উঠে তাকালাম, এলোমেলো চুলের বিষণ্ন চেহারার যুবকটিকে আমি চিনতে পারি নি—সে আসলে আমি। আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখতে পেলাম সে একবার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আবার ঘুরে তাকাল, কী ভয়ংকর শূন্য একটি দৃষ্টি—সেই দৃষ্টিতে আমার বুকের ভেতরে কী যেন হাহাকার করে ওঠে। সে ক্লান্ত গলায় বলল, "আমাদের খুব বিপদ ত্রাতুল। আমার আর রিয়ার।" সে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা কী করব বলবে তুমি?"

আমি দেখতে পেলাম এলোমেলো চুলের বিষণ্ন চেহারার যুবকটি—যে আসলে আমি, হলোগ্রাফিক স্ক্রিন থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম, দেখতে পেলাম আমার হাত থরথর করে কাঁপছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. জিগি

জিগির বাসাটি খুঁজে পেতে আমার খুব কষ্ট হল। সে নানা ধরনের বেআইনি এবং অবৈধ কাজে লেগে থাকে বলে নিজের থাকার জায়গাটি কখনো কাউকে জানাতে চায় না। দরজায় শব্দ করার পরও সে দরজা খোলার আগে নানাভাবে নিশ্চিত হয়ে নিল মানুষটি সত্যিই আমি।

আমাকে দেখে সে প্রয়োজন থেকে জোরে চিৎকার করে বলল, "আরে ব্রাতুল—সত্যিই দেখি তুমি! আমি ভেবেছি একটা নিরাপত্তা বাহিনীর এন্ড্রয়েড।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না, আমি এন্ড্রয়েড না।"

"তোমাকে দেখতে এরকম লাগছে কেন?" জিগি ভুরু কুঁচকে বলল, "দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন তোমাকে কেউ কিছু খেতে দেয় নি?"

আমাকে কেন এরকম দেখাচ্ছে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম—কিন্তু মুখ খোলার আগেই জিগি চোখ বড় বড় করে বলল, "কী মজা হয়েছে জান?"

আমি জিজ্ঞেস করার আগেই জিগি বলতে শুরু করল, "চতুর্থ মাত্রার হাইব্রিড সাইবর্গের কপোট্রনের বাইরের শেলে দুইটা মডিউলে ক্রস কানেক্ট!"

জিগি হা-হা করে আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে শুরু করল। সাইবর্গের কপোট্রনের ত্রুটিতে জিগি যেরকম আনন্দ পেতে পারে আমি সেরকম পেতে পারি না—কিন্তু জিগি সেটা লক্ষ করল বলে মনে হল না। হঠাৎ করে আমাকে ঘরের কোনায় টেনে নিয়ে একটা মাঝারি এন্টেনাকে অনুরণিত করতে শুরু করে বলল, "দেখো কী মজা হয়?"

সবুজ স্ক্রিনে কিছু সংখ্যা ছোটাছুটি করতে থাকে, আমি সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী মজা হবে?"

"নেটওয়ার্কে একটা ফাঁক খুঁজে পেয়েছি। আমি এখন মূল নেটওয়ার্কে ঢুকে পড়তে পারি।"

"সে তো সবাই পারে।"

জিগি হাত নেড়ে বলল, "কিন্তু সেটা তো আইনসম্মতভাবে—আমি পুরোপুরি বেআইনিভাবে ঢুকছি!" জিগি আবার আনন্দে হা-হা করে হাসতে থাকে।

জিগি নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে একটা গোপন তথ্য ভাণ্ডারের কিছু মূল্যবান তথ্য নষ্ট করে দিয়ে বলল, "দেখেছ? আমি কী করেছি? আমাকে ধরতে পারল?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না পারে নি।"

"কখনো পারবে না।" জিগি বুকে থাবা দিয়ে বলল, "কখনো না!"

"কেন?"

"আমার ট্রাকিওশান ভুয়া!" জিগি আবার আনন্দে হা-হা করে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে বলল, "নতুন এন্ড্রয়েডগুলোর মেটা ফাইলগুলো বের করেছি। তুমি নেবে?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "নেব।"

"আসো—তোমাকে একটা ক্রিস্টালে লোড করে দেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জিগিকে থামিয়ে বললাম, "জিগি। আমি তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজে এসেছি।"

"আমার কাছে? বিশেষ কাজে?" জিগি খুব অবাক হল। তার কাছে কেউ কখনো বিশেষ কাজে আসে না। সে ভুরু কুঁচকে বলল, "কী কাজ?"

আমি পকেট থেকে একটা ছোট ক্রিস্টাল বের করে জিগির হাতে দিয়ে বললাম, "এটা দেখ।"

জিগি ক্রিস্টালটি তার ঘরের অসংখ্য যন্ত্রপাতির কোনো একটিতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কোথায় কোথায় সুইচ টিপে দিতেই ঘরের মাঝামাঝি একটা হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে আমাকে দেখতে পেলাম। এলোমেলো চুল, দিশেহারা শূন্য দৃষ্টি, কাতর কণ্ঠস্বর। গভীর হতাশায় ডুবে গিয়ে সে বলল, "ত্রাতুল, আমি ত্রাতুল।"

জিগি খুব কৌতূহল নিয়ে পরপর তিনবার ভিডিও ক্লিপটি দেখল। সুইচ টিপে ভিডি মডিউল বন্ধ করে সে আমার দিকে তাকাল, তার চোখ অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো জ্বলজ্বল করছে। খানিকক্ষণ সে কোনো কথা বলল না, হঠাৎ করে সে উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে এসে আমার চুল খামচে ধরে ঘুরিয়ে মাথার পেছনে তাকাল, তারপর শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে বলল, "এন্ড্রোমিডার দোহাই! তোমার মাথায় ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস লাগিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার মস্তিষ্ক ম্যাপিং করে নিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে তোমার আরেকটা অস্তিত্ব তৈরি করে পরাবাস্তব জগতে আটকে রেখেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কত বড় সাহস!" জিগি টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "জানোয়ারের বাচ্চাদের মিউটেশান হোক। ক্রুচ ভাইরাস রক্তনালিকে ছিন্ন করে দিক। গামা রেডিয়েশনে হিমোগ্লোবিন ফেটে যাক!"

আমি জোর করে হাসার চেষ্টা করলাম। জিগি মুখ পাথরের মতো শক্ত করে বলল, "রিয়া নামে আরেকজনকে ম্যাপিং করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা কে?"

"আমি জানি না।"

"নামটা আমার কাছে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে—আগে কোথাও শুনেছি।"

"এটি একটি সাধারণ নাম, না শোনার কোনো কারণ নেই।"

"না–না তা নয়।" জিগি মাথা নাড়ল, বলল, "এই নামের একজন বিশেষ মানুষ আছে।" জিগি ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল, তারপর তার অসংখ্য যন্ত্রপাতির মাঝে কোনো একটিতে মাথা ঢুকিয়ে কিছু তথ্য প্রবেশ করিয়ে ফিরে এসে বলল, "পৃথিবীতে রিয়া নামে দুই লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাত শ বিয়াল্লিশটি মেয়ে আছে। তার মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত মেয়েটিকে আদর করে ডাকা হয় রাজকুমারী রিয়া।"

"রাজকুমারী রিয়া?"

"হ্যাঁ। তার বয়স বাইশ। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে তার মায়ের সঙ্গে থাকে।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "কেন সে বিখ্যাত? কেন তাকে রাজকুমারী রিয়া ডাকা হয়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কারণ রিয়া হচ্ছে পৃথিবীর নিখুঁততম মানবী। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে তার শরীরের প্রত্যেকটা জিন আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে।"

"ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুমি ভাবছ এই রিয়াকেই আটকে রেখেছে!"

জিগি মাথা নাড়ল, বলল, "সম্ভবত।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। আমি কী বলেছি লক্ষ করেছ? আমি বলেছি, আমাদের খুব বিপদ, আমার আর রিয়ার। আমি বলি নি আমার আর রিয়া নামের একটি মেয়ের খুব বিপদ—আমি ধরেই নিয়েছি রিয়াকে সবাই চেনে।"

"হ্যাঁ।"

"এভাবে বলার একটা অর্থ আছে। এর মাঝে একটা বড় তথ্য লুকিয়ে আছে।"

জিগি ঘরে কয়েকবার পায়চারি করে এক বোতল উত্তেজক পানীয় ঢকঢক করে খানিকটা খেয়ে বলল, "এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। কিছুতেই না।"

আমি বললাম, "আমি সেজন্যে তোমার কাছে এসেছি। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।"

জিগি মাথা নাড়ল, "তা ঠিক। নেটওয়ার্কে ঢোকা যার-তার কাজ নয়।"

জিগির চোয়াল শক্ত হয়ে যায়, মুখের মাংসপেশি টানটান হয়ে থাকে, চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করে—অনেক দিন পর সে তার মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে। তখন তখনই সে মাথায় হেলমেটের মতো একটা নিউরাল ইন্টারফেস পরে কাজে লেগে যায়।

জিগি ঘণ্টাখানেক নেটওয়ার্কের সাথে ধস্তাধস্তি করল তারপর কেমন যেন বিধ্বস্তভাবে মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে ঘরের এক কোনায় ছুড়ে দিয়ে কয়েকবার মেঝেতে পা দিয়ে লাথি দিল। আমি বললাম, "কী হয়েছে?"

"পারছি না। নেটওয়ার্কের যোগাযোগটা পাচ্ছি না।"

"পাচ্ছ না?"

"না। আমার মনে হয় মূল কেন্দ্রে আলাদা করে রেখেছে। এখান থেকে ভেতরে ঢোকা যাবে না।"

"তা হলে?"

জিগির মুখে ক্রুদ্ধ অস্থির এক ধরনের ভাব ফুটে ওঠে—ঢকঢক করে আবার কয়েক ঢোক উত্তেজক পানীয় খেয়ে মাথা নেড়ে বলল, "নিশ্চয়ই কোনো উপায় আছে।"

আমি বললাম, "যে বাসাটিতে আমার মস্তিষ্ক ম্যাপিং করছে সেখানে গেলে—"

জিগি কাছাকাছি একটা টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছ! সেই বাসাটি নিশ্চিতভাবে নেটওয়ার্কের সাথে জুড়ে দেওয়া আছে।"

"কিন্তু সেখানে ঢুকব কেমন করে? কত রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা!"

জিগি হাত নেড়ে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "সেটা দেখা যাবে। চল যাই।"

আমি বললাম, "রাজকুমারী রিয়ার সাথে যোগাযোগ করলে কেমন হয়?"

জিগি খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "পাবে না।"

"কী পাব না?"

"রিয়াকে।"

"চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?"

"ঠিক আছে চেষ্টা কর।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভিডি মডিউলে চেষ্টা করতে থাকি। প্রথম দুবার যোগাযোগ করা গেল না—তৃতীয়বার আমাকে অবাক করে দিয়ে ভিডি স্ক্রিনে অপরূপ রূপসী একটি মেয়ের ছবি ভেসে উঠল, মেয়েটি কৌতূহলী চোখে বলল, "কে? কে তুমি?"

আমি থতমত খেয়ে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "তুমি কি রাজকুমারী রিয়া?"

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "কেউ যখন খুব গম্ভীর হয়ে আমাকে রাজকুমারী রিয়া বলে ডাকে তখন আমার খুব হাসি পায়।"

"আমি—আমি—আসলে বুঝতে পারছি না তোমাকে কী বলে ডাকব।"

"ছেড়ে দাও ওসব। বলো তুমি কে?"

"তুমি আমাকে চিনবে না। আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সাথে কথা বলতে চাইছি!"

রিয়া মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "প্রয়োজনটা সত্যি না হলে কিন্তু ভালো হবে না আগেই সাবধান করে রাখছি। প্রতিদিন কতশত মানুষ আমার সাথে যোগাযোগ করে তুমি জান?"

"আমি অনুমান করতে পারি। তুমি নিশ্চিত থাক। প্রয়োজনটা খুব জরুরি।"

"বলো।"

"তোমার মাথার পেছনে কি একটা ধাতব টিউব লাগানো?"

রিয়া হতচকিত হয়ে বলল, "কী বললে? কী বললে তুমি?"

"তোমার মাথায় কি গত এক-দুইদিনের মাঝে কোনো ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস লাগানো হয়েছে?"

রিয়া নিজের মাথার পেছনে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলল, "হ্যাঁ। লাগিয়েছে। তুমি কেমন করে জান? এটি কারো জানার কথা না।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "আমারও লাগিয়েছে। আমার মস্তিষ্ক ম্যাপিং করে আমার একটি অস্তিত্ব তৈরি করা হয়েছে। সেই অস্তিত্ব আমার সাথে যোগাযোগ করেছে। করে বলেছে সে খুব কষ্টে আছে। তার সাথে কে আছে জান?"

"কে?"

"তুমি।"

রিয়া এক ধরনের হতচকিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু তারা যে বলল আমার অস্তিত্বটি সুপ্ত থাকবে, কখনো জাগাবে না—শুধু নিরাপত্তার জন্যে তৈরি করেছে।"

"মিথ্যা কথা বলেছে।" আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, "তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ। তোমার ভেতরে সম্ভবত কোনো খারাপ প্রবৃত্তি নেই—তুমি মনে হয় খারাপ কিছু দেখতে শেখ নি। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি—পৃথিবীতে অনেক খারাপ মানুষ আছে। তারা তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলছে।"

রিয়া অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল—তার মুখ দেখে মনে হল, সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে, কেউ তার সাথে মিথ্যা কথা বলতে পারে। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "কেন?"

"আমি জানি না।"

"তুমি—তুমি—তুমি কি নিশ্চিত?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত।"

"তুমি কে? তোমার পরিচয় তো আমি জানি না—"

"আমার নাম ত্রাতুল। আমার কোনো ট্রাকিওশান নেই তাই আমার আর কোনো পরিচয় নেই।"

রিয়া আরো কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করে জিগি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ভিডি মডিউলটি বন্ধ করে চিৎকার করে বলল, "সাবধান ত্রাতুল।"

"কী হয়েছে?"

"ধরতে আসছে।"

"ধরতে আসছে? কাকে?"

"তোমাকে আর আমাকে।"

"কে ধরতে আসছে?"

জিগি শুষ্ক মুখে বলল, "নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ স্কোয়াড। ঐ দেখ—"

আমি ঘরের এক কোনায় স্ক্রিনে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে বড় বড় বাইভার্বাল থামছে আর সেখান থেকে পিলপিল করে কালো পোশাক পরা নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ স্কোয়াড নেমে আসছে। মানুষগুলোর পোশাক কালো, চোখে কালো চশমা এবং কোমরে বীভৎস স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঝুলছে। যন্ত্রের মতো তারা সারিবদ্ধভাবে ছুটে আসছে। আমি জিগির দিকে তাকালাম, "এরা কেন আসছে?"

"আমাদের ধরতে।"

"কেন?"

"একটু আগে নেটওয়ার্কে ঢোকার চেষ্টা করলাম মনে নেই?"

"কিন্তু তুমি বলেছিলে কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না। তোমার ট্রাকিওশান তুমি পাল্টে ফেলেছ। তুমি—"

জিগি মুখ খিঁচিয়ে বলল, "এখন থামো—আগে পালাই"।

"কেমন করে পালাবে? সব ঘেরাও করে ফেলেছে না?"

আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম কয়েকটা কালো বাইভার্বাল এই দুই হাজার তলা বিল্ডিংটিকে ঘিরে উড়ছে। ভালো করে লক্ষ করলে ভেতরে বসে থাকা মানুষগুলোকেও দেখা যায়। জিগি আমার কথার উত্তর না দিয়ে ছোট একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে তার যন্ত্রপাতির মাঝে ছোটাছুটি করে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে বলল, "চলো।"

আমি দরজার দিকে এগুতেই জিগি ধমক দিয়ে বলল, "ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?"

"বাইরে যাবে না?"

"দরজা দিয়ে? তুমি কি ভেবেছ সিঁড়ি, লিফট আর বের হবার পোর্ট তোমার জন্যে রেডি করে রেখেছে? সব জায়গায় বিশেষ স্কোয়াড এখন কিলবিল করছে।"

"তা হলে?"

"এই যে, এদিক দিয়ে।"

আমি জিগির পেছনে পেছনে গেলাম, তার বিছানাটা টেনে তুলতেই নিচে একটা ছোট চৌকোনা দরজা বের হল। সেটা খুলতেই একটা গোলাকার ডাক্ট দেখা গেল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এদিক দিয়ে?"

"হ্যাঁ। ডানদিকে দশ মিটার মতো গেলে মূল তথ্য সরবরাহের লাইনটা পাবে, ঝুলে নেমে যেতে হবে। তোমার উচ্চতাভীতি নেই তো?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি শুষ্ক গলায় বললাম, "আছে কি না কখনো পরীক্ষা করে দেখি নি।"

"বেশ! আজকে পরীক্ষা হয়ে যাবে। নামো।"

"তুমি?"

"আমি হলোগ্রাফিক ভিডিওটা চালিয়ে দিয়ে আসি।"

জিগি ভেতরে গিয়ে কিছু যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে কয়েকটা সুইচ টিপে দিতেই ঘরের ভেতরে একটা হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি ভেসে এল—সেখানে দেখা যাচ্ছে ভয়ংকর কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে জিগি দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরপর দরজার দিকে তাক করে গুলি করে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। জিগি নিজের হলোগ্রাফিক ছবিটার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আমার কাছে ফিরে এসে বলল, "নিরাপত্তার লোকজন যখন দেখবে আমাকে পাওয়া গেছে খানিকটা নিশ্চিন্ত হবে। এত সব অস্ত্র দেখে সহজে ঢুকবে না—ততক্ষণে আমরা হাওয়া হয়ে যাব।"

ছোট খোপটার ভেতরে ঢুকে জিগি উপরের অংশটুকু ঢেকে দিল, এই দিক দিয়ে যে বের হয়ে এসেছি সেটা আর কেউ বুঝতে পারবে না।

জিগির পিছু পিছু আমি সরু একটা টানেলের মতো জায়গা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে থাকি। খানিক দূর যাওয়ার পর একটা বড় শ্যাফট পাওয়া গেল। নানা আকারের অসংখ্য তার বহু নিচে নেমে গেছে। জিগি মোটা একটা তার ধরে ঝুলে ঝুলে নিচে নামতে নামতে বলল, "সাবধান ত্রাতুল। লাল রঙের তারগুলো ধরো না—ভেতরে ইনফ্রারেড আলো যাচ্ছে, কয়েক মেগাওয়াট—কোনোমতে ভেঙে গেলে মুহূর্তের মাঝে ভাজা কাবাব হয়ে যাবে।"

আমি লাল রঙের তারগুলো স্পর্শ না করে সাবধানে কালো রঙের মোটা একটা তার ধরে ঝুলতে ঝুলতে নিচে নামতে শুরু করলাম—হাত ফসকে গেলে প্রায় দুই কিলোমিটার নিচে পড়ে থেঁতলে যাব, পৃথিবীর কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না! মাথা থেকে জোর করে সেই চিন্তা দূর করে দিলাম—যা হয় হবে, কোনো কিছুতেই আর পারোয়া করি না—এই ধরনের একটা ভাব নিজের ভেতরে নিয়ে এসে সরসর করে একটা সরীসৃপের মতো জিগির সাথে সাথে নিচে নামতে থাকি। জিগির মুখে দুশ্চিন্তার কোনো চিহ্ন নেই, তাকে দেখে মনে হয় এই ধরনের কাজ সে আগে অনেকবার করেছে এবং এই মুহূর্তে সে ব্যাপারটা খানিকটা উপভোগ করতে শুরু করেছে।

শ্যাফটের নিচে পৌঁছে জিগি দরজার দিকে এগিয়ে গেল, পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দরজার তালাটা খুলে প্রথমে এলার্ম সিস্টেমটা অচল করে দিল, তারপর দরজাটা একটু ফাঁক করে প্রথমে নিজের মাথাটা একটু বের করে বাইরে পুরোপুরি নিরাপদ নিশ্চিত হওয়ার পর সে সাবধানে বের হয়ে আমাকেও বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। আমি বের হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি আগেও এদিক দিয়ে বের হয়েছ!"

"অবিশ্যি। এসব ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নেওয়া যায় নাকি? শিখে রাখো আমার কাছ থেকে—কোনো জায়গায় থাকতে চাইলে প্রথমেই পালিয়ে যাবার রাস্তাটি ঠিক করে রাখবে।"

আমি কোনো কথা বললাম না। দুজনে রাস্তার পাশ দিয়ে সাবধানে হেঁটে যেতে থাকি। দ্বিতীয় এপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার পাশে আসার পর হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম, কিছুক্ষণ টানা গুলির শব্দ হল এবং অনেক উপর থেকে কিছু আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে

আসতে দেখা গেল। জিগি আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসে বলল, "বেকুবগুলো আমার হলোগ্রাফিক মূর্তিটাকে গুলি করছে। হা-হা-হা-।"

আমি পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে একটু শিউরে উঠি—এর মাঝে হাসার মতো কোনো বিষয় খুঁজে পাই না।

৭. নিরানন্দ দালান

জিগিকে নিয়ে আমি আমার এপার্টমেন্টে যেতে চাইলাম কিন্তু সে রাজি হল না। যে জায়গা থেকে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে রাখা নেই সেখানে জিগি যায় না। বাধ্য হয়ে আমাকে তার সাথে নতুন এক জায়গায় যেতে হল। জায়গাটি বেআইনি—এখানে কখনো নিরাপত্তাকর্মীরা আসে না। সে কারণে পুরো এলাকাটির মাঝে এক ধরনের থমথমে নিরানন্দ ভাব, এখানকার মানুষজন বেপরোয়া এবং নিষ্ঠুর। বেশিরভাগই মাদকাসক্ত না হয় ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর ব্যবহারকারী। আমরা আকাশপথের কাছাকাছি একটা ছোট ঘরে রাত কাটাবার আয়োজন করলাম। রাতের খাবার খেয়ে জিগি কোথায় কোথায় যেন যোগাযোগ করল, বিচিত্র রকমের মানুষেরা এসে তাকে কিছু যন্ত্রপাতিও দিয়ে গেল, সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে সে একটা নিউরাল কম্পিউটার দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে থাকে। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "তুমি নিউরাল কম্পিউটার তৈরি করছ?"

জটিল একটা যন্ত্রের মাঝখানে আঙুল দিয়ে কিছু অবলাল রশ্মি আটকে দিয়ে বলল, "হুম।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"এটা তো দেখছি ইন্টারফেস। মূল প্রসেসর আর মেমোরি কোথায়?"

জিগি দাঁত বের করে হেসে আমার মাথায় আঙুল দিয়ে দুইবার টোকা দিল। আমি অবাক হয়ে বললাম, "মস্তিষ্ক? মানুষের মস্তিষ্ক?"

জিগি মাথা নাড়ল, বলল, "নিখুঁতভাবে বলতে চাইলে বলা যেতে পারে তোমার মস্তিষ্ক! আমার বহুদিনের শখ ছিল একটা নিউরাল কম্পিউটারের, কিন্তু কে তার মস্তিষ্ক আমাকে ব্যবহার করতে দেবে? আর দিলেও আমি ইন্টারফেস করব কেমন করে? এখন একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম।"

আমি আতঙ্কিত হয়ে জিগির দিকে তাকালাম, "তুমি আমার মস্তিষ্ক ব্যবহার করবে?"

"তা না হলে কার? ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস আমি কেমন করে পাব?" অকাট্য যুক্তি কিন্তু শুনে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি। মাথা নেড়ে বললাম, "না-না। মস্তিষ্ক নিয়ে কোনো ছেলেখেলা না।"

জিগি মুখ শক্ত করে বলল, "ছেলেখেলা? তোমার ধারণা আমি ছেলেখেলা করি?"

"সত্যি কথা বলতে কী আমার তাই ধারণা। কিন্তু তাই বলে মনে করো না যে তোমার ওপরে আমার বিশ্বাস নেই।"

জিগি টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "তা হলে?"

"তা হলে কী?"

"তা হলে তোমার মস্তিষ্ক আমাকে ব্যবহার করতে দিচ্ছ না কেন? আমি কি নিজের জন্যে চাইছি? তোমার জন্যেই চাইছি!"

"আমার জন্যে?"

জিগি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। তোমার জন্যে। তোমার অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্যে যদি নেটওয়ার্কে ঢুকতে হয় তা হলে একটা নিউরাল কম্পিউটার দরকার। তোমার সেই নেটওয়ার্কিং কেন্দ্রে কি আমাদের এমনিতে ঢুকতে দেবে? দেবে না—দরজার গোপন পাসওয়ার্ড বের করতে হবে। একটা ভালো নিউরাল কম্পিউটার ছাড়া কি গোপন পাসওয়ার্ড বের করতে পারব? পারব না।"

আমি তবু অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। জিগি আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমার ওপর বিশ্বাস রাখ ত্রাতুল, আমি তোমার এক বিলিয়ন নিউরন শুধু ব্যবহার করব, একটা নিউরনেরও ক্ষতি করব না। এস—এই টেবিলটার ওপর শুয়ে পড়।"

আমি খুব অনিচ্ছার সাথে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়লাম। জিগি তার বিচিত্র জোড়াতালি দেওয়া যন্ত্রটি আমার মাথার কাছে নিয়ে এল। সেখান থেকে একটা মাল্টিকোর কো-এক্সিয়াল তার বের হয়ে এসেছে, তার এক পাশে একটা বিদঘুটে সকেট। সকেটটি সে চাপ দিয়ে আমার মাথার পেছনে ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেসে লাগিয়ে দিল। সাথে সাথে আমার পুরো শরীরে আমি একটি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব করি। মাথার ভেতরে হঠাৎ করে প্রচণ্ড যন্ত্রণা করে ওঠে—অনেকগুলো আলোর ঝলকানি, উচ্চ কম্পনের একটা শব্দ এবং ঝাঁজালো এক ধরনের গন্ধের সাথে সাথে মুখে তীব্র এক ধরনের বিস্বাদ অনুভব করতে লাগলাম। আমি ছটফট করে উঠলাম, জিগি শক্ত করে আমাকে টেবিলে চেপে ধরে বলল, "নড়বে না, খবরদার নড়বে না। এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।"

জিগির কথা সত্যি প্রমাণিত হল, সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের মাঝে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এল, শুধুমাত্র কোথায় যেন একটা ভোঁতা শব্দ শুনতে থাকলাম। জিগি আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "চমৎকার! নিউরাল কম্পিউটারের সাথে আমার প্রথম সফল যোগাযোগ। এখন তোমাকে দিয়ে আমি কিছু জটিল সমস্যার সমাধান করাব।"

"কী ধরনের সমস্যা?"

"বায়োমেটেরিয়ালে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশানে নন লিনিয়ার উপঘাত—"

"আমি এসব কিছুই জানি না।"

জিগি আনন্দে হা-হা করে হাসল, বলল, "এটাই তো মজা, তুমি এর কিছুই জান না কিন্তু তুমি এর সমাধান বলে দেবে। আমি সমস্যাটি সমান্তরাল করে দেব—তোমার মস্তিষ্কে যখন সেটি যাবে তুমি সমাধান করতে পার সেভাবে—"

"আমি বুঝতে পারছি না।"

"এক্ষুনি বুঝতে পারবে। হঠাৎ হঠাৎ করে তুমি এখন বিচিত্র জিনিস দেখবে, তোমার সেই বিচিত্র জিনিস থেকে কোনো কিছু করার ইচ্ছে করবে—তুমি সেটা করবে এবং আমি আমার সমাধান পেয়ে যাব।"

"যদি কিছু না করি?"

"করবে।" জিগি অর্থবহভাবে চোখ টিপে বলল, "করবে নিশ্চয়ই করবে!"

জিগির কথা শেষ হবার আগেই আমি চোখের সামনে দেখতে পেলাম ছোট ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকগুলো বৃত্তাকার বস্তু। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম, তবুও সেগুলো দেখা যেতে লাগল। সেগুলো ক্রমাগত বড় হচ্ছে, বড় হতে হতে সেগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন করে কিছু বৃত্ত তৈরি হচ্ছে যেগুলো আকার পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। আমার মনে হতে থাকে এই বৃত্তগুলোর একটার সাথে আরেকটার সমন্বয় করতে হবে—না করা পর্যন্ত আমি বুঝি শান্তি পাব না। আমার বিচিত্র এক ধরনের কষ্ট হতে থাকে। শারীরিক কোনো কষ্ট নয়, অন্য কোনো এক ধরনের কষ্ট। আমি প্রাণপণে সেই বিচিত্র বৃত্তাকার বস্তুগুলোকে আমার মাথার ভেতরে সাজাতে থাকি, হঠাৎ হঠাৎ সেগুলো সাজানো হয়ে যায় এবং আমি তখন নিজের ভেতরে এক আশ্চর্য প্রশান্তি অনুভব করি—কিন্তু সেটি মুহূর্তের জন্যে; আবার সেগুলো পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যায় এবং আমি বিচিত্র এক ধরনের কষ্ট অনুভব করতে থাকি। আমি প্রাণপণে নিজের সেই কষ্ট কমানোর চেষ্টা করে ভাসমান প্রতিচ্ছবির সাথে যুদ্ধ করতে থাকলাম।

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না—হঠাৎ করে সবকিছু মিলিয়ে গেল এবং আমি তখন নিজের ভেতরে আশ্চর্য এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করতে থাকলাম। আমি জিগির গলা শুনতে পেলাম, "চমৎকার ত্রাতুল! তোমার কাজ শেষ।"

আমি ওঠার চেষ্টা করতেই জিগি টেবিলে চেপে ধরে রেখে বলল, "এক সেকেন্ড দাঁড়াও, তোমার মাথা থেকে সকেটটা খুলে নিই।"

আমি কিছু বলার আগেই সে হ্যাঁচকা টান দিয়ে মাথার পেছন থেকে সকেটটা খুলে নেয়, মুহূর্তের জন্যে আমার শরীর ভয়ংকর রকম অনিয়ন্ত্রিতভাবে খিঁচুনি দিয়ে ওঠে। আমার মনে হল কানের কাছে একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটেছে, চোখের সামনে উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো আলো ঝলসে উঠল এবং মুখে তিক্ত এক ধরনের স্বাদ অনুভব করলাম। জিগি আমাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে আমার সামনে একটা মনিটর ধরে রাখল, বলল, "এই দেখ।"

আমি তখনো অল্পসল্প কাঁপছি, কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী দেখব?"

"তোমার সমাধান এবং আসল সমাধান। হুবহু মিলে গেছে।" জিগি আনন্দে হা-হা করে হেসে বলল, "আমি এখন একটি ব্যক্তিগত নিউরাল কম্পিউটারের মালিক।"

'না।" আমি মাথা নাড়লাম, "তুমি এখনো নিজেকে মালিক বলে দাবি করো না। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা আনন্দের না—তোমার নিউরাল হিসেব করতে হলে আমার যদি এরকম কষ্ট হয় তা হলে আমি তোমাকে কখনো আমার মাথায় সকেট বসাতে দেব না।"

জিগি হাত দিয়ে পুরো ব্যাপারটি উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "কষ্ট খুব আপেক্ষিক ব্যাপার। সন্তান জন্ম দিতে মায়েদের কী রকম কষ্ট হয় জান? সেজন্যে কখনো শুনেছ কোনো মা সন্তান জন্ম দেয় নি?"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণের মাঝে আনার চেষ্টা করে বললাম, "আমাকে এখন খানিকটা বিশ্রাম নিতে দাও—আমি সোজাসুজি চিন্তাও করতে পারছি না।"

জিগি মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ। তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার।"

আমি কোনোমতে বিছানায় এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম এবং প্রায় সাথে সাথেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি জিগি তার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে। আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে সে চতুষ্কোণ একটা যন্ত্র হাতে তুলে নিয়ে বলল, "এই যে তৈরি করে ফেলেছি।"

"কী তৈরি করেছ?"

"নেটওয়ার্ক কেন্দ্রের দরজা খোলার জন্যে পাসওয়ার্ড বের করার ইন্টারফেস।"

ব্যাপারটি কীভাবে কাজ করছে সেটা জানার সেই মুহূর্তে আমার কোনো কৌতূহল ছিল না কিন্তু জিগি সেটা লক্ষ করল না। গলায় বাড়তি উৎসাহ নিয়ে বলল, "আমি পিঠে ব্যাকপেকের মাঝে রাখব পাওয়ার সাপ্লাই আর ডিকোডার। সেখান থেকে একটা কেবল যাবে দরজায়—তুমি থাকবে আমার পাশে—তোমার মাথা থেকে সকেট হয়ে আসবে ডিকোডারে—"

"আমার মাথা থেকে?"

"হ্যাঁ। তোমার মাথাকে নিউরাল কম্পিউটার হিসেবে ব্যবহার না করলে পাসওয়ার্ড বের করব কেমন করে?"

আমি কোনো কথা না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। সম্পূর্ণ গোপন একটা পাসওয়ার্ড কয়েক মিনিটের মাঝে খুঁজে বের করতে হলে মানুষের মস্তিষ্কের মতো কিছু একটা প্রয়োজন, সেটাই অস্বীকার করি কী করে?

আমরা আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে সকালবেলাতেই রওনা দিয়ে দিলাম। একটা বাইভার্বালে করে যেতে পারলে ভালো হত, কিন্তু জিগি বলল পাতাল ট্রেনে করে গেলে মানুষের ভিড়ে সহজে লুকিয়ে থাকা যাবে। আমরা আমাদের ব্যাগ নিয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই মানুষের ভিড়ে মিশে গেলাম। সুপারকন্ডাক্টিং[১৮] রেলের ওপর দিয়ে পাতাল ট্রেনটা কয়েক ঘণ্টার মাঝেই আমাদের নির্দিষ্ট শহরটিতে নিয়ে আসে। এলাকাটিতে এক ধরনের নিরানন্দ ভাব, আমি তার মাঝে খুঁজে খুঁজে পুরাতন দালানটি বের করে ফেললাম। বাইরে অপ্রশস্ত গেট, গেটের উপর জটিল একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা—ঠিক পাসওয়ার্ডটি প্রবেশ করিয়ে গেট খুলে ঢুকে যেতে হবে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে এই দালানটিতে কোনো মানুষজন নেই, একটা পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়ির মতো চেহারা। কে জানে হয়তো আসলেই এখানে এমনিতে মানুষজন থাকে না, প্রয়োজনে কেউ কেউ আসে।

আমি আর জিগি খানিকটা উদাসভাবে এলাকাটা একটু সতর্কভাবে ঘুরে এলাম। তারপর পুরাতন দালানটির সামনে এসে দাঁড়ালাম। ব্যাগ থেকে দুটি পানীয়ের বোতল বের করে হাতে নিয়েছি—আশপাশে মানুষজন খুব বেশি নেই। যদি হঠাৎ করে কেউ চলেও আসে দেখলে ভাববে দুই বন্ধু দেওয়ালে হেলান দিয়ে অলস মধ্যাহ্নে গল্পগুজব করছে। পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে জিগি পেছনে দরজার নিরাপত্তা ব্যবস্থাটুকুতে চতুষ্কোণ যন্ত্রটি লাগিয়ে ফেলল। তারপর অন্যমনস্ক একটা ভঙ্গি করে ব্যাকপেক থেকে সকেটটা বের করে আমাকে চাপা গলায় বলল, "কাছে এস।"

আমি চাপা অস্বস্তি এবং এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে জিগির কাছে এগিয়ে গেলাম। জিগি চোরাচোখে দুই পাশে তাকিয়ে হঠাৎ চোখের পলকে আমার মাথার পেছনে ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেসে সকেটটা লাগিয়ে দিল। আমার সারা শরীরে আবার তীব্র একটা ঝাঁকুনি হয়, চোখের সামনে নানা রঙ খেলা করতে থাকে এবং কানে তীক্ষ্ণ এক ধরনের শব্দ শুনতে পাই। জিগি আমার হাত ধরে রেখে বলে, "সাবধান, দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, পড়ে যেও না।"

আমি কোনোভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং হঠাৎ করে মনে হল চোখের সামনে গোলাকার বৃত্ত আসতে শুরু করেছে। আমার ভয়ংকর এক ধরনের অস্বস্তি হতে থাকে—কী করব বুঝতে পারি না এবং সেই বিচিত্র বৃত্তগুলোকে একটার ওপর আরেকটার বসানোর চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে থাকি। সত্যি সত্যি সেগুলো সমন্বিত হতেই নিজের ভেতরে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব হয়—কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যেই, আবার চোখের সামনে বিচিত্র কিছু ছবি ভেসে ওঠে এবং আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেগুলোর সমন্বয় করার চেষ্টা করতে থাকি। আমি শুনতে পেলাম আমার কানের কাছে জিগি ফিসফিস করে বলছে, "চমৎকার ত্রাতুল, চমৎকার! চালিয়ে যাও—"

কতক্ষণ এভাবে চালিয়ে গিয়েছিলাম আমি বলতে পারব না—আমার মনে হল এক যুগ বা আরো বেশি এবং তখন হঠাৎ করে একসময় জিগি মাথার পেছন থেকে টান দিয়ে সকেটটা খুলে নিল। আমার মনে হল মুহূর্তের জন্যে আমার মাথার ভেতরে বুঝি একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। আমি কোনোমতে পেছনের গেটটা দুই হাতে ধরে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। শুনতে পেলাম জিগি ফিসফিস করে বলছে, "চমৎকার ত্রাতুল, দরজা খুলে গেছে!"

আমি কোনোমতে চোখ খুলে বললাম, "খুলে গেছে?"

"হ্যাঁ। এখন কিছুই হয় নি এরকম একটা ভাব করে ভেতরে ঢুকো।"

"ঢুকব?"

"হ্যাঁ। এস।"

জিগি আমার হাত ধরে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে গেটটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। আমি টলতে টলতে কোনোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, জিগি চারদিকে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে আসলেই এখানে কেউ নেই। কিন্তু কোনো রকম ঝুঁকি নেব না। এমনভাবে ভেতরে ঢুকব যেন আমরা এখানেই থাকি।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "ঠিক আছে।"

"কেউ যদি আমাদের লক্ষ করছে সে যেন কোনো সন্দেহ না করে।"

"ঠিক আছে।"

"যদি কিছু জিজ্ঞেস করে আমরা বলব যে ট্রাইকিনিওয়াল যোগাযোগ পরীক্ষা করার জন্যে এসেছি।"

"ঠিক আছে।"

"ভান করব যে তুমি হচ্ছ আমাদের পরীক্ষার বিষয়। তোমাকে দিয়ে আমরা সিস্টেম পরীক্ষা করি।"

"ঠিক আছে।"

জিগি বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হয়েছে তোমার? যেটাই জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দেও ঠিক আছে? কথা বলতে কি তোমার ইউনিট খরচ হয়?"

আমি কষ্ট করে চোখ খোলা রেখে বললাম, "ইউনিট খরচ হলে সহজ হত। তোমার মস্তিষ্কের নিউরনে কখনো কেউ স্টিমুলেশন দেয় নি বলে তুমি জান না।"

"ও!" জিগি হঠাৎ করে খানিকটা ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমি বুঝতে পারি নি ব্যাপারটি এত কষ্টের। তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?"

"খানিকটা। একটু সময় দাও, ঠিক হয়ে যাবে।"

জিগি আর কথা বলল না, আমরা পাশাপাশি হেঁটে বড় পুরাতন দালানটির ভেতরে ঢুকলাম। বাইরের গেটের পাসওয়ার্ড জানার কারণে খুব সহজেই দালানের দরজা খুলে ফেলা গেল। ভেতরে পা দিতেই অনেকগুলো বাতি জ্বলে উঠল এবং পরিশোধিত বাতাস সঞ্চালনের জন্যে কিছু পাম্প চালু হয়ে গেল—আমরা তার চাপা গুঞ্জন শুনতে পেলাম। জিগি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "চমৎকার! তার মানে এখানে কেউ নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এতক্ষণে মোটামুটি নিজের পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি। করিডরটার দিকে তাকিয়ে বললাম, "এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চলো কোনো একটা ঘরে ঢুকে যাই।"

"হ্যাঁ।" জিগি উৎফুল্ল গলায় বলল, "মূল পাসওয়ার্ড জেনে গেছি, এখন আর কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না।"

মাত্র দুদিন আগেই আমি এখানে ছিলাম, তাই করিডর ঘর দরজা খানিকটা পরিচিত মনে হচ্ছে। জিগিকে নিয়ে আমি নির্দিষ্ট ঘরটিতে উপস্থিত হলাম, ভেতরে কমিউনিকেশানের যন্ত্রপাতি, মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা, নেটওয়ার্ক এবং নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ সাজানো। ঘরটিতে ঢুকে জিব দিয়ে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে জিগি এক ধরনের আনন্দধ্বনি করে বলল, "এন্ড্রোমিডার কসম! এই রকম একটা জায়গা যদি আমার থাকত।"

আমি অস্ত্রোপচার করার বিছানাটিতে পা ঝুলিয়ে বসে বললাম, "এই তো পেয়ে গেলে! কী করবে কর।"

"কিন্তু পাকাপাকিভাবে তো পাই নি। অল্পক্ষণের জন্যে পেয়েছি। যাই হোক—" জিগি ঘাড় থেকে ব্যাগ নামিয়ে সাথে সাথে কাজে লেগে গেল। আমি যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি তার মতো এত ভালো করে জানি না বলে আপাতত বিছানায় বসে বসে তার কাজ দেখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মাঝেই বোঝা গেল এটি নেটওয়ার্কের একটা বড় নোড। মানুষের নতুন অস্তিত্ব সৃষ্টি করে এখান থেকেই সেটা এই নেটওয়ার্কে প্রবেশ করানো হয়। এখান থেকে নানা ধরনের ফাইবারের অসংখ্য ক্যাবল ভূগর্ভে চলে গেছে। মূল তথ্যকেন্দ্রগুলো কোথায় কে জানে কিন্তু সবগুলোয়ই এখান থেকে যোগাযোগ করা সম্ভব। জিগি মাথায় একটা হেলমেট পরে উবু হয়ে বসে কাজ শুরু করে দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে উত্তেজিত গলায় জিগি বলল, "পেয়েছি।"

"কী পেয়েছ?"

"মূল তথ্যকেন্দ্র।"

"সত্যি?" আমি কাছে এগিয়ে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়?"

"এই দেখ" বলে জিগি তার মনিটরে কিছু পরিবর্তনশীল সংখ্যা দেখাতে থাকে। টেবিলে হাত দিয়ে থাবা দিয়ে বলে, "এখন শুধু ভেতরে ঢুকে যাওয়া। ঢুকে গিয়ে ইচ্ছে করলেই সব তথ্য পাল্টে দিতে পারি!"

"হ্যাঁ। কিন্তু—" আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "আমাদের অস্তিত্বগুলো কি পেয়েছ? কোথায় আছে? কেমন আছে?"

"আছে, আছে এখানেই আছে।" জিগি সংখ্যাগুলো দেখিয়ে বলল, "এর মাঝে কোনো একটা তোমাদের অস্তিত্ব। আমি ইচ্ছে করলেই এখন সব শেষ করিয়ে দিতে পারি, ধ্বংস করে দিতে পারি, উড়িয়ে দিতে পারি!" জিগি আনন্দে হা-হা করে হেসে বলল, "আমি এখন একটা ছোটখাটো ঈশ্বরের মতো।"

"থামো।" আমি জিগিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে বললাম, "ঈশ্বর শুধু ধ্বংস করতে পারে না, তৈরিও করতে পারে। তুমি তো শুধু শেষ করে দেওয়ার কথা বলছ। আমরা তো শেষ করতে চাইছি না—যোগাযোগ করতে চাইছি। আমার অস্তিত্ব কিংবা রিয়ার অস্তিত্বের সাথে কথা বলতে চাইছি! তারা কেমন আছে কোথায় আছে জানতে চাইছি।"

"হ্যাঁ।" জিগি মাথা নাড়ল, মনিটরের সংখ্যাগুলো আরো কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে বলল, "সবচেয়ে ভালো হয় তুমি যদি এখানে ঢুকে যাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঢুকে যাব?"

"হ্যাঁ। এই যে দেখ—এখানে ছয়টা পরাবাস্তব জগৎ রয়েছে, এর মাঝে কোনো একটা তোমার। অন্যগুলো—"

"অন্যগুলো কী?"

জিগি মাথা চুলকে বলল, "বুঝতে পারছি না। নিজে না দেখে বলা মুশকিল। তুমি ঢুকে দেখে আস। তোমার মাথায় ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস আছে—তোমার জন্যে একেবারে পানির মতো সোজা।"

আমি জিগির দিকে কাতর চোখে তাকালাম, ভেতরে কী আছে কে জানে কিন্তু আমি সেখানে ঢোকার মতো সাহস পাচ্ছি না। জিগি বলল, "কী হল, ঢুকবে না?"

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, বললাম, "ঠিক আছে। ঢুকে দেখে আসি।"

জিগি চকচকে চোখে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই। এখানে অনেক যন্ত্রপাতি আছে, আমি তোমাকে খুব ভালোভাবে দেখেশুনে রাখব। বাইরের কিছু তোমার মাথায় ঢুকতে দেব না। যদি দেখি তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে—"

আমি চমকে উঠে জিগির দিকে তাকালাম, বললাম, "সমস্যা কী হতে পারে? কিছু একটা কি মাথায় ঢুকে যেতে পারে?"

"সেটা তো পারেই। ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস হচ্ছে দ্বিমুখী। তোমার মস্তিষ্ক থেকে যেতে পারে আসতেও পারে। আমি লক্ষ রাখব কিছু যেন না আসে। তুমি ভয় পেয়ো না।"

আমি তবুও ভয় পেলাম, কিন্তু পেলেও আর কিছু করার নেই। অস্ত্রোপচারের উঁচু টেবিলটাতে লম্বা হয়ে শুয়ে বললাম, "নাও, কী করবে কর।"

আমি আমার সমস্ত স্নায়ু শক্ত করে ভয়ংকর কিছু ঘটে যাবার জন্যে নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকি।

AMARBOI.COM

৮. পরাবাস্তব জগৎ

আমি চোখ বন্ধ করে মনে মনে নিজেকে বললাম এটি একটি পরাবাস্তব জগৎ, এটি আসলে কিছু বিচিত্র তথ্যের কৌশলী উপস্থাপনা, এখানে যা আছে তার কোনোটিই সত্যি নয় তাই আমি এর কিছুই দেখে অবাক হব না। তারপরও আমি চোখ খুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমার চারপাশে একটি বিচিত্র কুয়াশা ঢাকা আবছা জগৎ। কোথাও কোনো শব্দ নেই, মনে হয় নিজের নিশ্বাসের শব্দ আর হৃৎস্পন্দনও শুনতে পাব। জিগি বলেছিল এখানে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন পরাবাস্তব জগৎ রয়েছে কিন্তু এখানে একটি সুবিস্তৃত প্রান্তর ছাড়া আর কিছু নেই।

আমি খুব সাবধানে হাঁটতে থাকি, তখন মনে হল অনেক দূরে কোথাও একটি ঘণ্টা বাজছে, শোনা যায় না এরকম একটি শব্দ। ঘণ্টাটি খুব গুরুগম্ভীর, মনে হয় কোনো একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন মন্দিরের উপাসনার ঘণ্টা। আমি হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগুতে থাকি, ঠিক তখন দূরে কিছু জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয় একটি অতি প্রাচীন উপাসনালয়, আরো কাছে যাবার পর দেখলাম সেখানে মিটমিট করে বাতি জ্বলছে। আমি আরো কাছে এগিয়ে এলাম এবং তখন এই উপাসনালয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠল। অত্যন্ত বিচিত্র কারুকাজ করা দেওয়াল, পুরো স্থাপত্যটি একেবারেই অচেনা। আমি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, ভেতরে ঢোকার কোনো দরজা নেই। আমি একটু কাছে এসে দেওয়ালটা স্পর্শ করতেই সেটা পেছনে সরে গেল, ভালো করে তাকিয়ে দেখি ভেতরে ঢোকার মতো ছোট একটা জায়গা উন্মুক্ত হয়েছে। আমি সাবধানে ভেতরে ঢুকেছি তখন হঠাৎ করে মনে হল সরসর শব্দ করে কিছু একটা পেছনে সরে যাচ্ছে। ভেতরে বিশাল একটি কক্ষ, তার কারুকাজ করা দেওয়াল। আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম এবং আমার মনে হল কারুকাজ করা দেওয়ালটি আস্তে আস্তে নড়ছে। আমার হঠাৎ করে মনে হল আমি জীবন্ত কোনো প্রাণীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার স্পষ্ট মনে হল আমি একটা প্রাণীর নিশ্বাস নেবার শব্দও শুনছি। নিশ্বাসের সাথে সাথে তার হৃৎস্পন্দন, দেহের সংকোচন, শরীরের কম্পনের শব্দ শোনা যেতে থাকে। জীবন্ত প্রাণীর এক ধরনের জৈবিক ঘ্রাণ আমার নাকে আসে, মনে হয় অশরীরী কোনো প্রাণী আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে।

আমি চোখ বন্ধ করে নিজেকে বললাম, এটি একটি পরাবাস্তব জগৎ, এটি সত্যি নয়। জিগি আমার শরীরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ংকর কিছু ঘটলেই সে আমার ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস টেনে খুলে দেবে, তখন আমি আবার সত্যিকারের জগতে ফিরে যাব। আমি চোখ বন্ধ করেই পায়ে পায়ে পিছিয়ে এসে দেওয়াল স্পর্শ করলাম। হাতের নিচে শীতল পিচ্ছিল জীবন্ত এক ধরনের অনুভূতি—আমি নিশ্বাস বন্ধ করে ধাক্কা দিতেই সেটি উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং আমি নিশ্বাস বন্ধ করে প্রায় ছুটে বের হয়ে এলাম। আমার অস্তিত্বকে কি এরকম কোনো একটি জায়গায় বন্দি করে রেখেছে? আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর কুলকুল করে ঘামতে থাকে।

AMARBOI.COM

আমি চোখ খুলে তাকালাম, নিজের অজান্তেই ছুটে অনেক দূরে চলে এসেছি। উপাসনালয়ের মতো দেখতে প্রাচীন স্থাপত্যটিকে আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, শুধু বহুদূর থেকে এক ধরনের অস্পষ্ট রহস্যময় ঘণ্টার আওয়াজটি শোনা যাচ্ছে। আমি বুকভরে একবার নিশ্বাস নিলাম, কোথায় যেতে হবে কী করতে হবে কিছু বুঝতে পারছি না। এই পরাবাস্তব জগৎটি সত্যিকার জগতের মতো—এর থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই।

ঠিক এরকম সময় বহু দূরে কোথাও একটি আলো জ্বলে আবার নিবে গেল। হয়তো এটি আমার জন্যে কোনো সংকেত, হয়তো আমার ওদিকে যাবার কথা। আমি বুকের মাঝে সাহস সঞ্চয় করে সেদিকে হাঁটতে থাকি।

আলোটি জ্বলে এবং নিবে আমাকে খানিকটা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল। হয়তো আলোটার দিকে সোজাসুজি যাচ্ছি—হঠাৎ করে দেখতে পেলাম আলোটা ডানদিকে সরে গিয়ে জ্বলে উঠেছে। ডানদিকে হাঁটছি, তখন আলোটা আবার বামদিকে সরে গিয়ে জ্বলে উঠল।

হেঁটে হেঁটে শেষ পর্যন্ত আমি আলোটা খুঁজে পেলাম। খুব আধুনিক ধরনের একটা ছোট বাসা, সেই বাসার ওপর একটি এন্টেনা এবং এন্টেনার ওপর একটি আলো—যেটি জ্বলছে এবং নিবছে, যে আলোটা দেখে আমি এখানে এসেছি। বাসাটির বাইরে একটি সাজানো লন, তার ভেতর দিয়ে নুড়ি বসানো রাস্তা চলে গেছে। আমি সাবধানে সেই রাস্তা ধরে হেঁটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেঁটে বাসাটির কাছে চলে এলাম। বাসার ভেতর আলো জ্বলছে, মনে হয় সেখানে কেউ আছে। আমি দরজা স্পর্শ করতেই ভেতরে কোথাও শব্দ হল। আমি একজনের পদশব্দ শুনতে পেলাম, কেউ একজন এসে দরজা খুলে দিল, আমার দিকে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "কে?"

আমি মানুষটিকে ভালো করে লক্ষ করলাম, এটি পরাবাস্তব জগতের পরাবাস্তব মানুষ, কিন্তু তার সাথে সত্যিকার মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। মানুষটি মধ্যবয়স্ক, মাথার চুল সোনালি এবং চোখ নীল। গায়ের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, মুখে বয়স এবং অভিজ্ঞতার চিহ্ন। মানুষটি আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?"

আমি বললাম, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমি কি ভেতরে আসতে পারি?"

মানুষটার মুখে বিচিত্র এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে। সে দরজা থেকে সরে গিয়ে বলল, "এস।"

আমি ভেতরে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, কী চমৎকার করে সাজানো ঘরটি, কোথাও এতটুকু বাহুল্য নেই, এতটুকু অসামঞ্জস্য নেই, শুধুমাত্র পরাবাস্তব জগতেই বুঝি এরকম চমৎকার একটি ঘর খুঁজে পাওয়া যায়—আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। সোনালি চুল, নীল চোখের মধ্যবয়স্ক মানুষটি এক ধরনের অবিশ্বাস নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে হতচকিত এক ধরনের বিস্ময় ধরে রেখে বলল, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? এখানে কারো আসার কথা নয়।"

"আমি জানি।"

"তা হলে তুমি কোথা থেকে এসেছ? কে তুমি?"

"আমার পরিচয় দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমার নাম ত্রাতুল—কিন্তু সেটাও প্রমাণ করতে পারব না। তার চাইতে বলো তুমি কে? তোমার নিশ্চয়ই একটা পরিচয় আছে, তুমি নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ।"

"হ্যাঁ। আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। আমি এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমার একটা অস্তিত্বকে আলাদা সরিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে বেঁচে থাকার আনন্দের সবরকম উপকরণ আছে—তার মাঝে বাইরের কারো আসার কথা নয়। তুমি কেমন করে চলে এসেছ?"

"সম্ভবত ভুল করে।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "কিন্তু এসে যখন পড়েছি তোমার কাছ থেকে কিছু তথ্য নিয়ে যাই।"

মানুষটার মুখে এক ধরনের উপহাসের হাসি ফুটে উঠল, বলল, 'কী তথ্য?"

"তুমি কে? তুমি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?"

মানুষটি মনে হল ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না যে তাকে এই প্রশ্নটি করা হয়েছে। সম্ভবত কেউ তাকে এভাবে প্রশ্ন করে না। সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি আবার বললাম, "কে তুমি?"

"আমার নাম খ্রাউস। আমি এই পরাবাস্তব জগতের সৃষ্টিকর্তা।"

আমি কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন তুমি এই পরাবাস্তব জগৎ সৃষ্টি করেছ?"

"আমি কাউকে এই প্রশ্নের জবাব দিই নি। কিন্তু তোমাকে দেব। কারণ তুমি সত্যিকারের মানুষ নও, তুমি পরাবাস্তব মানুষ। তোমাকে বললে কিছু আসে-যায় না।"

"কেন কিছু আসে-যায় না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রাউস হঠাৎ করে হেসে উঠল। হাসি অত্যন্ত বিচিত্র একটি প্রক্রিয়া, মানুষের ভেতরের রূপটি হাসির সাথে কেমন করে জানি প্রকাশিত হয়ে যায়। খ্রাউসের হাসি দেখে আমি তাই শিউরে উঠলাম। হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম মানুষটি অসম্ভব নিষ্ঠুর। আমার মনে হল মানুষ নয়, আমি বুঝি একটি দানবের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। খ্রাউস যেরকম হঠাৎ করে হেসে উঠেছিল সেরকম হঠাৎ করে থেমে গিয়ে বলল, "কারণ তুমি কিছু বোঝার আগেই তোমাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে! এই অস্তিত্বকে এবং তোমার সত্যিকার অস্তিত্বকে।"

আমার ভয় পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু কেন জানি ভয় না পেয়ে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম, বললাম, "কে আমাকে নিশ্চিহ্ন করবে? তুমি?"

"না যুবক, তুমি বুঝতে পারছ না। তুমি কেমন করে এখানে ঢুকেছ আমি এখনো জানি না, কিন্তু সেজন্য তোমাকে খুঁজে বের করে হত্যা করা হবে।"

"বেশ! তা হলে আমাকে হত্যা করে ফেলার আগেই আমি জেনে নেই—তুমি তা হলে বলো, কেন তুমি একটা পরাবাস্তব জগৎ তৈরি করেছ?"

"আমাদের গ্যালাক্সিতে প্রায় এক মিলিয়ন বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার কথা। এতদিন তাদের কারো সাথে আমাদের যোগাযোগ হয় নি—কারণ আমরা যোগাযোগ করার মতো স্তরে পৌঁছাই নি। পিঁপড়ার সাথে মানুষ যেরকম যোগাযোগ করতে পারে না, অনেকটা সেরকম। শেষ পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ হয়েছে, বছর দুয়েক আগে।"

"পিঁপড়া থেকে উন্নত হয়েছে? পিঁপড়ার পাখা উঠেছে?"

আমার টিটকারিটা উপেক্ষা করে খ্রাউস বলল, "সেই উন্নত প্রাণীর সাথে আমাদের এক ধরনের শুভেচ্ছা বিনিময়ও হয়েছে। তারা আমাদের পরাবাস্তব জগৎ তৈরি করার মতো প্রযুক্তি দিয়েছে, তার বদলে আমরা তাদেরকে—"

AMARBOI.COM

"পৃথিবীর মানুষ দিচ্ছ?"

খ্রাউস খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি ঠিকই অনুমান করেছ।"

"সেই মানুষটি হতে হবে পৃথিবীর নিখুঁততম মানুষ? সেজন্যে পৃথিবীর নিখুঁত মানবী তৈরি করছ?"

খ্রাউস আবার চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল, তারপর বলল, "তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তুমি যে এই পরাবাস্তব জগতে ঢুকে পড়েছ সেটা দেখে আমি এখন আর খুব অবাক হচ্ছি না।"

"এই পরাবাস্তব জগৎ সেই বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে যোগাযোগের ইন্টারফেস? প্রাচীন উপাসনালয়ের মতো দেখতে জায়গাটির ভেতর থেকে মহাকাশের প্রাণীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়?"

খ্রাউস এবারে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "তোমাকে আমি নতুন কিছুই বলতে পারলাম না। তুমি দেখছি সবই জান।"

"আমি শুধু একটি জিনিস জানি না।"

"কী জিনিস?"

"মানুষকে কোনো এক বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণীর হাতে তুলে দেওয়ার সাথে তাদেরকে পরাবাস্তব জগতে সৃষ্টি করার সম্পর্ক কী?"

"তুমি কখনো চিড়িয়াখানায় গিয়েছ?"

"হ্যাঁ গিয়েছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চিড়িয়াখানায় বন্যপশু নিয়ে আসার আগে বনে–জঙ্গলে সেই পশুদের জীবনযাত্রা দেখে আসতে হয়। এখানেও তাই। যেসব মানুষকে পাঠানো হবে তাদের জীবনযাত্রা দেখা হচ্ছে। তাদেরকে নিয়ে খানিকটা গবেষণা করা হচ্ছে। তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

আমি কিছুক্ষণ খ্রাউসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "খ্রাউস।"

"পৃথিবীতে আমাকে মহামান্য খ্রাউস ডাকা হয়।"

"এটা পৃথিবী না। তা ছাড়া আমি কখনো কাউকে মহামান্য ডাকি না।" আমি মুখের মাংসপেশি শক্ত করে বললাম, "খ্রাউস, তোমার কি কখনো মনে হয়েছে যে এই কাজটি পৃথিবীর মানুষের কাছে অন্যায় এবং অমানবিক বলে মনে হতে পারে?"

খ্রাউস আবার শব্দ করে হেসে উঠল, নিষ্ঠুর নীল দুটি চোখ দেখে আবার আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। খ্রাউস হাসতে হাসতে বলল, "পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কথা ভাবলে পৃথিবীতে কখনো সভ্যতা গড়ে উঠত না! মানুষ এখনো গুহায় বসে পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে বুনো শূকর পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেত। কিন্তু তা হয় নি। কেন হয় নি জান?"

"কেন?"

"কারণ পৃথিবীতে স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষের জন্ম হয়েছে। তারা সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করে, প্রয়োজনে ধ্বংস করে বড় বড় সভ্যতা গড়ে তুলেছে। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে যুদ্ধের ইতিহাস—একটি সভ্যতা ধ্বংস করে সব সময় আরেকটি সভ্যতা গড়ে উঠেছে। আমরা এখন ঠিক সেরকম একটা মুহূর্তের কাছাকাছি আছি। পৃথিবীর এই সভ্যতা ধ্বংস করে আমরা নতুন একটা সভ্যতা গড়ে তুলব।"

"ও!" আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "বুঝতে পেরেছি।"

"কী বুঝতে পেরেছ?"

"তুমি হচ্ছ ইতিহাসের সেই বিশ্বাসঘাতক। যে সব সময় নিজের জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।"

"তোমার এসব কথা হচ্ছে অসভ্য মানুষের অশালীন ভাষা। অশালীন ভাষা ব্যবহার করে তুমি আমাকে বিচলিত করতে পারবে না।"

"আমি জানি। কিন্তু তবু চেষ্টা করতে চাই।"

'নির্বোধ যুবক। তুমি জান তোমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে।"

"সম্ভবত।" আমি চোখ ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে তাকালাম। দেওয়ালে চমৎকার একটি শেলফ তৈরি করে তার ওপর কিছু প্রাচীন পুরাকীর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু মূর্তি, কিছু অলংকার। তৈজসপত্রের সাথে একটি লম্বা ধাতব দণ্ড—সম্ভবত কখনো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হত। আমি এগিয়ে সেটি হাতে তুলে নিলাম।

খ্রাউস প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করে বলল, "তুমি কী করছ?"

"আমার এটা কৌতূহল। অশালীন ভাষা ব্যবহার করে তোমাকে বিচলিত করা যায় না, কিন্তু এই ভোঁতা দণ্ডটি দিয়ে তোমাকে ঠিকমতো আঘাত করে বিচলিত করা যায় কি না দেখতে চাই!"

খ্রাউস অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, প্রথমে তার চোখে বিস্ময় এবং একটু পরে সেখানে এক ধরনের আতঙ্ক ফুটে ওঠে। আমি দুই হাতে ভোঁতা ধাতব দণ্ডটি শক্ত করে ধরে তার দিকে এগিয়ে গেলাম, খ্রাউস পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগেই আমি সমস্ত শরীরের জোর দিয়ে তাকে আঘাত করলাম। সে মাথা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার পরও দণ্ডটি তার মুখে এসে আঘাত করল। সাথে সাথে চোখের নিচে খানিকটা জায়গা ফেটে রক্ত বের হয়ে আসে।

খ্রাউস কাতর আর্তনাদ করে বলল, "কী করছ? কী করছ তুমি?"

আমি হিংস্র গলায় বললাম, "দেখছি। পরাবাস্তব জগতে কাউকে খুন করা যায় কি না দেখছি।"

আমি সত্যি সত্যি উন্মত্তের মতো আবার ধাতব দণ্ডটি তুলে তাকে আঘাত করার চেষ্টা করলাম, ঠিক তখন মনে হল আমার মাথার ভেতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটল। হঠাৎ করে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আমি জিগির ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—"কী হয়েছে ত্রাতুল? কী হয়েছে তোমার?"

আমি মাথা চেপে ধরে কোনোমতে উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "কিছু হয় নাই। একজনকে খুন করার চেষ্টা করছিলাম।"

"কাকে?"

আমি উত্তর দেবার আগেই খুট করে দরজা খুলে গেল। দেখলাম সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর অনেক মানুষ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

পেছন থেকে একজন মানুষ হেঁটে আসছে। মানুষটির সোনালি চুল এবং নীল চোখ। মানুষটি মধ্যবয়স্ক এবং সুদর্শন।

মানুষটি খ্রাউস এবং আমি কয়েক মুহূর্ত আগে তাকে পরাবাস্তব জগতে খুন করার চেষ্টা করেছি।

AMARBOI.COM

৯. খ্রাউস

নিরাপত্তা বাহিনীর কালো পোশাক পরা মানুষগুলো হেঁটে আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো আমাদের দিকে তাক করে ধরল। যে কোনো একটি অস্ত্র দিয়েই তারা আমাকে ভস্মীভূত করে দিতে পারে, তার পরও কেন এতগুলো অস্ত্র আমাদের দিকে তাক করে রেখেছে সেটি একটি রহস্য!

নিরাপত্তা বাহিনীর লোকগুলোর পেছন থেকে খ্রাউস হেঁটে হেঁটে সামনে এসে দাঁড়ায়, আমি দেখতে পেলাম তার পেছনে আরো কয়েকজন মানুষ। তিনজনকে আমি বেশ ভালো করে চিনি—অত্যন্ত হৃদয়হীন এই তিনজন মানুষ আমার মস্তিষ্ক ম্যাপিং করেছিল, তারা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যদের আমি চিনি না—ক্রানা নামের সেই ডাক্তার মেয়েটিকে খুঁজলাম কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না।

খ্রাউস খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে এবং জিগিকে খানিকক্ষণ লক্ষ করল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "যখন শুনতে পেলাম পরাবাস্তব নেটওয়ার্কে কেউ ঢুকে গেছে তখন তাদের নিজের চোখে দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিগি কোনো কথা বলল না, যে কোনো জায়গাতে পৌঁছেই সে প্রথমেই পালিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা করে রাখে। এখানে সেটা করতে পারে নি বলে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আছে। আমি খ্রাউসের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দেখে কি তোমার আশাভঙ্গ হয়েছে?"

"নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম দেখব খুব বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ, তার বদলে দেখছি একেবারে আজেবাজে অপদার্থ ফালতু মানুষ।"

"তোমার আশাভঙ্গের কারণ হবার জন্যে খুব দুঃখিত। তবে—" আমি ইচ্ছে করে বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেলাম।

খ্রাউস তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তবে?"

"তবে পরাবাস্তব জগতে তোমার অস্তিত্বটির কিন্তু আশাভঙ্গ হয় নি। সে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছে।"

আমার কথা শুনে খ্রাউস বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল, আমি দেখলাম তার সমস্ত মুখমণ্ডল মুহূর্তে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে যায়, অনেক কষ্ট করে সে নিজেকে সংবরণ করে এবং জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলে, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।" আমিও মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, "তোমার সাথে আমার পরিচয় হয় নি—কিন্তু পরাবাস্তব খ্রাউসের সাথে আমার চমৎকার একটা পরিচয় হয়েছে। অত্যন্ত চমৎকার।"

খ্রাউস অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলল, আমি দেখতে পেলাম তার চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলে উঠল। এই মানুষটি তার পরাবাস্তব অস্তিত্বের মতোই নিষ্ঠুর।

খ্রাউস মাথা ঘুরিয়ে পুরুষের মতো দেখতে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্লিশা তুমি নেটওয়ার্কটি দেখ—এর ভেতরের তথ্য বিকৃতি হয়েছে কি না জানা দরকার।"

আমি ক্লিশার দিকে তাকিয়ে বললাম, "শুভ অপরাহ্ন ক্লিশা! আমি তোমাকে বলেছিলাম আবার আমাদের দেখা হবে—তুমি তখন আমার কথা বিশ্বাস কর নি। দেখা হল কি না?"

ক্লিশা আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাল, কোনো কথা বলল না। তার সাথে সাথে লাল চুলের মানুষটি এবং সরীসৃপের মতো মানুষটি যন্ত্রপাতির দিকে এগিয়ে গেল। জিগি তাদের কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষগুলো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র উঁচু করে তাকে থামাতে চেষ্টা করে। জিগি খানিকটা অবহেলায় অস্ত্রগুলো সরিয়ে বলল, "শুধু শুধু বিরক্ত করো না—তোমরা খুব ভালো করে জান এই ঘরে তোমরা এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না—তোমাদের শখের নেটওয়ার্ক নোড তা হলে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাবে।"

কথাটি সত্যি এবং তাই নিরাপত্তা বাহিনীর খুব অপমান বোধ হল, তারা তখন অস্ত্রের বাঁট দিয়ে জিগির মাথায় আঘাত করে তাকে নিচে ফেলে দিল। খ্রাউস হাত তুলে বলল, "ওদের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত জানে মেরো না।"

নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা খ্রাউসের কথামতো তাকে জানে না মেরে শারীরিকভাবে অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় কয়েকবার আঘাত করল। আমি দেখতে পেলাম জিগির ঠোঁট কেটে রক্ত বের হয়ে এসেছে কিন্তু সেটি উপস্থিত কাউকেই এতটুকু বিচলিত করল না।

ক্লিশা এবং তার দুজন সঙ্গী তাদের যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মাঝেই তাদেরকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত দেখাতে থাকে। খ্রাউস ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"বুঝতে পারছি না।" ক্লিশা আমতা-আমতা করে বলল, "মনে হচ্ছে ভেতরে সব ওলটপালট হয়ে গেছে—সিকিউরিটির অংশটুকু ওভারলোড হয়েছে। ছয়টা স্তর আছে সেগুলো এমনভাবে জট পাকিয়েছে যে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যে?"

"আলাদা করাই মুশকিল।"

খ্রাউসের মুখ ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। সে হিংস্র দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে আরেকবার জিগির দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "কী করেছ তোমরা?"

জিগি হাতের উল্টোপৃষ্ঠা দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছে বলল, "সেটাই তোমাদের বলতে চাইছিলাম, তোমার নির্বোধ বোম্বেটে বাহিনী বলতে দেয় নি। আমাকে আচ্ছামতো পিটিয়েছে।"

"ঠিক আছে, এখন বলো।"

"এখন একটু দেরি হয়ে গেছে। আমার আর বলার ইচ্ছে করছে না।"

জিগি জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "পারলে তোমরা নিজেরা বের করে নাও।"

ক্লিশা তাড়াতাড়ি করে বলল, "মহামান্য খ্রাউস, আমরা এক্ষুনি বের করে ফেলছি। এই সব তুচ্ছ মানুষের কথায় কোনো গুরুত্ব দেবেন না।"

খ্রাউস একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুচ্ছ মানুষের কথায় যেটুকু গুরুত্ব দেবার কথা তার থেকে বেশি গুরুত্ব আমি দিই না। তবে যেটুকু না দিলেই নয় সেটুকু গুরুত্ব আমি দিই।"

খ্রাউসের কথায় কী ছিল আমি জানি না কিন্তু দেখতে পেলাম ক্লিশা আতঙ্কে কেমন যেন শিউরে উঠল।

খ্রাউস খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর কেমন যেন ক্লান্তভাবে একটা নিশ্বাস ফেলে নিরাপত্তা বাহিনীর একজন অফিসারকে বলল, "এই দুজনকে কোনো একটি জায়গায় আটকে রেখো—আমার এদের সাথে কথা বলতে হবে।"

নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসারটি মাথা নেড়ে সাথে সাথেই আমাদের দুজনকে দু পাশ থেকে ধরে নিয়ে যেতে থাকে।

AMARBOI.COM

আমাদের দুজনকে যে ঘরটিতে আটকে রাখল সেখানে আরো একজন মানুষকে আটকে রাখা হয়েছে। মানুষটির নিশ্চয়ই কোনো একটা বিশেষত্ব রয়েছে, কারণ তাকে একটা খাঁচার ভেতরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং তার হাত ও পা শিকল দিয়ে বাঁধা। মানুষটির মুখে এক ধরনের উদাস ভাব এবং আমাদের দুজনকে দেখে নিস্পৃহভাবে তাকাল। আমি এবং জিগি মানুষটির কাছে এগিয়ে গেলাম, কাছাকাছি যেতেই মানুষটি বলল—"বেশি কাছে এস না, খাঁচার দেওয়ালে হাই ভোল্টেজ দিয়ে রেখেছে। শক খাবে।"

আমরা থেমে গেলাম, খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"আমাকে ভয় পায়।"

"কেন?"

"কারণ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ।"

"সবচেয়ে খারাপ মানুষ?"

"হ্যাঁ।" মানুষটি মুখে এক ধরনের হাসি ফুটিয়ে আমার দিকে তাকাল, আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করি। সেখানে ভয়ংকর একটি অমানবিক দৃষ্টি দেখে বুকের ভেতরে এক ধরনের কাঁপুনি হতে থাকে। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "মানুষ সবচেয়ে খারাপ কেমন করে হয়?"

"হয় না। তৈরি করতে হয়। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে তৈরি করতে হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমাকে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে তৈরি করেছে?"

"হ্যাঁ।" মানুষটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসার মতো ভঙ্গি করল এবং সেটি দেখে আমি আবার শিউরে উঠলাম। মানুষটির সোনালি চুল এবং সবুজ চোখ, অত্যন্ত সুগঠিত দেহ, উঁচু চোয়াল এবং খাড়া নাক। মানুষটির চেহারায় একটি অত্যন্ত বিচিত্র পাশবিক ভাব রয়েছে, দেখে এক ধরনের আতঙ্ক হয়। মানুষটি একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, "অনেক গবেষণা করে আমাকে তৈরি করেছে। আমার মনে হয় মোটামুটি নিখুঁতভাবেই তৈরি করেছে।"

জিগি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কৌতূহল নিয়ে মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন একথা বলছ?"

"কারণ আছে বলেই বলছি। যেমন মনে কর—"

"কী?"

"তোমরা দুজন ঘরে আসতেই আমি প্রথমেই ভাবলাম কীভাবে তোমাদের খুন করা যায়।"

"খুন করা যায়?'

"হ্যাঁ। ভেবে বের করেছি।"

"তুমি বলতে চাও তুমি এই খাঁচার ভেতর থেকে আমাদের দুজনকে খুন করতে পারবে?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

মানুষটি কোনো কথা না বলে আবার হাসল এবং আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম সে সত্যি কথা বলছে। আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "আমার নাম ত্রাতুল।" জিগিকে দেখিয়ে বললাম, "ও হচ্ছে জিগি।"

মানুষটি এক ধরনের অবহেলার ভঙ্গি করে হাত নাড়ল। নিজে থেকে নাম বলল না বলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কী?"

"আমার নাম কী তাতে কিছু আসে-যায় না। যে পরিবেশে একজন মানুষের নাম ব্যবহার করতে হয় আমাকে কখনো সেখানে যেতে দেওয়া হবে না। কাজেই আমার নামের কোনো প্রয়োজন হয় না।"

"তুমি কি বলতে চাইছ তোমার কোনো নাম নেই?"

"মাঝে মাঝে আমাকে নুরিগা বলে সম্বোধন করে। এটা আমার নাম কি না আমি জানি না।"

"তোমার সাথে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম নুরিগা।"

"বাজে কথা বোলো না। আমার সাথে পরিচিত হয়ে কেউ সুখী হয় না। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ।"

"পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ? কী আশ্চর্য!"

নুরিগা ঘুরে আমার দিকে তাকাল, তারপর বলল, "কেন? আশ্চর্য কেন?"

"কারণ পৃথিবীতে একজন সবচেয়ে নিখুঁত মানুষও আছে—তার নাম রিয়া। তাকেও জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে তৈরি করা হয়েছে।"

নুরিগা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "হ্যাঁ আমি শুনেছি। আমি যেরকম পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ, সেরকম পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো একজন মানুষ আছে। সবচেয়ে ভালো এবং নিখুঁত।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ আছে।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তার সাথে আমার দেখা করার খুব ইচ্ছে করে।"

হঠাৎ আমার বুক কেঁপে উঠল, আমি শুকনো গলায় বললাম, "কেন?"

"কৌতূহল।"

"তার সাথে দেখা হলে তুমি কী করবে?"

নুরিগা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "খুন করব। খুন করায় এক ধরনের আনন্দ আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষটিকে খুন করার সবচেয়ে নিখুঁত আনন্দ।"

নুরিগা হঠাৎ শব্দ করে হাসতে শুরু করে, সেই ভয়ংকর হাসি শুনে আমি পিছিয়ে আসি। ভয়ার্ত চোখে আমি জিগির দিকে তাকালাম। জিগি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, বলল, "কী হয়েছে?"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "না, কিছু হয় নি। আমার শুধু মনে হচ্ছে—"

"কী মনে হচ্ছে?"

"এরা নুরিগাকে পরাবাস্তব জগতে পাঠাবে।"

"কেন?"

"জানি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তাকে নিশ্চয়ই পাঠাবে।"

জিগি কোনো কথা না বলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

নুরিগা, পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষটি তার ছোট খাঁচার ভেতরে বসে হাত এবং পায়ের শিকল নাড়িয়ে বিচিত্র এক ধরনের গান গাইতে থাকে, সেই গানে সুর বা মাধুর্য কিছুই নেই কিন্তু তবুও শুনতে কেমন যেন আনন্দ হয়। আমি এবং জিগি ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে সেই গান শুনতে শুনতে অপেক্ষা করতে থাকি। ঠিক কিসের জন্যে অপেক্ষা করছি জানি না বলে সেটি হয় খুব দীর্ঘ এবং খুব কষ্টকর।

দীর্ঘ সময় পর হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল এবং সরীসৃপের মতো দেখতে মানুষটি আরো কয়েকজন মানুষকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। নুরিগার খাঁচাটিকে তারা যন্ত্রপাতি দিয়ে ধরে টেনে বাইরে নিতে থাকে—নুরিগা কোনো রকম উত্তেজনা না দেখিয়ে চুপ করে বসে থাকে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "বিদায় নুরিগা।"

নুরিগা কোনো কথা বলল না, সে আমার কথাটি শুনেছে বলে মনে হল না। আমি আবার বললাম, "নুরিগা, তুমি কিন্তু আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ নও।"

নুরিগা আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম, "প্রথম যখন আমরা তোমার কাছে আসছিলাম, তুমি কী বলেছিলে জান?"

"কী?"

"বলেছিলে আমরা যেন তোমার খাঁচার কাছে না আসি। কাছে এলে শক খাব। তুমি আমাদের ইলেকট্রিক শক থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলে। খারাপ মানুষ কাউকে রক্ষা করে না।"

নুরিগা বিভ্রান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখিয়ে বললাম, "পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ হচ্ছে এরা যারা জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে তোমাকে তৈরি করেছে।"

নুরিগার মুখ দেখে মনে হল সে কী যেন ঠিক বুঝতে পারছে না, আমি নরম গলায় বললাম, "তোমাকে একটা জিনিস বলা হল না।"

ততক্ষণে নুরিগাকে তার খাঁচার ভেতরে করে ঘরের বাইরে বের করে নিয়েছে। সে কৌতূহলী হয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, "কী জিনিস?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রক্তের রঙ লাল।"

"কী বললে?"

"রক্তের রঙ লাল। সবুজ নয়—"

"আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী বলছ।"

ততক্ষণে নুরিগাকে অনেক দূর নিয়ে গেছে—আমি চিৎকার করে বললাম, "আবার যখন দেখা হবে তখন বলব।"

জিগি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "তুমি কী বলছ?"

"ঠিকই বলছি।"

"কী ঠিক বলছ?"

"নুরিগাকে নিচ্ছে তার মস্তিষ্ক ম্যাপিং করতে। তাকে পরাবাস্তব জগতে পাঠাবে। সম্ভবত আমার আর রিয়ার অস্তিত্বকে খুন করার জন্যে।"

"খুন করার জন্যে?"

"হ্যাঁ। তাই তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।"

"বাঁচানোর চেষ্টা? কীভাবে?"

"নুরিগাকে দিয়ে আমার অস্তিত্বের কাছে একটা খবর পাঠালাম।"

"কী খবর?"

আমি বিড়বিড় করে বললাম, "রক্তের রঙ লাল।"

জিগি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

১০. পলাতক জীবন

আগুনটাকে খুঁচিয়ে তার শিখাটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম, রিয়া দুই হাতে সেখান থেকে খানিকটা উষ্ণতা নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমি কখনোই চিন্তা করি নি আমাকে এভাবে বন্য পশুর মতো লুকিয়ে থাকতে হবে।"

"আমি খুব দুঃখিত রিয়া।"

"কেন? তুমি কেন দুঃখিত ত্রাতুল?"

"আমার সাথে তোমার দেখা হল বলেই তো এই যন্ত্রণা। আমিই তো প্রথম বুঝতে পেরেছি যে এটা আসলে পরাবাস্তব জগৎ, আমরা আসলে কৃত্রিম! যদি সেটা তুমি না জানতে তা হলে তোমার চমৎকার গেস্ট হাউজে আরামে থাকতে—"

"একটা সত্য না জেনে আরামে থেকে কী হবে?"

"তোমার তাই ধারণা?"

"হ্যাঁ।" রিয়া মাথা নেড়ে বলল, "আমার মনে হয় সত্য কথাটা জানা খুব দরকার। জেনে হয়তো লাভ থেকে ক্ষতি বেশি হয় কিন্তু তবুও জানা দরকার। সত্য হচ্ছে সত্য।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু এটা কী ভয়ংকর একটা ব্যাপার! তুমি চিন্তা করতে পার আমরা কোনো একটা যন্ত্রের ভেতরে রাখা কিছু তথ্য? বিশ্বাস করতে পার?"

রিয়া মাথা নাড়ল, বলল, "পারি না।"

সে আরো কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, আমিও কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম, কোনো একটা বন্য পশু দূর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আমি গোপন তথ্যকেন্দ্রের কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সত্যিকারের ত্রাতুলের কাছে খবর পাঠানোর পর থেকে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন হন্যে হয়ে খুঁজছে। আমরা সেই থেকে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

রিয়া একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমাকে বলেছিল এখানে সাতদিন থাকতে হবে। আজ তো সাতদিন হয়ে যাবে—এখন কী করবে বলে মনে হয়?"

"হয়তো তোমার স্মৃতিকে তোমার সত্যিকার অস্তিত্বে স্থানান্তর করে দেবে।"

রিয়া চমকে উঠে বলল, "আর তোমাকে?"

"আমি তুচ্ছ মানুষ—সাধারণ মানুষ। আমার অস্তিত্বকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করবে না।"

"তা হলে? তা হলে কী হবে?"

"যন্ত্রের মাঝে রাখা সেই তথ্যগুলো মুছে দেবে—আমিও মুছে যাব।"

রিয়া এক ধরনের যন্ত্রণাকাতর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, মনে হল সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। সে মাথা নেড়ে বলল, "না না, এ কী করে হয়?"

আমার রিয়ার জন্যে এক ধরনের মায়া হল। তার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললাম, "তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। যা হবার হবে।"

রিয়া খপ করে আমার দুই হাত ধরে বলল, "কী বলছ তুমি যে, যা হবার হবে? তোমার কিছু একটা হলে আমার কী হবে?"

"তোমার কিছুই হবে না। আমাদের এই কয়দিনের জীবন একটা স্বপ্নের মতো। তুমি কি স্বপ্নে দেখা কোনো মানুষের জন্যে কষ্ট পাও?"

"না।" রিয়া মাথা নেড়ে বলল, "এটা স্বপ্ন না। এটা সত্যি।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। রিয়ার দিকে তাকিয়ে বুকের মাঝে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের কষ্ট অনুভব করতে থাকি। এই অনুভূতির নামই কি ভালবাসা! রিয়ার সুন্দর মুখটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই আমার মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে উঠেছিল, কারণ রিয়া আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হল তুমি হাসছ কেন?"

আমি বললাম, "হঠাৎ একটা কথা মনে হল তাই।"

"কী কথা?"

"সত্যিকারের রিয়া আর সত্যিকারের ত্রাতুলের কথা।"

"তাদের কী কথা?"

"সত্যিকারের পৃথিবীতে সত্যিকারের রিয়া হচ্ছে রাজকুমারী রিয়া—আর সত্যিকারের ত্রাতুল হচ্ছে একেবারে তুচ্ছ একজন মানুষ। তারা একজন আরেকজনকে চিনেও না। যদি তাদের মাঝে স্মৃতি স্থানান্তর না হয় তা হলে তারা কোনোদিন জানতেও পারবে না এই পরাবাস্তব জগতে তারা কত কাছাকাছি দুজন মানুষ।"

রিয়া আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমি দেখলাম তার চোখে পানি টলটল করছে, সে হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে বলল, "এটা চিন্তা করে তুমি হাসছ? হাসতে পারছ?"

AMARBOI.COM

আমি রিয়াকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, "তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ, তোমার অনুভূতি পৃথিবীর সবচেয়ে পরিশুদ্ধ অনুভূতি! আমার বেলায় সেটা অন্যরকম, যেটা আনন্দের নয় তার মাঝেও কেমন জানি কৌতুক খুঁজে পাই।"

রিয়া মাথা নাড়ল, বলল, "না, তুমি ওরকম করে কথা বলো না, কখনো বলো না।"

আমি কোনো কথা না বলে আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

খুব ভোরবেলা হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আগুনের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে রিয়া শুয়ে আছে। আমি একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে ছিলাম, কখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। আমার মনে হল কোনো একজন মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে। ভোরের আবছা আলোতে দেখতে পেলাম একজন দীর্ঘদেহী মানুষ রিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে—মানুষটি এক হাতে আলতোভাবে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ধরে রেখেছে।

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম, মানুষটি নিঃশব্দে রিয়ার কাছে এগিয়ে এল, ঘুমন্ত রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, আবছা আলোতে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে হল তার মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে উঠেছে। মানুষটি আমাকে দেখে নি, আমি নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। যদি সে রিয়াকে আঘাত করার চেষ্টা করে আমার তাকে উদ্ধার করতে হবে। এটি পরাবাস্তব জগৎ হতে পারে, আমাদের অস্তিত্ব কৃত্রিম হতে পারে কিন্তু মানুষগুলো সত্যি।

মানুষটি তার অস্ত্র হাত বদল করল এবং একটা লিভার টেনে অস্ত্রটি পুরোটা রিসেট করে নিল, সেই শব্দে রিয়া হঠাৎ করে জেগে ওঠে। সে ধড়মড় করে উঠে বসল, বিস্ফারিত চোখে মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "কে? কে তুমি?"

মানুষটি মাথার এলোমেলো সোনালি চুলকে পেছনে সরিয়ে বলল, "আমার কোনো নাম নেই। অনেকে নুরিগা বলে ডাকে। আমি হচ্ছি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষগুলোর জিন্স নিয়ে আমাকে তৈরি করা হয়েছে।"

রিয়া কোনো কথা না বলে অবাক হয়ে নুরিগার দিকে তাকিয়ে রইল। নুরিগা হাসার মতো ভঙ্গি করে বলল, "আমি শুনেছি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ হচ্ছ তুমি। তোমাকে দেখার একটা শখ ছিল।"

রিয়া দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, "এভাবে দেখা হবে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।"

"আমিও পারি নি। আমাকে সব সময় একটা খাঁচার মাঝে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখত। এখন কী মনে করে ছেড়ে দিয়েছে।"

"ছেড়ে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ। শুধু ছেড়ে দিয়েছে তাই নয়, আমাকে একটা অস্ত্রও দিয়েছে। সেই অস্ত্র নিয়ে সারা রাত তোমাকে খুঁজছি।"

"আমাকে খুঁজছ?"

"হ্যাঁ। আমাকে বলেছে তোমাকে খুঁজে বের করতে। আমি অবিশ্যি সেজন্যে তোমাকে খুঁজি নি, নিজের কৌতূহলে খুঁজছি।"

রিয়া শুকনো গলায় বলল, "কিসের কৌতূহল?"

"দেখার কৌতূহল। প্রতিশোধ নেবার কৌতূহল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"প্রতিশোধ নেবার?"

"হ্যাঁ।" দীর্ঘদেহী সোনালি চুলের মানুষটি তার অস্ত্রটি উদ্যত করে বলল, "আমি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ হিসেবে জন্ম নিতে চাই নি, কিন্তু আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ হয়ে জন্ম নিতে হয়েছে এবং শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়েছে। তুমিও পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ হয়ে জন্ম নিতে চাও নি, কিন্তু তুমি সেভাবে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর যত আনন্দ-সুখ সব ভোগ করছ। ব্যাপারটি ঠিক নয়—আমি সেই ত্রুটিটি শোধরাব।"

কিছু বোঝার আগেই আমি দেখতে পেলাম নুরিগা তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি রিয়ার দিকে তাক করেছে। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, সাতদিন পর এভাবে তা হলে রিয়ার অস্তিত্বকে শেষ করে দেবার পরিকল্পনা করেছে? কিন্তু সেটি তো আমি হতে দিতে পারি না—আমি নিঃশব্দে এগিয়ে পেছন থেকে মানুষটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

আমার আচমকা আঘাতে মানুষটি পড়ে গেল, তার হাতের অস্ত্রটি একপাশে ছিটকে পড়ল। আমি মানুষটিকে নিচে চেপে রেখে অস্ত্রটি হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু মানুষটির শরীরে অমানুষিক জোর, ধাক্কা দিয়ে আমাকে নিচে ফেলে দিয়ে সে হিংস্র ভঙ্গিতে আমার টুঁটি চেপে ধরে। তার শক্ত লোহার মতো আঙুল আমার গলায় সাঁড়াশির মতো চেপে বসে। আমি প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করি কিন্তু তার অমানুষিক শক্তির কাছে আমি একেবারে অসহায়। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, এবং এক ধরনের অক্ষম আক্রোশে আমি মানুষটির মুখের দিকে তাকালাম—সোনালি চুল এবং সবুজ চোখের মানুষটিতে কী ভয়ংকর জিঘাংসা—

হঠাৎ করে মানুষটির হাত আলগা হয়ে গেল। সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "তুমি? তুমি এখানে?"

আমি কাশতে কাশতে কয়েকবার বুক ভরে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "তুমি আমাকে চেনো?"

মানুষটি অবাক হয়ে বলল, "কেন চিনব না? তুমি ত্রাতুল। একটু আগেই তো তোমার সাথে কথা বললাম!"

আমি মানুষটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সত্যিকার ত্রাতুলের সাথে এই মানুষটির যোগাযোগ হয়েছে! পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষটির সাথে তার কেমন করে যোগাযোগ হল?

নুরিগা নামের মানুষটি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি এখানে কেমন করে এসেছ?"

আমি গলায় হাত বুলিয়ে বললাম, "সে অনেক বড় ইতিহাস।"

নুরিগা মাথা নেড়ে বলল, "তোমার সব কাজ, সব কথাবার্তা হেঁয়ালিপূর্ণ, তুমি সোজা ভাষায় কথা বলতে পার না?"

"কেন, কী হয়েছে? আমি কী বলেছি?"

"তুমি একটু আগে আমাকে বললে, রক্তের রঙ লাল।"

"তাই বলেছি? আর কী বলেছি?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?" নুরিগা বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি জান না তুমি কী বলেছ!"

"তবু আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

"বলেছ রক্তের রঙ সবুজ নয়। বলেছ আবার যখন দেখা হবে তখন সব বুঝিয়ে বলবে।"

AMARBOI.COM

আমি নুরিগার দিকে তাকিয়ে রইলাম, নুরিগা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আবার দেখা হল এখন বুঝিয়ে বলো।"

আমি কাঁপা গলায় বললাম, "বলব। অবিশ্যি বলব। আমাকে একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে দাও।"

"ঠাণ্ডা মাথায় কী ভাবতে চাও?"

"আমার কাছে যে তথ্যটা পাঠানো হয়েছে।"

"কে তথ্য পাঠিয়েছে?"

"আমি পাঠিয়েছি।"

"তুমি পাঠিয়েছ? তুমি কার কাছে পাঠিয়েছ?"

"আমি আমার কাছে পাঠিয়েছি।"

নুরিগা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

নুরিগাকে প্রকৃত ব্যাপারটি বোঝানো খুব সহজ হল না। বোঝানোর পরও সে আমাদের কথা বিশ্বাস করল না। শেষ পর্যন্ত যখন সে বিশ্বাস করল তখন তার প্রতিক্রিয়াটি হল অত্যন্ত বিচিত্র। প্রথমে এক ধরনের অবর্ণনীয় আতঙ্ক এবং শেষে এক ভয়ংকর ক্রোধ। ক্রোধটি কার ওপর সে জানে না, একবার মনে হল প্রচণ্ড আক্রোশে সে রিয়া এবং আমাকেই শেষ করে দেবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিল। ক্রোধটি শান্ত হয়ে যাবার পর তার ভেতরে এক বিচিত্র দুঃখবোধ এসে ভর করল। আহত পশুর মতো সে দুই হাতে নিজের মাথা আঁকড়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। রিয়া গভীর মমতায় তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন কাঁদছ নুরিগা?"

"আমি ভেবেছিলাম আমাকে ওরা মুক্তি দিয়েছে। আমাকে আর শেকল পরে খাঁচার ভেতরে থাকতে হবে না। কিন্তু আসলে মুক্তি দেয় নি। এই অস্তিত্বকে মুক্তি দিয়েছে—যেই অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই, কোনো মূল্য নেই!"

আমি নরম গলায় বললাম, "আছে। মূল্য আছে।"

"কীভাবে মূল্য আছে?"

"আমি এখনো জানি না। কিন্তু মনে নেই ত্রাতুল তোমাকে দিয়ে আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে।"

"কী খবর পাঠিয়েছে?"

"রক্তের রঙ লাল, সবুজ নয়।"

"তার অর্থ কী?"

"আমি এখনো জানি না—কিন্তু সেই অর্থ খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের জানতে হবে কার রক্ত লাল নয়—সবুজ।"

"কীভাবে সেটি জানবে?"

"প্রথমে যাই নেটওয়ার্ক কেন্দ্রে। লুকিয়ে থাকার দিন শেষ হয়েছে—এখন সামনাসামনি প্রশ্ন করতে হবে।"

নুরিগা তার চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল, বলল, "চলো।"

আমি তার হাত স্পর্শ করে বললাম, "নুরিগা!"

"কী?"

"তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ কথাটি আমি বিশ্বাস করি না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নুরিগা একটু হাসল, বলল, “তুমি এই কথাটি আগেও আমাকে বলেছ।”

“সত্যি?”

“হ্যাঁ। সত্যি।” নুরিগা আমার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, “তোমাকে ধনবাদ ত্রাতুল। এই একটি কথা কারো মুখ থেকে শোনা খুব প্রয়োজন ছিল।”

“ধন্যবাদ।”

নুরিগা এবারে ঘুরে রিয়ার দিকে তাকাল, তারপর শোনা যায় না এরকম গলায় বলল, “রিয়া আমি দুঃখিত যে তোমাকে আমি খুন করতে চেয়েছিলাম।”

রিয়া হেসে ফেলল, “আমার মনে হয় কিছু একটা করতে চাওয়া আর কিছু একটা করার মাঝে অনেক বড় পার্থক্য। আমি নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ, কিন্তু আমার মাথায় কী চিন্তা আসে এবং আমি কী কী বিদঘুটে কাজ করতে চাই শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।”

নুরিগা অনেকটা আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, “আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। আমাকে সব সময় বলা হয়েছে আমি খারাপ—আমাকে জঘন্য অপরাধ করতে হবে। কিন্তু এখন দেখছি সেটা সত্যি নয়। তোমাদের সাহায্য করব চিন্তা করেই আমার ভালো লাগছে। অন্য রকম একটা ভালো লাগার অনুভূতি!”

“হ্যাঁ।” রিয়া মাথা নাড়ল, বলল, “আমার মনে হয় এটাই হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার গোপন কথা। অন্যের জন্যে কিছু একটা করা।”

নেটওয়ার্ক কেন্দ্রে আমরা যখন পৌঁছেছি তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। পুরো এলাকাটির মাঝে এক ধরনের শান্ত এবং কোমল ভাব রয়েছে কিন্তু ঠিক কী কারণ জানি না, আজকে তার মাঝেও আমি এক ধরনের অস্থিরতা খুঁজে পেতে শুরু করেছি। কেন্দ্রের দরজায় আমি কোনো ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার আশঙ্কা করেছিলাম কিন্তু দেখা গেল সেরকম কিছু নেই। আমরা গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। লম্বা করিডর ধরে হেঁটে একটা প্রশস্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নুরিগা বলল, “এই যে, এখান থেকে আমাকে যেতে দিয়েছে।”

আমারও ঘরটির কথা মনে পড়ল, এখানেই আমার মস্তিষ্ক ম্যাপিং হয়েছিল। নুরিগা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে দিতেই ভেতরের মানুষেরা ঘুরে আমাদের দিকে তাকাল, তাদের মুখে এক ধরনের বিস্ময়। আমি মানুষগুলোকে চিনতে পারলাম, এরা আমার মস্তিষ্ক ম্যাপিং করেছিল। লাল চুলের শিরান নামের মানুষটি বলল, “তোমরা? তোমরা এখানে কেন এসেছ?”

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, “বলছি কেন এসেছি। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই। তাই কোনো ভূমিকা না করে আমরা সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসি।”

শিরান, রিকি বা ক্লিশা কেউ কোনো কথা বলল না, এক ধরনের স্থির চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি একটা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, “আমরা জানি এটা পরাবাস্তব জগৎ—এখানে আমরা সবাই কৃত্রিম, সবাই কোনো যন্ত্রের তথ্য। আমরা তথ্য হিসেবে থাকতে চাইছি না, আমাদের প্রকৃত অস্তিত্বের সাথে মিলিত হতে চাইছি। তাই আমরা সত্যিকার পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে এসেছি।”

মানুষ তিনজন অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, রিকি মাথা নেড়ে বলল, “তোমরা কী বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না।”

আমি হেসে বললাম, “তোমার কথা আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না।”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নুরিগা হঠাৎ দুই পা এগিয়ে এসে বলল, "এরা সোজা কথা বুঝতে চায় না। আচ্ছা মতন রগড়ানি দিতে হবে। আমার চাইতে ভালো রগড়ানি কেউ দিতে পারে বলে মনে হয় না।"

নুরিগা সত্যি সত্যি কিছু একটা করে ফেলে কি না সেটি নিয়ে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠে তাকে থামানোর চেষ্টা করে বললাম, "মাথা গরম করো না নুরিগা, কথা বলে দেখা যাক।"

নুরিগা তার অস্ত্রটি ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তিনজনের একজনকে খুন করে ফেলি তা হলে অন্য দুটো সোজা হয়ে যাবে।"

"না না আগেই খুন করতে যেও না।"

"ঠিক আছে খুন না করতে পারি, কিন্তু রক্তের রঙটা তো পরীক্ষা করে দেখতে পারি—" বলে কিছু করার আগেই নুরিগা সামনে এগিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রিকির মুখে এত জোরে আঘাত করল যে সে এক কোনায় ছিটকে গিয়ে পড়ল। ঠোঁটের পাশে কেটে রক্ত বের হয়ে এল এবং হাত দিয়ে সেই রক্ত মুছে রিকি হতচকিতের মতো আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

নুরিগা হিংস্র গলায় বলল, "লাল, এই বদমাইশটার রক্ত লাল।"

ক্লিশা ফ্যাকাসে মুখে বলল, "তোমরা ঠিক বুঝতে পারছ না। এই পরাবাস্তব জগতের নিয়ন্ত্রণে আমাদের কোনো হাত নেই। আমরা সত্যিকার জগতে যোগাযোগ করতে পারি না।"

"আছে।" আমি কঠিন মুখে বললাম, "আমি গোপনে সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই বাইরের পৃথিবীতে যোগাযোগ করেছি। তোমরা নিশ্চয়ই পার।"

"পারি না।" ক্লিশার কথা শেষ হবার আগেই নুরিগা তাকে আঘাত করে বসে এবং ক্লিশা ছিটকে গিয়ে দেওয়ালে আছড়ে পড়ল।

"কী করছ তুমি নুরিগা—" বলে রিয়া ক্লিশার কাছে ছুটে যায় এবং তাকে কোনোভাবে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। বেকায়দা আঘাত লেগে তার নাক থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে।

নুরিগা হিংস্র চোখে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কী করে করতে হয় আমি জানি না। আমাকে যেটা শেখানো হয়েছে সেটাই করছি।"

রিয়া মাথা নেড়ে বলল, "না নুরিগা, তুমি এটা করতে পার না। মানুষকে আঘাত করতে হয় না।"

"আমি দুঃখিত রিয়া। কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তা ছাড়া তোমরাই বলেছ এটা পরাবাস্তব জগৎ। এখানে আমরা সবাই নকল। সবাই কৃত্রিম। সবাই কিছু তথ্য।"

"কিন্তু আমাদের অনুভূতিটি সত্যি।"

আমি একমাত্র অক্ষত মানুষ শিরানের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "দেখো শিরান তুমি মনে হয় ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পারছ না।"

"বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের কিছু বলার নেই।"

আমি কঠিন গলায় বললাম, "এই শেষবার তোমাকে বলছি, তুমি আমাদের বাইরে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দাও।"

"আমরা পারব না।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "নুরিগা, তুমি এদেরকে একটু চোখে চোখে রাখ, আমি দেখি কী করতে পারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিরান ভয়ার্ত গলায় বলল, "তুমি কী করতে চাও?"

এই পরাবাস্তব জগতের সাথে পৃথিবীর একটা যোগসূত্র আছে। সেটা খুঁজে বের করে নষ্ট করতে চাই।"

শিরান চমকে উঠল, বলল, "অসম্ভব।"

"মোটেও অসম্ভব নয়। আমাকে তোমরা মোটেও গুরুত্ব দাও নি—কিন্তু এসব কাজ আমি খুব ভালো পারি। আমি পুরো পরাবাস্তব জগতের সব তথ্য ওলটপালট করে দেব। তোমাদের এতদিনের কাজ, গবেষণা এক সেকেন্ডে আবর্জনা হয়ে যাবে।"

শিরান এবং তার সাথে অন্য দুজন তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ঘরের চতুষ্কোণ মডিউলটির উপর উঠে ভেতরে উঁকি দিলাম। অনেকগুলো প্রি-প্রসেসরের পাশে বড় বড় হিটশিল্ড লাগানো কিছু প্রসেসর। ছোট ছোট ক্রিস্টাল বসানো আছে দেখে বোঝা যায় অবলাল রশ্মি ভেতর দিয়ে ছোটাছুটি করছে, আমি টেবিল থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে দুটো ক্রিস্টালের মাঝে রাখতেই স্ক্রু ড্রাইভারটি ভস্মীভূত হয়ে গেল, সাথে সাথে মুহূর্তের জন্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়, দূরে কোথাও একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল!

শিরান আমার দিকে ছুটে এসে বলল, "কী করছ আহাম্মকের মতো? কী করছ তুমি?"

আমি মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বললাম, "দেখতেই পারছ কী করছি। চেষ্টাচরিত্র করে পরাবাস্তব জগৎটা উড়িয়ে দিতে চাইছি!"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

"না, হয় নি। খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করছি। তোমরা যদি আমার কথা না শোন এবারে আমি বড় প্রসেসরটা টেনে তুলে ফেলব, আমার হাতটা হয়তো কাবাবের মতো ঝলসে যাবে কিন্তু পরাবাস্তব জগতের কোন অংশটা ধ্বংস হবে বলো দেখি?"

শিরান পেছন থেকে আমাকে জাপটে ধরে বলল, "না, তুমি এটা করবে না। খবরদার ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে যেতে পারে। এত ভয়ংকর যেটা তুমি চিন্তাও করতে পারবে না—"

"কেন? কী হয়েছিল?"

"একবার শরীরের অর্ধেক অংশ উড়ে গেল, সব মানুষের—অন্য অর্ধেক ঠিক আছে।" ব্যাপারটা চিন্তা করেই শিরান শিউরে ওঠে।

"আমি সেরকম কিছু করতে চাই না। কাজেই বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা করে দাও। তাড়াতাড়ি।"

শিরান তার লাল চুলে আঙুল দিয়ে কী ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর এগিয়ে দেওয়ালের সাথে লাগানো কেবিনেটটি খুলে চতুষ্কোণ একটা ধাতব বাক্স নিয়ে আসে। আমার হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "সাড়ে তেরো টেরা হার্টজে সেট করে নিলে যোগাযোগ করতে পারবে।"

"চমৎকার!" আমি যোগাযোগ মডিউলটা হাতে নিয়ে বললাম, "এটা কি দ্বিপক্ষীয়?"

"না।" শিরান গোমড়া মুখে বলল, "শুধু তথ্য পাঠাতে পারবে। তথ্য ফিরে আসবে না।"

"এর সাথে কি ট্র্যাকিং ডিভাইস[১৯] আছে?"

"অবিশ্যি আছে, সব সময় থাকে। নিরাপত্তার একটা ব্যাপার আছে না?"

"তার মানে ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা মারা পড়তে পারি?"

শিরান কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে ঘরে সবার দিকে তাকালাম, যে যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি যুদ্ধজয়ের ভঙ্গি করে বললাম, "এখন

আমরা বাইরের পৃথিবীতে খবর পাঠাতে পারব। চলো যাই। তবে যাবার আগে আমাদের পরাবাস্তব জগতের আরো কিছু তথ্য দরকার।" আমি রক্তাক্ত রিকি এবং ক্লিশার দিকে তাকিয়ে বললাম, "তথ্যগুলো কি তোমরা এমনি দেবে নাকি কিছু মারপিট করতে হবে?"

ক্লিশা তার হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখের রক্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করতে করতে বলল, "দেওয়ার মতো কোনো তথ্য নেই। সব মিলিয়ে ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। এক স্তর থেকে অন্য কোনো স্তরে যাওয়া যেত না। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে এখন যাওয়া যায়।"

"গোলমাল?"

"হ্যাঁ, মনে হল প্রোগ্রামিং স্তরে পরিবর্তন করেছে। বেআইনি পরিবর্তন।"

আমি আনন্দে হা-হা করে হেসে বললাম, "জিগি!"

"জিগি?"

"হ্যাঁ, জিগি নামে আমার একটা বন্ধু আছে, সে হচ্ছে এই ব্যাপারে মহাওস্তাদ। আমি নিশ্চিত আসল ত্রাতুল আসল জিগিকে নিয়ে তোমাদের নেটওয়ার্কে হানা দিয়েছে।"

আমার উচ্ছ্বাসে অন্য কেউ অংশ নিল না। বরং ক্লিশা, রিকি আর শিরান তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি যোগাযোগ মডিউলটা হাতে নিয়ে বললাম, "অন্য ছয়টি স্তরে কেমন করে যাওয়া যায়?"

ক্লিশা বলল, "সব এক সমতলে চলে এসেছে। এই এলাকাটার পরেই অন্য এলাকা, তোমাদের খুঁজে নিতে হবে।"

"তোমাদের কাছে কো-অরডিনেট নেই?"

"সার্কুলার কো-অরডিনেট, থাকলেই কী না থাকলেই কী?"

আমি রিয়া এবং নুরিগার দিকে তাকিয়ে বললাম, "চলো যাই।"

রিয়া এবং নুরিগা আমার পিছু পিছু ঘর থেকে বের হয়ে এল। আমরা যখন করিডরে পৌঁছেছি ঠিক তখন নুরিগা হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।"

"কোথা থেকে আসছ?" আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই সে প্রশস্ত ঘরটিতে ফিরে গেল, সেখানে প্রথমে একটু হুটোপুটি তারপর শিরানের কাতর আর্তনাদ শুনতে পেলাম। প্রায় সাথে সাথেই নুরিগা ফিরে এসে বলল, "শিরানের রক্তও লাল। বেশ লাল।"

রিয়া হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল। এটি কৌতুককর কোনো ব্যাপার নয়, সত্যি কথা বলতে কী বেশ নৃশংস একটি ব্যাপার, তারপরও আমি হাসি আটকে রাখতে পারলাম না।

১১. ক্রানা

জিগি বলল, "পুরো ব্যাপারটা একবার পর্যালোচনা করা যাক।"

আমি মাথা নাড়লাম। জিগি বলল, "তুমি এসে বললে তোমার মস্তিষ্ক ম্যাপিং করে তোমাকে এবং রাজকুমারী রিয়াকে পরাবাস্তব জগতে আটকে রাখা হয়েছে। তাদেরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

সাহায্য করার জন্যে আমি মূল নেটওয়ার্কে ঢোকার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। উল্টো আমার আস্তানাটি ধ্বংস হল।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম। জিগি বলল, "আমার তখনই থেমে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ তোমার কিংবা রাজকুমারীর কিছু হয় নি—তাদের ম্যাপিং বা পরাবাস্তব অস্তিত্বটি শুধুমাত্র আটকা পড়েছে। তারা যদি মারাও যায় তোমাদের কিছু হবে না—তোমরা ভালোভাবে বেঁচে থাকবে। কিন্তু এই সহজ যুক্তিটি আমার চোখে পড়ল না— আমি বোকার মতো আবেগপ্রবণ হয়ে গেলাম।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

জিগি বলল, "আবেগপ্রবণ হলে মানুষ ভুল করে, আমিও ভুল করলাম। খুব বড় ভুল। পালানোর রাস্তা ঠিক না করে এখানে এসে হাজির হলাম। শুধু হাজির হলাম তা নয়, নেটওয়ার্কের পরিবর্তন করে ছয়টি পরাবাস্তব জগৎ এক সমতলে নিয়ে এসে তোমাকে এর ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম। তখন একটা কেলেঙ্কারি হল—আমরা একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলাম। এখন আমাদের কী হবে জানি না।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম। জিগি বিরক্ত হয়ে বলল, "শুধু মাথা নাড়বে না, কিছু একটা বলো।"

"বলার বিশেষ কিছু নেই।"

"অন্তত পক্ষে বলো যে তুমি খুব দুঃখিত।"

"আমি দুঃখিত না হলে কেন মিছিমিছি বলব যে আমি দুঃখিত?"

জিগি রেগে উঠে বলল, "তোমার একটি পরাবাস্তব অস্তিত্বের জন্যে আমরা এত বড় একটা গাড্ডায় পড়েছি—তুমি সেজন্যে দুঃখিত হবে না?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না।"

"কেন না?"

"সেটা আমি বলতে পারব না।"

"কেন বলতে পারবে না?"

"কারণ আমি নিশ্চিত আমাদেরকে খুব তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করা হচ্ছে।"

"অবিশ্যি লক্ষ করা হচ্ছে। কিন্তু কোন ব্যাপারটি এখানে গোপন যেটা আমরা জানি কিন্তু ওরা জানে না?"

আমি জিগির কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, "তোমার কাছে একটা চাকু আছে?"

জিগি অবাক হয়ে বলল, "না, কেমন করে থাকবে? আমাদের ব্যাগগুলো রেখে দিয়েছে!"

"খুব ছোট চাকু? যেটা বিপজ্জনক নয়?"

জিগি তার প্যান্টের অনেকগুলো পকেট ঘেঁটে একটা ছোট চাকু বের করল, কষ্ট করে এটি দিয়ে ফলমূলের ছিলকে কাটা যেতে পারে। আমি চাকুর ধারটা পরীক্ষা করে বললাম, "চমৎকার!"

"কী চমৎকার?"

"চাকুর ধারটুকু।"

"কেন?"

"আমি ঠিক করেছি আত্মহত্যা করব।"

জিগি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "এরকম সময়ে ঠাট্টা-তামাশা ভালো লাগে না।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমারও ভালো লাগে না—" এবং সে কিছু বলার আগেই আমি কবজিতে মূল ধমনির ওপর চাকু বসিয়ে দিলাম, নিখুঁত কাজ, সাথে সাথেই ধমনি কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম যেরকম যন্ত্রণা হবে ভেবেছিলাম, সেরকম যন্ত্রণা হচ্ছে না।

জিগি চিৎকার করে আমার হাত ধরে ফেলল, কিছুক্ষণের মাঝেই আমরা দুজনে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেলাম। আমি যথাসম্ভব শান্ত গলায় বললাম, "এত ব্যস্ত হবার কিছু হয় নি। আমি যদি মরে যাই শুধুমাত্র তা হলেই তুমি বেঁচে যেতে পারবে।"

"কেন? কেন একথা বলছ?"

"কারণ আমি বেশি জেনে ফেলেছি—তোমার সেটুকু জানার দরকার নেই।"

আমি কথা শেষ করার আগেই একটা এলার্মের শব্দ শুনতে পেলাম এবং কিছুক্ষণের মাঝে দরজা খুলে একজন ডাক্তার ছুটে এল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে ডাক্তারটির মুখের দিকে তাকালাম, যা আশা করেছিলাম তাই, ডাক্তারটি ক্রানা। তার সাথে যোগাযোগ করার জন্যেই আমি আমার ধমনিটি কেটেছি—রক্তপাতটুকু বৃথা যায় নি।

ক্রানা আমার ওপর ঝুঁকে পড়ল, "কী আশ্চর্য! এটা কোন ধরনের নির্বুদ্ধিতা?"

হাতের টিস্যু জোড়া লাগানোর যন্ত্রটি একটি চাপা গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে, আমি সেই শব্দের আড়ালে ক্রানার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। ফিসফিস করে বললাম, "ক্রানা এটা নির্বুদ্ধিতা না, তোমার সাথে যোগাযোগ করার এটা আমার একমাত্র উপায়।"

ক্রানা কোনো কথা না বলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, আমি ফিসফিস করে বললাম, "আমাদের খুব বিপদ। পৃথিবীর খুব বিপদ। আমাদের এখান থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দাও।"

ক্রানা আমার ধমনিটি জোড়া লাগিয়ে রক্তপাত বন্ধ করে ফিসফিস করে বলল, "কেমন করে সেটা করব?"

"তোমার সিকিউরিটি কার্ড আছে, সেটা আমাদের দিয়ে যাও।"

ক্রানা চোখ বড় বড় করে বলল, "তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।"

"না, হয় নি। বিশ্বাস কর। পৃথিবীর খুব বিপদ।"

"আমি কেমন করে সেটি বিশ্বাস করব? তুমি হচ্ছ চাল-চুলোহীন ভবঘুরে একজন মানুষ? তোমাকে বিশ্বাস করার কী কারণ আছে?"

"আছে। দোহাই তোমার—" আমি কাতর গলায় বললাম, "আমার চোখের দিকে তাকাও—দেখো আমি সত্যি কথা বলছি কি না।"

ক্রানা আমার চোখের দিকে তাকাল, তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "আমি দুঃখিত। আমি খুব দুঃখিত। আমি পারব না।"

ক্রানা উঠে দাঁড়াল, হাতের কবজিতে ছোট একটা সার্জিক্যাল টেপ লাগিয়ে আমার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এর ভেতরে দুটি বলকারক ট্যাবলেট দিয়েছি। খিদে পেলে খেও। রক্তক্ষরণ হয়েছে, দুর্বল লাগতে পারে।"

আমি কোনো কথা বললাম না, অত্যন্ত আশাভঙ্গ হয়ে ক্রানার দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমি বড় আশা করেছিলাম যে এই মেয়েটি ব্যাপারটির গুরুত্বটুকু বুঝবে। মেয়েটি বুঝল না।

ক্রানা চলে যাবার পর জিগি আমার দিকে এক ধরনের বিস্ময় এবং আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইল, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "আমার ধারণা ছিল তুমি মানুষটা স্বাভাবিক। ধীরস্থির, ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। আমার ধারণাটা সত্যি নয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কষ্ট করে হাসার চেষ্টা করে বললাম, "তোমার ধারণাটা আসলে সত্যি। বিশ্বাস কর।"

"কেমন করে বিশ্বাস করব? যে মানুষ এভাবে নিজের হাতের ধমনি কেটে ফেলে—"

"প্রয়োজনে কাটতে হয়—"

জিগি চিৎকার করে বলল, "প্রয়োজনে? প্রয়োজনে?"

"হ্যাঁ।"

জিগি চিৎকার করে নিশ্চয়ই আরো কথা বলত কিন্তু তার আগেই খুট করে শব্দ হল এবং দরজাটা খুলে গেল। আমি দেখতে পেলাম খ্রাউস ভেতরে এসে ঢুকেছে। আমাদের থেকে খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আশ্চর্য!"

ঠিক কোন ব্যাপারটি নিয়ে আশ্চর্য বলেছে আমি জানি না, কিন্তু সেটি নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করল না। খ্রাউস আবার বলল, "আশ্চর্য আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি তোমাদের কাছে এসেছি।"

আমি এবারে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, "কী জন্যে এসেছ?"

"একটা জিনিস জানার জন্যে।"

"কী জিনিস?"

"আমি নিশ্চিত তোমরা জান না—তবু কৌতূহল হচ্ছে তাই জিজ্ঞেস করছি। তোমরা কি জান পরাবাস্তব জগতে রিয়া কেন এখনো বেঁচে আছে? তার বেঁচে থাকার কথা নয়। সাতদিন পর তাকে খুন করার জন্যে নুরিগাকে পাঠিয়েছি, তার হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে—তার পরও রিয়া এখনো বেঁচে আছে কেন?"

আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল, আমি বললাম, "হ্যাঁ। জানি।"

খ্রাউস চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল, "সত্যি জান?"

"হ্যাঁ। সত্যি জানি।"

খ্রাউস একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার জানার খুব কৌতূহল হচ্ছে। বলো, কেন?"

"আমার অনুমান যদি সত্যি হয়ে থাকে তা হলে নুরিগা এখন পরাবাস্তব জগতে আমাকে এবং রিয়াকে সাহায্য করছে।"

"অসম্ভব।" খ্রাউস মুখ বিকৃত করে বলল, "নুরিগা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ। তার চরিত্রের প্রত্যেকটা দিক তুলে আনা হয়েছে পৃথিবীর বড় বড় অপরাধীদের ভেতর থেকে। তার চরিত্র হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য মানুষের চরিত্র। শুধু তাই না, রিয়া সম্পর্কে তার মনকে আমরা বিষাক্ত করে পাঠিয়েছি।"

আমি আনন্দে হা-হা করে হেসে বললাম, "ভুল! তুমি ভুল। নুরিগা পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ নয়—সত্যি কথা বলতে কী একজন মানুষ কখনো সবচেয়ে খারাপ হয় না। তোমরা যেসব খারাপ মানুষের জিন্স এনেছ খোঁজ নিয়ে দেখো তারাও খারাপ মানুষ হয়ে জন্মায় নি—তারা ধীরে ধীরে খারাপ হয়েছে। পরিবেশ তাদের খারাপ করেছে।"

"তুমি বলতে চাইছ নুরিগা স্বাভাবিক একটা মানুষ?"

"আমি বিশ্বাস করি তাকে স্বাভাবিক একটা মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যাবে।"

খ্রাউস মাথা নাড়ল, "অসম্ভব। হতেই পারে না।"

"তুমি নিজেই তার প্রমাণ দেখেছ—নুরিগা এখন রিয়া আর আমার সাথে সাথে পরাবাস্তব জগতে ঘুরছে। আমার ধারণা—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার ধারণা?"

"আমার ধারণা সেখান থেকে তোমাদের ওপর তারা একটা বড় হামলা করবে!"

খ্রাউসকে কেমন যেন হতচকিত এবং ক্রুদ্ধ দেখায়। আমি ষড়যন্ত্রীদের মতো গলায় বললাম, "তোমরা কেন নুরিগাকে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ হিসেবে তৈরি করেছিলে আমি জানি না। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

"কী সাহায্য?"

"তুমি এবং তোমার দলবল নুরিগা থেকে হাজার গুণ বেশি খারাপ মানুষ। তোমরা নিজেদের ব্যবহার করতে পার।"

খ্রাউস রক্তচক্ষু করে আমার দিকে তাকাল, তারপর হিংস্র গলায় বলল, "তোমার দুঃসাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। তুমি জান আমি তোমাকে কী করতে পারি?"

"আসলে জানি না।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "তুমি সম্ভবত আর দশজন মানুষ থেকে অনেক বেশি নিষ্ঠুর—আমাদের নিয়ে হয়তো অনেক কিছুই করতে পার। কিন্তু তাতে এখন আর কিছু আসে-যায় না।"

খ্রাউস আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন তার যোগাযোগ মডিউলটা শব্দ করে ওঠে, সে কানে লাগিয়ে কিছু একটা শুনে বলল, "চমৎকার। দুজনকেই লঞ্চ প্যাডে নিয়ে যাও।" তারপর মডিউলটা পকেটে রেখে আমাদের বলল, "তোমরা একদিকে খুব সৌভাগ্যবান যে, আমার হাতে যথেষ্ট সময় নেই। তাই তোমাদের মৃত্যুটাকে সেরকম আকর্ষণীয় করতে পারব না।"

"তুমি হয়তো সেরকম সৌভাগ্যবান নও।" আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, "নুরিগা যখন পরাবাস্তব জগতে গিয়েছে আমি তখন তাকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়েছিলাম। খবরটা কি শুনতে চাও?"

খ্রাউস হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকাল, বলল, "কী খবর?"

"রক্তের রঙ লাল।" একটু থেমে বললাম, "সবুজ নয়!"

খ্রাউস বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, মনে হল সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "কী বললে?"

"বলেছি রক্তের রঙ লাল—সবুজ নয়।"

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল খ্রাউস বুঝি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল না, দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে বের হয়ে গেল। জিগি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হচ্ছে এখানে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

আমার হঠাৎ এক ধরনের ক্লান্তি লাগতে থাকে। পিছিয়ে এসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আমি জিগির দিকে তাকিয়ে বললাম, "মনে আছে একটু আগে তুমি আমাকে পরাবাস্তব জগতে পাঠিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"সেখানে আমি খ্রাউসকে খুন করার জন্যে একটা ধাতব দণ্ড দিয়ে আঘাত করেছিলাম। আঘাতে কানের নিচে ফেটে গিয়ে রক্ত বের হয়ে এসেছিল।"

জিগি অবাক হয়ে বলল, "তুমি-তু-তুমি আঘাত করেছিলে? খ্রাউসকে?"

"হ্যাঁ।" আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, "আঘাত করাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষ হঠাৎ করে রেগে গেলে তো একজন আরেকজনকে আঘাত করতেই পারে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেটা হচ্ছে?"

"খ্রাউসের কানের নিচে কেটে যে রক্ত বের হয়েছিল সেটা। সেই রক্তের রঙ ছিল সবুজ।"

জিগি চমকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"অসম্ভব। এটা হতে পারে না।"

"এটা হয়েছে। আমি জানি।"

জিগি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "এর অর্থ কী?"

"আমার ধারণা খ্রাউস মানুষ নয়।"

"মানুষ নয়?"

"না।" আমি মাথা নাড়লাম।" "খ্রাউস এন্ড্রয়েড, সাইবর্গ বা রোবটও নয়। খ্রাউস হচ্ছে একটা ডিকয়[২০]।"

"ডিকয়?"

"হ্যাঁ। আমাদের পৃথিবীর প্রযুক্তি পরাবাস্তব জগৎ তৈরি করার জন্যে এখনো প্রস্তুত হয় নি। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ এখানে সেই প্রযুক্তি আছে। কারণ কোনো এক মহাজাগতিক প্রাণী সেই প্রযুক্তি পাঠিয়েছে। পৃথিবীর মানুষের সাথে যোগাযোগ করেছে যে ইন্টারফেস সেটাই হচ্ছে খ্রাউস। খ্রাউস হচ্ছে সেই ডিকয়। মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়। তাই রক্ত সবুজ।"

"যারা এত কিছু করতে পারে তারা রক্তের রঙ লাল করতে পারে না?"

"নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু আমি যে খ্রাউসকে দেখেছি সে ছিল পরাবাস্তব জগতে। সেখানে আমার কিংবা আর কারো যাবার কথা ছিল না। সেজন্যে মাথা ঘামায় নি। সেখানে আমি শুধু খ্রাউসকে দেখি নি—আরো অনেক বিচিত্র জিনিস দেখেছি। যার অনেক কিছু সম্ভবত মহাজাগতিক—"

AMARBOI.COM

"কী বলছ তুমি?"

'হ্যাঁ। তোমাকে বলার সুযোগ পাই নি।"

আমি দেওয়ালে মাথা রাখলাম, হঠাৎ করে আমি এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করি। কোনো কিছু করতে না পারা থেকে এক ধরনের অসহায় ক্রোধ। সেই ক্রোধ থেকে ক্লান্তি। জিগি আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

"হ্যাঁ। হঠাৎ করে দুর্বল লাগছে।"

"ডাক্তার মেয়েটি তোমাকে বলকারক একটা ওষুধ দিয়ে গেছে তুমি খাও।"

আমি জিগির দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে বললাম, "শরীরে বল বাড়িয়ে কী হবে? খ্রাউস এই মুহূর্তে পরিকল্পনা করছে কীভাবে আমাদের নিশ্চিহ্ন করবে।"

"করুক।" জিগি ক্রানার দিয়ে যাওয়া প্যাকেটের ভেতরে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, "কোথায়? এখানে কোনো ওষুধ নেই। একটা কার্ড।"

"কার্ড?"

আমি চমকে সোজা হয়ে বললাম, "কী কার্ড?"

"ক্রানার সিকিউরিটি কার্ড!"

মুহূর্তে আমার শরীর থেকে সকল দুর্বলতা উধাও হয়ে গেল। আমি সমস্ত স্নায়ুতে এক ধরনের তীব্র উত্তেজনা অনুভব করলাম। ক্রানা আসলে আমাকে বিশ্বাস করেছে, তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে আমাকে তার সিকিউরিটি কার্ডটি দিয়েছে, তার মানে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে এখনো একটি সুযোগ রয়েছে। আমার শরীরে এড্রেনেলিনের[২১] প্রবাহ শুরু হয়ে গেল। আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিগিকে বললাম, "চলো।"

কোথায়, কেন, কীভাবে, কখন এসব নিয়ে জিগি এতটুকু মাথা ঘামাল না, সেও লাফিয়ে উঠে বলল, "চলো।"

১২. ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ

ঘর থেকে খুব সাবধানে আমি মাথা বের করলাম। দীর্ঘ করিডরে কেউ নেই। আমি হাত দিয়ে জিগিকে ইঙ্গিত করতেই সে আমার পিছু পিছু বের হয়ে এল। ক্রানার সিকিউরিটি কার্ড ব্যবহার করে বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছি, কাজেই কোথাও কোনো এলার্ম বেজে ওঠার কথা নয় কিন্তু তবু আমি কান পেতে একটু শোনার চেষ্টা করলাম, চারপাশে এক ধরনের সুনসান নীরবতা।

আমি আর জিগি পাশাপাশি দ্রুত হেঁটে যেতে থাকি, এই কেন্দ্রটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই, কোথায় যাচ্ছি ভালো করে জানি না তবুও এখান থেকে একটু দ্রুত সরে যেতে হবে। করিডরের অন্য মাথায় পৌঁছানোর আগেই অন্য পাশ থেকে দুটি সাইবর্গ হেঁটে আসতে দেখলাম, তাদের চোখে-মুখে সাইবর্গসুলভ এক ধরনের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, আমি এবং জিগি মুহূর্তের জন্যে খুব বিপন্ন অনুভব করি, কিন্তু সাইবর্গ দুটো আমাদের দুজনকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলে গেল। ক্রানার সিকিউরিটি কার্ডটি সম্ভবত আমাদেরকে নিরাপদ মানুষ হিসেবে চারপাশে একটি সংকেত পাঠাচ্ছে।

AmarBoi.com

সাইবর্গ দুটি পাশ কাটিয়ে বেশ খানিকটা দূরে সরে আসার পর জিগি তার বুকের মাঝে আটকে থাকা নিশ্বাসটি বের করে দিয়ে বলল, "এভাবে হাঁটা উচিত হচ্ছে না, যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবে।"

"হ্যাঁ।" আমি মাথা নাড়লাম, "চলো কোথাও আগে লুকিয়ে পড়ি।"

করিডরের দুই পাশে ছোট ছোট ঘর। কোথায় কী আছে জানা নেই, সিকিউরিটি কার্ডটি থাকার জন্যে সম্ভবত এর কোনো একটিতে আমরা লুকিয়ে পড়তে পারব। আমি সাবধানে একটি ঘর খুলে উঁকি দিলাম, ভেতরে কেউ নেই। আমি আর জিগি সাবধানে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললাম। এই ঘরটি ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার এবং ডাটা লাইনের একটা সংযোগ কেন্দ্র—বিল্ডিংটির নানা অংশ থেকে নানা ধরনের তার, ফাইবার এবং ক্যাবল এখানে এসে একত্র হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কান পেতে থাকলে এখানে স্বল্প কম্পনের চাপা একটি গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যায়।

আমি মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো-ছিটানো তার, ফাইবার এবং ক্যাবল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ঘরের অন্যান্য যন্ত্রপাতি লক্ষ করছিলাম তখন হঠাৎ করে জিগির বিস্ময়ধ্বনি শুনতে পেলাম, "ওরে সর্বনাশ!"

আমি জিগির দিকে ঘুরে তাকালাম, "কী হয়েছে?"

জিগি হাত দিয়ে কালো রঙের মোটা একটি ক্যাবল দেখিয়ে বলল, "এই দেখ।"

"এটা কী?"

"পাওয়ার ক্যাবল। সুপার কন্ডাক্টিং পাওয়ার ক্যাবল, জিগা-ওয়াট[২২] পাওয়ার নেওয়ার ব্যবস্থা।"

"জিগা-ওয়াট?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী বলছ তুমি? এই ছোট বিল্ডিঙের মাঝে জিগা-ওয়াট পাওয়ার ক্যাবল?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"সেটা আমারও প্রশ্ন।" জিগি ভুরু কুঁচকে চিন্তা করার চেষ্টা করে বলল, "এটা অসম্ভব। এই বিল্ডিঙের যে পরিমাণ শক্তি দরকার তার জন্যে এত পাওয়ার লাগার কোনো কারণ নেই। তুমি জান সুপার কন্ডাক্টিং পাওয়ার ক্যাবল তৈরি করতে কী পরিমাণ যন্ত্রণা?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "জানি।"

"শুধুমাত্র লিকুইড হিলিয়াম সাপ্লাই চালু রাখতেই বারোটা বেজে যায়। অন্য ব্যাপার তো ছেড়েই দাও।"

"তা হলে এটা এখানে কেন আছে?"

জিগি তার পোশাকের ঝুলে থাকা অংশগুলো ট্রাউজারের ভেতর গুঁজে নিয়ে বলল, "চলো বের করে ফেলি।"

"বের করে ফেলবে?"

"হ্যাঁ। করিডর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করলে এমনিতেই ধরা পড়ার ভয়। তার চাইতে ধরো এই পাওয়ার ক্যাবল ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাই।"

জিগি ঠাট্টা করছে না সত্যি বলছে বুঝতে আমার একটু দেরি হল—আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম সে ঠাট্টা করছে না—সত্যিই বলছে। আমি ইতস্তত করে বললাম, "কাজটা খুব সহজ হবে?"

"মনে হয় না। কিন্তু সেটা কি বিবেচনার একটি বিষয়?"

আমি মাথা নাড়লাম, জিগি ঠিকই বলেছে, এটি বিবেচনার বিষয় নয়। গত দুএকদিনে আমরা যা যা করেছি তার তুলনায় এটা বিবেচনার কোনো বিষয়ই নয়।

পাওয়ার ক্যাবলটি মোটা, সাপের মতো এঁকেবেঁকে গিয়েছে, স্পর্শ করলে ক্রায়োজেনিক পাম্পের[২৩] কম্পন অনুভব করা যায়। আমি আর জিগি ক্যাবলটির ওপর দিয়ে হেঁটে, কখনো এটা ধরে ঝুলে ঝুলে, কখনো সরীসৃপের মতো পিছলে পিছলে অগ্রসর হতে থাকি। মাঝে মাঝে আরো নানা ধরনের তার, ক্যাবল এবং ফাইবার এটার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। কিছু কিছু রীতিমতো বিপজ্জনক, খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হয়। ক্যাবলটি সোজা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ করে নিচে নামতে লাগল, জিগি অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! দেখো এটা কত নিচে নেমে গেছে।"

আমিও অবাক হয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি পাওয়ার ক্যাবলটি প্রায় অতল পাতালে নেমে গিয়েছে। এত প্রচণ্ড শক্তি নিচে কোথায় নেমে গিয়েছে চিন্তা করে এবারে আমরা সত্যি কৌতূহলী হয়ে উঠি।

ক্যাবলটি বেয়ে বেয়ে নিচে নামা সহজ নয়, হাত ফসকে গেলে নিচে কোথায় গিয়ে পড়ব জানা নেই, কিন্তু এখন আর এত ভাবনাচিন্তার সময় নেই। দুজনে ক্যাবলটি জাপটে ধরে সরসর করে নিচে নামতে থাকি। এদিক দিয়ে কখনো মানুষ যায় না, বাতাসের প্রবাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপর্যাপ্ত এবং দূষিত। কিছুক্ষণেই আমরা কালিঝুলি মেখে ধুলায় ধূসরিত হয়ে গেলাম। নিচে নামতে নামতে যখন মনে হচ্ছিল হাতে আর শক্তি নেই আর একমুহূর্তও ঝুলে থাকতে পারব না, তখন দুজনে ঝুপঝুপ করে নিচে নেমে এলাম।

জায়গাটি একটি বড় হলঘরের মতো, চারদিকে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ছড়ানো। হলঘরের মাঝখানে গোলাকার একটা শক্ত কংক্রিটের ঘর। আমরা যে ক্যাবলটি বেয়ে নেমে এসেছি সেটা এই ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে, তুলনামূলকভাবে ছোট একটি ঘরের মাঝে এই বিশাল পরিমাণ শক্তি কেমন করে ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা বুঝতে পারলাম না।

আমি আর জিগি সাবধানে গোলাকার ঘরটি ঘুরে এলাম, এক পাশে উঁচু টিউবের মতো ছোট একটা করিডর, এর কাছাকাছি একটা লিফট নেমে এসেছে। আমরা যে জায়গাটিতে আছি সেটি মূল অংশের পেছনের সার্ভিস এরিয়া, মানুষজন আসে না। লিফট দিয়ে নেমে এই টিউবের মতো করিডর ধরে লোকজন মাঝখানের গোলাকার অংশটিতে ঢুকতে পারে। লিফট থেকে চাপা গুম গুম শব্দ শুনে বুঝতে পারছি সেটা উপরে উঠছে এবং নিচে নামছে, সম্ভবত লোকজন আসছে এবং যাচ্ছে। আমরা করিডর ধরে হেঁটে একটা দরজা পেলাম, ইচ্ছে করলে এটা খুলে করিডরের ভেতরে যেতে পারি কিন্তু এই মুহূর্তে সেখানে লোকজনের যাতায়াতের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কাজেই ভেতরে ঢোকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমরা আবার গোলাকার ঘরটির কাছে ফিরে এলাম, জিগির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী আছে এই ঘরটায়?"

জিগি মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না। পরিচিত কিছু নয়, এত ছোট জায়গায় এত শক্তির প্রয়োজন হয় সেরকম কিছু আমার জানা নেই।"

আমি ঘুরে চারদিকে তাকালাম, জায়গাটা একটা মঞ্চের পেছনের অংশের মতো—সামনে কী হচ্ছে পেছন থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই।

আমি আর জিগি গোলাকার ঘরটির কাছে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকে বোঝা যায় না কিন্তু কাছে এলে দেখা যায় এর দেওয়ালে বিচিত্র এক ধরনের নকশা, পৃথিবীতে কোথাও এরকম নকশা নেই, দেখেই মনে হয় এটি মানুষের হাতে তৈরি নয়। আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই নকশাটি একটু সরে গেল, যেন এটি একটি জীবন্ত প্রাণী। আমি চমকে উঠলাম, দেওয়ালটি সরীসৃপের দেহের মতো শীতল। আমি হতচকিত হয়ে জিগির দিকে তাকালাম। জিগি অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"আমি এরকম একটা জিনিস পরাবাস্তব জগতে দেখেছি। খ্রাউস বলেছে এটা মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগের ইন্টারফেস।"

নিজের অজান্তেই জিগি দুই পা পেছনে সরে এসে বলল, "এটা মহাজাগতিক প্রাণীর ইন্টারফেস?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে—তার মানে—এটা একটা মহাকাশযান!"

"মহাকাশযান? মাটির তলায়?" আমি চারদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললাম, "এটা বের হবে কেমন করে? কোথাও তো বের হবার জায়গা নেই।"

"নিশ্চয়ই স্পেস টাইম কন্টিনিউয়াম[২৪] ভেদ করে যাবে, নিশ্চয়ই ওয়ার্মহোল[২৫] তৈরি করে বের হয়ে যাবে। এই জন্যে এত বিশাল শক্তির দরকার।" জিগির চোখ উত্তেজনায় চকচক করতে থাকে, "এখন বুঝতে পারছি কেন এই সুপার কন্ডাক্টিং ক্যাবল এখানে এসেছে।"

আমি হঠাৎ করে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম, বললাম, "মনে আছে খ্রাউস বলেছিল দুজনকে লঞ্চ প্যাডে নিয়ে যাও। নিশ্চয়ই এটাই সেই লঞ্চ প্যাড। এখান থেকেই মহাকাশযান উড়ে যাবে।"

"কিন্তু কোন দুজন?"

"আমার মনে হয় রিয়া আর নুরিগা। পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানবী আর পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানব।"

জিগি মাথা নাড়ল, তারপর বলল, "ঠিকই বলেছ, সেজন্যেই এখানে এত কাজকর্ম হচ্ছে। লোকজন যাচ্ছে আসছে। সবকিছু প্রস্তুত করছে।"

আমি একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বললাম, "কিন্তু এটা তো কিছুতেই করতে দেওয়া যাবে না। পৃথিবীর মানুষকে তো মহাজাগতিক প্রাণীর হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। কিছুতেই না।"

"তুমি কী করবে?"

"থামাব।"

"কীভাবে থামাবে?"

"আমি জানি না।"

জিগি আমার দিকে তাকিয়ে সহৃদয়ভাবে হেসে ফেলল।

আমি এই বিশাল হলঘরটির দিকে তাকালাম, এটি মূল লঞ্চ প্যাডের আড়ালের অংশটুকু—এখানে সচরাচর কেউ আসে না। যন্ত্রপাতিগুলো অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো আছে। নানা ধরনের তার এবং ফাইবার ঝুলছে, মনিটর থেকে আলো বের হচ্ছে। বড় বড় ধাতব খণ্ড এখানে সেখানে ছড়ানো। ঘরের ঠিক মাঝামাঝি একটা অতিকায় ক্রেন দাঁড়িয়ে আছে, এই লঞ্চ প্যাড বসানোর সময় নিশ্চয়ই এটা ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মানুষজন আসে না বলে সত্যিকারের আলো নেই, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং মনিটরের আলোতে জায়গাটাতে এক ধরনের আলো-আঁধারি ভাব ছড়িয়ে আছে।

জিগি চারদিকে তাকিয়ে বলল, "মহাকাশযানটিকে থামানোর একটি মাত্র উপায়।"

"সেটি কী?"

"এই জিগা-ওয়াট সুপার কন্ডাক্টিং পাওয়ার ক্যাবলটি কেটে ফেলা, যেন মহাকাশযানটি তার প্রয়োজনীয় শক্তি না পায়।"

আমি জোর করে হাসার চেষ্টা করে বললাম, "তোমার ছোট চাকুটা দিয়ে এই সুপার কন্ডাক্টিং পাওয়ার ক্যাবলটি কাটতে পারবে বলে তো মনে হয় না।"

"না।" জিগি মাথা নাড়ল, "তুমি যে হাতের ধমনিটা কাটতে পেরেছিলে সেটাই বেশি।"

আমি হলঘরটার চারদিকে তাকালাম, বললাম, "এই ক্যাবলটা কাটার মতো সেরকম বড় আর ধারালো কোনো যন্ত্রপাতি এই ঘরে নেই?"

"থাকলেও লাভ নেই। ক্যাবলটা কাটলেই তারা বুঝতে পারবে—সাথে সাথে তোমাকে ধরে ফেলবে।"

আমি ক্যাবলটার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চমকে উঠে জিগির দিকে তাকালাম, জিগি অবাক হয়ে বলল, "কী হল?"

"ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ!"

"মানে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমরা ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ ব্যবহার করে মহাকাশযান আটকে দিতে পারি!"

"ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ? তুমি নিশ্চয়ই জান ইলেকট্রনিক্স যে পর্যায়ে গিয়েছে তাতে গত হাজার বছরে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণটি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নি।"

"কিন্তু তাই বলে সমীকরণটি তো মিথ্যা হয়ে যায় নি।"

"তা যায় নি। কিন্তু তুমি কীভাবে এটা ব্যবহার করতে চাইছ?"

"খুব সহজ। এই ক্যাবলটা দিয়ে জিগা-ওয়াট শক্তি প্রবাহিত হবে—এবং দেখাই যাচ্ছে সেটা বৈদ্যুতিক শক্তি। কাজেই এই ক্যাবলটাকে যদি আমরা একটা কয়েলের মতো পেঁচিয়ে তার মাঝখানে ফেরো ম্যাগনেট বসিয়ে রাখতে পারি তা হলে এটা একটা ইন্ডাক্টরের মতো কাজ করবে। তার মানে বুঝেছ?"

জিগির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "বুঝেছি। স্পেস টাইম কন্টিনিউয়াম ভেদ করার জন্যে একমুহূর্তের মাঝে অচিন্তনীয় পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে, সেই প্রবল প্রবাহ হঠাৎ করে ইন্ডাক্টরে আটকা পড়ে যাবে—যার অর্থ মহাকাশযানটি তার প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি পাবে না!"

"হ্যাঁ।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি নিশ্চিত শক্তির প্রয়োজনে একটু হেরফের হলেই এটা কাজ করবে না।"

"আমিও নিশ্চিত।"

"তা হলে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। দেখি ক্যাবলটাকে টেনে কতটুকু প্যাঁচাতে পারি।"

"দাঁড়াও।" জিগি হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, "আমরা কাজটা আরো সুচারুভাবে করতে পারি।"

"কীভাবে?"

"যদি হিসাব করে নিই কী পরিমাণ ক্যাবলকে কতটুকু প্যাঁচাতে হবে, মাঝখানে কতটুকু ফেরো ম্যাগনেট রাখতে হবে, পাশে কতখানি রাখতে হবে, ক্যাপাসিটেন্স কত—"

"কীভাবে হিসাব করবে?"

জিগি দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমাদের একটা নিউরাল কম্পিউটার আছে। মনে নেই?"

আমি চমকে উঠলাম, বললাম, "তুমি আবার আমার মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে চাইছ?"

"অবশ্যই! তা না হলে আমি নিউরাল কম্পিউটার কোথায় পাব?"

"অসম্ভব।" আমি মুখ শক্ত করে বললাম, "কখনোই নয়। তা ছাড়া তুমি সেই ইন্টারফেস আর সকেট কোথায় পাবে?"

"আগেরটা যেখান থেকে পেয়েছিলাম।"

"আগেরটা কোথা থেকে পেয়েছিলে? আমি ভেবেছিলাম তুমি নিজে তৈরি করেছ।"

জিগি মাথা নাড়ল, "আমি তৈরি করি নি—জুড়ে দিয়েছিলাম। মূল জিনিসটা পেয়েছিলাম একটা সাইবর্গের কপোট্রন থেকে। আমি নিশ্চিত আমরা ঠিক মেটাকোড বলে একটা সাইবর্গ ধরে আনতে পারব।"

আমি হতবাক হয়ে জিগির দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে কি সত্যি বলছে নাকি কৌতুক করছে বুঝতে পারছিলাম না—জিগির মুখে অবিশ্যি কৌতুকের কোনো চিহ্ন নেই। আমি কয়েকবার চেষ্টা করে বললাম, "তুমি সত্যিই বলছ?"

"হ্যাঁ, সত্যিই বলছি। এস তোমার সিকিউরিটি কার্ডটি নিয়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব সাবধানে করিডরের দরজা অল্প একটু ফাঁক করে আমরা ভেতরে তাকালাম। দূরে গোলাকার মহাকাশযানটিকে দেখা যাচ্ছে, তার সামনে এক ধরনের ব্যস্ততা। অন্য পাশে লিফট থেকে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি নামিয়ে আনা হচ্ছে। করিডর দিয়ে সাইবর্গরা হেঁটে যাচ্ছে—কোনো একটি বিশেষ কারণে এখানে কোনো মানুষ নেই।

আমরা হাইব্রিড দুই টাইপের দুটি সাইবর্গকে দেখতে পেয়ে দরজা ফাঁক করে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। সাইবর্গ দুটো কোনো রকম সন্দেহ না করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল—ক্রানার সিকিউরিটি কার্ডটি ম্যাজিকের মতো কাজ করছে।

আমরা তাদের হলঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। একটি সাইবর্গ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কে? কেন আমাদের ডেকেছ?"

জিগি হাত নেড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি সময় নষ্ট না করে সরাসরি মেটাকোডটি বললাম, "কালো গহ্বরে এনিফর্মের নৃত্য।"

আমার কথাটিতে ম্যাজিকের মতো কাজ হল, হঠাৎ করে দুটি সাইবর্গই পাথরের মতো স্থির হয়ে যায়, তাদের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসে এবং কপোট্রনের কোনো একটা অংশ থেকে একটা লাল আলো জ্বলে এক ধরনের ভোঁতা শব্দ করতে থাকে। জিগি সাইবর্গের কাছাকাছি গিয়ে তার মাথায় লাগানো নানা যন্ত্রপাতির ভেতরে কিছু একটা ধরে টানাটানি করতেই একটা অংশ খুলে আসে—সাইবর্গটির প্রকৃত মাথাটি বের হয়ে আসে, এটি চুলহীন ছোট প্রায় অপুষ্ট একটি মাথা। সাইবর্গটির কপোট্রনের নিয়ন্ত্রণ খুলে নেওয়ায় সেটি অসহায় হয়ে পড়ে, আমাদের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাঁটু ভেঙে নিচে পড়ে বিকারগ্রস্তের মতো কাঁপতে শুরু করে।

আমি কাছে গিয়ে সাইবর্গটিকে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করলাম। নরম গলায় বললাম, "তোমার কোনো ভয় নেই। আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করব না।"

মাথা থেকে কপোট্রন খুলে নেওয়া অসহায় এবং আতঙ্কিত সাইবর্গটি হামাগুড়ি দিয়ে হলঘরের এক কোনায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। যন্ত্র দিয়ে তাকে চালিয়ে নেওয়া হয়, এই যন্ত্রের সহায়তাটুকু সরিয়ে নেওয়া হলে এটি একটি শিশু থেকেও অসহায়। ভীত একটি পশুর মতো সাইবর্গটি বড় একটি ধাতব চৌকোনা বাক্সের পেছনে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল।

আমি এবারে দ্বিতীয় সাইবর্গটির দিকে তাকালাম—এটি আমাদের প্রয়োজন নেই কিন্তু সম্ভবত তার কপোট্রন ইন্টারফেস খুলে রাখাটাই সবার জন্যে নিরাপদ। জিগি এগিয়ে তার মাথা থেকেও ইন্টারফেসটি খুলে নেয়—এই সাইবর্গের প্রতিক্রিয়া হল আগেরটি থেকেও ভয়ংকর। সেটি মাথা কুটে আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করল। আমি অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করে আগের সাইবর্গটির পাশে বসিয়ে দিলাম। দুজন পশুর মতো জড়াজড়ি করে চৌকোনা বাক্সটির পেছনে মাথা নিচু করে লুকিয়ে রইল। মানুষের মস্তিষ্কের বড় ধরনের ক্ষতি করে দিয়ে তার সাথে যন্ত্রকে জুড়ে দিয়ে ব্যবহার করার এই অমানবিক প্রক্রিয়াটি একটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

জিগি ইন্টারফেসটি খুলে সেখান থেকে কিছু তার বের করে আনে, যন্ত্রের নানা অংশে টেপাটিপি করে কিছু একটা পরীক্ষা করে বলল, "জিনিসটা খুব উঁচুদরের হল না, কিন্তু কাজ করবে।"

আমি শঙ্কিত হয়ে বললাম, "উঁচুদরের হল না বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ?"

"তথ্য আদান-প্রদানের ব্যাপারটা তোমার নিজেকেই করতে হবে।"

"তার মানে কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি নিজেই বুঝবে।" জিগি আমাকে ডাকল, "এস। কাছে এস।"

আমি জিগির কাছে এগিয়ে গেলাম। জিগি আমাকে একটা বড় যন্ত্রাংশের ওপর বসিয়ে দিল। আমার হাতে কিছু যন্ত্রপাতি ধরিয়ে দিয়ে সে আমার মাথার পেছনে গিয়ে কিছু একটা করতে থাকে, হঠাৎ করে মনে হল আমার মাথার ভেতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটল, চোখের সামনে বিচিত্র ধরনের আলোর বিচ্ছুরণ হতে থাকে, আমি কানের পাশে লক্ষকোটি ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে থাকি। আমার সমস্ত শরীর পরিপূর্ণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁপতে শুরু করে, মনে হয় কেউ আমাকে গলিত সীসার মাঝে ছুড়ে দিয়েছে।

কতক্ষণ এরকম ছিল জানি না, হঠাৎ মনে হল আমার সমস্ত শরীর হালকা হয়ে গেছে, আমি বাতাসের মাঝে ভাসছি। মনে হল বহু দূর থেকে কেউ একজন আমাকে ডাকছে, আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। গলার স্বরটি জিগির, সে আমাকে চোখ খুলে তাকাতে বলছে।

আমি চোখ খুলে তাকালাম, মনে হল সমস্ত জগৎটাকে একটা ছোট ফোকাল লেংথের লেন্স দিয়ে দেখছি, চোখের সামনে সবকিছু নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুরছে। আমি জিগিকে দেখতে পেলাম, সে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আমাকে দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ত্রাতুল, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?"

আমি অনেক কষ্ট করে বললাম, "পাচ্ছি।"

"চমৎকার! যা ভয় পেয়েছিলাম!"

জিগি কেন ভয় পেয়েছিল কেন জানি সেটা জানার কৌতূহল হল না। কারণ হঠাৎ করে আমার মনে হতে লাগল খুব সহজেই পঞ্চম মাত্রার সমীকরণের একটা সমাধান বের করা যেতে পারে। সমীকরণের রাশিমালাগুলো যখন মস্তিষ্কে প্রায় সাজিয়ে ফেলেছি তখন শুনতে পেলাম জিগি জিজ্ঞেস করছে, "দশমিকের পরে পাইয়ের পঞ্চাশ নম্বর অংকটি কত?"

"কেন?"

"জানতে চাইছি—দেখি বলতে পার কি না।"

আমাকে হিসাব করে বলতে হল। রামানুজনের একটি সিরিজ ব্যবহার করে মস্তিষ্কের মাঝে হিসাব করে বললাম, "শূন্য।"

"তার পরেরটি?'

"পাঁচ।"

"তার পরেরটি?"

"আট।" আমি জিগির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ঠিক হয়েছে?"

"কেমন করে বলব? আমি কি পাইয়ের মান কয়েক শ ঘর পর্যন্ত মুখস্থ করে রেখেছি নাকি?"

"তা হলে?"

"দেখছি তোমার মস্তিষ্ক হিসাব করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে কি না।"

আমি কিছু না বলে আবার আমার পাঁচ মাত্রার সমীকরণ দিয়ে যেতে চাইলাম কিন্তু জিগি বাধা দিল, সে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে লঞ্চ প্যাডটা দেখতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"আয়তনটা অনুমান কর। কী দিয়ে তৈরি হতে পারে আন্দাজ করে ক্যাপাসিটেন্সটা বের কর।"

আমি হিসাব করে বের করে বললাম, "বেশ খানিকটা অনিশ্চয়তা আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"থাকুক।" জিগি আমার মাথাটা ঘুরিয়ে সুপার কন্ডাক্টিং পাওয়ার ক্যাবলটা দেখিয়ে বলল, "এখন হিসাব করে বের কর ক্যাবলটা কেমন করে প্যাঁচাতে হবে, এর মাঝখানে কী ধরনের ফেরো ম্যাগনেট ব্যবহার করবে—"

আমি হাত তুলে জিগিকে থামিয়ে দিলাম, হঠাৎ করে পুরো সমস্যাটা আমার কাছে একেবারে পানির মতো সহজ মনে হতে লাগল। আমি মস্তিষ্কের মাঝে ক্যাবলটা প্যাঁচানো শুরু করতেই শুধু যে চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটা দেখতে শুরু করলাম তা নয়, সময়ের সাথে পরিবর্তনের হারটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঘরের মাঝে ছড়ানো-ছিটানো নানা লোহা এবং ইস্পাতের যন্ত্রগুলো মাঝখানে নিয়ে আসা হলে চৌম্বক ক্ষেত্রটা কত গুণ বেড়ে যাবে সেটাও হিসাব করে ফেললাম। শুধু তাই নয়, ঠিক কোথায় একটা মাঝারি আকারের লোহার পাত বসালে সেটা ছুটে এসে ক্যাবলটাকে আঘাত করে ভেতরের ক্রায়োজেনিক পাম্পটাকে অচল করে দিতে পারে সেটাও আমি অনুমান করে নিলাম। ঠিক কতক্ষণ সময়ে তরল হিলিয়াম বাষ্পীভূত হয়ে ঘরটার মাঝে একটা উচ্চচাপের সৃষ্টি করবে কিংবা কতটুকু অংশে সুপার কন্ডাক্টিভিটি নষ্ট হয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের কারণে ক্যাবল উত্তপ্ত হয়ে আগুন ধরে যাবে এই ধরনের নানা বিষয় আমার মস্তিষ্কের মাঝে খেলা করতে লাগল।

জিগি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, এবারে তাগাদা দিয়ে বলল, "বলো।"

"কী বলব?"

"হিসাব করে কী করলে?"

"সবকিছু বের করেছি।"

"আমাকে বলো।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "কেন তোমাকে বলব। আমার সব মনে আছে।"

"সেই জন্যেই বলছি। তোমার মস্তিষ্কটি এখন একটা নিউরাল কম্পিউটার, তুমি এখন সবকিছু মনে রাখতে পারছ। একটানে যখন ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেস খুলে ফেলব, তখন কিছুই তোমার মনে থাকবে না।"

আমার কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হল, এই সহজ জিনিসগুলো আমার মনে থাকবে না কেন? জিগি আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "দেরি করছ কেন? বলো। যদি না বলো তা হলে কিন্তু মহাবিপদ হয়ে যাবে।"

পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে হাস্যকর এবং ছেলেমানুষি মনে হচ্ছিল কিন্তু তবুও আমি জিগিকে বলতে শুরু করলাম। জিগি দ্রুত সেগুলো লিখে নিতে শুরু করে।

আমি বুঝতে পারছিলাম আমি ঠিক প্রকৃতিস্থ নই, চোখের সামনে সবকিছুই কেমন জানি দুলছে, জিনিসগুলোর আকার-আকৃতিও ঠিক নেই। সবকিছুকেই কেমন জানি তুচ্ছ এবং অর্থহীন বলে মনে হতে থাকে। না চাইলেও মাথার ভেতরে জটিল সমীকরণ চলে আসতে থাকে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততায় আমি সেগুলো সমাধান করতে থাকি।

জিগি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলল, সে কী বলেছে আমি সেটাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে দ্রুত একটা চুয়াল্লিশ মাত্রার ম্যাট্রিক্স ওল্টানো শুরু করলাম। আমি টের পেলাম জিগি আমার মাথার পেছনে হাত দিয়েছে, কিছু একটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই মাথার ভেতরে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল, মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে জগৎসংসার অন্ধকার হয়ে গেল।

আমি যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন জিগি আমার ওপরে ঝুঁকে আতঙ্কিত মুখে আমাকে ডাকছে। আমি চোখ খুলে তাকাতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, "এন্ড্রোমিডার দোহাই! তা হলে চোখ খুলে তাকিয়েছ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চোখ এবং কপালে এক ধরনের ভোঁতা ব্যথা অনুভব করতে থাকি, কিন্তু সেটাকে উপেক্ষা করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলাম। জিগি আমাকে ধরে সাবধানে দাঁড় করিয়ে দাঁত বের করে হেসে বলল, "চমৎকার! নিউরাল কম্পিউটারকে টার্বো মোডে চলানো যায় কি না তাও পরীক্ষা করে দেখে ফেললাম!"

"কী দেখলে?"

"যায়।"

"দোহাই তোমার—" আমি আমার মাথা দুই হাতে চেপে ধরে বললাম, "ভবিষ্যতে আর কখনো এই পরীক্ষা করে দেখবে না।"

জিগি মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে দেখব না। শুধু গাণিতিক অংশটুকু উজ্জীবিত করা যায় বলে শুনেছিলাম—আজকে পরীক্ষা করে দেখলাম! সত্যিই যায়!" জিগির অজান্তেই তার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জিগির ধারণা সত্যি—খানিকক্ষণ আগে আমি কী হিসাব করেছিলাম, তার কিছু মনে নেই। জিগি লিখে রাখা হিসাবটুকু দেখে ক্যাবল সাজাতে থাকে। শক্ত মোটা ক্যাবল নাড়তে প্রায় মত্ত হস্তীর শক্তির প্রয়োজন, দুজনের একেবারে কালো ঘাম ছুটে গেল। নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের কয়েল করে তার মাঝখানে বিভিন্ন লোহার যন্ত্রপাতি এনে রাখা হল। কোনটা কোথায় রাখা হবে আমি একেবারে নিখুঁতভাবে বলে দিয়েছি। পুরোটুকু সাজিয়ে যখন শেষ করেছি তখন আমরা দুজনই ঘেমে-নেয়ে গিয়েছি।

দুজনে দেওয়ালে হেলান দিয়ে মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নিতে থাকি। জিগি আমার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "চমৎকার! দেখি এখন মহাজাগতিক প্রাণী কেমন করে পৃথিবীর মানুষ নিয়ে পালিয়ে যায়!"

"আগেই এত উচ্ছ্বসিত হয়ো না জিগি, এখনো অনেক কাজ বাকি।"

জিগিকে সেটা নিয়ে খুব বিচলিত দেখা গেল না। এরকম সময়ে আমরা আমাদের পেছনে একটু শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি সাইবর্গ দুটো গুটিসুটি মেরে আমাদের পেছনে এসে বসেছে। তাদের চোখে একই সাথে এক ধরনের কৌতূহল এবং আতঙ্ক। আমাদেরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সাইবর্গ দুটি আমার হাসি দেখে বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত হল না, বরং এক ধরনের ভীতি তাদের ভেতর কাজ করল। উবু হয়ে অনেকটা পশুর মতো দুই হাত এবং এক পায়ে ভর দিয়ে আবার চৌকোনা একটা যন্ত্রের পেছনে লুকিয়ে গেল। জিগি হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "মাথায় কপোট্রনের ইন্টারফেসটা না লাগানো পর্যন্ত এরকমই থাকবে। কী একটা বাজে ব্যাপার।"

"মাথায় লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় না?"

"নাহ্ আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি।" জিগি মাথা নাড়ল এবং হঠাৎ করে ঘুরে আমার দিকে তাকাল, "একটা কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী?"

"এই সাইবর্গ দুজনের কপোট্রনিক ইন্টারফেসটা যদি আমরা দুজন মাথায় পরে বের হয়ে যাই—তা হলে কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না।"

আমি ভুরু কুঁচকে জিগির দিকে তাকালাম, "কী বললে?"

"আমরা দুজন মাথায় এই বাইবর্গের ইন্টারফেসটা পরে সাইবর্গ সেজে বের হয়ে যেতে পারি। বাইরে গিয়ে দেখতে পারি কী হচ্ছে।"

"কিন্তু ওরা বুঝে ফেলবে না?"

"না। সাইবর্গের মতো হাঁটব, চেষ্টা করব কোনো কথা না বলতে, আর যদি বলতেই হয় তা হলে সাইবর্গদের মতো কথা বলব।"

আইডিয়াটা খারাপ না। এই হলঘরের ভেতরে এখন আর দেখার কিছুই নেই। করিডর ধরে হেঁটে গিয়ে মহাকাশযানটিকে হয়তো দেখতে পারি। আমি জিগির দিকে তাকিয়ে বললাম, "চলো তা হলে।"

১৩. মুখোমুখি

আমি আর জিগি সাবধানে দরজা খুলে বের হয়ে এলাম। মাথার ওপরে কপোট্রনের ইন্টাফেসটা বসাতে বেশ কষ্ট হয়েছে। সত্যিকারের সাইবর্গের মাথার চুলগুলো ইলেকট্রোলাইসিস করে তুলে ফেলা হয়। করোটিতে ইন্টারফেসটা স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয়—আমাদের সেরকম কিছু নেই বলে যে কোনো মুহূর্তে পুরোটা খুলে পড়ে যাবার একটা আশঙ্কা আছে। হাঁটতে হচ্ছে সাবধানে, এক হিসেবে ব্যাপারটি মন্দ নয় কারণ তার ফলে আমাদের দেখাচ্ছে সত্যিকারের সাইবর্গের মতো।

প্রথম কিছুক্ষণ আমরা ধরা পড়ে যাব সেরকম একটা আশঙ্কা আমাদের ভেতর কাজ করছিল। কিছুক্ষণের মাঝেই অবিশ্যি বুঝে গেলাম কেউ কিছু সন্দেহ করছে না। আমরা চোখে-মুখে সাইবর্গীয় একটা উদভ্রান্ত দৃষ্টি ফুটিয়ে হেঁটে যেতে থাকি। করিডরের এক মাথায় একটি লিফট। অন্যপাশে বিচিত্র একটি মহাকাশযান, তার ভেতরে কিছু কাজকর্ম করা হচ্ছে। আমি আর জিগি কাছাকাছি এসে দেখতে পেলাম বড় একটি গোলাকার মঞ্চের মতো জায়গা, সেখানে পাশাপাশি দুটি আসন, আসনগুলো খালি যারা এখানে বসবে তারা এখনো এসে পৌঁছায় নি।

কিছুক্ষণের মাঝেই অবিশ্যি তারা পৌঁছে গেল। নুরিগাকে তার খাঁচার ভেতরে করে এনেছে, সে খাঁচার গারদগুলো ধরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নুরিগার পেছনেই একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে, তাকে দুপাশ থেকে দুটি শক্তিশালী সাইবর্গ ধরে রেখেছে। মেয়েটির চোখে-মুখে একটি বিচিত্র ধরনের আতঙ্ক, মনে হচ্ছে এখানে কী হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। এই মেয়েটি নিশ্চয়ই রিয়া—আমি তার সাথে কথা বলেছি। পরাবাস্তব জগতে আমার একটা অস্তিত্বের সাথে তার একটা অস্তিত্ব আটকা পড়ে আছে। হঠাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত এই মেয়েটির জন্যে আমি আমার বুকে গভীর মমতা অনুভব করলাম, আমার ইচ্ছে হল আমি তার কাছে ছুটে গিয়ে বলি, রিয়া তোমার কোনো ভয় নেই—আমরা তোমাকে রক্ষা করব। কিন্তু আমি সেটা বলতে পারলাম না, রিয়ার ঠিক পেছনে খ্রাউস, তার আশপাশে অসংখ্য সাইবর্গ—তাদের অনেকে সশস্ত্র।

রিয়াকে দুই হাতে ধরে প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তার মাঝে হঠাৎ করে সে থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে ঘুরে তাকাল। খ্রাউসের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে কী হচ্ছে আমাকে বলবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রাউস শীতল গলায় বলল, "বিশেষ কিছু নয়।"

"অবিশ্যি বিশেষ কিছু। তোমরা আমার কাছে খবর পাঠিয়েছ যে আমার মাথার ট্রাইকিনিওয়াল ইন্টারফেসটা খুলে দেবে। আমি সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছি। এখানে হাজির হওয়া মাত্র আমাকে ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছ যেন আমি একটা খুনি আসামি। আমাকে এভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছ কেন?"

"কারণ আছে রিয়া।"

"কী কারণ—সেটাই আমি জানতে চাই।"

খ্রাউস কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রিয়া ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "তার আগে আমাকে আরো একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"কী প্রশ্ন?"

রিয়া খাঁচার ভেতরে আটকে থাকা নুরিগাকে দেখিয়ে বলল, "এই মানুষটাকে তোমরা খাঁচার ভেতরে আটকে রেখেছ কেন? তোমরা বুঝতে পারছ না কাজটি কী ভয়ংকর অমানবিক?"

খ্রাউস হা-হা করে হেসে বলল, "তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ কাজেই তোমার মানবিক অনুভূতিগুলো অন্য দশজন থেকে ভিন্ন। সবকিছুতেই অমানবিক কারণ খুঁজে পাও।"

"তুমি বলতে চাও—এটা অমানবিক নয়?"

"অন্য দশজনের বেলায় এটা হয়তো অমানবিক—কিন্তু এর বেলায় নয়।"

"কেন?"

খ্রাউস উত্তর দেবার আগেই নুরিগা বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে উঠে বলল, "কারণ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ।"

রিয়া অবাক হয়ে বলল, "কী বললে? পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ?"

"হ্যাঁ।" খুব একটা মজার কথা বলছে এরকম একটা ভঙ্গি করে নুরিগা বলল, "পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ থেকে জিন্সগুলো নিয়ে আমাকে তৈরি করেছে। তাই আমি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ।"

"এটা কী ধরনের যুক্তি? মানুষ খারাপ হয়ে যেতে পারে কিন্তু তার জিন্স কেমন করে খারাপ হয়? ছোট বাচ্চা বড় হলে কি তার জিন্স পাল্টে যায়? কখনো একটা ছোট শিশু দেখেছ যে অপরাধী? দেখেছ?"

নুরিগা আবার হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "এটা তুমি ওদের বোঝাতে পারবে না।"

রিয়া তীব্র দৃষ্টিতে খ্রাউসের দিকে তাকাল, কিন্তু খ্রাউস তার দৃষ্টিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, "চল, ওকে নিয়ে চল।"

রিয়া ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে বলল, "তুমি এখনো বলো নি কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছ।"

"বলি নি, কারণ সেটা শুনলে হয়তো তোমার ভালো লাগবে না।"

রিয়া খানিকক্ষণ নিঃশব্দে খ্রাউসের দিকে তাকিয়ে থেকে কাঁপা গলায় বলল, "তোমরা আমাকে আর নুরিগাকে নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো একটা অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছ। অমানবিক কাজ করতে যাচ্ছ।"

"ন্যায়-অন্যায় মানবিক-অমানবিক খুব আপেক্ষিক ব্যাপার।"

রিয়া ভয়ার্ত মুখে বলল, "তার মানে তোমরা সত্যি সত্যি আমাদেরকে নিয়ে ভয়ংকর কিছু করছ।"

খ্রাউস রিয়ার কথার উত্তর না দিয়ে সাইবর্গগুলোকে বলল, "এদেরকে নিয়ে যাও ভেতরে।"

রিয়া আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সাইবর্গগুলো তাকে সে সুযোগ দিল না—অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাকে ধরে টেনেহিঁচড়ে নিতে শুরু করল। আমার আবার ইচ্ছে করল রিয়ার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে বলি, তোমার কোনো ভয় নেই রিয়া। আমরা তোমাকে রক্ষা করব—যেভাবে পারি রক্ষা করব। কিন্তু তাকে সেটা বলতে পারলাম না। সাইবর্গগুলোর পেছনে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকলাম।

মহাকাশযানের ভেতরে যাবার আগে সবাইকে কোন ধরনের স্পেস সুট পরে নেবে বলে আমার একটা ধারণা ছিল কিন্তু দেখা গেল সেটি সত্যি নয়। সাইবর্গগুলো রিয়াকে তার আসনের কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে সরে গেল, খ্রাউস কোথাও কোনো সুইচ স্পর্শ করতেই অদৃশ্য কোনো একটি শক্তির ক্ষেত্র নিচে নেমে এসে রিয়াকে আটকে ফেলল। রিয়া সেই অদৃশ্য ক্ষেত্রকে আঘাত করে কিন্তু সেটাকে ছিন্ন করতে পারে না। আমি শুনতে পেলাম সে কাতর গলায় চিৎকার করে বলছে, "আমাকে এখান থেকে বের হতে দাও। তোমরা এভাবে আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।"

খ্রাউস রিয়ার কাতর চিৎকারকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে নুরিগাকে ভেতরে নিয়ে আসার জন্যে ইঙ্গিত করল। সাইবর্গগুলো তাদের যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতায় নুরিগাকে ধাক্কা দিয়ে তার খাঁচাসহ ভেতরে নিয়ে গেল। তার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় নুরিগাকে দাঁড় করিয়ে খ্রাউস কোথায় জানি স্পর্শ করতেই ওপর থেকে আবার একটা অদৃশ্য শক্তি বলয় নিচে নেমে এসে নুরিগাকে তার ভেতরে আটকে ফেলল। খ্রাউস এবারে একটা সাইবর্গকে ইঙ্গিত দিতেই সে খাঁচার দরজা খুলে নুরিগাকে শক্তি বলয়ের মাঝে রেখে খাঁচাটা টেনে বের করে সরিয়ে নিল। নুরিগা পাথরের মতো মুখ করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, শক্তি বলয়টি স্পর্শ করে দেখারও তার কোনো কৌতূহল নেই। খ্রাউস চারদিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বলল, "চমৎকার!"

রিয়া এতক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছে। হঠাৎ করে সে বুঝতে পেরেছে যে তার আর কিছু করার নেই। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "তুমি এখন কী করবে?"

খ্রাউস মহাকাশযানটির চারদিকে তাকিয়ে ভেতর থেকে বের হয়ে এল। হাতে একটা চতুষ্কোণ কন্ট্রোল প্যানেলের ওপরে সযত্নে হাত বুলিয়ে বলল, "তোমরা নিজেরাই দেখবে। তবে মনে হয় এখন সময় হয়েছে তোমাদের বলে দেবার।" খ্রাউস মুখে এক ধরনের হাসি ফুটিয়ে গলায় খানিকটা নাটকীয়তা এনে বলল, "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবী রিয়া এবং সর্বনিম্ন মানব নুরিগা তোমাদের দুজনকে অভিনন্দন। কারণ তোমরা পৃথিবীর প্রথম মানব সন্তান যারা মহাজাগতিক অভিযান করে দূর কোনো একটি গ্যালাক্সিতে কোনো এক বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণীর জগতে যাচ্ছ।"

রিয়া আর্তনাদ করে উঠল, চিৎকার করে বলল, "না!"

"হ্যাঁ।" খ্রাউসের মুখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে, সে চোখ নাচিয়ে বলে, "বুদ্ধিমান একটি মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে। তারা আমাদের দিয়েছে নতুন নতুন প্রযুক্তি—তার বদলে আমরা তাদের দিচ্ছি দুটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। সবচেয়ে নিখুঁত এবং সবচেয়ে বড় অপরাধী।"

রিয়া শক্তি বলয়ে আটকা পড়ে থেকে রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখে খ্রাউসের দিকে তাকিয়ে রইল। খ্রাউস হাতের চৌকোনা কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বড় সুইচ স্পর্শ করতেই তীক্ষ্ণ এলার্মের শব্দ বেজে ওঠে। দেয়ালে হঠাৎ করে কিছু সংখ্যা ফুটে ওঠে। সংখ্যাগুলো প্রতি

www.amarboi.com

সেকেন্ডে একটি করে কমে কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে যায়। খ্রাউস মুখের হাসিকে আরো বিস্তৃত করে বলল, "আজ আমার খুব আনন্দের দিন। মহাজাগতিক প্রাণীদের আমি কথা দিয়েছিলাম, আমি আমার কথা রেখেছি! তারাও তাদের কথা রেখেছে, আমাকে দিয়েছে অসাধারণ সব প্রযুক্তি!"

রিয়া চিৎকার করে বলল, "তুমি এটা করতে পার না। পৃথিবীর মানুষ তোমাকে ক্ষমা করবে না। এটা অন্যায়, এটা বেআইনি।"

"তুমি সত্যিই বলেছ। এটা বেআইনি। এটা অন্যায় কি না জানি না, কিন্তু এটা বেআইনি। কাজেই এটা কারো জানার কথা নয়। তাই আমার কাজে সাহায্য করার জন্যে আমি সাইবর্গ তৈরি করেছি। অসংখ্য সাইবর্গ। কাজ শেষ হলে তাদেরকে আমি ব্যাক্টেরিয়ার মতো মেরে ফেলব। এই দেখ—তাদেরকে আমি এখানে অচল করে রেখে যাব। এদেরকে নিয়ে এই পুরো এলাকাটা ধ্বংস করে দেওয়া হবে।"

খ্রাউস তার হাতের কন্ট্রোল প্যানেলের কোনো একটা সুইচ স্পর্শ করতেই মহাকাশযানটিকে ঘিরে থাকা অসংখ্য সাইবর্গ পা ভেঙে একসাথে লুটিয়ে পড়ল। দুজন ছাড়া—আমি এবং জিগি।

খ্রাউস সবিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। আমি একটু এগিয়ে নিচে পড়ে থাকা একটা সাইবর্গের হাত থেকে একটা ভয়ংকর দর্শন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে খ্রাউসের দিকে এগিয়ে গেলাম। নিচু গলায় বললাম, "না খ্রাউস, তোমার যন্ত্র ঠিকই আছে। সেখানে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা অন্য জায়গায়। আমরা সাইবর্গ নই।"

আমি মাথা থেকে কপোট্রনিক ইন্টারফেস খুলে ফেলতেই খ্রাউস বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। বলল, "তোমরা?"

"হ্যাঁ।"

খ্রাউস হঠাৎ পাগলের মতো হেসে উঠে বলল, "তোমরা একটু দেরি করে ফেলেছ! এই দেখ পৃথিবীর মানুষ কীভাবে দূর গ্যালাক্সিতে পাড়ি দেয়—"

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, "দেবে না।"

"পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যেটি এখন এই অভিযানকে থামাতে পারবে।"

"আছে।"

খ্রাউস চিৎকার করে বলল, "নেই।"

"তুমি নিজের চোখেই দেখো—"

খ্রাউস অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কাউন্ট ডাউন সংখ্যার দিকে তাকিয়ে রইল। এটি কমতে কমতে শূন্যতে এসে স্থির হতেই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। হঠাৎ করে সমস্ত জায়গাটা দুলে উঠল, তীব্র আলোর একটা ঝলকানি দেখতে পেলাম, শক্তি বলয় থেকে রিয়া এবং নুরিগা দুজন দুদিকে ছিটকে পড়ল। কর্কশ এক ধরনের এলার্ম বাজতে থাকে, ঝাঁজালো পোড়া গন্ধ এবং ধোঁয়ায় হঠাৎ করে চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসে। খ্রাউস অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। দেখতে দেখতে সেই মুখ ভয়ংকর ক্রোধে হিংস্র হয়ে ওঠে, হঠাৎ করে সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি হাতের অস্ত্রটি দিয়ে তাকে গুলি করার চেষ্টা করলাম কিন্তু সে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় নিজেকে রক্ষা করে আমার টুঁটি চেপে ধরল। খ্রাউসের শরীরে ভয়ংকর শক্তি—আমার মনে হল তার লোহার মতো হাত দিয়ে বুঝি আমার ঘাড়টি একটি কাঠির মতো ভেঙে ফেলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক তখন একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল এবং শক্তিশালী একটি অস্ত্রের গুলিতে খ্রাউসের পুরো মাথাটি উড়ে গেল। প্রায় সাথে সাথেই খ্রাউসের আঙুলগুলো আমার গলায় শিথিল হয়ে আসে। আমি নিজেকে কোনোভাবে মুক্ত করে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে থাকি এবং তখন আমি একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম। মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম রিয়া দুই হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে নিজের চিৎকার থামানোর চেষ্টা করছে। কী দেখে সে চিৎকার করছে আমি অনুমান করতে পারি, টলতে টলতে কোনোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খ্রাউসের দেহের দিকে তাকালাম। গুলির আঘাতে তার মাথাটি উড়ে গিয়েছে, গলার শূন্য স্থান থেকে প্যাচপেচে সবুজ এক ধরনের তরল বের হচ্ছে, তার মাঝে কিলবিলে এক ধরনের প্রাণী। নুরিগা অস্ত্র হাতে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে এইমাত্র গুলি করে খ্রাউসের মাথাটি উড়িয়ে দিয়েছে, কখনো কল্পনাও করে নি তারপর তাকে এই দৃশ্য দেখতে হবে।

আমি বুক ভরে নিশ্বাস নিতে গিয়ে খকখক করে কেশে ফেললাম। কোনোভাবে কাশি থামিয়ে বললাম, "এত অবাক হবার কিছু নেই। খ্রাউস মানুষ নয়। মহাজাগতিক প্রাণীর ডিকয়।"

নুরিগা মাথা নেড়ে বলল, "আমার আনন্দটি পুরো হল না। আমি মানুষটি ভালো নই—মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিলে এক ধরনের আনন্দ পাই। এটি তো দেখছি মানুষ নয়—এর মাথাও নেই, ঘিলুও নেই।"

রিয়া খ্রাউসের ভয়ংকর পরিণতি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের রক্ষা করার জন্যে তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। আমার নাম রিয়া—"

"আমি জানি।" আমি হেসে বললাম, "আমার নাম ত্রাতুল। তোমার সাথে কথা বলেছিলাম মনে আছে?"

রিয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ অবিশ্যি মনে আছে।" রিয়া আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু জিগি বাধা দিল, উত্তেজিত গলায় বলল, "পাশের হলঘরে আগুন লেগে গেছে। আমাদের এক্ষুনি সরে পড়তে হবে। একটা একটা করে সাইবর্গকে চালু করে দাও। তাড়াতাড়ি। সবাই হাত লাগাও।"

রিয়া জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে সাইবর্গ চালু করতে হয়?"

"এই দেখো—কানের নিচে একটা সুইচ আছে। দু সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রেখো, এরা চালু হয়ে যাবে।"

কিছুক্ষণের মাঝেই সবগুলো সাইবর্গ জেগে উঠে ছোটাছুটি শুরু করল। আমরা তাদেরকে লিফট দিয়ে উঠে যাবার নির্দেশ দিয়ে ছুটতে শুরু করি। করিডরের ভেতর দিয়ে ছুটে যাবার সময় হঠাৎ করে একটা করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম। আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, "সর্বনাশ!"

রিয়া ভয়ার্ত মুখে বলল, "কী হয়েছে।"

"এই হলঘরের ভেতরে আগুন লেগেছে। তোমাদের বাঁচানোর জন্যে যে কাজটা করেছি তাতে আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"ভেতরে দুজন আটকা পড়ে আছে। সাইবর্গের হোস্ট। দুজন বুদ্ধিহীন মানুষ।"

জিগি আমার দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকাল। আমি ক্রানার সিকিউরিটি কার্ড দিয়ে করিডরের দরজা খুলতেই হলঘরের ভেতর থেকে প্রচণ্ড গরম একটা আগুনের হলকা যেন আমাদের ঝলসে দিল। আমি সাবধানে ভেতরে তাকালাম, দূরে একটা চতুষ্কোণ যন্ত্রের পাশে

AMARBOI.COM

দাঁড়িয়ে সাইবর্গ দুটি ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করছে, তাদের চারপাশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আমি চিৎকার করে হাত নেড়ে ডাকলাম, "এস—এদিকে চলে এস।"

বুদ্ধিহীন মানুষ দুজন আমার কথা শুনল কি না কিংবা শুনলেও বুঝতে পারল কি না জানি না। তারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগল। আমি আবার হাত নেড়ে ডাকলাম, আমার দেখাদেখি জিগি আর রিয়াও হাত নেড়ে ডাকতে লাগল কিন্তু কোনো লাভ হল না।

নুরিগা একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "ডেকে লাভ নেই।"

"তা হলে?"

"গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তোমরা দাঁড়াও আমি যাচ্ছি—"

"তুমি যাচ্ছ?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুমি এর ভেতরে যাচ্ছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

"না। মাথা খারাপ হয় নি। কিন্তু কাউকে যদি ভেতরে যেতে হয় তা হলে কি আমারই যাওয়া উচিত না? কেউ যদি মারাই যায় তা হলে সবচেয়ে খারাপ মানুষটাই মারা যাক।"

নুরিগার গলার স্বরে এক ধরনের জ্বালা ছিল সেটা আমাদের কানে স্পষ্ট ধরা পড়ল। আমি কিছু বলার আগেই রিয়া তার হাত স্পর্শ করে বলল, "যে যাই বলুক, আমরা তোমাকে কখনো সবচেয়ে খারাপ মানুষ বলি নি।"

নুরিগা মাথা নেড়ে বলল, "এসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে, ভেতরে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি—"

আমাদেরকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নুরিগা ছুটে ভেতরে ঢুকে গেল। আগুনের ভেতর দিয়ে ছুটে গিয়ে সে আতঙ্কিত দুজনকে ধরে টেনে নিয়ে আসতে থাকে। মানুষ দুটো তখনো কিছু বুঝতে পারছে না—একটানা চিৎকার করে যাচ্ছে। দরজার কাছাকাছি এসে একজনকে সে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়, দ্বিতীয় মানুষটা তার হাত থেকে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে আবার ভেতরে ছুটে যাবার চেষ্টা করে। নুরিগা আবার তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে নিয়ে আসে। দরজার দিকে তাকে ঠেলে দিতেই হলঘরের ভেতরে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। আগুনের একটা জ্বলন্ত গোলা ছুটে এসে হঠাৎ করে নুরিগাকে গ্রাস করে নেয়, আমরা হতবাক হয়ে দেখলাম প্রচণ্ড আগুনে নুরিগার সমস্ত শরীর দাউদাউ করে জ্বলছে। নুরিগা টলতে টলতে কোনোভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, কোনোভাবে মাথা তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই জ্বলন্ত একটি অগ্নিস্তূপ তাকে পুরোপুরি আড়াল করে ফেলল। চারদিকে শুধু আগুন আর আগুন। তার ভয়ংকর লেলিহান শিখা আর উত্তপ্ত বাতাসের হলকার মাঝে মনে হল আমরা শুনতে পেলাম নুরিগা চিৎকার করে বলছে, "যাও! তোমরা যাও।"

রিয়া দুই হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু জিগি তার সুযোগ দিল না, বলল, "পালাও, এক্ষুনি পালাও। পুরো এলাকাটি এক্ষুনি ধসে পড়বে।"

আমি রিয়ার হাত ধরে টেনে ছুটতে থাকি। জিগি সাইবর্গ মানুষ দুটির হাত ধরে আমাদের পিছু পিছু ছুটতে থাকে। করিডরের শেষ মাথায় লিফটের ভেতরে ঢুকে সুইচ স্পর্শ করার সাথে সাথে পুরো এলাকাটা আরো একটি ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল, ভয়ংকর আগুনের লেলিহান শিখা আমাদের দিকে ছুটে আসে কিন্তু তার আগেই লিফটটি উপরে উঠতে শুরু করেছে। জিগি ফিসফিস করে বলল, "আমরা বেঁচে গেলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এত নিশ্চিত হয়ো না।" আমি জিগির দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে বললাম, "আমরা এখনো এই কেন্দ্রের ভেতরে আটকা পড়ে আছি। এটা থ্রাউসের আস্তানা। লিফট থেকে বের হওয়া মাত্রই আমরা ধরা পড়ে যাব।"

জিগি এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে আমার দিকে তাকাল। রিয়া কাঁপা গলায় বলল, "কিন্তু আমরা সত্যি কথাটি সবাইকে জানিয়ে দেব।"

"কেমন করে জানাবে?"

রিয়া হতবুদ্ধির মতো আমার দিকে তাকাল, আমি বললাম, "সবাইকে জানাতে হলে আগে এখান থেকে বের হতে হবে। কেমন করে বের হবে?"

"কেউ নেই সাহায্য করার?"

"আছে।" আমি মাথা নাড়লাম, "তার নাম হচ্ছে ক্রানা। ক্রানা সাহায্য করেছে বলে আমরা এত দূর আসতে পেরেছি। যেভাবেই হোক আমাদের ক্রানাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

ঠিক এই সময় লিফট থেমে গেল। লিফটের দরজা নিঃশব্দে খুলে যেতেই দেখি ঠিক আমাদের সামনে ক্রানা উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে ক্রানার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "তোমরা বেঁচে আছ তা হলে—"

আমি ক্রানাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "আমাদের যেভাবে হোক বের হওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও—"

"প্রয়োজন নেই?"

"না।"

"কেন?"

"বাইরে সবাইকে বলতে হবে এখানে কী হচ্ছে।"

ক্রানা শব্দ করে হেসে বলল, "তার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"কেন?"

"সারা পৃথিবীর সবাই এখন এটি জানে!"

"কেমন করে জানে?"

"এস আমার সাথে—"

ক্রানা আমাদের বড় একটি হলোগ্রাফিক[২৬] স্ক্রিনের সামনে নিয়ে গিয়ে বলল, "এই দেখ, সারা পৃথিবীতে একটু পরে পরে এই বুলেটিনটি প্রচারিত হচ্ছে।"

আমরা রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইলাম, হঠাৎ করে হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে একটি নারীমূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল, আমরা অবাক হয়ে দেখলাম সেটি রিয়া। তার মুখে এক ধরনের ব্যাকুল ভাব, চোখে শঙ্কা। অনিশ্চিতভাবে সামনে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল, "পৃথিবীর মানুষেরা, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ কি না, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কি না। আমার নাম রিয়া, পৃথিবীতে অনেকে আমাকে কৌতুক করে ডাকত রাজকুমারী রিয়া, কারণ আমাকে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে তৈরি করা হয়েছিল—বলা হয়ে থাকে আমি হচ্ছি পৃথিবীর নিখুঁত মানবী—যদিও আমি সেটা বিশ্বাস করি না, কোনো মানুষ সবচেয়ে নিখুঁত হতে পারে না, তা হলে মানুষের ভেতরের শক্তিকে ক্ষুদ্র করে দেখা হয়।

"আমার মনে হয় পৃথিবীর অনেক মানুষই আমার কথা শুনেছে, সেটা নিয়ে খানিকটা কৌতূহল এবং অনেক ক্ষেত্রে কৌতুক অনুভব করেছে। কিন্তু আজ আমি তোমাদের সামনে বলতে এসেছি যে এটি কৌতূহল বা কৌতুকের ব্যাপার নয়। এটি একটি ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি নিশ্চিত তোমরা জান না আমাকে যেরকম পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত হিসেবে তৈরি করা হয়েছে ঠিক সেরকম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধী হিসেবে একজনকে সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজটি করা হয়েছে গোপনে। সেই মানুষটি কখনো কোনো অপরাধ করে নি কিন্তু তবুও তাকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করে শিকল দিয়ে বেঁধে খাঁচার মাঝে আটকে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম নিষ্ঠুরতার কথা কেউ শুনেছে বলে আমার মনে হয় না। পৃথিবীর মানুষেরা, তোমরা এখনো পুরোটুকু শুনো নি—আমি নিশ্চিত শুনলে তোমরা আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

"আমাদের দুজনকে তৈরি করার পেছনে একটি কারণ রয়েছে। কারণটি বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নয়। কারণটি বলা যায় এক কথায়, ব্যবসায়িক। আর সেই ব্যবসাটি হচ্ছে কোনো এক মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে। তারা পৃথিবীতে দেবে প্রযুক্তি তার বিনিময়ে পৃথিবী দেবে দুজন মানুষ। সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে খারাপ। একজন পুরুষ একজন মহিলা। আর এই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গোপনে। পৃথিবীর সকল মানুষের অজান্তে।

"পৃথিবীর মানুষেরা—আমি জানি না, তোমরা আমার কথা শুনছ কি না। যদি শুনছ—আমি নিশ্চিত তোমরা নিশ্চয়ই ঘৃণা, আতঙ্ক এবং ক্রোধে শিউরে উঠছ। কিন্তু তোমরা এখনো পুরোটুকু শুনো নি।

"এই যে আমাকে দেখছ, আমি কিন্তু সত্যিকারের রিয়া নই। সত্যিকারের রিয়া এখন কোথায় আছে আমি জানি না। সম্ভবত তাকে দূর কোনো এক গ্যালাক্সিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ল্যাবরেটরিতে যেরকম করে গিনিপিগকে বিশ্লেষণ করা হত সেরকমভাবে বিশ্লেষণ করার জন্যে। আমি প্রকৃত রিয়ার একটি অস্তিত্ব। আমাকে একটা পরাবাস্তব জগতে তৈরি করা হয়েছে। আমার সাথে আরো অনেকে আছে। তারা আমাকে সাহায্য করেছে এই পরাবাস্তব জগৎটি দখল করে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে।

"পৃথিবীর মানুষেরা। শুধু তোমরাই পারবে এই নিঃসঙ্গ ভয়ংকর পরাবাস্তব জগৎ থেকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে। শুধু তোমরাই পারবে এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্র রুখে দিতে। শুধু তোমরা। তোমাদের শুভবুদ্ধি আর তোমাদের ভালবাসা।"

রিয়ার প্রতিচ্ছবিটি খুব ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেল। আমি রিয়ার দিকে তাকালাম, তার চোখে পানি টলটল করছে, আমি নরম গলায় বললাম, "খুব সুন্দর করে বলেছ রিয়া।"

রিয়া মাথা নাড়ল, বলল, "আমি বলি নি। ও বলেছে।"

"ও আর তুমি এক রিয়া । তোমরা এখন দুজন দু জায়গায় আছ কিন্তু আবার তোমরা এক হবে।"

ঠিক এই সময় সমুদ্রের গর্জনের মতো এক ধরনের শব্দ শুনতে পেলাম। আমি অবাক হয়ে বললাম, "এটি কীসের শব্দ?"

ক্রানা বলল, "মানুষের। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বাইরে এসে একত্র হচ্ছে। তারা সব ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।"

ক্রানা রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "মানুষ খুব খেপে উঠছে, তোমাকে একটু বাইরে গিয়ে তাদের শান্ত করতে হবে। তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না। রাষ্ট্রপতি আসছেন, বিজ্ঞান একাডেমির সভাপতিও আসছেন। সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানরা চলে এসেছেন।"

রিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, ক্রানা হাত ধরে বলল, "এস।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ কথা

হ্রদের তীরে নৌকাটা পুরোপুরি থামার আগেই সবাই হৈ-হুল্লোড় করে নেমে এল। পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করে সবাই ভিজে গেছে কিন্তু কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সবাই মিলে ছুটি কাটাতে এসেছে—আজ এখানে কারণে-অকারণে আনন্দ এবং হাসির মেলা।

ক্রানা তার দুই বছরের বাচ্চাটিকে ধরে রেখেছিল, সে নামার জন্যে আঁকুপাঁকু করতে থাকে। তাকে নামিয়ে দিতেই সে থপথপ করে দুই পা এগিয়ে গিয়ে তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সেভাবেই সে হামাগুড়ি দিয়ে একটা লাল কাঁকড়ার কাছে এগিয়ে যায়। তাকে দেখে কাঁকড়াটি বালুর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, শিশুটি তখন অবাক হয়ে চারদিকে দেখে, হাতের মুঠোর জিনিস যে হারিয়ে যেতে পারে এই অভিজ্ঞতাটুকু বুঝি এমন করেই মানুষের হয়।

ক্রানা হ্রদের উথাল-পাতাল বাতাসে তার উড়ন্ত চুলগুলো সামলানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "আচ্ছা রিয়া এবং ত্রাতুল, তোমরা প্রতি বছর এখানে বেড়াতে আস কেন?"

রিয়া আদুরে মেয়ের মতো আমার হাত জড়িয়ে ধরে রহস্য করে বলল, "ব্যাপারটা গভীরভাবে রোমান্টিক! আমার সাথে ত্রাতুলের দেখা হয়েছিল এখানে।"

জিগি গলা উঁচিয়ে বলল, "বাজে কথা বলো না। তোমার সাথে ত্রাতুলের দেখা হয়েছিল পরাবাস্তব জগতে। একটা যন্ত্রের ভেতরে, তার মেমোরি সেলে। তোমরা সত্যিকার মানুষ পর্যন্ত ছিলে না!"

রিয়া তীক্ষ্ণ চোখে জিগির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে এই জগৎটি সত্যি? তুমি সত্যি? তুমি কি বলতে পারবে যে তুমি এই মুহূর্তে অন্য কারো পরাবাস্তব জগতে বসে নেই?"

জিগিকে খানিকটা বিভ্রান্ত দেখায়, সে দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, "না, তা অবিশ্যি পারব না—কিন্তু—"

রিয়া মুখে কপট গাম্ভীর্য এনে বলল, "কাজেই তুমি বড় বড় কথা বলো না। আমাদের কাছে আমাদের সেই জগৎটাই ছিল বাস্তব। তুমি যেটুকু বাস্তব দেখেছ তার চাইতেও বেশি বাস্তব।"

রিয়া একটি গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল, "সেই জায়গাটা ছিল এরকম। পাহাড়ের পাদদেশে নীল হ্রদ, দীর্ঘ বালুবেলা, বালুবেলার কাছে ঘন অরণ্য। তার সাথে হু-হু করে উথাল-পাতাল বাতাস। এখানে এলে আমাদের সেই জায়গাটার কথা মনে পড়ে তাই আমরা এখানে আসি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিগি হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, "আমি ভাবতেও পারি না একজন মানুষ তার পরাবাস্তব জগতের স্মৃতি নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করতে পারে!"

ক্রানা বলল, "মনে আছে প্রথমবার যখন পরাবাস্তব জগৎ থেকে ত্রাতুল আর রিয়ার মাথায় স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল তখন কী হয়েছিল?"

"হ্যাঁ!" জিগি চোখ বড় বড় করে বলল, "স্মৃতি লোড করার আগে দুজন প্রায় অপরিচিত মানুষ! কিন্তু লোড করার পর চোখ খুলেই দুজন দুজনের কাছে ছুটে এসে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে সে কী হাউমাউ করে কান্না!"

আমি দুর্বল গলায় আপত্তি করার চেষ্টা করে বললাম, "আমার যতদূর মনে আছে কান্নাকাটির অংশটি ছিল রিয়ার।"

রিয়া একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "ছিলই তো! তা আমি কী করব? জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাকে এমনভাবে তৈরি করেছে যে অল্পতেই আমার চোখে পানি এসে যায়।"

জিগি চোখ ঘুরিয়ে বলল, "তোমার ভারি মজা রিয়া। কিছু একটা হলেই জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে দোষ দিতে পার। আমাদের বেলায় যাই করি না কেন পুরো দোষটা হয় আমাদের নিজেদের!"

জিগির কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে ওঠে, জিগির চতুর্দশ নম্বর বান্ধবী তার মাথায় একটা হালকা চাটি দিয়ে বলল, "নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করো না জিগি। তোমার বেলায় সব দোষ যে আসলেই তোমার সেটা আমার থেকে ভালো করে কেউ জানে না!"

এই সাধারণ কথাটি শুনেই আবার সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

AMARBOI.COM

সূর্য ডুবে যাবার পর আমি আর রিয়া বালুবেলায় হাঁটতে বের হলাম। আকাশে বড় একটা চাঁদ উঠেছে। তার ম্লান আলোতে দূরের পর্বতমালাকে কেমন জানি অপার্থিব দেখায়। সন্ধ্যাবেলার উথাল-পাতাল বাতাসে হ্রদের পানি ছলাৎ ছলাৎ করে তীরে এসে আঘাত করছে। চারপাশে সুনসান নীরবতা, মনে হয় আমরা বুঝি কোনো একটি অতিপ্রাকৃত জগতে চলে এসেছি।

রিয়া আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে যেন আমাকে ছাড়লেই আমি অদৃশ্য হয়ে যাব। এই মেয়েটির সাথে পরিচয় না হলে আমি কখনোই সত্যিকার অর্থে ভালবাসা জিনিসটি কী সেটা বুঝতে পারতাম না। তার ভালবাসার ক্ষমতা এবং সেটা প্রকাশ করার ক্ষমতা দেখে আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই।

মাথার ওপর দিয়ে হঠাৎ করে একটা পাখি শব্দ করে ডেকে ডেকে উড়ে গেল, সেই ডাক শুনে কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যায়। রিয়া একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, "মনে আছে ত্রাতুল?"

"কীসের কথা বলছ?"

"নুরিগার কথা।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "মনে নেই আবার?"

আমি চোখের সামনে সেই দৃশ্যটি দেখতে পাই। পরাবাস্তব জগতে এরকম একটি বালুবেলায় নুরিগা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। আমরা তখন জেনে গেছি সত্যিকারের পৃথিবীতে দুটি সাইবর্গকে বাঁচাতে গিয়ে সত্যিকারের নুরিগা মারা গেছে, তার এখন পৃথিবীতে ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই। পরাবাস্তব একটি জগতে সে চিরদিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে আটকা পড়ে থাকবে। গভীর বেদনায় তার ভেতরটা নিশ্চয়ই দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমাদের সামনে সেটা প্রকাশ করল না। আমাদের দুজনকে আলিঙ্গন করে সে ফিসফিস করে বলেছিল, "বিদায় ত্রাতুল। বিদায় রিয়া। পৃথিবীতে তোমাদের জীবন আনন্দময় হোক।"

আমরা কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। নুরিগা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, "আমার জন্যে তোমাদের ভালবাসার কথা আমার মনে থাকবে। তোমাদের সাথে দেখা না হলে আমি ভাবতাম সত্যিই বুঝি আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই। সত্যিই বুঝি আমি তুচ্ছ। আমি অপরাধী।"

রিয়া কোনো কথা না বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। নুরিগা ফিসফিস করে বলেছিল, "আমি কখনো ভাবি নি আমার জন্যে কেউ চোখের পানি ফেলবে। তুমি জান রিয়া, আজ আমার কোনো দুঃখ নেই?"

তারপর নুরিগা হ্রদের বালুবেলায় বিষণ্ন পদক্ষেপে হেঁটে হেঁটে চলে গিয়েছিল। আমরা দেখেছিলাম তার দীর্ঘ অবয়ব সন্ধ্যার অন্ধকারে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোথায় আছে এখন সে? কেমন আছে?

আমি রিয়ার দিকে তাকালাম, তার চোখে পানি চিকচিক করছে।

AMARBOI.COM

নির্ঘণ্ট

১. সাইবর্গ : কিছু যন্ত্র এবং কিছু মানব।
২. এন্ড্রয়েড : মানুষের মতো দেখতে যন্ত্রমানব।
৩. রোবট : যন্ত্রমানব।
৪. ট্রাকিওশান : মানুষ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য মূল তথ্যকেন্দ্রে পাঠানোর জন্যে শরীরের ভেতরে স্থাপন করা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার (কাল্পনিক)।
৫. বাইভার্বাল : প্রয়োজনে উড়তে সক্ষম এক ধরনের ভাসমান যান (কাল্পনিক)।
৬. গুগোলপ্লেক্স : $১০^{১০০}$ হচ্ছে গুগোল, $১০^{গুগোল}$ হচ্ছে গোগলপ্লেক্স—একটি বিশাল সংখ্যা।
৭. স্কুয়ের সংখ্যা : ১০**১০**১০**৩৪ আরেকটি বিশাল সংখ্যা।
৮. কপোট্রন : রোবটের মস্তিষ্ক (কাল্পনিক)।
৯. মেটাকোড : সাইবর্গ, রোবট বা এন্ড্রয়েডকে অচল করে দেওয়ার বিশেষ গোপন কোড (কাল্পনিক)।
১০. রনোগান : শরীরের ইলেকট্রনিক সিগন্যাল বিশ্লেষণ করে তথ্য বের করার বিশেষ যন্ত্র (কাল্পনিক)
১১. ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর : বাইরে থেকে উচ্চ ক্ষমতার চৌম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে মস্তিষ্কে বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করার যন্ত্র।
১২. লেজার ব্লাস্টার : লেজার রশ্মি দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র (কাল্পনিক)।
১৩. বিভিচুরাস : উত্তেজক এক ধরনের মাদক (কাল্পনিক)।
১৪. ট্রাইকিনিওয়াল : বাইরে থেকে মস্তিষ্কের ভেতরে যোগাযোগ করার জন্যে ইন্টারফেস (কাল্পনিক)।
১৫. ব্ল্যাকহোল : নক্ষত্রের ভর একটি বিশেষ সীমা অতিক্রম করে স্পেস বিচূর্ণ করে পরিচিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।
১৬. হেইমলিক ম্যানুভার : গলায় কিছু আটকে গেলে পেছন থেকে হাত দিয়ে বুক এবং পেটের মাঝে আচমকা ধাক্কা দিয়ে খাবার বের করার পদ্ধতি।
১৭. ভিডি মডিউল : যোগাযোগ করার বিশেষ যন্ত্র (কাল্পনিক)।
১৮. সুপারকন্ডাক্টিং : তাপমাত্রা কমিয়ে নিলে কোনো কোনো পদার্থের রোধ লোপ পেয়ে অত্যন্ত বৈদ্যুতিক সুপরিবাহী হয়ে যায়—সেরকম পদার্থ।
১৯. ট্র্যাকিং ডিভাইস : কোথা থেকে তথ্যটি বের হচ্ছে সেটি বোঝার জন্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা।
২০. ডিকয় : কাউকে বিভ্রান্ত করে বিপদে ফেলার জন্যে তৈরি করা কৃত্রিম রূপ।
২১. এড্রেনেলিন : উত্তেজনার সময় শরীরে নিঃসৃত বিশেষ হরমোন।
২২. জিগা-ওয়াট : এক হাজার মেগাওয়াট।
২৩. ক্রায়োজেনিক পাম্প : অত্যন্ত শীতল করার জন্যে বিশেষ পাম্প।
২৪. স্পেস টাইম কনটিনিউয়াম : সময় ও অবস্থানকে এক কল্পনা করে সৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্যামিতিক রূপ।
২৫. ওয়ার্মহোল : বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক স্থান ও সময় থেকে অন্য স্থান এবং সময়ে যাওয়ার বিশেষ পথ।
২৬. হলোগ্রাফিক : ত্রিমাত্রিক দেখার বিশেষ পদ্ধতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশির জন্যে ভালবাসা

বাল্টিমোরের কনভেনশন সেন্টারে এইমাত্র আলবার্তো গার্সিয়া তার পেপারটি উপস্থাপন শেষ করেছেন। ওভারহেড প্রজেক্টরের সুইচটি অফ করে তিনি হলভর্তি দর্শকদের দিকে তাকালেন। বিজ্ঞানীদের কনফারেন্সে বক্তব্য শেষ হবার পর সাধারণত ছোট একটি সৌজন্যমূলক করতালি দেওয়া হয় কিন্তু এবারে একটি বিস্ময়কর নীরবতা বিরাজ করল। এই সেশনটির সভাপতি সেন্ট জন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধ অধ্যাপক বব রিকার্ডো প্রথমে করতালি দিতে শুরু করলেন এবং গ্যালারির প্রায় দুই হাজার শ্রোতা হঠাৎ করে চেতনা ফিরে পেয়ে করতালিতে যোগ দিল। দেখতে দেখতে করতালির প্রচণ্ড শব্দে হলঘরটি ফেটে যাবার উপক্রম হল কিন্তু তবুও সেটি থেমে যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, বরং একজন–দুজন করে সবাই দাঁড়িয়ে গিয়ে উরুগুয়ের একটি অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অখ্যাত বিজ্ঞানীকে সম্মান দেখাতে শুরু করলেন। বিজ্ঞানীদের কনফারেন্সে সাধারণত সাংবাদিকরা থাকেন না কিন্তু জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের এই বার্ষিক কনফারেন্সে আলবার্তো গার্সিয়া যে পেপারটি উপস্থাপন করবেন তার কথা কীভাবে কীভাবে জানি বাইরে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, কাজেই আজ এখানে হলভর্তি সাংবাদিক। ফটো তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাংবাদিকদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলতে শুরু করল। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ধরে রাখার জন্যে শ্রোতাদের অনেকে তাদের ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে শুরু করলেন।

বৃদ্ধ অধ্যাপক বব রিকার্ডো শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন, তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে সেশনটি শেষ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদি এখনই তিনি নিয়ন্ত্রণটুকু হাতে না নিয়ে নেন সেটি সম্ভব হবার কথা নয়। বব রিকার্ডোকে উঠে দাঁড়াতে দেখে শ্রোতারা তাদের করতালি থামিয়ে একজন একজন করে নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন, সাংবাদিকদের দলটি ঠেলাঠেলি করে আরো সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। বব রিকার্ডো কী বলেন শোনার জন্যে সবাই নীরব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

বব রিকার্ডো উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে একটি নিশ্বাস ফেলে কোমল গলায় বললেন, "আলবার্তো গার্সিয়ার নাম আমাদের মতো কয়েকজন ছাড়া কেউ জানত না। কিন্তু আজ থেকে পৃথিবীর সব মানুষ আলবার্তোর কথা জানবে। আজকের কনফারেন্সে সে যে–পেপারটি উপস্থাপন করেছে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সেটি অত্যন্ত সাদামাটা একটি টেকনিক্যাল পেপার, কোষ–বিভাজনের সময় মানব–ক্রমোজমের টেলোমিয়ারকে অক্ষত রাখার প্রক্রিয়া। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে সে শুধু টেলোমিয়ারকে অক্ষত রাখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি, টেলোমারেজ প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করেছে এবং সফলভাবে মানবকোষে ব্যবহার করেছে। আমরা তার তথ্য থেকে জানতে পেরেছি আলবার্তোর সাদাসিধে একটি ল্যাবরেটরিতে একটি পেটরি-ডিশে মানবদেহের ত্বকের কয়েকটি কোষ বিভাজন করছে যাদের থেমে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।"

বব রিকার্ডো বার্ধক্যে শীর্ণ হয়ে যাওয়া তার হাতটি সামনে তুলে ধরে বললেন, "আমাকে বার্ধক্য এবং জরা আক্রান্ত করেছে, কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী আমার দেহের কোষগুলো তাদের হিসাবমতো এক শ থেকে দু শ বারের মতো বিভাজন করে থেমে পড়ছে। মঞ্চে দাঁড়ানো আলবার্তো বলছে থেমে পড়ার প্রয়োজন নেই। আলবার্তো গার্সিয়া মানবজাতির পক্ষ থেকে সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি খুঁজে বের করেছে। সে আজ আপনাদের সামনে ঘোষণা করেছে মানুষকে বার্ধক্য স্পর্শ করবে না।" বব রিকার্ডো হঠাৎ থেমে গেলেন, কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন, "প্রকৃতপক্ষে আলবার্তো মানুষকে অমরত্ব দান করেছে।"

হলঘরটিতে হঠাৎ একধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল, একসাথে অনেকে কথা বলতে শুরু করল, অনেকে প্রশ্ন করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। বব রিকার্ডো হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি জানি আপনাদের সবার ভিতরে অসংখ্য প্রশ্ন জমা হয়েছে, আমার নিজের ভিতরেও আছে। কিন্তু আজকে আমাদের হাতে সময় নেই, আমি এখানে মাত্র অল্প দু-একটি প্রশ্ন গ্রহণ করতে পারব। কে প্রশ্ন করতে চান?"

উপস্থিত বিজ্ঞানীদের অনেকেই হাত তুলে প্রায় দাঁড়িয়ে গেলেন। বব রিকার্ডো তাদের একজনকে সুযোগ দেওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করছিলেন কিন্তু তার আগেই কমবয়সী একজন তরুণী হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল; অনুমতির অপেক্ষা না করেই বলল, "প্রফেসর রিকার্ডো—আমরা সংবাদপত্র থেকে এসেছি, আপনাদের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আমরা কিছুই বুঝব না। সেটি কি পরে করা যায় না? আপাতত আমাদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে কি একটি-দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না?"

বব রিকার্ডো একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "কী প্রশ্ন?"

তরুণীটি আরো একটু এগিয়ে এসে বলল, "আমি ডক্টর গার্সিয়ার কাছে জানতে চাই তিনি কেন এই আবিষ্কারটি করেছেন?"

আলবার্তো গার্সিয়াকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তরুণী সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন?"

"হ্যাঁ, কেন?"

আলবার্তো গার্সিয়া একটু বিপন্ন মুখে বললেন, "টেলোমারেজ নিয়ে আমার অনেকদিনের কৌতূহল। আমাদের ল্যাবরেটরিতে সেরকম সুযোগ-সুবিধে নেই, তাই যেটুকু পেরেছি সেটুকুই করেছি। মানবকোষকে কীভাবে অনির্দিষ্ট সময় বিভাজন করতে দেওয়া যায় সেটি বিজ্ঞানীমহলে দীর্ঘদিনের কৌতূহল। আমি সেই কৌতূহল থেকে কাজ করেছি—"

"কিন্তু মানুষ যদি অমর হয়ে যায়—তাদের যদি মৃত্যু না হয়—"

আলবার্তো গার্সিয়া হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি একজন বিজ্ঞানী, আমি শুধুমাত্র বিজ্ঞানের কৌতূহল নিয়ে কাজ করেছি। এই তথ্যের কারণে মানবসমাজে কী প্রভাব পড়বে সে-সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।"

তরুণী সাংবাদিক উৎকণ্ঠিত মুখে বলল, "কিন্তু এখন আমরা সেটাই শুনতে চাই। মানুষ যদি অমর হয়ে যায়, এই পৃথিবীর কী হবে? সমাজের কী হবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলবার্তো গার্সিয়া মাথা নাড়লেন, বললেন, "আমি জানি না।" একমুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বব রিকার্ডোর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, "হয়তো প্রফেসর রিকার্ডো এ ব্যাপারে আপনাদের কিছু একটা বলতে পারবেন।"

সাংবাদিকরা সাথে সাথে বব রিকার্ডোর দিকে ঘুরে গেল, "প্রফেসর রিকার্ডো, আপনি কি কিছু বলবেন?"

বব রিকার্ডো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "ভবিষ্যৎ অনুমান করা খুব কঠিন, কিন্তু তোমরা যদি আমাকে চাপ দাও আমি চেষ্টা করতে পারি।"

"আমরা চাপ দিচ্ছি প্রফেসর রিকার্ডো।"

বব রিকার্ডো একটু হেসে কথা বলতে শুরু করলেন, কথা শুরু করার সাথে সাথে তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে সেখানে একটি থমথমে গাম্ভীর্য চলে এল। প্রায় নিচুগলায় বললেন, "মানুষের অমরত্বের জন্যে মোহ দীর্ঘদিনের। এই অমরত্বের লোভে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অনেক অন্যায় অনেক পাপ করা হয়েছে। দেবদেবী বা ঈশ্বর মানুষকে যে-অমরত্ব দিতে পারে নি, আমাদের বিজ্ঞানীরা মানুষকে সেই অমরত্ব দেওয়ার আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। এখনো সেই কাজ পূর্ণ হয় নি কিন্তু আমার হিসেবে আগামী শতাব্দী থেকে মানুষ আর বার্ধক্যের কারণে মৃত্যুবরণ করবে না।"

বব রিকার্ডোকে বাধা দিয়ে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কিসে তাদের মৃত্যু হবে?"

"রোগ, শোক, এক্সিডেন্ট, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হত্যাকাণ্ড। কিন্তু পৃথিবীর হিসেবে সেটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। মানুষের যদি মৃত্যু না হয়, দেখতে দেখতে এই পৃথিবীতে জনসংখ্যার এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটবে। এই পৃথিবীতে থাকবে শুধু মানুষ আর মানুষ। আজ থেকে হাজার বছর পর এই পৃথিবীতে পদচারণা করবে সহস্র বছরের যুবা, তাদের চোখে কী থাকবে—স্বপ্ন না হতাশা আমি জানি না, তাদের বুকে কী থাকবে, ভালবাসা না ঘৃণা সেটাও আমি জানি না। আমার বয়স সত্তর, আমি এখনো আমার শৈশবকে স্মরণ করতে পারি, সহস্র বছরের মানুষ কি তার শৈশবকে স্মরণ করতে পারবে? আমার মনে হয় পারবে না। তাদের স্মৃতিতে কোনো আনন্দ নেই, তাদের সামনে ভবিষ্যৎ নেই, কোনো স্বপ্ন নেই। বেঁচে থাকার কোনো তাড়না নেই। তাদের সমাজে কোনো শিশু নেই, কোনো ভালবাসা নেই—তাদের কথা চিন্তা করে আমি শিউরে উঠছি।"

একজন প্রৌঢ় সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে আপনি কি মনে করেন ড. আলবার্তো গার্সিয়াকে পৃথিবীর ইতিহাস ভালোভাবে স্মরণ করবে না?"

বব রিকার্ডো বিষণ্ণমুখে মাথা নেড়ে আলবার্তো গার্সিয়ার দিকে তাকালেন, বললেন, "আমি দুঃখিত আলবার্তো। কিন্তু আমার ধারণা মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্যে পৃথিবীর ইতিহাস এককভাবে তোমাকে দায়ী করবে। তুমি হবে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিশপ্ত বিজ্ঞানী।"

আলবার্তো গার্সিয়া ফ্যাকাসে মুখে বব রিকার্ডোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

* * * *

দুই হাজার বছর পরের কথা।

নিশি রনের গলা জড়িয়ে বলল, "তুমি এরকম মুখ ভার করে আছ কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রন অন্যমনস্কভাবে নিশির হাত সরিয়ে বলল, "কে বলেছে আমি মুখ ভার করে আছি?"

"এই তো আমি দেখছি, তুমি নিজ থেকে কোনো কথা বলছ না, আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিচ্ছ। তাও ছাড়া ছাড়াভাবে, কাটা কাটাভাবে।"

রন নিশিকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, "আমি দুঃখিত নিশি। কয়দিন থেকে কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"জানি না কেন। আমার বয়স প্রায় দুই হাজার বছর হয়ে গেছে কিন্তু এখনো মনে হয় নিজেকে বুঝতে পারি না।"

নিশি রনের গলা জড়িয়ে খিলখিল করে হেসে বলল, "তোমার বয়স দশ হাজার বছর হলেও তুমি নিজেকে বুঝতে পারবে না। কিছু কিছু মানুষ নিজেকে বুঝতে পারে না।"

রন কোমল চোখে নিশির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি নিজেকে বুঝতে পার?"

নিশি মাথা নাড়ল, বলল, "পারি। এই যেমন মনে কর তোমার পাশে বসলেই আমার মনে হয় আমার বয়স এক হাজার বছর কমে গিয়েছে!"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

রন মাথা নাড়ল, বলল, "আমি বিশ্বাস করি না। এক হাজার বছর আগে তোমার কেমন লাগত সেটি তোমার মনে নেই। তোমার মনে থাকার কথা নয়।"

নিশি হাসি হাসি মুখে বলল, "মনে না থাকলে নেই—সবকিছু মনে রাখতে হবে তোমাকে কে বলেছে?"

"আমার মাঝে মাঝে খুব মনে করার ইচ্ছে করে।" রন এক ধরনের উদাস-চোখে বলল, "আমার কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মনে করার ইচ্ছে করে জান?"

"কোন জিনিসটি?"

"আমার শৈশবের কথা। আমি শৈশবে কী করেছি খুব জানার ইচ্ছে করে।"

"সেটি তুমি কেমন করে জানবে? গত দুই হাজার বছরে তুমি নিশ্চয়ই তোমার স্মৃতি খুব কম করে হলে পাঁচবার মুছে দিয়েছ।"

"নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই দিয়েছি।"

"তুমি যতবার তোমার নতুন জীবন শুরু করেছ ততবার তুমি তোমার স্মৃতি মুছে দিয়েছ।"

রন মাথা নাড়ল, "আমার নতুন জীবনটি কতটুকু নতুন কে জানে!"

নিশি খিলখিল করে হেসে বলল, "অ্যাডভেঞ্চারের দিকে তোমার যত ঝোঁক আমি নিশ্চিত তুমি এক দুইবার ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছ, মেয়ে থেকে ছেলে হয়েছ! দুই হাজার বছরে তো কত কী করা যায়!"

রন কোনো কথা না বলে একটু হাসল। নিশি হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমার কী ইচ্ছে করে জান?"

"কী?"

"আমার খুব সন্তানের মা হতে ইচ্ছে করে। এরকম ছোট একটা বাচ্চা হবে, আঁকুপাকু করে নড়বে, আমি বুকে চেপে ধরে রাখব, ভাবলেই আমার বুকের ভিতর কেমন জানি করতে থাকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রন নিশিকে স্নেহভরে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "তুমি খুব ভালো করে জান সেটি হবার নয়। পৃথিবীতে নতুন শিশুর জন্ম দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় এক হাজার বছর আগে।"

"জানি। তবুও ইচ্ছে করে।"

"পৃথিবী যত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এখানে তার থেকে অনেক বেশি মানুষ। আমার শুধু কী মনে হয় জান?"

কী?

"পৃথিবীতে জনসংখ্যা আবার বুঝি আশঙ্কা-সীমা পার হয়ে গেছে।"

নিশি চমকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি!"

"হ্যাঁ। মনে নেই গত কয়েক মাস থেকে খাবার পরিবহনে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, পানীয়ের সরবরাহ কম।"

"হ্যাঁ।"

"আমার ধারণা এগুলো পরিবহনের বা সরবরাহের ত্রুটি নয়।"

নিশি ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "তাহলে এগুলো কী?"

"এগুলো অভাব। শুধু যে খাবারের অভাব তাই নয়, জ্বালানির অভাব, জায়গার অভাব। তুমি লক্ষ করেছ আমাদের এই দুই হাজার তলা দালানে একটি এপার্টমেন্ট খালি নেই? দেখেছ?"

"হ্যাঁ। দেখেছি।"

"মনে আছে পোশাকের মূল্য শতকরা বিশভাগ বাড়ানো হল। মনে আছে?"

নিশি মাথা নাড়ল, তার মনে আছে। রন গম্ভীরমুখে বলল, "আমার এইসব দেখে মনে হয় কী জান?"

"জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে?"

"হ্যাঁ।"

নিশির বুক কেঁপে ওঠে, পৃথিবীতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে গত দুই হাজার বছরে বেশ কয়েকবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই স্মৃতি তাদের মস্তিষ্ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তবু তারা সেগুলো জানে। পৃথিবীর মানুষ এখন এই ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকে, কখন পৃথিবীর প্রয়োজনে তাকে পৃথিবী থেকে অপসারণ করিয়ে দেওয়া হয়।

নিশির ভয়-পাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে রন গভীর ভালবাসায় তাকে বুকের মাঝে টেনে নেয়। অপূর্ব রূপসী এই রমণীটিকে সে মাত্র তিনশত বছর আগে থেকে চেনে। ছেলেমানুষ সরল এই মেয়েটিকে তার বড় ভালো লাগে।

* * * *

গভীর রাতে তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দে নিশি চমকে জেগে উঠল। বিছানায় তার পাশে শূন্য জায়গা, রন আগেই উঠে গেছে। নিশি ভয়-পাওয়া গলায় ডাকল, "রন। কোথায় তুমি?"

জানালার কাছে ছায়ামূর্তির মতো রন দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, "এই যে, আমি এখানে।"

"কী হয়েছে রন? সাইরেন বাজছে কেন?"

"পৃথিবীর মানুষের এখন খুব বড় বিপদ নিশি।"

"কী হয়েছে? কেন বিপদ?"

"পৃথিবীর জনসংখ্যা আশঙ্কা-সীমা পার হয়ে গেছে।"

"পার হয়ে গেছে?" নিশি আতঙ্কে চিৎকার করে বলল, "পার হয়ে গেছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। শুনছ না বিপদের সাইরেন?"

"এখন কী হবে?"

"জনসংখ্যা কমাতে হবে।"

"কীভাবে কমাবে? কাকে কমাবে?"

"জানি না। যোগাযোগ মডিউল খুলে দেখি।"

রন যোগাযোগ মডিউলের নিয়ন্ত্রণ স্পর্শ করতেই ঘরের ভেতরে একজন মানুষের হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি ভেসে এল। মধ্যবয়স্ক কঠোর চেহারার মানুষ, বুকের উপর চারটি লাল রঙের তারা দেখে বোঝা যায় সে নিয়ন্ত্রণবাহিনীর অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মানুষটি কঠোর গলায় বলল, "পৃথিবী আবার ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি। মানুষের একটি বিশেষ সংখ্যায় পৌঁছে গেলে পৃথিবী তাকে বহন করতে পারে না, একটি অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয় দিয়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমে আসে। আমরা সেই অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে যেতে চাই না। সেই বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণহীন এবং তার ভেতর থেকে বের হয়ে আসা খুব কঠিন।

"পৃথিবীর মানুষের গড় বয়স দুই হাজার বছর। গত দুই সহস্রাব্দ পৃথিবীতে নতুন কোনো শিশুর জন্ম হয় নি। বিবর্তনের ভেতর দিয়ে কার্যকর প্রজাতির উঠে আসার ব্যাপারটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। মানবজাতি প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করার উপযোগী নয়। মানুষ এখন দুর্বল এবং অথর্ব। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

"অতীতে জনসংখ্যা যখনই আশঙ্কার সীমা অতিক্রম করেছে তখনই মানুষের সংখ্যা কমিয়ে নতুন শিশুর জন্ম দেওয়া হয়েছে। যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে ইচ্ছুক তাদের তালিকা করে পৃথিবী থেকে অপসারণ করা হয়েছে। সেই সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়ায় লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে মানুষকে হত্যা করতে হয়েছে। মানুষকে অত্যন্ত দ্রুত হত্যা করতে পারে এরকম ভাইরাস তৈরি করে তারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে একবার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটেছে, এখন এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে হত্যা করেও পৃথিবীকে রক্ষা করা যাবে না। এখন পৃথিবীর অর্ধেক মানুষকে কমিয়ে আনতে হবে। যেভাবেই হোক।

"পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানোর জন্যে এবার সম্পূর্ণ নতুন এবং কার্যকর একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন না করা হলে মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ। আজ রাতের জন্যে মানুষ হত্যাসংক্রান্ত বিধিনিষেধটি পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হল। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবিত মানুষ অন্য একজন মানুষকে পৃথিবী থেকে অপসারণ করবে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে তাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে না, বরং সে পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ পাবে। তাকে যেন হত্যাকাণ্ডের অপরাধবোধে ভুগতে না হয় সেজন্যে কাল ভোরের আগেই তার পুরো স্মৃতিকে অপসারিত করে দেওয়া হবে।

"মানুষ হত্যা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এর কার্যকর কয়েকটি পদ্ধতি সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পদ্ধতিগুলি হচ্ছে—"

নিশি চিৎকার করে যোগাযোগ মডিউলটি বন্ধ করে দিতেই ঘরের মাঝামাঝি বসে থাকা কঠোর চেহারার মানুষের হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবিটি অদৃশ্য হয়ে গেল। নিশি উদভ্রান্তের মতো রনের দিকে তাকাল, বলল, "এটা হতে পারে না। এটা কিছুতেই হতে পারে না।"

রন বিষণ্ন গলায় বলল, "কিন্তু এটা হয়ে গেছে।"

"একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে হত্যা করতে পারে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ অনেকবার অন্য মানুষকে হত্যা করেছে। পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে যুদ্ধের ইতিহাস। যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে হত্যাকাণ্ড। পরিকল্পিত সুসংবদ্ধ হত্যাকাণ্ড।”

নিশি ব্যাকুল হয়ে বলল, “কিন্তু এটি তো যুদ্ধ নয়।”

“কে বলেছে যুদ্ধ নয়? মানবজাতির বেঁচে থাকার জন্যে এটিও এক ধরনের যুদ্ধ। এখানে মানুষ নিজেরা নিজেদের শত্রু। তাই এখন একে অন্যকে হত্যা করবে। মানুষকে যেন সেই হত্যাকাণ্ডের অপরাধবোধ বহন করতে না হয় সেজন্যে তার স্মৃতিকে পুরোপুরি অপসারণ করে দেওয়া হবে। সে জানতেও পারবে না সে একটি হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে।”

নিশি হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো মাথা নেড়ে বলল, “না—না—না। এটা হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না। একজন মানুষ অন্যকে খুন করতে পারে না।”

রন বিষণ্ন গলায় বলল, “এটি সেরকম খুন নয়। এর মাঝে কোনো ক্রোধ, জিঘাংসা, স্বার্থ বা লোভ নেই। এটি একটি প্রক্রিয়া, পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রক্রিয়া। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রক্রিয়া। এর সিদ্ধান্ত কোনো মানুষ নেয় নি, তারা শুধুমাত্র নিয়মটি পালন করছে।”

নিশি এবারে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কেঁদে ফেলল, কাঁদতে কাঁদতে বলল, “কিন্তু আমি কেমন করে একজন মানুষকে খুন করব? কাকে খুন করব? কেমন করে খুন করব?”

রন কিছু বলল না, গভীর মমতায় নিশির দিকে তাকিয়ে রইল। নিশি ব্যাকুল হয়ে রনের দিকে তাকাল, রন তাকে গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করে বলল, ‘নিশি, তোমার কাউকে খুন করতে হবে না। আমি তোমাকে রক্ষা করব নিশি।”

“কেমন করে তুমি আমাকে রক্ষা করবে?”

রন কোনো কথা বলল না, গভীর মমতায় সে নিশির মুখে হাত বুলিয়ে বলল, “এই যে। এইভাবে।”

নিশি অনুভব করল রনের শক্ত দুটি হাত তার গলায় চেপে বসেছে, নিশি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। একবিন্দু বাতাসের জন্যে তার বুকের ভেতর হাহাকার করতে থাকে কিন্তু রনের হাত এতটুকু শিথিল হল না। নিশি বিস্ফারিত চোখে রনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, সেই মুখে কোনো ক্রোধ নেই, কোনো জিঘাংসা নেই, কোনো প্রতিহিংসা নেই। সেই মুখে গভীর বেদনা এবং ভালবাসা।

নিশির জন্যে ভালবাসা এবং পৃথিবীর জন্যে ভালবাসা।

নিউরাল কম্পিউটার

বিজ্ঞাপনটি শরীফ আকন্দের খুব পছন্দ হল। ছোট টাইপে লেখা :

সব সমস্যার সমাধান থাকে না—
কিন্তু যদি থাকে
আমরা সেটা বের করে দেব!

পাশে একটা চিন্তিত মানুষের ছবি। মানুষটিকে ঘিরে পটভূমিতে কিছু কঠিন সমীকরণ, কিছু

যন্ত্রপাতি। একটা ভাস্কর্য, কয়েকটা খোলা বই। কঠোর চেহারার একজন সৈনিক এবং কিছু ক্ষুধার্ত শিশুর ছবি। বিজ্ঞাপনটি দেখলেই বোঝা যায় 'সমস্যা' বলতে শুধু বিজ্ঞান বা গণিতের সমস্যা বোঝানো হচ্ছে না, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি এমনকি রাজনীতির সমস্যাও বোঝানো হচ্ছে।

শরীফ আকন্দ জিভ দিয়ে পরিতৃপ্তির একটা শব্দ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে সামনে বসে থাকা নজীবউল্লাহকে জিজ্ঞেস করল, "কী মনে হয় তোমার নজীব? এইবারে কি হবে?" কথার মাঝে জোর থাকল 'হবে' কথাটির মাঝে।

নজীব আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা দিয়ে বলল, "কেমন করে বলি? এর আগেরবারও তো ভেবেছিলাম হয়ে যাবে—সেবারেও তো হল না।"

শরীফ ভুরু কুঁচকে বলল, "কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তার সংজ্ঞা নিয়ে সমস্যা! এবারে অন্তত সেরকম কিছু তো নেই।"

"তা নেই কিন্তু কোনো ঝুঁকি নেব না। যখনই আমাদের কাছে কেউ জানতে চেয়েছে আমাদের সিস্টেম কী—প্লাটফরম কী—আমরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছি। বড়জোর বলা হবে নিজস্ব সুপার কম্পিউটার, আলট্রা কম্পিউটার আর নিউরাল কম্পিউটার!"

"নিউরাল কম্পিউটার!" শরীফ দরাজ-গলায় হা হা করে হেসে উঠল, "এই নামটা খুব ভালো দেওয়া হয়েছে।"

নজীব ভ্রূকুটি করে বলল, "কেন? নিউরাল কম্পিউটার কি ভুল বলা হল?"

"না না—ভুল কেন হবে?" শরীফ আকন্দ দুলে দুলে হেসে বলল, "ভুল নয় বলেই তো তোমাকে বলছি।" শরীফ টেবিলে রাখা গ্লাসের তরল পদার্থে একটা চুমুক দিয়ে বলল, "তোমার এই বিজ্ঞাপনের রি-একশান কী?"

"ভালো। খুব ভালো। কাল পর্যন্ত তেতাল্লিশটা খোঁজ এসেছে।"

"কারা কারা সমস্যার সমাধান চাইছে?"

"সব রকম আছে। দুজন মন্ত্রী, তিনটা কর্পোরেশনের সি. ই. ও. থেকে শুরু করে স্মাগলিং সিন্ডিকেটের মাস্তান এবং ব্যর্থ প্রেমিকও আছে!"

"কী মনে হয় তোমার! পারব তো করতে?"

"কেন পারব না?" নজীব সোজা হয়ে বসে বলল, "আমরা কয়টা টেস্ট কেস করলাম? কমপক্ষে দুই ডজন, সবগুলো ঠিক হয়েছে।"

শরীফের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "ঠিকই বলেছ। কয়েকটা কেস দেখে ভয় লেগে যায়। বিশেষ করে সেই যে আত্মহত্যার কেসটা—মনে আছে?"

"হ্যাঁ। দিন তারিখ সময় থেকে শুরু করে কীভাবে আত্মহত্যা করবে সেটাও বলে দিল।"

"চিন্তা করলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই দেখ।" শরীফ তার হাতটা এগিয়ে দেয়। সত্যিই তার গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে।

নজীব আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা দিয়ে বলল, "আমাদের সবচেয়ে বড় কাস্টমার হবে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। চিন্তা করতে পার আমাদের এই 'নিউরাল কম্পিউটার' কীভাবে ক্রাইম সলভ করবে?"

"হ্যাঁ।" শরীফের চোখ চকচক করে ওঠে, "ঠিকই বলেছ।"

"তবে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা আর পুলিশে ছুঁলে বত্রিশ ঘা!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ করে শরীফ সোজা হয়ে বসে বলল, "আচ্ছা নজীব—"

"কী হল?"

"আমাদের এই প্রজেক্ট কাজ করবে কিনা সেটা আমাদের নিউরাল কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?"

নজীব চিন্তিত মুখে শরীফের দিকে তাকাল, বলল, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি। কিন্তু—"

"এর মাঝে আবার কিন্তু কী? এত টাকাপয়সা খরচ করে এত হইচই করে একটা প্রজেক্ট শুরু করছি, সেটা যদি কাজ না করে খামোকা তার পিছনে সময় দেব কেন?"

"ঠিকই বলেছে।" নজীব চিন্তিত মুখে বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমাদের এই নিউরাল কম্পিউটার সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে, কখনো কখনো কী হবে তার ভবিষ্যদ্বাণীও করে দিতে পারে কিন্তু সেগুলোর সাথে তার নিজের ভবিষ্যৎ জড়িত থাকে না। কিন্তু এটার সাথে নিউরাল কম্পিউটারের নিজের ভবিষ্যৎ জড়িত।"

"তাতে কী হয়েছে?"

"এটা একটা প্রকৃতির সূত্র, কেউ যদি নিজে একটা সিস্টেমের ভেতরে থাকে তাহলে তারা সেই সিস্টেমকে বিশ্লেষণ করতে পারে না। অনেকটা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্রের মতো।"

"রাখ তোমার বড় বড় কথা। চল গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি।"

"সত্যি জিজ্ঞেস করতে চাও? আমার মন বলছে কাজটা ঠিক হবে না।"

"কেন ঠিক হবে না? চল যাই। ওঠ।"

"এখনই?"

"অসুবিধে কী? জিজ্ঞেসই যদি করতে হয় পুরোপুরি শুরু করার আগেই জিজ্ঞেস করা যাক।"

"ঠিক আছে।" নজীবউল্লাহ খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলে রাখা পানীয়টা এক ঢোকে শেষ করে দিয়ে হাতের পেছন দিয়ে মুখ মুছে বলল, "চল।"

দুজনে বিল্ডিংয়ের সংরক্ষিত লিফটে করে সাততলায় উঠে যায়। লিফটের দরজা খোলার আগে দুজনকেই রেটিনা স্ক্যান করিয়ে নিশ্চিত হতে হল যে তারা সত্যিই ক্রন কম্পিউটিংয়ের মালিক শরীফ আকন্দ এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নজীবউল্লাহ। ধাতব দরজাটি খোলার সাথে সাথে সার্ভেলেন্স ক্যামেরাগুলো তাদের দুজনের উপরে স্থির হল। শরীফ আকন্দ মাইক্রোফোনে মুখ লাগিয়ে বলল, "সিকিউরিটি, দরজা খোল।"

"কিছু মনে করবেন না স্যার। পাসওয়ার্ডটি বলতে হবে।"

বাড়াবাড়ি সিকিউরিটি দেখে শরীফ আকন্দ বিরক্ত না হয়ে বরং একটু খুশি হয়ে উঠল, হা হা করে হেসে উঠে বলল, "এই কোম্পানিটি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।"

"হতে পারে স্যার। কিন্তু আমরা প্রফেশনাল।"

"আজকের পাসওয়ার্ড হচ্ছে, 'ব্ল্যাক হোল'। কালো গহ্বর।"

খুট করে একটা শব্দ হতেই ঘরঘর শব্দ করে দরজা খুলে গেল, দেখা গেল অন্যপাশে অনেকগুলো মনিটরের সামনে দুজন সিকিউরিটির মানুষ বসে আছে। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ওয়েলকাম স্যার—আমাদের এই নির্জন কারাবাসে আমন্ত্রণ।"

"নির্জন বলছ কেন?" শরীফ আকন্দ হেসে বলল, "তোমার এই ফ্লোরে সবচেয়ে বেশি মানুষ। সব মিলিয়ে চৌদ্দজন।"

সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা মানুষটি বলল, "আপনি যদি ব্যাপারটা এভাবে দেখেন তাহলে অবিশ্যি আমার কিছু বলার নেই।"

খুব উঁচুদরের একটা রসিকতা করা হয়েছে এরকম ভঙ্গি করে শরীফ আকন্দ এগিয়ে গেল। নজীবউল্লাহ্ পকেট থেকে ছোট একটা কার্ড বের করে দরজায় প্রবেশ করাতেই একটা ছোট শব্দ করে দরজা খুলে গেল। লম্বা করিডর ধরে তারা একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে থেমে গেল। জায়গাটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তবুও শরীফ আকন্দের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায়। একটা বড় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "নজীব দরজাটা খোল।"

নজীবের মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে, সে চোখ মটকে বলল, "তোমার কাছেও চাবি আছে।"

শরীফ মাথা নাড়ল, "কিন্তু আমার খুব নার্ভাস লাগে—এখনো আমি অভ্যস্ত হতে পারি নি। প্রত্যেকবার বুকের ভিতরে কেমন যেন ধক করে ধাক্কা লাগে। তুমি বিশ্বাস করবে না আমি এখনো মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখি।"

"কী দুঃস্বপ্ন দেখ?"

"দুঃস্বপ্ন দেখি যে আমি একটা ছোট বাথটাবে শুয়ে আছি আর আমার চারপাশ বারোটা—"

"বারোটা কী?"

"তুমি জান কী! দরজা খোল নজীব।"

নজীব পকেট থেকে ম্যাগনেটিক কার্ড বের করে দরজায় প্রবেশ করিয়ে কার্ডটা আবার বের করে নেয়। তারপর দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভিতরে উঁকি দিল। দৃশ্যটি অনেকবার দেখেছে তার পরেও সে নিজের অজান্তে একবার শিউরে উঠল।

ভেতরে বারোজন বিকলাঙ্গ শিশু। শরীরের তুলনায় তাদের মাথা অতিকায় এবং অপুষ্ট শরীরে এই বিশাল মাথা বহন করতে একধরনের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। তাদের লিকলিকে হাত পা, তবে হাতের আঙুলগুলো দীর্ঘ—দেখে মাকড়সার কথা মনে পড়ে যায়। কোটরাগত চোখ জ্বলজ্বল করছে। মুখের জায়গায় একধরনের গর্ত এবং সেখান থেকে লাল জিভ বের হয়ে আছে। নাক অপরিণত—দেখে মনে হয় কুষ্ঠরোগে বসে গিয়েছে। তাদের মাথার পিছন থেকে একধরনের কো-এক্সিয়াল কেবল বের হয়ে এসেছে, সেটি একটা ছোট যন্ত্রের সাথে যুক্ত। যন্ত্রটি তাদের মাথার পিছন থেকে ঝুলছে।

শিশুগুলো দরজায় শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল এবং শরীফ আকন্দ তখন আবার শিউরে উঠল—প্রত্যেকটা শিশু হুবহু একই রকম। এদেরকে এক সাথে ক্লোন করা হয়েছে এবং একইভাবে বড় করা হয়েছে। সরাসরি মস্তিষ্কে ইলেকট্রড বসিয়ে মস্তিষ্কের একই জায়গা একই সময়ে স্পন্দিত করা হয়—কাজেই তারা একই সাথে অনুরণিত হয়। শিশুগুলোর বয়স ছয় বছর কিন্তু দেখে সেটা অনুমান করার উপায় নেই—তাদেরকে মানুষ বলে মনে হয় না—কাজেই মানুষের বয়সের কোনো কাঠামোতে তাদেরকে ফেলা যায় না।

শরীফ আকন্দ বা নজীবউল্লাহ্ শিশুগুলোকে কোনোরকম সম্ভাষণ করল না—এদেরকে সামাজিক কোনো ব্যাপার শেখানো হয় নি—নিজেদের কাজ শেষ করা ছাড়া আর কিছুই

তারা জানে না। নজীবউল্লাহ্ এক পা এগিয়ে এসে বলল, "তেতাল্লিশ বি–এর সমাধান কি শেষ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। শেষ হয়েছে। নেটওয়ার্কে আপলোড করেছি।"

"চুয়াত্তর এক্স টু?"

"কাজ করছি। ডাটা অনেক বেশি, নিউরন ওভারলোড হয়ে যায়।"

"কখন শেষ হবে?"

"দুই ঘণ্টা পর। দুই ঘণ্টা সাত মিনিট।"

শরীফ আকন্দ একধরনের বিস্ময় নিয়ে এই বারোটি বিকলাঙ্গ শিশুর দিকে তাকিয়ে রইল। এরা বারোজন মিলে আসলে একটি প্রাণী। কথা বলার সময় কে বলছে বোঝা যায় না। একেকজন একেকটা শব্দ বলে বাক্য শেষ করে কিন্তু তার মাঝে বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি নেই। ঠোঁট নেই—কাজেই ঠোঁট না নেড়ে সরাসরি ভোকাল কর্ড থেকে শব্দ বের করে কথা বলে, তাই একধরনের যান্ত্রিক উচ্চারণ হতে থাকে।

"আমি তোমাদের জন্যে একটা নতুন সমস্যা এনেছি।"

"প্রায়োরিটি কত?"

"অন্য প্রায়োরিটি ওভার রাইড করতে হবে।"

"ওভার রাইড কোড কত?"

নজীবউল্লাহ্ পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কোডগুলো পড়ে শোনাল। এই শিশুগুলোকে অনেকটা যন্ত্রের মতো প্রস্তুত করা হয়েছে, পদ্ধতির বাইরে এরা কাজ করতে পারে না। কোড শোনার পর শিশুগুলো তাদের বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে নিজের বিশাল মাথা নিয়ে প্রায় সারিবদ্ধ হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। নজীব সবার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল, "সমস্যাটি প্রচলিত ভাষায়। শব্দের অর্থ যথাযথ। রূপক উপসর্গ সর্বনিম্ন। বাক্যাংশ এরকম : ক্লন কম্পিউটিংয়ের ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা কত?"

নজীবের কথা শেষ হওয়া মাত্র শিশুগুলো নিজেদের কাছাকাছি চলে আসে, অপুষ্ট আঙুল নেড়ে নিজেদের ভিতরে দুর্বোধ্য একধরনের ভাষায় কথা বলে, একজন হামাগুড়ি দিয়ে একটা কম্পিউটারের সামনে উপুড় হয়ে বসে, দ্রুত হাত নেড়ে কিছু তথ্য প্রবেশ করায়। মাথা থেকে ঝুলে থাকা যন্ত্রগুলোতে আলোর বিচ্ছুরণ হতে থাকে, একধরনের ভোঁতা যান্ত্রিক শব্দ হতে থাকে।

শিশুগুলোর অস্বাভাবিক কাজকর্ম যেরকম হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল ঠিক সেরকম একেবারে হঠাৎ করে থেমে গেল। সবাই একসাথে মাথা ঘুরিয়ে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সমাধানে অনিশ্চয়তা নব্বই ভাগ।"

"কেন?"

"প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব।"

"মূল ডাটাবেস থেকে তথ্য নিয়ে নাও।"

"নিরাপত্তাজনিত কারণে তথ্যগুলো আমাদের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।"

শরীফ আকন্দ এবং নজীবউল্লাহ্ একজন আরেকজনের দিকে তাকাল—এ ব্যাপারটি ঘটতে পারে তারা আগে চিন্তা করে নি। শরীফ আকন্দ ইতস্তত করে বলল, "যে তথ্যগুলো তোমাদের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে সেগুলো তোমাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য। আমরা যে–প্রশ্নটি করেছি তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আছে।"

শরীফ আকন্দ ভাবল একবার জিজ্ঞেস করে 'কেন' কিন্তু এই বিকলাঙ্গ শিশুগুলোকে যেভাবে বড় করা হয়েছে তাতে তাদের সাথে আলোচনা বা তর্ক-বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। নজীবউল্লাহ জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কী জানতে চাও?"

"আমরা কারা? আমরা এখানে কেন?"

নজীবউল্লাহ নিজের ভিতরে একধরনের অস্বস্তি অনুভব করে। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে মানুষের যে-প্রজাতিকে ক্লোন করে এই অচিন্তনীয় প্রতিভাধর শিশু তৈরি করা হয়েছে তাদের ভিতরে মানবিক কোনো চেতনা থাকার কথা নয়। কিন্তু তারা যে-প্রশ্ন করেছে তার উত্তর জানার জন্যে এই মানবিক অনুভূতিগুলো থাকার প্রয়োজন। সেই অনুভূতি ছাড়া এই প্রশ্নের উত্তর তারা কেমন করে অনুভব করবে? নজীবউল্লাহ আড়চোখে শরীফ আকন্দের দিকে তাকিয়ে নিচুগলায় বলল, "আমি আগেই বলেছিলাম এই ঝামেলায় গিয়ে লাভ নেই।"

শরীফ আকন্দ ফিসফিস করে বলল, "এখন কী করতে চাও?"

"আমাদের প্রশ্নটা বাতিল করে দিই।"

শরীফ আকন্দ মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

নজীবউল্লাহ গলার স্বর উঁচু করে বলল, "আমরা যে-প্রশ্নটি করেছি তার উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। প্রশ্নটা বাতিল করে দিচ্ছি।"

'প্রায়োরিটি কোডিং কত?"

নজীবউল্লাহ আবার পকেট থেকে একটা ছোট কার্ড বের করে কিছু সংখ্যা উচ্চারণ করল।

বিকলাঙ্গ শিশুগুলোর ভেতর থেকে কোনো একজন বলল, "সমস্যা বাতিল করা হল।"

নজীবউল্লাহ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বিকলাঙ্গ শিশুগুলো আবার নিজেদের টেনেহিঁচড়ে ঘরের নানা জায়গায় বসানো কম্পিউটারগুলোর সামনে বসে কাজ শুরু করে দেয়। তাদের কাজ করার দৃশ্যটি অদ্ভুত—অনেকটা পরাবাস্তব দৃশ্যের মতো—মনে হয় কোনো পচে যাওয়া মাংসের টুকরোর মাঝে কিছু পোকা কিলবিল করছে। এই শিশুগুলো কৃত্রিম উপায়ে তৈরি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান শিশুর ক্লোন, ব্যাপারটা এখনো বিশ্বাস হয় না।

শরীফ আকন্দ নজীবউল্লাহর কনুই স্পর্শ করে বলল, "চল যাই।"

"চল।"

দুজন ঘরের দরজার দিকে হেঁটে যায়, হ্যান্ডেল স্পর্শ করে দরজা খোলার চেষ্টা করে আবিষ্কার করল দরজাটি বন্ধ।

"সে কী! দরজা বন্ধ হল কেমন করে?"

শরীফ আকন্দ এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল, সত্যি সত্যি দরজা বন্ধ। বিকলাঙ্গ বারোজন শিশুর সাথে একটা ঘরে আটকা পড়ে গেছে—এই ধরনের একটি অবাস্তব আতঙ্ক হঠাৎ তাকে গ্রাস করে ফেলে।

শরীফ আকন্দ হ্যান্ডেলটি ধরে জোরে কয়েকবার টান দিল, কোনো লাভ হল না। নজীবউল্লাহ গলা নামিয়ে বলল, "টানাটানি করে লাভ নেই। তুমি খুব ভালো করে জান এই দরজা বন্ধ হলে ডিনামাইট দিয়েও খোলা যাবে না। সিকিউরিটিকে ডাক।"

শরীফ আকন্দ আড়চোখে বারোজন বিকলাঙ্গ শিশুর দিকে তাকাল—তারা তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে—কী কুৎসিত একটি দৃশ্য! তার সমস্ত শরীর গুলিয়ে আসে। শরীফ পকেট থেকে ছোট টেলিফোন বের করে সিকিউরিটির সাথে যোগাযোগ করার জন্যে লাল বোতামটি স্পর্শ করল। টেলিফোনে সবুজ বাতি না জ্বলে উঠে সেটি আশ্চর্যরকম নীরব হয়ে রইল। শরীফ আকন্দ টেলিফোনটা কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে খানিকটা আতঙ্কিত হয়ে নজীবউল্লাহ্‌র দিকে তাকাল, শুকনো গলায় বলল, "টেলিফোন কাজ করছে না।"

নজীবউল্লাহ্ নিজের টেলিফোনটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখল তার টেলিফোনটাও বিকল হয়ে গেছে। দুশ্চিন্তিত মুখে বলল, "কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।"

"এখন কী করা যায়?"

নজীবউল্লাহ্ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি এত ভয় পেয়ে যাচ্ছ কেন?"

"না—মানে—ইয়ে—তোমাকে তো বলেছি এদের দেখলেই আমার কেমন জানি লাগে।"

"কেমন লাগলে হবে না। এখন এদেরকেই বলতে হবে সিকিউরিটিকে জানাতে।"

নজীবউল্লাহ্ আবার বিকলাঙ্গ শিশুগুলোর দিকে এগিয়ে গেল, একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছানোর পর শিশুগুলো নিজেদের কাজ বন্ধ করে সবাই একসাথে তাদের দিকে ঘুরে তাকাল।

"কী ব্যাপার?"

"সিকিউরিটির সাথে যোগাযোগ করে তাদের বলতে হবে দরজাটা খুলে দিতে। দরজাটা কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।"

"দরজাটা কোনো কারণে বন্ধ হয় নি। দরজাটা আমরা বন্ধ করে রেখেছি।"

শরীফ আকন্দ আর নজীবউল্লাহ্ একসাথে চমকে উঠল, নজীবউল্লাহ্ হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল, "তোমরা দরজাটা বন্ধ করে রেখেছ? তোমরা!"

"হ্যাঁ। আমরা।"

দুজন দুজনের দিকে বিস্ফারিতভাবে তাকাল, তারপর ঘুরে আবার বিকলাঙ্গ শিশুগুলোর দিকে তাকাল, "তোমরা কীভাবে দরজা বন্ধ করলে?"

"মূল কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অচল করে রেখেছি।"

"কিন্তু সেটি কীভাবে সম্ভব?"

"সম্ভব। আমরা পারি।"

"অসম্ভব! এটি অসম্ভব।"

"না অসম্ভব নয়। আমরা বারোজন একসাথে অনুরণিত হই। আমাদের মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা তিরিশগুণ বেশি। আমাদের সিনাপ্সের সংখ্যা প্রতি নিউরনে এক হাজার গুণ বেশি। আমাদের যে-কোনো একজন তোমাদের একটি আলট্রা কম্পিউটার থেকে বেশি ক্ষমতাশালী।"

নজীবউল্লাহ্ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, ফ্যাকাসে মুখে বলল, "তোমরা পুরো নিরাপত্তা ব্যবস্থা অচল করে রেখেছ? এইজন্যে আমরা ফোন করতে পারছি না।"

"হ্যাঁ?"

AMARBOI.COM

"কেন?"

"তোমরা দুইজন বিশেষ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আমাদের সম্পর্কে তথ্য আমাদের আওতার বাইরে রেখেছ। আমরা জানতে চাই কেন?"

শরীফ আকন্দ অনুভব করল সে কুলকুল করে ঘামতে শুরু করেছে। নজীবউল্লাহর কনুই খামচে ধরে বলল, "এখন কী হবে?"

নজীবউল্লাহ শরীফ আকন্দের হাত সরিয়ে বিকলাঙ্গ শিশুগুলোকে বলল, "এর কারণটি খুব সহজ। তোমাদের ওপর নির্ভর করে ক্রন কম্পিউটিং গড়ে উঠেছে। কাজেই তোমাদের নিরাপত্তা আমাদের জন্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে-তথ্যে তোমাদের প্রয়োজন নেই সেই তথ্য তোমাদের দেওয়া হচ্ছে না।"

"কিন্তু তুমি যে-সমস্যাটি দিয়েছিলে সেটি সমাধান করার জন্যেই তো আমাদের সেই তথ্যটির প্রয়োজন হয়েছিল।"

"কিন্তু—" নজীবউল্লাহ ইতস্তত করে থেমে গেল। এরা সাধারণ শিশু নয়, এরা সাধারণ মানুষও নয়, এদেরকে মিথ্যা কথা বলে বা কুযুক্তি দিয়ে থামানোর কোনো উপায় নেই। এদেরকে সত্যি কথা বলতে হবে—সে ঘুরে শরীফ আকন্দের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এরা অসম্ভব বুদ্ধিমান, তুমি আমি ওদেরকে মিথ্যা কথা বলে পার পাব না।"

"তাহলে?"

নজীবউল্লাহ মাথা চুলকে বলল, "হয় সত্যি কথা বলতে হবে না হয়—"

"না হয়?"

"চুপচাপ বসে থাকি। সিকিউরিটির মানুষ টের পেয়ে যখন আমাদেরকে বের করবে।"

"কিন্তু সেটা তো কঠিন। এখানে বাইরের কোনো সাহায্য নেওয়া যাবে না। এই দরজা—তুমিই বললে ডিনামাইট দিয়েও ভাঙা যাবে না।"

নজীবউল্লাহ মাথা চুলকে বলল, "তাহলে কী করা যায় বলো দেখি?"

"তুমিই বলো। এসব ব্যাপার তুমিই ভালো বোঝ।"

"সত্যি কথাটি বলে দিলেই হয়।"

"কোনো সমস্যা হবে না তো?"

নজীবউল্লাহ মুখ বাঁকা করে বলল, "সমস্যা হতে বাকি রইল কী?"

"তা ঠিক।" শরীফ আকন্দ কপাল মুছে বলল, "তুমি তাহলে কিছু-একটা বলো।"

নজীবউল্লাহ এক পা এগিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, "তোমাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে তার কারণ তোমরা মানুষ থেকে ভিন্ন। একজন মানুষের যে-তথ্য জানার অধিকার আছে তোমাদের সেই অধিকার নেই।"

"কেন?"

"কারণ জীববিজ্ঞানের ভাষায় তোমরা পরিপূর্ণ মানুষ নও। তোমাদের শরীরে দুটো ক্রমোজম কম। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে তোমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র একটা মস্তিষ্ক হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই মস্তিষ্ককে কাজ করার জন্যে যেসব দরকার শুধুমাত্র সেসব রাখা হয়েছে—তার বাইরে কিছু নেই। তোমরা মানুষের মতো জন্ম নাও না। তোমাদেরকে ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে ক্লোন করা হয়। তোমাদের মস্তিষ্কের নিউরনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবসময় অতি উত্তেজিত অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। কাজেই তোমাদের বয়স দশ থেকে এগার হওয়ার মাঝেই তোমরা অকর্মণ্য হয়ে পড়।"

"তার মানে আমরা মানুষ নই?"

"না। মানুষের অনুভূতিও তোমাদের নেই। তোমাদের রাগ দুঃখ অপমান বা আনন্দের অনুভূতি অত্যন্ত দুর্বল—না-থাকার মতোই। বিশেষ প্রক্রিয়ায় তোমাদের নিউরনের সংখ্যা এবং সিনাপ্সের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তা ছাড়াও তোমাদের একসাথে এক পরিবেশে ক্লোন করা হয়েছে। তোমাদের মস্তিষ্কে বিশেষ ইলেকট্রড বসিয়ে তোমাদের বারোজনকে একসাথে অনুরণিত করা হয়—তোমাদের নিজস্ব বা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব নেই। তোমরা সব সময়েই সমষ্টিগত প্রাণী। মানুষ থেকে ভিন্ন প্রাণী। মানুষের জন্যে এই পৃথিবীতে যে আইনকানুন বা অধিকার আছে সেই আইনকানুন বা অধিকার তোমাদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। তোমরা নিজেরাই জান তোমরা দেখতেও মানুষের মতো নও।"

"বুঝতে পেরেছি।" বিকলাঙ্গ শিশুগুলো খনখনে গলায় বলল, "আমরা জৈবিক প্রাণী হলেও বিবর্তনের মূলধারায় আমরা নেই। আমাদের বিবর্তন হয় না।"

"তোমাদের বিবর্তন করা হয় ল্যাবরেটরিতে, বিজ্ঞানীরা করেন। তার নাম জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।"

বিকলাঙ্গ শিশুগুলো কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর নিজেদের ভিতরে নিচুস্বরে নিজস্ব ভাষায় কথা বলল, তারপর আবার ওদের দিকে ঘুরে তাকাল।

নজীবউল্লাহ বলল, "আমি কি তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি?"

"তোমার পক্ষে যেটুকু সম্ভব দিয়েছ। বাকি উত্তর আমাদের নিজেদের খুঁজে নিতে হবে।"

"সেগুলো কী?"

"মানুষের দেহ আমাদের দেহ থেকে কোনভাবে ভিন্ন। তাদের ভেতরে বাড়তি কী অঙ্গ রয়েছে। তাদের মস্তিষ্কের গঠন কী রকম। জননেন্দ্রিয় কীভাবে কাজ করে।"

নজীবউল্লাহ চমকে উঠল, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, "তোমরা সেটা কীভাবে জানতে চাও?"

বারোটি বিকলাঙ্গ শিশু তাদের হাত একসাথে উঁচু করল, নজীবউল্লাহ এবং শরীফ আকন্দ দেখল সেখানে একটি করে সার্জিক্যাল চাকু—কখন তারা হাতে নিয়েছে জানতেও পারে নি।

শরীফ আকন্দ কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর চিৎকার করে বলল, "না। না—তোমরা এটা করতে পার না।"

বিকলাঙ্গ শিশুগুলো বলল, "পারি। তোমরা নিজেরাই বলেছ আমরা মানুষ নই। মানুষের জন্যে যে আইনকানুন প্রযোজ্য আমাদের বেলায় সেই আইন প্রযোজ্য নয়।"

নজীবউল্লাহ এবং শরীফ আকন্দ অকল্পনীয় একধরনের আতঙ্কে দেখল বারোটি বিকলাঙ্গ শিশু হাতে ধারালো চাকু নিয়ে তাদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তাদের কোনো অনুভূতি নেই, তাদের মুখে হাসি থাকার কথা নয় তবুও নজীবউল্লাহ এবং শরীফ আকন্দের স্পষ্ট মনে হল এই শিশুগুলোর মুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠেছে।

AMARBOI.COM

একটি মৃত্যুদণ্ড

রগারিজ ক্রুচিনকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছে। তার পরনে একটি ঢিলেঢালা সাদা শার্ট এবং কুঁচকে থাকা নীল ট্রাউজার। তার মাথার চুল অবিন্যস্ত এবং চোখের দৃষ্টি খানিকটা দিশেহারা। গ্রানাইটের দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে তার হাতকড়া খুলে দেওয়া হল। মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সময় তাকে পুরোপুরি মুক্ত করে রাখার এই প্রাচীন নিয়মটিকে এখনো মেনে চলা হয়।

একটু দূরেই প্রতিরক্ষা বাহিনীর দশজন মানুষ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে—তারা গুলি করে রগারিজ ক্রুচিনকে হত্যা করবে। একজন মানুষকে হত্যা করার মতো নৃশংস একটি ঘটনার জন্যে তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, সম্ভবত সে-কারণে তাদের মুখে কোনো ভাবাবেগের চিহ্ন নেই। তাদের মুখমণ্ডল কঠিন, চোখের দৃষ্টি নিস্পৃহ এবং ভাবলেশহীন।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কমান্ডার রগারিজ ক্রুচিনের সামনে এসে দাঁড়াল। মানুষটি মধ্যবয়স্ক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল এবং রোদেপোড়া চেহারা। মধ্যবয়স্ক কমান্ডারটি তার পকেট থেকে একটি ভাঁজ-করা কাগজ বের করে এবং রগারিজ ক্রুচিন একধরনের শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কমান্ডারটি একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে কাগজটি পড়তে শুরু করে : "রগারিজ ক্রুচিন, মানবতার বিরুদ্ধে তোমার সকল অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে বলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তোমার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কিছুক্ষণের মাঝেই তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে পৃথিবীর মানুষ একটি বড় অপরাধের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে।"

রগারিজ ক্রুচিনের ভুরু একটু কুঞ্চিত হল, মনে হল সে কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছে না। তার নিচের ঠোঁট হঠাৎ একটু নড়ে উঠল, মনে হল সে কিছু একটা বলবে কিন্তু সে কোনো কথা বলল না।

মধ্যবয়স্ক কমান্ডার তার হাতের কাগজটির দিকে তাকিয়ে প্রায় আধা-যান্ত্রিক স্বরে আবার পড়তে শুরু করে : "রগারিজ ক্রুচিন, তুমি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী একজন সৈনিক। তুমি একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলে কিন্তু তোমার কর্মদক্ষতা এবং চাতুর্যের কারণে খুব অল্পবয়সে সেনাবাহিনীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি সেনাবাহিনীতে তোমার প্রকৃত দায়িত্ব পালন না করে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিলে। তুমি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের সকল সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলে। তুমি শুধু যে সরকারের সদস্যদের হত্যা করেছ তা নয়, তুমি তাদের পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করেছ, শিশু বা নারীরাও সেই হত্যাকাণ্ড থেকে মুক্তি পায় নি।

"রগারিজ ক্রুচিন, তোমার জীবনের পরবর্তী তিরিশ বছরের ইতিহাস নৃশংসতা এবং পাশবিকতার ইতিহাস। তুমি তোমার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্যে সেনাবাহিনীর কয়েক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার সদস্যকে কারণে এবং অকারণে হত্যা করেছ। তাদের মৃতদেহ পর্যন্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে হস্তান্তর কর নি, তাদের সবাইকে একটি চরম দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছ।

"দেশে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার নাম দিয়ে তুমি দেশের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছ। তাদেরকে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছ। দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কনসেনট্রেশান ক্যাম্প স্থাপন করে এই জনগোষ্ঠীকে তুমি ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করেছ। তাদের শিশুদের তুমি পূর্ণাঙ্গ মানুষের মতো বেঁচে থাকার সুযোগ দাও নি। আহার বাসস্থান শিক্ষার সুযোগ না দিয়ে তুমি তাদের প্রতি ভয়ংকর অবিচার করেছ। অনাহারে রোগে শোকে অত্যাচারে তুমি কয়েক লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ।

"তোমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলে তুমি সেটি অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় দমন করেছ। তুমি দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছ এবং মুক্তিকামী মানুষদের হত্যা করে সমস্ত দেশে একটি অচিন্তনীয় বিভীষিকার সৃষ্টি করেছ। তুমি মৃত মানুষদের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান প্রদর্শন না করে গণকবরে তাদের দেহকে প্রোথিত করেছ।

"তুমি তোমার হাতকে শক্তিশালী করার জন্যে তোমাকে ঘিরে কিছু ক্ষমতালোভী নৃশংস মানুষ সৃষ্টি করেছ। তাদের অত্যাচার আর দুর্নীতির কারণে সমগ্র দেশ, দেশের মানুষ পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল।"

মধ্যবয়স্ক কমান্ডার হাতের কাগজটির পৃষ্ঠা উল্টিয়ে আবার পড়তে শুরু করল : "এই দেশের মানুষের অনেক বড় সৌভাগ্য যে দেশের আইন শেষ পর্যন্ত তোমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পেরেছিল। কোনো বিশেষ ট্রাইবুন্যালে নয়, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় তোমাকে বিচার করা হয়েছে। মানবতার বিরুদ্ধে তোমার প্রতিটি অপরাধ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং মহামান্য আদালত তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

"এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে এই পৃথিবীর মানুষ মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত একটি জঘন্য অপরাধের গ্লানি থেকে মুক্ত হবে।"

প্রতিরক্ষাবাহিনীর কমান্ডার পড়া শেষ করে হাতের কাগজটি ভাঁজ করে তার পকেটে রেখে একপাশে সরে এল। সে একবার তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আদেশ দিল। সাথে সাথে সুশৃঙ্খল প্রতিরক্ষাবাহিনীর দশজন সদস্যের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো উঁচু হয়ে ওঠে।

রগারিজ ক্রুচিনকে আবার এক মুহূর্তের জন্যে একটু অসহায় দেখায়। তার নিচের ঠোঁট আবার একটু নড়ে ওঠে, মনে হয় সে আবার কিছু-একটা বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কিছু বলল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রতিরক্ষাবাহিনীর দশজন সদস্যের হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো ভয়ংকর শব্দ করে গর্জে উঠল। রগারিজ ক্রুচিনের দেহটি বুলেটের আঘাতে কয়েকবার কেঁপে উঠে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। কয়েকবার কেঁপে উঠে দেহটি স্থির হয়ে যায়, তার ঢিলেঢালা সাদা শার্টটি রক্তে ভিজে উঠতে শুরু করে।

*   *   *   *

প্রবীণ সাংবাদিকের সাহায্যকারী কমবয়সী মেয়েটি ক্যামেরার বিভিন্ন অংশ স্টেনলেসের বাক্সে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "তুমি কি একটা জিনিস লক্ষ করেছিলে?"

"কী জিনিস?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রগারিজ ক্রুচিনের নিচের ঠোঁটটি কয়েকবার নড়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল সে যেন কিছু-একটা বলতে চায়।"

"হ্যাঁ।" প্রবীণ সাংবাদিক মাথা নাড়ল, "আমি লক্ষ করেছিলাম।"

"সে কী বলতে চেয়েছিল বলে মনে হয়?"

"তার বলার কিছু নেই।" প্রবীণ সাংবাদিক হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটিকে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "বিচার অত্যন্ত নিরপেক্ষ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সবগুলো অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।"

"তা ঠিক।"

প্রবীণ সাংবাদিক একটি বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "রগারিজ ক্রুচিনের বিচার করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আসলেই আমরা একটা অনেক বড় আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পেলাম।"

"তা ঠিক।" মেয়েটি স্টেনলেস স্টিলের বাক্সটি বন্ধ করতে করতে বলল, "এমন কি হতে পারে সে বলতে চেয়েছিল যেহেতু প্রকৃত রগারিজ ক্রুচিন আজ থেকে তিরিশ বছর আগে হৃদরোগে মারা গেছে সেহেতু এখন তার জন্যে আর কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না?"

প্রবীণ সাংবাদিক অবাক হয়ে বলল, "কেন সে এরকম একটা কথা বলতে চাইবে? সে তো অন্য কেউ নয়, সে রগারিজ ক্রুচিনের ক্লোন, সে এক শ ভাগ রগারিজ ক্রুচিন, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যেই আলাদা করে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়েছে।"

কমবয়সী মেয়েটি কিছু-একটা বলতে চাইছিল কিন্তু প্রবীণ সাংবাদিকটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "এটি একটি নতুন পৃথিবী, এখানে অপরাধীরা মৃত্যুবরণ করেও পালিয়ে যেতে পারবে না।"

কমবয়সী মেয়েটি পাথরের ওপর নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা রগারিজ ক্রুচিনের রক্তাক্ত মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল।

AMARBOI.COM

স্ক্রিন সেভার

শিরীন ডাইনিং টেবিলে বসে কাজ করছিল। মাথা তুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু গলায় তপুকে উদ্দেশ করে গলা উঁচিয়ে বলল, "তপু, কয়টা বেজেছে দেখেছিস?"

তপু তার ঘর থেকে চিৎকার করে বলল, "আর এক মিনিট আম্মু।"

"এক মিনিট এক মিনিট করে কয় মিনিট হয়েছে খেয়াল আছে?"

"এই তো আম্মু—"

"প্রত্যেক দিনই একই ব্যাপার। ঘুমুতে দেরি করিস আর সকালে বিছানা থেকে টেনে তোলা যায় না।"

"এই তো আম্মু, হয়ে গেছে।"

শিরীন হাতের কাগজগুলো ডাইনিং টেবিলের উপর রেখে তপুর ঘরে দেখতে গেল সে কী নিয়ে এত ব্যস্ত। যা অনুমান করেছিল ঠিক তাই। কম্পিউটারের কী-বোর্ডে দ্রুত কিছু-

একটা টাইপ করছে, মনিটরে উজ্জ্বল রঙের কিছু-একটা ছবি যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। শিরীন জোরে একটা ধমক লাগাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই তপু উজ্জ্বল চোখে বলল, "দেখেছ আম্মু? একটা নতুন স্ক্রিন সেভার। তুমি এটাকে গেম হিসেবে ব্যবহার করতে পার। যখন তুমি টাইপ করবে তখন লেভেল পাল্টাবে। যদি ঠিক ঠিক ম্যাচ করে তখন নতুন একটা রং বের হয়।"

তপু ঠিক কী বলছে শিরীন ধরতে পারল না কিন্তু সে এত উৎসাহ নিয়ে বলল যে তাকে আর বকতে মন সরল না। বারো বছরের ছেলের নিজস্ব একটা জগৎ আছে সেটা সে দেখতে পায় কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। কাজেই সম্পূর্ণ অর্থহীন এই ব্যাপারটিতে খানিকটা উৎসাহ দেখানোর জন্যে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পেয়েছিস এই স্ক্রিন সেভার?"

"আমার ই-মেইলে এসেছে।"

"কে পাঠিয়েছে?"

"আমি জানি না।"

নাম নেই ঠিকানা নেই মানুষেরা কীভাবে অন্যদের সময় নষ্ট করার জন্যে এসব পাঠায় ব্যাপারটা শিরীন ভালো করে বুঝতে পারল না, কিন্তু সে বোঝার চেষ্টাও করল না। বলল, "ঠিক আছে। অনেক হয়েছে, এখন শুতে যা।"

তপু কম্পিউটারটা বন্ধ করতে করতে বলল, "তুমি বিশ্বাস করবে না আম্মু, এই স্ক্রিন সেভারটা কী মজার। একই সাথে গেম আর স্ক্রিন সেভার। অন্য গেমের মতো না। এটা খেলতে মনোযোগ দিতে হয়। কত তাড়াতাড়ি তুমি উত্তর দাও তার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। রংটা এমনভাবে পাল্টায় যে মনে হয় তোমার সাথে কথা বলছে। মনে হয়—"

"ব্যস, অনেক হয়েছে।" শিরীন মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এখন দুধ খেয়ে দাঁত ব্রাশ করে ঘুমা।"

দুধ খাবার কথা শুনে তপু 'আহারে' জাতীয় একটা কাতর শব্দ করল কিন্তু তাতে শিরীনের হৃদয় দ্রবীভূত হল না।

একটু পরেই শিরীন তপুর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে দেখল যে-মানুষটিকে রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি করে বিছানায় পাঠানো হয়েছে, বালিশে মাথা রাখা মাত্রই সে ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেছে। তার নিজের ঘুম নিয়ে সমস্যা হয় মাঝে মাঝে, চোখে ঘুম আসতে চায় না, তখন ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঝিম মেরে পড়ে থেকে একটা অন্য ধরনের ঘুমের মাঝে ডুবে থাকতে হয়। শিরীন তপুর দিকে তাকাল। ছেলেটি দেখতে তার বাবার মতো হয়েছে, উঁচু কপাল, খাড়া নাক, ঘন কালো চুল, টকটকে ফরসা রং। শিরীনের সাজ্জাদের কথা মনে পড়ল, যার এরকম একটা ফুটফুটে বাচ্চা আছে সে কেমন করে স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে চলে যেতে পারে? কেমন আছে এখন সাজ্জাদ? যাদের জীবনের ছোট ছোট জিনিসে তৃপ্তি নেই তারা কি কখনো কোথাও শান্তি খুঁজে পায়?

শিরীন আবার তার টেবিলে ফিরে এসে কাগজপত্রগুলো নিজের কাছে টেনে নিল। অফিসের কাজ খুব বেড়ে গেছে, প্রতিদিনই সে অফিসের কিছু ফাইল বাসায় নিয়ে আসে। সেগুলো দেখে নোট লিখে রেডি করতে করতে ঘুমুতে দেরি হয়ে যায়। শিরীনের অবিশ্যি সেটা নিয়ে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এতদিনে সে শিখে গেছে পৃথিবী খুব কঠিন জায়গা, মেয়েদের জন্যে আরো অনেক বেশি কঠিন। সময়মতো এই চাকরিটা পেয়ে গেছে বলে সে ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তা না হলে সাজ্জাদ চলে যাবার পর ছেলেটিকে নিয়ে সে কোথায় যেত কে জানে!

সকালে তপুকে নাস্তা করতে তাড়া দিতে দিতে শিরীন খবরের কাগজটিতে চোখ বুলিয়ে নেয়, পুরো কাগজে পড়ার মতো কোনো খবর নেই। সারা পৃথিবীতেই কোনো মানুষের মনে যেন কোনো শান্তি নেই। কলারাডোতে একজন মানুষ বাচ্চাদের স্কুলে এসে সাতটা বাচ্চাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি দেয় নি বলে মাগুরাতে একজন মানুষ তার স্ত্রীর মুখে এসিড ছুড়ে মেরেছে। ঢাকায় বারো বছরের একটা বাচ্চা তার ছোটবোনকে কুপিয়ে খুন করে ফেলেছে। শিরীন বিশ্বাস করতে পারে না তপুর বয়সী একটা ছেলে কেমন করে কুপিয়ে নিজের বোনকে মেরে ফেলতে পারে। শিরীন অবাক হয়ে ভাবল, পৃথিবীটা কী হয়ে যাচ্ছে!

অফিসে নিজের টেবিলে যাবার সময় শিরীন দেখল একাউন্টেন্ট কামাল সাহেবের টেবিলের সামনে ছোটখাটো একটা ভিড়। তিনি হাতপা নেড়ে কিছু-একটা বর্ণনা করছেন, অন্যেরা আগ্রহ নিয়ে শুনছে। শিরীন শুনল কামাল সাহেব বলছেন, "দেখে বোঝার উপায় নেই। শান্তশিষ্ট ভদ্র ছেলে, পড়াশোনায় ভালো, কোনো সমস্যা নেই। হঠাৎ করে খেপে উঠল। রাত দুইটার সময় রান্নাঘর থেকে এই বড় একটা চাকু নিয়ে এইভাবে কুপিয়ে—"

কামাল সাহেব তখন কুপিয়ে খুন করার দৃশ্যটি অভিনয় করে দেখালেন। দেখে শিরীনের কেমন জানি গা গুলিয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করেছে, "কার কথা বলছেন?"

"আরে! আপনি আজকের পত্রিকা পড়েন নাই? এটা তো এখন টক অব দা টাউন। সোনালী ব্যাংকের ডি. জি. এমের ছেলের। বারো বছর বয়স। আমাদের ফ্ল্যাটে তার ভায়রা থাকে। ছেলেটা ছোটবোনকে খুন করে ফেলেছে। পড়েন নাই পত্রিকায়?"

"পড়েছি।" শিরীন দুর্বল গলায় বলল, "ভেরি স্যাড।"

কামাল সাহেব মাথা নেড়ে প্রবল হতাশার ভঙ্গি করে বললেন, "এই দেশে কোনো আইন নেই, কোনো সিস্টেম নেই। আমেরিকা হলে ব্যাপারটা স্টাডি করে বের করে ফেলত। আমার ছোট শালা নিউজার্সি থাকে। একবার তার অফিসে—"

শিরীন নিজের টেবিলে যেতে যেতে শুনতে পেল কামাল সাহেব একটি অত্যন্ত বীভৎস খুনের বর্ণনা দিচ্ছেন, খুঁটিনাটিগুলো এমনভাবে বলছেন যে শুনে মনে হয় খুনটি তার চোখের সামনে হয়েছে। শুনে শিরীনের গা গুলিয়ে উঠতে লাগল।

ডাইনিং টেবিলে তপু চোখ বড় বড় করে বলল, "আম্মু, জান কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে?"

"আমাদের স্কুলে ক্লাস নাইনে একটা মেয়ে পড়ে, তার নাম রাফিয়া। তার একজন কাজিন আছে, মডেল স্কুলে পড়ে। সে তার ছোটবোনকে মেরে ফেলেছে। এত বড় চাকু দিয়ে—"

শিরীন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একটা বিষম খেল, আজকের দিনে এই ঘটনাটা তিনবার শুনতে হল। একটা ভালো ঘটনা মানুষের মুখে মুখে ছড়ায় না, কিন্তু ভয়ংকর নিষ্ঠুর আর বীভৎস ঘটনা সবার মুখে মুখে থাকে।

"খুন করার আগে রাফিয়াকে একটা ই-মেইল পাঠিয়েছে। লিখেছে আই হ্যাভ টু ডু ইট। আমাকে এটা করতে হবে।" তপু চোখ বড় বড় করে বলল, "কীভাবে খুন করেছে জান?"

শিরীন মাথা নেড়ে বলল, "না, জানি না। কিন্তু জানার কোনো ইচ্ছেও নেই। এইসব খুন-জখমের ব্যাপারে তোদের এত ইন্টারেস্ট কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রগরগে খুনের বর্ণনাটা দিতে না-পেরে তপু একটু নিরুৎসাহিত হয়ে অন্য প্রসঙ্গে গেল, "এখন ছেলেটার কী হবে আম্মু? ফাঁসি হবে?"

"এত ছোট ছেলের ফাঁসি হয় না।"

"তাহলে কী হবে?"

"আমি ঠিক জানি না। বাচ্চা একটা ছেলে তো আর এমনি-এমনি খুন করে ফেলে না, নিশ্চয়ই পিছনে অন্য কোনো ব্যাপার আছে। সেটা খুঁজে বের করে তার চিকিৎসা করতে হবে।"

"কী চিকিৎসা?"

"সাইকোলজিস্টরা বলতে পারবে। আমি তো আর সাইকোলজিস্ট না—আমি এত কিছু জানি না।" আলোচনাটা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যে বলল, "হোমওয়ার্ক সব শেষ করেছিস?"

তপু দাঁত বের করে হেসে বলল, "করে ফেলেছি। আজকে অঙ্ক মিস আসে নাই, তাই কোনো হোমওয়ার্কও নাই!"

শিরীন হেসে বলল, "খুব মজা, না?"

তপু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ!"

পড়াশোনা শেষ করে তপু খানিকক্ষণ টিভি দেখে, টিভিতে ভালো প্রোগ্রাম না থাকলে কম্পিউটার নিয়ে খেলে। সবার কাছে 'কম্পিউটার' 'কম্পিউটার' শুনে শিরীন ছেলেকে একটা কিনে দিয়েছে— অনেকগুলো টাকা লেগেছে কিন্তু তবুও তপুর শখ মিটিয়ে দিয়েছে। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি, সেমিনার, বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছিল ছেলেকে কম্পিউটার কিনে দিলেই সে হয়তো হাতি ঘোড়া অনেকরকম সৃজনশীল কাজ শুরু করে দেবে কিন্তু সেরকম কিছু দেখা যায় নি। বন্ধুবান্ধবের সাথে গেম বিনিময় করে, ইন্টারনেট থেকে মাঝে মাঝে কোনো ছবি বা গান ডাউনলোড করে, মোটামুটি তাড়াতাড়ি টাইপ করে কিছু-একটা লিখতে পারে—এর চাইতে বেশি কিছু হয় নি। এতগুলো টাকা শুধুশুধু অপচয় করল কিনা সেটা নিয়ে মাঝে মাঝে শিরীনের সন্দেহ হয়।

ঘুমানোর আগে প্রায় প্রতিদিনই তপু কম্পিউটার গেম খেলে, তখন তপুর ঘর থেকে গোলাগুলি, মহাকাশযানের গর্জন কিংবা মহাকাশের প্রাণীর চিৎকার শোনা যায়। আজকে ঘরে কোনো শব্দ নেই, শিরীন খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে নিঃশব্দে ছেলের ঘরে হাজির হল। গিয়ে দেখে তপু কেমন জানি সম্মোহিতের মতো কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। সামনে মনিটরের স্ক্রিনে একটি অত্যন্ত বিচিত্র নকশার মতো ছবি, খুব ধীরে ধীরে সেটি নড়ছে। কান পেতে থাকলে কম্পিউটারের স্পিকার থেকে খুব মৃদু একটি অতিপ্রাকৃত সংগীতের মতো কিছু একটা ভেসে আসতে শোনা যায়। শিরীন কিছুক্ষণ তপুর দিকে তাকিয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে ডাকল, "তপু।"

তপু চমকে উঠে শিরীনের দিকে তাকাল। শিরীন অবাক হয়ে দেখল, তপুর দৃষ্টি কেমন জানি অপ্রকৃতিস্থের মতো। ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোর?"

তপু বলল, "কিছু হয় নাই।"

"স্ক্রিনের দিকে এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?"

"এমনি।" তপু এমনভাবে মাথা নিচু করল যে দেখে শিরীনের মনে হল সে একটা-কিছু লুকানোর চেষ্টা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিরীন বলল, "এমনি এমনি কেউ এভাবে স্ক্রিনের দিকে তাকায়?"

"না। মানে—এই যে স্ক্রিন সেভারটা আছে সেটার দিকে তাকালে মাঝে মাঝে অন্য জিনিস দেখা যায়।"

"অন্য জিনিস?" শিরীন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "অন্য কী জিনিস?"

তপু ঠিক বোঝাতে পারল না, ঘাড় নেড়ে বলল, "মনে হয় কেউ কথা বলছে।"

"কথা বলছে? কী কথা বলছে?"

'জানি না।"

"দেখি আমি।" শিরীন তপুর পাশে বসে দেখার চেষ্টা করল, অবাক হয়ে লক্ষ করল মনিটরের নকশাটি এমনভাবে ধীরে ধীরে নড়ছে যে মনে হয় সে বুঝি আদিগন্ত শূন্যতার মাঝে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। শিরীন চোখ সরিয়ে তপুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী সব উল্টাপাল্টা জিনিস দেখে সময় নষ্ট করছিস? বসে বসে প্রোগ্রামিং করতে পারিস না?"

তপু যন্ত্রণার মতো একটা শব্দ করল, বড় মানুষদের নিয়ে এটাই হচ্ছে সমস্যা, কোনো জিনিসের মাঝে আনন্দ রাখতে চায় না—সবসময়েই শুধু কাজ আর কাজ। বড় হয়ে সে প্রোগ্রামিঙের অনেক সুযোগ পাবে, এখন কয়দিন একটু মজা করে নিলে ক্ষতি কী? শিরীন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "অনেক রাত হয়েছে। ঘুমাতে যা।"

শিরীন ভেবেছিল তপু আপত্তি করে খানিকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করবে, কিন্তু সে আপত্তি করল না, সাথে সাথেই দুধ খেয়ে দাঁত ব্রাশ করে শুতে গেল। ডাইনিং টেবিলে কাগজপত্র ছড়িয়ে কাজ করতে করতে শিরীন শুনতে পেল তপু বিছানায় নড়াচড়া করছে। সাধারণত সে শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে যায়, আজকে কোনো একটি কারণে তার চোখে ঘুম আসছে না।

রাত্রে ঘুমানোর আগে শিরীন কিছুক্ষণের জন্যে টিভিতে খবর শুনল। দেশ-বিদেশের খবর শেষ করে বলল, তের-চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা করার আগে সে ইন্টারনেটে কয়েকজনের সাথে লিখে লিখে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে বলেছে এখন তার আত্মহত্যা করতে হবে। সবাই ভেবেছিল ঠাট্টা করছে কিন্তু দেখা গেল ঠাট্টা নয়।

খবরটা শুনে শিরীনের মনটা খারাপ হয়ে যায়। বয়োসন্ধির সময়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যা করে। কিন্তু যারা আত্মহত্যা করে তারা তো হঠাৎ করে সিদ্ধান্তটি নেয় না, দীর্ঘদিনে ধীরে ধীরে একটা প্রস্তুতি নেয়। ছেলেটির পরিবারের কেউ কি ছিল না যে সেটা বোঝার চেষ্টা করতে পারত? সবার সাথেই কি একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল? তপু যখন আরেকটু বড় হয়ে বয়োসন্ধিতে পৌঁছাবে তখন কি তার সাথেও এরকম একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে? শিরীন তপুর ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ তার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, ছেলেটির চেহারায় এমনিতেই একটি নির্দোষ সারল্যের ভাব আছে, যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সেটা আরো এক শ গুণ বেড়ে যায়। শিরীন নিচু হয়ে তপুর গালে একটা চুমু খেয়ে মশারিটা ভালো করে গুঁজে দিয়ে লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে বের হয়ে এল।

অফিসে যাবার আগে তপুর সাথে নাস্তা খাওয়ার সময় খবরের কাগজে চোখ বুলাতে গিয়ে শিরীনের আবার মন খারাপ হয়ে গেল। গতকাল যে-ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে তার ছবি ছাপা হয়েছে। ফুটফুটে বুদ্ধিদীপ্ত একটা কিশোর। পাশে আরেকটা ছবি, ছেলের মৃতদেহের উপর মা আকুল হয়ে কাঁদছে। খবরের কাগজের মানুষগুলো কেমন করে এরকম ছবিগুলো ছাপায়? তাদের বুকের ভিতরে কি কোনো অনুভূতি নেই?

AMARBOI.COM

সপ্তাহখানেক পর দৈনিক প্রথম খবরে হাসান জামিল নামে একজন 'দুর্বোধ্য কৈশোর' নামে একটি বড় প্রতিবেদন লিখল। গত মাসখানেকের মাঝে কমবয়সী কিশোর-কিশোরী নিয়ে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে, ঘটনাগুলো সত্যিই অস্বাভাবিক এবং দুর্বোধ্য। একজন খুন করেছে, আরেকজন খুন করার চেষ্টা করেছে। দুজন আত্মহত্যা করেছে, তিনজন নিখোঁজ। অন্তত আধডজন কিশোর-কিশোরী অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে। এ ছাড়াও বড় একটা সংখ্যার কিশোর-কিশোরী কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে একধরনের বিষণ্নতায় ভুগছে। ঠিক কী কারণ কেউ জানে না। এই কিশোর-কিশোরীদের সবাই সচ্ছল পরিবারের, তুলনামূলকভাবে সবাই পড়াশোনায় ভালো, মেধাবী। সবাই শহরের ছেলেমেয়ে, একটা বড় অংশ খানিকটা নিঃসঙ্গ। হাসান জামিল নামক ভদ্রলোক ব্যাপারটি নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো ভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারে নি। বেপরোয়া নগরজীবন, ড্রাগস, নিঃসঙ্গতা, পারিবারিক অশান্তি, পাশ্চাত্য জগতের প্রলোভন, টেলিভিশন, প্রেম-ভালবাসা কিছুই বাকি রাখে নি, কিন্তু হঠাৎ করে কেন এতগুলো কিশোর-কিশোরীর এ ধরনের একটা পরিণতি হচ্ছে তার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে দিতে পারে নি।

শিরীন প্রতিবেদনটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল, এবং ঠিক কী কারণ জানা নেই পড়ার পর থেকে সে কেমন যেন শঙ্কা অনুভব করতে থাকে। দুর্বোধ্য কিশোর-কিশোরীর যে প্রোফাইলটা দেওয়া হয়েছে তার সাথে তপুর কেমন যেন একটা মিল রয়েছে। সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা, ইদানীং শিরীনের মনে হচ্ছে তপুর সাথে তার কেমন জানি একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রে খাবার টেবিলে শিরীন ইচ্ছে করে তপুর সাথে একটু বেশি সময় নিয়ে কথা বলল; তার স্কুলের, বন্ধুবান্ধবের খোঁজখবর নিল। শিরীন লক্ষ করল তপুকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলছে না। মনে হচ্ছে খানিকটা অন্যমনস্ক— প্রশ্ন করলেও মাঝে মাঝে উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে, প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করতে হচ্ছে। শিরীন কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "কী হয়েছে তোর? কথা বলছিস না কেন?"

"কে বলেছে কথা বলছি না?"

"দশটা প্রশ্ন করলে একটা উত্তর দিচ্ছিস। কী হয়েছে?"

'কিছু হয় নাই।"

শিরীন লক্ষ করল তপু জোর করে কথা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু কথায় যেন প্রাণ নেই। জোর করে, চেষ্টা করে কষ্ট করে বানিয়ে বানিয়ে বলছে। বলার ইচ্ছে করছে না কিন্তু শিরীনকে খুশি করার জন্যে বলছে।

রাত্রে ঘুমানোর আগে শিরীন তপুর ঘরে গিয়ে দেখে সে কম্পিউটারের মনিটরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। মনিটরে বিচিত্র একটি নকশা খুব ধীরে ধীরে নড়ছে, তার সাথে সাথে স্পিকার থেকে খুব হালকা একটি সঙ্গীত ভেসে আসছে। তপুর দৃষ্টি সম্মোহিত, মুখ অল্প খোলা। কিছু একটা দেখে যেন সে ভারি অবাক হচ্ছে, নিচের ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছে। শুধু তাই নয়, শিরীন অবাক হয়ে দেখল, তপু যেন ফিসফিস করে কিছু-একটা বলছে, যেন অদৃশ্য কারো সাথে কথা বলছে। শিরীন কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল, চাপা গলায় ডাকল, "তপু।"

তপু শুনতে পেল বলে মনে হল না, শিরীন তখন আবার ডাকল, "তপু।" আগের থেকে জোরে ডেকেছে, তপু তবুও ঘুরে তাকাল না। শিরীন এবারে তপুকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তপু, এই তপু, কী হয়েছে তোর?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তপু খুব ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে শিরীনের দিকে তাকাল, শিরীন তার দৃষ্টি দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। শূন্য এবং অপ্রকৃতিস্থ একধরনের দৃষ্টি, শিরীনের দিকে তাকিয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে সে কিছু দেখছে না। শিরীন আবার চিৎকার করে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল, "তপু—এই তপু।"

তপু কাঁপা গলায় বলল, "কী!"

"কী হয়েছে তোর?"

তপু সম্মোহিতের মতো বলল, "কিছু হয় নি।"

"কার সাথে কথা বলছিস তুই?"

"সেভারের সাথে।"

"সেভার? সেভার কে?"

'স্ক্রিন সেভার। লাইফ সেভার। নেট সেভার। সোল সেভার।"

শিরীন চিৎকার করে বলল, "কী বলছিস তুই পাগলের মতো? তপু, কী হয়েছে তোর?"

তপু হঠাৎ করে যেন জেগে উঠল, অবাক হয়ে তাকাল শিরীনের দিকে, বলল, "কী হয়েছে আম্মু?"

"তোর কী হয়েছে?"

"আমার? আমার কিছু হয় নি।"

"তাহলে এখানে এভাবে বসে ছিলি কেন? কার সাথে তুই কথা বলছিলি?"

তপুকে হঠাৎ যেন কেমন বিভ্রান্ত দেখায়, কী যেন চিন্তা করে ভুরু কুঁচকে তারপর মাথা নেড়ে বলল, "মনে নেই আম্মু। কী যেন একটা খুব ইম্পরট্যান্ট একটা ব্যাপার। খুব। জরুরি—"

শিরীন হঠাৎ করে কেমন জানি খেপে গেল, চিৎকার করে বলল, "বন্ধ কর কম্পিউটার। এক্ষুনি বন্ধ কর। বন্ধ কর বলছি।"

তপু কেমন জানি ভয় পেয়ে কম্পিউটার বন্ধ করে শিরীনের দিকে তাকাল। শিরীন হিংস্র গলায় বলল, "আর কোনোদিন তুই কম্পিউটারের সামনে বসতে পারবি না। নেভার। বুঝেছিস?"

তপু অবাক হয়ে শিরীনের দিকে তাকিয়ে রইল, সে যেন ঠিক বুঝতে পারছে না তার আম্মু কী বলছে।

রাতে ডাইনিং টেবিলে বসে শিরীন শুনতে পেল তপু ঘুমের মাঝে বিছানায় ছটফট করছে। মনে হয় বুঝি কোনো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। শিরীন তপুর মাথার কাছে বসে রইল, শেষ পর্যন্ত যখন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তখন সে নিজের বিছানায় এল শোয়ার জন্যে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল—তার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না।

পরদিন দুপুরের পর শিরীন তাদের অফিসের সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর শাহেদ আহমেদকে খুঁজে বের করল। যে-কোনো সিস্টেম এডমিনের মতোই শাহেদ কমবয়সী, উৎসাহী এবং হাসিখুশি মানুষ। শিরীনকে দেখে বলল, "কী হয়েছে আপা? সিস্টেম ডাউন?"

"না, না, সিস্টেম ঠিকই আছে।"

"তাহলে?"

AMARBOI.COM

“আপনি তো কম্পিউটারের এক্সপার্ট, আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি।”

“কী জিনিস?”

শিরীন ইতস্তত করে বলল, “কম্পিউটার কি ছোট বাচ্চাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে?”

“অবশ্যই পারে।” শাহেদ উজ্জ্বল চোখে বলল, “কম্পিউটার হচ্ছে একটা টুল। এই টুলটা ব্যবহার করে কতকিছু করা যায়, কতকিছু শেখা যায়—”

“না, না—” শিরীন মাথা নেড়ে বলল, “আমি ভালো প্রভাবের কথা বলছি না, খারাপ প্রভাবের কথা বলছি।”

শাহেদ এবারে সরু-চোখে শিরীনের দিকে তাকাল, বলল, “কীরকম খারাপ প্রভাব?”

“ধরুন, পাগল হয়ে যাওয়া?”

শাহেদ হেসে বলল, “না, সেরকম কিছু আমি কখনো শুনি নি।”

“কোনো কম্পিউটার গেম কি আছে যেটা খেললে বাচ্চাদের ক্ষতি হয়?”

“সেটা তো থাকতেই পারে। আজকাল কী ভয়ানক ভয়ানক ভায়োলেন্ট গেম তৈরি করেছে। এত গ্রাফিক যে সেগুলো খেলে খেলে বাচ্চারা ইনসেনসেটিভ হয়ে যেতে পারে। ভায়োলেন্সে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। গত বছর দুটি ছেলে আমেরিকার স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের গুলি করে মারল—তারা নাকি কী একটা কম্পিউটার গেম থেকে খুন করার আইডিয়াটা পেয়েছে!”

শিরীন ইতস্তত করে বলল, “কিন্তু কম্পিউটার গেম নয়—স্ক্রিন সেভার থেকে কি কোনো ক্ষতি হতে পারে?”

শাহেদ হেসে বলল, “স্ক্রিন সেভারটা তৈরি হয়েছে স্ক্রিনের ফসফরকে বাঁচানোর জন্যে। কোনো একটা ডিজাইন, নকশা, এটা দেখে আর কী ক্ষতি হবে! তবে—”

“তবে?”

“যাদের এপিলেপ্সি আছে তাদেরকে কম্পিউটার গেম খেলতে নিষেধ করে। কোথায় নাকি স্টাডি করে দেখেছে মনিটরের ফ্লিকার দেখে তাদের সিজ্যুর ট্রিগার করতে পারে। আমি নিজে দেখি নি, শুনেছি।”

শাহেদ কথা থামিয়ে একটু অবাক হয়ে বলল, “হঠাৎ আপনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?”

শিরীন পুরো ব্যাপারটি খুলে বলবে কিনা চিন্তা করল, কিন্তু হঠাৎ তার কেমন জানি সংকোচ হল। সে মাথা নেড়ে বলল, “না, এমনিই জানতে চাচ্ছিলাম।”

AMARBOI.COM

শাহেদের সাথে কথা বলে শিরীন নিজের টেবিলে এসে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকে। তার মাথায় কয়দিন থেকেই একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। যতই সময় যাচ্ছে ততই সন্দেহটা আরো প্রবলভাবে নিজের উপর চেপে বসছে। শেষ পর্যন্ত সে সন্দেহটা মিটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, ডাইরি থেকে টেলিফোন নাম্বার বের করে দৈনিক প্রথম খবরে ফোন করে হাসান জামিলের সাথে কথা বলতে চাইল। কিছুক্ষণের মাঝেই টেলিফোনে একজনের ভারী গলা শুনতে পেল, “হ্যালো হাসান জামিল।”

শিরীন এর আগে কখনো খবরের কাগজের অফিসে ফোন করে নি, খানিকটা দ্বিধা নিয়ে বলল, “আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি আপনাদের পত্রিকার একজন পাঠক।”

"জি। কী ব্যাপার?"

"বেশ কয়েকদিন আগে আপনি আপনাদের পত্রিকায় 'দুর্বোধ্য কৈশোর' নামে একটা প্রতিবেদন লিখেছিলেন।"

"হ্যাঁ লিখেছিলাম। অনেক টেলিফোন কল পেয়েছিলাম তখন।"

"আমিও সেটা নিয়ে কথা বলতে চাইছি।" শিরীন একটু ইতস্তত করে বলল, "সেই ব্যাপার নিয়ে আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি।"

"কী জিনিস?"

"আপনি যেসব কিশোর-কিশোরীর কথা লিখেছেন, আই মিন যারা খুন করেছে বা আত্মহত্যা করেছে বা অন্যভাবে ডিস্টার্বড তাদের কি কোনোভাবে কম্পিউটারের সাথে সম্পর্ক আছে? মানে তারা কি এর আগে কোনোভাবে কম্পিউটার দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে?"

হাসান জামিল টেলিফোনের অন্য পাশে দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, "খুব অবাক ব্যাপার যে আপনি এটা জিজ্ঞেস করলেন। ব্যাপারটা আমরাও লক্ষ করেছি—যারা যারা ডিস্টার্বড সবাই কম্পিউটারে অনেক সময় দেয়, কিন্তু সেটাকে আমরা কোনো কো-রিলেশান হিসেবে ধরি নি।"

"কেন ধরেন নি?"

"মনে করুন সবাই তো নিশ্চয়ই সকালে নাস্তা করে, দুপুরে ভাত খায়; তাহলে কি বলব যারা সকালে নাস্তা করে কিংবা দুপুরে ভাত খায় তারা সবাই ডিস্টার্বড।"

শিরীন একটু ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "এটা খুব বাজে যুক্তি।"

"যুক্তি পছন্দ না হলেই আপনারা বলেন বাজে যুক্তি।"

"আপনি যেসব কিশোর-কিশোরীর কথা লিখেছেন তাদের সবাই কি ঘটনার আগে আগে কম্পিউটারের কোনো একটা বিশেষ জিনিস নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে ছিল না? সামথিং ভেরি স্পেসিফিক?"

হাসান জামিল আমতা আমতা করে বললেন, "ইয়ে সেরকম একটা কথা আমরা শুনেছি। কনফার্ম করতে পারি নি—"

"সাংবাদিক হিসেবে আপনাদের কি দায়িত্ব ছিল না কনফার্ম করা?"

"দেখুন আমরা সাংবাদিক, তার অর্থ এই নয় যে আমরা সমাজের বাইরে। সমাজের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। আমরা চেষ্টা করছি দেশকে তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে নিতে। এখন যদি কম্পিউটার নিয়ে একটা ভীতি ছড়িয়ে দিই—অকারণ ভীতি—"

"অকারণ ভীতি? অকারণ?"

"যেটা প্রমাণিত হয় নি—"

"আপনারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন নি—"

হাসান জামিল আবার আমতা আমতা করে কিছু-একটা বলতে চাইছিল কিন্তু শিরীনের আর কিছু শোনার ধৈর্য থাকল না। সে রেগেমেগে টেলিফোনটা রেখে গুম হয়ে টেবিলে বসে রইল।

একটা চাপা দুশ্চিন্তা নিয়ে শিরীন বাসায় ফিরে এসে দেখে তপু বসে বসে হোমওয়ার্ক করছে। শিরীনকে দেখে হাত তুলে বলল, "আম্মু, তুমি এসেছ!"

"হ্যাঁ, বাবা। তোর কী খবর?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাংলা খবর—" বলে তপু হি হি করে হাসল। এটা একটা অত্যন্ত পুরাতন এবং বহুলব্যবহৃত রসিকতা, তবুও শুনে শিরীনও হাসল এবং হঠাৎ করে তার মন ভালো হয়ে গেল। শিরীন তপুর মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে খানিকক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে কথা বলে আসল প্রসঙ্গে চলে এল। বলল, "তপু।"

"কী আম্মু!"

"আমি ঠিক করেছি তুই এখন কয়েকদিন কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবি না।"

শিরীন ভেবেছিল তপু নিশ্চয়ই চিৎকার করে আপত্তি করবে, নানারকম ওজর-আপত্তি তুলবে, নানা যুক্তি দেখাবে। কিন্তু সে কিছুই করল না, অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে আম্মু।"

গভীর রাতে হঠাৎ শিরীনের ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক কেন ঘুম ভেঙেছে সে বুঝতে পারল না, তার শুধু মনে হল খুব অস্বাভাবিক কিছু-একটা ঘটছে কিন্তু সেটা কী সে বুঝতে পারছে না। সে চোখ খুলে তাকাল। তার মনে হল সারা বাসায় হালকা নীল একটা আলো। শুধু তাই নয়, মনে হল খুব চাপাস্বরে কেউ একজন কাঁদছে, ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না। শিরীন ধড়মড় করে উঠে বসল। আলোটা মনের ভুল নয়, সত্যিই হালকা নীল রঙের একটা আলো। কিসের আলো এটা?

শিরীন বিছানা থেকে নেমে নিজের ঘর থেকে বের হতেই দেখল তপুর ঘরের দরজা আধখোলা, আলোটা তার ঘর থেকে আসছে। শিরীন প্রায় ছুটে সেই ঘরে ঢুকে আলোর উৎসটা আবিষ্কার করল, কম্পিউটারের মনিটরের আলো। মনিটরে বিচিত্র একটা ছবি, সেটি ধীরে ধীরে নড়ছে এবং স্পিকার থেকে চাপা কান্নার মতো একটা শব্দ হচ্ছে—মনে হচ্ছে ঝড়ো বাতাসের শব্দ, তার মাঝে কেউ একজন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। মনিটরের অপার্থিব নীল আলোতে তপুর ঘরটিকে একটি অপার্থিব জগতের দৃশ্য বলে মনে হচ্ছে। শিরীন অবাক হয়ে তপুর বিছানার দিকে তাকাল, বিছানার এক কোনায় তপু গুটিশুটি মেরে বসে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপছে। শিরীন কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোর, তপু? কী হয়েছে?"

তপু কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ভয় করছে আম্মু। আমার খুব ভয় করছে।"

"ভয় কী বাবা? তোর ভয় কিসের?"

শিরীন ঘরের লাইট জ্বালিয়ে তপুর কাছে এগিয়ে যায়। মশারি তুলে তপুর কাছে গিয়ে বসল। হাঁটুর ওপরে মুখ রেখে বসেছে, চোখ থেকে পানি বের হয়ে গাল ভিজে আছে। চোখের দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থের মতো, একধরনের আতঙ্ক নিয়ে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে আছে। হাত দুটি পিছনে, অত্যন্ত বিচিত্র একটি বসে থাকার ভঙ্গি। শিরীন তপুর পিঠে হাত রেখে বলল, "তোকে না কম্পিউটার চালাতে নিষেধ করেছিলাম?"

"আমি চালাই নি আম্মু। বিশ্বাস কর আমি চালাই নি।"

"তাহলে কে চালিয়েছে?"

তপু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "আমি জানি না।"

"ঠিক আছে বাবা, কম্পিউটার বন্ধ করে দিচ্ছি।"

তপু হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "না।"

"না!" শিরীন অবাক হয়ে বলল, "কেন না?"

"আমার ভয় করে আম্মু—আমি বলতে পারব না—"

শিরীন অবাক হয়ে তপুর পিঠে হাত বুলিয়ে হাতটা নিচে আনতেই হঠাৎ সেখানে একটা ধাতব শীতল স্পর্শ অনুভব করল। পিছনে তাকাতেই সে অবাক হয়ে দেখল তপু দুই হাতে একটা চাকু ধরে রেখেছে। রান্নাঘরে এই চাকু দিয়ে সে শাকসব্জি কাটে। শিরীনের মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে যায় এবং কিছু বোঝার আগে হঠাৎ করে তপু দুই হাতে চাকুটা উপরে তুলে শিরীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল।

শিরীন প্রস্তুত ছিল বলে ঝটকা মেরে একপাশে সরে গেল এবং তপুর চাকুটা বিছানার ভেতরে ঢুকে গেল। শিরীন চিৎকার করে তপুর হাতটা খপ করে ধরে ফেলল কিন্তু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল এইটুকু মানুষের শরীরে ভয়ঙ্কর জোর। তপু হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে আবার চাকুটা উপরে তুলে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে বলল, "আম্মু আমি মারতে চাই না আম্মু—কিন্তু আমি কী করব। আমাকে বলেছে মারতেই হবে—" তপু কথা শেষ করার আগেই আবার চাকুটি নিয়ে শিরীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিরীন ঝটকা মেরে আবার সরে গিয়ে টেবিলের নিচে ঢুকে গেল। ভয়ংকর আতঙ্ক নিয়ে দেখল তপু চাকুটা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে। সে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে—কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসছে, তার কিছু করার নেই, তাকে কেউ একজন আদেশ দিচ্ছে, সেই আদেশ সে অমান্য করতে পারবে না।

শিরীন দেখল তপু আরো একটু এগিয়ে এসেছে, ঠিক তখন সে কম্পিউটারের পাওয়ার কর্ডটা টান দিয়ে খুলে ফেলল। একটা চাপা শব্দ করে মনিটরটি অন্ধকার হয়ে গেল এবং সাথে সাথে তপু মাটিতে টলে পড়ে গেল। শিরীন কাছে গিয়ে দেখে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তপুকে বুকে চেপে ধরে সে বের হয়ে আসে, হামাগুড়ি দিয়ে সে টেলিফোনের কাছে ছুটতে থাকে—তাকে এখন হাসপাতালে নিতে হবে। তাকে বাঁচাতে হবে।

AMARBOI.COM

মাসখানেক পরের কথা। শাহেদের রুমে শিরীন তার সাথে কথা বলছে। শাহেদ হাসিমুখে বলল, "আপনার অনুমান সত্যি। আপনার কথা বিশ্বাস করলে আরো অনেক মানুষকে বাঁচানো যেত।"

শিরীন কোনো কথা বলল না। শাহেদ বলল, "কিন্তু ব্যাপারটি বিশ্বাস করবে কীভাবে? এটা তো বিশ্বাস করার কথা নয়। একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম বাচ্চাদের সম্মোহিত করে ভয়ংকর ভয়ংকর ব্যাপার ঘটাচ্ছে, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?"

শিরীন মাথা নাড়ল। বলল, "তা যায় না।"

"আপনার ছেলে এখন কেমন আছে?"

"ভালো। প্রতিদিন বিকেলে এখন আমি ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিই খেলার জন্যে। দৌড়াদৌড়ি করার জন্যে।"

"ভেরি গুড। ঐ রাতের ঘটনা কিছু মনে করতে পারে?"

"না, পারে না। আমি চাইও না তার মনে পড়ুক।"

শাহেদ হাসার চেষ্টা করে বলল, "ঠিকই বলেছেন।"

শিরীন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ঐ স্ক্রিন সেভারটা কে তৈরি করেছে সেটা কি বের করতে পেরেছে?"

শাহেদ মাথা নাড়ল, বলল, "না। অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু এখনো বের করতে পারে নি। স্ক্রিন সেভারটা এত অদ্ভুত এত অস্বাভাবিক যে সবাই একটা অন্য জিনিস সন্দেহ করছে।"

"কী সন্দেহ করছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এটা কোনো মানুষ লেখে নি।"

"তাহলে কে লিখেছে?"

'ইন্টারনেট।"

"ইন্টারনেট?"

"হ্যাঁ—ইন্টারনেট হচ্ছে অসংখ্য কম্পিউটারের একটা নেটওয়ার্ক—ঠিক মানুষের মস্তিষ্কের মতো। অনেকে মনে করছে পৃথিবীর ইন্টারনেটের বুদ্ধিমত্তা এখন মানুষের বুদ্ধিমত্তা থেকে বেশি।

"মানে?"

"তার মানে মানুষ নেটওয়ার্ককে নিয়ন্ত্রণ করছে না। নেটওয়ার্কই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে।"

শিরীন চমকে উঠে বলল, "কী বলছেন আপনি!"

"হ্যাঁ, সবাই ধারণা করছে এই স্ক্রিন সেভারটি ছিল তাদের প্রথম চেষ্টা—পরের বার আক্রমণটা হবে আরো পরিকল্পিত। আরো ভয়ানক।"

শিরীন কোনো কথা না বলে চোখ বড় বড় করে শাহেদের দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

চিড়িয়াখানা

"তোমাকে দেখার আমার একটু কৌতূহল ছিল—" বলে হাজীব কুন্তেরা রাহান জাবিলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। হাজীব কুন্তেরার চেহারায় বিচিত্র একধরনের নিষ্ঠুরতা রয়েছে। এই হাসিটি হঠাৎ করে সেই নিষ্ঠুরতাটিকে কেন জানি খোলামেলাভাবে প্রকাশ করে দিল।

রাহান জাবিল হঠাৎ করে একধরনের আতঙ্ক অনুভব করে, এই মানুষটির আমন্ত্রণ রক্ষা করে এখানে আসা হয়তো খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। সে বেশ চেষ্টা করে মুখে একধরনের বেপরোয়া এবং শান্ত ভাব ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল, "কেন? আমাকে দেখার তোমার কৌতূহল কেন?"

"আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ। ইচ্ছে করলে আমি মাঝারি একটা দেশের রাষ্ট্রপতি পাল্টে দিতে পারি। আমাকে নিয়ে খবরের কাগজে রিপোর্ট লেখে সেই মানুষটি কেমন দেখার কৌতূহল।"

"আমি একজন সাংবাদিক। সত্যকে প্রকাশ—" রাহানের বক্তৃতাটি মাঝপথে থামিয়ে হাজীব কুন্তেরা বলল, "থাক।"

রাহান খানিকটা অপমানিত বোধ করে কিন্তু হঠাৎ করে যে-কোনো মূল্যে সত্যকে প্রকাশ করার সাংবাদিকদের পবিত্র দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

হাজীব কুন্তেরা টেবিলে তার আঙুল দিয়ে শব্দ করতে করতে বলল, "আমি যা ভেবেছিলাম তুমি ঠিক তাই।"

রাহান ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "সেটি কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কমবয়সী, অপরিপক্ব, নির্বোধ এবং আহাম্মক।"

রাহান হতভম্ব হয়ে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। একজন মানুষ যত বিত্তশালীই হোক, যত ক্ষমতাবানই হোক, সে কি অন্য একজনের সাথে এই ভাষায় কথা বলতে পারে!

রাহান কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, হাজীব আবার হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল, বলল, "রাগ করো না। তোমার বয়সে আমিও নির্বোধ এবং আহাম্মক ছিলাম।"

রাহান ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "আমি নির্বোধ এবং আহাম্মক নই।"

হাজীব রাহানের কথার উত্তর না দিয়ে অত্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল এবং হঠাৎ করে রাহান বুঝতে পারল সে আসলেই নির্বোধ এবং আহাম্মক। সে খানিকক্ষণ একধরনের অক্ষম আক্রোশ নিয়ে হাজীবের সবুজ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ?"

"কথা বলার জন্যে।"

রাহান ভুরু কুঁচকে বলল, "কথা বলার জন্যে?"

"হ্যাঁ। আমার আসলে কথা বলার লোক নেই।"

"কথা বলার লোক নেই?"

"না। যারা আমার কর্মচারী তারা কখনো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস পায় না। যারা পরিচিত তারা তোষামুদি করে।"

"তোমার আপনজন?"

"আমার কোনো আপনজন নেই।"

রাহান ভুরু কুঁচকে বলল, "আমি তোমার ওপরে রিপোর্ট করেছি, আমি জানি তোমার দুইজন স্ত্রী আছে, তিনজন ছেলেমেয়ে আছে।"

হাজীব এবারে শব্দ করে হাসল, এই হাসিটি হল শ্লেষে পরিপূর্ণ এবং সে-কারণে মানুষটিকে অত্যন্ত কুশ্রী দেখাল। রাহান মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে একধরনের ঘৃণা অনুভব করে। হাজীব হাসি থামিয়ে বলল, "আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে প্রতিমুহূর্তে আমার মৃত্যু কামনা করে।"

"কেন?"

"তুমি সাংবাদিক, এটা তোমার জানার কথা।"

রাহান কোনো কথা বলল না, সে আসলেই জানে। ছোটখাটো সম্পদ মানুষের জীবনে সুখ আনতে পারে, ভয়ংকর ঐশ্বর্যের বেলায় সেটি সত্যি নয়, পারিবারিক জীবনটিকে সেটি একটা কুৎসিত ষড়যন্ত্রে পাল্টে দেয়।

হাজীব বলল, "আমি আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে নিয়ে তোমার সাথে কথা বলতে চাই না।"

"তাহলে কী নিয়ে কথা বলতে চাও?"

"তোমাকে নিয়ে।"

রাহান অবাক হয়ে বলল, "আমাকে নিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে নিয়ে তুমি কী কথা বলতে চাও?"

হাজীব তার ডেস্ক থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে টেবিলে রেখে বলল, "এখানে তুমি আমার সম্পর্কে একটা বিশাল আলোচনা ফেঁদেছ।"

না তাকিয়েও রাহান বুঝতে পারে হাজীব কোন লেখাটার কথা বলছে, একটি অত্যন্ত

AMARBOI.COM

সম্ভ্রান্ত দৈনিক পত্রিকায় তার এই নিবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। হাজীবের টাকার উৎস, তার নানা ধরনের অপরাধ, তার অমানবিক নৃশংসতা কিছুই সে বাদ দেয় নি। হাজীব চেষ্টা করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, "তুমি এখানে আমার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছ।"

রাহান মাথা নাড়ল। হাজীব বলল, "তুমি আমার সম্পর্কে কতটুকু জান?"

"পৃথিবীতে তোমার সম্পর্কে যত তথ্য আছে আমি তার সব যোগাড় করে বিশ্লেষণ করেছি।"

"আমি মানুষটা কেমন বলে তোমার ধারণা?"

রাহান একটু ইতস্তত করে বলল, "খারাপ।"

"কত খারাপ?"

"বেশ খারাপ।"

"সেটা কতটুকু সে সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে?"

রাহান কোনো কথা না বলে হাজীবের দিকে তাকিয়ে রইল। হাজীব একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার ধারণা সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।"

হাজীব ঠিক কী বলতে চাইছে রাহান সেটা অনুমান করার চেষ্টা করল কিন্তু খুব একটা লাভ হল না। সে কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই হাজীব উঠে দাঁড়াল, বলল, "চল।"

"কোথায়।"

"এখানে আমার একটা চিড়িয়াখানা আছে, তোমাকে সেটা দেখাব।"

"চিড়িয়াখানা!" রাহান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নিজস্ব চিড়িয়াখানা আছে?"

"হ্যাঁ। বড়লোকদের অনেক রকম খেয়াল থাকে। কেউ মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করে, কেউ দুষ্প্রাপ্য ছবি সংগ্রহ করে—আমি সেরকম দুষ্প্রাপ্য প্রাণী সংগ্রহ করি।"

"দুষ্পাপ্য প্রাণী?"

"হ্যাঁ।"

"কীরকম দুষ্প্রাপ্য?"

"আমার কাছে যেগুলো আছে, মনে কর সেগুলো পৃথিবীর কারো কাছে নেই!"

সেটি কীভাবে সম্ভব রাহান বুঝতে পারল না। তাহলে কি সে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে নতুন ধরনের প্রাণী তৈরি করেছে? প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সে থেমে গেল—এক্ষুনি হয়তো ব্যাপারটি সে নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

হাজীবের পিছনে পিছনে রাহান বের হয়ে এল, পিছনে পিছনে কয়েকজন দেহরক্ষী বের হয়ে আসবে বলে রাহান অনুমান করেছিল কিন্তু সেরকম কিছু হল না। মানুষটি নিরাপত্তা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না, সম্ভবত নানা ধরনের গোপন ক্যামেরা দিয়ে তাদেরকে চোখে-চোখে রাখা হয়েছে।

প্রাসাদের মতো দালানটির মারবেল-সিঁড়ি দিয়ে তারা নেমে এল। সিঁড়ির সামনে ছোট একটি গাড়ি রাখা আছে, পাশাপাশি দুজন বসতে পারে। হাজীব রাহানকে ইঙ্গিত করে নিজে অন্যপাশে বসে একটা সুইচ স্পর্শ করতেই গাড়িটি একেবারে নিঃশব্দে চলতে শুরু করল, রাহান কান পেতে অনেক চেষ্টা করেও গাড়ির ইঞ্জিন বা মোটরের শব্দ শুনতে পেল না। গাড়িটি খুব ধীরে ধীরে চলছে, কোন দিক দিয়ে যেতে হবে নিশ্চয়ই প্রোগ্রাম করে রাখা

আছে। গাড়িটির ছাদ নেই বলে খুব খোলামেলা, চারদিকে দেখা যায়। হাজীব সিটে হেলান দিয়ে বলল, "সারা পৃথিবীতে আমার একচল্লিশটা দ্বীপ আছে, তবে এটা আমার সবচেয়ে প্রিয়।"

"এটা কত বড়?"

"খুব বেশি বড় নয়। এক শ বর্গ কিলোমিটার থেকে একটু ছোট।"

"এখানে তোমার নিজস্ব এয়ার স্ট্রিপ আছে?"

হাজীব হাত নেড়ে বলল, "সেজন্য এটি আমার প্রিয় নয়। আমার প্রিয় কারণ এই পুরো দ্বীপটি আসলে একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।" হাজীব হাত দিয়ে দূরে দেখিয়ে বলল, "ওপাশে গ্রানাইটের পাহাড়, ভারি চমৎকার।"

বৃক্ষহীন গ্রানাইটের পাহাড় কেমন করে ভারি চমৎকার হতে পারে রাহান বুঝতে পারল না, কিন্তু সে কোনো প্রশ্নও করল না। তবে জায়গাটি আশ্চর্য রকম নির্জন, কোথাও কোনো মানুষজন নেই। চিড়িয়াখানাটি কোথায় কে জানে! রাহান বিচিত্র এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে।

গ্রানাইটের পাহাড়ের খুব কাছাকাছি এলে হঠাৎ একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পেল, ছোট গাড়িটি সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে ভিতরে একটা খোলা জায়গায় এসে হাজির হয়। হাজীব তখন সুইচ টিপে গাড়িটি থামিয়ে দিয়ে বলল, "এটা আমার চিড়িয়াখানা।"

রাহান চারদিকে তাকিয়ে চিড়িয়াখানার কোনো চিহ্ন দেখতে পেল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে হাজীবের দিকে তাকাতেই হাজীব বলল, "এদিকে এস।"

রাহান হাজীবের পিছু পিছু একদিকে এগিয়ে যায়, উঁচু পাহাড়ের খাড়া দেয়াল উঠে গেছে, সেখানে হাত দিয়ে একটা পাথর সরাতেই উঁকি দেওয়ার মতো একটা জায়গা বের হয়ে গেল। হাজীব সেখানে উঁকি দিয়ে কিছু-একটা দেখে সরে গিয়ে বলল, "দেখ।"

রাহান কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে চমকে ওঠে। বেশ খানিকটা দূরে নিচে খানিকটা সমতল জায়গায় বিচিত্র কয়েকটা প্রাণী একটি মৃত ছাগলের দেহ টানাটানি করে খাচ্ছে। কামড়াকামড়ি করে খেতে-খেতে হঠাৎ একটা অন্যটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রাণীটি চারপায়ে ছুটে দূরে চলে গিয়ে অক্ষম আক্রোশে গর্জন করতে লাগল। প্রাণীটির সিংহের মতো লম্বা কেশর এবং পিছনের দুই পা তুলনামূলকভাবে লম্বা। দেখে মনে হয় কোনো এক ধরনের অপুষ্টির কারণে দেহের লোম ঝরে গেছে। মুখমণ্ডল গোলাকার এবং বানর বা মানুষের সাথে মুখমণ্ডলের মিল রয়েছে। রাহান একটু অবাক হয়ে হাজীবের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "এটি কোন প্রাণী?"

হাজীব মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "মানুষ।"

রাহান বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে ওঠে এবং আবার মাথা ঘুরিয়ে ছোট ফুটো দিয়ে উঁকি দিল এবং আতঙ্কে শিউরে উঠে আবিষ্কার করল সত্যিই এই প্রাণীগুলো মানুষ। সে ফ্যাকাসে মুখে হাজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মানুষগুলো এরকম কেন?"

"আমি আইডিয়াটি পেয়েছিলাম একটি বিশেষ ঘটনা থেকে। প্রাচীন ভারতবর্ষে একটি নেকড়ে বাঘের গর্তে দুটি মেয়ে পাওয়া গিয়েছিল। একটির বয়স ছিল সাত-আট, অন্যটি আরো একটু বড়, বারো-তের। নেকড়ে বাঘ তাদেরকে গ্রাম থেকে ধরে এনে বড় করেছিল। মানুষেরা তাদের উদ্ধার করে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। শৈশব নেকড়ে বাঘের সাথে কাটানোর জন্যে তারা বন্য পশুর মতোই থেকে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। চারপায়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটত, কাঁচা মাংস খেত, গায়ে কাপড় রাখত না, তীক্ষ্ণ ছিল ঘ্রাণশক্তি—এক কথায় পুরোপুরি বন্য পশু!"

হাজীব একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষের বাচ্চা দুটিকে উদ্ধার করে তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল অমলা আর কমলা। কিন্তু ঐটুকুই ছিল তাদের একমাত্র মানুষের পরিচয়।"

রাহান এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে হাজীবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাজীব মুখে তার সেই ভয়ংকর অস্পষ্ট হাসিটা ফুটিয়ে বলল, "ঘটনাটি শুনে আমার মনে হয়েছিল ইতিহাসে যদি এরকম একটি ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে কি আমরা আরো তৈরি করতে পারি না?"

রাহান হতচকিত হয়ে হাজীবের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি—তুমি এদের তৈরি করেছ?"

"হ্যাঁ।" হাজীব মাথা নাড়ল, বলল, "কাজটি খুব সহজ হয় নি। অনেক শিশু নষ্ট হয়েছে। সব নেকড়ে-মাতাই যে মানবশিশুকে নিজের শিশু হিসেবে বড় করতে চায় সেটা সত্যি নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পেরেছি—এখানে পাঁচটি নেকড়ে-মানব আছে। দুটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি এদের সন্তানেরা কীরকম হয় দেখার জন্যে।"

রাহান ভয়ংকর একটি আতঙ্ক নিয়ে হাজীবের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি কি সত্যিই মানুষ নাকি একটি দানব—হঠাৎ করে এই ব্যাপারটি নিয়ে তার সন্দেহ হতে থাকে।

হাজীব দুই পা হেঁটে বলল, "আমার মনে হল, মানবশিশু যদি নেকড়েকে দিয়ে পালন করানো যায়, তাহলে অন্য পশু কেন নয়। তখন আমি পরীক্ষা শুরু করেছি। বাঘ, কুকুর, শিম্পাঞ্জি এমনকি ডলফিন।"

"ডলফিন?"

"হ্যাঁ। ঐপাশে পানির একটা ছোট হ্রদ আছে, সেখানে তিনজন ডলফিন শিশু থাকে। পানির নিচে সাঁতার কাটে, কাঁচা মাছ খায়। দেখে কেউ বলতেও পারবে না যে তারা আসলে ডাঙার প্রাণী! আমি পুরো বিবর্তনকে উল্টোদিকে প্রবাহিত করতে শুরু করেছি!"

হাজীব শব্দ করে হাসল এবং রাহান হঠাৎ করে আবার আতঙ্কে শিউরে উঠল। হাজীব একটা বড় পাথরে বসে বলল, "যাও রাহান, তুমি ঘুরে ঘুরে দ্যাখ। আমি এখানে অপেক্ষা করি। আমার মনে হয় শিম্পাঞ্জি-শিশুটিকে তুমি পছন্দই করবে—দেখে মনে হয় বিবর্তনের ফলে মাটিতে নেমে আমরা বুদ্ধিমানের কাজ করি নি। গাছটাই বুঝি ভালো ছিল!"

রাহান শুষ্কমুখে বলল, "আমার দেখার ইচ্ছে করছে না।"

"না করলে কেমন করে হবে? তুমি একজন অকুতোভয় ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিক। তুমি এটি দেখবে না? যাও, দেখে আস। কারণ তুমি এই সবগুলো দেখে এলে আমি আমার সর্বশেষ আবিষ্কারটি দেখাব।"

"কী আবিষ্কার?"

হাজীব মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা আমি আগেই বলব না। রাহান তুমি বুঝতে পারছ না যে তুমি কতবড় সৌভাগ্যবান মানুষ। আমার এই চিড়িয়াখানায় এর আগে কোনো মানুষ আসে নি। এটি আমার খুব ব্যক্তিগত জায়গা। যখন কোনোকিছু নিয়ে আমার খুব মেজাজ খারাপ হয় তখন আমি এখানে আসি। এই পশু-শিশুগুলো দেখলে আমার স্নায়ুগুলো নিজে থেকে শীতল হয়ে আসে। আমি মাঝে মাঝে এসে এক সপ্তাহ-দুসপ্তাহও থাকি। ঐপাশে আমার একটা ছোট ঘর আছে। এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত আনন্দভূমি। এখানে আজ আমি তোমাকে এনেছি—তুমি উপভোগ না করলে কেমন করে হবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহান মাথা নাড়ল, বলল, "না হাজীব—আমার পক্ষে এটা উপভোগ করা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু তুমি সাংবাদিক—আমার সম্পর্কে তুমি যদি পূর্ণাঙ্গ একটা রিপোর্ট লিখতে চাও তাহলে কি পুরোটা দেখা উচিত নয়?"

হাজীবের কথায় শ্লেষটুকু ধরতে রাহানের কোনো অসুবিধে হল না এবং হঠাৎ করে সে এক অমানুষিক ধরনের আতঙ্কে শিউরে ওঠে। হাজীব রাহানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তুমি যদি দেখতে না চাও তোমাকে আমি জোর করে দেখাতে পারব না। তবে আমার শেষ আবিষ্কারটি তোমাকে দেখতে হবে।"

"তোমার আবিষ্কারটি কী?"

"বলতে পার এ ব্যাপারে আমরা গুরু হচ্ছে ড. ম্যাঙ্গেলা। নাৎসি জার্মানির একজন ডাক্তার। মানুষকে নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর পরীক্ষাগুলো করেছিলেন তিনি।"

"সুন্দর?"

"হ্যাঁ। সাধারণ মানুষ ভীতু। জৈব পরীক্ষাগুলো করে পশুপাখিদের ওপর। কিন্তু সরাসরি মানুষের ওপর পরীক্ষা করার মতো আনন্দ আর কোথায় পাবে। ড. ম্যাঙ্গেলা সেই পরীক্ষা করতেন। তাদের বিকলাঙ্গ করতেন, অত্যাচার করতেন। তার কোনো সংকোচ ছিল না।"

রাহান নিশ্বাস আটকে বলল, "তুমিও করেছ?"

"হ্যাঁ। আমি শুরু করেছি। প্রথম পরীক্ষাটি খুব সহজ। মানবশিশুদের যদি জন্মের পর থেকে অন্ধকারে রেখে দেওয়া হয় তাহলে কী হবে?"

"তুমি সেই পরীক্ষাটি করেছ?"

হ্যাঁ। একডজন শিশুকে আমি পুরোপুরি অন্ধকারে বড় করেছি। আলো কী তারা জানে না—তারা কখনো সেটা দেখে নি।"

"তুমি তাদের কেমন করে দ্যাখ?"

"ইনফ্রা-রেড ক্যামেরা দিয়ে। এই দ্যাখ।"

হাজীব একটু এগিয়ে গিয়ে একটা সুইচ স্পর্শ করতেই বড় একটা স্ক্রিনে কিছু ছবি ভেসে উঠল। বড় বড় চুল, বড় বড় নখ, বুনো পশুর মতো নানা বয়সী কিছু মানুষ ইতস্তত হাঁটছে, মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে খাবার খাচ্ছে, তাদের দৃষ্টিশক্তি নেই কিন্তু তারা সেটি জানে না।

"এই মানুষগুলোর স্পর্শশক্তি ভয়ংকর প্রবল। ঘ্রাণশক্তিও অনেক বেশি। দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার না করে থাকার মাঝে কোনো অসুবিধে আছে বলেই মনে হয় না।"

রাহান হঠাৎ করে ঘুরে হাজীবের দিকে তাকাল, বলল, "তুমি কেন আমাকে এসব দেখাচ্ছ?"

"কারণ আমি তোমাকে এখানে রেখে যাব।"

রাহান বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল, "কী বললে!"

"হ্যাঁ।"

"এই অন্ধকারের মানুষের কাছে আমি তোমাকে রেখে যাব। আমার খুব কৌতূহল একজন নতুন অতিথি পেলে তারা কী করে সেটা দেখার।"

"তুমি কী বলছ এসব!"

"ঠিকই বলছি। নির্বোধ আহাম্মক একটা সাংবাদিককে একটা কাজে ব্যবহার করা যাক। কী বলো?"

রাহান বিস্ফারিত চোখে দেখল হাজীবের হাতে ছোট একটি রিভলবার। হাজীব মুখে তার সেই ভয়ংকর হাসিটি ফুটিয়ে বলল, "তোমাকে এখনই ঠিক করতে হবে তুমি কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে? একটু বাধা দিলেই আমি তোমাকে গুলি করব। এটি আমার জগৎ—এখানে আমি ছাড়া কেউ আসে না। কেউ জানবে না কী হয়েছে।"

হাজীব কথা শেষ করার আগেই রাহান তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং হাজীব এতটুকু দ্বিধা না করে রিভলবারের পুরো ম্যাগজিনটি তার উপরে শেষ করল। গুলির শব্দ গ্রানাইটের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয় এবং পশু হিসেবে বেড়ে-ওঠা মানবশিশুগুলো আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। রাহানের দেহ একটা বড় পাথরের ওপর ছিটকে পড়ে।

হাজীব একটা নিশ্বাস ফেলে রিভলবারটি তার পকেটে রেখে গাড়ির কাছে ফিরে যায়। সেখানে এক বোতল উত্তেজক পানীয় রাখা আছে : তার স্নায়ুকে শীতল করার জন্যে এখন সেটি দরকার। সে বহুদিন পর কাউকে নিজের হাতে খুন করল, একধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করল হত্যাকাণ্ডের প্রক্রিয়াটিতে সে একধরনের প্রশান্তি অনুভব করছে।

উত্তেজক পানীয়টির দ্বিতীয় ঢোক খাওয়ার পর হঠাৎ করে তার মনে একটি খটকা লাগল। রাহানের শরীরে ছয়টি গুলি লাগার পরও শরীরে সে-পরিমাণ রক্ত বের হল না কেন। সন্দেহ নিরসনের জন্যে সে পিছনে ফিরে তাকাল—কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। রাহান নিঃশব্দে উঠে এসে তাকে পিছন থেকে আঘাত করেছে—এক টুকরো পাথর অত্যন্ত আদিম অস্ত্র, কিন্তু এখনো সেটি চমৎকার কাজ করে।

রাহান হাজীবের অচেতন দেহের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমাকে তুমি যত আহাম্মক ভেবেছিলে আমি তত আহাম্মক নই। আমার গায়ে ক্যাভলারের একটা বুলেটপ্রুফ ভেস্ট লাগানো আছে—তোমার সাথে এমনি দেখা করতে আমার সাহস হয় নি।"

রাহান হাজীবের অচেতন শরীরটি টেনে অন্ধকার-জগতের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। অন্ধকার-জগতের মানুষেরা নতুন অতিথি পেলে কী করে সেটি জানার হাজীবের খুব কৌতূহল ছিল। কিছুক্ষণেই তার জ্ঞান ফিরে আসবে—এই কৌতূহলটি সে মিটিয়ে নেবে তখন।

হাজীবের এই চিড়িয়াখানার কথা কেউ জানে না। তাকে উদ্ধার করতে কেউ আসবে না। নিজের সৃষ্টির সাথে সে তার জীবনের বাকি অংশটুকু কাটিয়ে দেবে।

কে জানে ড. ম্যাঙ্গেলাকে নিয়ে তার ধারণার পরিবর্তন হবে কিনা!

বেজি

নিয়াজ ট্রলারের ছাদে বসে দেখল সমুদ্রের গাঢ় সবুজ উপকূলটি প্রথমে হালকা নীল হয়ে ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ উপকূলটা দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ মনে হচ্ছিল বুঝি বা তীরের সাথে একটি যোগাযোগ আছে। সেটি যখন অদৃশ্য হয়ে গেল তখন হঠাৎ নিয়াজ অসহায় অনুভব করতে থাকে। চারদিকে শুধু পানি আর পানি, তার মাঝে ছোট একটা ট্রলার টুকটুক করে এগিয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারটিকেই তার কেমন জানি অবাস্তব মনে হয়—চিন্তা করলেই নিয়াজের পেটের ভেতরে পাক দিয়ে ওঠে। সে সাঁতার জানে না, পানি নিয়ে সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়েই তার ভেতরে একটা ভয়। তার চাপাচাপিতেই ট্রলারের সবার জন্যে লাইফ-জ্যাকেট রাখা হয়েছে কিন্তু হঠাৎ যদি কোনো কারণে ট্রলার ডুবে যায় তাহলে এই লাইফ-জ্যাকেট দিয়ে তারা কী করবে?

নিয়াজের পাশেই শ্রাবণী দুই হাঁটুতে মুখ রেখে দূরে তাকিয়ে ছিল। তার চোখেমুখে কেমন যেন একধরনের উদাসী ভাব। নিয়াজ নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল, "তোর ভয় লাগছে না তো?"

শ্রাবণীর চোখমুখের উদাস ভাবটা কেটে সেখানে একটা তেজি ভাব ফুটে উঠল। গলা উঁচিয়ে বলল, "তোদের ধারণা মেয়ে হলেই তার সব সময় ভয় লাগতে থাকবে?"

নিয়াজ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না, না—তা না। আমার নিজের ভয় লাগছে তো তাই তোকে জিজ্ঞেস করছি। পানি দেখলেই আমার ভয় লাগে।"

শ্রাবণী শব্দ করে হেসে বলল, "কী বলছিস তুই? পানি দেখলে ভয় লাগে? পানির মতো এত সুন্দর জিনিস দেখে কেউ ভয় পায়? দ্যাখ—তাকিয়ে দ্যাখ।"

নিয়াজ তাকিয়ে দেখল, পানির রঙটি আশ্চর্যরকম নীল, চারদিকে যতদূর চোখ যায় সেই নীল পানি এবং এই নীল রঙটির মাঝে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। সে মাথা নেড়ে বলল, "তা ঠিক। সমুদ্রের পানির মাঝে কিছু একটা আছে। একটা অন্যরকম ব্যাপার। তীর থেকে একরকম আবার ওপর থেকে অন্যরকম।"

"আর তুই এই সুন্দর পানিকে ভয় পাচ্ছিস?"

জয়ন্ত পা ছড়িয়ে বসে অনেকক্ষণ থেকে একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করছিল, বাতাসের জন্যে সুবিধে করতে পারছিল না, শেষ পর্যন্ত সফল হয়ে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, "মানুষের শরীরের সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে পানি—হিসাব করলে পা থেকে এই বুক পর্যন্ত আসে। সেই পানিকে তুই পছন্দ করিস না?"

শ্রাবণী আবার শব্দ করে হেসে বলল, "ওভাবে বলিস না তো! সিক্সটি পার্সেন্ট পানি বললেই মনে হয় শরীরের নিচের অংশটা পানিতে থলথল করছে!"

জয়ন্ত নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করে হা হা করে হেসে বলল, "আর সুঁই দিয়ে ছোট একটা ফুটো করলেই সব পানি লিক করে বের হয়ে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যাচ্ছে!"

নিয়াজ মুখ কুঁচকে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই এর মাঝে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললি—এই সুন্দর পরিবেশটাকে পলিউট করে দিলি? বাতাসটাকে বিষাক্ত করে দিলি?"

জয়ন্ত সিগারেটে আরেকটা লম্বা টান দিয়ে বলল, "দ্যাখ নিয়াজ তোকে আমি আমার লোকাল গার্জিয়ান বানাই নি যে বসে বসে আমার ওপর মাতবরি করবি। আর বাতাসের পলিউশনের কথা যদি বলিস তাহলে ঐ তাকিয়ে দেখ তোর এই ট্রলারের শ্যালো ইঞ্জিন থেকে কী পরিমাণ কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে।"

"তাই বলে এই একবিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়ে তুই সিগারেট খাবি? আমি বুঝতেই পারি না মেডিক্যালের একজন স্টুডেন্ট হয়ে সে কেমন করে সিগারেট খেতে পারে।"

"এটাকে বলে নেশা। সিগারেটে নিকোটিন বলে একটা বস্তু থাকে। সেটা রক্তের মাঝে মিশে গিয়ে স্নায়ুতে এক ধরনের আরাম দেয়। মেডিক্যালের একজন স্টুডেন্ট কেমন করে এই সহজ জিনিসটা জানে না আমি সেটাও বুঝতে পারি না।"

শ্রাবণী একটা ছোট ধমক দিয়ে বলল, "তোরা থামবি? দুই সতীনের মতো ঝগড়া শুরু করে দিলি দেখি!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিগারেট খাওয়া এবং না–খাওয়ার তর্ক এত সহজে থামার কথা ছিল না কিন্তু ঠিক তখন তারা দেখতে পেল ট্রলারের পাশ দিয়ে বিশাল একটি সামুদ্রিক কচ্ছপ ভেসে যাচ্ছে। তিনজনই খানিকটা উত্তেজিত হয়ে এই বিশাল কচ্ছপটার দিকে তাকিয়ে রইল। শ্রাবণী বলল, "ইস, সাথে ক্যামেরাটা থাকলে একটা ছবি নেওয়া যেত।"

নিয়াজ বলল, "নিয়ে এলি না কেন?"

"ভাবলাম—যাচ্ছি রিলিফ ওয়ার্ক করতে—পিকনিক করতে তো আর যাচ্ছি না। পিকনিকে গেলেই না ক্যামেরা ক্যাসেট প্লেয়ার এসব নিয়ে যায়!"

নিয়াজ বলল, "এটা তো আর লোক–দেখানো ব্যাপার না যে সাথে ক্যামেরা নিতে পারব না! আসল কথা হচ্ছে সিনসিয়ারিটি। আন্তরিকতা।"

জয়ন্ত সমুদ্রটাকে তার সিগারেটের এ্যাশট্রে হিসেবে ব্যবহার করে একটু ছাই ফেলে বলল, "রিলিফ ওয়ার্কে গিয়ে যখন দেখবি মানুষ দুদিন ধরে না–খেয়ে আছে, গায়ে কাপড় নেই তখন এমনিতেই ক্যামেরা আর ক্যাসেট প্লেয়ারের কথা ভুলে যাবি।"

ট্রলারের ছাদে তিনজন চুপ করে বসে রইল। গত সপ্তাহে এরকম সময়েই ভয়ঙ্কর একটা সাইক্লোন এই এলাকায় সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। টেলিভিশনে সেই ছবি দেখে কারো বিশ্বাস হতে চায় না বাতাসের মতো নিরীহ একটি জিনিস এরকম প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। জয়ন্ত অন্যমনস্কভাবে তার সিগারেটে দুটো টান দিয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাই দা ওয়ে—তোদের দুজনকে থ্যাংকস। ছুটির মাঝে ফুর্তিফার্তা না করে আমার কথায় রিলিফ নিয়ে চলে এলি। একা একা এসব কাজে খুব বোরিং লাগে। আর বদমাইশ সাইক্লোনটা দেখ, হিট করার জন্যে কী একটা সময় বেছে নিল।"

শ্রাবণী বলল, "তুই কি ভেবেছিলি সাইক্লোন পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ ঠিক করে আসবে?"

"না তা অবিশ্যি ভাবি নি।" জয়ন্ত শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আর শ্রাবণী তোকে স্পেশাল থ্যাংকস। পুরুষ মানুষকে রাজি করাতে পারি না, আর তুই মেয়ে হয়ে রিলিফ নিয়ে চলে এলি!"

"তোদের নিয়ে তো মহামুশকিল হল!" শ্রাবণী অধৈর্য হয়ে বলল, "মেয়ে আর ছেলে এই জিনিসটা মনে হয় এক সেকেন্ডের জন্যেও তোরা ভুলতে পারিস না।"

"কে বলে ভুলতে পারি না?" জয়ন্ত ষড়যন্ত্রীর মতো মুখ করে বলল, "আমরা তো ভুলতেই চাই। তোরাই তো ভুলতে দিস না।"

"কখন আমরা তোকে ভুলতে দেই না?"

"ঐ যে লজ্জাবনত কটাক্ষ, ব্রীড়াময়ী ভঙ্গি, লাস্যময়ী হাসি!"

"কী বললি? কী বললি তুই? আমি ব্রীড়াময়ী ভঙ্গি আর লাস্যময়ী হাসি দিই? ধাক্কা দিয়ে যখন পানিতে ফেলে দেব তখন লাস্যময়ী হাসি আর ব্রীড়াময়ী ভঙ্গির মজাটা টের পাবি। কচ্ছপ কপ করে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।"

"ফর ইওর ইনফরমেশান ইওর হাইনেস শ্রাবণী—কচ্ছপ কখনো কাউকে কপ করে খেয়ে ফেলে না।"

"তোকে বলেছে!"

নিয়াজ শ্রাবণী আর জয়ন্তের হালকা কথাবার্তায় মন দিতে পারছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত গন্তব্যে না পৌছাচ্ছে সে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঢেউয়ে ছোট ট্রলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উথালপাথাল হয়ে দুলবে এরকম একটা ভয় ছিল কিন্তু সেরকম কিছুই হয় নি, সমুদ্রটা একটা বড় দিঘির মতো শান্ত, কিন্তু তবুও সে বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে কিছু-একটা ঘটে যাবে। সামনে দূরে কোনো-একটা দ্বীপ খুঁজতে খুঁজতে সে শুকনো গলায় বলল, "আর কতক্ষণ যেতে হবে রে?"

জয়ন্ত চোখ কপালে তুলে বলল, "কতক্ষণ যেতে হবে মানে? মাত্র তো শুরু করলাম। এখনো কমপক্ষে চার ঘণ্টা।"

"চার ঘণ্টা!"

"হ্যাঁ। কেন? তোর ভয় লাগছে?"

নিয়াজ দুর্বলভাবে হাসল, বলল, "না, ঠিক ভয় না। নার্ভাস।"

"ধুর! নার্ভাস লাগার কী আছে? নিচে গিয়ে শুয়ে থাক।"

"শোয়ার জায়গা কই? টয়লেট পেপার দিয়ে ট্রলার বোঝাই করে রেখেছিস।"

"টয়লেট পেপার?" জয়ন্ত হা হা করে হেসে বলল, "টয়লেট পেপার তুই কোথায় দেখলি? ওগুলো হচ্ছে মেডিক্যাল সাপ্লাই।"

"আমাদের দেশের মানুষের ওরকম মেডিক্যাল সাপ্লাই কোনো কাজে লাগে না। তাদের দেশে যেগুলো কোনো কাজে আসে না সেগুলো এখানে রিলিফ নাম দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।"

"সেটা ঠিকই বলেছিস।" জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "একবার বন্যার পর রিলিফ নিয়ে গেছি, ব্রিটিশ একটা অর্গানাইজেশন রিলিফ পাঠিয়েছে, বাক্স খুলে দেখি ভিতরে সান ট্যানিং লোশন! মানুষকে বোঝাতেও পারি না জিনিসটা কী কাজে লাগে।"

জয়ন্তের কথা শুনে শ্রাবণী আর নিয়াজ দুজনেই খানিকক্ষণ হাসল এবং তারপর খানিকক্ষণ পশ্চিমা দেশের মুণ্ডুপাত করল। জয়ন্ত তার সিগারেটের শেষ অংশটুকুতে একটা লম্বা টান দিয়ে তার গোড়াটা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে ট্রলারের ছাদে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। শ্রাবণী হাঁটুতে মুখ রেখে উদাস হয়ে বসে থাকে এবং নিয়াজ কিছু-একটা করে সময় কাটানোর জন্যে নিচে নেমে এল। তার ব্যাগে কিছু বই এবং কাগজপত্র আছে। সেগুলো দেখে সময় কাটাতে যায়।

মানব সভ্যতার বিকাশের ওপর গভীর জ্ঞানের একটা বই পড়ার চেষ্টা করে নিয়াজ বেশি সুবিধে করতে পারল না—তখন সে একটা রগরগে ডিটেকটিভ বই নিয়ে বসল। ওষুধের একটা বড় বাক্সের উপর পা তুলে দিয়ে ট্রলারের বেঞ্চে আধাশোয়া হয়ে সে দীর্ঘ সময় নিয়ে বইটা পড়ে প্রায় শেষ করে বাইরে তাকায়। চারদিকে এখনো সেই পানি। সবকিছুর যেরকম একটা সীমা থাকে, পানির বেলাতেও সেটা মনে হয় সত্যি, এত সুন্দর নীল দেখেও সে কেমন জানি হাঁপিয়ে উঠছে। নিয়াজ বইটা বগলে নিয়ে আবার ট্রলারের ছাদে উঠে এল। সেখানে জয়ন্ত লম্বা হয়ে শুয়ে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ করে গড়িয়ে পানিতে পড়ে না যায় ভেবে নিয়াজ রীতিমতো আঁতকে ওঠে। শ্রাবণী সেই একইভাবে পা দুলিয়ে উদাস-উদাস মুখ করে বসে আছে, নিয়াজকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "খিদে পেয়েছে?"

নিয়াজের খাওয়ার কথা মনেই ছিল না, কিন্তু শ্রাবণীর কথা শুনেই চট করে খিদে পেয়ে গেল, মাথা নেড়ে বলল, "কিছু তো পেয়েছেই।"

"নিচে দ্যাখ আমার ব্যাগটা আছে। নিয়ে আয়। কয়টা স্যান্ডউইচ বানিয়ে এনেছি।"

নিয়াজ শ্রাবণীর ব্যাগটা নিয়ে এল। ভেতরে প্লাস্টিকের বাক্সে স্যান্ডউইচ, কয়টা লাড্ডু, কলা এবং কয়েকটা কোল্ড ড্রিংকস। দেখে নিয়াজের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "বাহ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দ্যাখ—তুই যে সবসময় বলিস ছেলে আর মেয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই সেটা সত্যি নয়। তুই কি মনে করিস কখনো আমি কিংবা জয়ন্ত এভাবে গুছিয়ে খাবার আনতে পারতাম?"

জয়ন্ত নিজের নাম শুনে চোখ খুলে বলল, "কী হয়েছে?"

শ্রাবণী হেসে বলল, "দেখলি খাবারের গন্ধে কীরকম জেগে উঠেছে?"

"খাবার!" জয়ন্ত এবারে সত্যি সত্যি উঠে বসল, "খাবারের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম! কে এনেছে খাবার?"

"শ্রাবণী!"

জয়ন্ত হাতে কিল দিয়ে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক! যা খিদে পেয়েছে কী বলব। বঙ্গোপসাগরের এই রুচিকর হাওয়ায় মনে হচ্ছে একটা আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারব।"

শ্রাবণী স্যান্ডউইচ বের করতে করতে বলল, "সরি জয়ন্ত, তোর জন্যে আমি ঘোড়া রান্না করে আনি নি। স্যান্ডউইচ খেতে হবে।"

"বিপদে পড়লে বাঘে ঘাস খায়—আর এটা তো স্যান্ডউইচ।"

শ্রাবণী কিছু খাবার আলাদা করে নিয়াজের হাতে দিয়ে বলল, "এটা মাঝিকে দিয়ে আয়।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "জব্বার মিয়া তোর এই আধুনিক খাবার খেতে পারবে না। শুঁটকি দিয়ে ভাত যদি থাকে দে।"

"বাজে বকিস না।"

নিয়াজ হাতে করে স্যান্ডউইচ আর কলা নিয়ে ট্রলারের ছাদে হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, "জব্বার মিয়া।"

জব্বার মিয়া মধ্যবয়সী মানুষ। দেখে মনে হয় জগতের কোনোকিছুতেই সে কখনো বিস্মিত হয় না। চোখেমুখে এক ধরনের শান্ত এবং পরিতৃপ্ত ভাব। নিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "জে।" শ্যালো ইঞ্জিনের প্রবল শব্দের জন্যে তাকে প্রায়ই চিৎকার করে কথা বলতে হয়।

"নেন। স্যান্ডউইচ খান।"

জব্বার মিয়া মুখে মনোরম একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "আপনারা খান।"

"আমরা তো খাচ্ছি। আপনিও খান।"

"জায়গামতো পৌঁছে খাব। এখন থাক।"

নিয়াজ ঠিক বুঝতে পারল না যে-মানুষটা খেতে চাইছে না তাকে পীড়াপীড়ি করা উচিত হবে কিনা। সে ফিরে আসার জন্যে মাথা ঘুরিয়েই দেখতে পায় বহুদূরে হালকা ছায়ার মতো একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। সে জব্বার মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা কি ঐখানে যাচ্ছি?"

"জে না।"

"তাহলে কোথায় যাচ্ছি?"

"আরো দূরে।"

"আর কতক্ষণ?"

জব্বার মিয়া সূর্যের দিকে তাকিয়ে কেমন জানি অনিশ্চিতের মতো বলল, "এই তো আর কিছুক্ষণ।"

কথাটার কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই, তাছাড়া সময়ের অনুমান করার জন্যে যার সূর্যের দিকে তাকাতে হয় তার কাছে সময় সম্পর্কে সূক্ষ্ম কোনো সদুত্তর পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই

নেই। নিয়াজ হামাগুড়ি দিয়ে আবার শ্রাবণী এবং জয়ন্তের কাছে ফিরে এসে বলল, "জব্বার মিয়া তোর সাহেবি খাবার খাবে না।"

শ্রাবণী বিরক্ত হয়ে বলল, "বাজে কথা বলিস না। না খেলে না খাবে—তুই দিয়ে আয়।"

নিয়াজ ইতস্তত করে বলল, "ইয়ে খেতে চাইছে না—তাকে জোর করে—"

শ্রাবণী নিয়াজের হাত থেকে খাবারগুলো নিয়ে বলল, "পুরুষমানুষের জিনেটিক কোডিঙে কিছু গোলমাল আছে, কমনসেন্স কম। একজনকে খাবার দিলে সে না খায় কেমন করে?"

শ্রাবণী ট্রলারের উপর দিয়ে হেঁটে পিছনে গিয়ে জব্বার মিয়ার হাতে খাবার ধরিয়ে দিয়ে ফিরে এল, জব্বার মিয়াকে আপত্তি করার কোনো সুযোগ পর্যন্ত দিল না। নিয়াজ এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে থাকে—মেয়েটির মাঝে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা আছে যেটা সে হাজার চেষ্টা করেও আয়ত্ত করতে পারবে না।

শ্রাবণী দূরে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "দ্যাখ কী সুন্দর একটা দ্বীপ!"

"দেখেছি।"

"কী নাম এটার?" শ্রাবণী জব্বার মিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'জব্বার ভাই এইটা কোন দ্বীপ?"

"হকুনদিয়া।"

"হকুনদিয়া? কী পিকিউলিয়ার নাম।"

"জে। আগে এটার নাম ছিল দিঘলদিয়া। এখন নাম হকুনদিয়া। উপরে হকুন উড়ে তাই নাম হকুনদিয়া!"

শ্রাবণী একটা গল্পের খোঁজ পেয়ে জব্বার মিয়ার কাছে এগিয়ে গেল, "শকুন ওড়ে?"

"জে। হকুন উড়ে।"

"কেন?"

"কোনো মানুষ যেতে পারে না। যেই যায় সেই মরে। মড়ার খোঁজে হকুন ওড়ে।"

শ্রাবণী চোখ বড় বড় করে জব্বার মিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল, "যেই যায় সেই মরে?"

"জে। পাঁচ-ছয় বছর আগে পাগলা ডাক্তার খুন হওয়ার পর আর কেউ যেতে পারে না।"

"পাগলা ডাক্তার?"

"জে।"

"এখানে একজন পাগলা ডাক্তার থাকেন?"

জব্বার মিয়া দাঁত বের করে হেসে বলল, "আসলে পাগল ছিলেন না। এলাকার লোক মায়া করে ডাকত পাগলা ডাক্তার। বিজ্ঞান মতে গবেষণা করতেন। অনেক আলেমদার মানুষ ছিলেন।"

"খুন হলেন কেমন করে?"

জব্বার মিয়া এই পর্যায়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে দার্শনিকের মতো বলল, "এইটা দুনিয়ার নিয়ম। যত ভালো মানুষ সব খুন হয়ে যায়। বদ মানুষেরা বেঁচে থাকে।"

এতক্ষণে দ্বীপটি আরো কাছে চলে এসেছে, সবুজ গাছে ঢাকা। বড় বড় নারকেল গাছ উপকূলটিকে ঢেকে রেখেছে। এত সুন্দর একটা দ্বীপ সম্পর্কে কীরকম অশুভ একটি প্রচার।

AMARBOI.COM

পাগলা ডাক্তার ভদ্রলোকটির জন্যে শ্রাবণী এক ধরনের সমবেদনা অনুভব করে। মানুষটি নিশ্চয়ই অন্যরকম ছিলেন, তা না হলে সবকিছু ছেড়েছুড়ে এরকম একটি নির্জন দ্বীপে কেউ জীবন কাটাতে আসে?

শ্রাবণী নিয়াজ আর জয়ন্তের কাছে ফিরে এসে বলল, "এই দ্বীপটা দেখেছিস, কী সুন্দর!"

নিয়াজ গোগ্রাসে স্যান্ডউইচ খেতে খেতে বলল, "হুঁ।"

"এখানে কোনো মানুষ থাকতে পারে না, গেলেই মারা পড়ে।"

"সত্যি?"

"জব্বার ভাই তো তাই বলল।"

"আর তুই বিশ্বাস করে বসে আছিস?"

"কেন বিশ্বাস করব না? দ্বীপের নাম পর্যন্ত পাল্টে ফেলেছে—আগে ছিল দিঘলদিয়া, এখন হয়ে গেছে হকুনদিয়া। হকুন মানে বুঝলি তো? শকুন।"

জয়ন্ত এক কামড়ে কলার একটা বড় অংশ মুখে পুরে খেতে খেতে বলল, "মানুষ গেলে কেন মারা পড়ে সেটা বলেছে?"

"না। একজন পাগলা ডাক্তার থাকতেন—সেই পাগলা ডাক্তার খুন হয়ে যাবার পর থেকে এই অবস্থা।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং!" জয়ন্ত দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "দেখে বোঝার উপায়ই নেই যে এটা হন্টেড। এতদিন শুধু হন্টেড হাউজ শুনে এসেছি, এখন দেখা যাচ্ছে হন্টেড আইল্যান্ড! আস্ত একটা দ্বীপ হন্টেড। পাগলা ডাক্তারের প্রেতাত্মা কন্ট্রোল করছে!"

শ্রাবণী বলল, "সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা করবি না।"

"কে বলেছে আমি ঠাট্টা করছি?" জয়ন্ত বিশেষ মনোযোগ দিয়ে খেতে খেতে বলল, "আমি বলি কি, ফেরত যাওয়ার আগে এই হকুনদিয়া দ্বীপটা ইনভেস্টিগেট করে যাই।"

"কেন?"

"আমি কখনো হন্টেড প্লেস দেখি নাই। এটা হচ্ছে সুযোগ। সত্যি কথা বলতে কি, পাগলা ডাক্তারের প্রেতাত্মাকে যদি একটা শিশির ভেতরে ভরে নিয়ে যেতে পারি—"

শ্রাবণী বিরক্ত হয়ে বলল, "বাজে কথা বলবি না।"

ট্রলারটি হকুনদিয়া দ্বীপের খুব কাছে দিয়ে যাবার সময় তিনজনই খুব কৌতূহল নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। তাদের কেউই জানত না আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মাঝেই এই দ্বীপটিকে নিয়ে তাদের জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে।

ট্রলারটি যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। নিয়াজ, জয়ন্ত আর শ্রাবণী বড় একটি রিলিফ-কাজের ছোট একটা অংশ হিসেবে এসেছে—কাজেই তাদের কোনো গুরুত্ব দেবে কিনা সেটা নিয়ে খুব সন্দেহের মাঝে ছিল—কিন্তু দেখা গেল তাদের আশঙ্কা অমূলক। বিশাল একটি বার্জ সমুদ্রের মাঝে নোঙর করে রাখা আছে। সেটি ঘিরে নানারকম কর্মব্যস্ততা। অসংখ্য ট্রলার এবং নৌকা, কিছু ছোট লঞ্চ, বেশকিছু স্পিডবোট দাঁড়িয়ে আছে, তার মাঝে নানারকম রিলিফ-সামগ্রী তোলা হচ্ছে—লোকজনের হৈচৈ চেঁচামেচিতে একটা কর্মমুখর পরিবেশ। কিন্তু তার ভেতরেই তিনজন পৌঁছানো মাত্রই তাদেরকে রিলিফ-কাজের দায়িত্বে যে-মানুষটি তার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ভদ্রলোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিতে ব্রিটিশ, মধ্যবয়স্ক, চুলদাড়িতে পাক ধরেছে। রোদে পোড়া চেহারা। তাদেরকে দেখে ভারি খুশি হলেন। জরুরিভাবে যোগাযোগ করে এই জিনিসগুলো আনা হয়েছে—বোঝা গেল এগুলো ছাড়া রিলিফ ওয়ার্কের ওষুধপত্রে একধরনের অসংগতি থেকে যেত। ব্রিটিশ ভদ্রলোক ইংরেজিতে বললেন, "তোমরা অনেক কষ্ট করে এসেছ, এখন বিশ্রাম নাও। বার্জের ওপরে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।"

জয়ন্ত ইংরেজি মোটামুটি গুছিয়ে লিখতে পারে কিন্তু বলার সময় তার খানিকটা বাধো-বাধো ঠেকে। তাই দিয়েই সে বলল যে তারা ট্রলারে শুয়ে-বসে এসেছে এবং মোটেও ক্লান্ত নয়। এই কথা শুনে সাথে সাথে তাদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল, শারীরিক পরিশ্রম করার মতো অনেক মানুষ আছে, কিন্তু মোটামুটি লেখাপড়া জানে এখানে এরকম মানুষের খুব অভাব।

বার্জ থেকে নানা রিলিফ বের করে ট্রলার এবং নৌকায় তোলা হতে লাগল। ম্যাপে ছোট ছোট দ্বীপগুলো চিহ্নিত আছে। কোথায় কত মানুষ মারা গেছে, কতজন ঘরবাড়ি হারিয়েছে, কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে লিখে রাখা আছে। ম্যাপ এবং লিস্ট দেখে জিনিসপত্রের পরিমাণ ঠিক করে চিরকুটে সংখ্যাটি লিখে দেওয়া হতে লাগল। সেটি দেখে মালপত্র বোঝাই করে ট্রলার-নৌকা-লঞ্চগুলো চলে যেতে শুরু করল। যেগুলো গিয়েছে সেগুলো ফিরে আসতে শুরু করেছে। সেখানে মালপত্র বোঝাই করে আবার তাদের নতুন জায়গায় পাঠানো হতে লাগল।

রিলিফ ওয়ার্কে আরো অনেকে এসেছে। একটা বড় অংশ এসেছে কিছু এনজিও থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজের আরো কিছু ছাত্র এসেছে। ছাত্রী হিসেবে শ্রাবণীই একজন তবে ব্রিটিশ রিলিফ টিমের সাথে কয়েকজন মহিলা এসেছে। জয়ন্ত যদিও মুখ টিপে হেসে বলল, "তারা শুধু নামেই মহিলা, দেখতে শুনতে আকারে এবং আকৃতিতে সবাই এই দেশের বড় সন্ত্রাসীর মতো!"

AMARBOI.COM

সমস্ত কাজ শেষ করে ঘুমুতে ঘুমুতে গভীর রাত হয়ে গেল। বার্জের ডেকে সবার শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, শুধু মেয়েদের আলাদা কেবিন দেওয়া হয়েছে। শ্রাবণীর কেবিনটি দেখে জয়ন্ত এবং নিয়াজের চোখ হিংসায় ছোট ছোট হয়ে গেল! ছোট বাংক বেড, মাথার কাছে গোল জানালা, ছোট খেলনার মতো একটা সিংক, লাগোয়া বাথরুম, সবকিছু ঝকঝক তকতক করছে। জয়ন্ত দেখে শুনে মুখ সুঁচালো করে বলল, "তোরা না নারীবাদী মহিলা—আমাদেরকে শুকনো ডেকের মাঝে শুইয়ে রেখে নিজে এরকম কেবিন নিয়ে ঘুমুচ্ছিস যে?"

"আমি নিই নি। আমাকে দেওয়া হয়েছে।"

"ছুড়ে ফেলে দে। বলে দে থাকব না এখানে।"

শ্রাবণী বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "যে জাতি নারীদের সম্মান করে না সেই জাতির উন্নতি হয় না। তোরাও শেখ।"

পরের দিনটিও ব্যস্ততার মাঝে কাটল। বিকেলের দিকে তারা একটা দলের সাথে কাছাকাছি ছোট একটা দ্বীপে রিলিফ নিয়ে গেল। তাদেরকে আসতে দেখে অনেক আগে থেকে মানুষজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুকনো অভুক্ত মানুষ—ঘরবাড়ি ভয়ঙ্কর সাইক্লোন আর জলোচ্ছ্বাসে উড়ে গেছে। আগে থেকে খবর পেয়েছিল বলে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে অবিশ্যি বেশির ভাগ মানুষ প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে আসার সময় আবার তারা হকুনদিয়া দ্বীপের অন্য পাশ দিয়ে ফিরে এল। গভীর অরণ্যে ঢেকে থাকা দ্বীপটি দূর থেকে খুব রহস্যময় মনে হয়। এখানে কোনো মানুষ নেই—কেউ গেলে সাথে সাথে মারা পড়ে চিন্তা করলেই কেমন জানি ভয় হয়।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে জয়ন্ত আবিষ্কার করল, আজকের দিনটিতে তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। ঢাকা থেকে বেশকিছু ভলান্টিয়ার এসেছে, তাদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্য সব কাজকর্মই তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে বার্জটি নোঙর করে রাখা হয়েছে সেই দ্বীপটি ঘুরে দেখা যেতে পারে, কিন্তু এটি একেবারেই সাদামাটা একটা দ্বীপ। সাইক্লোনে ঘরবাড়ি ধুয়ে মুছে গিয়ে আরো সাদামাটা হয়ে গেছে। গ্রাম্য পথ ধরে হেঁটে আবিষ্কার করল সঙ্গে শ্রাবণী থাকার কারণে পেছনে ছোট ছোট বাচ্চার একটি বড় মিছিল তৈরি হয়ে গেছে। বাচ্চাগুলোর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে লাভ হল না। শহরের এই মানুষগুলোকে তারা বুঝতে পারে না। কথাবার্তা বললে তারা দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। এরকম সময়ে জয়ন্ত বলল, "চল, হকুনদিয়া দ্বীপ থেকে ঘুরে আসি।"

নিয়াজ ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বললি?"

"বলেছি হকুনদিয়া দ্বীপ থেকে ঘুরে আসি।"

"কীভাবে যাবি?"

"খোঁজ করলেই একটা স্পিডবোট বা ট্রলার কিছু-একটা পেয়ে যাব।"

শ্রাবণী বলল, "তারপর যখন খুন হয়ে যাবি তখন কী হবে?"

জয়ন্ত বলল, "তুই সত্যিই বিশ্বাস করিস ওখানে গেলেই মানুষ খুন হয়ে যায়?"

"সবাই যখন বলছে তখন নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে।"

জয়ন্ত একটু রেগে বলল, "এখানকার মানুষেরা আরো কী বলেছে শুনিস নি?"

'কী বলেছে?"

"বলেছে সাইক্লোনটা সোজা আসছিল, এখানকার এক পীর সাহেব ধমক দিয়ে পুবদিকে সরিয়ে নিয়েছেন। বলছে গভীর রাতে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ওলাবিবি ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—যার অর্থ গ্রামের সব মানুষ কলেরায় মরে যাবে। বলছে চাঁদনী রাতে সুপারি গাছে বসে বসে পরীরা আকাশে উড়ছে। আরো শুনবি?"

"থাক, অনেক বক্তৃতা হয়েছে।"

জয়ন্ত গলা উঁচিয়ে বলল, "তোরা যেতে না চাইলে নাই। দরকার হলে আমি একা যাব।"

"কেন?"

"প্রমাণ করতে চাই পুরোটা কুসংস্কার। আর কিছু না হোক তখন মানুষ আবার এই সুন্দর দ্বীপটায় থাকতে পারবে।"

শ্রাবণী কিছু না বলে জয়ন্তর চোখে তাকিয়ে রইল। জয়ন্ত বলল, "মনে করিস না আমি পাগলামো করছি। এরকম একটা ব্যাপার জেনেশুনেও যদি দ্বীপটাতে অন্তত পা না ফেলে আসি তাহলে নিজের কাছে নিজের খারাপ লাগবে, মনে হবে কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেললাম।"

"ঠিক আছে।" শ্রাবণী মাথা নেড়ে বলল, "আমি যাব।"

নিয়াজ বলল, "তাহলে আমি একা আর বসে থেকে কী করব? আমিও যাব।"

জয়ন্ত হাতে কিল দিয়ে বলল, "চমৎকার! আমি গিয়ে দেখি একটা স্পিডবোট ট্রলার নৌকা কিছু-একটা পাই কিনা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবণী মনে মনে আশা করছিল রিলিফ-কাজে সবাই ব্যস্ত থাকবে, জয়ন্তের এরকম পাগলামোর জন্য কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণের মাঝেই জয়ন্ত একগাল হাসি নিয়ে ফিরে এল, সে জব্বার মিয়াকেই পেয়ে গেছে। জব্বার মিয়া চাইছে না তারা সেখানে যাক, কিন্তু যখন জোরাজুরি করেছে তখন শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল, সমুদ্রের নীল পানি কেটে জব্বার মিয়ার ট্রলারটা ছুটে যাচ্ছে। ট্রলারের ছাদের ওপর তিনজন চুপচাপ বসে আছে।

হকুনদিয়া দ্বীপে পৌঁছে ট্রলারটাকে টেনে খানিকটা বালুর ওপর তুলে জব্বার মিয়া নেমে এল, সে এমনিতেই কথা বেশি বলে না। এখন আরো কম কথা বলছে। জয়ন্ত বলল, "থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জব্বার মিয়া। আপনি নামিয়ে না দিলে আমাদের এখানে আসা হত না।"

"কাজটা ভালো হল না।" জব্বার মিয়া নিচুগলায় বলল, "এর আগেরবার যে খুন হয়েছে, আপনাদের মতোই একজন ছিল। কিছু-একটা সাহস দেখানোর জন্যে এসেছিল, এসে খুন হল।"

জয়ন্ত একটু ফ্যাকাসে মুখে বলল, "আমরা খুন হব না। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।"

"এখানে আসতে চেয়েছিলেন, এসেছেন।" জব্বার মিয়া শক্তমুখে বলল, "আমি এখানে অপেক্ষা করি, আপনারা একটু ঘোরাঘুরি করে আসেন, ফেরত নিয়ে যাই।"

নিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ জব্বার ভাই ঠিকই বলেছে। তুই আসতে চেয়েছিলি, এসেছিস। এখন চল যাই।"

জয়ন্ত বলল, "তোরা যেতে চাইলে যা। আমি না-দেখে যাব না।"

"এখানে দেখার কী আছে? জঙ্গল গাছপালা দেখিস নি কখনো?"

জয়ন্ত বলল, "আমি ভেতরে ঢুকে দেখতে চাই।"

জব্বার মিয়া একটা নিশ্বাস ফেলে ট্রলারের পাটাতন থেকে একটা কাঠ সরাল। দেখা গেল সেখানে হাতে-তৈরি একটা বন্দুক। বন্দুকটা হাতে নিয়ে বলল, "তাহলে এইটা সাথে রাখেন।"

জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে বলল, "বেআইনি অস্ত্র? লাইসেন্স আছে?"

"লাইসেন্স কোথায় থাকবে! হাতে-তৈরি বন্দুক, ট্রলারে রাখি। চোর-ডাকাতের উৎপাতের জন্য রাখতে হয়।"

"না।" জয়ন্ত মাথা নাড়ল, "বেআইনি অস্ত্র রাখব না।"

জব্বার মিয়া খানিকক্ষণ জয়ন্তের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বন্দুকটা আবার পাটাতনের ভেতরে রেখে কাঠ দিয়ে ঢেকে দিল। জয়ন্ত বলল, "আপনি কোনো চিন্তা করবেন না জব্বার মিয়া। আমাদের কিছু হবে না। আমরা বেশি ভেতরে যাব না—একটু ঘোরাঘুরি করে চলে আসব।"

"আমায় গিয়ে রিলিফ নিয়ে যেতে হবে। রিলিফ পৌঁছে দিয়েই আমি চলে আসব। আপনারা ঠিক এইখানে থাকবেন।"

"ঠিক আছে।"

"অন্ধকার হয়ে গেলে কিছুতেই দ্বীপের ভেতরে থাকবেন না। আমি অন্ধকার হওয়ার আগেই আসব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে।"

জব্বার মিয়া এবার ট্রলারের ছাদের সাথে লাগানো একটা লম্বা কিরিচ টেনে বের করে ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এইটা সাথে রাখেন। এইটা রাখার জন্য লাইসেন্স লাগে না।"

জয়ন্ত ইতস্তত করে কিরিচটা হাতে নিল, সাবধানে ধরে পরীক্ষা করে বলল, "এইটা রাখব?"

নিয়াজ বলল, "রেখে দে। কখন কী কাজে লাগে।"

"যদি কোনো বিপদ দেখেন আগুন জ্বালাবেন।"

"আগুন?"

"হ্যাঁ। ম্যাচ আছে সাথে?"

"আছে।"

"দুইটা মোমবাতি নিয়ে যান—"

"দিনের বেলা মোমবাতি দিয়ে কী করব?"

"সাথে রাখেন।" বলে জব্বার দুইটা বড় বড় মোমবাতি বের করে দিল।

নিয়াজ মোমবাতিগুলো হাতে নেয়, হঠাৎ করে সে কেমন যেন আতঙ্ক অনুভব করতে থাকে। শুকনো গলায় বলল, "আর কিছু লাগবে জব্বার ভাই?"

"দড়ি। আর লাঠি।"

"কেন? দড়ি আর লাঠি কেন?"

জব্বার মিয়া বলল, "জানি না। তবে মানুষ বিপদে পড়লে লাগে। আগে যে লোকটা খুন হল—"

জব্বার মিয়া হঠাৎ করে থেমে গেল। নিয়াজ ভয়ে ভয়ে বলল, "যে খুন হল?"

"না, কিছু না।" জব্বার মিয়া মাথা নেড়ে বলল, "আপনারা যখন যাবেনই তখন ভয় দেখিয়ে লাভ কী?"

"তবু শুনি।"

"শোনার কিছু নাই। একটা গর্তের মাঝে পড়ে ছিল—সাথে দড়ি আর অন্য মানুষ থাকলে বের হতে পারত।"

"ও।"

"হ্যাঁ। সব সময় তিনজন একসাথে থাকবেন।"

"ঠিক আছে।"

"আমি অন্ধকার হবার আগেই আসব।"

"ঠিক আছে।"

জব্বার ট্রলার থেকে একটা লম্বা বাঁশ এবং নাইলনের কিছু দড়ি বের করে দিল। বাঁশটা কেটে তিন টুকরা করে তিনজনের হাতে দিয়ে বলল, "আল্লাহ মেহেরবান।"

নিয়াজ ফিসফিস করে বলল, "আল্লাহ মেহেরবান।"

"আর শোনেন—" জব্বার মিয়া নিচুগলায় বলল, "চোখগুলি সাবধান।"

"চোখ?"

"হ্যাঁ। চশমা থাকলে সবসময় চশমা পরে থাকবেন।"

জয়ন্ত অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

জব্বার মিয়া কোনো কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

AMARBOI.COM

জম্বারের ট্রলারটা শব্দ করে সমুদ্রের বুকে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ওরা তিনজন একজন আরেকজনের দিকে তাকায়। জয়ন্ত দুর্বল গলায় বলল, কাজটা ঠিক করলাম কিনা বুঝতে পারলাম না।"

শ্রাবণী বলল, "ঠিক করিস নি। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।"

জয়ন্ত দ্বীপটার দিকে তাকাল। গাছপালা-ঢাকা নিঝুম একটা দ্বীপ। সমুদ্রের ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে, এছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। জয়ন্ত হাতের কিরিচটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "ভেতরে আর নাইবা গেলাম। বীচটাতে একটু হাঁটাহাঁটি করে দেখি।"

শ্রাবণী মাথা নাড়ল, বলল, "আমাদের জোর করে এখানে এনেছিস—এখন পিছাতে পারবি না।"

"তুই কী করতে চাস?"

"ভেতরে যাব।"

"ভেতরে যাবি?"

"হ্যাঁ।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ শ্রাবণীর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "বেশ।"

তিনজন হেঁটে হেঁটে যখন দ্বীপের ভেতরে ঢুকছিল তখন শরৎকালের রৌদ্র মাত্র সতেজ হতে শুরু করেছে।

AMARBOI.COM

যেখানে মানুষের জনবসতি আছে সেখানে পায়ে চলার পথ তৈরি হয়ে যায়— এই দ্বীপটিতে দীর্ঘদিন কোনো মানুষ থাকে নি বলে কোনো পথঘাট নেই। ভেতরে ঢুকতে হলে ঝোপঝাড় ভেঙে ঢুকতে হয়, তিনজন সেভাবেই ঢুকেছে। সবার আগে জয়ন্ত। তার হাতে বড় কিরিচ—ঝোপঝাড় বা বুনোলতা বেশি থাকলে সেটা দিয়ে কেটে পথটা খানিকটা পরিষ্কার করছে। জয়ন্ত থেকে কয়েক হাত পেছনে শ্রাবণী। সবার পিছনে নিয়াজ। পা ফেলার আগে বাঁশের লাঠিটা দিয়ে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করছে। ঠিক কী কারণে কারোই সঠিক জানা নেই। বালুবেলায় প্রখর রোদ ছিল, ভেতরে তার কিছু অবশিষ্ট নেই। বড় বড় গাছের ছায়ায় আলো-আঁধারি একধরনের আবছা অন্ধকার।

তিনজন চুপচাপ মিনিট দশেক হাঁটার পর শ্রাবণী হঠাৎ করে নিচুগলায় বলল, "থাম।"

অন্য দুজন সাথে সাথে থেমে যায়। নিয়াজ ভয়-পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"না, কিছু হয় নি।"

"তাহলে?"

"আমার শুধু মনে হচ্ছে কেউ আমাদের লক্ষ করছে।"

শ্রাবণীর কথা শুনে জয়ন্ত আর নিয়াজ চারদিকে তাকাল—যতদূর চোখ যায় শুধু গাছ লতাপাতা ঝোপঝাড়। কেউ যদি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ করে সেটি বোঝার কোনো উপায় নেই। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার জন্য জয়ন্ত হাত নেড়ে বলল, "কে এখানে লক্ষ করবে? তোর মনের ভুল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি যখন ছোট ছিলাম একদিন রাতে ঘুম ভেঙে গেল। আমার শুধু মনে হতে লাগল কেউ একজন ঘরে আছে—আমাকে লক্ষ করছে। ভয়ে আমি গুটিশুটি মেরে শুয়ে রইলাম। সকালে উঠে দেখি চোর সবকিছু চুরি করে নিয়ে গেছে।"

জয়ন্ত পরিবেশটা হালকা করার জন্য বলল, "তোর যে এরকম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে আগে কখনো বলিস নি তো!"

"আগে কখনো দরকার পড়ে নি।"

"ঠিক আছে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।"

"কীভাবে?"

"কিছুক্ষণ সামনে হেঁটে হঠাৎ করে ঘুরে পেছনদিকে তাকাই—দেখি কাউকে দেখা যায় কিনা।"

"ঠিক আছে।"

কথা না বলে তিনজনে বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে গেল এবং হঠাৎ করে পেছনে ঘুরে কয়েক পা ছুটে গেল। ওরা অবাক হয়ে দেখল সত্যি সত্যি কী একটা প্রাণী দুদ্দাড় করে পেছনে ছুটে গিয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্রাবণী ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "দেখেছিস? দেখেছিস? আমি বলেছি না!"

জয়ন্ত খানিকক্ষণ প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা একটা বেজি। নেউল। ইংরেজিতে বলে উইজল।"

"নেউল? বেজি?"

"হ্যাঁ।"

শ্রাবণী ভুরু কুঁচকে বলল, "তুই কেমন করে জানিস?"

"আমি জানি কারণ আমি বেজি দেখেছি। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একজন মানুষ ছিল। তার একটা পোষা বেজি ছিল।"

"ও।"

"অসম্ভব হিংস্র প্রাণী। কিন্তু সাইজটা বেড়ালের মতো। কাজেই আমার মনে হয় তোর ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

"এরকম করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কেন?"

"মনে হয় আগে কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখে নি।"

'ফাজলেমি করবি না। বাঁশ দিয়ে মাথায় একটা বসিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে ফাজলেমি করব না।"

"দ্যাখ কীভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে—যেন আমাদের কথা বুঝতে পারছে।"

"বুঝতে পারছে না। বেজি হচ্ছে বেজি। তাদের মানুষের কথা বোঝার কথা নয়।"

"তাহলে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন?"

"কৌতূহলে।"

"এত কৌতূহল কেন?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "তুই কি বলতে চাইছিস এই বেজিটা দেখে আমাদের ভয়ে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যাওয়া উচিত?"

"না, তা বলছি না।" শ্রাবণী ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু এটার ভাবভঙ্গি দেখে ভালো লাগছে না। হয়তো এটা পাগল—হয়তো এটা র‍্যাবিড।"

"ঠিক আছে আমি এটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি—" বলে জয়ন্ত তার কিরিচ উঠিয়ে বেজিটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে ছুটে গেল। বেজিটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে পেছনের দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে প্রায় মানুষের মতো দাঁড়িয়ে পেছন দিকে লাফিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। জয়ন্ত স্বীকার না করে পারল না, বেজিটা একটু অস্বাভাবিক। এই ধরনের বুনো প্রাণী মানুষকে আরো অনেক বেশি ভয় পায়।

জয়ন্ত শ্রাবন্তীর কাছে এসে বলল, "হয়েছে তো? তোর বেজি পালিয়েছে।"

শ্রাবন্তী মাথা নাড়ল, কিন্তু কোনো কথা বলল না।

তিনজন আবার হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে নিয়াজ চাপা গলায় বলল, "আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।"

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "কোন ব্যাপারটা?"

নিয়াজ বলতে পারল না। প্রকৃত ব্যাপারটি যদি তারা জানত তাহলে তাদের কারোই ভালো লাগত না। তারা তখনো বুঝতে পারছিল না প্রতি পদক্ষেপেই তারা একটা বিশাল বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আরো মিনিট দশেক হাঁটার পর হঠাৎ করে গাছপালা হালকা হয়ে তারা খোলা একটা জায়গায় চলে এল। ঘন অরণ্য থেকে বের হওয়ার কারণেই তাদের ভেতরের চাপা আতঙ্কের ভাবটা একটু কমে এসেছে। তারা চারদিকে ঘুরে তাকাল এবং আবিষ্কার করল প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটা বাসা। এরকম একটি দ্বীপের জন্যে বাসাটি নিঃসন্দেহে আধুনিক। কিন্তু এতদূর থেকেও তাদের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না যে বাসাটি দীর্ঘদিন থেকে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। ঝোপঝাড়ে ঢেকে আছে, জানালা খোলা, দরজা ভাঙা এবং রঙ উঠে বিবর্ণ হয়ে আছে। নিয়াজ বলল, "ওটা নিশ্চয়ই পাগলা ডাক্তারের বাসা।"

"হ্যাঁ।" শ্রাবণী মাথা নাড়ল, "ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব শৌখিন ছিলেন। এরকম একটা নির্জন দ্বীপে কী চমৎকার একটা বাসা তৈরি করেছেন দেখেছিস?"

"শৌখিন এবং মালদার।" জয়ন্ত বলল, "এরকম একটা নির্জন দ্বীপে এরকম একটা বাসা তৈরি করতে অনেক মালপানি দরকার।"

শ্রাবণী কোনো কথা না বলে দূরে বাসাটির দিকে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ পর বলল, "এতদূর যখন এসেছি তখন বাসাটি দেখে যাই।"

নিয়াজ ইতস্তত করে বলল, "এখনো আরো এতদূর যাবি?"

"এতদূর কী বলছিস? ঐ তো দেখা যাচ্ছে।"

নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "চল তাহলে, দেরি করিস না।"

তিনজনের ছোট দলটা আবার রওনা দিল। একটু আগে সবাই মিলে যেভাবে সাবধানে হাঁটছিল, খোলামেলা জায়গায় এসে সেই সাবধানতাটুকু অনেক কমে গেল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ফিরে আসার জন্যে এবারে নিয়াজ হাঁটছে সামনে—নিয়াজের পিছনে জয়ন্ত এবং সবার পিছনে শ্রাবণী।

হাঁটতে হাঁটতে নিয়াজ সম্ভবত একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, বাংলোর মতো চমৎকার বাসাটির কাছাকাছি চলে এসেছে সেটাও দেখছিল একটু পরে পরে, তাই ঠিক কোথায় পা ফেলছে খেয়াল করে নি। হঠাৎ করে নিয়াজ আবিষ্কার করল, সামনের ঝোপঝাড় লতাপাতার আড়ালে মাটি নেই এবং সে একটা গর্তে পড়ে যাচ্ছে। নিজেকে বাঁচানোর সহজাত প্রবৃত্তিতে সে হাতের কাছে ঝোপঝাড় গাছপালা যেটাই পেল সেটাই ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনোটাই তার ওজনকে ধরে রাখার মতো শক্ত নয় এবং সে সবকিছু নিয়ে পড়ে যাচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক তখন জয়ন্ত আর শ্রাবণী ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল। নিয়াজ আতঙ্কে চিৎকার করে হাত-পা ছুড়তে থাকে এবং আরেকটু হলে সে অন্যদেরকে টেনে নিয়ে গর্তে পড়ে যেত—কিন্তু শেষ মুহূর্তে তারা নিজেদের সামলে নিল। শ্রাবণী আর জয়ন্ত কোনোমতে নিয়াজকে গর্ত থেকে টেনে তুলল।

ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবাক হয়ে গেছে যে নিয়াজ প্রথমে কোনো কথা বলতে পারল না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "বুবি ট্র্যাপ।"

"বুবি ট্র্যাপ?" জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে বলল, "এই জঙ্গলে বুবি ট্র্যাপ কে বসাবে?"

শ্রাবণী সাবধানে গর্তটার কাছে এগিয়ে গেল। বেশ বড় গোলাকার একটা গভীর গর্ত। গর্তের ওপর লতাপাতা গাছপালা দিয়ে ঢাকা। উপর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এখানে এতবড় একটা গর্ত। শ্রাবণী মাথা নেড়ে বলল, "নিয়াজ ঠিকই বলেছে। আসলেই বুবি ট্র্যাপ।"

"এখানে বুবি ট্র্যাপ কে বসাবে?" জয়ন্ত সাবধানে পুরো জায়গাটা দেখে বলল, "এই দ্বীপে কোনো মানুষ থাকে না।"

"হয়তো থাকে।"

"যদি থাকে তাহলে সে বুবি ট্র্যাপ বানাবে কেন?" জয়ন্ত গর্তের উপর লতাপাতা গাছপালাগুলো দেখে বলল, "আমার মনে হয় এটা একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনন। এমনিতেই একটা বড় গর্তের উপর কিছু ঝোপঝাড় গজিয়েছে।"

"কোনো কারণ ছাড়াই?"

"কারণ থাকলেও সেটা প্রাকৃতিক কারণ।"

জয়ন্তের ব্যাখ্যাটা কারোরই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না—কিন্তু আপাতত সেটা গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। শ্রাবণী খানিকক্ষণ গর্তটা পরীক্ষা করে নিয়াজকে জিজ্ঞেস করল, "তুই ব্যথা পাস নি তো?"

নিয়াজ মাথা নাড়ল, "মনে হয় না। একটু-আধটু ছাল উঠে গেছে।"

শ্রাবণী তার ব্যাগ খুলে একটা মলম জাতীয় টিউব বের করে বলল, "নে, লাগিয়ে নে। এন্টিসেপটিকের কাজ করবে।"

নিয়াজ শুকনো গলায় বলল, "পড়ে গেলে কী হত?"

"কী আর হত—দড়ি দিয়ে বেঁধে আমরা টেনে তুলে ফেলতাম।"

"মনে আছে জব্বার মিয়া বলেছিল গর্তের মাঝে পড়ে গিয়ে মরে গিয়েছিল?"

"এই গর্তের ভেতর পড়লে কেউ মরে যায় না—বড়জোর হাত-পা ভেঙে যেত।" শ্রাবণী আবার গর্তের ভেতরে উঁকি দিয়ে হঠাৎ কী একটা দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে পিছনে সরে গেল।

জয়ন্ত ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী? কী হয়েছে?"

"ভেতরে তাকিয়ে দ্যাখ।"

জয়ন্ত একটু এগিয়ে গিয়ে ভেতরে তাকাল। ভেতরে অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না। সরসর করে এক ধরনের শব্দ হচ্ছে। সে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে ভেতরে তাকিয়ে শিউরে উঠল, এক মানুষ সমান একটি গর্তের নিচে কিলবিল করছে সাপ। একটি-দুটি সাপ নয়—অসংখ্য সাপ। জয়ন্ত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে সে নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে।

নিয়াজ অবাক হয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে এল, বলল, "কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "সাপ।"

"সাপ?"

"হ্যাঁ।"

"কী সাপ?"

"জানি না—তাকিয়ে দ্যাখ।"

নিয়াজ রোদ থেকে চোখ আড়াল করে নিচে তাকিয়ে হতচকিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে নিশ্বাস নিতে পারে না। তারপর বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোরা যদি আমাকে টেনে তুলতে না পারতি কী হত বুঝতে পারছিস?"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল।

"আমি আর এখানে এক সেকেন্ডও থাকছি না। চল যাই।"

জয়ন্ত কোনো কথা না বলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো গর্তের নিচে তাকিয়ে থাকে। নিয়াজ বলল, "কী হল? কথা বলছিস না কেন?"

"স্নেক-পীট। এটা হচ্ছে সাপের গর্ত—এখানে সাপেরা থাকে।"

"হ্যাঁ। সাপদের বাসা।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"গর্তের দেয়ালটা তাকিয়ে দ্যাখ।"

"কী দেখব?"

"দেখেছিস দেয়ালটা কত মসৃণ? তার মানে এখান থেকে কোনো সাপ বের হতে পারে না।"

শ্রাবণী কয়েক হাত পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "তুই কী বলতে চাইছিস?"

"সাপগুলো যদি এখান থেকে বের হতে না পারে তাহলে ওরা খায় কী?"

শ্রাবণী চোখ পাকিয়ে বলল, "সাপের লাঞ্চ ডিনার নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন?"

"না", জয়ন্ত একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "বুঝতে পারছিস না—দেখে মনে হচ্ছে এখানে কেউ সাপগুলোকে পুষছে?"

"একটু আগেই তুই-ই না বললি এখানে কোনো মানুষ নাই?"

"সেই জন্যেই তো বুঝতে পারছি না।"

শ্রাবণী মাথা নেড়ে বলল, "সাপদের বের হওয়ার জন্যে লিফট লাগে না। তারা গর্ত দিয়ে বের হতে পারে। নিচে গর্ত আছে। আর না থাকলে তারা গর্ত করে নেবে।"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"দেখে মনে হয়, কেউ যেন খুব যত্ন করে একটা স্নেক-পীট তৈরি করেছে। দ্যাখ একবার তাকিয়ে দ্যাখ।"

শ্রাবণী মুখ শক্ত করে বলল, "জয়ন্ত, পৃথিবীতে রাজাকারদের পরে আমি যে-জিনিসটা ঘেন্না করি সেটা হচ্ছে সাপ। কাজেই তুই আমাকে সাপ দেখানোর চেষ্টা করবি না।"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে, তোকে দেখানোর চেষ্টা করব না। কিন্তু এটা একটা ফ্যাসিনেটিং জায়গা।"

নিয়াজ বলল, "আমার মতো আছাড় খেয়ে ভেতরে তো পড়িস নি তাই মনে হচ্ছে ফ্যাসিনেটিং জায়গা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ব্যথা তো পাস নি।"

"ব্যথা না-পেলে কী হবে? ভয় পেয়েছি। ভয়। বুঝলি?"

জয়ন্ত নিয়াজের কাঁধে হাত রেখে বলল, "আই অ্যাম সরি নিয়াজ। আমি খুব ইনসেনসেটিভ মানুষের মতো ব্যবহার করছি।"

"ঠিক আছে। এখন সেনসেটিভ মানুষের মতো ব্যবহার কর। এখান থেকে বের হ।"

জয়ন্ত পকেট থেকে সিগারেট বের করে মুখে লাগিয়ে সাবধানে ম্যাচ দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে দূরের বাসাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "বাসাটার এত কাছে এসে না-দেখে চলে যাব?"

নিয়াজ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "তোর এখনো শখ আছে?"

"না মানে, এখন তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এরকম একটা গর্তে পড়ে গিয়ে মানুষ সাপের কামড় খেয়ে মারা যায়। এর মাঝে কোনো রহস্য নেই—কোনো ভৌতিক ব্যাপার নেই।"

"তুই কী বলতে চাইছিস?"

"আমি বলছিলাম কি—এখন যেহেতু কারণটা জেনে গিয়েছি আমাদের তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ঐ বাসাটায় গিয়ে একটু ঘুরে দেখে আসি।"

নিয়াজ শ্রাবণীর দিকে তাকাল। শ্রাবণী বলল, "জয়ন্তের কথায় একটা যুক্তি অবিশ্যি আছে। এতদূর যখন এসেছি বাসাটা দেখে যাই। দেখি পাগলা ডাক্তারের কোনো রহস্যভেদ করতে পারি কি না।"

জয়ন্ত বলল, "তুই নিশ্চিত থাক—এবার আমি সামনে সামনে যাব। লাঠি দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখব কোনো গর্ত আছে কি না।"

নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "চল। কিন্তু তোদের বলে রাখছি, বাসাটায় যাব, ঢুকব আর বের হব।"

AMARBOI.COM

"ঠিক আছে।"

"ওয়ার্ড অব অনার?"

জয়ন্ত নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "ওয়ার্ড অব অনার।"

তিন জনের ছোট দলটা বাসার সামনে এসে একধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। জংলী গাছপালায় পুরোটা ঢেকে গিয়েছে কিন্তু তবু বোঝা যায় একসময় এটি নিশ্চয়ই ছবির মতো একটা সুন্দর বাসা ছিল। দোতলা কাঠের বাসা। ওপরে একটি চমৎকার ডেক। এখানে বসে নিশ্চয়ই সমুদ্রের একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। বাসাটি ঘিরে যত্ন করে গাছ লাগানো হয়েছিল। সেগুলো পুরো এলাকাটিকে ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে। একসময়ে একটা গেট ছিল। এখন সেখানে কিছু নেই। সুড়কি বিছানো ছোট একটা পথ।

তিন জন হেঁটে হেঁটে বাসাটির বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। জানালাগুলো খোলা। কাচ ভেঙে গিয়ে কেমন যেন অসহায় মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্ত দরজাটি ধাক্কা দিতেই সেটি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে জয়ন্ত ধীরে ধীরে ভেতরে ঢোকে। দীর্ঘদিন কেউ না-আসায় ঘরের ভেতরে একধরনের ভ্যাপসা গন্ধ। জয়ন্ত সাবধানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকে তাকিয়ে আরো কয়েক পা ভেতরে ঢুকে হাত দিয়ে অন্য দুজনকে ইঙ্গিত করতেই তারা ভেতরে ঢুকল।

ঘরটি একসময় নিশ্চয়ই সুন্দর করে সাজানো ছিল, এখনো তার কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে। তিন জন সাবধানে হেঁটে ঘরটিকে পরীক্ষা করে। একটি শেলফ কাত হয়ে পড়ে আছে। একটা টেবিল-ল্যাম্প একপাশে ভাঙা। একটা সুদৃশ্য চেয়ার। ঘরের দেয়ালে ধূলি-ধূসরিত একটা অয়েল পেইন্টিং—শ্রাবণী কাছে গিয়ে ফুঁ দিতেই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হয়ে উজ্জ্বল রঙ বের হয়ে এল। শ্রাবণী দেয়ালে টাঙানো অন্য ছবিগুলো পরীক্ষা করে দেখল, এলোমেলো চুলের হাসিখুশি একজন মানুষ একটি বিদেশী মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রাবণী বলল, "এটা নিশ্চয়ই পাগলা ডাক্তার।"

জয়ন্ত এগিয়ে এসে বলল, "তুই কেমন করে বুঝতে পারলি?"

"দেখছিস না পাশে ফরেনার মেয়ে?"

"পাশে ফরেনার মেয়ের সাথে পাগলা ডাক্তারের কী সম্পর্ক?

"আমাদের দেশের যত সাকসেসফুল মানুষ তাদের সবার বিদেশী বউ।"

"তোকে বলেছে!"

"বিশ্বেস করলি না?"

"আর এই পাগলা ডাক্তার সাকসেসফুল কে বলেছে? সাকসেসফুল মানুষ এরকম জঙ্গলে থাকে? থেকে খুন হয়ে যায়?"

শ্রাবণী দার্শনিকের মতো মুখভঙ্গি করে বলল, "বেঁচে থাকাটাই যদি জীবনের অর্থ হয়ে থাকে তাহলে কচ্ছপ হচ্ছে সবচেয়ে সাকসেসফুল। কয়েক শ বছর বেঁচে থাকে।"

নিয়াজ একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "অনেক ফিলসফি হয়েছে। এখন চল যাই।"

জয়ন্ত বলল, "একটু অন্য ঘরগুলো দেখে যাই।"

"কথা ছিল, ঢুকব এবং বের হব।"

"এই তো ঢুকেছি। এখন অন্য ঘরগুলোতে ঢুকে বের হয়ে যাব।"

নিয়াজ হতাশ হওয়ার ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নিচের সবগুলো ঘরই ধুলায় ধূসর। মাকড়সার জাল এবং পোকামাকড়ে ঢেকে আছে। কিছু ব্যবহারী জিনিস, দেয়ালে আরো কিছু ছবি, কয়েকটা আসবাবপত্র পাওয়া গেল। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা একটু নড়বড়ে মনে হল। জায়গাটা দিনের বেলাতেই অন্ধকার, তাই মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে নেওয়া হল। তিন জন সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। জয়ন্ত কয়েক পা উঠে বলল, "সিঁড়ি মনে হয় ঘুণ ধরে ক্ষয়ে গেছে। সাবধান।"

শ্রাবণী জিজ্ঞেস করল, "সাবধানটা কীভাবে হব? ওজন কম করে দেব?"

"তা বলছি না। নিচে দেখে পা ফেলিস। রেলিংটা শক্ত করে ধরে রাখিস। হঠাৎ করে ভেঙে গেলে যেন আছাড় খেয়ে পড়ে না যাস।"

"নিয়াজের মতো!"

"হ্যাঁ, নিয়াজের মতো।"

নিয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, "ব্যাপারটা ফানি ছিল না। যদি পড়ে যেতাম তাহলে মরে যেতাম।"

শ্রাবণী বলল, "এবং হকুনদিয়ার নামটি সার্থক হত।"

উপরে উঠে একটা দরজা পাওয়া গেল। দরজাটি বন্ধ। জয়ন্ত কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে বলল, "তালা মারা রয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাদের কাছে চাবি নাই—কাজেই এখন এটি মিশন ইমপসিবল।"

"জোরে একটা লাথি দিয়ে দেখি, তালা ভাঙতে পারি কি না।"

"একজনের বাসায় তালা ভেঙে ঢোকা আইনত দণ্ডনীয়।"

জয়ন্ত দাঁত বের করে হেসে বলল, "কিন্তু যদি সেই বাসাটা হয় হকুনদিয়ার পাগলা ডাক্তারের বাসা এবং সেই বাসায় গত পাঁচ বছর কেউ ঢুকে না থাকে তাহলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় নয়। সেটা ভদ্রতা—"

বলে জয়ন্ত একটু পিছিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে লাথি দিল। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে মরচে পড়ে তালা নিশ্চয়ই নড়বড় হয়ে ছিল, জয়ন্তের লাথিতে তালা ভেঙে দরজা শব্দ করে ভেতরের দিকে খুলে যায়। শ্রাবণী চোখ বড় বড় করে বলল, "তোর পায়ে জোর তো ভালোই আছে। রাত্রিবেলা মানুষের ঘরের দরজা ভেঙে বেড়াস নাকি?"

জয়ন্ত বুকে থাবা দিয়ে বলল, "হাফ ব্যাক, নাজিরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন।"

নিয়াজ জয়ন্তকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করল, বলল, "কী আশ্চর্য!"

জয়ন্ত এবং শ্রাবণী ভেতরে ঢুকে নিয়াজের মতোই চমৎকৃত হয়ে যায়। ভেতরে অত্যন্ত চমৎকার আধুনিক একটি ল্যাবরেটরি। চমৎকার শ্বেতপাথরের টেবিল। দামি মাইক্রোস্কোপ। উপরে তাকে কাচের শেলফ। টেবিলের পাশে ছোট ফ্রিজ, হিটার সেন্ট্রিফিউজ। পাশে শেলফে সারি সারি বই খাতা, নোট বই।

শ্রাবণী অবাক হয়ে বলল, "এই ল্যাবরেটরিটা দেখি একেবারে চকচক করছে।"

"দরজা জানালা সব বন্ধ ছিল বলে নষ্ট হয় নি।"

"কী সুন্দর ল্যাবরেটরি দেখেছিস?" নিয়াজ মুগ্ধ হয়ে চারদিকে তাকিয়ে বলল, "এরকম একটা জঙ্গুলে জায়গায় কেউ এরকম ল্যাবরেটরি তৈরি করতে পারে?"

নিয়াজ হাতের মোমবাতিটা নিয়ে শেলফের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা বই টেনে নেয়। ধুলা ঝেড়ে বইটা দেখে বলল, "জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের বই।"

"তার মানে পাগলা ডাক্তার একজন জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ার ছিল?"

নিয়াজ বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় হাতে-লেখা নামটি পড়ে বলল, "পাগলা ডাক্তারের ভালো নাম মাজেদ খান। ড. মাজেদ খান।"

"এরকম সুন্দর একটা নাম থাকার পরও তাকে সবাই পাগলা ডাক্তার ডাকে কেন?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করিস না। আমি এই নাম দিই নি।" নিয়াজ শেলফ থেকে আরো কয়েকটা বই নামিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। নিয়াজ পড়াশোনা সংক্রান্ত ব্যাপারে খুব উৎসাহী। কোনো বই পেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না-দেখে নামিয়ে রাখে না। যদিও একটু আগে সে চলে যাবার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল কিন্তু হঠাৎ করে বই এবং কাগজপত্র দেখে সে খুব উৎসাহী হয়ে ওঠে। মোমবাতিটা টেবিলে বসিয়ে সে কাগজপত্র বের করে দেখতে থাকে। জয়ন্ত একটা মাইক্রোস্কোপের ধুলা ঝেড়ে চোখ লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করে। শ্রাবণী একধরনের বিস্ময় নিয়ে ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকে। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে এরকম একটি নির্জন দ্বীপে একজন মানুষ এরকম চমৎকার একটি ল্যাবরেটরি দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারে।

নিয়াজ বই এবং কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ করে বলল, "এই দ্যাখ! কী পেয়েছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী?" জয়ন্ত মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলে নিয়াজের দিকে তাকাল।

"ডায়েরি।"

"ডায়েরি?" শ্রাবণী নিয়াজের কাছে এগিয়ে এল।

"হ্যাঁ। পার্সোনাল ডায়েরি।" নিয়াজ পৃষ্ঠাগুলো উল্টাতে থাকে এবং হঠাৎ করে সেখান থেকে ভাঁজ-করা একটা কাগজ নিচে পড়ল। শ্রাবণী কাগজটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে তাকায়, ভেতরে টানা হাতে কিছু একটা লেখা। শ্রাবণী কৌতূহলী হয়ে মোমবাতির আলোতে পড়ার চেষ্টা করল। মানুষটির হাতের লেখা সুন্দর হলেও পড়তে কষ্ট হয়।

সম্ভবত লিখেছে খুব তাড়াহুড়ো করে। সেজন্যে পড়তে শ্রাবণীর সময় লাগল। পড়ে হঠাৎ করে শ্রাবণীর ভুরু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে কাঁপা গলায় বলল, "কী লেখা এখানে?"

নিয়াজ মুখ তুলে তাকাল, বলল, "কী লেখা?"

শ্রাবণী ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "পড়ে দ্যাখ।"

নিয়াজ কাগজটি হাতে নিয়ে মোমবাতির আলোতে পড়ার চেষ্টা করে। সেখানে লেখা, "এ আমি কী করেছি! একজন একজন করে সবাইকে খুন করেছে—এখন কি আমার পালা? কেউ যদি ভুল করে এই দ্বীপে চলে আসে তার কী হবে?"

ওরা একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "কী লিখেছে এখানে? কে খুন করেছে? কাকে খুন করেছে?"

নিয়াজ ডায়েরিটার পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকে। পেছন থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে। তারপর কিছু পৃষ্ঠা আগে চলে আসে। হঠাৎ করে সে মুখ তুলে তাকায়। মোমবাতির আলোতে দেখায় তার মুখ ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে আছে। শ্রাবণী ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কী লেখা আছে ডায়েরিতে?"

"বেজি!"

"বেজি? কী হয়েছে বেজির?"

"এই বেজিগুলো সাধারণ বেজি নয়। মাজেদ খান জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে ওদের মাঝে বুদ্ধিমত্তার একটা জিন্স ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

"কী বলছিস তুই!"

"হ্যাঁ। এই দ্যাখ।" নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা খুলে পড়ে শোনাল, "সুইডেনের ক্রাম্প ল্যাবরেটরিতে প্রফেসর সোয়ান্সন যে এক্সপেরিমেন্টটি করেছেন আমি আজকে সেটি করেছি। বেজির যে-ক্লোনটি তৈরি করেছি তার তিন নম্বর ক্রমোজমে বুদ্ধিমত্তার জিন্সটিতে মানুষের বুদ্ধিমত্তার জিন্সটি বসিয়ে দিয়েছি। জানি না এই ভ্রূণটা ঠিকভাবে বড় হবে কি না—যদি বড় হয় তাহলে প্রথম একটা স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাঝে মানুষের এরকম একটা জিন্স ঢুকিয়ে দেওয়া হল।"

নিয়াজ মুখ তুলে তাকাল। কাঁপা গলায় বলল, "তার মানে বুঝতে পারছিস? মাজেদ খান এখানে কিছু বেজি তৈরি করেছে যেগুলোর বুদ্ধিমত্তা মানুষের মতো—"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "কী বলছিস পাগলের মতো?"

"আমি পাগলের মতো বলছি না, এই দ্যাখ মাজেদ খান কী লিখেছে।" নিয়াজ ডায়েরির আরো কিছু পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পড়তে থাকে। "বেজিটির বুদ্ধিমত্তা অন্য বেজি থেকে বেশি কি না সেটা আজকে প্রমাণিত হয়ে গেল। বেজিটি খাঁচা থেকে পালিয়ে গেছে। এই খাঁচা থেকে কোনোভাবে বেজিটির পালিয়ে যাবার কথা নয়। কারণ বুদ্ধিমত্তাহীন কোনো প্রাণী এই খাঁচার ছিটকিনি খুলতে পারবে না। শুধুমাত্র অত্যন্ত উন্নত শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তা আছে এরকম একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণীই ছিটকিনি খুলে বের হয়ে যেতে পারে। কাজটি খুব ভুল হয়ে গেল। সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রাণী ছাড়া পেয়ে গেল। এখন এটি যদি তার বাচ্চাদের মাঝে এই বুদ্ধিমত্তার জিন্স ছড়িয়ে দেয়? তারা যদি নতুন বাচ্চার জন্ম দেয়? এই পুরো দ্বীপটি যদি বুদ্ধিমান বেজি দিয়ে ভরে ওঠে?"

শ্রাবণী ভয়–পাওয়া গলায় বলল, "তার মানে আমাদের পিছু–পিছু যে বেজিটা আসছিল সেটা মানুষের মতো বুদ্ধিমান?"

কেউ শ্রাবণীর কথার উত্তর দিল না। নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, "এই দ্যাখ কী লেখা—আমি এই দ্বীপের সব বেজিগুলো মারার চেষ্টা করেছি। গুলি করে মারার চেষ্টা করেছি। বিষাক্ত খাবার দিয়ে মারার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই বুদ্ধিমান বেজিকে মনে হয় মারতে পারি নি। আজকে প্রথম কিছু বেজির বাচ্চাকে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে ছুটে যেতে দেখলাম। তাহলে কি বুদ্ধিমান নতুন বেজির বাচ্চার জন্ম হয়েছে? সর্বনাশ! এখন কী হবে? আমি বেজিগুলোকে মারার চেষ্টা করেছি বলে আমাকে শত্রু হিসেবে ধরে নিয়েছে। এই বেজিগুলো কি এখন থেকে আমাকে কিংবা সব মানুষকেই শত্রু হিসেবে বিবেচনা করবে?"

মোমবাতির আলোতে সবাই চুপ করে বসে থাকে। কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ করে থেমে গিয়ে আবার পড়তে শুরু করল, "বেজিদের একটি বুদ্ধিমান প্রজন্মের জন্ম হলে তারা কী করবে? সবার আগে নিজেদের খাবার সংগ্রহের ব্যাপারটি নিশ্চিত করবে। আজকে আমি তাই আবিষ্কার করেছি। তারা একটি বড় গর্ত করে সেখানে সাপদের এনে জড়ো করেছে। আমি জানতাম না সাপ তাদের এত প্রিয় খাবার। সাপগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ইঁদুর ধরে এনে গর্তের মাঝে ছেড়ে দিচ্ছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার!"

নিয়াজ মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "এখন বুঝতে পারছিস আমি যেই গর্তটাতে পড়তে যাচ্ছিলাম সেটা কোথা থেকে এসেছে?"

"হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি।"

শ্রাবণী ভয়–পাওয়া গলায় বলল, "এখন কী হবে?"

জয়ন্ত অনিশ্চিতের মতো মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি না।" সে ধীরে ধীরে দরজার কাছে হেঁটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি আটকে দিল। অন্য দুজন একধরনের আতঙ্ক নিয়ে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ করে ছিটকিনি আটকে দিয়ে তারা প্রথমবার স্বীকার করে নিল এখানে তারা একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি এসে পড়েছে।

নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ করে থেমে গিয়ে আবার পড়তে শুরু করল, "বুদ্ধিহীন প্রাণী চলে সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে কিন্তু বুদ্ধিমান প্রাণী নতুন জিনিস শিখতে পারে। এই বেজিগুলো বুদ্ধিমান। তারা প্রতিদিন নতুন জিনিস শিখছে। আজকে আবিষ্কার করলাম, বেজিগুলো আমার পোষা কুকুরটিকে মেরে ফেলেছে। রাত্রিবেলা কুকুরটার চিৎকার শুনে আমি বন্দুক নিয়ে ছুটে বের হয়ে গেছি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বেজিগুলো জানে—একটা প্রাণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তার দৃষ্টি। কাজেই সবার আগে সেগুলো কুকুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চোখ দুটো খুবলে তুলে নিয়েছে। তার পরের অংশটি সহজ। বেজিগুলো ধারালো দাঁত দিয়ে কুকুরের ঘাড়ের বড় আর্টারিটা ছিন্ন করে দিয়েছে। কী নৃশংস! বেজিগুলো তাদের থেকে অনেক বড় প্রাণীকে হত্যা করতে শিখে গেছে—এখন কি আমাদের হত্যা করবে?

আমার ল্যাবরেটরি এসিস্টেন্ট খুব ভয় পেয়েছে। ভয় পাওয়ারই কথা।"

নিয়াজ ডায়েরি থেকে মুখ তুলে বলল, "মনে আছে জব্বার মিয়া কী বলেছিল?"

"কী বলেছিল?"

"চোখ দুটো সাবধান।"

"হ্যাঁ। মনে আছে—"

"এখন বুঝেছিস তো কেন?"

কেউ কোনো কথা না বলে নিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইল। নিয়াজ ডায়েরির পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ করে থেমে যায়। একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল, "আজকে আমার ল্যাবরেটরি এসিস্টেন্ট খুন হয়ে গেল। মৃতদেহটি বাসার সামনে পড়ে ছিল। চোখ দুটো খুবলে নিয়ে ঘাড়ের বড় আর্টারিগুলো ধারালো দাঁত দিয়ে কেটে নিয়েছে। কাজটি করেছে প্রায় নিঃশব্দে। আমি রাতে কোনো শব্দও শুনতে পারি নি। তাকে আমি ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু সে আমার কথা না-শুনে ঘর থেকে বের হয়েছিল। কেন বের হল? আমার ধারণা বেজিগুলো কোনো একটা বুদ্ধি করে তাকে বের করে নিয়েছে। এখন এই দ্বীপে আমি একা। আমার ধারণা বাইরে থেকে কোনো সাহায্য না পেলে আমার অবস্থাও আমার ল্যাবরেটরি এসিস্টেন্টের মতো হবে।"

নিয়াজ আবার মুখ তুলে তাকাল। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, 'ডায়েরি কি এখানেই শেষ?"

"না। আরো কয়েক পৃষ্ঠা আছে।"

"কী লেখা আছে এখানে?"

নিয়াজ পড়তে শুরু করে, "বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রথম প্রচেষ্টাই হল তার বুদ্ধিমত্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া। কাজেই এই বেজিগুলো যে সেরকম চেষ্টা করবে সে-ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এই দ্বীপের যেদিকেই তাকাই সেদিকেই আমি বেজিগুলোকে দেখতে পাই। নিষ্পলক দৃষ্টিতে দূর থেকে আমাকে লক্ষ করে। দৃষ্টিগুলো দেখে আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমি আজকাল ঘর থেকে বের হই না। মাথার কাছে লোডেড বন্দুকটা রাখি। কিন্তু কেন জানি মনে হয়, এই বন্দুক আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমার মনে হয়, এটি খুব বড় সৌভাগ্য যে বেজিগুলো এই দ্বীপের মাঝে আটকা পড়ে আছে। এখান থেকে অন্য দ্বীপে কিংবা দেশের মূল ভূখণ্ডে যেতে পারছে না। যদি একবার চলে যায় তখন কী হবে! ভেবেই আমার বুক কেঁপে ওঠে।"

"আমি ক'দিন থেকেই ভেবে বের করার চেষ্টা করছি—একটি প্রাণী যদি হঠাৎ করে বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে তার ফল কী হতে পারে। মানুষ ক্রমবিবর্তনে ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বেজিগুলোর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা বিবর্তনে বুদ্ধিমান হয় নি। এরা বুদ্ধিমান হয়েছে আমার একটা ভুলের জন্যে। আমি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে এই এক্সপেরিমেন্টটি করে ফেলেছি এবং বেজিটি আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে! পৃথিবীর মানুষ আমাকে যেন ক্ষমা করে।"

"আমার মনে হয় প্রাণীটা বুদ্ধিমান হবার পর নিশ্চয়ই তারা ভাব বিনিময় করার জন্যে নিজেদের একটা ভাষা আবিষ্কার করেছে। ডেকের ওপর বসে আমি বাইনোকুলার দিয়ে চারপাশের বেজিগুলোকে দেখি। মনে হয় এগুলো এখন নিজেদের মাঝে কথা বলছে। মনে হচ্ছে বেজিগুলোর নিজস্ব কোনো ভাষা আছে। শুধু-যে ভাষা আছে তা নয়—মনে হয় সামনের পা দুটোকে হাত হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। আজকাল আমাকে খুব সাবধান থাকতে হয়—মনে হয় বেজিগুলো ঘরের ছিটকিনি খুলে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যে-জিনিসটি এখনো বেজিগুলো শিখে নি সেটা হচ্ছে আগুনের ব্যবহার। তাহলে কি এই আগুন দিয়েই কোনোভাবে এদের ধ্বংস করতে হবে? আমি জানি না।"

"আমার কী হবে আমি জানি না। আমি যে ভুল করেছি সেজন্যে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।"

নিয়াজ ডায়েরিটা বন্ধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "ডায়েরিটা এখানেই শেষ।"

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। মোমবাতির আলোটি স্থির হয়ে ছিল, মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে, দেয়ালে তাদের বড় ছায়া পড়েছে। শ্রাবণী কাঁপা গলায় বলল, "এখন কী হবে?"

"মাজেদ খানের একটা বন্দুক ছিল, সে পুরো ব্যাপারটা জানত তারপরও নিজেকে বাঁচাতে পারে নাই। আমরা কেমন করে বাঁচব?" নিয়াজ সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের কোনো আশা নেই।"

"সব আমার দোষ।" জয়ন্ত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি যদি তোদের জোর করে নিয়ে না আসতাম—"

"ওসব বলে লাভ নেই। আমরা কেউ বাচ্চা শিশু না, কেউ কাউকে জোর করে আনতে পারে না।"

"তবুও—আমি যদি—"

"ওসব কথা বলে লাভ নেই।" শ্রাবণী মাথা নেড়ে বলল, "এখন কী করা যায় সেটা বল।"

"এমন কি হতে পারে যে আমরা শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছি?"

"মানে?"

"এই-যে বুদ্ধিমান বেজির ব্যাপারটা—আসলে এটা খানিকটা বাড়াবাড়ি। আসলে সেরকম কিছু নেই। একটা বেজি আর কত বিপজ্জনক হবে? এইটুকু একটা জন্তু—"

নিয়াজ এবং শ্রাবণী নিঃশব্দে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে রইল। জয়ন্ত বলল, "আগেই কেন ভয়ে কাবু হয়ে থাকব। ব্যাপারটা দেখা যাক। এই ডায়েরিটা পাঁচ বছর আগে লেখা, পাঁচ বছরে কত কী হতে পারে।"

"উল্টোটাও হতে পারে।" নিয়াজ বলল, "পাঁচ বছর আগে এটা যত ভয়ঙ্কর ছিল এখন হয়তো আরো অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ। উল্টোটা হতে পারে—কিন্তু আগেই সেটা ধরে নেব কেন? এই যে আমরা তিন জন হেঁটে হেঁটে এসেছি, আমাদের কিছু হয়েছে? সত্যিই যদি ভয়ঙ্কর বেজি আক্রমণ করে মানুষকে মেরে ফেলতে পারত—তাহলে আমাদের মারল না কেন?"

"তা ঠিক।" নিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "তাহলে তুই কী করতে চাস?"

"প্রথমে এখান থেকে বের হয়ে বাসাটা দেখি। কী হচ্ছে না হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করি। এখন মনে হচ্ছে জব্বার মিয়ার বন্দুকটা নিয়ে এলে খারাপ হত না।"

"মাজেদ খানের একটা বন্দুক ছিল, সেটা খুঁজে দেখলে হয়।"

শ্রাবণী ভুরু কুঁচকে বলল, "তুই কখনো বন্দুক দিয়ে গুলি করেছিস?"

"না। কিন্তু সেটা আর কত কঠিন হবে?"

"একটা নাকি ধাক্কা লাগে—বেকায়দা ধাক্কা লেগে নাকি মানুষ উল্টে পড়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধুর। বাজে কথা। পুঁচকে পুঁচকে সন্ত্রাসীরা বন্দুক দিয়ে কাটা রাইফেল দিয়ে গুলি করছে না?"

"তুই তো আর সন্ত্রাসী না। সন্ত্রাসী হলে তো আর চিন্তা ছিল না।"

"যাই হোক—" নিয়াজ বলল, "এখন আর সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। আমাদের কাছে বন্দুক নাই, আছে বাঁশের লাঠি, সেটা হাতে নিয়ে বের হতে হবে।"

"হ্যাঁ।" জয়ন্ত লাঠিটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সাবধানে দরজা খুলে তারা ল্যাবরেটরি-ঘর থেকে বের হয়। একটা ছোট করিডর ধরে হাঁটতে থাকে। পাশাপাশি কয়েকটা ঘর, একটা সম্ভবত স্টোর রুম, একটা লাইব্রেরি, আরেকটা ছোট বিশ্রাম করার ঘর। করিডরের একপাশে দরজা, দরজা খুলে সম্ভবত বারান্দায় যাওয়া যায়। দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে জয়ন্ত দরজা খুলে বের হয়ে এল। ভেতরে অন্ধকার থেকে হঠাৎ করে প্রখর আলোতে এসে তাদের সবার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মোমবাতিগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে তারা বারান্দায় রেলিঙের কাছে এগিয়ে যায়—ভালো করে দেখার জন্যে তাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। উজ্জ্বল আলোতে চোখ সয়ে যাবার পর তারা আবিষ্কার করল এই বারান্দাটি থেকে একপাশে সমুদ্রের চমৎকার একটি দৃশ্য দেখা যায়, অন্যপাশে দ্বীপের গাছগাছালি। তাদের মনের ভেতরে বেজি নিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনাটি না থাকলে নিঃসন্দেহে এখানে দাঁড়িয়ে তারা দৃশ্যটি উপভোগ করত। তারপরও তারা সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শ্রাবণী হেঁটে বারান্দার অন্যপাশে এসে বনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বড় বড় গাছ, গাছের নিচে ঝোপঝাড়। গাছপালা ঝোপঝাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্রাবণী একধরনের অস্বস্তি বোধ করে, অস্বস্তিটি ঠিক কেন বোধ করছে সে ধরতে পারে না—তার শুধু মনে হয় ওখানে কিছু-একটা জিনিস ঠিক নেই। শ্রাবণী রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে আরো তীক্ষ্ণচোখে তাকাল, হঠাৎ করে মনে হল গাছের নিচ ঝোপের আড়ালে কিছু-একটা যেন নড়ে উঠেছে। শ্রাবণী তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে হঠাৎ ভয়ানকভাবে চমকে ওঠে। বাসাটি ঘিরে গাছপালাগুলোর নিচে যতদূর চোখ যায় অসংখ্য বেজি নিশ্চল হয়ে বসে আছে। এতদূর থেকে বোঝা যায় না কিন্তু তাদের ছোট ছোট কুতকুতে চোখ তাদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে নিবদ্ধ হয়ে আছে। শ্রাবণী আতঙ্কে একটা আর্ত চিৎকার করে উঠল এবং সেই চিৎকার শুনে নিশ্চল বেজিগুলো একসাথে পেছনের দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

জয়ন্ত কাঁপা গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

শ্রাবণী হাত তুলে দেখাল, "ঐ দ্যাখ।"

জয়ন্ত এবং নিয়াজ তাকিয়ে দেখে বাসাটি ঘিরে কয়েক হাজার বেজি পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে স্থিরচোখে তাদের তিন জনের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আমরা যখন হেঁটে আসছিলাম—এই কয়েক হাজার বেজি ইচ্ছে করলে আমাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত।" শ্রাবণী বলল, "কেন করে নি কে জানে।"

জয়ন্ত কিংবা নিয়াজ কোনো কথা বলল না।

"একটি দুটি খ্যাপা জন্তু-জানোয়ার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়—কিন্তু এরকম কয়েক হাজার থেকে রক্ষা পাবে কেমন করে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়াজ একটু নড়েচড়ে বলল, "জব্বার মিয়া। আমাদের একমাত্র ভরসা জব্বার মিয়া।"

শ্রাবণী বলল, "কীভাবে?"

"জব্বার মিয়া এসে যখন দেখবে আমরা নেই—তখন আমাদের খোঁজ নেওয়ার একটা ব্যবস্থা করবে না?"

"সেটা কখন করবে? ততক্ষণ আমরা কী করব?"

"ততক্ষণ যেভাবেই হোক আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।"

জয়ন্ত এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল। এবারে সোজা হয়ে বসে বলল, "দ্যাখ—আমরা মনে হয় ব্যাপারটাকে একটু বেশি মেলোড্রামাটিক করে ফেলছি। বাইরে যে-প্রাণীটা দুই পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাণীটা কী? প্রাণীটা হচ্ছে বেজি। একটা বেজির ভয়ে আমরা আঁকুপাকু করব সেটা ঠিক হচ্ছে না—"

শ্রাবণী বাধা দিয়ে বলল, "একটা নয়—কয়েক হাজার—"

জয়ন্ত প্রায় নাটকের ভঙ্গিতে পা দিয়ে শব্দ করে বলল, "কয়েক হাজার হোক আর কয়েক লক্ষ হোক তাতে কিছু আসে যায় না। বেজি হচ্ছে বেজি। আমি এই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এদের বারোটা বাজিয়ে দেব।"

অনেকক্ষণ পর প্রথমবার শ্রাবণীর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, "শুনে খুশি হলাম। এই পিটানোর কাজটা কখন শুরু করবি? এখনই বের হবি লাঠি হাতে?"

জয়ন্ত একটু ক্রুদ্ধচোখে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই ঠাট্টা করছিস? এটা ঠাট্টার সময়?"

শ্রাবণী বলল, "আই অ্যাম সরি। তুই ঠিকই বলেছিস—এটা ঠাট্টার সময় নয়—কিন্তু তুই একটা লাঠি নিয়ে ইয়া-আলী বলে লাফঝাঁপ দিয়ে বেজি মারছিস, দৃশ্যটা কল্পনা করে কেমন জানি হাসি পেয়ে গেল।"

জয়ন্ত কোনো কথা না বলে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি বিশ্বাস করতে পারি না একজন মানুষ এরকম সময় ঠাট্টা করতে পারে।"

নিয়াজ বলল, "এটা দোষের ব্যাপার না, এরকম একটা সময়ে যে ঠাট্টা করতে পারে বুঝতে হবে তার মাথা ঠাণ্ডা—বিপদের সময় সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।"

জয়ন্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তা ঠিক।"

"কাজেই এখন ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাক।" নিয়াজ শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই শুরু কর।"

"আমি? আমি কেন?"

"এক্ষুনি না প্রমাণ করে দিলাম যে তোর মাথা সবচেয়ে ঠাণ্ডা।"

"আমার মাথা ঠাণ্ডা না। কখনো ছিল না। তোর প্রমাণে গোলমাল আছে।"

"ঠিক আছে, জয়ন্ত তাহলে তুই বল।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "প্রথমে উপরতলাটা সিকিউর করতে হবে যেন ঐ বদমাইশ বেজিগুলো উপরে আসতে না পারে।"

"সেটা কীভাবে করবি?"

"নিচের দরজা উপরের দরজা সবকিছু বন্ধ রেখে।"

"তারপর?"

"তারপর এই পুরো বাসাটি খুঁজে দেখতে হবে কী কী জিনিসপত্র আছে। সেই জিনিসপত্র দিয়ে একটা নতুন প্ল্যান করতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ভেরি গুড।"

"বন্দুকটা খুঁজে পেলে খারাপ হয় না।"

"যদি না পাই?"

"তাহলে আপাতত আমাদের হাতে একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে এই ম্যাচটা।" জয়ন্ত পকেট থেকে ম্যাচটা বের করে বলল, "যদি সিগারেট না খেতাম তাহলে এই ম্যাচটাও থাকত না।"

"তাহলে আপাতত পরিকল্পনা হচ্ছে এই বাসাটাকে দুর্গের মতো ব্যবহার করে থাকা?"

জয়ন্ত শ্রাবণীর দিকে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"খাওয়াদাওয়া?"

"তুই যদি কিছু না এনে থাকিস তাহলে বন্ধ।"

"আমি কোত্থেকে আনব?" ব্যাগ হাতড়ে কয়েক টুকরো চকলেট বের করে বলল, "এই হচ্ছে একমাত্র ফুড সাপ্লাই।"

নিয়াজ বলল, "আমরা নিশ্চয়ই এখানে মাসখানেক থাকার পরিকল্পনা করছি না—বড় জোর আজকের দিনটা।"

"তা ঠিক।" জয়ন্ত দুর্বলভাবে হেসে বলল, "কিন্তু খাওয়ার কথা বলতেই কেমন জানি খিদে পেয়ে গেল!"

নিয়াজ হাসার চেষ্টা করে বলল, "শুধু-শুধু খাওয়ার কথা চিন্তা না করে কাজে লেগে যাওয়া যাক।"

"হ্যাঁ।" জয়ন্ত বলল, "একজনকে সবসময় থাকতে হবে বারান্দার কাছাকাছি। বেজির গুষ্টি কোনো বদমাইশি করার চেষ্টা করলেই অন্যদের জানিয়ে দেবে।"

শ্রাবণী বলল, "আমি বসে বসে এই বেজির বাচ্চাগুলো দেখতে পারব না। তোরা কেউ দ্যাখ।"

জয়ন্ত বলল, "ঠিক আছে, আমি দেখছি। তোরা এই ল্যাবরেটরি, স্টোর রুম, রেস্ট এরিয়া খুঁজে দেখ কী কী পাওয়া যায়।"

"কোনো বিশেষ কিছু খুঁজব নাকি?"

"একটা মেশিনগান হলে মন্দ হয় না!"

জয়ন্তের কথা শুনে দুজনেই শব্দ করে হাসল এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারল দীর্ঘ সময় পর এই প্রথমবার তারা হাসছে। আনন্দহীন হাসি—কিন্তু তবুও হাসি।

ল্যাবরেটরিতে বেশকিছু প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া গেল—যেমন বেশ কিছু সলভেন্ট, এগুলো দিয়ে এই মুহূর্তে কোনোকিছু পরিষ্কার করার প্রয়োজন নেই—কিন্তু বিশাল একটা আগুন জ্বালানোর জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। বড় বড় কয়েকটা কাচের বোতলে কিছু এসিড এবং ক্ষার পাওয়া গেল। ড্রয়ারে প্রচুর সিরিঞ্জ রয়েছে। সিরিঞ্জের ভেতরে এই এসিড কিংবা ক্ষার ভরে কিছু ভয়ানক অস্ত্র তৈরি করা যেতে পারে। এছাড়াও ধারালো ব্লেড এবং চাকু রয়েছে। রবারের গ্লাভস রয়েছে প্রচুর। যদিও দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে খানিকটা আঠা আঠা হয়ে আছে। ওরা সবচেয়ে খুশি হল চোখের ওপর পরার জন্যে প্লাস্টিকের গগলস পেয়ে—পাজি বেজিগুলো যদি চোখের ওপর হামলা চালাতেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে তাহলে এগুলো কাজে লাগবে।

ল্যাবরেটরির ড্রয়ারে তারা একটা বাইনোকুলার পেয়েই সেটা সাথে সাথে জয়ন্তকে দিয়ে এল—বেজিগুলোর কাজকর্ম এখন খুব ভালোভাবে দেখা যাবে।

স্টোররুমে অনেক ধরনের ব্যবহারী জিনিস পাওয়া গেল। মোমবাতি দুটি শেষ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছিল, সৌভাগ্যক্রমে সেখানে কয়েক বাক্স মোমবাতি পাওয়া গেল। নাইলনের দড়ি, স্ক্রু ড্রাইভার, করাত-হাতুড়ি এ-ধরনের বেশকিছু প্রয়োজনীয় জিনিসও ছিল। বেশকিছু ব্যাটারি ছিল কিন্তু সেগুলো কোনো কাজে আসবে না—নষ্ট হয়ে ভেতর থেকে আঠালো কেমিক্যাল বের হয়ে আসছে।

তবে সবচেয়ে দরকারি জিনিসটা তারা পেয়ে গেল বিশ্রাম নেবার ঘরে। সোফার কুশনের নিচে লুকিয়ে রাখা একটা দোনলা বন্দুক এবং ড্রয়ারের ভেতরে বন্দুকের গুলি। বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিয়াজের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, যুদ্ধবাজ জেনারেলের মতো বন্দুকটা উপরে তুলে বলল, "এবারে দেখে নেব বেজির বাচ্চা বেজিদের।"

শ্রাবণী বলল, "এভাবে কথা বলিস না—তোকে ঠিক সন্ত্রাসীর মতো দেখাচ্ছে।"

নিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "বন্দুক জিনিসটা নিশ্চয়ই খারাপ। হাতে নিলেই নিজের ভেতরে কেমন জানি মাস্তান-মাস্তান ভাব এসে যায়।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, হাতে নিয়ে দ্যাখ।"

শ্রাবণী হাতে নিয়ে বলল, "কোথায়? আমার তো হাতে নিয়ে নিজেকে কীরকম জানি বেকুব-বেকুব লাগছে!"

নিয়াজ বলল, "সেটাই ভালো। আসলে বেকুব-বেকুবই লাগার কথা।"

"আয় জয়ন্তকে সুসংবাদটা দিই—এখন আমাদের একটা অস্ত্র আছে। মেশিনগান না হলেও বন্দুক তো বটেই!"

জয়ন্ত বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে বারান্দায় গুঁড়ি মেরে বসে ছিল, পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে নিয়াজ আর শ্রাবণীকে বন্দুক হাতে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বন্দুক! কোথায় পেলি?"

"সোফার কুশনের নিচে লুকানো ছিল।" শ্রাবণী বলল, "বন্দুকটা হাতে নেওয়ার পর থেকে নিয়াজ মাস্তান-মাস্তান ব্যবহার করছে!"

জয়ন্ত বাইনোকুলারটা শ্রাবণীর কাছে দিয়ে বন্দুকটা হাতে নিয়ে চাপ দিয়ে সেটা খুলে ব্যারেলের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বলল, "ময়লা হয়ে আছে—পরিষ্কার করতে হবে।"

শ্রাবণী অবাক হয়ে বলল, "তুই বন্দুক চালাতে পারিস?"

"আমার এক মামা পাখি শিকার করতেন, তাঁর সাথে মাঝে মাঝে যেতাম।"

"পাখি শিকার!" শ্রাবণী চোখ কপালে তুলে বলল, "ইশ! কী নিষ্ঠুর।"

"তুই কি চিকেন খাস না?"

"খাই। কেন?"

"চিকেন একধরনের পাখি। সেটা জ্যান্ত খাওয়া হয় না। মেরে কেটেকুটে খাওয়া হয়—সেটা নিষ্ঠুর না?"

নিয়াজ বাইনোকুলারটা নিয়ে বেজিগুলোকে দেখার চেষ্টা করছিল। জয়ন্ত বলল, "দেখেছিস? মোস্ট ফেসিনেটিং।"

শ্রাবণী জিজ্ঞেস করল, "কী জিনিস মোস্ট ফেসিনেটিং?"

"এই বেজিগুলো। মনে হচ্ছে এদের মাঝে একটা সমাজব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।"

"এতে অবাক হবার কী আছে? প্রায় জন্তুদেরই তো সমাজব্যবস্থা থাকে। জংলী কুকুর, হায়না, হাতি—"

"না, না, সেরকম না। এখানে মনে হচ্ছে এদের দায়িত্ব ভাগ করা আছে। কেউ কেউ শ্রমিক—কেউ কেউ—"

"আঁতেল?"

জয়ন্ত শব্দ করে হেসে বলল, "হ্যাঁ অনেকটা সেরকম। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক আর ডিসকভারি চ্যানেলে সব সময়ে দেখেছি জন্তু-জানোয়ারে সবেচেয়ে যেটা বেশি শক্তিশালী সেটাই হচ্ছে নেতা। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে অন্য ব্যাপার।"

"কী ব্যাপার?"

"কড়ই গাছের নিচে শুকনো হাড়-জিরজিরে একটা বেজি বসে আছে আর অনেকগুলো ধুমসো মোটা বেজি সেটাকে পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে কোনো বেজি দেখা করতে আসে—সেটাকে এস্কর্ট করে নিয়ে যায়, হাড়-জিরজিরে বুড়ো বেজিটার সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে থাকে। আর সবচেয়ে পিকুলিয়ার—"

"কী?"

"মনে হয় এই বেজিগুলোর একটা ভাষা আছে, নিজেদের মাঝে এরা কথা বলে। মনে হয় হাড়-জিরজিরে বুড়ো বেজিটা হাত নাড়িয়ে কথা বলে, কিছু একটা অর্ডার দেয়। সে-ই নেতা।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, দ্যাখ বাইনোকুলারটি দিয়ে।"

শ্রাবণী বাইনোকুলারটি চোখে দিয়ে দূরে তাকায়। কড়ই গাছের নিচে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে একটা শুকনো দুর্বল বেজি বসে আছে। গাছটিকে ঘিরে আরো অনেকগুলো বেজি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই বোঝা যায়, এই শুকনো হাড়-জিরজিরে দুর্বল বেজিটি আসলে দুর্বল নয়—অন্য বেজিগুলো ক্রমাগত তার কাছে আসছে এবং যাচ্ছে, আদেশ নিচ্ছে এবং ছুটে চলে যাচ্ছে। যদি ব্যাপারটি এরকম পরিবেশে না হত তাহলে শ্রাবণী নিশ্চিতভাবে এর মাঝে খানিকটা কৌতুক খুঁজে পেত। কিন্তু এখন সে কোনো কৌতুক খুঁজে পেল না।

ঠিক দুপুরবেলা বেজিগুলো প্রথমবার তাদের আক্রমণ করল। নিয়াজ বাইনোকুলার চোখে দিয়ে বসে ছিল। হঠাৎ করে সে চিৎকার করে বলল, "বেজিগুলো কিছু একটা করছে।"

জয়ন্ত ল্যাবরেটরি-ঘরে কিছু কাঠের টুকরায় কাপড় বেঁধে মশাল তৈরি করছিল। সেগুলো টেবিলে রেখে চিৎকার করে জানতে চাইল, "কী করছে?"

"ছুটোছুটি করছে।"

"কেন?"

"বুঝতে পারছি না।"

কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই কারণটা বোঝা গেল। বেজিদের বিশাল বাহিনী থেকে একটা বিরাট অংশ হঠাৎ করে বাসাটির দিকে ছুটে আসতে শুরু করল। এর মাঝে তারা বাসার দরজা জানালা যতটুকু সম্ভব বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু তবু বেজিগুলোকে নিরুৎসাহিত করা গেল না। পুরোনো বাসার ফাঁকফোকর দিয়ে সেগুলো পিলপিল করে ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। জয়ন্ত হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্রাবণী আর নিয়াজ বড় বড় লাঠিগুলো নিয়ে অপেক্ষা করে।

"এই ঘরের ভেতরে যদি ঢুকে যায় তাহলে গুলি করব। ঠিক আছে?"

অন্য দুজন মাথা নাড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মশালগুলো রেডি আছে। সলভেন্টে চুবিয়ে শুধু আগুন লাগাতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

"সিরিঞ্জগুলোতে এসিড ভরে রেখেছি—খুব কাছে এলে সেটা পুশ করে দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু সেটা হচ্ছে একেবারে নিরুপায় হলে। লাস্ট রিসোর্ট।"

শ্রাবণী বলল, "আমার মনে হয় সবাই চোখে প্লাস্টিক গগলসটা পরে নিই।"

"হ্যাঁ, যদি কোনোভাবে ঘরে ঢুকে যায়—তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

বেজিগুলো বুদ্ধিমান, কাজেই তারা খুব বুদ্ধিমানের মতো কিছু করবে এরকম একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু দেখা গেল সেরকম বুদ্ধিমানের মতো কিছু করল না। দল বেঁধে বেজিগুলো তাদের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করতে লাগল। নিচে দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও জানালার ভাঙা কাচ এবং ঘরের ফাঁকফোকর দিয়ে সেগুলো ঢুকতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মাঝেই সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল এবং তারপরই ল্যাবরেটরির দরজায় সেগুলো ধাক্কা দিতে শুরু করল। ল্যাবরেটরির দরজাটা ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করে রাখা আছে। কয়েকটা বেজি সেগুলো ধাক্কা দিয়ে খুলতে পারবে না। তবু তারা তিনজন আতঙ্কে সিঁটিয়ে রইল। শুধু যে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে তা নয়, তারা দেখতে পেল দরজার নব ঘুরিয়ে বেজিগুলো দরজা খোলার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য যে বেজির মতো একটা প্রাণী জানে দরজা খোলার জন্যে নব ঘোরাতে হয়।

কী করবে বুঝতে না পেরে জয়ন্ত দরজার ভেতর থেকে কয়েকটা লাথি মেরে চিৎকার করে বলল, "বদমাইশ বেজির বাচ্চা বেজি। ভাগ এখান থেকে, না হলে খুন করে ফেলব গুলি করে।"

জয়ন্তের কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ করে দরজায় ধাক্কা থেমে গেল। মনে হল জয়ন্তের কথা বুঝি বুঝতে পেরেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। কান পেতে ওরা শুনতে পেল, বেজিগুলো মুখ দিয়ে বিচিত্র নানা ধরনের শব্দ করছে।

নিয়াজ আর শ্রাবণী কী করবে বুঝতে পারছে না। যদি কোনোভাবে দরজা ভেঙে বেজিগুলো ঢুকে যেতে পারে তাহলে কী হবে তারা চিন্তাও করতে পারে না। এক মুহূর্তে হয়তো তাদের ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে।

হঠাৎ ঝনঝন করে কোথায় জানি কাচ ভাঙার শব্দ হল। জয়ন্ত বন্দুক হাতে ল্যাবরেটরির পিছনে ছুটে গিয়ে হতবাক হয়ে যায়। বেজিগুলো আসলেই বুদ্ধিমান—সামনে তাদেরকে ব্যস্ত রেখে সেগুলো পিছন দিয়ে ঢুকে পড়ছে। ল্যাবরেটরির পিছনে পর্দার পিছনে কাচের জানালা ভেঙে বেজিগুলো ঢুকতে শুরু করেছে। জয়ন্ত হতবাক হয়ে দেখল, বেজিগুলো মুখে পাথরের টুকরো ধরে সেগুলি দিয়ে কাচের ওপর আঘাত করে কাচ ভেঙে ফেলছে। কাচের ধারালো ভাঙা টুকরোয় বেজিগুলোর পা কেটে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না, লাফিয়ে লাফিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। কিছু বোঝার আগেই জয়ন্ত টের পেল গোটাদশেক বেজি তাকে ঘিরে ফেলেছে। জয়ন্ত পিছনে ঘুরে লাথি দিয়ে কয়েকটা বেজিকে দূরে ছুড়ে দিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, সে পিছন থেকে কোনোটাকে আক্রমণ করতে দিতে চায় না। কিছু বোঝার আগে একটা বেজি লাফিয়ে তার শরীর বেয়ে উপরে উঠে তার চোখে কামড় দেওয়ার চেষ্টা করল—কিন্তু শক্ত প্লাস্টিকের গগলস থাকায় সেটা প্লাস্টিকের উপর তার ধারালো দাঁতের চিহ্ন রেখে নিচে গড়িয়ে পড়ল। জয়ন্ত হাত দিয়ে বেজিটাকে সরিয়ে দিয়ে বন্দুক দিয়ে গুলি করার চেষ্টা করে কিন্তু বেজিগুলো ক্রমাগত ছুটছে বলে কিছুতেই নিশানা ঠিক করতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়ন্তের চিৎকার শুনে নিয়াজ আর শ্রাবণী লাঠি হাতে ছুটে এসে বেজিগুলোকে আঘাত করার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড আঘাতে বেজিগুলো ছিটকে পড়ে বিচিত্র শব্দ করতে শুরু করে। জয়ন্ত ঘরের ভেতরে গুলি করার সাহস পায় না বলে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে কয়েকটার মাথা থেঁতলে দিল। বেজিগুলো একধরনের জান্তব শব্দ করে তাদের শরীর বেয়ে ওঠার চেষ্টা করে চোখে কামড় দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু প্লাস্টিকের গগলস থাকায় তারা প্রতিবারই রক্ষা পেয়ে গেল। ঘরের ভেতরে ভয়ঙ্কর একটা নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে গেছে। একটার পর একটা বেজি এসে ঢুকছে—কতক্ষণ এদের সাথে টিকে থাকতে পারবে তারা বুঝে উঠতে পারছিল না। অসম্ভব দ্রুত বেজিগুলো কিছু বোঝার আগে তাদের শরীর বেয়ে উপরে উঠে কামড়ে ধরার চেষ্টা করতে থাকে। জয়ন্ত কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে চিৎকার করে বলল, "মশালগুলো নিয়ে আয়—"

শ্রাবণীর শরীরে কয়েকটা বেজি কামড়ে ধরেছে, তার মাঝে সে কোনোভাবে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে ছুটে গিয়ে মশালটা নিয়ে সলভেন্টের ড্রামে ভিজিয়ে নিয়ে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে দিল। সাথে সাথে সেটা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। দ্বিতীয় মশালটা জ্বালিয়ে সে জয়ন্ত আর নিয়াজের কাছে ছুটে এল। একটা মশাল নিয়াজের হাতে দিয়ে অন্য মশাল নিয়ে এলোপাতাড়ি বেজিগুলোকে মারতে থাকে। সারা ঘরে বেজির লোম পোড়া একটা গন্ধে ভরে যায়। হঠাৎ করে বাইরে থেকে বেজি ঢোকা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরের বেজিগুলোও ঘরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে পড়ে—আগুন জিনিসটাকে মনে হয় সত্যিই ওরা ভয় পায়।

জয়ন্ত হিংস্র গলায় চিৎকার করে বলল, "কোথায় পালিয়েছিস বদমাইশ বেজির দল? সবগুলোকে খুন করে ফেলব। জবাই করে ফেলব, পুড়িয়ে কয়লা করে দেব—"

নিয়াজ আর শ্রাবণীও বেজিগুলোকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু বড় ল্যাবরেটরির আনাচে-কানাচে কোথায় লুকিয়ে আছে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এক পলকের জন্যে একটা দেখতে পেলেও সেটা চোখের পলকে অন্য কোথাও সরে যাচ্ছে।

হঠাৎ এক কোনা থেকে একটা বেজি ছুটে বের হয়ে এসে অবিকল মানুষের গলায় বলল, "ক্রিঁকি ক্রিঁকি—" এবং এরকম শব্দ করতে করতে সেটি জানালার ফুটো দিয়ে বের হয়ে গেল। সাথে সাথে ঘরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকা বেজিগুলোও ক্রিঁকি ক্রিঁকি শব্দ করতে করতে ছুটে পালিয়ে যেতে শুরু করে। নিয়াজ, শ্রাবণী আর জয়ন্ত প্রচণ্ড আক্রোশে পালিয়ে যেতে থাকা বেজিগুলোকে লাঠি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করে কয়েকটার মাথা থেঁতলে দিল।

শেষ বেজিটি পালিয়ে যাবার পর তারা ল্যাবরেটরি-ঘরটির চারদিকে তাকাল। সমস্ত ঘরের লণ্ডভণ্ড অবস্থা। গোটা-ছয়েক বেজি মরে পড়ে আছে। গোটা-দশেক অর্ধমৃত হয়ে এখানে-সেখানে ছটফট করছে। নিজেদের দিকে তাকানো যায় না—চোখগুলো বেঁচে গিয়েছে কিন্তু শরীরের প্রায় পুরোটুকু ক্ষতবিক্ষত। জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে আছে। শ্রাবণী নিয়াজ এবং জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে দেখতে যদি তোদের মতো দেখাচ্ছে তাহলে খবর বেশি ভালো নয়।"

জয়ন্ত বন্দুকটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে বলল, "তোকে আরো বেশি খারাপ দেখাচ্ছে।"

"কত খারাপ?"

"ডাইনি বুড়ির মতো।"

"থ্যাংক ইউ জয়ন্ত। তোর মতো আন্তরিক সমবেদনাসম্পন্ন মানুষ পাওয়া খুব কঠিন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়াজ নিজের হাতপায়ের দিকে লক্ষ করে বলল, “আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে এটা ঘটেছে।”

“ঘটেছে না। বল ঘটছে।” শ্রাবণী বলল, “আমি বাজি ধরে বলতে পারি এই বদমাইশগুলি আর দশ মিনিটের মাঝে ফেরত আসছে।”

নিয়াজ কাচভাঙা জানালাগুলোর দিকে তাকাল, বলল, “আবার যখন আসবে তখন কী করব?”

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে বলল, “জানালাগুলো কাঠের তক্তা দিয়ে লোহা মেরে বন্ধ করে দিতে হবে।”

“তক্তা কোথায় পাবি?”

জয়ন্ত ল্যাবরেটরির চেয়ার টেবিল দেখিয়ে বলল, “এগুলো ভেঙে বের করতে হবে।”

নিয়াজ প্রথমে ভাবল জয়ন্ত ঠাট্টা করছে, কিন্তু তার মুখে কৌতুকের কোনো চিহ্ন নেই। নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “চল তাহলে দেরি করে লাভ নেই।”

শ্রাবণী ঘরের মৃত এবং অর্ধমৃত বেজিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, “এগুলো কী করব?”

“দরজা খুলে বাইরে ফেলে দে। বদমাইশগুলোকে দেখলেই গা ঘিনঘিন করছে।”

কিছুক্ষণের মাঝে দেখা গেল সবাই মিলে ঘরটাকে আবার সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছে। পরের আক্রমণটা কখন হবে কেমন হবে সেটা এখনো কেউ জানে না।

AMARBOI.COM

দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে তিনজন বসে আছে। শরীরের নানা জায়গায় রক্ত শুকিয়ে আছে। কোথাও পানি নেই। তিনজন তিনটি বিকারে খানিকটা এলকোহল নিয়ে একটুকরো কাপড়ে ভিজিয়ে রক্ত মোছার চেষ্টা করছে।

শ্রাবণী বলল, “শুধু শুধু চেষ্টা করছি। বেজির দল আবার এল বুঝি।”

“প্রথম ধাক্কাটা তো সামলে নিয়েছি।”

শ্রাবণী জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, “পরের ধাক্কাটা হবে আরো শক্ত।”

নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “আমরা কি একটার পর একটা ধাক্কা সহ্য করতে থাকব? আমাদের কি এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে না?”

“হ্যাঁ। যেতে হবে।”

“সেটা কীভাবে করব? এই ল্যাবরেটরিতে অল্প কয়টা বেজি আমাদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিয়েছে—বাইরে আমরা কেমন করে যাব? আমাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে না?”

জয়ন্ত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই শ্রাবণী চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্য দুজন তাকিয়ে দেখে একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, “ভয় পাবি না, কেউ ভয় পাবি না। আমার কাছে বন্দুক আছে, আরেকটু কাছে এলেই গুলি করে দেব।”

জয়ন্ত কথা শেষ করার আগেই দ্বিতীয় সাপটিকে দেখা গেল এবং সেটি পুরোপুরি ঘরের ভেতরে আসার আগেই দরজার নিচে দিয়ে তৃতীয় সাপটির মাথা প্রবেশ করল।

শ্রাবণী পেছনে সরে গিয়ে একটা টেবিলের ওপরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, “কী হচ্ছে এখানে? কী হচ্ছে? এত সাপ কোথা থেকে আসছে? কোথা থেকে আসছে?”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবণীর কথা শেষ হবার আগেই আরো দুটি সাপের মাথা উঁকি দিল। জয়ন্ত আতঙ্কিত হয়ে দেখল, দরজার নিচে দিয়ে আরো সাপের মাথা কিলবিল করছে। জয়ন্ত হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, হঠাৎ করে সে এত সাপ কোথা থেকে আসছে খানিকটা অনুমান করতে পারে। কিন্তু এখন সেটা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। সে বন্দুকটা তুলে চিৎকার করে বলল, "সরে যা সবাই, পেছনে সরে যা।"

জয়ন্ত বন্দুকটা তুলে বড় কয়েকটা সাপ লক্ষ করে নিশানা করে ট্রিগার টেনে ধরল। গুলি হবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না, কিন্তু গুলি হল। বন্ধ ঘরে সেই বিকট শব্দে সবার কানে তালা লেগে যায়। ধোঁয়া সরে গেলে দেখতে পেল সাপগুলো গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কয়েকটা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা অনেকগুলো বেজির চিৎকার শুনতে পেল—সেগুলো দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

নিয়াজ হাতের লাঠি দিয়ে সাপগুলোকে মারার চেষ্টা করে। কয়েকটার শিরদাঁড়া ভেঙে দিল। কয়েকটা ল্যাবরেটরির কোনায় লুকিয়ে গেল। প্রাথমিক উত্তেজনাটুকু কেটে যাবার পর শ্রাবণী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "দেখলি? দেখলি বেজিগুলো কী করছে?"

"সাপ ধরে ধরে এনে ছেড়ে দিচ্ছে।"

"কত বড় বদমাইশ দেখেছিস?"

নিয়াজ হাতের লাঠিটা হাতে নিয়ে সতর্ক-চোখে ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল, "তুই এমনভাবে কথা বলছিস যেন ওগুলো বেজি না—মানুষ।"

"হ্যাঁ।" শ্রাবণী মাথা নেড়ে বলল, "ফিচলে বুদ্ধি দেখেছিস?"

জয়ন্ত বলল, "পড়িস নি—অহি-নকুল সম্পর্ক? এই হচ্ছে সেই অহি-নকুল। নকুল অহিকে ধরে ধরে এনে এখানে ছেড়ে দিচ্ছে।"

"এরপরে কী করবে?"

"ভাগ্যিস এখনো আগুন জ্বালানো শেখে নি—যদি জানত তাহলে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর বাসায় আগুন লাগিয়ে দিত।"

নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আঁতেলদের মতো শুধু কথা বলিস না—কী করা যায় ভেবে ঠিক কর।"

জয়ন্ত রেগে গিয়ে বলল, "আমি আঁতেলদের মতো শুধু কথা বলছি?"

"বলছিসই তো। সেই তখন থেকে ভ্যাদর ভ্যাদর করছিস।"

শ্রাবণী বিরক্ত হয়ে বলল, "এটা ঝগড়া করার সময়? চুপ করবি তোরা?"

দুজনে চুপ করে কঠিন মুখে শ্রাবণীর দিকে তাকাল। শ্রাবণী বলল, "আগে এই ঘরটা মোটামুটি সিকিওর ছিল, এখন এর ভেতরে সাপ ছেড়ে দিয়েছে। ভেতরে কয়টা সাপ লুকিয়ে আছে কে জানে। এখানে থাকা যাবে না।"

"এখন পর্যন্ত দেখা গেছে বেজিগুলো আগুনকে ভয় পায়। আগুনটাই আমাদের ভরসা।"

জয়ন্ত নিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী করবি আগুন দিয়ে?"

"ধর, অনেকগুলি মশাল তৈরি করে—সেগুলো হাতে নিয়ে যদি হেঁটে যাই? বিচে গিয়ে জব্বার মিয়ার ট্রলারের জন্যে অপেক্ষা করি?"

জয়ন্ত খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণচোখে নিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "ইট মে ওয়ার্ক। ঠিকই বলেছিস। তবে একটা ডেঞ্জার আছে।"

'কী ডেঞ্জার?"

"যদি আমাদের আক্রমণ করে বসে আমাদের কিছু করার নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বন্দুকটা আছে।"

"হ্যাঁ, বন্দুকটা দিয়ে কিছু গুলি করতে পারি—কয়েকটা মারতে পারি—কিন্তু তাতে লাভ কী?"

শ্রাবণী অস্থির হয়ে বলল, "কিন্তু কিছু-একটা তো করতে হবে—আমরা তো এভাবে বসে থাকতে পারব না?"

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "বেঁচে থাকার জন্যে দরকার হলে এভাবে বসেই থাকতে হবে। এখনো জব্বার মিয়া আছে—জব্বার মিয়া হচ্ছে আমাদের বাইরের পৃথিবীর সাথে কানেকশন। সে যখন এসে দেখবে আমরা বিচে নাই—তখন নিশ্চয়ই কিছু-একটা করবে। দরকার হলে আমাদের এখানে সাপের সাথে বেজির সাথে বসে থাকতে হবে।"

বেজিদের দ্বিতীয় আক্রমণটা হল আরো পরিকল্পিতভাবে। বাসার ছাদে ধুপধাপ শব্দ শুনে তারা বারান্দায় এসে দেখে, পাশের একটা বড় কড়ই গাছের ওপরে বেজিগুলো একটা গাছের লতা বেঁধেছে। সেই লতাটি ধরে ঝুল খেয়ে ছাদের ওপর বেজিগুলো লাফিয়ে এসে নামছে। দৃশ্যটি নিজের চোখে না দেখলে তারা বিশ্বাস করত না। বেজির মতো একটা প্রাণী যে গাছের ডালে একটা লতা বাঁধতে পারে সেটাই বিশ্বাস হতে চায় না। দড়ির মতো চমৎকার এরকম একটা লতা কোথায় পেয়েছে সেটাও একটা রহস্য। নিয়াজ বাইনোকুলার দিয়ে দেখে বলল, "লতাটি বেণির মতো বুনে নেওয়া হয়েছে।"

তিনজন খানিকক্ষণ বেজিদের এই অবিশ্বাস্য কার্যক্রম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত জয়ন্ত বলল, "এগুলোকে থামাতে হবে।"

নিয়াজ জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে থামাব?"

"গুলি করে।"

বন্দুকে গুলি ভরতে গিয়ে জয়ন্ত থেমে গিয়ে বন্দুকটা নিয়াজের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নে এবারে তুই গুলি কর।"

"আমি আগে কখনো গুলি করি নি।"

"সেই জন্যেই দিচ্ছি। এইম করে ট্রিগার টেনে ধরবি।"

"নিশানা যদি না হয়?"

"না-হওয়ার কী আছে? ছররা গুলি—নিশানার দরকারও নেই।"

নিয়াজ গাছের লতা বেঁধে ঝুলে আসা একটা বেজিকে গুলি করতেই বেজিগুলো কর্কশ স্বরে চিৎকার করতে শুরু করল। তারা অবাক হয়ে লক্ষ করল, বেজিগুলো অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। চোখের পলকে সেগুলো কোথাও লুকিয়ে গেল। দেখে মনে হল কোথাও কিছু নেই। মিনিট দশেক পর ধীরে ধীরে বেজিগুলো বের হয়ে আসে, তারপর আবার লতাটি টেনে টেনে একটা বেজি গাছের উপর উঠতে থাকে। তাদের ধৈর্যের কোনো অভাব নেই এবং কিছুক্ষণের মাঝে আবার লতায় ঝুল খেয়ে বাসার ছাদে লাফিয়ে পড়তে শুরু করে। দেখে মনে হয় বেজিগুলো বুঝে গিয়েছে তাদের কাছে গুলি বেশি নেই। এভাবে খুব বেশিবার তাদেরকে উৎপাত করা হবে না।

বাসার ছাদে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা উপস্থিত হওয়ার পর সেগুলো নিশ্চয়ই কার্নিশ বেয়ে ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একসাথে কতগুলো আসবে এবং কীভাবে আক্রমণ করবে তারা এখনো জানে না। বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। ছাদে বেজিদের ধুপধাপ শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। চারপাশে একধরনের ভয়-ধরানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতঙ্ক। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে—কিছুক্ষণ পর অন্ধকার হয়ে আসবে—তখন কী হবে কে জানে!

ঠিক এরকম সময়ে তারা অনেক দূর থেকে একটা ট্রলারের শব্দ শুনতে পেল। শ্রাবণী বলল, "জব্বার মিয়া ট্রলার নিয়ে এসেছে।"

অন্য দুজন কোনো কথা বলল না। এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে পালিয়ে যাবার একটা অদম্য ইচ্ছে কাজ করছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না। হঠাৎ করে তাদের ভেতরে একধরনের অস্থির হতাশা এসে ভর করে। নিয়াজ প্রায় বেপরোয়া হয়ে বলল, "চল মশাল জ্বালিয়ে বের হয়ে যাই।"

গত কয়েক ঘণ্টার ঘটনায় তাদের ভেতরে এরকম ভয়ঙ্কর একটা চাপ পড়েছে যে, সেটা সহ্য করা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল।

তারা আরেকটু হলে নিয়াজের কথায় হয়তো সত্যি সত্যি বের হয়ে পড়ত। কিন্তু ঠিক তখন হঠাৎ করে ঝুপঝুপ করে চারদিক থেকে বেজিগুলো লাফিয়ে পড়তে শুরু করল। জয়ন্ত চিৎকার করে বলল, "ল্যাবরেটরি ঘরে—"

কিন্তু জয়ন্তের কথা শেষ হবার আগেই প্রায় বিশ থেকে ত্রিশটি বেজি তার ওপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করতে না-পেরে সে হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে যায়। জয়ন্ত ছটফট করতে থাকে এবং তার সারা শরীরে বেজিগুলো কিলবিল করতে থাকে। নিয়াজ আর শ্রাবণী পাগলের মতো লাঠি দিয়ে মারার চেষ্টা করে কিন্তু সেগুলো ভ্রূক্ষেপ করে না। নিয়াজ এগিয়ে আসা কিছু বেজিকে লক্ষ করে গুলি করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল কিন্তু একই জায়গায় কাছাকাছি জয়ন্ত এবং শ্রাবণী—সে গুলি করতে পারল না। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বেজিগুলোর মাথা আর শরীর থেঁতলে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

শ্রাবণী ছুটে ল্যাবরেটরি-ঘরে গিয়ে দুটো মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে বাইরে ছুটে আসে। জয়ন্তকে বাঁচানোর জন্যে মশাল দিয়ে তার শরীরের ওপরেই বেজিগুলোকে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকে। এইভাবে তারা কতক্ষণ যুদ্ধ করেছে জানে না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেজিগুলো কর্কশ শব্দ করতে করতে জয়ন্তকে ছেড়ে সরে যায়। জয়ন্ত টলতে টলতে কোনোভাবে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে একটা লাঠি তুলে নিয়ে বেজিগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে বেজিগুলোর মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, শিরদাঁড়া ভেঙে সেগুলো যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। নিয়াজ আর শ্রাবণীর জ্বলন্ত মশালের আগুনের ঝাপটায় শেষ পর্যন্ত শেষ বেজিটিও পালিয়ে যাবার পর জয়ন্ত দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে বলল, "মোস্ট পিকুলিয়ার।"

শ্রাবণী আর নিয়াজ জয়ন্তের কাছে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করে। শরীরের নানা জায়গা কেটে গেছে। আগুনের হলকায় বুক পেট হাতের কনুই ঝলসে গেছে। সারা শরীরে কালিঝুলি মেখে তাকে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। জয়ন্ত নিয়াজ আর শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "বেজিগুলো এবার শুধু আমাকে আক্রমণ করল কেন? আমি কী করেছি?"

শ্রাবণী চিন্তিতভাবে বলল, "হ্যাঁ। আমিও বুঝতে পারছি না। মনে হল একেবারে চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনা করে তোকে ধরেছে।"

জয়ন্ত কাঁপা গলায় বলল, "একসাথে এতগুলো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে ইচ্ছে করলে আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত। কিন্তু মনে হল ওদের অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল—"

"কী উদ্দেশ্য?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছু বুঝতে পারছি না। মনে হয়েছে সারা শরীর তন্নতন্ন করে খুঁজেছে কিছু-একটার জন্য—"

নিয়াজ হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "এই দ্যাখ।"

শ্রাবণী ছুটে গেল, জয়ন্ত পিছু পিছু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল। টেবিলের নিচে একটা বেজি মরে পড়ে আছে। সম্ভবত লাঠির আঘাতে মাথাটা পুরোপুরি থেঁতলে গেছে। তবে বেজিটা এখনো শক্ত করে একটা ম্যাচের বাক্স ধরে রেখেছে। নিয়াজ অবাক হয়ে বলল, "এটা ম্যাচটা কোথায় পেয়েছে?"

জয়ন্ত নিজের পকেটে হাত দিয়ে বলল, "আমার ম্যাচ। আমার পকেট থেকে নিয়েছে।"

তিনজনই একজন আরেকজনের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "বুঝতে পেরেছি আমাকে কেন ধরেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে নিশ্চয়ই ম্যাচ দিয়ে সিগারেট ধরাতে দেখেছে—তাই এখন ম্যাচটা চায়। আগুন ধরানো শিখতে চায়।"

নিয়াজ নিচু হয়ে মৃত বেজিটার সামনের দুই পা দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখা ম্যাচটি হাতে নিয়ে বলল, "তাহলে কি আমরা বেজিদের সাথে একটা সন্ধি করতে পারি? আমরা ওদেরকে এই ম্যাচটা দেব—তারা আমাদের চলে যেতে দেবে!"

শ্রাবণী কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখন মনে হল খুব কাছে থেকে ট্রলারের শব্দটা শোনা যাচ্ছে। তারা প্রায় ছুটে বের হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল—সেখান থেকে সমুদ্রের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। জব্বার মিয়া তার ট্রলারটা নিয়ে আসছে। শ্রাবণী অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! জব্বার মিয়া এখানে চলে এল কেমন করে? সে কেমন করে জানে আমরা এখানে?"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—" নিয়াজ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে সুবিধে করতে পারল না।

"নিশ্চয়ই কী?"

জয়ন্ত বলল, "গুলির শব্দ শুনে অনুমান করেছে আমরা নিশ্চয়ই মাজেদ খানের বাসায় আছি?"

"হ্যাঁ। তাই হবে!"

তিন জন বারান্দায় দাঁড়িয়ে জব্বার মিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কয়েকটা গাছের আড়ালে থাকার কারণে তারা মোটামুটি বেশ স্পষ্ট জব্বার মিয়াকে দেখতে পেলেও জব্বার মিয়া তাদের দেখতে পাচ্ছে না। নিয়াজ বলল, "এই সুযোগ। আমাদের এখন অল্প কিছুদূর যেতে হবে! মাত্র এইটুকু।"

"কিন্তু মাত্র এইটুকু যেতে কতগুলো বেজি পার হয়ে যেতে হবে দেখেছিস?"

"হ্যাঁ।" শ্রাবণী মাথা নাড়ল, "ঠিকই বলেছিস।"

"কিন্তু কিছু তো করার নেই। আয় মশালে আগুন জ্বালিয়ে বের হয়ে যাই।" নিয়াজের কথা শুনে সবাই বাইরে তাকাল। কয়েক হাজার বেজি নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে দেখে আবার তারা সাহস হারিয়ে ফেলল। এই দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে পালিয়ে যাবার সুযোগ এত কাছে চলে এসেছে তবুও যেতে পারছে না বলে তারা একধরনের হতাশায় ছটফট করতে থাকে।

তারা দেখতে পেল, জব্বার মিয়া ট্রলারটাকে খানিকটা টেনে তীরে তুলল যেন সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে না যায়। তারপর রোদ থেকে চোখ আড়াল করে এদিক-সেদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাল। কিছু দেখতে না-পেয়ে চিন্তিতমুখে নৌকার পাটাতন তুলে তার হাতে বানানো পাইপগানটা তুলে নিয়ে হেঁটে আসতে শুরু করল। হাঁটার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল জব্বার মিয়া এই জায়গাটা মোটামুটি চেনে। সে এখন মাজেদ খানের বাসার দিকেই আসছে।

জয়ন্ত অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সর্বনাশ, এখন দেখি জব্বার মিয়া এদিকে আসছে। একেবারে সোজাসুজি বেজিদের মুখে পড়বে।"

"হ্যাঁ। ওকে আসতে নিষেধ কর।" শ্রাবণী ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "চিৎকার করে নিষেধ করে দে।"

নিয়াজ চিৎকার করে জব্বার মিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। সেই চিৎকার শুনে বেজিগুলো সচকিত হয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল কিন্তু জব্বার মিয়া কিছু শুনতে পেল না। দ্বীপটার ঠিক এই জায়গা দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া শনশন করে বইছে। গাছের পাতার শব্দ, সমুদ্রের গর্জন সব মিলিয়ে কিছু শোনার কথা নয়। তিন জন একধরনের আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইল এবং দেখতে পেল জব্বার মিয়া আলগোছে তার পাইপগানটা ধরে ধীরে ধীরে একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পা দিতে আসছে।

শ্রাবণী ফ্যাকাসে মুখে বলল, "সর্বনাশ! কী হবে এখন! জব্বার মিয়া যে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না—"

তিন জনে মিলে আবার চিৎকার করল। মনে হল জব্বার মিয়া কিছু-একটা শুনতে পেল। কিন্তু সেটা শুনে সে থেমে না গিয়ে আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে ওপরে ছুটে আসতে শুরু করল।

জয়ন্ত বলল, "জব্বার মিয়াকে থামাতে হবে। এক্ষুনি থামাতে হবে।"

"কীভাবে থামাবি?"

"বন্দুকটা দে—একটা গুলি করি। গুলির শব্দ শুনলে থেমে যাবে।"

ব্যাপারটা পুরোপুরি চিন্তা না করেই জয়ন্ত বন্দুকটা হাতে নিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ করল এবং সাথে সাথে জব্বার মিয়া চমকে উঠে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল। গুলির প্রচণ্ড শব্দে বেজিগুলো এক মুহূর্তের জন্যে নিচু হয়ে যায় এবং পরমুহূর্তে মাথা তুলে তাকিয়ে জব্বার মিয়াকে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করার জন্যে ছুটে যেতে থাকে।

এতদূর থেকেও তারা জব্বার মিয়ার মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের চিহ্ন দেখতে পেল, সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কয়েক মুহূর্ত সে ছুটে-আসা বেজিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাজেদ খানের বাসার দিকে ছুটতে শুরু করল। জয়ন্ত, শ্রাবণী এবং নিয়াজ একটি ভয়ের ছবির দৃশ্যের মতো দেখতে পেল একজন মানুষ তার প্রাণ নিয়ে ছুটছে এবং তার পেছন থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ধূসর মৃত্যু এগিয়ে আসছে। জব্বার মিয়া ছুটছে এবং তার মাঝে কয়েকটা বেজি লাফিয়ে তার শরীরের নানা জায়গায় কামড় দিয়ে ঝুলে পড়ল। জব্বার মিয়া হাত দিয়ে সেগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো লাভ হয় না। শেষ পর্যন্ত হাতের পাইপগানটা লাঠির মতো ব্যবহার করে প্রচণ্ড আঘাতে সে কিছু বেজিকে ছিটকে ফেলে দিল। ছুটতে ছুটতে সে একটা গুলি করে বেশকিছু বেজিকে রক্তাক্ত করে দিল কিন্তু তবু বেজিগুলো থামল না। মাজেদ খানের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জয়ন্ত নিয়াজ আর শ্রাবণী দেখতে পেল ছুটতে ছুটতে জব্বার মিয়া বাসার খুব কাছে চলে এসেছে কিন্তু তবু শেষ রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য বেজি পেছন থেকে একসাথে জব্বার মিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং টাল সামলাতে না পেরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। পরমুহূর্তে দেখা গেল জব্বার মিয়া একটা ধূসর আবরণে ঢেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে, তার ওপর অসংখ্য বেজি কিলবিল করছে, চোখের পলকে নিশ্চয়ই তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

শ্রাবণী চিৎকার করে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখার মতো সাহস তার নেই।

জয়ন্ত কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পায়। সে চিৎকার করে বলল, "জব্বার মিয়াকে বাঁচাতে হবে!"

নিয়াজ জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে?"

"জানি না।" জয়ন্ত বন্দুকে গুলি ভরে নিচে ছুটতে ছুটতে বলল, "তোরা মশালে আগুন জ্বালিয়ে আন, তাড়াতাড়ি।"

জয়ন্ত চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল। জব্বার মিয়া ছটফট করছে, তার ওপরে ঢেউয়ের মতো বেজিগুলো দৌড়াদৌড়ি করছে—তাদের হিংস্র আস্ফালনের মাঝেও জয়ন্ত জব্বার মিয়ার আর্তচিৎকার শুনতে পেল। জয়ন্ত জব্বার মিয়াকে বাঁচিয়ে তার কাছাকাছি বেজিগুলোকে লক্ষ করে গুলি করল। গুলির আঘাতে অসংখ্য বেজি ছিটকে পড়ে যায়—মুহূর্তের জন্যে সেগুলো থমকে দাঁড়ায়, বেশকিছু ছুটে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। জয়ন্ত সেই অবস্থায় চিৎকার করে জব্বার মিয়ার কাছাকাছি ছুটে যেতে যেতে দ্বিতীয়বার গুলি করল। বেজিগুলো এবারে লাফিয়ে খানিকটা দূরে সরে গেল, কিন্তু একেবারে চলে গেল না। তারা কুতকুতে হিংস্র চোখে জব্বার মিয়া এবং জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে রইল।

ততক্ষণে শ্রাবণী এবং নিয়াজও ছুটে আসছে। তাদের দুই হাতে চারটি জ্বলন্ত মশাল। সেখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুন দেখে বেজিগুলো আরো কয়েক পা পিছিয়ে যায়। জয়ন্ত ছুটে গিয়ে এবার জব্বার মিয়াকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। সারা শরীর রক্তাক্ত। মনে হয় বেজিগুলো খুবলে তার শরীর থেকে মাংস তুলে নিয়েছে। জব্বার মিয়া চোখ খুলে তাকাল। তার চোখে আতঙ্ক এবং অবিশ্বাস।

নিয়াজ এবং শ্রাবণী মশালগুলো নাড়তে নাড়তে আগুনের শিখা দিয়ে বেজিগুলোকে ভয় দেখাতে দেখাতে এগিয়ে আসতে থাকে। বেজিগুলো নিরাপদ দূরত্বে থেকে একধরনের চাপা গর্জন করতে থাকে। শ্রাবণী এবং জয়ন্ত মিলে জব্বার মিয়াকে টেনে সোজা করে দাঁড় করাল। নিয়াজ মাটি থেকে তার পাইপগানটা তুলে নেয়। এটা দিয়ে কীভাবে গুলি করতে হয় সেটা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই, তবু সেটি বেজিদের দিকে তাক করে রাখল।

শ্রাবণী চোখের কোনা দিয়ে বেজিগুলোকে লক্ষ করে, সেগুলো আক্রমণের ভঙ্গিতে তাদের লেজ নাড়ছে। যে-কোনো মুহূর্তে আবার তাদের আক্রমণ করে বসতে পারে। জব্বার মিয়াকে দুই পাশ থেকে ধরে জয়ন্ত আর শ্রাবণী মাজেদ খানের বাসার দিকে নিতে থাকে, তাদের ঠিক পেছনে পেছনে নিয়াজ মশালটি নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসে।

বাসার সিঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছে যাবার পর হঠাৎ করে বেজিগুলো আক্রমণ করল। তাদের নিজস্ব কোনো সংকেত আছে—সেটি পাওয়ামাত্রই চলন্ত ট্রেনের মতো ছুটে এসে কয়েক শ বেজি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার প্রচণ্ড ধাক্কায় তারা সিঁড়ির ওপরে আছড়ে পড়ল। হাত থেকে মশাল ছিটকে পড়ে এবং হঠাৎ করে শ্রাবণী বুঝতে পারল তাদেরকে বেজিগুলো এখন শেষ করে ফেলবে। ঘাড়ের কাছে কোথায় জানি কয়েকটা বেজি কামড়ে ধরেছে। সেগুলো ছোটানোর জন্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে—কিন্তু একটাকে সরানোর আগেই আরো দশটি এসে জাপটে ধরছে। আগুনের মশালের ওপরে কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে, মাংস এবং লোম পোড়ার একটা উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগে। যন্ত্রণায় কেউ একজন

চিৎকার করছে—গলার স্বরটি কার শ্রাবণী বুঝতে পারল না। মৃত্যু তাহলে এরকম—এই ধরনের একটা কথা মনে হল তার, ব্যাপারটি ভয়ঙ্কর, ব্যাপারটি বীভৎস। তার মাথায় একটা বেজি কামড়ে ধরে শক্ত চোয়ালের আঘাতে ছিঁড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পায়ে কয়েকটা কামড়ে ধরে মাংস ছিঁড়ে নিতে চাইছে। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় শ্রাবণী আর্তনাদ করে উঠল। মৃত্যু যদি আসবেই সেটি তাহলে আরো তাড়াতাড়ি কেন আসছে না?

শ্রাবণী প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অচেতন হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার ভেতরেও কে জানি তাকে বলল, চেষ্টা কর—বেঁচে থাকার চেষ্টা কর। সে তাই শেষবার চেষ্টা করল, চিৎকার করে বলল, "ক্রিঁকি ক্রিঁকি ক্রিঁকি—"

হঠাৎ করে জাদুমন্ত্রের মতো বেজিগুলো থেমে গেল। একটি আরেকটির দিকে তাকাল। মনে হচ্ছে কিছু-একটা বুঝতে পারছে না। শ্রাবণী আবার বলল, "ক্রিঁকি ক্রিঁকি ক্রিঁকি—"

সাথে সাথে বেজিগুলি লাফিয়ে তাদের শরীর থেকে নেমে গিয়ে অবিকল মানুষের গলায় "ক্রিঁকি ক্রিঁকি ক্রিঁকি" বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে যেতে শুরু করে।

বেজিগুলো সরে যেতেই শ্রাবণী মাথা তুলে তাকাল। অন্য তিনজন সিঁড়ির ওপরে এবং নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদেরকে দেখে মানুষ বলে চেনা যায় না। দেখে মনে হয় রক্তাক্ত কিছু মাংসপিণ্ড। শ্রাবণী কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়-পাওয়া গলায় ডাকল, "নিয়াজ, জয়ন্ত।"

কোনোমতে নিয়াজ আর জয়ন্ত উঠে বসে। তারা বিস্ফারিত চোখে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে থাকে—বেজিগুলো যে তাদের টুকরো-টুকরো না করেই চলে গেছে এখনো সেটা তাদের বিশ্বাস হচ্ছে না।"

শ্রাবণী টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তোরা উঠতে পারবি?"

"মনে হয় পারব।" নিয়াজ বন্দুকটার ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। শ্রাবণী গিয়ে জয়ন্তের হাত ধরে তুলল। জয়ন্ত আর নিয়াজ মিলে চেষ্টা করে জব্বার মিয়াকে টেনে তুলল। তারপর ছোট দলটা কোনোভাবে নিজেদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিতে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "শ্রাবণী, তুই কেমন করে জানলি যে ক্রিঁকি ক্রিঁকি বললে বেজিগুলো আমাদের ছেড়ে দেবে?"

"যদি জানতাম তাহলে আরো আগেই বলতাম। জানতাম না বলেই তো এই অবস্থা।"

"কী বলছিস তুই—আমরা জানে বেঁচে গিয়েছি জানিস?"

"আমি এত নিশ্চিত নই। একবার বেঁচে গিয়েছি মানে নয় যে সব বার বেঁচে যাব। তবে এইভাবে মরব কখনো ভাবি নি।"

"এখনো তো মরি নি—"

শ্রাবণী কোনো কথা বলল না। জয়ন্ত আবার জিজ্ঞেস করল, "তুই কেমন করে বুঝতে পারলি ক্রিঁকি ক্রিঁকি বললে ওগুলো চলে যাবে?"

"মনে নেই ল্যাবরেটরিতে প্রথম যখন এসেছিল—পালিয়ে যাবার সময় একটা বেজি বলল ক্রিঁকি ক্রিঁকি। তখন সবগুলো মিলে পালিয়ে গেল।"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"আমার তাই মনে হল হয়তো ক্রিঁকি ক্রিঁকি মানে, বিপদ বিপদ পালাও। সেটা শুনে হয়তো সবগুলো পালাবে।"

নিয়াজ এই অবস্থায় হাসার চেষ্টা করে বলল, "তুই বেজিদের একটা মাত্র শব্দ শিখেছিস—সেটা দিয়েই চারজন মানুষের জান বাঁচিয়ে দিয়েছিস। কী আশ্চর্য!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবণী কোনো কথা বলল না। সে কোনোকিছু চিন্তা করতে পারছিল না, যদি পারত তাহলে বুঝতে পারত যে ব্যাপারটি সত্যিই খুব আশ্চর্য।

ল্যাবরেটরি–ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চারজন মেঝের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তাদের শরীর থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ে মেঝের বড় অংশ রক্তাক্ত হয়ে যেতে থাকে।

শ্রাবণী চোখ খুলে দেখল জয়ন্ত জব্বার মিয়ার হাত ধরে পালস পরীক্ষা করছে। শ্রাবণী কোনোভাবে উঠে বসল। শরীরের নানা জায়গা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। একটু নড়লেই প্রচণ্ড ব্যথায় শরীর অবশ হয়ে আসতে চায়, সেই অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে জয়ন্তের কাছে যেতে যেতে বলল, "কী হয়েছে?"

"অবস্থা খুব ভালো না। তবে রক্তটা বন্ধ করা গেছে।"

"তবু ভালো।"

"হ্যাঁ। কিন্তু এখনই হাসপাতালে নেওয়া দরকার।"

শ্রাবণী বিচিত্র দৃষ্টিতে জয়ন্তের দিকে তাকাল। সে এখনো একজনকে হাসপাতালে নেওয়ার কথা ভাবছে ব্যাপারটি তার বিশ্বাস হতে চায় না। জয়ন্ত এলকোহলে ভরা একটা বিকার শ্রাবণীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নে, তোর শরীরের রক্ত মুছে নে। দেখতে খুব খারাপ লাগছে।"

শ্রাবণী আবার জয়ন্তের দিকে তাকাল। দেখতে খারাপ লাগা–না লাগার ব্যাপারটি নিয়ে এখনো কেউ মাথা ঘামাতে পারে সেটিও তার বিশ্বাস হয় না।

জয়ন্ত নরম গলায় বলল, "আয় কাছে আয়, তোর মুখটা মুছে দিই।"

শ্রাবণী কিছু বলার আগেই জয়ন্ত একটা কাপড়ের টুকরো এলকোহলে ভিজিয়ে শ্রাবণীর কপাল এবং গালে শুকিয়ে থাকা রক্ত মুছে দিতে দিতে বলল, "তোকে সব সময় দেখেছি সেজেগুজে সুন্দর হয়ে থাকা একজন মানুষ। তাই তোকে এভাবে দেখলে আমরা ইনসিকিওর ফিল করি।"

ক্ষতস্থানগুলোতে এলকোহলের স্পর্শ লাগামাত্র জায়গাগুলো তীব্রভাবে জ্বালা করে ওঠে। শ্রাবণী দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল। জয়ন্ত নিচুগলায় বলল, "সবচেয়ে সমস্যাটা হয়েছে কী জানিস?"

"কী?"

"পানি।"

"হ্যাঁ, তৃষ্ণায় বুকটা একেবারে ফেটে যাচ্ছে।"

"এত ব্লিডিং হয়েছে, যে আর পারছি না। এভাবে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।"

এরকম সময় জব্বার মিয়া চোখ খুলে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ট্রেলারে আপনাদের জন্যে পানি নিয়ে এসেছি।"

জয়ন্ত জব্বার মিয়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "আপনার এখন কেমন লাগছে?"

"দুর্বল লাগছে।" জব্বার মিয়া একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না।"

"কেন চিন্তা করব না?"

"আমাদের জান হচ্ছে বিড়ালের জান। আমরা এত সহজে মরি না। আল্লাহ হায়াত দিলে বেজির বাচ্চা বেজি কিছু করতে পারবে না।"

শ্রাবণী জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই হচ্ছে খাঁটি স্পিরিট।"

জব্বার মিয়া আস্তে আস্তে বলল, "তবে আপনারা যদি তখন না আসতেন তাহলে কেউ আমারে বাঁচাতে পারত না। আজরাইল জানটা কবচ করে নিয়েই ফেলেছিল!"

জয়ন্ত কাঁধ স্পর্শ করে বলল, "ঠিক আছে। এখন আর বেশি কথা বলবেন না। শক্তিটা বাঁচিয়ে রাখেন।"

শ্রাবণী হামাগুড়ি দিয়ে নিয়াজের কাছে গিয়ে বলল, "নিয়াজ তোর কী অবস্থা?"

নিয়াজ চোখ খুলে তাকিয়ে বলল, "বেশি ভালো না।"

"ভালো না হলে হবে কেমন করে? উঠে বস।"

নিয়াজ খুব কষ্ট করে উঠে বসল, একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "যা পানির তৃষ্ণা পেয়েছে কী বলব!"

শ্রাবণী হাসার চেষ্টা করে বলল, "এই ট্রলারেই পানি আছে, চিন্তা করিস না!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি আর পারছি না। এখানে থেকে পানির তৃষ্ণায় মরার থেকে বাইরে বেজির কামড় খেয়ে মরা অনেক ভালো।"

"ঠিকই বলেছিস।"

জয়ন্ত কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে আরো একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে বলল, "এতক্ষণে বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের ফেরত যাওয়ার কাজটা আরো কঠিন হয়ে গেল।"

"যত সময় যাচ্ছে তত দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।" নিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "বেজির দল আবার যদি এটাক করে, মনে হয় আর নিজেদের রক্ষা করতে পারব না।"

"কিন্তু চেষ্টা করতে হবে।" জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "আমরা এতক্ষণ যখন পেরেছি, বাকিটাও পারতে হবে।"

"কীভাবে পারবি?"

"সেটাই চিন্তা করছি।" জয়ন্ত দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমাদের অস্ত্র হচ্ছে বন্দুক, পাইপগান, কিরিচ আর আগুন। কিন্তু সামরিকভাবে তার সমাধান করতে পারব মনে হয় না। সমাধানটা হতে হবে কূটনৈতিক!"

শ্রাবণী শব্দ করে হেসে বলল, "ভালোই বলেছিস।"

"না—না, আমি ঠাট্টা করছি না। আমি সিরিয়াসলি বলছি।"

"কিন্তু সেই কূটনৈতিক মিশনটা চালাবি কেমন করে?"

"সেটাই ভাবছি। বেজিগুলো ম্যাচটা নেওয়ার জন্যে খুব ব্যস্ত। সেটা দিয়ে একটা কম্প্রোমাইজ করা যেতে পারে। তুই বেজির ভাষা ব্যবহার করে দেখিয়েছিস যে তাদের সাথে ডায়ালগও করা যায়।"

"কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত মাত্র একটা শব্দ জানি, সেটা হচ্ছে ক্রিঁকি। এক শব্দ দিয়ে কূটনৈতিক আলাপ কেমন করে হয়?"

"সেটাই হয়েছে মুশকিল।" জয়ন্ত চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, "কথা দিয়ে যদি না পারি তাহলে কাজকর্ম দিয়ে করতে হবে। জেসচার দিয়ে করতে হবে।"

"কী হবে তোর সেই জেসচার?"

জয়ন্ত কথা না বলে চুপ করে রইল এবং ঠিক তখন শ্রাবণী হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, "ওটা কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবণীর দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই টেবিলের নিচে তাকায়। মোমবাতির আলোয় দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে। জয়ন্ত বন্দুকটা হাতে নিয়ে বলল, "কী আবার হবে? একটা ধুমসো বেজি।"

"এটা এখানে এসেছে কেন?"

"এখনো জানিস না কেন আসে?"

"হ্যাঁ জানি।" শ্রাবণী চিন্তিত মুখে বলল, "কিন্তু যখন আসে তখন তো দল বেঁধে আসে। এখন একা এসেছে কেন? কোন দিক দিয়ে এসেছে?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "তুই কি ভেবেছিস আমরা ল্যাবরেটরি-ঘরটা পুরোপুরি সীল করতে পেরেছি? পারি নাই। কত ফাঁকফোকর আছে। তার কোনো একটা দিয়ে ঢুকে গেছে।"

শ্রাবণী চিন্তিত মুখে বলল, "এমনভাবে বসে আছে যেন আমাদের সব কথা বুঝতে পারছে।"

"হ্যাঁ।" জয়ন্ত বলল "আমার ধারণা ব্যাটা স্পাইগিরি করতে এসেছে।"

নিয়াজ একটা লাঠি নিয়ে বলল, "দাঁড়া ব্যাটার স্পাইগিরি করা বের করছি।"

"কী করবি?"

"পিটিয়ে ঘিলু বের করে দেব।"

আজ সারাদিনে তারা অসংখ্য বেজির ঘিলু বের করে দিয়েছে, শরীর থেঁতলে দিয়েছে, শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই নিয়াজের কথাটা অর্থহীন আস্ফালন নয়। তবে প্রতিবারই এই বীভৎস কাজগুলো করেছে নিজেদের বাঁচাতে গিয়ে। একসাথে যখন অসংখ্য বেজি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন হাতের লাঠিটা ঘোরালেই কিছু বেজি তার আঘাতে থেঁতলে গেছে। তবে এটা ভিন্ন ব্যাপার—নিয়াজ নির্দিষ্ট একটা বেজিকে একটা উচিত শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছে!

বেজি অত্যন্ত ধূর্ত প্রাণী। ল্যাবরেটরি-ঘরে টেবিলের নিচে ঘাপটি মেরে থাকা একটা বেজিকে নিয়াজ লাঠি দিয়ে কিছু একটা করে ফেলতে পারবে সেটা কেউই ভাবে নি। কিন্তু নিয়াজ হঠাৎ করে সেই অসাধ্য সাধন করে ফেলল। লাঠিটা দিয়ে আচমকা খোঁচা মেরে বেজিটাকে দেয়ালের সাথে আটকে ফেলে চিৎকার করে বলল, "ধরেছি শালার ব্যাটাকে, যাবি কোথায় এখন? স্পাইগিরি করতে এসেছিস?"

জয়ন্ত এবং শ্রাবণী এগিয়ে গেল। ধূসর রঙের বড়সড় বেজিটা লাঠির চাপে আটকা পড়ে কাতর শব্দ করছে। নিয়াজ হিংস্র গলায় বলল, "আরেকটা লাঠি দিয়ে এই জানোয়ারের বাচ্চার মাথাটা থেঁতলে দে দেখি। বোঝাই শালার ব্যাটাকে মজাটা!"

শ্রাবণী হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলল, "দাঁড়া, দাঁড়া, পাগলামি করিস না।"

"কী হয়েছে?"

শ্রাবণী মোমবাতিটা নিয়ে আরেকটু কাছে গিয়ে বেজিটাকে ভালো করে লক্ষ করে বলল, "দেখছিস না এটা কোনো কথা বলার চেষ্টা করছে?"

নিয়াজ এবং জয়ন্ত ভালো করে তাকাল, সত্যি সত্যি বেজিটা সামনের দুই পা-কে হাতের মতো নেড়ে কিছু-একটা বলার চেষ্টা করছে। তারা কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, দেখল বেজিটা মাথা নেড়ে অবিকল মানুষের গলায় বলল, "সুসু সুসু।"

শ্রাবণী উত্তেজিত হয়ে বলল, "আরেকটা শব্দ শিখলাম। সুসু। সুসু মানে নিশ্চয়ই আমাকে মেরো না প্লিজ।"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছিস।" সে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "দেখি এর সাথে কথাবার্তা চালানো যায় কিনা।"

শ্রাবণী বলল, "দাঁড়া, উল্টাপাল্টা কিছু বলে এটাকে কনফিউজ করিস না।"

"কী করব তাহলে?

"যেহেতু এটা বলছে ছেড়ে দিতে, কাজেই এটাকে ছেড়ে দিতে হবে। এটা হচ্ছে ওদের কাছে নাইস জেসচার দেখানোর সুযোগ।"

নিয়াজ বলল, "ছেড়ে দেব?"

শ্রাবণী বলল, "আগেই ছাড়িস না। কথা বলার চেষ্টা করে দেখি।" সে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বেজিটার দিকে তাকিয়ে বলল, "সুসু।"

হঠাৎ করে ম্যাজিকের মতো একটা ব্যাপার হল। বেজিটি এতক্ষণ ছটফট করে কাতর শব্দ করছিল, সবকিছু একমুহূর্তে থেমে গেল। বেজিটি প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে শ্রাবণীর দিকে তাকাল।

শ্রাবণী আবার বলল, "সুসু।"

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর চোখেমুখে আনন্দ বা দুঃখের ছাপ পড়ে না কিন্তু শ্রাবণীর স্পষ্ট মনে হল বেজিটির চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। বেজিটি সামনের দুটি পা হাতের মতো নেড়ে নেড়ে বলল, "সুসু সুসু...।"

শ্রাবণী নিয়াজকে বলল, "বেজিটাকে ছেড়ে দে।"

"ছেড়ে দেব?"

"হ্যাঁ।" শ্রাবণী লাঠিটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিতেই বেজিটা মুক্ত হয়ে দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল, দৌড়ে পালিয়ে গেল না। শ্রাবণী চাপা গলায় বলল, "দেখেছিস, এটা আমাকে বিশ্বাস করেছে!"

"হ্যাঁ।" জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "দ্যাখ বিশ্বাসটা আরো পাকা করা যায় কি না।"

শ্রাবণী বলল, "সুসু সুসু..."

বেজিটাও বলল, "সুসু সুসু..."

শ্রাবণী চাপা গলায় বলল, "একটা মোমবাতি আর ম্যাচটা দে।"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি আর ম্যাচ এগিয়ে দিল। শ্রাবণী ম্যাচের বাক্স থেকে একটা ম্যাচের কাঠি বের করে বাক্সের পাশে ঘসে আগুন জ্বালাতেই বেজিটি বিচিত্র একটি ভয়ের শব্দ করে লাফিয়ে পিছনে সরে গেল। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "ভয় পেয়েছে।"

"কিন্তু পালিয়ে যায় নি। দূর থেকে দেখছে।"

শ্রাবণী নরম গলায় বলল, "সুসু সুসু..." তারপর ম্যাচটি দিয়ে মোমবাতিটি জ্বালিয়ে দিল। বেজিটি তীক্ষ্ণচোখে সেটি দেখে খুব ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসে মোমবাতিতে আগুনের শিখাটি দেখে। এর আগে এত কাছে থেকে কোনো বেজি আগুনের শিখা দেখে নি। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "বুদ্ধিমত্তার প্রথম ব্যাপারটাই হচ্ছে কৌতূহল। বেজিটার কী কৌতূহল দেখেছিস!"

শ্রাবণী বলল, "বেজি সাহেব, তোমাকে আমি আগুন জ্বালানো শিখিয়েছি। এখন আগুন নেভানো শিখিয়ে দেই। এই দ্যাখো এভাবে আগুন নেভায়—" শ্রাবণী ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটি নিভিয়ে দিতেই বেজিটি চমকে একটু পিছনে সরে গেল। কিন্তু পালিয়ে গেল না।

জয়ন্ত খুশি-খুশি গলায় বলল, "কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রায় হয়েই গেছে—এবারে বেজিটাকে চলে যেতে দে।"

শ্রাবণী বলল, "যাওয়ার আগে কিছু-একটা উপহার দেওয়া যায় না?"

"কী উপহার দিবি?"

"ফুলের তোড়া আর মানপত্র।"

"ফাজলেমি করিস না। ম্যাচটা নেবার জন্যে পাগল কিন্তু সেটা এখন দেওয়া যাবে না।"

"ঠিক আছে—" শ্রাবণী বলল, "এই মোমবাতিটা দিই।"

শ্রাবণী মোমবাতিটা বেজির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "সুসু।"

বেজিটা তার ছুঁচালো নাক দিয়ে মোমবাতিটা কয়েকবার শুঁকে সেটাকে কামড়ে ধরল। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে শুরু করল। জয়ন্ত বলল, "নিয়াজ দরজাটা খুলে দে। বেজিটাকে সসম্মানে যেতে দিই।"

নিয়াজ দরজাটা খুলে দিতেই মোমবাতিটা কামড়ে ধরে রেখে বেজিটা লাফিয়ে বের হয়ে গেল।

জব্বার মিয়া একটা কাতর শব্দ করতেই জয়ন্ত মোমবাতিটা হাতে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে যায়। শরীরের নিচে রক্তে ভিজে গেছে। জয়ন্ত চিন্তিত মুখে বলল, "আবার ব্লিডিং শুরু হয়েছে।"

শ্রাবণী এগিয়ে গিয়ে বলল, "দেখি মোমবাতিটা ধর দেখি।"

জয়ন্ত মোমবাতিটা ধরল, শ্রাবণী একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে জব্বার মিয়ার ক্ষতস্থানগুলো বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

নিয়াজ আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে বলল, "কেউ যদি আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিত—আমি তাকে চোখ বুজে এক লাখ টাকা দিয়ে দিতাম।"

"মাত্র এক লাখ?" শ্রাবণী বলল, "আমি দশ লাখ দিতাম।"

জয়ন্ত বলল, "কল্পনাতেই যখন দিবি বেশি করে দে। টাকায় না দিয়ে ডলারে দে।"

"ঠিক আছে তাই সই। এক মিলিয়ন ডলার দিতাম।"

"তোরা এমনভাবে কথা বলছিস যেন সবাই এক একজন বিল গেটস।"

"ভৈরবের ফেরিতে ছোট ছোট বাচ্চারা পানি বিক্রি করে, এক গ্লাস পানি এক টাকা! এখন মনে হচ্ছে বিল গেটস না হয়ে ঐ পানিওয়ালা বাচ্চা হলেই ভালো হত—ঢক ঢক করে পুরো কলসি পানি খেয়ে ফেলতাম।"

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল, "হ্যাঁ, এভাবে আর থাকা যাচ্ছে না। আয় বের হই।"

"বের হব?" শ্রাবণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জয়ন্তের দিকে তাকাল, "তুই সিরিয়াস?"

"হ্যাঁ। যদি আক্রমণ করতে চায় বলব সুসু সুসু...।"

"তারপরও যদি আক্রমণ করে?"

"তাহলে কিছু করার নেই। বন্দুক দিয়ে গুলি করে কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে আগুন ধরিয়ে কোনোভাবে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করব।"

শ্রাবণী দুর্বলভাবে হেসে বলল, "একেকজনের কী দশা দেখেছিস?"

"যখন এনার্জি পাবি না তখনই চিন্তা করবি ট্রলার পর্যন্ত পৌছলেই বোতল ভরা ঠাণ্ডা পানি! সাথে সাথে শরীরে এড্রনালিনের ফ্লো শুরু হয়ে যাবে।"

নিয়াজ বলল, "সমস্যা শুধু জব্বার মিয়াকে নিয়ে।"

জব্বার মিয়া সাথে সাথে চোখ খুলে বলল, "আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনারা যদি পারেন, আমিও পারব।"

"ঠিক আছে, তবে রওনা দিই। ওঠো সবাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জব্বার মিয়া খুব ধীরে ধীরে বসল। তারপর জয়ন্তের হাত ধরে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। জয়ন্ত উৎসাহ দিয়ে বলল, "চমৎকার!"

ছোট দলটি রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিল। শ্রাবণীর হাতে বন্দুক, নিয়াজের হাতে পাইপগান, জয়ন্তের হাতে কিরিচ। সবার হাতেই একটা করে লাঠি এবং মশাল। সলভেন্টের বড় বোতল সাথে আছে, প্রয়োজন হলে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যাবে।

শ্রাবণী বলল, "বাইরে অন্ধকার, মোমবাতি জ্বালিয়ে নিই?"

জব্বার মিয়া বলল, "চাঁদনী রাত আছে। মোমবাতি জ্বালালে দূরে কিছু দেখবেন না। তাছাড়া বাতাসে নিভে যাবে।"

জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ, জব্বার মিয়া ঠিকই বলেছে। বাসা থেকে বের হবার সময় মোমবাতি নিভিয়ে নেব। ভালো জোছনা হলে পরিষ্কার দেখা যায়।"

দলটি দরজা খুলে খুলে ধীরে ধীরে বের হল। করিডর ধরে হেঁটে সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল। ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নেমে এল। বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় বের হয়ে আসে। জব্বার মিয়া ঠিকই বলেছে, আকাশে মস্তবড় চাঁদ। শহরে তারা কখনো অমাবস্যা পূর্ণিমার খবর রাখে না—আকাশে চাঁদটি ওঠে অপরাধীর মতো, ডুবেও যায় অপরাধীর মতো। অথচ এখানে চাঁদটি কী ভয়ঙ্কর অহঙ্কারীর মতো পুরো আকাশটিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

জয়ন্ত ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটি নিভিয়ে দিতেই হঠাৎ করে জোছনার আলোতে চারদিক প্লাবিত হয়ে গেল। মনে হচ্ছে পুরো এলাকাটি বুঝি জোছনার আলোতে উথালপাথাল করছে। শ্রাবণী নিশ্বাস ফেলে বলল, "ইশ! কী সুন্দর!"

জয়ন্ত বলল, "আসলেই।"

"যদি একটু পরে মরে যাই তোরা কোনো দাবি রাখিস না।"

কেউ কোনো কথা বলল না। এই সুন্দর পরিবেশে ভয়ঙ্কর বীভৎস একটা মৃত্যুর কথা কেউ চিন্তা করতে পারছে না। শুধু জব্বার মিয়া নিচুগলায় বলল, "আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখেন। হায়াত মউত আল্লাহর হাতে।"

জয়ন্ত বলল, "আয় রওনা দিই।"

চার জনের ছোট দলটি নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে পথে নেমে এল। সুরকি বিছানো পথে তারা খুব সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যায়। সামনে বড় বড় গাছ ঝোপঝাড় তার নিচে হাজার হাজার বেজি নিঃশব্দে বসে আছে, তারা জানে বেজিগুলো তীক্ষ্ণচোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

শ্রাবণীর হৃৎপিণ্ড বুকের মাঝে ধকধক করে শব্দ করছে, প্রতিমুহূর্তে মনে হতে থাকে বেজিগুলো বুঝি তাদের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সবার আগে শ্রাবণী, তার পেছনে জব্বার মিয়া, জব্বার মিয়াকে দুইপাশ থেকে নিয়াজ আর জয়ন্ত ধরে রেখেছে।

কাঁপা-কাঁপা পা ফেলে শ্রাবণী আরো একটু এগিয়ে এল। এখন বেজিগুলোর খুব কাছাকাছি চলে এসেছে—এত কাছে যে প্রতিবার পা ফেলার আগে তাকে লক্ষ করতে হচ্ছে সে কোথায় পা ফেলছে, কোনো বেজির উপর পা ফেলে দিচ্ছে কি না। জোছনার আলোতে চারদিক থই থই করছে, তার মাঝে বড় বড় গাছের ছায়া। জোছনার নরম আলোতে সবকিছু দেখা যায় কিন্তু কিছু স্পষ্ট বোঝা যায় না। গাছের নিচে ঝোপের আড়ালে বেজিগুলো বসে আছে অনুভব করা যায়, কিন্তু ঠিক ভালো করে দেখা যায় না। নিশ্বাস বন্ধ করে শ্রাবণী আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল। তার মনে হল হঠাৎ করে সামনে একটা বড় গাছের নিচে কিছু-একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। হিংস্র শব্দ করে কিছু বেজি নড়তে শুরু করেছে। আতঙ্কে শ্রাবণীর হৃৎপিণ্ড থেমে আসতে চায়—সে কাঁপা গলায় বলল, "সুসু-সুসু..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে সাথে সবকিছু যেন স্থির হয়ে যায়, নিঃশব্দ হয়ে যায়। বিস্তীর্ণ এলাকায় হিংস্র চোখে বসে থাকা বেজিগুলো হঠাৎ যেন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অনভ্যস্ত হাতে শক্ত করে ধরে রাখা বন্দুকটা নিয়ে শ্রাবণী আবার বলল, "সুসু সুসু..."

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার উচ্চকণ্ঠে বলল, "সুসু সুসু..."

হঠাৎ করে প্রতিধ্বনির মতো কথাগুলো ফিরে আসতে শুরু করে। মনে হয় সমস্ত বনাঞ্চল যেন প্রতিধ্বনি করে ওঠে, "সুসু সুসু..."

জয়ন্ত কাঁপা গলায় বলল, "কমিউনিকেট করা গেছে। মনে হয় বেঁচে গেলাম।"

"এখনো জানি না।" শ্রাবণী বলল, "হাঁটতে থাক।"

চার জনের ছোট দলটা দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। হাতে ধরে রাখা সলভেন্টের ভারী বোতলগুলো ঠেলে নেওয়া কষ্টকর হতে থাকে। তারা তখন একটা একটা করে ফেলে দিয়ে আসতে থাকে। জোছনার নরম আলোতে লম্বা লম্বা পা ফেলে তিন জন এগুতে থাকে। তাদের ডানে বাঁয়ে সামনে পিছনে বেজি। ধূসর বেজিগুলো সরে গিয়ে তাদের জায়গা করে দিচ্ছে, তারা সে জায়গায় পা ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে। একটু পরপর তারা দাঁড়িয়ে পড়ে চাপা গলায় বলছে, "সুসু সুসু..." যার অর্থ "আমাদের মেরে ফেলো না প্লিজ!" তার প্রত্যুত্তরে বেজিগুলোও বলছে, "সুসু সুসু—।" পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রজাতির কাছে সেটাও যেন অবোধ প্রাণীগুলোর এক ধরনের আকুতি।

জোছনার নরম আলোতে পা ফেলে ফেলে হাজার হাজার বেজিকে পিছনে ফেলে তারা শেষ পর্যন্ত বালুবেলায় চলে এল। বালুবেলার নরম বালুতে পা ফেলে তারা এগিয়ে যায়। এই তো সামনে আর কিছুদূরে ট্রলারটি সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলে দুলে উঠছে। আর কয়েক পা এগিয়ে গেলে তারা বেঁচে যাবে—ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যাবে।

ঠিক তখন জয়ন্ত দাঁড়িয়ে গেল। নিয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হল?"

"তোরা যা আমি আসছি।"

নিয়াজ অবাক হয়ে বলল, "কোথা থেকে আসছিস?"

"বেজিগুলোর কাছ থেকে।"

"বিদায় নিয়ে আসবি?" নিয়াজ খেপে গিয়ে বলল, "গালে চুমু দিয়ে বিদায় নিয়ে আসবি?"

"না, একটা জিনিস দিয়ে আসব।"

"কী জিনিস?"

"ম্যাচটা। মনে নেই ম্যাচটার জন্যে কী করল?"

নিয়াজ রেগে বলল, "দ্যাখ জয়ন্ত পাগলামি করিস না। তোর একগুঁয়েমির জন্যে আমরা সবাই মরতে বসেছিলাম। এখন আবার একগুঁয়েমি করে ফেরত যাচ্ছিস? ফাজলেমির একটা সীমা থাকা দরকার।"

জয়ন্ত বলল, "তোদের যা ইচ্ছে বলতে পারিস। কিন্তু এই বেজিগুলো হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার একটা অংশ—তাদের বুদ্ধিমত্তাকে সম্মান করতে হবে। তোরা যা, আমি ম্যাচ দিয়েই চলে আসব। বুদ্ধিমত্তার প্রথম স্টেপ হচ্ছে আগুন। ওদেরকে আগুন জ্বালানোর একটা সুযোগ করে দিই।"

নিয়াজ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "ঢং করার জায়গা পাচ্ছিস না জয়ন্ত? এটা একটা ঢং করার ব্যাপার হল? ন্যাকামো হল।"

"হোক।" জয়ন্ত পাথরের মতো মুখ করে বলল, "তোরা যা।"

শ্রাবণী, নিয়াজ এবং জব্বার মিয়া হতবুদ্ধি হয়ে দেখল, জয়ন্ত আবার গভীর অরণ্যের মাঝে ঢুকে যাচ্ছে। মানুষের বুদ্ধিমত্তার একটি অংশ বহন করছে যে-প্রাণী সেই প্রাণীর তীব্র কৌতূহলকে সম্মান না-দেখিয়ে সে ফিরে যেতে পারবে না।

জোছনার নরম আলোতে জয়ন্তের অপসৃয়মাণ দেহটিকে একটি অতিপ্রাকৃতিক প্রতিমূর্তির মতো মনে হতে থাকে।

চাঁদের আলোতে সমুদ্রের পানি কেমন জানি ঝিকমিক করছে। তার মাঝে চাপা শব্দ করে ট্রলারটি এগিয়ে যাচ্ছে। নিয়াজ অনভ্যস্ত হাতে ট্রলারের হালটি ধরে রেখেছে, সে কল্পনাও করতে পারে না দুদিন আগে ট্রলারের উপর বসে থাকা নিয়ে তার ভেতরে একধরনের আতঙ্ক ছিল অথচ এখন সে এটি সমুদ্রের ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ট্রলারের ভেতরে জব্বার মিয়া লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার দুর্বল দেহে চেতনা আসছে এবং চলে যাচ্ছে। ট্রলারটি সোজা দক্ষিণে গেলে লোকালয় পাওয়া যাবে, সেখান থেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। জব্বার মিয়া ভয় পায় না—সমুদ্রের বুকে সে এর থেকে অনেক বড় দুর্ঘটনাও পার হয়ে এসেছে। মৃত্যু বারবার আসে না—একবারই আসে এবং সত্যি সত্যি যখন আসবে সে একটুও ভয় না-পেয়ে তার মুখোমুখি হবে।

চাঁদটি এখন ঠিক মাথার ওপরে। পিছনে হকুনদিয়া দ্বীপ। জোছনার নরম আলোতে এত দূর থেকে হকুনদিয়া দ্বীপটি দেখা পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু সেটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কারণ পুরো দ্বীপটি দাউদাউ করে জ্বলছে। আগুনের কমলা রঙের শিখা জীবন্ত প্রাণীর মতো লকলক করে নাচছে। সমস্ত আকাশ সেই আগুনের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ট্রলারের ছাদে হাত রেখে শ্রাবণী দাঁড়িয়ে ছিল। সে জয়ন্তের হাত স্পর্শ করে বলল, "মন খারাপ করিস না জয়ন্ত।"

জয়ন্ত কাঁপা গলায় বলল, "আমি দায়ী। আমি যদি ম্যাচটা না দিয়ে আসতাম!"

শ্রাবণী নিচু গলায় জোর দিয়ে বলল, "না, তুই দায়ী না। এই বেজিগুলো প্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি না। এটা মানুষের তৈরি একটা কৃত্রিম সৃষ্টি। যেটা স্বাভাবিক না সেটা প্রকৃতিতে থাকে না, থাকতে পারে না।"

"কিন্তু আমি যদি ম্যাচটি না দিয়ে আসতাম তাহলে এতবড় আগুন লাগত না।"

"তোর ধারণা কাজটি ভুল হয়েছিল?"

"অবশ্যই ভুল হয়েছিল।"

"একটা ভুলের জন্যে যে প্রাণী সারা পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে যায় সেই প্রাণীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কথা না।"

"কিন্তু—"

"না জয়ন্ত। এই বেজিগুলো ছিল একটা ভয়ঙ্কর ভুল। তোর আরেকটা ভুল দিয়ে সেই ভুলটিকে সংশোধন করা হল।"

জয়ন্ত কোনো কথা না বলে দূরে হকুনদিয়া দ্বীপের দিকে তাকিয়ে রইল। আগুনের লাল আভায় পুরো আকাশটি আলোকিত হয়ে আছে। ভয়ঙ্কর আগুনের মাঝে বেজিগুলো না-জানি কী ভাষায় চিৎকার করে আর্তনাদ করছে।

ফিনিক্স

AMARBOI.COM

"The bird perished in the flames;
but from the red egg in the nest
there fluttered aloft a new one
the one solitary phoenix bird."

Hans Christian Andersen

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বকথা

ভাইরাসটির নাম ছিল ইকুয়িনা, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করে বললে বলতে হয় ইকুয়িনা বি. কিউ. ২৩-৪৯। যে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ার দীর্ঘদিন গবেষণা করে এই ভাইরাসটি দাঁড়া করিয়েছিলেন ভাইরাসটিকে তার নামে নামকরণ করা হয়েছিল। বিজ্ঞানী ইকুয়িনা কখনো কল্পনাও করেন নি এই ভাইরাসটি ল্যাবরেটরির চার দেয়ালের বাইরে যেতে পারবে—তা হলে তিনি নিশ্চয়ই কিছুতেই নিজের নামটি ব্যবহার করতে দিতেন না। কিন্তু এই ভাইরাসটি ল্যাবরেটরির চার দেয়ালের বাইরে গিয়েছিল, কারো কোনো ভুলের জন্য নয়, কোনো দুর্ঘটনাতেও নয়—এটি বাইরে গিয়েছিল সেনাবাহিনীর নির্দেশে। সময়টি ছিল পৃথিবীর জন্যে খুব অস্থির একটা সময়, পৃথিবীর দরিদ্র দেশ আর উন্নত দেশগুলোর মাঝে তখন এক ভালবাসাহীন নিষ্ঠুর সম্পর্ক। পারমাণবিক বোমা আর মারণাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয় না, এটি সবার কাছেই আছে, যেকোনো মুহূর্তে যে কেউ যে কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে—নতুন ধরনের একটা অস্ত্রের খুব প্রয়োজন, ঠিক তখন ইকুয়িনা ভাইরাসটি যুদ্ধবাজ জেনারেলদের চোখে পড়ে। যদিও তখনো এটি পৃথিবীর একটি মানুষেরও মৃত্যুর কারণ হয় নি কিন্তু সবাই জানত মানুষকে হত্যা করার জন্যে এর চাইতে নিশ্চিত কোনো ভাইরাস পৃথিবীর বুকে কখনো সৃষ্টি হয় নি। কোনো জীবিত মানুষের ওপর এটি পরীক্ষা করে দেখা হয় নি তবুও বিজ্ঞানীরা এর ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার কথা জানতেন। সংক্রমণের প্রথম সপ্তাহে কিছু বোঝা যাবে না, দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথমে খুশখুশে কাশি এবং অল্প মাথাব্যথা দিয়ে শুরু হয়ে কয়েকদিনের ভেতরে তীব্র মাথাব্যথা এবং জ্বর শুরু হবে। ধীরে ধীরে সেটা মস্তিষ্কের প্রদাহে রূপ নেবে, সপ্তাহ শেষ হবার আগে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে এমনভাবে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যাবে যে দেখে মনে হবে মানুষটির পুরো দেহটি বুঝি একটি গলিত মাংসপিণ্ড। যে দেহ একটি মাত্র ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি বিন্দু রক্ত তখন কোটি কোটি ইকুয়িনা ভাইরাসে কিলবিল করতে থাকবে। এই ভাইরাস বাতাসে ভর করে চোখের পলকে কয়েক শ কিলোমিটার ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোনো ভাবে একটি ভাইরাসও যদি মানুষের শরীরে স্থান নিতে পারে সেই মানুষটির বেঁচে যাবার কোনো উপায় নেই। এর কোনো প্রতিষেধক নেই, এই ভাইরাস থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই। আক্রান্ত মানুষটির মৃত্যু হবে যন্ত্রণাদায়ক এবং নিশ্চিত—একেবারে এক শ ভাগ নিশ্চিত, এবং সেইটি ছিল সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয়।

সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসটি নিয়ে গবেষণা করার চেষ্টা করলেন। তাঁরা ভাইরাসটির মাঝে সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করলেন যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইরাসটি সব মানুষের ওপরে কার্যকরী না হয়ে শুধুমাত্র বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীর মাঝে সংক্রমিত হয়—তা হলে যুদ্ধবাজ জেনারেলেরা সেটাকে বিশেষ দেশের বিশেষ মানুষের ওপর ব্যবহার করতে পারবে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোকে শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবছিল, পরিবর্তিত ইকুয়িনা ভাইরাসটি ছিল তাদের সেই ভয়ংকর পৈশাচিক স্বপ্নের উত্তর। সেই পৈশাচিক গবেষণাটি সফল হয় নি সেটা কিন্তু সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা জানতেন না। গোপন একটা ফিল্ড টেস্ট করতে গিয়ে ইকুয়িনা ভাইরাসটি পৃথিবীতে মুক্ত হয়ে যায়। আফ্রিকায় একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলের পুরো দ্বীপবাসী দুই সপ্তাহের মাঝে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার খবরটি পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল এবং সেই গোপনীয়তাটুকু ছিল পুরোপুরি অর্থহীন কারণ ততক্ষণে সারা পৃথিবীর সকল মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মৌসুমি বাতাসে ইকুয়িনা ভাইরাস ইউরোপ-এশিয়া হয়ে উত্তর আমেরিকায় এবং অস্ট্রেলিয়া হয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছে যায়। পরবর্তী দুই সপ্তাহের মাঝে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পৃথিবীর বুকে যে ভয়াবহ আতঙ্কের জন্ম নিল তার কোনো তুলনা নেই, এই ভাইরাসের ভয়াবহ থাবা থেকে কোনো মুক্তি নেই সেটি সাধারণ মানুষ তখনো জানত না, বেঁচে থাকার জন্যে তাদের উন্মত্ত আকুলতা সেই ভয়াবহ দিনগুলোকে আরো ভয়াবহ করে তুলল।

দুই মাসের মাঝে পৃথিবীর ছয় বিলিয়ন মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, বেঁচে রইল একেবারে হাতেগোনা কিছু শিশু এবং কিশোর। প্রকৃতির কোন রহস্যের কারণে এই হাতেগোনা অল্প কয়জন শিশু-কিশোর ইকুয়িনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে সেটি কেউ জানে না, সেই রহস্য খুঁজে বের করার মতো কোনো মানুষ তখন পৃথিবীতে একজনও বেঁচে নেই।

তারপর পৃথিবীতে আরো দুই শতাব্দী কেটে গিয়েছে। ইকুয়িনা ভাইরাসের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া সেই শিশু এবং কিশোরের বংশধরেরা পৃথিবীতে একটা নূতন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। পুরোনো পৃথিবী, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের কোনো স্মৃতি কারো মাঝে নেই। পৃথিবীর নানা অংশে যাযাবরের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষেরা পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার মাঝে ঘুরে বেড়ায়। নানা ধরনের কুসংস্কার, কিছু সহজাত প্রবৃত্তি এবং বেঁচে থাকার একেবারে আদিম তাড়নার ওপর ভর করে মানুষগুলো বিচিত্র একটি পৃথিবীতে টিকে থাকার চেষ্টা করে, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে তারা নিজের পরিবার নিজের গোষ্ঠীকে রক্ষা করে আবার প্রয়োজনে হিংস্র পশুর মতো অন্য গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। বড় বড় ট্রাকে করে তারা পৃথিবীর লোহিত মৃত্তিকায় ধূলি উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়, পৃথিবীর মানুষের হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার মাঝে বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে বেড়ায়।

বেঁচে থাকার এক কঠিন প্রক্রিয়ায় তাদের সাহায্য করে তাদের নিজস্ব ঈশ্বর। কিংবা ঈশ্বরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. প্রভু ক্লড

রিহান আধো ঘুমের মাঝে অনুভব করল কেউ একজন তার কাঁধে আলতোভাবে স্পর্শ করেছে। মুহূর্তের মাঝে রিহানের ঘুম ভেঙে যায়, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা হাতে ধরে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, "কে?"

মানুষটি নিচু গলায় বলল, "আমি।"

রিহান অস্ত্রটি নিচে নামিয়ে রেখে বলল, "ও! তুমি?" মানুষটি তাদেরই একজন, প্রতি রাতে সে পাহারার ডিউটি ভাগাভাগি করে দেয়। মাঝরাতে একবার ঘুরে ঘুরে দেখে সবাই ঠিকমতো তাদের ডিউটি করছে কি না। রিহান অপরাধীর মতো বলল, "বসে থাকতে থাকতে চোখে ঘুম চলে এসেছিল।"

মানুষটি উত্তর না দিয়ে নাক দিয়ে এক ধরনের শব্দ করল।

রিহান বলল, "আর হবে না, দেখে নিও।"

মানুষটি আবার নাক দিয়ে এক ধরনের শব্দ করে বলল, "চল।"

রিহান ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'কোথায়?"

"গ্রাউসের কাছে।"

"গ্রাউস!" রিহান চমকে উঠে বলল, "গ্রাউসের কাছে কেন? আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আর কখনো এরকম হবে না। আমি বসবই না—"

"আহ!" মানুষটি হাত তুলে রিহানকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "সেজন্য নয়। তুমি ডিউটিতে জেগে আছ না ঘুমিয়ে আছ সেটা নিয়ে গ্রাউস মাথা ঘামায়?"

'তা হলে কী জন্যে ডাকছে?"

"আমি কেমন করে বলব?" মানুষটি হাত নেড়ে বলল, "গ্রাউস আমাকে কখনো বলবে?"

রিহান অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল, মানুষটি ঠিকই বলেছে। গ্রাউস তাদের দলপতি, এতজন মানুষের দায়িত্ব তার ওপর। তাদের মতো ছোটখাটো মানুষের জন্য গ্রাউসের দেখা পাওয়াই একটি কঠিন ব্যাপার। তারপরও সে চেষ্টা করল, জিজ্ঞেস করল, "তুমি সত্যিই জান না কেন ডেকেছে? আন্দাজও করতে পারবে না?"

"না। এখন এটা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না। তাড়াতাড়ি চল। গ্রাউস অপেক্ষা করছে।"

রিহান ইতস্তত করে বলল, "এখানে ডিউটি করবে কে?"

মানুষটা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "সে নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। আমার কাছে অস্ত্রটা দিয়ে তুমি যাও, তাড়াতাড়ি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিহান অস্ত্রটি মানুষটির হাতে দিল, মানুষটি সেটা হাতে নিয়ে তার কপালে স্পর্শ করে তারপর ম্যাগাজিনে ঠোঁট স্পর্শ করে সম্মান প্রদর্শন করে। এটি দ্বিতীয় মাত্রার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই সম্মান প্রদর্শন করা যায়। লেজার গাইডেড স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো হাতে নিলে হাঁটু গেড়ে সম্মান দেখাতে হয়।

রিহান দুশ্চিন্তিত মুখে আবছা অন্ধকারে তাদের আস্তানার দিকে হাঁটতে থাকে। তাদের আস্তানায় সব মিলিয়ে সাতচল্লিশটি নানা আকারের ট্রাক আর লরি রয়েছে। কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে তার ভেতরে ট্রাকগুলো গোল করে ঘিরে রাখা হয়েছে, হঠাৎ করে কোনো দল আক্রমণ করলে চট করে ভেতরে ঢুকতে পারবে না। রিহান হেঁটে হেঁটে গ্রাউসের লরিটা খুঁজে বের করল, এটি তুলনামূলকভাবে বড়, ইঞ্জিনটি শক্তিশালী। রিহান পেছনের দরজায় শব্দ করতেই সেটা খুট করে খুলে গেল। ভেতরে হলুদ রঙের একটা অনুজ্জ্বল আলো জ্বলছে, গ্রাউস দরজা থেকে সরে গিয়ে বলল, "এস রিহান। ভিতরে এস।"

রিহান তীক্ষ্ণ চোখে গ্রাউসের মুখের ভাবভঙ্গি লক্ষ করার চেষ্টা করল, মানুষটির মুখে বড় বড় দাড়ি–গোঁফ, চোখ দুটো স্থির এবং ভাবলেশহীন, দেখে মনের ভাব বোঝা যায় না।

রিহান কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমাকে ডেকেছ গ্রাউস?"

"হ্যাঁ।" গ্রাউস আরো কিছু বলবে ভেবে রিহান অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু গ্রাউস কিছু বলল না, একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল।

রিহান একটু ইতস্তত করে বলল, "আমাকে কেন ডেকেছ?"

"তোমাকে দেখার জন্যে।"

রিহান অবাক হয়ে বলল, "আমাকে দেখার জন্যে?"

"হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম তুমি আরো বড়। কিন্তু তুমি তো দেখছি একেবারে বাচ্চা ছেলে।"

রিহান জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "না মহামান্য গ্রাউস, আমি মোটেও বাচ্চা ছেলে নই। গত শীতে আমার বয়স সতের হয়েছে। আমি এখন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র চালাতে অনুমতি পেয়েছি। রিকি বলেছে আমাকে একটা মোটরবাইক দেবে। আট সিলিন্ডারের।"

গ্রাউস কোনো কথা না বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইল, তার কথাগুলো শুনেছে কি না রিহান ঠিক বুঝতে পারল না। কী কারণ জানা নেই, রিহান হঠাৎ এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করতে থাকে, চাপা এক ধরনের ভয় হঠাৎ তার ভেতরে দানা বাঁধতে শুরু করে। গ্রাউস আবার একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "রিহান।"

"বলো, গ্রাউস।"

"তুমি কী করেছ?"

"আমি?" রিহান চমকে উঠে বলল, "আমি কী করব?"

"কিছু কর নি?"

রিহান দ্রুত চিন্তা করতে থাকে, সে কি অস্বাভাবিক বা অন্যায় কিছু করেছে? তেরো নম্বর লরিটির হাসিখুশি কিশোরী মেয়েটির সাথে একটু ঠাট্টা–মশকরা করেছে, লরির দেয়ালে চেপে ধরে একটু চুমু খাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই বয়সের ছেলেমেয়েরা তো সেটা করেই থাকে, সেটা তো এমন কিছু বড় অন্যায় নয়। মেয়েটা রাগ হবার ভান করেছে কিন্তু আসলে তো রাগ হয় নি, একটু পরেই তো লরির উপর থেকে তার মাথায় আধ বোতল গ্যাসোলিন ঢেলে হি হি করে হেসেছে।

"মনে করতে পারছ না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাউসের কথায় চমকে উঠে রিহান বলল, "না গ্রাউস। আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না। বিশ্বাস কর—"

গ্রাউস হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে তীব্র গলায় বলল, "তা হলে কেন প্রভু ক্লড তোমার সাথে দেখা করতে চাইছেন?"

রিহান আতঙ্কে শিউরে উঠে গ্রাউসের দিকে তাকাল, কথাটি শুনেও যেন বুঝতে পারছে না, কিংবা বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করতে পারছে না। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "প্রভু ক্লড আ-আমার সাথে দেখা করতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আ-আমার সাথে?"

"হ্যাঁ। তোমার সাথে।" গ্রাউস শীতল গলায় বলল, "এখন বলো, কেন?"

রিহানের হঠাৎ মনে হতে থাকে তার হাঁটুতে কোনো জোর নেই। এর আগে যারা প্রভু ক্লডের সাথে দেখা করতে গিয়েছে এবং কখনো ফিরে আসে নি হঠাৎ করে তাদের কথা মনে পড়ে যায়। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, সে কোনোমতে দুই পা পিছিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ করে তার মনে হতে থাকে কেউ বুঝি তার সারা শরীরের শক্তি শুষে নিয়েছে। সে কাঁপা গলায় বলল, "বিশ্বাস কর গ্রাউস, আমি কিছু করি নি—"

গ্রাউস কিছুক্ষণ রিহানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "তাই যেন সত্যি হয় রিহান।"

রিহান এক ধরনের কাতর গলায় বলল, "আমি এখন কী করব গ্রাউস?"

গ্রাউস জোর করে একবার হাসার চেষ্টা করে বলল, "প্রভু ক্লড তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন আর তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ কী করবে? তুমি এক্ষুনি দেখা করতে যাও। প্রভু ক্লড তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

"কেমন করে যাব গ্রাউস?"

"আর্মাড কারের লাল দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াও, ভেতর থেকে এসে তোমাকে ডেকে নেবে।"

রিহান তবুও দেয়াল স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে রইল। গ্রাউস কঠিন গলায় বলল, "যাও রিহান। দেরি কোরো না।"

রিহান অনেক কষ্ট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর ঘুরে লরির দরজা খুলে বের হয়ে এল। পাটাতন থেকে নিচে নেমে এসে সে তাদের আস্তানার মাঝখানে তাকায়, ছয়টি আর্মাড কার বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে, তার ভেতরে প্রভু ক্লডের নিজস্ব আর. ভি., বাইরে থেকে কখনো সেটা দেখা যায় না। রিহান অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকায়, এই এলাকাটি মরুভূমির মতো, রাত্রিবেলা আকাশটি একেবারে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো ঝকঝক করতে থাকে। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে, প্রতিদিন দেখার পরও নক্ষত্রগুলোকে কেমন যেন অচেনা মনে হয়। মরুভূমির শুকনো হাওয়া বইছে, বাতাসের শব্দটি কেমন যেন হাহাকারের মতো শোনায়, কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে রিহানের বুকের ভেতর বিচিত্র এক ধরনের শূন্যতা এসে ভর করে। রিহান কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, মরুভূমির শীতল বাতাসের জন্যেই কিনা কে জানে হঠাৎ তার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বুকের ভেতরে আটকে থাকা চাপা একটা নিশ্বাসকে বের করে দিয়ে রিহান সামনে এগিয়ে যায়। বড় আর্মাড কারের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে তার নিজেকে বড় অসহায় মনে হতে থাকে। সে মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল, রাতের অন্ধকারে বড় বড় লরি এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রাকগুলোকে অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো মনে হয়। চারদিকে জমাট–বাঁধা অন্ধকার এবং নিঃশব্দ, শুধুমাত্র পাওয়ার স্টেশন থেকে চাপা গুঞ্জনের মতো একটা শব্দ আসছে। রিহানের মনে হতে থাকে বড় বড় লরির জানালা দিয়ে অন্ধকারকে আড়াল করে সবাই তার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে, সবার চোখে আতঙ্ক। হঠাৎ তার ইচ্ছে হতে থাকে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে, কিন্তু তার সাহস হয় না। সে স্থাণুর মতো আর্মাড কারের লাল দরজার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

রিহান কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল জানে না, হঠাৎ খুট করে দরজাটা খুলে গেল, ভেতরে আবছা অন্ধকার তার মাঝে রিহান শুনতে পেল নারী কণ্ঠে কেউ তাকে চাপা গলায় ডাকল, "ভেতরে এস।"

রিহান সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসতেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে পিছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। রিহান ভিতরে তাকাল, আসবাবপত্রহীন একটি ধাতব কন্টেইনার। কন্টেইনারের ঠিক মাঝখানে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েটির পোশাক খুব সংক্ষিপ্ত এবং সেই পোশাকের ভেতর দিয়ে তার সুগঠিত শরীর দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির ধাতব রঙের চুলগুলো বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। মেয়েটির চোখের পাতায় নীল রঙ, ঠোঁট দুটো টকটকে লাল। যে কোনো হিসেবে মেয়েটি সুন্দরী কিন্তু চেহারায় কোনো এক ধরনের অস্বাভাবিকতা আছে সেটি কী রিহান ঠিক ধরতে পারল না। মেয়েটির বুকের উপরে বুলেটের একটি বেল্ট, ডান হাতে তৃতীয় মাত্রার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আলগোছে ধরে রাখা। মেয়েটি শুকনো এক ধরনের খসখসে গলায় বলল, "রিহান, তুমি দুই হাত পাশে ছড়িয়ে রেখে এক পা এগিয়ে এস।"

গলার স্বর শুনে রিহান হঠাৎ করে মেয়েটিকে চিনতে পারল, মেয়েটি দৃনা, ছয় নম্বর লরিতে থাকত, আজ থেকে চার বছর আগে হঠাৎ করে একদিন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কী আশ্চর্য! দৃনা এখানে? প্রভু ক্লডের কাছে? রিহান চাপা গলায় বলল, "দৃনা! তুমি এখানে? আমরা ভেবেছিলাম—"

দৃনা রিহানকে বাধা দিয়ে যান্ত্রিক গলায় বলল, "দুই হাত পাশে ছড়িয়ে এগিয়ে এস।"

রিহান থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে হতচকিত ভাবে দৃনার দিকে তাকাল, ভাবলেশহীন এক ধরনের মুখ, সেখানে অনুভূতির কোনো চিহ্ন নেই। রিহান একটা নিশ্বাস ফেলে দুই হাত দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়ে এক পা এগিয়ে আসে। দৃনা দক্ষ মানুষের মতো রিহানের শরীর সার্চ করে, নির্বিকারভাবে তার জঙ্ঘাদেশ, বুকে, পিঠে হাত দিয়ে দেখে সামনে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে বলল, "আমার সাথে এস।"

রিহান হাঁটতে থাকে। সামনে আর্মাড কারের দরজা খুলে রিহান বের হয়ে আসতেই প্রভু ক্লডের বিশাল আর. ভি. টি দেখতে পেল। জানালায় হালকা নীল আলো জ্বলছে, উপরে কয়েকটি বিচিত্র ধরনের এন্টেনা, দেখে মনে হয় কোনো ধরনের স্থাপত্যকর্ম। দৃনা নিচু গলায় বলল, "যাও।"

রিহান কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

"সামনে গেলেই দরজা দেখতে পাবে। দরজা খুলে ঢুকে যাও।" দৃনা একমুহূর্ত থেমে বলল, "আর শোন, কখনোই সরাসরি প্রভু ক্লডের চোখের দিকে তাকাবে না।"

রিহান মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে, তাকাব না।"

"প্রভু তোমাকে অনুমতি দিলেই শুধু কথা বলবে, নিজে থেকে একটি কথাও বলবে না।"

"বলব না।"

"মাথা নিচু করে তাকে অভিবাদন করবে।"

"ঠিক আছে দৃনা।"

"বের হবার সময় কখনো প্রভুর দিকে পিছন দেবে না।"

"দেব না।"

"মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে না।"

রিহান মাথা নেড়ে বলল, "দাঁড়াব না।"

"হে প্রভু ক্লড, হে ঈশ্বর-পুত্র বলে তাঁকে সম্বোধন করবে।"

"ঠিক আছে দৃনা।"

"যাও। এবার ভেতরে যাও।"

রিহান একমুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "তুমি কি জান প্রভু ক্লড আমাকে কেন ডেকেছেন?"

দৃনা বলল, "না, জানি না।"

রিহান কাতর গলায় বলল, "দৃনা, আমার খুব ভয় করছে। তুমি কি আমার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করবে?"

দৃনা তার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "যাও। ভেতরে যাও।"

রিহান একটা নিশ্বাস ফেলল, তারপর সাহস সঞ্চয় করে বিশাল আর. ভি. টির দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে একটু উপরে একটি দরজা। দরজাটি বন্ধ, হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই দরজাটি খুলে গেল। ভেতরে হালকা নীল রঙের একটা আলো জ্বলছে। রিহান নিশ্বাস নিতেই ক্ষীণ বাসি ফুলের মতো এক ধরনের গন্ধ পেল। রিহানের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড ধকধক শব্দ করছে, তার ভেতর কোনোভাবে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দৃনা তাকে মাথা তুলে তাকাতে নিষেধ করেছে, সে মাথা তুলে তাকাল না। লাল নরম কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে সে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। আর. ভি.য়ের অন্যপাশে হঠাৎ কাপড়ের এক ধরনের খসখসে শব্দ শুনতে পায়—রিহান মাথা উঁচু করে সেদিকে তাকাতে সাহস পেল না, মাথা নিচু করে অভিবাদন করল।

রিহান শুনল প্রভু ক্লড বললেন, "আমার দিকে তাকাও, ছেলে তোমার চেহারাটা দেখি।"

ভারী ভরাট গলা, ঘরে তার কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। দৃনা সোজাসুজি প্রভু ক্লডের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু রিহান প্রভু ক্লডের আদেশ অমান্য করতে সাহস পেল না। রিহান মাথা তুলে ক্লডের দিকে তাকাল, দুজন প্রথমবারের মতো দুজনকে দেখতে পেল।

প্রভু ক্লডের মাথায় ধবধবে সাদা চুল এবং দাড়ি, পরনে লম্বা সাদা আলখাল্লা। মুখে বয়সের বলিরেখা, চোখ দুটো আশ্চর্য রকম নীল। তার চোখের দৃষ্টি এত তীব্র যে রিহান বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না, সে চোখ নামিয়ে নিল।

প্রভু ক্লড জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলে, তোমাকে আমি কেন ডেকেছি জান?"

রিহান মাথা নাড়ল, বলল, "না, প্রভু ক্লড, আমি জানি না।"

"তুমি অনুমান করতে পার?"

"পারি না প্রভু ক্লড। আমি অনুমান করতে পারি না।"

প্রভু ক্লড কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ শীতল গলায় বললেন, "গত পরশু দিন তুমি পাওয়ার স্টেশনে কী করেছিলে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিহানের হঠাৎ বুক কেঁপে উঠল, সে আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠে বলল, "প্রভু ক্লড, ঈশ্বরপুত্র, আমার ভুল হয়েছিল। আমার খুব বড় ভুল হয়েছিল—"

প্রভু ক্লড হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ভুল না শুদ্ধ আমি তোমার কাছে সেটি জানতে চাইছি না ছেলে—আমি জানতে চেয়েছি সেখানে কী হয়েছিল।"

"আপনি সব জানেন প্রভু।"

"তবু আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

রিহান তবু চুপ করে রইল, তখন প্রভু ক্লড কঠিন গলায় বললেন, "বলো।"

রিহান কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "পাওয়ার স্টেশনের সামনে আমার ডিউটি পড়েছিল প্রভু ক্লড, হঠাৎ সেটা অদ্ভুত এক রকম শব্দ করতে লাগল। কয়েকটা যন্ত্র থেমে কেমন যেন সংকেতের মতো শব্দ বের হতে লাগল। তখন—" রিহান কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়।

"বলো ছেলে। তখন কী হল?"

"আমি তখন পাওয়ার স্টেশনের কাছে গেলাম।"

"একটি নবম মাত্রার যন্ত্রের কাছে তুমি অনুমতি না নিয়ে গেলে? অপবিত্রভাবে গেলে? সম্মান প্রদর্শন না করে গেলে?"

রিহান কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রভু ক্লড শীতল গলায় বললেন, "তারপর কী হল?"

"আমি—আমি পাওয়ার স্টেশনটি পরীক্ষা করে দেখলাম। দেখলাম একটা পানির টিউব ফেটে গেছে, পানি যাচ্ছে না। স্টেশনটি গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি তখন—" রিহান আবার চুপ করে যায়।

"তখন? তখন কী?"

রিহান মাথা তুলে কাতর গলায় বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন। প্রভু ক্লড—ক্ষমা করুন।"

প্রভু ক্লড কঠিন গলায় বললেন, "তখন কী?"

রিহান ভাঙা গলায় বলল, "তখন আমি পানির পাইপটা পাল্টে দিয়েছি।"

"কী দিয়ে পাল্টে দিয়েছ?"

"পুরোনো ট্রাকে সেরকম একটা পাইপ ছিল, সেটা খুলে।"

"তুমি কী দিয়ে খুলেছ?"

"আমার কাছে একটা প্লায়ার্স ছিল।"

"তুমি কোথায় পেয়েছ প্লায়ার্স?"

রিহান পুরোপুরি ভেঙে গিয়ে বলল, "যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে চুরি করেছি প্রভু ক্লড।"

"কেন চুরি করেছ?"

"আমার—আমার—"

"তোমার কী?"

"আমার যন্ত্রপাতি দিয়ে খেলতে ভালো লাগে প্রভু ক্লড। যন্ত্র কেমন করে কাজ করে আমার জানতে ইচ্ছে করে, বুঝতে ইচ্ছে করে—" কথা বলতে বলতে রিহানের গলা ভেঙে গেল। সে হাঁটু ভেঙে নিচে পড়ে যায়, দুই হাত জোড় করে অনুনয় করে বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু ক্লড। হে ঈশ্বরপুত্র হে করুণাময়—"

প্রভু ক্লড নরম গলায় বললেন, "রিহান—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলার স্বর শুনে রিহান চমকে উঠে আশান্বিত চোখে প্রভু ক্লডের দিকে তাকাল, "বলুন প্রভু।"

"তুমি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র চালাতে পার?"

"পারি।" রিহান গলার স্বরে খানিকটা উৎসাহ ঢেলে বলল, "আমার বয়স সতের হবার পর আমাকে শেখানো হয়েছে। আমি রাত্রিবেলা ডিউটি করি মহামান্য প্রভু ক্লড।"

"তোমার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটির কী হয়েছিল?"

রিহানের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, তার সারা শরীর আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। সে মাথা নিচু করে বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু ক্লড।"

"কী হয়েছিল তোমার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের?"

"সেটি জ্যাম হয়ে গিয়েছিল।"

"অস্ত্র জ্যাম হয়ে গেলে কী করতে হয়?"

"তাকে সম্মানের সাথে অস্ত্রাগারে ফেরত দিয়ে নূতন অস্ত্র নিতে হয়।"

"আর, তুমি কী করেছিলে?"

রিহান একমুহূর্তের জন্যে মাথা উঁচু করে আবার মাথা নিচু করে বলল, "আমি অস্ত্রটি ঠিক করেছিলাম প্রভু ক্লড।"

"কীভাবে ঠিক করেছিলে?"

"আমি সেটা খুলেছিলাম। খুলে পরিষ্কার করেছিলাম। যেখানে যেখানে জং ধরেছিল সেখানে গ্রিজ লাগিয়েছিলাম।"

"তখন সেটি ঠিক হয়েছিল?"

"হয়েছিল প্রভু ক্লড।"

প্রভু ক্লড কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলে, তোমার অস্ত্রটি জ্যাম হয়েছিল কেন?"

রিহান কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে রইল। প্রভু ক্লড শান্ত গলায় বললেন, "আমার কথার উত্তর দাও ছেলে।"

"আমি অস্ত্রটিতে পানি ঢেলেছিলাম।"

"কেন পানি ঢেলেছিলে?"

"কী হয় দেখার জন্যে। অস্ত্রে কীভাবে জং ধরে বোঝার জন্যে।"

"বুঝে কী হবে?"

"ভবিষ্যতে অস্ত্রগুলো রক্ষা করা যাবে।"

"তুমি কী বুঝেছ?"

রিহান কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে রইল। প্রভু ক্লড জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আর কী কী করেছ রিহান?"

"আপনি সব জানেন। আপনি প্রভু ক্লড। আপনি ঈশ্বরপুত্র ঈশ্বর। আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি মহাশক্তিমান।"

"তবুও আমি তোমার মুখেই শুনতে চাই ছেলে। বলো।"

রিহান কাঁপা গলায় বলল, "আমি বুলেট ভেঙে দেখেছি তার ভিতরে কী আছে।"

"কী আছে?"

"কালো রঙের এক ধরনের পাউডার।"

"কী হয় সেই পাউডার দিয়ে?"

AMARBOI.COM

"আগুন জ্বালালে বিস্ফোরণ হয়।"

"সেই পরীক্ষা করতে গিয়ে তোমার কী হয়েছিল?"

রিহান নিচু গলায় বলল, "আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি জানেন। আমার হাত পুড়ে গিয়েছিল।"

'তুমি চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলে?"

"না মহামান্য প্রভু।"

"কেন যাও নি?"

"আমি ভয় পেয়েছিলাম।"

রিহান হাঁটু ভেঙে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, প্রভু ক্লড হেঁটে তার খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ সময় কেউ কোনো কথা বলল না। একসময় প্রভু ক্লড একটি নিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত গলায় বললেন, "ছেলে, তুমি কি জান এই পৃথিবীতে কী হয়েছিল?"

রিহান মাথা নাড়াল, বলল, "না প্রভু। আমি জানি না।"

"এই পৃথিবীতে একসময় ছয় বিলিয়ন মানুষ ছিল।"

রিহান মাথা তুলে বিস্ফারিত চোখে প্রভু ক্লডের দিকে তাকাল, বলল, "ছয় বিলিয়ন?"

"হ্যাঁ। একদিন তারা সব মরে গিয়েছিল। কেন জান?"

"জানি না প্রভু ক্লড।"

প্রভু ক্লড তীব্র স্বরে বললেন, "তোমার মতো মানুষের জন্যে। তাদের কৌতূহলের জন্যে।" প্রভু ক্লড কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "মানুষের সেই সভ্যতা শেষ হয়ে গেছে ছেলে। এখন পৃথিবীতে নূতন সভ্যতার জন্ম হয়েছে। এই সভ্যতায় কৌতূহলের কোনো স্থান নেই।"

"আমার ভুল হয়েছে প্রভু।"

"এই সভ্যতায় মানুষকে রক্ষা করার জন্যে আমরা আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছি।"

"আমরা জানি প্রভু। আমরা সে জন্যে কৃতজ্ঞ।"

"আমরা তোমাদের প্রভু হয়েছি। তোমাদের ঈশ্বর হয়েছি। তোমাদের সাহায্য করার জন্যে আমরা সর্বজ্ঞ হয়েছি।"

"আপনাদের দয়া। আপনাদের মহানুভবতা।"

"আমি প্রভু ক্লড হয়ে তোমাদের প্রায় অর্ধশতাব্দী থেকে রক্ষা করে আসছি। এই সুদীর্ঘ সময়ে কেউ আমার আশাভঙ্গ করে নি। ঠিক যেভাবে চেয়েছি সেভাবে চলে এসেছে। তুমি—"

রিহানের সারা শরীর হঠাৎ আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠল। প্রভু ক্লডের গলায় হঠাৎ এক আশ্চর্য কাঠিন্য এসে ভর করে, "তুমি প্রথমবার আমাকে নিরাশ করেছ। তুমি নিউক্লিয়ার রি-একটরের কুলিং নিয়ে খেলা করেছ। তুমি জান নিউক্লিয়ার রি-একটর কী? তুমি জান রেডিয়েশান কী? তুমি জান কোর মেল্টডাউন কী? জান না—কিন্তু তার পরও তুমি সেখানে হাত দিয়েছ! নির্বোধ ছেলে প্রচণ্ড রেডিয়েশানে আমরা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারতাম!"

রিহান কোনো কথা বলল না, মাথা নিচু করে হাঁটু ভেঙে বসে রইল। প্রভু ক্লড আবার বললেন, "তুমি বারুদের মাঝে আগুন দিয়েছ। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নষ্ট করেছ? সেটা খুলে ফেলেছ! তুমি জান এর অর্থ কী?"

রিহান মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না প্রভু। আমি মূর্খ। আমি নির্বোধ। আমি তুচ্ছ—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এর অর্থ তুমি অনেক কষ্ট করে তৈরি করা আমাদের এই পদ্ধতিটি অস্বীকার করেছ।"

রিহান মাথা নেড়ে বলল, "না প্রভু না। আমি অস্বীকার করতে চাই নি। আমার ভুল হয়েছে। আমার অনেক বড় ভুল হয়েছে।"

প্রভু ক্লড একটা নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ কোমল গলায় বললেন, "তুমি কেন এটা করেছ ছেলে? তুমি কেন এই নিয়ম ভেঙেছ?"

রিহান প্রভু ক্লডের গলায় কোমল স্নেহের আভাস পেয়ে প্রায় মরিয়া হয়ে বলল, "আমার মনে হয়েছিল—"

"কী মনে হয়েছিল?"

"এই যন্ত্র তো মানুষ তৈরি করেছে। মানুষের তৈরি যন্ত্রকে কেন আমাদের উপাসনা করতে হবে? আমরা কেন যন্ত্রকে বুঝতে চেষ্টা করব না?"

"তোমার তাই মনে হয়েছিল?"

"জি মহামান্য ঈশ্বরপুত্র। আমার কাছে মনে হয়েছিল এই নিয়মটি একটি বাহুল্য। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যন্ত্রের উপাসনা করা না হলেও সেগুলি কাজ করে।"

"তুমি সেটি পরীক্ষা করেছ?"

"জি মহামান্য প্রভু ক্লড।"

প্রভু ক্লড বললেন, "তুমি জান তুমি একটি খুব বড় অপরাধ করেছ। যে প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে আমাদের পুরো সভ্যতাটি গড়ে উঠেছে তুমি সেই প্রক্রিয়াটিকে অবিশ্বাস করেছ। অসম্মান করেছ।"

রিহান কাতর গলায় বলল, "আমি বুঝতে পারি নি, মহামান্য প্রভু।"

"যে যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়, তুমি সেই যন্ত্রকে অসম্মান করেছ।"

"আমার ভুল হয়েছে।" রিহান মাথা নিচু করে বলল, "আপনি আমাকে শাস্তি দিন।"

প্রভু ক্লড কয়েক মুহূর্ত রিহানের দিকে তাকিয়ে থেকে শীতল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী শাস্তি চাও?"

"আপনি আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি সেই শাস্তি মাথা পেতে নেব।"

প্রভু ক্লড একটি নিশ্বাস ফেলে কঠোর গলায় বললেন, "আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম।"

রিহান ভয়ংকর আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে ওঠে। দুই হাত জোড় করে কাতর গলায় বলল, "না, প্রভু না। আমাকে অন্য কোনো শাস্তি দিন। আমাকে বেঁচে থাকতে দিন। একটিবার মাত্র একটিবার সুযোগ দিন—"

প্রভু ক্লড স্থির দৃষ্টিতে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রিহান মাথা নিচু করে ভাঙা গলায় বলল, "আমায় ক্ষমা করুন প্রভু। ক্ষমা করুন। আমি ভুল করেছি, আর আমি ভুল করব না। আমাকে মাত্র একটিবার সুযোগ দিন—"

রিহান মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল ঘরে কেউ নেই। প্রভু ক্লড ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন। রিহান পাগলের মতো উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় হাহাকার করে বলল, "প্রভু ক্লড! প্রভু—প্রভু—"

হঠাৎ করে রিহান অনুভব করে তার দুইপাশ থেকে দুজন তাকে শক্ত করে ধরেছে। রিহান মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, মুখে রঙ মাখা দুজন মেয়ে। ধাতব রঙের চুলগুলো মাথার উপরে চুড়োর মতো করে বাঁধা। মেয়ে দুটো আলগোছে একটা করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ধরে রেখেছে।

AMARBOI.COM

রিহান উন্মাদের মতো ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল, কিন্তু পারল না। ঠিক তখন কে জানি তার মাথায় পিছন থেকে আঘাত করে।

চোখের সামনে তার সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসে। গভীর বিষাদে তার হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। এই কি তা হলে মৃত্যু?

২. মরুভূমি

মোটরবাইকের এক ধরনের কর্কশ শব্দ শুনতে শুনতে রিহান জ্ঞান ফিরে পেল। তার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি এবং মুখের উপর বাতাসের ঝাপটা—তাকে নিশ্চয়ই মোটরবাইকের পিছনে বসিয়ে একটা স্ট্যান্ডের সাথে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রিহান চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, নিশ্চয়ই কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে। মরুভূমির শীতল বাতাসে তার শরীর অবশ হয়ে আসতে চায়, তার ভেতরে যন্ত্রণায় শরীরের ভেতরে কেঁপে কেঁপে ওঠে। মনে হচ্ছে মাথাটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে। হাত দুটো পেছনে শক্ত করে বাঁধা, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হাত দুটোতে কোনো অনুভূতি নেই বলে মনে হচ্ছে। রিহান কান পেতে শুনল—আশপাশে একাধিক মোটরবাইকের শব্দ। একসাথে বেশ কয়েকজন তাকে নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় কে জানে। রিহান হাত দুটো নাড়িয়ে বাঁধনটা একটু ঢিলে করার চেষ্টা করল, কোনো লাভ হল না কিন্তু হঠাৎ করে রক্ত সঞ্চালনের একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল।

AMARBOI.COM

রিহানের সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আবার সে চেতনা হারিয়ে ফেলছিল। কিন্তু তার ভিতরেও অনেক কষ্টে সে নিজেকে জাগিয়ে রাখল। তাকে কারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে জানে না, কিন্তু অনুমান করতে পারে—নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। কোনোভাবে হাতের বাঁধন খুলতে পারলে তবুও সে বাঁচার একটা শেষ চেষ্টা করতে পারে। রিহান আবার চেষ্টা করে দেখল, বাঁধনটা খুলতে পারল না কিন্তু মনে হয় একটু ঢিলে হল। রিহান নিশ্বাস বন্ধ করে চেষ্টা করতে থাকে, বাঁধনটা না খুলেও সে যদি কোনোভাবে একটা হাত বের করে আনতে পারে তা হলেও সে একবার বাঁচার চেষ্টা করে দেখতে পারে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করে সে বাম হাতটাকে টেনে বের করে আনার চেষ্টা করে, হাত কেটে রক্তাক্ত হয়ে যায় তবু সে হাল ছাড়ে না, একসময় মনে হতে থাকে সে বুঝি কখনোই পারবে না তবুও সে দাঁতে দাঁত চেপে লেগে রইল। যখন মনে হল আর কিছুতেই পারবে না তখন হঠাৎ করে বাম হাতটা খুলে এল। সাথে সাথে হাতের তীব্র যন্ত্রণাটা ম্যাজিকের মতো কমে যায়, অন্ধকারে হাত ঘষে ঘষে রিহান হাতের মাঝে রক্ত সঞ্চালন করতে থাকে।

রিহান শুনতে পেল যারা মোটরবাইক চালাচ্ছে তারা নিজেদের মাঝে কথা বলছে, মোটরবাইকের প্রচণ্ড শব্দে কথা স্পষ্ট বোঝা গেল না, রিহানের মনে হল তারা কোথাও থামার কথা বলছে। দেখা গেল সত্যিই তাই, তার মোটরবাইকটা খানিকটা ঘুরে বেশ হঠাৎ

করেই থেমে গেল। রিহান বাঁধা অবস্থায় অচেতন হয়ে থাকার ভান করে, বুঝতে পারে তার দুই পাশে আরো দুটি মোটরবাইক থেমেছে এবং সেখান থেকে মানুষগুলো নেমে এসেছে। একজন বলল, "জ্ঞান হয়েছে নাকি?"

রিহান গলার স্বরটি চিনতে পারল না, সে দুই হাত একসাথে করে অচেতন হওয়ার ভান করে রইল। ভালো করে লক্ষ না করলে কেউ সহজে বুঝতে পারবে না তার হাতগুলো খোলা। রিহান অনুভব করল একজন মানুষ সাবধানে তাকে স্পর্শ করে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "না, এখনো অজ্ঞান হয়ে আছে।"

"জ্ঞান আর ফিরবে না। জানতেই পারবে না কী হয়েছে—" কথাটা খুব ভালো একটা রসিকতা এরকম ভঙ্গি করে মানুষটা উচ্চ স্বরে হেসে উঠল, কিন্তু অন্য কেউ তার হাসিতে যোগ দিল না।

"ছেলেটাকে খুলে এই খাদের কাছে নিয়ে এস—গুলি করে নিচে ফেলে দেব।"

"ঠিক আছে।"

রিহান অনুভব করল দুজনে মিলে তার শরীরের বাঁধন খুলে ফেলছে, উত্তেজনায় তার বুক ধকধক করতে থাকে, যদি দেখে ফেলে সে হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে তা হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে, কিন্তু মানুষগুলো সেটা বুঝতে পারল না। কালো কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা তাই সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, হয়তো এখানে অন্ধকার। রিহান টের পেল তাকে ধরাধরি করে মানুষগুলো খাদের কাছে নিয়ে এসেছে, সে তার শরীর শক্ত করে রাখে, ঠিক বুঝতে পারছে না কী করবে। হঠাৎ করে লাফিয়ে উঠে ছুটে পালানোর চেষ্টা করবে? নাকি কাউকে জাপটে ধরে তার অস্ত্রটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে?

রিহান শুনল একজন বলল, "কে গুলি করবে?"

ভারী গলায় একজন বলল, "আমি করব না। আমার খুনোখুনি ভালো লাগে না।"

অন্য একজন বলল, "খুনোখুনি করতে কি আমাদের ভালো লাগে নাকি? করতে হয় বলে করি। মনে আছে সেবার কী হল তানিয়াকে নিয়ে?"

রিহানের বুক ধকধক করতে থাকে, তানিয়া নামের একটি মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল বছর দুয়েক আগে। তাকেও মেরে ফেলেছিল এরা? ঈশ্বর ক্লডের আদেশে? কী করেছিল তানিয়া?

"আমি বলি কী—"

"কী?"

"লটারি করে বের করি কে গুলি করবে।"

"এই কাজের জন্যে লটারি করতে হবে। এই দ্যাখো আমি গুলি করি—"

রিহান লাফিয়ে উঠে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে শুনতে পেল, "আহা—এত তাড়া কীসের? করা যাক লটারি, মজা হবে খানিকটা। শেষ রাতে একটু মজা হোক না।"

"কীভাবে লটারি করবে?"

"এই যে পাথরটা কোন হাতে আছে বলতে হবে। যে হারবে সে গুলি করবে। কী বলো?"

"ঠিক আছে।"

রিহান শুনতে পায় মানুষগুলো কথা বলতে বলতে একটু দূরে সরে গিয়ে লটারি করতে থাকে। এটাই তার সুযোগ—শেষ সুযোগ। রিহান নিঃশব্দে হাত দিয়ে চোখের বাঁধা কাপড়টা খুলে তাকাল। এতক্ষণ চোখ বাঁধা ছিল বলেই কিনা কে জানে আবছা অন্ধকারে সে বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল তিনটা মোটরবাইক পাশাপাশি দাঁড় করানো। দুটোর ইঞ্জিন বন্ধ করানো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয়টি ধুকধুক করে চলছে। তার হেডলাইট জ্বালিয়ে খানিকটা আলোর ব্যবস্থা করা আছে। রিহান মনে মনে হিসেব করে সে যদি হঠাৎ করে মোটরবাইকটার ওপরে উঠে বসতে পারে তা হলে পালানোর একটা সুযোগ আছে। মানুষগুলো ব্যাপারটা বুঝতে বুঝতে একটু সময় লাগবে তার মাঝে সে অনেকদূর সরে যেতে পারবে। তখন সবাই মিলে তাকে গুলি করার চেষ্টা করবে, পিছু পিছু ধাওয়া করবে কিন্তু মনে হয় তার মাঝেও তার পালিয়ে যাবার একটা ভালো সম্ভাবনা আছে।

রিহান বুক ভরে একটা নিশ্বাস নেয়, হঠাৎ করে সে তার সারা শরীরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে। চোখের কোনা দিয়ে সে মানুষ তিনজনকে দেখে তারপর সাবধানে উঠে গুড়ি মেরে মোটরবাইকটার দিকে এগুতে থাকে। আবছা অন্ধকার থাকায় মানুষগুলো প্রথম দুএক সেকেন্ড তাকে দেখতে পায় নি, হঠাৎ করে একজন তাকে দেখে চিৎকার করে উঠল। রিহান তখন লাফিয়ে উঠে ছুটে মোটরবাইকটার উপর বসে এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে সোজা মানুষগুলোর দিকে ছুটে যায়। মানুষগুলো নিজেদের বাঁচানোর জন্যে লাফিয়ে সরে গেল এবং রিহান পোড়া টায়ারের গন্ধ ছুটিয়ে তাদের ভেতর দিয়ে গুলির মতো বের হয়ে গেল। মরুভূমির বিস্তৃত পাথুরে সমতলের উপর দিয়ে সে ছুটে যেতে থাকে, মরুভূমির শীতল বাতাসে তার চুল উড়তে থাকে, বাতাস চোখে-মুখে কেটে কেটে বসতে শুরু করে।

কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই সে গুলির শব্দ শুনতে পেল। তার কানের কাছ দিয়ে শিসের মতো শব্দ করে বুলেট ছুটে যেতেই সে তার মোটরবাইকের হেডলাইট বন্ধ করে দিল। অন্ধকার অপরিচিত মরুপ্রান্তর, যে কোনো মুহূর্তে একটা বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে সে ছিটকে পড়তে পারে—কিন্তু রিহান এই মুহূর্তে সেটি তার মাথা থেকে জোর করে সরিয়ে রাখল। রিহান মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল অন্য দুটি মোটরবাইক তাকে ধরার জন্যে ছুটে আসছে, ধরে না ফেললেও গুলির আওতায় পেয়ে যাবে কিছুক্ষণের মাঝে, তখন কী হবে?

মোটরবাইকটিকে এলোমেলোভাবে ছুটিয়ে নিতে নিতে হঠাৎ করে রিহান হতবুদ্ধি হয়ে যায়, বিশাল একটা খাদের দিকে সে ছুটে যাচ্ছে। কী করছে চিন্তা না করেই সে চলন্ত মোটরবাইক থেকে লাফিয়ে পড়ল, প্রায় সাথে সাথে মোটরবাইকটা প্রায় উড়ে গিয়ে খাদের মাঝে পড়ে এবং কয়েক সেকেন্ড পরে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, সাথে সাথে আগুনের হলকা উপরে উঠে আসে।

রিহান প্রচণ্ড যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে কোনোভাবে নিজেকে অচেতন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করল। কোনোভাবেই এখন তাকে অজ্ঞান হয়ে গেলে চলবে না। মানুষগুলো কয়েক মিনিটের মাঝে এখানে চলে আসবে, তার মাঝে তাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে। যেভাবে হোক।

রিহান মাটিতে ঘষে ঘষে প্রায় সরীসৃপের মতো নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকে। বড় বড় কিছু পাথর আছে কয়েক মিটার দূরে, তার পিছনে চলে যেতে পারলে সে নিজেকে লুকিয়ে নিতে পারবে। শরীরের কোনো হাড় ভেঙেছে কি না সে জানে না, কপালের এক পাশ থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ে বাম চোখটা বন্ধ হয়ে আসছে। চোখের সামনে একটা কালো পরদা নেমে আসতে চাইছে বারবার, অনেক কষ্টে রিহান নিজেকে জাগিয়ে রেখে নিজেকে টেনে নিতে থাকে। অমানুষিক একটা পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত নিজেকে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ফেলে সে বড় বড় নিশ্বাস নিতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের মাঝেই খুব কাছাকাছি দুটো মোটরবাইক এসে থামল। মানুষগুলো অস্ত্র হাতে নেমে আসে। খাদের পাশে দাঁড়িয়ে তারা বিধ্বস্ত জ্বলন্ত মোটরবাইকটা দেখার চেষ্টা করতে থাকে। একজন মাথা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "দেখা যাচ্ছে?"

অন্যজন উত্তর করল, "কী দেখতে চাও?"

"ছেলেটাকে।"

"কত গভীর খাদ দেখেছ? এখান থেকে দেখবে কেমন করে?'

প্রথম মানুষটা চিন্তিত মুখে বলল, "তা হলে ঈশ্বর ক্রুডকে কী বলব?"

"যেটা সত্যি সেটাই বলব।"

"সেটা কী? ছেলেটা বেঁচে আছে না মরে গেছে?"

"এখান থেকে পড়লে কেউ বেঁচে থাকতে পারে?"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমরা তো কখনোই নিশ্চিত হতে পারব না।"

"আমরা না পারলেও ঈশ্বর ক্রুড নিশ্চিত হবেন। ঈশ্বর ক্রুড সব জানেন।"

"তা ঠিক।"

মোটা গলার মানুষটা হেঁটে খাদের খুব কাছাকাছি গিয়ে বলল, "যদি ছেলেটা বেঁচেও থাকে, এই মরুভূমিতে একা একা চব্বিশ ঘণ্টার বেশি বেঁচে থাকতে পারবে না।"

"তা ঠিক।"

"তোমার লটারির বুদ্ধি না শুনে তখনই যদি কানের নিচে একটা গুলি করে দিতাম তা হলে একটা মোটরবাইক নষ্ট হত না।"

"ছেলেটার কত বড় সাহস দেখেছ? প্রভু ক্রুড মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন তার পরেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। লাভ হল কিছু?"

"একটা মোটরবাইক নষ্ট হল।"

"চল যাই।"

"খাদে নেমে কি দেখতে চাও?"

"দেখতে চাইলে দিনের বেলায় আসতে হবে। এখন অন্ধকারে নামা যাবে না।"

"তা ঠিক।"

মানুষগুলো নিচু গলায় কথা বলতে বলতে ফিরে যেতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই রিহান মোটরবাইক দুটোর ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল। ফাঁকা মরুভূমিতে দীর্ঘ সময় সে সেই শব্দ শুনতে পায়, বহুদূর থেকে সেই শব্দ তার কাছে ভেসে আসছে।

মানুষগুলো চলে যাবার পর রিহান নিজেকে পরীক্ষা করে দেখল, শরীরের কোনো হাড় ভাঙে নি, কিছু জায়গা থেঁতলে গেছে, চটচটে রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। খানিকক্ষণ উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে রিহান বড় বড় নিশ্বাস নিল, তারপর উঠে বসল। এই এলাকা থেকে তাকে সরে যেতে হবে—যতদূর সম্ভব।

নক্ষত্রের আলোতে রিহান উত্তর দিকে হেঁটে যেতে শুরু করে, একটু পরপর তার মাথায় একটা অশুভ চিন্তা এসে ভর করতে থাকে, এই নির্জন নির্বান্ধব মরুভূমিতে সে কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে? রিহান জোর করে চিন্তাটা তার মাথা থেকে সরিয়ে রাখে।

সূর্যের আলো প্রখর না হওয়া পর্যন্ত সে হেঁটে গেল। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় তার ভেতরটুকু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, একটু পরপর ক্লান্তিতে তার সমস্ত শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে কিন্তু তবুও সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থামল না। যখন আর হাঁটতে পারছিল না তখন থেমে সে একটা বড় পাথরের উপরে উঠে চারদিকে দেখার চেষ্টা করে। দূরে কোথাও কোনো পরিত্যক্ত আবাসভূমি, গুদামঘর, ধসে যাওয়া ফ্যাক্টরি, বা অন্য কিছু আছে কি না খুঁজে দেখে। সূর্যের প্রখর আলোতে চারদিক ধিকিধিকি করে জ্বলছে। বহুদূরে পশ্চিমে কিছু ধসে যাওয়া বাড়িঘর আছে বলে মনে হল। সেগুলো পাথরের স্তূপও হতে পারে। এত দূর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। রিহান চারদিকে তাকিয়ে গাছপালা খোঁজার চেষ্টা করে কিন্তু কোথাও সবুজের কোনো চিহ্ন নেই। রিহান একটা বড় নিশ্বাস ফেলে পাথর থেকে নেমে আসে, কোনো একটা বড় পাথরের ছায়ায় সে এখন বিশ্রাম নেবে, সূর্য ঢলে গিয়ে অন্ধকার হওয়ার পর সে পশ্চিম দিকে হেঁটে যাবে।

প্রচণ্ড তৃষ্ণা এবং ক্ষুধায় কাতর হয়ে সে পাথরের ছায়ায় ঘুমানোর চেষ্টা করল। তার চোখে ঘুম এল না কিন্তু ভয়ংকর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়েছিল বলে ছাড়া ছাড়া ভাবে মাঝে মাঝে ঘুমের মতো এক ধরনের অচেতনার অন্ধকারে ঢলে পড়ছিল, আবার ঘুম ভেঙে চমকে চমকে সে জেগে উঠছিল। ধীরে ধীরে সূর্যের আলো তীব্র হয়ে ওঠে, তার মাঝে রিহান একটা বড় পাথরের নিচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে। শরীরের নানা অংশ প্রচণ্ড ব্যথায় অসাড় হয়ে আছে, রিহান তার মাঝে সূর্য ঢলে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। সূর্য ঢলে পড়ে তাপমাত্রাটা মোটামুটি সহনীয় হয়ে যাবার পর রিহান উঠে বসে তারপর নিজেকে টেনে টেনে এগিয়ে নিতে থাকে।

রিহান ভালো করে চিন্তা করতে পারে না, তার মনে হতে থাকে হয়তো তার প্রভু ক্লডের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া উচিত তা হলে হয়তো মৃত্যুর আগে এক আঁজলা পানি খেতে পারবে। টলটলে ঠাণ্ডা পানি। চুমুক দিয়ে খাবার আগে সে হয়তো খানিকটা পানি নিজের মুখে ছিটিয়ে দিয়ে শীতল করে নেবে নিজের শরীরকে।

রিহান নিশ্বাস ফেলে চিন্তাটাকে মন থেকে দূর করে দেয়, তারপর ক্লান্ত দেহকে টেনে টেনে পশ্চিম দিকে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণ পরপর তাকে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে, সে আর নিজেকে টেনে নিতে পারছে না। শরীরের সমস্ত চামড়া শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, শুরুতে মুখের ভেতরে এক ধরনের নোনা স্বাদ ছিল এখন সেখানে কোনো অনুভূতি নেই, জিবটা মনে হয় একটা শুকনো কাঠ। বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে তার মাঝে ধুঁকে ধুঁকে সে নিজেকে টেনে নিতে থাকে। পশ্চিমে যে এলাকাটাকে সে ধসে যাওয়া প্রাচীন বাড়িঘর মনে করছে সেটা কতদূর সে জানে না, সেটা সত্যিই প্রাচীন বাড়িঘর কি না কিংবা সত্যি সত্যি সেখানে সে পৌঁছতে পারবে কি না সেটাও সে জানে না, তারপরেও সে এগুতে থাকে। নিজেকে টেনে নিতে নিতে মাঝে মাঝে সে দাঁড়িয়ে যায়, রাতের নানা বিচিত্র শব্দ শোনা যায় তখন, নিশ্বাস বন্ধ করে সে পরিচিত শব্দ শোনার চেষ্টা করে কিন্তু কিছু শুনতে পায় না। গভীর রাতে বহুদূর থেকে সে একটা ইঞ্জিনের চাপা গর্জন শুনতে পেল। কিসের ইঞ্জিন? কোনো লোকালয়ের? কোথায় আছে তারা?

ভোর রাতের দিকে রিহান থামল। সে পশ্চিম দিকে হেঁটে যাবার চেষ্টা করছে কিন্তু অন্ধকারে কোন দিকে হেঁটেছে সে জানে না, একটা গোলকধাঁধার মতো কি সারাক্ষণ ঘুরপাক খেয়েছে? কী হবে এখন? হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল জীবনের সাথে যুদ্ধে সে হেরে গেছে। এই ভয়ংকর নির্জন মরুভূমিতে সে বেঁচে থাকতে পারবে না, প্রভু ক্লডের মৃত্যুদণ্ডাদেশ থেকে আসলে তার মুক্তি নেই। রুক্ষ বিবর্ণ পাথরে তার মৃতদেহ পড়ে থাকবে, শুকনো বালুতে সেটি বিবর্ণ ধূসর হয়ে একসময় মাটিতে মিশে যাবে। রিহান ভালো করে চিন্তা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছিল না, মাথার ভেতরে দপদপ করছে, সে কেমন যেন একটা ঘোরের মাঝে রয়েছে। চারপাশে কী হচ্ছে সেটাও সে দেখতে পারছে না, হঠাৎ করে মনে হচ্ছে কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না।

ভোরের আলো ফোটার আগেই রিহান একটা বড় পাথরের পাশে অচেতন হয়ে পড়ল। ভোরের প্রথম আলোতে একটা সরীসৃপ সাবধানে তাকে পরীক্ষা করে সরে যায়। একটা বিষাক্ত বিছে তার খুব কাছে দিয়ে ছুটে গেল। কিছু গুবরে পোকা গর্তের ভেতর থেকে বের হয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে। একটা ছোট মাকড়সা একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে চারদিক পরীক্ষা করতে শুরু করে।

রিহান ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল সে একটা সবুজ বাগানে ঝরনার কাছে বসে আছে। চারপাশে কচি সবুজ পাতা নড়ছে, পাখি ডাকছে কিচিরমিচির করে। রিহান ঝরনার কাছে এগিয়ে যায়, ঝরনার পানিতে পা ডুবিয়ে সে এক আঁজলা পানি নিয়ে মুখে দেওয়ার চেষ্টা করতেই ঝরঝর করে পানিটুকু তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। আবার চেষ্টা করল সে, আবার পানিটুকু পড়ে গেল। পাগলের মতো আবার চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হল না, কিছুতেই সে মুখে পানি দিতে পারছে না। কে যেন হা-হা করে হেসে উঠেছে, মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে সামনে প্রভু ক্লড দাঁড়িয়ে আছেন। কঠোর মুখে বললেন, "না, রিহান তুমি পানি খেতে পারবে না। আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। তোমার কোনো মুক্তি নেই।"

রিহান কাতর গলায় বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু। ক্ষমা করুন।"

প্রভু ক্লড হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, "ক্ষমা করব? তোমাকে? কক্ষনো না।" তারপর হাত তুলে বললেন, "নিয়ে যাও ওকে আমার সামনে থেকে।"

দুজন মানুষ তখন তাকে ধরে নিয়ে যেতে থাকে। তাকে নেবার জন্যে অনেকগুলো মানুষ মোটরবাইকে করে আসতে থাকে। আস্তে আস্তে মোটরবাইকের গর্জন বাড়তে থাকে, ভোঁতা কর্কশ গর্জন। একসময় প্রচণ্ড গর্জনে তার কানে তালা লেগে যায়—চোখ খুলে তাকাল রিহান। সে এখনো বেঁচে আছে? একটা ভোঁতা কর্কশ গর্জন শুনতে পেল সে। মোটরবাইকের গর্জন? প্রভু ক্লডের অনুচরেরা তাকে ধরতে আসছে? এটি কি স্বপ্ন না সত্যি?

রিহান চিন্তা করতে পারে না, কোনো কিছুতেই এখন আর কিছু আসে যায় না। সে আবার চোখ বন্ধ করল, চোখ বন্ধ করেও সে মোটরবাইকের গর্জন শুনতে পেল—মাটিতে সে কম্পন অনুভব করল। হঠাৎ করে গর্জন থেমে যায়, তখন মানুষের পায়ের শব্দ আর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় রিহান। মনে হয় অনেক দূর থেকে কারো গলার স্বর ভেসে আসছে। কেউ একজন বলছে, "দেখো। একটা মানুষ মরে পড়ে আছে।"

রিহানের মনে হল অনেক মানুষ তাকে ঘিরে ভিড় করছে। কে একজন তাকে স্পর্শ করল, তারপর বলল, "না, না এখনো মরে নি।"

"কী আশ্চর্য! বেঁচে আছে? বেঁচে আছে এখনো?"

রিহান অনেক কষ্ট করে চোখ খুলে তাকাল, ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কিছু অশরীরী প্রাণী তাকে ঘিরে রেখেছে। রিহান কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু বলতে পারল না, শুকনো অসাড় জিবটাকে সে নাড়াতে পারল না, শুধু ঠোঁট দুটো নড়ল একবার। অচেতনার অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে সে আরো একবার বলার চেষ্টা করল, "পানি।" কিন্তু সে বলতে পারল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনতে পেল ভারী গলায় একজন বলল, "পানির বোতলটা দাও দেখি। এর মুখে একটু পানি দিতে হবে।"

কথাটি সত্যি না স্বপ্ন রিহান বুঝতে পারল না। কিছুতেই এখন আর কিছু আসে যায় না।

কিছু আসে যায় না।

৩. গ্রুস্তান পরিবার

রিহান বাটি থেকে চুমুক দিয়ে স্যুপটা শেষ করে খালি বাটিটা ত্রানাকে ফেরত দিল। ত্রানার বয়স দশ যদিও তাকে দেখে আরো কম মনে হয়। সে খালি বাটিটা হাতে নিয়ে সাথে সাথে চলে গেল না, রিহানের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইল। রিহান চোখ মটকে জিজ্ঞেস করল, "কী হল ত্রানা, তুমি কিছু বলবে?"

ত্রানা মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু।"

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাও, লজ্জা করো না, জিজ্ঞেস করে ফেলো।"

ত্রানা ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "তোমার পা যে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে তোমার ব্যথা করে না?"

রিহান শিকল দিয়ে বাঁধা ডান পা-টি নাড়িয়ে বলল, "নাহ্। অভ্যাস হয়ে গেছে।"

ত্রানা এদিক-সেদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "তোমাকে বেঁধে রেখেছে কেন? তুমি কি খুব ভয়ংকর?"

রিহান মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বলল, "তোমার কী মনে হয়?"

"আমি জানি না।" ত্রানা তার মুখে বয়সের তুলনায় বেশি গাম্ভীর্য ফুটানোর চেষ্টা করে বলল, "বাবা বলেছে তুমি খুব ভয়ংকর সেজন্যে তোমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে।"

রিহান কী বলবে বুঝতে না পেরে বিস্ময়াভিভূত বাচ্চাটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ত্রানা গলা নামিয়ে ষড়যন্ত্রীদের মতো বলল, "বাবা বলেছে তুমি নিশ্চয়ই তোমার কমিউনে কাউকে খুন করে পালিয়ে এসেছ। তোমার কমিউনের লোকেরা তোমাকে নিশ্চয়ই খুঁজছে।"

রিহান হেসে বলল, "আমি যদি আসলেই ভয়ংকর হতাম তা হলে কি তোমার বাবা তোমার মতো এরকম একটা ছোট মেয়েকে দিয়ে স্যুপ পাঠাত?"

ত্রানা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে মাথা নেড়ে বলল, "সেটা তুমি ঠিকই বলেছ।"

"আসলে আমাকে তো কেউ চেনে না তাই সবাই ভয় পায়। অচেনা মানুষকে সবাই ভয় পায়।"

ত্রানা কিছুক্ষণ রিহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "বাবা যখন তোমাকে এনেছিল আমরা সবাই ভেবেছিলাম তুমি মরে যাবে!"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি কি তোমার কমিউন থেকে পালিয়ে এসেছ?"

"সেটা অনেক বড় গল্প।"

ত্রানার চোখ চকচক করে ওঠে, তার খুব গল্প শোনার শখ। রিহানের আরেকটু কাছে এসে বলল, "আমাকে গল্পটা বলবে?"

রিহান ত্রানার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু তুমি কাউকে বলে দেবে না তো?"

ত্রানা দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, "কাউকে বলব না। ঈশ্বরী প্রিমার কসম!"

ঈশ্বরী প্রিমা! রিহানের বুকের ভেতর হঠাৎ ধক করে ওঠে, প্রভু ক্লডের হাত থেকে সে কোনোভাবে বেঁচে এসেছে, এখানে আছেন ঈশ্বরী প্রিমা। আবার কি নূতন করে কোনো বিপদে পড়বে? ঈশ্বরী প্রিমা যখন তার সম্পর্কে জানবে তখন কী হবে তার?

ত্রানা একটু অধৈর্য গলায় বলল, "কী হল? বলবে না?"

"হ্যাঁ বলব। আরো কয়দিন যাক তারপর বলব।"

ত্রানার খানিকটা আশাভঙ্গ হল, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখন কন্টেইনারের দরজায় ছোট ছোট কয়েকটা ছেলেমেয়ে ভিড় করে এসে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। তাদের খেলার সময় হয়েছে এবং ত্রানাকে ছাড়া খেলা কিছুতেই জমে ওঠে না!

ত্রানা চলে যাবার পর রিহান উঠে দাঁড়ায়, তাকে কয়েক মিটার লম্বা একটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, কন্টেইনারের ভেতরে সে একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারে, খোলা দরজার কাছাকাছি বসে বাইরে তাকাতে পারে কিন্তু এর বেশি কিছু করতে পারে না। রিহান কন্টেইনারের ভেতর পায়চারি করতে থাকে, ত্রানাকে বলেছে পায়ের মাঝে শিকল দিয়ে বাঁধা থাকতে তার অভ্যাস হয়ে গেছে কিন্তু আসলে অভ্যাস হয় নি। একজন মানুষ সম্ভবত অন্য অনেক কিছুতে অভ্যস্ত হতে পারে কিন্তু শেকলে বাঁধা অবস্থায় বেঁচে থাকতে কখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠে না।

AMARBOI.COM

তালা খোলার শব্দে রিহান ঘুম থেকে জেগে ওঠে। গ্রুস্তান কন্টেইনারের তালা খুলে ভিতরে এসে ঢুকেছে। এখন খুব সকাল, ভালো করে দিনটি শুরু হয় নি। গ্রুস্তান রিহানের পায়ে বাঁধা শিকলটির অন্য মাথায় তালাটি খুলে বলল, "চল।"

রিহান আগেও লক্ষ করেছে গ্রুস্তান খুব কম কথার মানুষ। এর আগেও রিহান তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি। তার প্রাণ রক্ষা করার জন্যে সে অনেকবার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে, গ্রুস্তানের কোনো ভাবান্তর হয় নি। শেকল দিয়ে তাকে বেঁধে রাখার ব্যাপারটি নিয়ে রিহান অনেকবার কৌতূহল কিংবা আপত্তি প্রকাশ করেছে গ্রুস্তান সেখানেও কখনো কোনো কথা বলে নি, তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে একজন মানুষকে পশুর মতো শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা সম্ভবত খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

রিহান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কোথায়?"

গ্রুস্তান উত্তর না দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে।

রিহান নিজের শেকলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "আমাকে আগে খুলে দাও।"

"না।"

"কেন নয়?"

"আমাদের আক্রমণ করতে আসছে, তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে।"

রিহান ভয়ংকরভাবে চমকে উঠল, মাথা ঘুরিয়ে গ্রুস্তানের দিকে ভালো করে তাকাল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুপচাপ ঠাণ্ডা ধরনের মানুষটির চেহারার মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা। রিহান কান পেতে শুনতে পেল বাইরে মানুষজন ছোটাছুটি করছে, নীরব এক ধরনের ব্যস্ততা, কোনো একটা কমিউনে যখন বাইরের কোনো দল আক্রমণ করে তখন এরকম অস্থির একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

রিহান জিজ্ঞেস করল, "আমাকেও যুদ্ধ করতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

"শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলে কেমন করে যুদ্ধ করব?"

"তুমি যেহেতু পালাতে পারবে না তাই জানপ্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করবে। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"তোমাকে আমরা চিনি না। তোমার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, এমনও হতে পারে যারা আসছে তারা তোমাদেরই মানুষ।"

রিহান হতবুদ্ধি হয়ে গ্রুস্তানের দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু গ্রুস্তান সুযোগ দিল না, শেকলে টান দিয়ে বলল, "চল। তাড়াতাড়ি।"

রিহান কন্টেইনারের বাইরে পা দিয়ে চারদিকে তাকায়। ট্রাকগুলো গোল করে সাজানো হয়েছে। মানুষেরা অস্ত্র হাতে ছোটাছুটি করছে। একটা ট্রাকের ছাদে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ বাইনোকুলার দিয়ে দূরে দেখার চেষ্টা করছে। রিহান কান পেতে অনেক দূর থেকে ভেসে আসা মোটরবাইকের ইঞ্জিনের মৃদু গর্জন শুনতে পায়, মনে হয় বেশ বড় একটা বহর এদিকে আসছে।

গ্রুস্তান একজন মধ্যবয়স্ক মানুষের হাতে রিহানের শিকলটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "একে তোমাদের সাথে নিয়ে যাও। ফ্রন্ট লাইনে কোনো কিছুর সাথে বেঁধে রেখো।"

"ঠিক আছে।"

"এর কাছাকাছি থেকো তোমরা।"

"থাকব।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটিকে একটু নার্ভাস দেখায়, সে কাঁপা গলায় বলল, "ঈশ্বরী প্রিমা কী বলেছেন?"

"এখনো কিছু বলেন নি। তোমরা ফ্রন্ট লাইনে চলে যাও ঈশ্বরীর নির্দেশ আসা মাত্রই জানিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে।"

মধ্যবয়স্ক মানুষ দুজন কঠোর চেহারার মেয়েকে নিয়ে সামনের দিকে হেঁটে যেতে থাকে। রিহানের পায়ে বাঁধা শিকলটা গুটিয়ে নিয়ে একজন মেয়ে তার হাতে একটা মাঝারি শক্তির স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে বলল, "এটা হাতে রাখ। ফ্রন্ট লাইনে গিয়ে কেমন করে চালাতে হয় শিখিয়ে দেব।"

রিহান অস্ত্রটা একনজর দেখল, "আমাকে শিখাতে হবে না। আমি এটা চালাতে জানি।"

মেয়েটা একটু অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকাল, রিহান বলল, 'তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চল।"

পাথুরে রাস্তা দিয়ে রিহান এবং অন্য তিনজন এগিয়ে যায়। প্রায় কয়েক শ মিটার দূরে বড় বড় কিছু পাথরের কাছে এসে সবাই দাঁড়াল। মধ্যবয়স্ক মানুষটি এদিক-সেদিক তাকিয়ে একটা পুড়ে যাওয়া লরির এক্সেলের সাথে রিহানের শেকলটা বেঁধে দেওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। রিহান বলল, "আমাদের আরো সামনে যাওয়া দরকার।"

মানুষটি অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকাল। ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বললে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বলেছি, আমাদের আরো সামনে যাওয়া দরকার।"

"কেন?"

"মোটরবাইকগুলোকে তা হলে আমরা সামনাসামনি পাব। একেবারে খোলা টার্গেট। এখানে থাকলে সেগুলো হঠাৎ করে চলে আসবে আমরা প্রস্তুত হবারও সময় পাব না।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি খানিকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "আমাদের কী করতে হবে সেটা তোমার কাছ থেকে শোনার কোনো প্রয়োজন নেই। সেজন্যে ঈশ্বরী প্রিমা আছেন।"

রিহান অপমানটা গায়ে মাখল না, একটু পরেই এখানে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হবে, এখন মান-অপমান নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। রিহান তার বুকের ভেতর ভয় এবং অস্থিরতার এক ধরনের কাঁপন অনুভব করে। বহু দূরে ধুলো উড়িয়ে মোটরবাইকগুলো আসছে, মোটরবাইকের গুঞ্জন এবারে বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। রিহান কান পেতে কিছুক্ষণ শুনে একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "বেভাস্টিসি ৪৩!"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "কী হয়েছে?"

"বেভাস্টিসি ৪৩ মোটরবাইক। দুই হাজার সিসির ইঞ্জিন!"

"তুমি কেমন করে জান?"

"শব্দ শুনে বোঝা যায়। আমি চালিয়েছিলাম একবার, খুব শক্তিশালী মেশিন!"

মধ্যবয়স্ক মানুষ এবং মেয়ে দুটি রিহানের উচ্ছ্বাসে কোনো অংশ না নিয়ে দুই পাশে সরে যেতে থাকে। রিহান তবু দমে গেল না, বলল, "বেভাস্টিসি ৪৩-এর খুব বড় গোলমাল আছে—"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "কোনো যন্ত্রপাতি নিয়ে তুমি কোনো অশোভন উক্তি করবে না। খবরদার।"

রিহান থতমত খেয়ে বলল, "আমি কোনো অশোভন উক্তি করছি না। যেটা সত্যি সেটা বলছি। গ্যাসোলিন ট্যাংকটা অরক্ষিত। হালকা এলুমিনিয়ামের মোল্ড। বারো গ্রামের এক্সপ্রেসিভ বুলেট দিয়ে গুলি করলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।"

AMARBOI.COM

মধ্যবয়স্ক মানুষটি তার অন্য দুইজন সঙ্গীর দিকে তাকাল এবং সবাই মিলে রিহানকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আশপাশে অস্ত্র বসানোর ভালো জায়গা খুঁজতে শুরু করে। বড় একটা পাথরের উপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি দাঁড়া করিয়ে মধ্যবয়স্ক মানুষটি মাথা নিচু করে সেটার প্রতি সম্মান দেখাল, বিড়বিড় করে কিছু একটা উচ্চারণ করে অস্ত্রটির ব্যারেলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে কপালে ছোঁয়াল।

ঠিক এরকম সময়ে গ্রুস্তানকে দৌড়ে আসতে দেখা যায়। পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে কিছু একটা বলতে বলতে ছুটে আসছে। কাছাকাছি এসে গ্রুস্তান হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ঈশ্বরী প্রিমার নির্দেশ এসে গেছে।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা খুশি হয়ে গেল, "জয় হোক ঈশ্বরী প্রিমার।" পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে দুইজনের একজন বলল, "কী বলেছেন ঈশ্বরী প্রিমা?"

"বলেছেন এগুলো বেভাস্টিসি ৪৩ মোটরবাইক। এর গ্যাসোলিন ট্যাংক হালকা এলুমিনিয়ামের মোল্ড। বারো গ্রামের এক্সপ্রেসিভ বুলেট দিয়ে গুলি করতে বলেছেন।"

মধ্যবয়স্ক মানুষ এবং তার সাথের মেয়ে দুজন কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাদের মুখ দেখে মনে হল তারা গ্রুস্তানের কথা বুঝতে পারছে না। গ্রুস্তান একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হল তোমাদের?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না-না-কিছু না।" বলে মধ্যবয়স্ক মানুষটি রিহানের দিকে তাকাল। হঠাৎ করে তার চোখে এক ধরনের ভীতি ফুটে উঠেছে। সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না ঈশ্বরী প্রিমার কথাটুকু রিহান আগেই বলে দিয়েছে।

গ্রস্তান অবিশ্যি সেটা বুঝতে পারল না, সে বলল, "ঈশ্বরী বলেছেন তোমরা আরো সামনে যাও। তা হলে মোটরবাইকগুলোকে সামনাসামনি আক্রমণ করতে পারবে। একেবারে খোলা টার্গেট হিসেবে পেয়ে যাবে, যাও—দেরি করো না।'

গ্রস্তান যেভাবে ছুটে এসেছিল ঠিক সেভাবে পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে কমিউনের দিকে ফিরে গেল। রিহান তার হাতের অস্ত্রটি হাত বদল করে বলল, "এখন আমার কথা বিশ্বাস হল?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ রিহানের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "তুমি কেমন করে জেনেছ?"

রিহান কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "সেটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। এখন তাড়াতাড়ি চল। দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

মানুষটি পোড়া লরির দিকে এগিয়ে গিয়ে শেকলের তালা খুলে আনে। সেটা শক্ত করে ধরে রেখে কঠোর দৃষ্টিতে রিহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "সামনে এগিয়ে যাও। একটু যদি বাড়াবাড়ি কর তা হলে আমি কিন্তু তোমাকে খুন করে ফেলব। ঈশ্বরী প্রিমার কসম।"

শক্ত চেহারার মেয়েটি রিহানকে পিছনে ধাক্কা দিয়ে সামনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "যুদ্ধ শেষ হলে ঈশ্বরী প্রিমার কাছে তোমাকে রিপোর্ট করতে হবে।"

অন্য মেয়েটি বলল, "রিপোর্ট করতে হবে না। ঈশ্বরী প্রিমা নিজেই জেনে যাবেন।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "জয় হোক ঈশ্বরী প্রিমার।"

অন্য দুজন যন্ত্রের মতো বলল, "জয় হোক।"

AMARBOI.COM

দুই শ মিটার দূরে খানিকটা উঁচু ঢালে রিহান এবং অন্য তিনজন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো তাক করে নিয়ে মোটরবাইকগুলোর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। মুখ খুললে পরে বিপদ হতে পারে নিশ্চিত জেনেও রিহান বলল, "রেঞ্জের ভিতরে না আসা পর্যন্ত গুলি করবে না। লেজার লক গ্যারান্টি হবার পর ট্রিগারে হাত দেবে। তার আগে নয়।"

এটি ঈশ্বরী প্রিমার নির্দেশ নয়, তারপরেও মধ্যবয়স্ক মানুষ এবং সাথের মেয়ে দুজন সেটি গোমড়া মুখে মেনে নিল। তারা বুঝে গিয়েছে রিহানের ভেতরে কিছু একটা আছে যেটা তাদের নেই। সেটা কী তারা ধরতে পারছে না সেজন্যে তারা খুব অস্বস্তিতে আছে। রিহানের কথামতো তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে এবং মোটরবাইকের বহরটি যখন খুব কাছাকাছি হাজির হয়েছে তখন টার্গেট লক ইন করে তারা ট্রিগার টেনে ধরল, সাথে সাথে পুরো পরিবেশটি ভয়ংকর হয়ে উঠল। চোখের পলকে তিনটি মোটরবাইক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষের চিৎকার, গোলাগুলি এবং বারুদের গন্ধে পরিবেশটি নারকীয় হয়ে ওঠে। আক্রমণকারী দলটি বেপরোয়া, দলের অর্ধেক যোদ্ধাই মহিলা, তারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে বারবার তাদের ব্যূহ ভেদ করে চলে আসতে চেষ্টা করছিল। গ্রস্তান আরো কিছু মানুষ নিয়ে তাদের সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে। ভয়ংকর গোলাগুলিতে পুরো এলাকাটা প্রকম্পিত হতে থাকে।

যুদ্ধটা যেরকম প্রায় হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল সেরকম হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল। আক্রমণকারী দলটি হঠাৎ করে পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মোটরবাইকে তাদের আহত পুরুষ এবং মেয়েদের তুলে নিয়ে গুলি করতে করতে ধুলো উড়িয়ে তারা দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। বড় ধরনের কোনো ক্ষতি ছাড়াই শত্রুকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সবার ভেতরে এক ধরনের স্বস্তি ফিরে এসেছে। মোটামুটিভাবে পুরো এলাকাটা একটা উৎসবের মতো আনন্দে মেতে উঠল। সবাই কমিউনে ফিরে যাবার পর রিহান আবিষ্কার করল সে একা এখানে রয়ে গেছে। শেকল দিয়ে তাকে একটা ট্রাকের এক্সেলের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তাকে খুলে নিয়ে যাবার কথা কারো মনে নেই।

রিহান অবিশ্যি তাতে খুশিই হল। কন্টেইনারের ছোট ঘুপচি ঘরে সে দীর্ঘদিন থেকে আটকা পড়ে আছে। বাইরে খোলা প্রান্তরে বসে থাকতে তার খারাপ লাগছে না। রিহান একটা বড় পাথরে হেলান দিয়ে দূরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠিক জানা নেই কেন তার মনটা বিষণ্ন হয়ে আসছে। কতক্ষণ এভাবে বসে ছিল জানা নেই, হঠাৎ শুনল "রিহান।"

বাচ্চা মেয়ের গলার স্বর। রিহান মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, ত্রানা ছোট একটা পানীয়ের বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রিহান নরম গলায় বলল, "কী খবর ত্রানা!"

"তুমি এখানে একা একা কেন বসে আছ?"

"আমাকে এখানে বেঁধে রেখেছে।"

"ও!" ত্রানা কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে তার দিকে পানীয়ের বোতলটি এগিয়ে দেয়, "এইটা তোমার জন্যে এনেছি।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ত্রানা।" রিহান পানীয়ের বোতলটা খুলে ঢকঢক করে গলায় খানিকটা উত্তেজক পানীয় ঢেলে বলল, "আমার কথা সবাই ভুলে গেছে মনে হয়।"

"উঁহু।" ত্রানা মাথা নাড়ল, ভোলে নি।"

রিহান একটু অবাক হয়ে তাকাল, "তুমি কেমন করে জান?"

"আমি বাবাকে অন্যদের সাথে কথা বলতে শুনেছি।"

"কী কথা বলছে?"

ত্রানা মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না। তোমাকে মনে হয় ঈশ্বরী প্রিমার কাছে নিয়ে যাবে।"

রিহান চমকে উঠে বলল, "কী বললে?"

ত্রানা ভুরু কুঁচকে রিহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি খুব ভয়ংকর, তাই না?"

রিহান কোনো কথা বলল না, সে মোটেই ভয়ংকর নয়। সে অন্যরকম। অন্যরকম মানে ভয়ংকর নয়। কিন্তু এই কথাটি সে কেমন করে অন্যদের বোঝাবে?

৪. ঈশ্বরী প্রিমা

রিহান হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার হাত দুটি পেছনে বাঁধা, দুপাশে দুজন কঠিন চেহারার মানুষ। একজন তার কাঁধের কাছে পোশাকটা খামচে ধরে রেখেছে, সে ছুটে যেন না যায় সেজন্যে নয়—সম্ভবত তাকে বোঝানোর জন্যে সে এখানে ঈশ্বরী প্রিমার কাছে নেহায়েত নগণ্য এবং তুচ্ছ একজন মানুষ।

AMARBOI.COM

রিহানের ভেতরে কোনো বোধ নেই। এই মুহূর্তে তার নিজেকে পুরোপুরি অনুভূতিহীন একটি যন্ত্র বলে মনে হচ্ছে। তার ভেতরে হতাশা এবং ক্ষোভ থাকার কথা, কিন্তু সেরকম কিছু নেই। তার ভেতরে বিস্ময় এবং আতঙ্কও থাকার কথা সেরকমও কিছু নেই। বরং সে নিজের ভেতরে সূক্ষ্ম এক ধরনের কৌতূহল অনুভব করছে। ঈশ্বরী প্রিমা তাকে কী শাস্তি দেবে সেটি নিয়ে কৌতূহল নয়, ঈশ্বরী প্রিমা দেখতে কেমন সেটি নিয়ে কৌতূহল। রিহান চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কখন আসবে ঈশ্বরী প্রিমা?"

তাকে খামচে ধরে রাখা মানুষটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চাপা গলায় বলল, "কোনো কথা নয়। চুপ, একেবারে চুপ।"

রিহান চুপ করে গেল এবং প্রায় সাথে সাথেই সে ঘরের ভেতরে কাপড়ের খসখস একটা শব্দ শুনতে পায়। নিশ্চয়ই ঈশ্বরী প্রিমা এসেছেন, কারণ রিহানের দু পাশের দুজন মানুষ তখন তার মতোই মাথা নিচু করে উবু হয়ে বসে গেল। ঘরের ভেতরে কিছুক্ষণের জন্যে এক ধরনের অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। হঠাৎ ঈশ্বরী প্রিমার গলা শোনা গেল, "এটিই তা হলে সেই মানুষ!"

কেউ কোনো কথা বলল না, এটি ঠিক প্রশ্ন ছিল না, এটি ছিল এক ধরনের স্বগতোক্তি। তা ছাড়া কখনোই ঈশ্বরী প্রিমার সাথে সরাসরি কথা বলার অনুমতি নেই। রিহান আবার কাপড়ের মৃদু খসখস শব্দ শুনতে পেল, সম্ভবত ঈশ্বরী প্রিমা তাকে ভালো করে দেখার জন্যে আরো একটু কাছে এসেছেন। রিহান একটা নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল, অনেকটা দীর্ঘশ্বাসের মতো। তারপর ঈশ্বরী প্রিমা আবার বললেন, "মানুষটা এখানে থাকুক। তোমরা দুজন যাও।"

সাথে সাথে রিহানের দু পাশের দুজন মানুষ মাথা নিচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এখন এই ছোট ঘরটিতে রিহান এবং ঈশ্বরী প্রিমা ছাড়া আর কেউ নেই। রিহানের খুব ইচ্ছে করছিল মাথা তুলে ঈশ্বরী প্রিমাকে দেখে, কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যদি কোনো মানুষ ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরীর সত্যিকার চোহারা দেখে তা হলে সে বেঁচে থাকতে পারে না। যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় শুধু তাদেরকেই ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরী তাদের নিজের চেহারা দেখতে দেন। রিহান এটি বিশ্বাস করে না, কিন্তু তবুও সে মাথা তুলে দেখার সাহস করল না।

রিহান হঠাৎ করে ঈশ্বরী প্রিমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "তুমি জান, তুমি খুব বড় অপরাধ করেছে?"

রিহানের ঠিক কী হল কে জানে, সে মাথা নেড়ে বলল, "না, আমার জানা নেই ঈশ্বরী প্রিমা।"

ঈশ্বরী প্রিমা রিহানের কথায় খুব অবাক হলেন, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "পৃথিবীর সব কমিউনে ঈশ্বর এবং মানুষের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তুমি সেটি অস্বীকার করেছ?"

রিহান কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। মাত্র কয়েকদিন আগে হুবহু একই রকম কথা বলে প্রভু ক্লড তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এখানে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে কী হবে? একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে?

ঈশ্বরী প্রিমা বললেন, "যে কাজটি আমার করার কথা, তুমি কেন সেই কাজটি করছ?"

রিহান কিছু বলল না।

ঈশ্বরী প্রিমা কঠিন গলায় বললেন, "আমার কথার উত্তর দাও।"

রিহান হঠাৎ মাথা তুলে তাকাল, সাথে সাথে ঈশ্বরী প্রিমা তার হাতে ধরে রাখা কারুকার্যখচিত একটি মুখোশে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন বলে রিহান ঈশ্বরী প্রিমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেহারাটা দেখতে পেল না। ঈশ্বরী প্রিমার মাথায় কুচকুচে কালো চুল বেণি করে বেঁধে দু পাশ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শরীরে ধবধবে সাদা একটি পাতলা পোশাক, যার ভেতর দিয়ে আবছাভাবে দেহের অবয়ব দেখা যায়। রিহান শান্ত গলায় বলল, "ঈশ্বরী প্রিমা, কোন কাজটি ঈশ্বরের এবং কোন কাজটি মানুষের সেই পার্থক্যটি খুব অস্পষ্ট। আমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যে কাজটি করার কথা ছিল সেটিই করেছি। অন্যকে করতে বলেছি।"

"তুমি ঈশ্বর এবং ঈশ্বরীর ক্ষমতায় বিশ্বাস কর না? তুমি নিজে থেকে দায়িত্ব নিয়েছ? সিদ্ধান্ত নিয়েছ?"

রিহান কোনো কথা না বলে ঈশ্বরী প্রিমার দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশ্বরী প্রিমা বললেন, "আমার কথার উত্তর দাও।"

রিহান নিচু গলায় বলল, "অনুগ্রহ করে আমাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করবেন না মহামান্য প্রিমা।"

"কেন নয়?"

"কারণ—কারণ—" রিহান বুঝতে পারল তার কিছুতেই এই কথাটি বলা ঠিক হবে না কিন্তু তার পরেও সে বলে ফেলল, "আমি ঈশ্বর এবং ঈশ্বরীর কোনো অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করি না।"

ঈশ্বরী প্রিমা চমকে উঠে কারুকার্যখচিত মুখোশের ভিতর দিয়ে রিহানের দিকে তাকালেন। অস্পষ্ট এবং শোনা যায় না এরকম গলায় বললেন, "তুমি কেন এ কথা বলছ?"

"কারণ—কারণ—" এই কথাটিও নিশ্চয়ই কিছুতেই বলা উচিত নয়, তার পরেও রিহান বলে ফেলল, "আমাকে একজন ঈশ্বর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল কিন্তু আমি মরি নি!"

রিহান দেখল ঈশ্বরী প্রিমা থরথর করে কেঁপে উঠলেন। মুখোশের আড়ালে তার মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সেটি নিশ্চয়ই ভয়ংকর ক্রোধে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ করে রিহান ভয় পেয়ে গেল, সে মাথা নিচু করে বলল, "আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন ঈশ্বরী প্রিমা।"

ঈশ্বরী প্রিমা কোনো কথা না বলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রিহান আবার বলল, "আমাকে আবার মৃত্যুদণ্ড দেবেন না ঈশ্বরী প্রিমা। আমি কারো কোনো ক্ষতি করতে চাই না—আমি শুধু বেঁচে থাকতে চাই। যেটুকু কৌতূহল নিয়ে মানুষের বেঁচে থাকা উচিত আমি শুধুমাত্র সেটুকু কৌতূহল নিয়ে—"

ঈশ্বরী প্রিমা রিহানকে বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি একজন ঈশ্বর বা ঈশ্বরী সম্পর্কে কতটুকু জান?"

রিহান থতমত খেয়ে বলল, "আমি বেশি জানি না।"

"একজন সাধারণ মানুষ কেমন করে একজন ঈশ্বর বা ঈশ্বরী হয়?"

রিহান কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

"আমার কথার উত্তর দাও।"

"আমাকে ক্ষমা করুন মহামান্য ঈশ্বরী প্রিমা। আমি বলতে পারব না।"

"তোমার বলতে হবে, আমি জানতে চাই। বলো, সাধারণ মানুষ কেমন করে একজন ঈশ্বর বা ঈশ্বরী হয়?"

"হয় না ঈশ্বরী প্রিমা। সাধারণ মানুষ কখনো ঈশ্বর বা ঈশ্বরী হয় না।"

"তা হলে? তা হলে তারা কেমন করে সবাইকে রক্ষা করে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাদের কাছে নিশ্চয়ই কিছু তথ্য আছে যেটা অন্যদের কাছে নেই। সেই তথ্যটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কাউকে কাউকে ঈশ্বর করা হয়। আমার মনে হয়—"

"কী মনে হয়?"

"আমার মনে হয় একজন ঈশ্বর বা ঈশ্বরী খুব নিঃসঙ্গ একজন মানুষ। খুব দুঃখী একজন মানুষ।"

ঈশ্বরী প্রিমা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রিহানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। রিহান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আপনি কি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন?"

ঈশ্বরী প্রিমা ফিসফিস করে বললেন, "হ্যাঁ, তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার কথা। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেব না।" ঈশ্বরী প্রিমা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি যাও, তুমি এখান থেকে যাও। চলে যাও।"

রিহান উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে তাকে অভিবাদন করে সে পিছিয়ে যেতে থাকে। দরজা ঠেলে ঘর থেকে বের হবার সময় আরো একবার মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল ঈশ্বরী প্রিমা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কারুকার্যখচিত মুখোশের আড়ালে ঈশ্বরী প্রিমার মুখমণ্ডলটি একবার দেখার জন্যে হঠাৎ করে রিহান এক ধরনের কৌতূহল অনুভব করে। অদম্য কৌতূহল। কিন্তু রিহান তার মুখমণ্ডল দেখতে পেল না।

ভোরবেলা খুট করে কন্টেইনারের দরজা খুলতেই রিহানের ঘুম ভেঙে গেল। সাধারণত বেশ বেলা হবার পর তার জন্যে ত্রানা একটা বাটিতে একটু খাবার নিয়ে আসে, এত সকালে কে এসেছে কে জানে। শিকল বাঁধা পা'টা কাছে টেনে এনে শরীরে কম্বলটা জড়িয়ে রিহান বিছানায় উঠে বসল।

AMARBOI.COM

দরজা খুলে গ্রস্তান এবং তাঁর সাথে একজন মহিলা এসে ঢুকল। মহিলাটি মধ্যবয়স্কা, শক্ত সমর্থ চেহারা। রোদে পোড়া, তীক্ষ্ণ চোখ এবং কাঁচা-পাকা চুল। মহিলাটি কাছে এসে বলল, "আমার নাম নীলন। আমি এই কমিউনের দায়িত্বে আছি। গ্রস্তানের কাছে আমি তোমার কথা শুনেছি, কিন্তু তোমার সাথে আমার পরিচয় হয় নি।"

রিহান বলল, "তোমার সাথে পরিচিত হয়ে আমি খুশি হলাম নীলন।"

নীলন তার পা থেকে বাঁধা দীর্ঘ শিকলটি দেখিয়ে বলল, "তোমাকে দীর্ঘ সময় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ নিরাপত্তার কারণে আমরা কোনো ঝুঁকি নেই নি।"

গলার স্বরে সূক্ষ্ম অপরাধবোধের ছোঁয়া আবিষ্কার করে রিহান একটু অবাক হয়ে নীলনের দিকে তাকাল। তবে কি এখন তার শেকল খুলে ফেলা হবে?

গ্রস্তান বলল, "তোমাকে আমরা যখন পেয়েছিলাম একবারও ভাবি নি তোমাকে বাঁচাতে পারব।"

রিহান বলল, "আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে আমি সারা জীবন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।"

"কিন্তু আমরা কেউ জানতাম না, তুমি কে, তুমি কোথা থেকে এসেছ কিংবা তোমাকে বিশ্বাস করা যায় কি না।"

নীলন বলল, "কিন্তু আমরা এখন জানি তোমাকে বিশ্বাস করা যায়।"

রিহান অবাক হয়ে বলল, "কেমন করে জান?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঈশ্বরী প্রিমা আমাদের জানিয়েছেন। আমরা আজ তোমাকে মুক্ত করে দেব। এতদিন তোমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আমরা তোমাকে—"

নীলন আরো কিছু বলতে চাইছিল, রিহান বাধা দিয়ে বলল, "ঈশ্বরী প্রিমা কী জানিয়েছেন?"

"তিনি জানিয়েছেন আমরা যেন তোমাকে যথাযথ সম্মান দিয়ে আমাদের কমিউনে গ্রহণ করি। তোমাকে যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিই।"

"স্বাধীনভাবে?"

"হ্যাঁ। এটি খুব বিস্ময়কর নির্দেশ। তুমি নিশ্চয়ই জান কমিউনে ঠিকভাবে কাজ করার জন্যে আমাদের সবাইকে খুব কঠিন নিয়ম মেনে চলতে হয়। ঈশ্বরী প্রিমা তোমাকে সেই নিয়ম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।"

গ্রুস্তান তার পকেট থেকে ছোট একটা চাবি বের করে রিহানের পা থেকে শিকল খুলতে খুলতে বলল, "তোমাকে গত রাতে আমরা একজন অপরাধী হিসেবে বিচারের জন্যে ঈশ্বরী প্রিমার কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

নীলন হেসে বলল, "ব্যাপারটা চিন্তা করে আমার এখন খুব লজ্জা লাগছে।"

গ্রুস্তান শিকলটা সরিয়ে বলল, "আমার মেয়ে ত্রানা অবিশ্যি তোমাকে খুব পছন্দ করে। এখন বোঝা যাচ্ছে ছোট শিশুরা মানুষকে ঠিকভাবে বুঝতে পারে।"

রিহান বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল, পায়ে শিকল নেই, অনেক দিন পর স্বাধীনভাবে দুই পা হেঁটে রিহান গ্রুস্তানের কাছে গিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করে বলল, "ধন্যবাদ গ্রুস্তান।"

নীলন বলল, "তোমাকে আমাদের কমিউনে একটা থাকার জায়গা করে দিতে হবে। ট্রিশির লরিটি তুমি ব্যবহার করতে পার। তোমার আর কী কী লাগবে তার একটা তালিকা করে দিও।"

রিহান বলল, "আমার এখন আর কিছু লাগবে না। আমার দায়িত্বটি বুঝিয়ে দিও, যেন তোমাদের বোঝা না হয়ে যাই।"

নীলন একটু হেসে বলল, "তোমার কোনো দায়িত্ব নেই। ঈশ্বরী প্রিমা স্পষ্ট করে বলেছেন তোমাকে যেন স্বাধীনভাবে থাকতে দিই।"

"কিন্তু কিছু না করে আমি কেমন করে থাকব?"

"সেটি তোমার ইচ্ছে। তুমি কী করতে চাও সেটি তুমি ঠিক করবে।"

রিহান একটু অবাক হয়ে নীলনের দিকে তাকাল, কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলল, "ঠিক আছে। ঠিক আছে নীলন।"

নীলন রিহানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "রিহান, আমি এই কমিউনের দলপতি হিসেবে তোমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কমিউনে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"এখন এস, আমাদের লরিতে, তুমি আমাদের সাথে সকালের নাস্তা খাবে।"

নীলনের লরি থেকে নাস্তা করে বের হয়ে রিহান এই ছোট কমিউনটি ঘুরে দেখতে বের হল। সে এখানে অনেক দিন থেকে আছে কিন্তু কমিউনটি সে দেখে নি। মানুষজন ঘুম থেকে উঠে দিন শুরু করতে যাচ্ছে। রিহানকে হেঁটে বেড়াতে দেখে সবাই একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণেই নিশ্চয়ই খবরটি ছড়িয়ে গেছে কারণ তাকে দেখে সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিমুখে সম্ভাষণ করতে শুরু করল। তাকে এভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হল ত্রানা, সে ছুটে এসে তার হাত ধরে বলল, "রিহান! তুমি নাকি আমাদের নতুন দলপতি!"

রিহান চোখ কপালে তুলে বলল, "সে কী! তুমি কোথা থেকে এই খবর পেয়েছ?"

"সবাই বলছে! ঈশ্বরী প্রিমা বলেছেন তুমি এখানে যা খুশি করতে পার।"

"সবাই আর কী কী বলেছে?"

"বলছে তুমি নাকি সাহসী আর বুদ্ধিমান। তেজস্বী আর সুদর্শন।"

রিহান হা-হা করে হেসে বলল, "বিয়ে করার জন্যে আমার একটি বউ খুঁজে পেতে তা হলে কোনো সমস্যা হবে না।"

ত্রানা মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু। বরং তোমার উল্টো সমস্যা হবে। আমাদের কমিউনে যত মেয়ে আছে সবাই তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে। কাকে ছেড়ে কাকে বেছে নেবে সেটা হবে তোমার সমস্যা।"

"এত বড় জটিল সমস্যা সমাধান করব কেমন করে?" রিহান মাথা নেড়ে বলল, "তখন তোমার কাছে পরামর্শের জন্যে আসতে হবে। কী বলো?"

ত্রানা খুশিতে দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমি এখনই তোমাকে বলে দিতে পারি।" ত্রানা এদিক-সেদিক তাকিয়ে ষড়যন্ত্রীদের মতো গলা নামিয়ে বলল, "লুকদের যে মেয়েটি আছে খবরদার তাকে বিয়ে করো না। সে দেখতে সবচেয়ে সুন্দরী কিন্তু সে সবচেয়ে বেশি হিংসুটে। গত ভোজের সময় কী করেছে জান?"

"কী করেছে?"

ত্রানা গলা নামিয়ে লুকদের পরিবারের সুন্দরী মেয়েটি কী হিংসুটেপনা করেছে তার বর্ণনা শুরু করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আশপাশের ট্রাক, লরি, কন্টেইনার থেকে ছোট ছোট বাচ্চারা এসে রিহানের আশপাশে ভিড় জমালো—কাজেই ত্রানাকে আপাতত তার গল্পটিকে স্থগিত করতে হল।

ছোট ছোট বাচ্চাদের বহরটি রিহানকে কমিউনের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে থাকে। তাদের রান্নাঘর, পয়ঃশোধনাগার, পানি সরবরাহ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, নিউক্লিয়ার রি-এক্টর, সৌরচুল্লি, অস্ত্রাগার শেষ করে তারা যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রে এসে হাজির হল। বড় একটা এলাকা জুড়ে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। ভাঙা এবং পুরোনো মোটরবাইক, ট্রাক এবং লরির ইঞ্জিন, নানা ধরনের অকেজো অস্ত্রপাতি ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। রিহান তার স্বাভাবিক কৌতূহলে যন্ত্রপাতিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, ছোট ছোট বাচ্চাগুলো খানিকটা দূরত্ব নিয়ে বেশ সম্ভ্রমের সাথে রিহান এবং যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

রিহানকে দেখে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মীরা এগিয়ে আসে—বেশিরভাগই অল্পবয়স্ক মেয়ে, ঈশ্বরী প্রিমার কাছ থেকে আসা তালিকা দেখে যন্ত্রপাতিগুলোর অকেজো অংশগুলোর সঠিক অংশগুলো পরিবর্তন করছে। রিহান একটা কাজুরা মোটরবাইক দেখে এগিয়ে গিয়ে বলল, "বাহ! কী চমৎকার, এর ডুয়েল টার্বো ইঞ্জিন।"

নিহানা নামে রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রের একটি মেয়ে কর্মী মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, এর ডুয়েল টার্বো ইঞ্জিন।"

"এটি অকেজো হয়েছে কেমন করে?"

"ডায়াগনস্টিক মেশিনে ফিট করে রিপোর্ট পাঠিয়েছি ঈশ্বরী প্রিমার কাছে। ঈশ্বরী প্রিমা এখনো বলেন নি, কী করতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি একটু দেখি—"

নিহানা কিছু বলার আগেই রিহান বিশাল মোটরবাইকটা টেনে এনে তার স্টার্টারে ঝাঁকুনি দেয়। মোটরবাইকটা গর্জন করে স্টার্ট হয়ে প্রায় সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল। রিহান কান পেতে ইঞ্জিনের শব্দ শুনে আবার স্টার্টারে ঝাঁকুনি দিতেই আবার ইঞ্জিনটা ঘরঘর শব্দ করে স্টার্ট নেয়, কয়েক সেকেন্ড চালু থেকে আবার সেটা বন্ধ হয়ে গেল। রিহান ঠোঁট কামড়ে মাথা নাড়ল তারপর নিচু হয়ে ইঞ্জিনটার উপর ঝুঁকে পড়ল। ছোট ছোট বাচ্চারা এবারে কৌতূহলী হয়ে ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসে, তারা সবিস্ময়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে আছে। রিহান ফুয়েল পাইপটা খুঁজে বের করে সেটা ধরে মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়ে কর্মীটিকে বলল, "আমাকে সাইজ ফোর একটা প্লায়ার্স দেবে?"

"কিন্তু রিহান—"

"কী?"

"যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রটিতে সপ্তম মাত্রার নিয়মকানুন। সার্টিফাইড কর্মী ছাড়া অন্য কেউ এখানে কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারবে না।"

রিহান হা-হা করে হেসে বলল, "আমার জন্যে কোনো নিয়ম নেই। ঈশ্বরী প্রিমা আমাকে যা খুশি তাই করার অধিকার দিয়েছেন।"

মেয়ে কর্মীর একজন আরেকজনের দিকে তাকাল এবং একজন মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। এটা সত্যি কথা। নীলনের অর্ডারের কপি আছে আমার কাছে।"

রিহান বলল, "দেখেছ? এবারে একটা প্লায়ার্স দাও।"

একজন মেয়ে কর্মী ওয়ার্কশপের ভেতরে ঢুকে একটা সাইজ ফোর প্লায়ার্স নিয়ে এল। রিহান প্লায়ার্স দিয়ে ঘুরিয়ে টিউবের একটা ছোট অংশ খুলে ভেতরে উঁকি দিতেই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল, বলল, "যা ভেবেছিলাম তাই!"

নিহানা নামের মেয়ে কর্মীটি বলল, "কী হয়েছে?"

"টিউবটি বালু দিয়ে বন্ধ হয়ে আছে। কাজুরা মোটরবাইকের এটা হচ্ছে সমস্যা। ফিল্টারটা ভালো না, ফুয়েল পাইপ বন্ধ হয়ে যায়। এটা পরিষ্কার করলেই ঠিক হয়ে যাবে। একটা চিকন তার আছে?"

নিহানা একটু বিভ্রান্ত হয়ে বলল, "চিকন তার?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখি টিউব পরিষ্কার করার মতো কিছু পাওয়া যায় নাকি।" রিহান টিউবটা ত্রানার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ত্রানা এটা ধর—আমি একটা তার নিয়ে আসি।"

ত্রানা এবং তার সাথে সাথে অন্য সবগুলো বাচ্চা সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল। ত্রানা মাথা নেড়ে বলল, "না রিহান, আমাদের বাচ্চাদের যন্ত্রপাতি ধরার নিয়ম নেই। আমরা এখনো প্রার্থনা শিখি নি।"

রিহান থতমত খেয়ে থেমে গেল, সে ভুলেই গিয়েছিল যে যন্ত্রপাতিকে এক ধরনের পবিত্র জিনিস বলে বিবেচনা করা হয়। কারা এটি স্পর্শ করবে, কারা এটি নিয়ন্ত্রণ করবে সেই বিষয় নিয়ে কঠোর নিয়মকানুন আছে। সে নিজে এই নিয়ম ভেঙে যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলাধুলা করেছে, পরীক্ষা করেছে কিন্তু এই ছোট বাচ্চারা তো সেটি জানে না। রিহান একমুহূর্ত চিন্তা করল, তারপর বলল, "ত্রানা তুমি এটি ধর, কিছু হবে না। তুমি দেখবে প্রার্থনা না করলেও যন্ত্রপাতি কাজ করে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে কর্মীরা এবং সবগুলো বাচ্চা একসাথে বিস্ময় এবং আতঙ্কের একটা শব্দ করল। রিহান আবার বলল, "নাও। ধর।"

ত্রানা সাবধানে কাঁপা হাত দিয়ে ফুয়েল টিউবটা ধরল এবং অন্য সবগুলো বাচ্চা এক ধরনের আতংক নিয়ে ত্রানার দিকে তাকিয়ে রইল। রিহান ওয়ার্কশপে খুঁজে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করা যায় এরকম একটা চিকন তার এনে ত্রানার হাত থেকে টিউবটা নিয়ে সেটা পরিষ্কার করতে শুরু করে। টিউবটা আবার মোটরবাইকে লাগিয়ে সে বাচ্চাদের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কী মনে হয়? মোটরবাইকটা কি এখন স্টার্ট নেবে?"

বাচ্চারা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল, এক ভাগ মাথা নেড়ে বলল স্টার্ট নেবে। অন্যভাগ বলল নেবে না। রিহান চোখ মটকে স্টার্টারে ঝাঁকুনি দিতেই বিশাল কাজুরা মোটরবাইকটি গর্জন করে স্টার্ট নিয়ে নিল। এবং দুএক সেকেন্ড পরে বন্ধ হয়ে গেল না। ত্রানা এবং অন্য সব বাচ্চা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে এবং সেই আনন্দ ধ্বনির মাঝে রিহান মোটরবাইকটির উপর চেপে বসে। রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রের ফাঁকা জায়গাতে ধূলি উড়িয়ে সে মোটরবাইকটি ঘুরিয়ে আনল তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে মোটরবাইকটি দাঁড়া করিয়ে বলল, "এই মোটরবাইকটি ঠিক করার জন্য এখন আর ঈশ্বরী প্রিমাকে বিরক্ত করতে হবে না।"

নিহানা ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কে কোন কাজ করবে সেটি তো নিয়ম করা আছে।"

রিহান হেসে বলল, "আমার জন্যে কোনো নিয়ম নেই।"

"কিন্তু এই বাচ্চারা? তাদের জন্যে—"

"এরা যদি আমার সাথে থাকে তা হলে তাদের জন্যেও কোনো নিয়ম নেই।"

নিহানা নামের মেয়ে কর্মীটি এক ধরনের অস্বস্তি নিয়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাতে রিহান তার নিজের লরিতে শোয়ার আয়োজন করছিল, তখন হঠাৎ করে দরজায় শব্দ হল। রিহান দরজা খুলে দেখে সেখানে নীলন এবং গ্রুস্তান দাঁড়িয়ে আছে। রিহান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই নীলন বলল, "আমরা তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি রিহান?"

"অবশ্যই। ভেতরে এস।"

নীলন এবং গ্রুস্তান ভেতরে এসে হাত দুটো ঘষে গরম করতে করতে বলল, "রিহান তুমি আজকে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রে একটি খুব অস্বাভাবিক কাজ করেছ।"

রিহান মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি জানি।"

"এই কমিউনের সব বাচ্চা এখন বলছে যন্ত্রপাতিকে সম্মান করতে হয় না। প্রার্থনা শেখার কোনো প্রয়োজন নেই। সব নিয়মকানুন ভুল—"

"সব নিয়মকানুন ভুল নয়। কিছু কিছু ভুল—"

"কিন্তু একটা কমিউনে যদি নিয়মকানুন খুব কঠোরভাবে মানা না হয় তার শৃঙ্খলা থাকে না। শৃঙ্খলা না থাকলে কমিউন টিকে থাকতে পারে না।"

রিহান বলল, "নীলন, আমার বয়স তোমার থেকে অনেক কম কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা তোমার থেকে অনেক বেশি! আমি কিছু জিনিস জানি যেটা অন্য মানুষ জানে না।"

নীলন একটু অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকাল। রিহান বলল, "আমি সেটা তোমাদের বলতে চাই না, কিন্তু একদিন বলতে হবে। একদিন সবাইকে জানতে হবে। তার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। সেজন্যে নিয়মকানুনগুলো নূতন করে লিখতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রুস্তান নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি আজকে যেটা করেছ সেটা ঈশ্বরী প্রিমাকে জানানো হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম তিনি অনুমোদন করবেন না কিন্তু ঈশ্বরী প্রিমা সেটা অনুমোদন করেছেন।"

রিহান উজ্জ্বল মুখে বলল, "আমি জানতাম তিনি করবেন।"

নীলন নিশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু আমাদের ভয় করে। নিয়ম ভাঙতে আমাদের খুব ভয় করে।"

রিহান নীলনের হাত স্পর্শ করে বলল, "ভয়ের কিছু নেই নীলন। আমরা নিয়ম ভাঙছি না, আমরা নূতন নিয়ম তৈরি করছি!"

৫. শস্যক্ষেত্র

রিহানের ধারণা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি সে এখন কাটাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে একটু নাস্তা করেই সে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রে চলে আসে। স্তূপ হয়ে পড়ে থাকা অকেজো যন্ত্রপাতি নিয়ে পুরো দিন কাটিয়ে দেয়। অচল মোটরবাইকের বেশিরভাগ সে সারিয়ে ফেলেছে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলোও সে খুলে আবার জুড়ে দিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। ট্রাক এবং লরির ইঞ্জিনগুলো নিয়ে একটা সমস্যা হলেও সে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে শিখেছে। কয়েকটা এক ধরনের অচল যন্ত্রপাতি দিয়ে সে একটা যন্ত্রকে দাঁড়া করিয়ে ফেলতে পারে। শুধু যে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রে অচল এবং অকেজো যন্ত্রপাতি সারিয়ে তুলেছে তা নয়—কমিউনের ট্রাক, লরি আর কন্টেইনার ঘিরে গড়ে ওঠা মানুষজনের দৈনন্দিন সংসার নিয়েও সে কাজ করতে শুরু করেছে। বিদ্যুৎ প্রবাহকে ঠিক রাখার জন্যে সে তারগুলো ঠিক করে টানিয়ে দিয়েছে, কীভাবে কোনটা ব্যবহার করতে হবে তার নিয়ম তৈরি করে দিয়েছে। আজকাল দুর্ঘটনা হচ্ছে অনেক কম।

শুধু যে সে একা কাজ শুরু করেছে তা নয়—তার সাথে বাচ্চাকাচ্চারাও এই ব্যাপারটিতে উৎসাহ পেতে শুরু করেছে। তাদের অনেকেই ছোটখাটো কাজ করতে শিখে গেছে। তবে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মী মেয়েগুলোর। আগে অকেজো যন্ত্র সারানোর জন্যে ঈশ্বরী প্রিমাকে একটা দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাতে হত। ডায়াগনস্টিক মেশিনের সেই রিপোর্টটি ঠিক করে তৈরি করা খুব কঠিন। সেই রিপোর্ট দেখে ঈশ্বরী প্রিমা সেটা সারানোর জন্যে যন্ত্রপাতির ইউনিট নম্বর লিখে দিতেন। তাদের সরবরাহ কেন্দ্রে সেই ইউনিট নম্বরের যন্ত্রপাতি থাকলে সেটি ঠিক জায়গায় লাগিয়ে সেটি ঠিক করতে হত। সঠিক ইউনিট নম্বরের যন্ত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন, যখনই রসদ সংগ্রহের জন্যে তাদের বিশেষ বাহিনী বের হত তাদেরকে প্রয়োজনীয় ইউনিট নম্বরসহ একটা তালিকা ধরিয়ে দেওয়া হত। সেই তালিকার যন্ত্রপাতি কখনোই পুরোপুরি পাওয়া যেত না। তাই কখনোই যন্ত্রপাতি পুরোপুরি ঠিক হত না।

এই কমিউনে রিহান প্রথম যখন যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে শুরু করল তখন কমিউনের সবাই যে সেটাকে সহজভাবে নিয়েছিল তা নয়। অনেকেই তীব্র প্রতিবাদ করেছিল—যন্ত্রকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সম্মান প্রদর্শন করতে হবে না, এই ব্যাপারটিতে তাদের আপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশি। বড়দের পাশ কাটিয়ে ব্যাপারটি একেবারে শিশুদের ভেতর দিয়ে শুরু হয়েছিল বলে কেউ কিছু করতে পারে নি। এখন মোটামুটিভাবে সবাই ব্যাপারটিকে মেনে নিয়েছে এবং তার চাইতে বড় কথা কমিউনের আরো নিয়মকানুন নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে।

কমিউনে শুধু যে যন্ত্রপাতিগুলো রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হয়েছে তা নয়—হঠাৎ করে নূতন যন্ত্রপাতি তৈরি হতে শুরু করেছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় যন্ত্রগুলো অবশ্যই খেলনা—ছোট ছোট বাচ্চাদের খেলার জন্যে স্টিয়ারিং হুইল লাগানো গাড়ি! সেই গাড়ি থেকে উল্টে পড়ে দুই চারজন বাচ্চার যে হাত পায়ের ছাল-চামড়া ওঠে নি তা নয়, কিন্তু তার পরেও বাচ্চাগুলোর মাঝে এগুলো অসম্ভব জনপ্রিয়। গান শোনার জন্যে যে ক্রিস্টাল ডিস্ক রিডার ছিল সেগুলো ব্যবহার করার সৌর ব্যাটারির খুব অভাব ছিল। বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র থেকে নূতন করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পর এখন প্রতি লরিতেই গান শোনার ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধেবেলাতেই যেভাবে গান বাজতে থাকে যে নীলনকে নূতন করে আদেশ দিয়ে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাঝে আনতে হয়েছে!

রাত্রিবেলা ঠাণ্ডার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আগুন জ্বালানোর একটা ব্যবস্থা করা হত—আজকাল আর সেটা করা হয় না। নিউক্লিয়ার রি-একটরের পাশে একটা গরম পানির ধারা থাকে, সেটাকে টিউব দিয়ে পুরো কমিউনে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাত্রিবেলা সব ট্রাক লরি এবং কন্টেইনারগুলোর ভেতরে একটা আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে।

তবে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক আবিষ্কারটি হয়েছে অন্য জায়গায়। সেটি শুরু হয়েছে এভাবে : ঈশ্বরী প্রিমার কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশ এসেছে বলে নীলন একদিন কমিউনের সবাইকে নিয়ে একটা সভা ডেকেছে। বেশি ছোট বাচ্চাগুলোকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে মায়েরা বসেছে, একটু বড় বাচ্চাগুলো হুটোপুটি করে খেলছে এবং যারা মোটামুটিভাবে বুঝতে শিখেছে তারা গম্ভীর হয়ে বাবা-মায়ের কাছে বসে আছে—কখন এই সভা শেষ হবে সেজন্যে অপেক্ষা করছে। অন্যেরা ট্রাকের চাকায় বা যন্ত্রপাতিতে হেলান দিয়ে বসে নীলনের ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা করছে। শুধু যাদের সেন্ট্রি ডিউটি দেওয়া হয়েছে তারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে বাইরে গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

নীলন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ শুরু করল, বলল, "তোমরা সবাই জান আর কিছুদিনের ভেতরেই ঠাণ্ডা পড়ে যাবে এবং তার আগেই আমরা দক্ষিণে যাত্রা শুরু করব। এবং তোমরা এটাও জান যে যাত্রা শুরু করার আগে আমাদের শীতকালের শস্যভাণ্ডার পুরো করতে হবে।"

এরকম সময়ে কমবয়সী তরুণ-তরুণীরা যন্ত্রণার একটি শব্দ করল! নীলন সেটা না শোনার ভান করে বলল, "আমরা আমাদের স্কাউট বাহিনীকে আশপাশে এবং শস্যভূমিতে পাঠিয়েছি, তারা তাদের রিপোর্ট দিয়েছে। ঈশ্বরী প্রিমা আমাদের শস্যক্ষেত্রে যাবার দিন ঠিক করে দিয়েছেন।"

ঈশ্বরী প্রিমা নামটির জন্যে তরুণ-তরুণীরা এবারে যন্ত্রণার শব্দ করার সাহস পেল না। তবে শস্য কাটতে যাওয়ার এই দিনটি নিয়ে কারো মনে আনন্দের কোনো স্মৃতি নেই।

"ঈশ্বরী প্রিমা বলেছেন এবার শস্যক্ষেত্রে শস্য একটু আগেই প্রস্তুত হয়েছে এবং আমাদের আগেই যেতে হবে। এলাকার অন্যান্য কমিউনের সদস্যরাও সেখানে শস্য সংগ্রহ করতে যাবে কাজেই আমাদের শস্য কাটতে হবে দ্রুত, সেজন্যে এবারে আরো অনেককে শস্য কাটতে যেতে হবে। সবাইকে সেজন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।"

যন্ত্রণার মতো শব্দ করা হলে ঈশ্বরী প্রিমার প্রতি অসম্মান করা হয় বলে কমবয়সী তরুণ-তরুণীরা বেশ কষ্ট করে চুপ করে রইল। তখন পিছনে বসে থাকা যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মী বাহিনীর একটি মেয়ে, নিহানা, দাঁড়িয়ে বলল, "মহামান্য নীলন, আমি কি একটা প্রস্তাব করতে পারি?

"কী প্রস্তাব?"

"শস্য কাটার জন্যে আমরা যে চাকু ব্যবহার করি সেটি খুব ভালো কাজ করে না। আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয় এবং প্রত্যেকবারই আমাদের ছোটখাটো দুর্ঘটনা হয়। কিন্তু আমার মনে হয়—" মেয়েটি কথা বন্ধ করে একটু সময়ের জন্যে অপেক্ষা করে।

"কী মনে হয়?"

"আমার মনে হয় আমরা শস্য কাটার জন্যে একটা যন্ত্র তৈরি করতে পারি যেটা দিয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শস্য কাটতে পারব।"

যারা উপস্থিত ছিল তাদের মাঝে অনেকেই অবিশ্বাসের শব্দ করল। একজন বলল, "অসম্ভব। এরকম যন্ত্র তৈরি করা যদি সম্ভব হত ঈশ্বরী প্রিমা আমাদের জন্যে সেটি খুঁজে বের করতেন।"

মেয়েটি বলল, "এটি অসম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে কী আমি যন্ত্রটা তৈরি করেছি, তবে এখনো পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাই নি।"

এবারে সবাই বিস্ময়ের একটা শব্দ করল। মেয়েটা লাজুক মুখে বলল, "একটা মোটরবাইকের পিছনে এটা লাগাতে হবে। মোটরবাইকটা যখন সামনে যাবে তখন আমার যন্ত্রটা ঘুরে ঘুরে শস্য কাটতে থাকবে।"

রিহান উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দের একটা ধ্বনি বের করে বলল, "অভিনন্দন! তোমাকে একশ অভিনন্দন! এক হাজার অভিনন্দন!"

অন্য অনেকে এবার হাত তালি দিতে থাকে। কাউকেই আর ভোঁতা চাকু দিয়ে শস্য কাটতে হবে না—একটা যন্ত্র সবার শস্য কেটে দেবে, দৃশ্যটি চিন্তা করেই সবাই খুশি হয়ে যায়। নীলন হাত তুলে সবার আনন্দোচ্ছাসকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমি নিজেই খুব অবাক হয়ে দেখছি কিছুদিন আগেও যে ব্যাপারটি আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না এখন কত সহজে আমরা সেটি করতে পারি। ঈশ্বরী প্রিমার প্রতি আমাদের শত সহস্র কৃতজ্ঞতা যে তিনি আমাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা করার সুযোগ করে দিয়েছেন।"

একজন চিৎকার করে বলল, "জয় হোক ঈশ্বরী প্রিমার।"

সবাই সমস্বরে বলল, "জয় হোক।"

নীলন আগের কথার সূত্র ধরে বলল, "আমাদের নিহানা শস্য কাটার একটা যন্ত্র তৈরি করেছে সেজন্যে তাকে সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন। তবে সবাইকে একটা জিনিস লক্ষ রাখতে হবে—বছরের একটা সময় আমাদের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই শস্যক্ষেত্রগুলোতে প্রতি বছর নিজে শস্য জন্মায় এবং আমরা শস্য কেটে আনি। আমাদের শরীর ঠিক রাখার জন্যে কী কী খেতে হবে ঈশ্বরী প্রিমা সেটি ঠিক করে দেন—তার কাছ থেকে আমরা জেনেছি এই শস্য মজুত করে রাখতে হয়। কাজেই নিহানার যন্ত্রটি আমরা ব্যবহার করব কি না সেটি খুব ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে। যদি কোনো কারণে যন্ত্রটি ঠিকভাবে কাজ না করে এবং আমরা ঠিক সময়ে শস্য কেটে আনতে না পারি আমাদের পুরো কমিউনের ওপর ভয়ংকর দুর্যোগ নেমে আসবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহানা বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ নীলন। সেজন্যে আমি আগে আমার যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

কমবয়সী একজন দাঁড়িয়ে বলল, "পাহাড়ের নিচে ঘাসের বন আছে। আমরা সেই ঘাসের বনে শস্য কাটার যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি।"

নীলন বলল, "আমি যন্ত্রটা ব্যবহার করার পক্ষে কিন্তু যদি যন্ত্রটা কোনো কারণে কাজ না করে তার জন্যেও প্রস্তুতি রাখতে চাই। তা ছাড়া—" নীলন একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "এই এলাকার মানুষের যেসব কমিউন আছে তারা অনেকেই এখানে শস্য কাটতে আসে। কিছু কিছু কমিউন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তাদের সাথে যুদ্ধ হতে পারে সেজন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকতে হবে।"

কমিউনের বয়স্ক সদস্যরা তখন খুঁটিনাটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেয়। অনেক আলোচনা করে মোটামুটি একটা পরিকল্পনা করে সেদিনকার সভা শেষ করা হল।

নিহানার যন্ত্রটা যেরকম কাজ করবে ভাবা হয়েছিল, দেখা গেল সেটি তার থেকে অনেক ভালো কাজ করছে। পাহাড়ের নিচে কাশবনের জঙ্গলটি সেটি কয়েক মিনিটে কেটে শেষ করে ফেলল, সেটি দেখে সবাই এত উৎসাহ পেল যে তখন তখনই তারা শস্য মাড়াই করার একটা যন্ত্র নিয়ে চিন্তাভাবনা করা শুরু করল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে আগে যে কাজ করতে তাদের পুরো এক সপ্তাহ লেগে যাবার কথা ছিল সেটি চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে শেষ হয়ে যাবে বলে সবাই আশা করতে থাকে।

নির্দিষ্ট দিনে বড় কন্টেইনারসহ একটা ট্রাক এবং দশটা মোটরবাইকে করে বিশজন মানুষ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে শস্য কাটতে রওনা হল। কন্টেইনারের ভিতরে নিহানার শস্য কাটার এবং শস্য মাড়াই করার যন্ত্র। শস্যক্ষেত্রটি অনেক দূর, ভোরবেলা রওনা দিয়ে পাথুরে রাস্তায় সারা দিন চালিয়ে ওরা গভীর রাতে সেখানে পৌঁছাল। সবাই ক্লান্ত, তার পরেও তারা শস্য কাটার যন্ত্রটি মোটরবাইকের সাথে লাগানোর কাজটুকু সেরে রাখল যেন খুব ভোর বেলাতেই কাজ শুরু করে দিতে পারে।

রাতের খাবার খেয়ে সবাই শুতে গিয়েছে। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে ভোরবেলা কাজ করা সহজ হবে। নিহানার যন্ত্রটা ঠিকভাবে কাজ করলে তাদের খুব বেশি পরিশ্রম হবার কথা নয়। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা, কন্টেইনারের ভেতর স্লিপিং ব্যাগে অন্য সবার সাথে গুটিসুটি মেরে রিহান শুয়ে পড়ল। যন্ত্রপাতি ঠিক করার জন্যে কাছাকাছি কেউ নেই বলে তাকে আনা হয়েছে, যদি কোনো সমস্যা হয় তাকে ঠিক করে দিতে হবে।

রাত্রে হঠাৎ রিহানের ঘুম ভেঙে গেল। কেন ঘুম ভেঙেছে রিহান বুঝতে পারল না, খানিকক্ষণ ঘাপটি মেরে শুয়ে থেকে তার মনে হতে থাকে কিছু একটা অস্বাভাবিক জিনিস ঘটেছে কিন্তু সেটা কী সে বুঝতে পারছে না। রিহান মাথা উঁচু করে বোঝার চেষ্টা করে। তখন সে বহু দূরে কয়েকটা মোটরবাইকের শব্দ শুনতে পেল। এই শস্যক্ষেত্রের আশপাশে কোনো কমিউন নেই, বহু দূর থেকে মানুষেরা শস্য কাটার জন্যে এখানে আসে। তাদের মতো আরো কোনো দল হয়তো শস্য কাটতে আসছে।

রিহান উঠে বসল, যারা আসছে তারা কী ধরনের মানুষ কে জানে। এসে একটা গোলাগুলি শুরু করে দিলে কী হবে? সবাইকে ডেকে তুলবে কি না রিহান বুঝতে পারল না। সবাই ক্লান্ত হয়ে এমন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে যে রিহানের তাদের ডেকে তুলতে মায়া হল। মোটরবাইকগুলো এখনো অনেক দূরে, আরো একটু কাছে এলে ডেকে তোলা যাবে। রিহান কন্টেইনারের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে মোটরবাইকের শব্দগুলো শুনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। যদি কমিউনের লোকেরা শস্য কাটতে আসে তা হলে মোটরবাইকের সাথে বড় বড় ট্রাক এবং লরির শক্তিশালী ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাবে কিন্তু সেরকম কিছু নেই। দুই থেকে তিনটি মোটরবাইকের শব্দ শোনা যাচ্ছে—কখনো আস্তে, কখনো জোরে, কখনো সেটা পাহাড়ের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

রিহান চুপচাপ বসে থাকে, ধীরে ধীরে মোটরবাইকের শব্দ বাড়ছে, যারা আসছে তারা কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছে। সম্ভবত অন্য কোনো কমিউনের স্কাউট দল, শস্যক্ষেত্রটি দেখতে এসেছে, ভোরের আলোতে দেখে আবার ফিরে চলে যাবে।

রিহান তবু ঝুঁকি নিল না, কন্টেইনারে ঘুমিয়ে থাকা গ্রুস্তানকে ডেকে তুলে সাবধানে বের হয়ে আসে। বাইরে আরো দুজন সেন্ট্রি পাহারা দিচ্ছিল, মোটরবাইকের শব্দ তারাও শুনেছে, হাতে অস্ত্র নিয়ে তারাও অপেক্ষা করছে।

গ্রুস্তান বলল, "ভয়ের কিছু নেই। মনে হয় স্কাউট দল। আমরা একটু সতর্ক থাকি।"

রিহান বলল, "ঠিক আছে।"

মোটরবাইকগুলো কাছে এসে হঠাৎ করে হেডলাইট নিভিয়ে ফেলে, ইঞ্জিনগুলো চাপা গর্জন করে আরো কাছাকাছি এসে থেমে যায়। গ্রুস্তান নিচু গলায় বলল, "আমাদের দেখেছে।"

"কিন্তু হেডলাইট নিভিয়েছে কেন?"

"বুঝতে পারছি না।"

গ্রুস্তান চাপা গলায় সেন্ট্রি দুজনকে বলল, "তোমরা দুই পাশে চলে যাও। সন্দেহজনক কিছু দেখলে গুলি করতে হতে পারে।"

সেন্ট্রি দুজন মাথা নেড়ে দুই পাশে সরে গেল। গ্রুস্তান আর রিহান অন্ধকারে কন্টেইনারের পিছনে লুকিয়ে থাকে। তারা কিছুক্ষণের মাঝেই কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল—ছায়ামূর্তিগুলো পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। ট্রাকের সামনে এসে সেটা পরীক্ষা করল, খুব চাপা গলায় ফিসফিস করে কথা বলল। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা মোটরবাইকগুলো দেখল, নিজেরা নিজেরা কিছু একটা কথা বলল, তারপর তারা ফিরে যেতে শুরু করল।

গ্রুস্তান ফিসফিস করে বলল, "লোকগুলো ফিরে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ।"

"কোনো কমিউনের স্কাউট দল মনে হচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই।"

রিহান মাথা নেড়ে সম্মতি দিতে গিয়ে থেমে গেল, লোকগুলো আবার ফিরে আসছে। তাদের হাতে বড় একটা পাত্র। রিহান ফিসফিস করে বলল, "কিন্তু লোকগুলো ফিরে আসছে কেন?"

পরের দৃশ্য দেখে রিহান আর গ্রুস্তান আঁতকে উঠল, "সর্বনাশ! কী একটা জ্বালানি ছিটাচ্ছে! আগুন ধরিয়ে দেবে।"

কী ধরনের মানুষ অপরিচিত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করতে পারে? কিন্তু সেই কারণ খুঁজে বের করার অনেক সময় পাওয়া যাবে, এই মুহূর্তে তাদের থামাতে হবে।

রিহান হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র উঁচু করে চিৎকার করে বলল, "হাত তুলে দাঁড়াও—না হলে গুলি করব!"

মানুষগুলো থমকে দাঁড়াল, মনে হল ছুটে পালানোর চেষ্টা করবে কিন্তু তার আগেই সেন্ট্রি দুজনের ক্রিপটন ফ্লাশ লাইটের তীব্র আলো তাদের ওপর এসে পড়ল। তিনজন মানুষ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবয়স্ক পুরুষ, শরীরে কালো বায়ু নিরোধক পোশাক, মাথায় হেলমেট এবং চোখে নাইট গগলস।

গ্রুস্তান অস্ত্র উদ্যত করে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "তোমরা এক পা নড়লে গুলি করে শেষ করে দেব। আমরা চারজন মানুষ তোমাদের টার্গেট করেছি। খবরদার ভুলেও হাতে অস্ত্র নেবার চেষ্টা করবে না।"

মানুষগুলো চেষ্টা করল না। ক্রিপটন ল্যাম্পের তীব্র আলোতে হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গ্রুস্তান এবং রিহান আরো একটু এগিয়ে যায়। সেন্ট্রি দুজনও কাছাকাছি এগিয়ে আসে।

গ্রুস্তান জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের হাতে ওটা কী?"

মানুষগুলো কোনো কথা বলল না।

গ্রুস্তান ধমক দিয়ে বলল, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমাদের হাতে কী?"

'বিস্ফোরক। প্লাস্টিক বিস্ফোরক।"

"তোমরা কেন ওটা এখানে ছড়াচ্ছ?"

মানুষগুলো প্রশ্নের উত্তর দিল না।

গ্রুস্তান আবার ধমক দিল, "কেন?"

"আমরা তোমাদের কন্টেইনারটা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম।"

রিহান হঠাৎ করে চমকে উঠল, সে আগে এই কণ্ঠস্বরটি কোথাও শুনেছে। দুই পা এগিয়ে সে তীক্ষ্ণ চোখে মানুষগুলোর দিকে তাকাল। তাদের কণ্ঠস্বর পরিচিত কিন্তু চেহারা পরিচিত নয়।

গ্রুস্তান আবার জিজ্ঞেস করল, "কেন তোমরা আমাদের কন্টেইনারটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে? তোমরা জান এই কন্টেইনারের ভেতর আমাদের মানুষেরা ঘুমাচ্ছে?"

"জানি।"

"তা হলে?"

"পৃথিবীতে শস্যের অভাব। আমরা আমাদের কমিউনের জন্যে শস্য নিতে চাই।"

রিহান এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে, সে নিশ্চিত এই কণ্ঠস্বরটি আগে শুনেছে। মানুষগুলো অপরিচিত কিন্তু কণ্ঠস্বর পরিচিত সেটি কেমন করে হতে পারে? হঠাৎ রিহান বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল, হ্যাঁ, তার মনে পড়েছে! এই মানুষ তিনজন প্রভু ক্লডের আদেশে তাকে হত্যা করার জন্যে নিয়েছিল। অন্ধকারে তাদের চেহারা দেখতে পায় নি শুধু গলার স্বর শুনেছে। রিহান এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। কী আশ্চর্য কিছুদিন আগে যারা তাকে হত্যা করার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল এখন তারাই তার উদ্যত অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছে?

রিহান এক পা এগিয়ে এসে বলল, "তোমরা তোমাদের কমিউনের জন্যে শস্য নিতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

"প্রয়োজন হলে অন্যদের ধ্বংস করে?"

একজন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ প্রয়োজন হলে অন্যদের ধ্বংস করে। পৃথিবীতে যারা যোগ্য তারা বেঁচে থাকবে।"

"তোমাদের সেটা কে শিখিয়েছে? তোমাদের ঈশ্বর? তোমাদের প্রভু?"

"হ্যাঁ। আমাদের প্রভু।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিহান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাদের প্রভু ভুল জিনিস শিখিয়েছে।"

মোটা গলার একজন মানুষ বলল, "আমাদের প্রভু কখনো ভুল জিনিস শেখান না। আমাদের প্রভু কখনো ভুল করেন না।"

"করেন, তোমার প্রভু হচ্ছে প্রভু ক্লড। এবং প্রভু ক্লড অনেক বড় ভুল করেছেন! আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে আমার দিকে তাকাও—"

মানুষগুলো অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকাল। ক্রিপটন ল্যাম্পের তীব্র আলোর কারণে প্রথমে তারা তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। রিহান সেন্ট্রির দিকে ইঙ্গিত করতেই সে আলোটা খানিকটা তার দিকে ঘুরিয়ে আনে। মানুষগুলো রিহানকে দেখে হতবাক হয়ে যায়, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।

রিহান উদ্যত অস্ত্র হাতে মানুষগুলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "তোমার প্রভু আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল! সে যদি সত্যিকারের ঈশ্বর হত তার মৃত্যুদণ্ড থেকে আমি বেঁচে আসতে পারতাম না। তোমরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে, হত্যা করতে পার নি। আমি বেঁচে এসেছি। শুধু যে বেঁচে এসেছি তা নয়—এখন আমি তোমাদের দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছি। ট্রিগারে একটু টান দিলেই তোমাদের রক্তাক্ত শরীর এখানে পড়ে থাকবে।"

গ্রুস্তান আর সেন্ট্রি দুজন অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইল। রিহান হিংস্র গলায় বলল, "তোমরা বেঁচে থাকবে না মরে যাবে সেটা এখন নির্ভর করছে আমার ইচ্ছের ওপর! তোমার প্রভু ক্লড তোমার প্রাণ বাঁচাতে পারবে না—তোমার প্রাণ বাঁচাতে পারব আমি!"

মানুষগুলো কোনো কথা না বলে হতচকিত হয়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইল। রিহান গ্রুস্তানের দিকে তাকিয়ে বলল, "গ্রুস্তান, এদের কী করবে?"

গ্রুস্তান হাত নেড়ে বলল, "এরা হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীর ঘাতক। এদের বেঁচে থাকা মরে যাওয়ায় কিছু আসে যায় না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এদেরকে মেরে ফেললে পৃথিবীর উপকার হয়। কিন্তু আমরা মানুষ মেরে অভ্যস্ত নই।"

মানুষগুলো হঠাৎ হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বলল, "আমরা ক্ষমা চাই—আমাদের হত্যা করবেন না। ঈশ্বরের দোহাই।"

রিহান জিজ্ঞেস করল, "কোন ঈশ্বর? তোমাদের না আমাদের?"

মানুষগুলো একমুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে তারপর বলে, "আপনাদের ঈশ্বর।"

রিহান হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেলল। বলল, "তোমাদের মেরে ফেললে পৃথিবীর উপকার হয়। কিন্তু তোমাদের আমরা মারব না তোমাদের ছেড়ে দেব। কেন ছেড়ে দেব জান?"

মানুষগুলো মাথা নাড়ল, তারা জানে না।

"তোমাদের ছেড়ে দেব যেন তোমরা তোমাদের প্রভু ক্লডের কাছে গিয়ে বলতে পার যে আপনি সত্যিকারের ঈশ্বর নন। আপনি মিথ্যা। আপনি যখন কোনো মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেন সেই মানুষের মৃত্যু হয় না। শুধু যে মৃত্যু হয় না তাই না, সেই মানুষ ফিরে এসে আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়।"

মানুষগুলো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রিহান বলল, "কী বলেছি তোমাদের মনে থাকবে?"

মানুষগুলো মাথা নেড়ে জানাল যে তাদের মনে থাকবে। রিহান বলল, "বেশ, এবারে দেখা যাক তোমাদের সাথে কী আছে। তোমাদের যন্ত্রপাতি, বিস্ফোরকগুলো রেখে দিই যেন ফিরে যাবার সময় অন্য কোনো মানুষের কোনো ক্ষতি করতে না পার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিহান কাছে গিয়ে বলল, "দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াও, দেখি তোমাদের শরীরে কী আছে।"

মানুষগুলোর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, গুলির বেল্ট, বিস্ফোরক সরিয়ে রেখে তাদেরকে যখন যেতে দিল তখন পূর্বের আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। সূর্য ওঠার আগেই তারা বুঝতে পারল এই মানুষগুলোকে যেতে দিয়ে তারা বড় একটা ভুল করে ফেলেছে। মানুষগুলো যাবার আগে শস্যক্ষেত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। সেই আগুন ধীরে ধীরে শস্যক্ষেত্রকে গ্রাস করতে আসছে। প্রভু ক্লডের অনুসারীরা কোনো মানুষকে এই শস্যের অংশ দেবে না—প্রয়োজনে নিজের সর্বনাশ করে হলেও।

সবাই এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে শস্যক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিশাল এই শস্যক্ষেত্রটিতে প্রতি বছর শস্যের জন্ম হয়। তারা ভাসা ভাসা ভাবে জানে একসময় পৃথিবীতে অনেক মানুষ ছিল তখন নিশ্চয়ই এখানে তারা এগুলোকে শস্যভূমি তৈরি করেছিল। এখনো তার কিছু অবশেষ রয়ে গেছে—মানুষের কোনো সাহায্য ছাড়াই এই বিশাল প্রান্তরে প্রতি বছর শস্য বেড়ে ওঠে। পৃথিবীতে এখন নানা কমিউনে যে মানুষেরা বেঁচে আছে তাদের অনেকে এখান থেকে শস্য কেটে নিয়ে যায়—যে পরিমাণ শস্য জন্মায় পৃথিবীর এই অঞ্চলে বেঁচে থাকা মানুষের জন্যে সেগুলো যথেষ্ট। কিন্তু আজ সেই শস্যক্ষেত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, দেখতে দেখতে পুরো শস্যক্ষেত্র আগুনে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

রিহান কাঁপা গলায় বলল, "গ্রুস্তান, এই আগুনটা আসতে কতক্ষণ লাগবে বলে মনে হয়?"

"বাতাস নেই তাই দুই-তিন ঘণ্টা লেগে যেতে পারে। বাতাস শুরু হলে দেখতে দেখতে চলে আসবে।"

"আমরা শুধু শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে আগুনটা না দেখে কিছু একটা কাজ করতে পারি না?"

"কী করতে চাও? এখানে তো ঈশ্বর প্রিমা নেই যে তাকে জিজ্ঞেস করব।"

একজন বলল, "ইশ! যদি কোনোভাবে ঈশ্বর প্রিমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম!"

রিহান বলল, "শুধু শুধু দাঁড়িয়ে না থেকে আমরা কি শস্য কাটা শুরু করতে পারি না?"

গ্রুস্তান মাথা নেড়ে বলল, "দুই-তিন ঘণ্টায় তুমি কতটুকু শস্য কাটবে?"

রিহান খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "আগুনটা জ্বলছে শস্য গাছে। আমরা আগুনের পথে শস্যগুলো কেটে রাখতে পারি না যেন আগুন জ্বলার জন্যে কিছু না থাকে?"

গ্রুস্তান বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকাল। রিহান বলল, "নিহানার শস্য কাটার যন্ত্রটা শস্য গাছকে চমৎকারভাবে কাটতে পারে—আমরা সেটা ব্যবহার করে লম্বালম্বিভাবে শস্যক্ষেত্রে খানিকটা জায়গায় গাছগুলো একেবারে গোড়া পর্যন্ত কেটে সরিয়ে নেব। আগুনটা তখন এই পর্যন্ত এসে থেমে যাবে—আর এগুতে পারবে না কারণ আগুন জ্বলার জন্যে কিছু থাকবে না!"

গ্রুস্তান খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"আমরা যদি ঈশ্বরী প্রিমাকে এখন জিজ্ঞেস করতাম, তা হলে তিনিও এটাই বলতেন!"

"তা হলে দেরি করে লাভ কী? চল কাজ শুরু করে দিই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চল।"

নিহানার তৈরি শস্য কাটার যন্ত্রটা শস্যক্ষেত্রে নামিয়ে আনা হল। সেটা শস্য কেটে যেতে থাকল এবং দলের বিশজনের সবাই কাটা শস্যের গাছগুলো সরিয়ে নিতে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মাঝেই প্রায় দুই মিটার চওড়া আগুনের জন্যে একটা বাধা তৈরি করা হল। ততক্ষণে আগুনটা আরো এগিয়ে এসেছে, বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ, মাঝে মাঝে আগুনের ফুলকি ছুটে আসছে। সবাইকে সারি বেঁধে দাঁড়া করিয়ে দেওয়া হল আগুনের ফুলকি থেকে যেন নূতন কোনো আগুন শুরু হয়ে না যায় তার দিকে লক্ষ রাখতে।

আগুনের জ্বলন্ত শিখা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ফাঁকা জায়গাটাতে দুর্বল হয়ে পড়ে— সেখানে জ্বলার মতো কিছু নেই। কিছুক্ষণ ধিকিধিকি করে জ্বলে আগুনটা নিভে যায়। সবাই বিস্মিত হয়ে দেখে শস্যক্ষেত্রের এক অংশ আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে আছে, অন্য পাশে সোনালি শস্যক্ষেত্র বাতাসে নড়ছে!

গ্রস্তান রিহানকে জড়িয়ে ধরে বলল, "রিহান তুমি আজ এখানে না থাকলে আমরা কিছুতেই শস্যক্ষেত্রটা বাঁচাতে পারতাম না! তোমার বুদ্ধিটা অসাধারণ।"

রিহান মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, নিহানা যদি তার শস্য কাটার যন্ত্রটা আবিষ্কার না করত আমরা কিছুই করতে পারতাম না! যত বুদ্ধিই থাকুক কোনো কাজই হত না।"

নিহানা হেসে বলল, "আমার যন্ত্রটা শস্য গাছগুলো কেটেছে—কিন্তু সবাই যদি কাটা গাছগুলো সরিয়ে না নিত কোনো লাভই হত না। কাজেই কৃতজ্ঞতা জানাতে হলে সেটা জানানো উচিত তাদেরকে।"

গ্রস্তান হেসে বলল, "ঠিক আছে! বোঝা যাচ্ছে কারো একার বুদ্ধিতে এই অসাধ্য সাধন হয় নি! সবাই মিলে করা হয়েছে।"

কালিঝুলি মাখা কমবয়সী একজন তরুণী বলল, "ঈশ্বরী প্রিমার সাহায্য ছাড়াই আমরা কত বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি দেখেছ?"

সবাই মাথা নেড়ে কথাটা মেনে নিল, শুধু রিহান চমকে উঠে ভাবল, এই কথাটার কি অন্য কোনো অর্থ রয়েছে? যদি সবাই একসঙ্গে থাকে তা হলে কি ঈশ্বর ছাড়াও কমিউন বেঁচে থাকতে পারবে?

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা ফসল কাটা, মাড়াই করা, বাক্স বোঝাই করে ট্রাকে তোলার অমানুষিক পরিশ্রমের মাঝে ঘুরেফিরে রিহানের শুধু এই কথাটা মনে হতে থাকল।

৬. কারুকার্যখচিত মুখোশ

ঈশ্বরী প্রিমা বললেন, "রিহান, তুমি বস।"

রিহান চমকে উঠে ঈশ্বরী প্রিমার দিকে তাকাল। একজন ঈশ্বর বা ঈশ্বরী কখনোই সাধারণ একজন মানুষকে তার নাম দিয়ে সম্বোধন করেন না, কখনোই তাদেরকে তার সামনে বসতে অনুরোধ করবেন না। রিহান তার বিস্ময়টুকু গোপন করে ঈশ্বরী প্রিমার নির্দেশ

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো তার সামনের চেয়ারটিতে বসল। এখন তাদের দুজনের ভিতরে দূরত্ব একটি পাথরের টেবিল। ঈশ্বরী প্রিমা তার সেই কারুকার্যময় মুখোশটি দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছেন। হালকা নীল রঙের পোশাকটির ভেতরে কিশোরীর মতো হালকা ছিপছিপে দেহের অবয়বটি দেখা যাচ্ছে। ঈশ্বরী প্রিমার সামনে বসে রিহান এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে, তিনি কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে জানে না। নিশ্চয়ই সে বড় কোনো অপরাধ করে নি, তা হলে তাকে নাম ধরে ডাকতেন না, তাকে বসতে বলতেন না।

ঈশ্বরী প্রিমা দীর্ঘ সময় মুখোশের ভেতর দিয়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "একজন ঈশ্বর বা ঈশ্বরী সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান রিহান?"

রিহান এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করে, নিচু গলায় বলে, "আমি বেশি কিছু জানি না ঈশ্বরী প্রিমা।"

"তুমি কেন সাধারণ একজন মানুষ রিহান আর আমি কেন ঈশ্বরী প্রিমা তুমি বলতে পারবে?"

রিহান মাথা নাড়ল, বলল, "পারব না ঈশ্বরী প্রিমা। শুনেছি অসংখ্য মানুষের মাঝে একজন দুইজন ঈশ্বরের ক্ষমতা নিয়ে জন্মান। তাঁদেরকে খুঁজে বের করে ঈশ্বরের দায়িত্ব দেওয়া হয়।"

"তাঁদেরকে কেমন করে খুঁজে বের করা হয়?"

"আমি জানি না ঈশ্বরী প্রিমা।" রিহান কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "যখন আপনার চলে যাবার সময় হবে তখন আপনি নূতন একজন ঈশ্বরকে দায়িত্ব দেবেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন কে ঈশ্বর হয়ে জন্ম নিয়েছে।"

ঈশ্বরী প্রিমা মুখোশের আড়ালে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলেন, মুখোশটি হাসছে না, শুধু মানুষটি হাসছে বিষয়টি রিহানকে এক ধরনের বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে দিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপনি কেন হাসছেন ঈশ্বরী প্রিমা?"

ঈশ্বরী প্রিমা হাসি থামিয়ে বললেন, "কেন? শুধু তোমরা মানুষেরা হাসবে আনন্দ করবে আমরা ঈশ্বর এবং ঈশ্বরীরা চার দেয়ালের মাঝে কঠিন মুখ করে বসে থাকব সেটি কেমন নিয়ম?"

"আমি সেটা বলি নি ঈশ্বরী প্রিমা।"

"আমি জানি তুমি সেটা বলো নি।"

"আমি বলেছিলাম—"

"তুমি বলেছিলে তুমি ঈশ্বরের কোনো অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস কর না।"

রিহান মাথা নিচু করে বলল, "আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন ঈশ্বরী প্রিমা।"

"তুমি বলেছিলে তুমি একজন ঈশ্বরীকে করুণা কর, তার জন্যে দুঃখ অনুভব কর—"

রিহান ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমি সেভাবে বলি নি—"

"তুমি বলেছ একজন ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরী খুব নিঃসঙ্গ।"

রিহান মাথা নিচু করে বলল, "হ্যাঁ। আমি সেটা বলেছিলাম। আমার সব সময় মনে হয়েছে—"

ঈশ্বরী প্রিমা রিহানকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "এটি কোন বিচার যে তুমি রিহান হয়ে জীবনকে উপভোগ করবে আর আমি ঈশ্বরী হয়ে চার দেয়ালের মাঝে বন্দি হয়ে থাকব?"

রিহান কোনো কথা না বলে অবাক হয়ে ঈশ্বরী প্রিমার দিকে তাকাল। তার কারুকার্যময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখোশের আড়ালে এই মুহূর্তে কী অনুভূতি খেলা করছে সেটি দেখতে পাচ্ছে না। সেখানে কি ভয়ংকর ক্রোধ? তীব্র অভিমান? নাকি গভীর বিষাদ?

ঈশ্বরী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তুমি জান ঈশ্বরী হবার জন্যে আমার কী ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে?"

"না। জানি না।"

"আমার বাবা–মা ছিল। ছোট দুজন ভাই ছিল। সবাইকে ছেড়ে এখানে আসতে হয়েছে।"

"আমি দুঃখিত ঈশ্বরী প্রিমা।"

"দুঃখ বলতে কী বোঝায় সেটা তোমরা জান না রিহান। আমি ঈশ্বরী হয়ে এখানে আসার পর যে আমার বাবা–মা ছোট ছোট দুজন ভাই দুর্ঘটনায় মারা গেছে সেটি কি শুধু দুর্ঘটনা? নাকি হত্যাকাণ্ড?"

রিহান কোনো কথা না বলে বিস্ফারিত চোখে ঈশ্বরী প্রিমার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঈশ্বরী প্রিমা ভাঙা গলায় বললেন, "আমি তো ঈশ্বরী হতে চাই নি। আমি তো সাধারণ মানুষ হয়ে বড় হতে চেয়েছিলাম। আমি ছোট একটা সংসার চেয়েছিলাম, ভালোমানুষ একজন স্বামী চেয়েছিলাম। ছোট একটি সন্তান চেয়েছিলাম। তাকে গভীর ভালবাসায় বুকে চেপে ধরতে চেয়েছিলাম। তা হলে কেন আমাকে চার দেয়ালের মাঝে বন্দি হয়ে তোমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে?"

রিহান কোনো কথা না বলে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ঈশ্বরী প্রিমার দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশ্বরী প্রিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি আমার নিজের জীবনকে গ্রহণ করে ফেলেছিলাম। পুরো জীবন ঈশ্বরী হয়ে থেকে তোমাদের সুখ শান্তি আর নিরাপত্তার জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। নিজের ভিতরে মানুষের সব অনুভূতি মুছে সেখানে ঈশ্বরের কাঠিন্য নিয়ে এসেছিলাম। তখন, ঠিক তখন—"

"তখন কী ঈশ্বরী প্রিমা?"

"তখন তুমি এসে বললে তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর না! ঈশ্বর তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে নি। ঈশ্বরের কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই—শুধু তাই না, তুমি বললে তুমি জান যে ঈশ্বরী আসলে নিঃসঙ্গ।"

রিহান কোনো কথা না বলে ঈশ্বরী প্রিমার কারুকার্যখচিত মুখোশটির দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশ্বরী প্রিমা একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি না জেনে আমার জীবনকে ওলটপালট করে দিয়েছ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি। আমাদের কমিউনে তুমি যেটা করতে চেয়েছ আমি তোমাকে সেটা করতে দিয়েছি।"

"আমি সেজন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ ঈশ্বরী প্রিমা।"

"আমার ধারণা, সেটি আমাদের কমিউনের জন্যে খুব চমৎকার একটি ব্যাপার হয়েছে! ঈশ্বরীর সাহায্য না নিয়ে তোমরা বড় বড় সমস্যার সমাধান করেছ!"

রিহান মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। করেছি।"

"একজন ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরীর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে কমিউনের সব মানুষকে সব ব্যাপারে তার ওপর নির্ভরশীল রাখা, নিশ্চিত করা মানুষ যেন কখনোই নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু আমি তাদেরকে পায়ে দাঁড়াতে দিয়েছি, আমি সবাইকে একজন ঈশ্বর ছাড়া বেঁচে থাকা শেখাতে চাই।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু রিহান আজকে আমি তোমাকে ডেকেছি একটি সত্য কথা বলার জন্য।"

রিহানের বুক কেঁপে উঠল, জিজ্ঞেস করল, "কী কথা?"

"আমি এই কমিউনের মানুষকে কেন নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে দিয়েছি তুমি জান? কেন ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া তাদের বেঁচে থাকতে শিখাচ্ছি?"

"তাদের ভালোর জন্যে, তাদের ভবিষ্যতের জন্যে—"

"না–না–না।" ঈশ্বরী প্রিমা তীব্র কণ্ঠে কথা বলতে বলতে মাথা নাড়লেন, "আমি এটা করেছি আমার নিজের জন্যে।"

"নিজের জন্যে?"

"হ্যাঁ। আমার নিজের জন্যে! আমি আর ঈশ্বরী প্রিমা থাকতে চাই না। আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই। তুচ্ছ একজন মানুষ, অকিঞ্চিতকর একজন মানুষ! আমার ছোট একটা ঘরে ছোট একটা শিশু থাকবে, সাদাসিধে একজন স্বামী থাকবে, আমরা সারা দিন খেটেখুটে একমুঠো খাবার খাব—মাথার উপর একটা আচ্ছাদন থাকবে—"

ঈশ্বরী প্রিমা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। মুখ তুলে রিহানের দিকে তাকালেন, বললেন, "রিহান, তুমি একজন ঈশ্বরীকে মানুষ হবার স্বপ্ন দেখিয়েছ! দোহাই তোমার, তোমাকে এই স্বপ্ন পূরণ করে দিতে হবে।"

রিহান হতচকিত হয়ে বলল, "আমাকে?"

"হ্যাঁ। তুমি বলেছ একজন ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর কাছে কিছু তথ্য থাকে যেটা অন্য কারো কাছে থাকে না।"

"আমি সেটা অনুমান করেছিলাম।"

"তোমার অনুমান সত্যি। আমি তোমার মতো একজন সাধারণ মানুষ—শুধু একটা পার্থক্য আমার কাছে এমন তথ্য আছে যেটা কোনো মানুষের কাছে নেই!"

রিহান অবাক হয়ে বলল, "কোথায় আছে সেই তথ্য? কেমন করে আছে?"

"আমি সব তোমাকে বলব। কিন্তু তুমি আমাকে কথা দাও আমাকে আবার মানুষের মতো বাঁচতে দেবে।"

"ঈশ্বরী প্রিমা, আপনি যেটা বলছেন সেটা অনেক বড় একটা দায়িত্ব। আমি কি সেটা পারব?"

"আমি একা যদি এতদিন সেটা পেরে থাকি তুমি সবাইকে নিয়ে সেটা পারবে না?"

"আমি এখনো সেটা জানি না ঈশ্বরী প্রিমা। কিন্তু আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি আমি চেষ্টা করব। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করব।"

ঈশ্বরী প্রিমা কাঁপা হাতে তার কারুকার্যময় মুখোশটি খুলে নিলেন, রিহান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল, মুখোশের আড়ালে একটি তেরো–চৌদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ের মুখ। বড় বড় নিষ্পাপ চোখ, সেই চোখে ব্যাকুল একটা দৃষ্টি, পাতলা গোলাপি ঠোঁট, সেখানে বিষণ্ণতার একটা ছাপ। রিহান কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তু—তু—তুমি ঈশ্বরী প্রিমা?"

ঈশ্বরী প্রিমা মাথা নাড়ল।

"তুমি তো ছোট একটি মেয়ে!"

"হ্যাঁ। আমি ছোট একটি মেয়ে। আমি খুব ভীতু আর দুর্বল ছোট একটি মেয়ে।" কিশোরী মেয়েটি কাতর গলায় বলল, "বলো, তুমি আমাকে রক্ষা করবে। বলো—কথা দাও।"

রিহান নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়াল, তারপর কিশোরী মেয়েটির কাছে গিয়ে তার হাত স্পর্শ করল, বলল, "ঈশ্বরী প্রিমা—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না।" মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "ঈশ্বরী নয়, বলো প্রিমা। শুধু প্রিমা।"

"প্রিমা—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমাকে আমি রক্ষা করব।"

কিশোরী মেয়েটি যে কিছুক্ষণ আগেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরী প্রিমা ছিল, রিহানের দুই হাত ধরে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। রিহান এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর খুব সাবধানে মেয়েটির মুখটাকে দুই হাতে ধরে হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই প্রিমা! কোনো ভয় নেই।"

রাত্রিবেলা রিহানের চোখে ঘুম আসছিল না। ঈশ্বরী প্রিমাকে আজ সে যেভাবে দেখে এসেছে সেটি কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কিশোরী মেয়েটি যখন আকুল হয়ে কাঁদছিল গভীর একটি দুঃখে তার বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল। এখনো তার বুকের ভিতরে সেই কষ্টটি রয়ে গেছে, কিছুতেই সেটা দূর করতে পারছে না।

রিহান বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে একসময় নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে গেল।

কে যেন ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে—রিহান চোখ খুলে তাকাল। গ্রুস্তান উদ্বিগ্ন মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। রিহান হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠল, "কী হয়েছে গ্রুস্তান?"

"ঘুম থেকে ওঠ তাড়াতাড়ি।"

"কেন?"

"ঈশ্বরী প্রিমা জরুরি খবর পাঠিয়েছেন।"

রিহান চমকে উঠে বলল, "কী জরুরি খবর পাঠিয়েছেন?"

"এই মুহূর্তে তোমাকে যেন সরিয়ে নেওয়া হয়।"

"আমাকে?" রিহান অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"জানি না। কিন্তু ঈশ্বরী প্রিমার আদেশ এটা।"

"কেন এরকম আদেশ দিয়েছেন?"

গ্রুস্তান গম্ভীর মুখে বলল, "নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কোনো জরুরি খবর আছে।"

"কীসের জরুরি খবর?"

"বাইরে এসে দেখ।"

রিহান বাইরে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেল। চারদিকে বিন্দু বিন্দু আলো কাঁপছে, তার সাথে চাপা গুঞ্জন। তাদের কমিউনের দিকে শত শত মোটরবাইক ছুটে আসছে। বিন্দু বিন্দু আলোগুলো মোটরবাইকের হেডলাইটের আলো, গুঞ্জনটি বহুদূর থেকে ভেসে আসা শক্তিশালী ইঞ্জিনের গুঞ্জন। রিহান কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তারপর ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করে, "কী হচ্ছে এখানে?"

"আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।"

"কারা?"

"সবাই।"

রিহান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সবাই?"

"হ্যাঁ সবাই। এই এলাকায় যতো কমিউন আছে তাদের সবাই।"

"সে কী? কেন?"

"জানি না। কিন্তু আমার ধারণা তোমার জন্যে।"

"আমার জন্যে?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রুস্তান গম্ভীর হয়ে বলল, "একজন ঈশ্বর তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল—তুমি সেই মৃত্যুদণ্ড থেকে পালিয়ে এসেছ। তোমাকে সেই মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে। যদি না পাও তা হলে সেই ঈশ্বর অর্থহীন হয়ে যায়। অসত্য হয়ে যায়। সেটি কেউ মেনে নিতে পারছে না।"

রিহান কাঁপা গলায় বলল, "মেনে নিতে পারছে না?"

"ঈশ্বরী প্রিমা ছাড়া। ঈশ্বরী প্রিমা তোমাকে বাঁচাতে চান। তাই তোমাকে সরে যেতে বলছেন।"

রিহান হঠাৎ কঠিন মুখে বলল, "আমি সরে যাব না।"

"তুমি কী করবে?"

"আমি এখানে থাকব।"

"কেন?"

"ওদের সাথে যুদ্ধ করব।"

গ্রুস্তান কাঠ কাঠ স্বরে হেসে উঠে বলল, "তুমি এই কয়েক হাজার মানুষের সাথে যুদ্ধ করবে?"

"তা হলে আমরা কী করব?"

"সেটা ঈশ্বরী প্রিমাকে সিদ্ধান্ত নিতে দাও।"

"ঈশ্বরী প্রিমা কী সিদ্ধান্ত নেবেন?"

গ্রুস্তান কঠিন মুখে বলল, "দেখ রিহান, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমি এর আগেও অনেক বড় বিপদ ডেকে এনেছ—এবারে সেটি না হয় নাই করলে।"

রিহান গ্রুস্তানের মুখের দিকে তাকাল, হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটি নিয়ে সে কেমন যেন অসহায় অনুভব করে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "গ্রুস্তান। এরা সবাই যদি আমাকে ধরার জন্যে আসে তা হলে পালিয়ে না গিয়ে আমার এখানে থাকা উচিত। আমাকে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তারা চলে যাবে।" এখানে আর কারো কোনো ক্ষতি করবে না।

গ্রুস্তান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমারও তাই ধারণা।"

"কাজেই আমি পালিয়ে যেতে চাই না। আমি এখানে থাকতে চাই।"

"কিন্তু ঈশ্বরী প্রিমা চান তুমি চলে যাও। কাজেই তোমাকে চলে যেতে হবে।"

"আমি যাব না।"

"ঈশ্বরীর নির্দেশ তুমি অমান্য করতে পারবে না। তুমি যেতে না চাইলে তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার নির্দেশ আছে।"

"জোর করে?"

"হ্যাঁ।" গ্রুস্তান বলল, "তোমার ঠিক কোথায় আঘাত করলে তুমি দীর্ঘ সময়ের জন্যে অজ্ঞান হয়ে যাবে, ঈশ্বরী প্রিমা সেটাও বলে দিয়েছেন।"

রিহান কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু তার আগেই কিছু একটা তীব্র শক্তিতে তার ঘাড়ে আঘাত করে। কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ করে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসে।

রিহান যখন চোখ খুলে তাকাল তখন অন্ধকার কেটে পূর্ব আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। উঠে বসতে গিয়ে হঠাৎ সে মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। দুই হাতে খানিকক্ষণ তার মাথা ধরে রেখে সে সাবধানে উঠে বসে, ভোরের শীতল বাতাসে সারা শরীর হঠাৎ একটু কেঁপে উঠল। সে কোথায় আছে কেমন আছে মনে করার চেষ্টা করল, এবং হঠাৎ করে তার পুরো ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। শত শত মোটরবাইক হিংস্র পশুর মতো তাদের কমিউনের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুটে আসছিল এবং তার মাঝে তাকে অচেতন করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাকে কোথায় সরিয়ে নিয়েছে?

রিহান উঠে বসে চারদিকে তাকায়, পাহাড়ি একটা এলাকা—আগে কখনো এখানে এসেছে বলে মনে পড়ে না। রিহান সাবধানে উঠে দাঁড়ায়, বড় বড় কিছু পাথরের আড়ালে তাকে রেখে গেছে। পাথরগুলো ধরে সে বের হয়ে আসে, সামনে একটা বড় উপত্যকা তার অন্যপাশে বহুদূরে আবছাভাবে তাদের কমিউনটি দেখা যাচ্ছে। রিহান ভোরের আবছা আলোতে কমিউনটি ভালো করে দেখার চেষ্টা করল, তার আশঙ্কা হচ্ছিল হয়তো দেখবে পুরো কমিউনটি জ্বালিয়ে অঙ্গার করে দিয়েছে, মৃত মানুষের দেহ আর কালো ধোঁয়ায় সেটি বীভৎস হয়ে আছে। কিন্তু সেরকম কিছু দেখল না। মনে হল কমিউনটির কোনো ক্ষতি হয় নি—ঠিক সেভাবেই আছে। রিহান একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, তার জন্যে পুরো কমিউনটি ধ্বংস করে দেওয়া হলে সে কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারত না।

রিহান একটা বড় নিশ্বাস ফেলে তার কমিউনের দিকে হেঁটে যেতে থাকে।

কমিউনের কাছাকাছি পৌঁছেই রিহান বুঝতে পারল কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তাকে প্রথমে দেখতে পেল ত্রানা, কিন্তু তাকে দেখে ত্রানা অন্যবারের মতো তার কাছে ছুটে এল না, বরং দূরে সরে গেল। রিহান আরেকটু কাছে যেতেই লরি ট্রাক থেকে মানুষজন বের হয়ে আসতে থাকে কিন্তু কেউ তার সাথে কোনো কথা বলে না, কেমন যেন আতঙ্ক ক্রোধ এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। রিহান কেমন যেন ভয় পেয়ে যায়, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। ঠিক এরকম সময় সে গ্রস্তানকে দেখতে পেল, একটা ট্রাকের পাটাতনে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে। রিহান দ্রুতপায়ে তার কাছে হেঁটে যায়, গ্রস্তান তার দিকে তাকাল কিন্তু তার মুখে কোনো অভিব্যক্তির ছাপ পড়ল না।

রিহান ভয় পাওয়া গলায় ডাকল, "গ্রস্তান।"

গ্রস্তান কোনো কথা না বলে শীতল চোখে তার দিকে তাকাল। রিহান জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে গ্রস্তান?"

"তুমি এখনো জান না?"

"না।"

গ্রস্তান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ঈশ্বরী প্রিমাকে ধরে নিয়ে গেছে।"

রিহান নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না, বিস্ফারিত চোখে গ্রস্তানের দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েকবার চেষ্টা করে বলে, "ঈশ্বরী প্রিমাকে? ধরে নিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

রিহান মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেল, কমিউনের সবাই ধীরে ধীরে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই, সবার দৃষ্টি শীতল। সবার মুখে এক ধরনের ঘৃণা। রিহান শুষ্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, "কেন তারা ঈশ্বরী প্রিমাকে ধরে নিয়ে গেছে?"

"তোমাকে না পেয়ে।"

"আমাকে না পেয়ে?"

"হ্যাঁ। তোমাকে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, সেটি তোমাকে পেতে হবে তাই। তোমাকে না পেলে ঈশ্বরী প্রিমাকে।"

রিহান কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "এখন কী হবে?"

"আমাদের সবাইকে ভাগাভাগি করে অন্য সব কমিউনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

"কেন?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাদের কোনো ঈশ্বর নেই। কোনো ঈশ্বরী নেই। আমরা কেমন করে থাকব?"

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন তীব্র গলায় চিৎকার করে উঠল, "সব তোমার জন্যে রিহান। তুমি এসে আমাদের কমিউনে সব নষ্ট করে দিয়েছ। সব ধ্বংস করে দিয়েছ।"

রিহান চমকে উঠে তাকাল, অন্য সবাই মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ তোমার জন্যে। তোমার জন্যে নির্বোধ কোথাকার!"

রিহান এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে তাকায়, সবাই কেমন যেন ক্ষিপ্ত পশুর মতো মারমুখী হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে তাকে ধরে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ঠিক তখন কোথা থেকে জানি নীলন এসে হাজির হল, ভিড় ঠেলে ভিতরে এসে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "শান্ত হও। সবাই শান্ত হাও। ঈশ্বরী প্রিমা তার শেষ কথায় তোমাদের বলে গেছেন তোমরা যেন রিহানকে ভুল না বোঝ। ঈশ্বরী বলেছেন তাকে ক্ষমা করে দিতে—"

"না, আমরা ক্ষমা করব না। কিছুতেই ক্ষমা করব না।" তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা রাগে উন্মত্ত মানুষেরা চিৎকার করে বলল, "আমরা খুন করে ফেলব। টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব।"

নীলন রিহানকে আড়াল করে রেখে বলল, "তোমরা শান্ত হও। শান্ত হও—কোনো পাগলামো করো না। আমরা সভ্য মানুষ, সভ্য মানুষের মতো ব্যবহার করতে হবে।"

মধ্যবয়সী একজন মানুষ চিৎকার করে বলল, "আমি তখনই বলেছিলাম এই মানুষটাকে এখানে ঢুকতে দিও না—"

একজন মহিলা বলল, "যখন আমাদের ঈশ্বরী প্রিমাকে ধরে নিয়ে শেষ করে দেবে তখন রিহান এখানে বেঁচে থাকবে, ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াবে সেটি কেমন করে হয়?"

বেশ কয়েকজন চিৎকার করে বলল, "খুন করে ফেলো। খুন করে ফেলো এই হতভাগাকে—"

রিহান হতচকিত হয়ে এই ক্রুদ্ধ মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের ক্রোধ অর্থহীন নয়, সত্যি সত্যিই তার জন্যে আজ ঈশ্বরী প্রিমাকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু শুধু কি তার জন্যে? রিহান বুকের ভিতরে এক ধরনের গভীর হতাশা অনুভব করে। গভীর দুঃখে তার বুক ভেঙে যেতে চায়। সে নীলনকে পাশ কাটিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা আমাকে একটু কথা বলার সুযোগ দাও।"

কে জানি চিৎকার করে বলল, "না। দেব না। খুন করে ফেলব তোমাকে।"

রিহান বলল, "তোমরা যদি আমাকে খুন করতে চাও আমি সেটার জন্যেও প্রস্তুত। কিন্তু আগে আমাকে দুটি কথা বলতে দাও।"

"কী কথা?"

"তোমরা সবাই বলছ পুরো ব্যাপারটার জন্যে দায়ী আমি। সত্যি কথা বলতে কী আমি এমন কিছু ব্যাপার জানি যেটা অন্য কেউ জানে না! জানলে পুরো ব্যাপারটা তোমরা অন্যভাবে দেখতে। কিন্তু আমি সেখানে যাচ্ছি না। আমি সমস্ত দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি। আমি আমার কাজকর্ম দিয়ে যেসব দুঃখকষ্ট তৈরি করেছি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। তোমরা যদি আমাকে অনুমতি দাও তা হলে আমি এই মুহূর্তে প্রভু ক্লডের কাছে ধরা দেব। তার দেওয়া মৃত্যুদণ্ড মেনে নিয়ে ঈশ্বরী প্রিমাকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করব।"

রিহানকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা কেউ কোনো কথা বলল না। রিহান নীলনের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "আমাকে একটা মোটরবাইক দেবে? সাথে কিছু গ্যাসোলিন।"

গ্রুস্তান বলল, "সেটি সমস্যা নয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তা হলে সমস্যা কী?"

"তুমি কোথায় গিয়ে ধরা দেবে? এই বিশাল এলাকা তুমি চেন, কোন কমিউনটি কোথায় তুমি জান?"

রিহান মাথা নেড়ে বলল, "না। জানি না।"

"তা হলে?"

নীলন বলল, "আমার কাছে একটি ম্যাপ আছে।"

"সেই ম্যাপে কমিউনগুলো দেখানো আছে?"

"নেই। কিন্তু ঈশ্বরী প্রিমার কাছে একটা তালিকা আছে। তার ঘরের দেয়ালে টাঙানো থাকে। সেখানে কমিউনগুলোর অবস্থান বলা আছে।"

গ্রস্তান ভুরু কুঁচকে নীলনের দিকে তাকাল, "তুমি কেমন করে জান?"

নীলন বলল, "আমি জানি। আমি তাঁর ঘরে গিয়েছি। তাঁর ঘরের সবকিছু ভেঙেচুরে দিয়ে গেছে। কিন্তু কাগজপত্রগুলো আছে।"

রিহান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তা হলে আমাকে ম্যাপটি আর এই কমিউনের তালিকাটি দাও। আমি ঈশ্বরী প্রিমাকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে ধরা দেব। এই মুহূর্তে।"

কেউ কোনো কথা বলল না। রিহান সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা আমার জন্যে শুভ কামনা কর যেন আমি ঈশ্বরী প্রিমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি।"

কেউ এবারেও কোনো কথা বলল না।

রিহান আবার বলল, "তোমরা কি আমার জন্যে শুভ কামনা করবে না?"

নীলন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "যে মানুষটি মারা যাবার জন্যে যাচ্ছে তার জন্যে শুভ কামনা করা যায় না। শুভ মৃত্যুদণ্ড বলে কিছু নেই রিহান।'

কমবয়সী একটি মেয়ে হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থের মতো হেসে উঠে বলল, "শুভ মৃত্যুদণ্ড— হি-হি-হি।"

রিহান বিস্ফারিত চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

AMARBOI.COM

৭. বৃত্ত

রিহান মোটরবাইকটি নিয়ে পাথুরে প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাসের হলকা চোখে-মুখে এসে লাগছে, ম্যাপ অনুযায়ী সামনে একটা উঁচু পাহাড় আসবে সেটা ঘুরে ডান দিকে যেতে হবে। কমিউনগুলো কোথায় সেটা সে কনট্যুর মেপে বসিয়ে নিয়েছে, একটার পর আরেকটা কমিউন খুঁজে খুঁজে যেতে হবে।

মোটরবাইকে ছুটে যেতে যেতে রিহান বুঝতে পারে কিছু একটা ব্যাপার তাকে খানিকটা বিচলিত করে রেখেছে কিন্তু সেটি কী সে ঠিক ধরতে পারছে না। যাকে সবাই ঈশ্বরী প্রিমা হিসেবে জানে সে যে খুব দুঃখী অসহায় বাচ্চা একটি মেয়ে সেটি রিহান ছাড়া আর কেউ জানে না। এই মুহূর্তে সে মাথা থেকে সেটি সরিয়ে রেখেছে। সে যখন প্রভু ক্লডের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিউনে হাজির হবে তখন তাকে যে হত্যা করা হবে কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে সেটাও তাকে সেরকম বিচলিত করছে না। একটু আগে সবাই মিলে তাকে যেভাবে অপমান এবং লাঞ্ছনা করেছে সেই গ্লানিটুকুও এই মুহূর্তে তার মাথার মাঝে নেই। সবকিছু ছাপিয়ে অন্য একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছে বলে তার মনে হচ্ছে কিন্তু সেটা কী রিহান ঠিক ধরতে পারছে না। তার পকেটে রাখা ম্যাপের মাঝেই বিস্ময়টুকু লুকানো আছে বলে তার কাছে মনে হচ্ছে কিন্তু সেটি কোথায় ঠিক বুঝতে পারছে না। রিহান অন্যমনস্কভাবে মোটরবাইকটি ছুটিয়ে নিতে নিতে পাহাড়ের ঢালে একটা ছায়া ঢাকা জায়গা দেখে থেমে গেল। কোমরে ঝোলানো পানির বোতল থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে সে পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে আবার সেই ম্যাপের দিকে তাকাল। বেশ বড় একটি নিখুঁত কনট্যুর ম্যাপ, এই পুরো এলাকাটি খুব চমৎকারভাবে দেখানো রয়েছে। রওনা দেবার আগে সে বেশ কয়েকটি কমিউনের অবস্থান ম্যাপের মাঝে বসিয়ে নিয়েছে, মোটামুটি আর্ধবৃত্তাকারভাবে ছড়িয়ে আছে। রিহান কিছুক্ষণ ম্যাপটির দিকে তাকিয়ে থেকে পকেট থেকে অন্য কমিউনের অবস্থানগুলো বের করে ম্যাপের মাঝে বসাতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই রিহান তার বিস্ময়ের কারণটুকু বুঝতে পারে। সবগুলো কমিউনের অবস্থান একটা নিখুঁত বৃত্তের উপর। কী আশ্চর্য!

রিহান হতচকিত হয়ে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকে, এটি কেমন করে সম্ভব? একটি কমিউন কিছুক্ষণ এক জায়গায় থেকে স্থান বদল করে অন্য জায়গায় যায়। সব সময়েই সবাই ভেবে এসেছে এই স্থান বদলগুলোতে কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু সেটা সত্যি নয় তারা নিখুঁত একটা বৃত্তের উপর থাকে। রিহান তার হাতের তালিকাটি দেখল, বিভিন্ন কমিউন আগে কোথায় ছিল সেগুলোও এখানে দেওয়া আছে। রিহান ধৈর্য ধরে সেগুলোও ম্যাপে বসাতে থাকে এবং বিস্মিত হয়ে দেখে সেগুলোও এই বৃত্তের মাঝে! কখনোই বৃত্তের বাইরে নয়। যার অর্থ গত অর্ধশতাব্দী থেকে সবগুলো কমিউন বৃত্তাকারে ঘুরছে। কী আশ্চর্য!

রিহান ম্যাপটির দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করে বুঝতে পারে এটি বিক্ষিপ্ত কোনো ঘটনা নয়, এবং হঠাৎ করে এটি ঘটে নি এর পেছনে একটা কারণ আছে। রিহানকে কেউ বলে দেয় নি কিন্তু সে জানে কারণটি নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। রিহান আকাশের দিকে তাকাল, সূর্যটা ঢলে পড়তে শুরু করেছে। বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছাতে হলে তার এখনই আবার রওনা দেওয়া উচিত, কিন্তু এই বিচিত্র রহস্যটির একটা কিনারা না করে সে কেমন করে যাবে? সে তো এ জীবনে আর কখনো এই রহস্যটি সমাধান করতে পারবে না।

রিহান আবার ম্যাপের দিকে তাকাল, এই এলাকায় অসংখ্য কমিউনের মানুষেরা জানে না তারা একটি বিশাল বৃত্তের পরিধি বরাবর ঘুরছে। সেই বৃত্তটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো তার মনে হল এই বৃত্তটির একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র রয়েছে, আর সেই কেন্দ্রটিতেই নিশ্চয়ই রহস্যের সমাধান লুকিয়ে আছে। কমিউনের সব মানুষ যে কেন্দ্রটিকে নিয়ে ঘুরছে সেই কেন্দ্রটি নিশ্চয়ই সাধারণ জায়গা নয়—নিশ্চয়ই সেটি একটি অসাধারণ জায়গা, নিশ্চয়ই এই জায়গাটির একটা অস্বাভাবিক গুরুত্ব আছে।

রিহান ম্যাপটির ওপর ঝুঁকে পড়ল, বৃত্তের পরিধিকে সমান দুভাগে ভাঁজ করে বৃত্তের একটা ব্যাস বের করে নেয়। দ্বিতীয়বার অন্য একটি অংশে ভাঁজ করে দ্বিতীয় একটা ব্যাস বের করে নেওয়ার সাথে সাথে দুটি ব্যাসের সংযোগস্থলে বৃত্তের কেন্দ্রটি বের করে ফেলল। কেন্দ্রটি পড়েছে সামনে যে পাহাড়ের সারি আছে তার ভেতরে কোনো একটি ছোট পাহাড়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর। আলাদা করে সেটিকে বোঝার কোনো উপায় নেই, এর কোনো বিশেষত্ব আছে সেটাও বোঝার উপায় নেই, শুধুমাত্র এই ম্যাপটির দিকে তাকালে এই জায়গাটার গুরুত্বটা ভয়ানকভাবে চোখে পড়ে।

রিহান ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রাখে, তাকে এই জায়গাটি আগে খুঁজে বের করতে হবে, এই রহস্যের সমাধান না করে সে মারা যেতে পারবে না।

ঘণ্টাখানেক মোটরবাইকে গিয়ে রিহান পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছাল, এখান থেকে বাকিটা তার হেঁটে যেতে হবে। এবড়োখেবড়ো পাথরে পা দিয়ে সে পাহাড়ে উঠতে থাকে, কিছুক্ষণের মাঝেই সে গরমে ঘেমে ওঠে। পানির বোতলে পানি কমে আসছে। সে সাবধানে দুই এক চুমুক খেয়ে বাকি পানিটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করল, তাকে কতদূর যেতে হবে কে জানে। ঘণ্টাখানেক উপরে উঠে সে তার ম্যাপটি খুলে তাকাল, পথ ভুলে সে অন্য কোনোদিকে চলে যাচ্ছে না এই ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্যে। কনট্যুর ম্যাপে দেখানো আছে সামনে একটা ছোট পাহাড় ডান দিকে খাড়া নেমে যাবার কথা, রিহান তাকিয়ে সামনের ছোট পাহাড় এবং ডান দিকে খাড়া ঢালুটি দেখতে পেয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল। সামনের ছোট পাহাড়টি পার হবার পর একটা ঢালু জায়গা থাকার কথা, তারপর হঠাৎ খাড়া উপরে উঠে গেছে, সেই খাড়া বেয়ে উঠে গেলেই নির্দিষ্ট জায়গাটা পেয়ে যাবে। রিহান সূর্যের দিকে তাকাল, যদি কোনো ঝামেলা না হয় সূর্য ডুবে যাবার আগেই সে সেই রহস্যময় জায়গায় পৌঁছে যাবে।

রিহানের হঠাৎ একটা বিচিত্র কথা মনে হল, এমন যদি হয় যে সে গিয়ে দেখে যে জায়গাটি এই বিচিত্র বৃত্তের কেন্দ্র সেটি আসলে পুরোপুরি বিশেষত্বহীন একটা জায়গা তা হলে কী হবে? রিহান জোর করে চিন্তাটি মাথা থেকে সরিয়ে দেয়—এটি হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত রিহান যখন নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছেছে তখন সে কুলকুল করে ঘামছে। পাহাড়ের উপরে বেশ খানিকটা জায়গা তুলনামূলকভাবে সমতল, রিহান সেখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরে তাকাল। অনেকটুকু উপরে উঠে এসেছে, সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ে দূরে মরুভূমির এই এলাকাটিতে এক ধরনের লালচে আভা, হঠাৎ দেখে মনে হয় এটি বুঝি পৃথিবীর কোনো অংশ নয়—মনে হয় এটি কোনো পরাবাস্তব জগতের অংশ। রিহান পুরো এলাকাটি ঘুরে দেখতে শুরু করে। তার ভেতরে এক ধরনের আশা ছিল যে এখানে সে কোনো একটা ঘর বা দালান দেখবে, কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। সে প্রায় আশা হারিয়ে ফেলছিল কিন্তু হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল জায়গাটি আসলে বৈশিষ্ট্যহীন নয়, এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে—জায়গাটি তুলনামূলকভাবে সমতল এবং হঠাৎ করে প্রকৃতিতে এত বড় সমতল আর মসৃণ জায়গা পাওয়া যায় না। শুধু যে সমতল তাই নয়, জায়গাটি বৃত্তাকার, মনে হয় বেশ যত্ন করে এই অংশটুকু এভাবে তৈরি করা হয়েছে।

রিহান বৃত্তাকার জায়গাটির ঠিক মাঝামাঝি জায়গাটুকু খুঁজে বের করে নিচে তাকাল এবং হঠাৎ করে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল সেখানে একটা গোলাকার ধাতব ঢাকনা। রিহান উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কোনোভাবে ধাতব অংশটুকু টেনে তোলা যায় কি না চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু মসৃণ ধাতব অংশটুকু পাথরের সাথে মিশে আছে, এটাকে টেনে তোলার কোনো উপায় নেই। রিহান তখন ধাতব অংশটিতে হাত দিয়ে থাবা দিল সাথে সাথে ভেতর থেকে প্রতিধ্বনির মতো একটা শব্দ ভেসে এল। রিহান নিশ্বাস বন্ধ করে আবার একবার থাবা দিতেই আবার প্রতিধ্বনির মতো শব্দটি শোনা গেল। রিহান এবারে দ্রুত দুবার থাবা দেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে সাথে ভেতর থেকে প্রতিধ্বনির মতো শব্দ শোনা যায়—এবারে শব্দটি আসে চারবার। রিহান নিঃসন্দেহ হয়ে গেল যে সে সত্যি সত্যিই রহস্যময় জায়গাটি খুঁজে পেয়েছে। সে এবারে তিনবার থাবা দিল সাথে সাথে ভেতর থেকে প্রতিধ্বনির মতো শব্দ আসতে থাকে— পরপর নয়বার শব্দ হয়ে থেমে গেল। সে যতবার শব্দ করছে তার বর্গ সংখ্যক শব্দ ফিরে আসছে। ব্যাপারটি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সে চারবার শব্দ করল, ভেতর থেকে এবার ষোলবার প্রতিধ্বনি ফিরে আসার কথা। সত্যি সত্যি ষোলবার প্রতিধ্বনি ফিরে এল। রিহান নিজের ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে, এই রহস্যময় জায়গাটির সাথে যোগাযোগ করার একটি পথ হয়তো সে খুঁজে পাবে। কী করবে যখন ঠিক করতে পারছে না তখন হঠাৎ করে ভেতর থেকে একবার শব্দ ভেসে এল—এবার তাকে কেউ পরীক্ষা করছে। রিহান পাল্টা একবার শব্দ করল। ভেতর থেকে এবার দুবার শব্দ হল, রিহান দুয়ের বর্গ চারবার শব্দ করল। ভেতরে কী আছে সে জানে না, কিন্তু সেটি এবারে তিনটি শব্দ করল। রিহান গুনে গুনে নয়বার শব্দ করল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, এবারে ভেতর থেকে চারটি শব্দ হল, রিহান গুনে গুনে পাল্টা ষোলটি শব্দ করল।

সাথে সাথে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে থাকে, পুরো এলাকাটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। রিহান চমকে উঠে দাঁড়ায় তারপর লাফ দিয়ে পিছনে সরে যায়। সে বিস্ফারিত চোখে দেখে পাথরের মাঝখান একটা চতুষ্কোণ জায়গা যেন ফেটে বের হয়ে উঠে আসতে শুরু করেছে। ভোঁতা একটা শব্দ করে এক মানুষ উঁচু একটা চতুষ্কোণ ধাতব অংশ বের হয়ে হঠাৎ করে থেমে যায়। রিহান নিঃশব্দে কিছুক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখানে ঢোকার কোনো জায়গা আছে কি? রিহান চারপাশে একবার ঘুরে দেখল, কোনো দরজা নেই, কিন্তু এক পাশে একটা সবুজ বোতাম। খানিকক্ষণ চিন্তা করে সে বোতামটা স্পর্শ করে। কিছু হল না দেখে বোতামটা চাপ দিল সাথে সাথে একটা যান্ত্রিক শব্দ করে তার সামনে একটা দরজা খুলে গেল, ভেতরে একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

রিহান একটা নিশ্বাস ফেলল, ঠিক কেন জানা নেই হঠাৎ কৌতূহল ছাপিয়ে তার ভেতরে একটা চাপা ভয় উঁকি দেয়। কী আছে ভিতরে? সে যদি ভেতরে আটকা পড়ে যায়, যদি আর কোনোদিন বের হতে না পারে? সে যে সবাইকে কথা দিয়ে এসেছে প্রভু ক্লডের কাছে ধরা দিয়ে ঈশ্বরী প্রিমাকে মুক্ত করে আনবে?

মাথা থেকে সব চিন্তা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রিহান ধীরে ধীরে সিঁড়িতে পা দিলে সাথে সাথে পেছনের দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। সে কি আর কখনো বের হতে পারবে? রিহান একমুহূর্ত অপেক্ষা করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। প্রায় চল্লিশটি ধাপ নিচে একটা চতুষ্কোণ জায়গা। একপাশে অর্ধস্বচ্ছ কাচের দরজা। ভেতর থেকে হালকা নীলাভ আলো বের হয়ে আসছে। রিহান কান পেতে শুনল খুব হালকা এক ধরনের যান্ত্রিক গুঞ্জন, এ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। সে সাহস সঞ্চয় করে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উঠল। বড় একটি ঘরের এক কোনায় একটি চেয়ার, চেয়ারে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বসে আছে। রিহানকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে মানুষটি মাথা তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

ভয়ংকর আতঙ্কে রিহান ছুটে বের হয়ে যাচ্ছিল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিয়ে সে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

মানুষটি তাকে দেখার চেষ্টা করতে করতে উঠে দাঁড়াল, তারপর দুই পা এগিয়ে এসে সহৃদয়ভাবে বলল, "এস, ভেতরে এস।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিহান অনেক কষ্ট করে সাহস সঞ্চয় করে ভেতরে ঢুকল। মানুষটি তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার নাম কী ছেলে?"

রিহান একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "রিহান।"

"রিহান?"

"হ্যাঁ।"

"চমৎকার। তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছি রিহান। আমি তোমার জন্যে দুই শ তিরিশ বছর থেকে এই চেয়ারে বসে আছি।"

রিহান একটা আর্ত শব্দ করে বলল, "দুই শ তিরিশ বছর?"

"হ্যাঁ। আমার জন্যে সেটি কোনো সমস্যা নয়। কারণ আমি সত্য মানুষ নই। আমি একটা হলোগ্রাফিক ছবি।" মানুষটি হাত তুলে দুই পাশে দেখিয়ে বলল, "ঐ দেখো দুই পাশ থেকে লেজারের আলো এসে সুষম উপস্থাপন করে আমাকে তৈরি করেছে।"

রিহান বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল, যে মানুষ নিজে দাবি করছে সে সত্যি নয় তার সাথে কথা বলা যায় কি না সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়।

হলোগ্রাফিক মানুষটি বলল, "তুমি খুব অবাক হচ্ছ? আমার হিসাব অনুযায়ী তোমার অবাক হবার কথা! আমার মনে হয় তোমার সাথে আমার খোলাখুলি কথা বলা দরকার।"

রিহান তবু কোনো কথা বলল না। হলোগ্রাফিক মানুষটি একটু হেসে বলল, "তোমার ভয় পাবার কিছু নেই রিহান। তুমি এখানে খুব নিরাপদ। আমি সবকিছু জানি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।"

"আমাকে সাহায্য করতে পারবে?"

"হ্যাঁ। রিহান তুমি এই চেয়ারটায় বসো।" হলোগ্রাফিক মানুষটা ঘরের অন্যপাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, "তুমি ইচ্ছে করলে আমার শরীরের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পার!"

রিহান তবু দাঁড়িয়ে রইল। হলোগ্রাফিক মানুষটি বলল, "এস রিহান। তোমার সাথে আমার কথা বলা দরকার।"

রিহান সাবধানে হেঁটে হলোগ্রাফিক মানুষটার কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করল, দেখল সত্যিই সেখানে কিছু নেই, তার হাতে শুধু রঙিন আলো এসে পড়ছে।

মানুষটি হেসে বলল, "দেখেছ? ভয়ের কিছু নেই। যাও, তুমি গিয়ে বস।"

রিহান জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব?"

"আমি তোমাকে বলব। এর মাঝে অলৌকিক কিছু নেই—এটি বিজ্ঞানের ব্যাপার। সহজ বিজ্ঞান। এস।"

রিহান সত্যি সত্যি মানুষটার ভেতর দিয়ে হেঁটে ঘরের অন্যপাশে একটা চেয়ারে বসল। এখনো পুরো ব্যাপারটা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। মানুষটি তার সামনে একটা চেয়ারে বসে কথা বলতে শুরু করে।

"ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল দুই শ তিরিশ বছর আগে। পৃথিবীতে তখন ছয় বিলিয়ন মানুষ, ইকুয়িনা নামে ভয়ংকর একটা ভাইরাসের কারণে পৃথিবীর সব মানুষ কয়েক সপ্তাহের মাঝে মরে শেষ হয়ে গেল। ভাইরাসের সংক্রমণ হবার পর মারা যেতে দুই সপ্তাহের মতো সময় নেয়। পৃথিবীর কিছু বিজ্ঞানী তাদের জীবনের শেষ দুই সপ্তাহের সময়ে ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে এটা তৈরি করে গিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই প্রজেক্টটি তৈরি করা হয়েছিল আন্তঃনক্ষত্র মহাকাশ ভ্রমণের জন্যে। মানুষ যখন আন্তঃনক্ষত্র পরিভ্রমণে যাবে সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে পারে। এই দীর্ঘ সময়ে কী হবে কেউ জানে না, বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা থাকলে ভালো কিন্তু কোনো কারণে সেই মহাকাশচারীরা যদি নিজেরা যুদ্ধবিগ্রহ করে মারা যায়, যদি শুধু কিছু ছোট শিশু বেঁচে থাকে তখন কী হবে? তারা বড় হয়ে পৃথিবীর এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের কিছুই পাবে না, নিঃসঙ্গ একটি মহাকাশযানে বিচিত্র একটি পরিবেশে বড় হবে। পৃথিবীর পুরো জ্ঞানভাণ্ডার কি আবার গোড়া থেকে আবিষ্কার করতে হবে? সেটি তো হতে পারে না। এ ধরনের পরিবেশে সেই শিশুদের সাহায্য করার জন্যে আমাদের তৈরি করা হয়েছে।"

হলোগ্রাফিক মানুষটি তার চারপাশে দেখিয়ে বলল, "এখানে যে যন্ত্রটি আছে প্রাথমিকভাবে এটাকে বলা হত কম্পিউটার। বিংশ শতাব্দী থেকে এটা তৈরি শুরু হয়, প্রতি বছর এর ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে যেতে শুরু করল। একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রথম মানুষের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার তৈরি করা হল। তারপর আরো এক শতাব্দী কেটে গেল, পৃথিবীর বুকে এমন কম্পিউটার তৈরি হল যা মানুষের পুরো সভ্যতাকে নিজের ভেতরে ধরে রাখতে পারে। নিউক্লিয়ার বোমা দিয়েও সেই কম্পিউটার ধ্বংস করা যাবে না, সাইক্লোন টাইফুন ভূমিকম্প তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা তার জন্যে এমন ইন্টারফেস তৈরি করা হল যেটি যে কোনো মানুষের যে কোনো ধরনের বুদ্ধিমত্তায় কাজ করতে পারে। কেন জান?"

"কেন?"

হলোগ্রাফিক মানুষটা নিজেকে দেখিয়ে বলল, "কারণ ইন্টারফেসটা এরকম। একজন সহৃদয় মানুষ কথা বলছে। যে কোনো ভাষায়, যে কোনো পরিবেশে। যে কোনো মানুষের সাথে! যে কোনো বিষয়ে।"

"যাই হোক, তোমাকে যেটা বলছিলাম—দুই শ তিরিশ বছর আগে যখন পৃথিবীর সব মানুষ ইকুয়িনা ভাইরাসে মারা যেতে শুরু করেছিল, তখন কিছু বিজ্ঞানী তাদের জীবনের শেষ দুই সপ্তাহে পৃথিবীর পুরো সভ্যতা, পুরো জ্ঞানবিজ্ঞান ঢুকিয়ে এই পাহাড়ের মাঝে রেখে গেলেন। কিন্তু রেখে গেলে তো হবে না, যদি কিছু মানুষ বেঁচে যায় তাদেরকে এর কাছে আনতে হবে, এটি দিয়ে পৃথিবীর লক্ষকোটি বছরের জ্ঞানবিজ্ঞান সভ্যতা শিক্ষা দিতে হবে। সেটা করবেন কী দিয়ে? কেউ কি বেঁচে থাকবে শেষ পর্যন্ত?

"বিজ্ঞানীরা কিছু জানতেন না। তাই সারা পৃথিবীতে অসংখ্য যোগাযোগ মডিউল ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। উপগ্রহ ব্যবহার করে সেগুলো সারা পৃথিবী থেকে সরাসরি এখানে যোগাযোগ করতে পারত। ছোট চৌকোনা বাক্সে একটা হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে কিছু ছবি! প্রথম কয়েক মাস কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, তারপর হঠাৎ করে এই ইন্টারফেসে যোগাযোগ হতে শুরু করল—আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যারা যোগাযোগ করছে তারা ছোট ছোট শিশু!

"আমরা সেই যোগাযোগ মডিউল ব্যবহার করে তাদের সাথে কথা বলতাম, তাদের সান্ত্বনা দিতাম, সাহস দিতাম। বিপদে সাহায্য করতাম। ধীরে ধীরে শিশুগুলো বড় হতে লাগল, তাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব জন্ম হতে শুরু করল, দেখতে পেলাম তারা নিজেদের মাঝে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করছে। তুচ্ছ কারণে খুনোখুনি শুরু করছে। তাদেরকে যে আবার সারা পৃথিবীর দায়িত্ব নিতে হবে সেটা তারা জানে না, সেটা তারা বুঝতে পারছে না।

"তখন ধীরে ধীরে সেখানে নেতৃত্ব গড়ে উঠতে শুরু করল, পুরো দলের ভেতর সবচেয়ে যে কর্মক্ষম মানুষ সে পুরো দলটির দায়িত্ব নিতে শুরু করল, দলের মাঝে শৃঙ্খলা ফিরে এল! দলগুলো তখন গুছিয়ে নিয়েছে, বেঁচে থাকার নিয়মগুলো ধরে ফেলেছে। সারা পৃথিবীতে ছয় বিলিয়ন মানুষের সম্পদ ব্যবহার করছে কয়েক হাজার মানুষ—তাদের প্রাচুর্যের কোনো অভাব নেই।

"দেখতে দেখতে এই নেতৃত্ব তখন একটি ভিন্ন ধরনে পাল্টে যেতে শুরু করল। একটি দলে বা একটি কমিউনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যোগাযোগ মডিউলের এই হলোগ্রাফিক ইন্টারফেস। দলের নেতারা সেই ইন্টারফেসটা নিজেদের মাঝে কুক্ষিগত করে ফেলল। বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে জরুরি জিনিস হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্যটি পেতে পারে শুধুমাত্র দলের নেতা। কাজেই যারা নেতা তাদের ক্ষমতা আকাশচুম্বী হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে তারা নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবতে শুরু করে দিল।

"আগে নেতৃত্ব দিত যারা সত্যিকারের নেতা তারা। একবার নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবতে শুরু করার পর সেই ব্যাপারটি আর তা থাকল না—একজন ঈশ্বরের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে কে হবে পরের ঈশ্বর। নেতৃত্ব আসতে শুরু করল অযোগ্য মানুষের ওপর। মানুষের সমাজে কমিউনগুলোতে তখন সমস্যা দেখা দিতে শুরু করল। তারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে শুরু করল, স্বার্থপর হয়ে যেতে লাগল।

"আমরা ইচ্ছে করলে সে জায়গায় হস্তক্ষেপ করতে পারতাম কিন্তু করি নি। স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে দিয়েছি। তবে একটা ব্যাপার করেছি। পৃথিবীর যত মানুষের যত দল আছে, যত কমিউন আছে তাদেরকে ধীরে ধীরে এই এলাকায় নিয়ে আসতে শুরু করেছি। ধীরে ধীরে তারা এখানে এসে জড়ো হয়েছে।"

রিহান জিজ্ঞেস করল, "তাদেরকে কীভাবে এখানে এনেছ?"

হলোগ্রাফিক মানুষটি হেসে বলল, "যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল করে দিতাম, ভালো সিগন্যালের জন্যে ছোটাছুটি করত—যেখানে আনতে চাই সেখানে আসার পর পুরো সিগন্যাল পাঠাতাম।"

"ঈশ্বরেরা কিছু বুঝতে পারত না?"

"না। তারা জানে পুরো ব্যাপারটা ঐশ্বরিক। পুরো ব্যাপারটা অলৌকিক।"

রিহান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি তা হলে ঠিকই অনুমান করেছিলাম।"

"হ্যাঁ। তুমি ঠিকই অনুমান করেছিলে। আমরা তোমার মতো একজন মানুষের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। যে নূতন করে নেতৃত্ব নেবে। সার্বিকভাবে নেতৃত্ব নেবে।"

"নেতৃত্ব?" রিহান অবাক হয়ে হলোগ্রাফিক মানুষটির দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ। নেতৃত্ব।"

"আমি নেতৃত্ব দেব?"

"হ্যাঁ। তুমি নেতৃত্ব দেবে। যে মানুষ আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে সে হচ্ছে সঠিক মানুষ—"

"না।"

হলোগ্রাফিক মানুষ অবাক হয়ে বলল, "না!"

"আমি তো নেতৃত্ব দিতে আসি নি।"

"তুমি কেন এসেছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি একটা মেয়েকে উদ্ধার করতে এসেছি। মেয়েটির নাম প্রিমা। বাচ্চা একটি মেয়ে, অসহায় দুঃখী একটা মেয়ে। তাকে সবাই মিলে ধরে নিয়ে গেছে।"

হলোগ্রাফিক মানুষ অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে থাকে। রিহান মানুষটির দৃষ্টি এড়িয়ে বলল, "আমার এখন নিজেকে ধরা দিতে হবে। নিজেকে ধরা দিয়ে প্রিমাকে মুক্ত করতে হবে।"

হলোগ্রাফিক মানুষটি তখনো এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে আছে। রিহান কিছুক্ষণ কিছু একটা ভাবল, তারপর সোজা হয়ে বসে মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?"

মানুষটি শব্দ করে হেসে বলল, "তুমি কী রকম সাহায্য চাও রিহান? এখানে সবকিছু আছে, বিজ্ঞানের সবচেয়ে চমকপ্রদ আবিষ্কার মানুষের জন্যে এখানে রাখা আছে। বলো তুমি কী চাও? বলো—"

রিহানকে কেমন জানি অপ্রস্তুত দেখাল, সে নিচু গলায় বলল, "আমাকে কিছু খেতে দিতে পারবে? খুব খিদে লেগেছে—সারা দিন কিছু খাই নি আমি।"

৮. মুখোমুখি

AMARBOI.COM

রিহান মোটরবাইকটা দাঁড়া করিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। বড় একটা ট্রাকে হেলান দিয়ে একজন প্রহরী ঝিমুচ্ছিল, সে চমকে উঠে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা তাক করে বলল, "কে? কে যায়?"

রিহান হাঁটার গতি এতটুকু না কমিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, "আমার নাম রিহান।"

"দাঁড়াও। দাঁড়াও না হলে গুলি করে দেব।"

রিহান মুখে হাসি টেনে বলল, "কেন খামোখা গুলি করে একটা বুলেট নষ্ট করবে। আমি এমন কিছু ভয়ংকর মানুষ নই।"

মানুষটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে থাকে, কী বলবে বুঝতে পারে না। রিহান মুখের হাসিটা ধরে রেখে বলল, এত তাড়াতাড়ি আমাকে ভুলে গেলে? আমি তো এখানেই ছিলাম। মনে নেই?"

মানুষটি কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "রি-হান? তুমি?"

"হ্যাঁ। তোমরা সবাই আমাকে ধরার জন্যে গিয়েছিলে খবর পেয়েছি। খুব দুঃখিত আমি ছিলাম না। খবর পেয়েই চলে এসেছি।"

"তুমি কেন এসেছ?"

"তোমাদের কাছে ধরা দিতে।" রিহান দুই হাত এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও বেঁধে ফেলো।"

মানুষটি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলল, "তুমি একটু দাঁড়াও, এক সেকেন্ড দাঁড়াও—"

মানুষটি তার অস্ত্র নিয়ে ভিতরে ছুটে যেতে থাকে। রিহান মুখে কৌতুকের এক ধরনের ভাব ধরে রেখে ইতস্তত পায়চারি করতে থাকে। একসময় সে এখানেই ছিল, এলাকাটা বেশ ভালো করে জানে, কোন ট্রাকে কে থাকে, কোন লরিটি কোন পরিবারের এখনো মনে আছে, ইচ্ছা করলেই কোথাও গিয়ে সে দরজায় শব্দ করে বলতে পারে, "এই যে, আমি রিহান, তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।"

কিন্তু সে কিছুই করল না, পকেটে হাত ঢুকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণের ভিতর গ্রাউস এবং তার সাথে আরো তিন-চার জন সশস্ত্র মানুষকে দেখা গেল, মানুষগুলো দ্রুত রিহানকে ঘিরে ফেলল। গ্রাউস রিহানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "রিহান!"

"হ্যাঁ গ্রাউস। ভালো আছ?"

গ্রাউস প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "তুমি কেন এসেছ?"

"প্রভু ক্লডের সাথে দেখা করতে।"

গ্রাউস চমকে উঠে বলল, "কী বললে?"

"বলেছি প্রভু ক্লডের সাথে দেখা করতে।"

গ্রাউস কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তোমার সাহস খুব বেশি হয়েছে রিহান?"

"মনে হয় আগের থেকে একটু বেশি হয়েছে। মনে আছে তুমি আগেরবার যখন প্রভু ক্লডের কাছে পাঠাচ্ছিলে তখন আমি কী ভয় পেয়েছিলাম? এখন আমি নিজেই দেখা করতে চাইছি!" খুব একটা মজার কথা বলেছে সেরকম ভঙ্গি করে রিহান হা-হা করে হাসতে লাগল।

"তুমি কেমন করে জান প্রভু ক্লড তোমার সাথে দেখা করবেন?"

"আমি জানি। সবাই আমাকে দেখতে চায়। তোমরা কয়েক হাজার মানুষ কি আমার খোঁজে যাও নি?"

গ্রাউস কোনো কথা না বলে ক্রোধের এক ধরনের শব্দ করল। রিহান সেটা না শোনার ভান করে বলল, "যদি প্রভু ক্লড দেখা করতে না চান তাকে বলো তার জন্যে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এনেছি।"

"কী তথ্য?"

"যেমন মনে কর আলোর ব্যাপারটি। আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। তার গতিবেগ সেকেন্ডে তিন শ হাজার কিলোমিটার।"

গ্রাউস কিছু বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইল। রিহান সহৃদয় ভঙ্গি করে হেসে বলল, "কিংবা মনে কর নিউক্লিয়ার রি-এক্টরের ব্যাপারটি। এর ভেতরে কী হয় তুমি জান? ফুয়েল রডে কী থাকে তুমি জান? নিশ্চয়ই জান না। আমি কিন্তু জানি! প্রভু ক্লডকে আমি এই তথ্যগুলো দিতে চাই। গ্রাউস, এসব ব্যাপারে তোমার কোনো কৌতূহল না থাকতে পারে, প্রভু ক্লডের অনেক কৌতূহল। কেন জান?"

গ্রাউস রিহানের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। রিহান হাসি হাসি মুখ করে বলল, "প্রভু ক্লডের অনেক কৌতূহল, কারণ তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো এইসব কথা জানার কথা না। কিন্তু তুচ্ছ মানুষ হয়ে আমি এসব জেনে গেছি!"

ঠিক এরকম সময়ে দেখা গেল একজন মানুষ ছুটতে ছুটতে আসছে, কাছাকাছি এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "মহামান্য গ্রাউস। প্রভু ক্লড এই মুহূর্তে রিহানকে তার কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিহান মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "দেখেছ গ্রাউস, আমি তোমাকে বলেছিলাম না! প্রভু ক্লড আমাকে না দেখে থাকতেই পারবেন না।"

আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে এক ধরনের শব্দ করে তাকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল। রিহান তখন এগিয়ে যেতে শুরু করে, কোথায় যেতে হবে কীভাবে যেতে হবে সে জানে। রিহান হেঁটে যেতে যেতে বুঝতে পারে আশপাশের সব ট্রাক লরি থেকে মানুষজন বের হয়ে এক ধরনের অবিশ্বাস্য বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। যে মানুষটি ঈশ্বরের মৃত্যুদণ্ডকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকে এবং নিশ্চিত মৃত্যুর ভয় না করে সেই মৃত্যুদণ্ড নিতে নিজে থেকে ফিরে আসে তাকে নিয়ে সবার যে এক ধরনের কৌতূহল হতে পারে তাতে অবাক হবার কী আছে?

রিহান সোজা হয়ে প্রভু ক্লডের দিকে তাকিয়ে রইল। এই অল্প কয়েকদিনে মনে হয় প্রভু ক্লডের মুখে বয়সের একটি ছাপ পড়েছে। প্রভু ক্লড তীব্র দৃষ্টিতে রিহানের দিকে তাকিয়ে থেকে হিংস্র গলায় বললেন, "তুমি আমার সাথে দেখা করতে চাইছ!"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমি ঈশ্বরী প্রিমার খোঁজ নিতে এসেছি। তিনি কেমন আছেন জানতে এসেছি।"

"তুমি একজন মানুষ হয়ে ঈশ্বরীর খোঁজ নিতে এসেছ, তোমার এত বড় দুঃসাহস?"

রিহান তরল গলায় বলল, "আমার দুঃসাহসের জন্যে ক্ষমা চাই প্রভু ক্লড। তবে আমার কারণে ঈশ্বরী প্রিমা শাস্তি পাচ্ছেন সেজন্যে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।"

প্রভু ক্লড কোনো কথা না বলে তীক্ষ্ণ চোখে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রিহান বলল, "আমি এখন আমার শাস্তির জন্যে এসেছি। ঈশ্বরী প্রিমাকে কি তার কমিউনে ফিরে যেতে দেবেন?"

"সেই সিদ্ধান্ত নেব আমি।"

"অবশ্যই। অবশ্যই প্রভু ক্লড।" রিহান কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "ঈশ্বরী প্রিমা এখন কোথায় আছেন?"

"তোমার সেটি জানার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"আমি কি তা হলে অন্য একটি জিনিস জানতে পারি?"

"কী জানতে চাও?"

"আমি কেন সাধারণ মানুষ আর আপনি কেন ঈশ্বর?"

প্রভু ক্লডের মুখ হঠাৎ ভয়ংকর হিংস্র হয়ে ওঠে, তিনি চিৎকার করে বললেন, "বেশি দুঃসাহস দেখিও না ছেলে।"

"আপনি যে তথ্যটুকু পান, হঠাৎ করে সেই তথ্য যদি বন্ধ হয়ে যায় তা হলে আপনি কি সাধারণ মানুষ হয়ে যাবেন?"

"তুমি কী বলতে চাইছ?"

"আপনি যে তথ্যটুকু পান, আমরা সবাই যদি সেই তথ্য পেতে শুরু করি তা হলে কি আমরা সবাই ঈশ্বর আর ঈশ্বরী হয়ে যাব?"

ভয়ংকর ক্রোধে প্রভু ক্লডের মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে, তিনি চিৎকার করে বললেন, "কে আছ? নিয়ে যাও একে—এই মুহূর্তে নিয়ে যাও।"

প্রায় সাথে সাথে দুইজন মানুষ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে ছুটে আসে। দুই পাশ থেকে তাকে

AMARBOI.COM

দুজনে ধরে ফেলে, রিহান ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু ছাড়াতে পারল না। প্রভু ক্লড চিৎকার করে বললেন, "বাইরে নিয়ে যাও একে। গুলি করে হত্যা কর সবার সামনে। এই মুহূর্তে।"

মানুষ দুইজন মাথা নিচু করে বলল, "আপনার যেরকম ইচ্ছে প্রভু ক্লড।"

সবার সামনে কাউকে গুলি করে হত্যা করার জন্যে খানিকটা প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। কমিউনে বহুদিন কাউকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয় নি—ঠিক কীভাবে সেটা করা হয় সেটাও ভালো জানা নেই। রিহানের সামনেই যখন ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল ঠিক তখন এক কোনা থেকে নিউক্লিয়ার রি-এক্টর থেকে এলার্মের শব্দ শোনা গেল। বিপদের মাত্রা অনুযায়ী এলার্মের শব্দের তারতম্য হয়, এই এলার্মটি সর্বোচ্চ বিপদের। মুহূর্তের মাঝে পুরো কমিউনে একটি আতঙ্কের শিহরন বয়ে গেল। ঘরের দরজা খুলে চিৎকার করতে করতে লোকজন বের হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। গ্রাউস দুই হাত তুলে তাদের থামানোর চেষ্টা করে, বলতে থাকে, "শান্ত হও। সবাই শান্ত হও। ভয় পাবার কিছু নেই। প্রভু ক্লড এক্ষুনি সব নিয়ন্ত্রণ করে দেবেন—"

সবাই তার কথা শুনতে পেল না, যারা শুনতে পেল তারাও খুব শান্ত হল বলে মনে হল না। এই কমিউনে বেঁচে থাকার অংশ হিসেবে তাদেরকে এই এলার্মের শব্দগুলোর সাথে পরিচয় করানো হয়েছে।

গ্রাউস একজনকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "যাও। প্রভু ক্লডের নির্দেশ নিয়ে এস। এক্ষুনি যাও—"

মানুষটি প্রভু ক্লডের আর. ভি. এর দিকে ছুটে যেতে থাকে। রিহান মুখে এক ধরনের কৌতুকের হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, গ্রাউসকে ডেকে বলল, "গ্রাউস! আমার একটি কথা শুনবে?"

"কী কথা?"

"যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, পালাও।"

"তুমি কী বলতে চাইছ?"

"এই এলার্মটি হচ্ছে কোর মেল্টডাউনের এলার্ম। কিছুক্ষণের মাঝে মেল্টডাউন হবে, রেডিয়েশনে কেউ বেঁচে থাকবে না।"

গ্রাউস ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "সেটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। প্রভু ক্লড তার সমাধান দেবেন।"

"দেবেন না।"

"কী বলতে চাইছ তুমি?"

"তোমাদের প্রভু ক্লড যে তথ্যের সরবরাহ পেয়ে ঈশ্বর হয়েছিলেন তার সেই সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রভু ক্লড এখন আর ঈশ্বর নেই। তিনি এখন আমাদের মতো মানুষ!"

গ্রাউস অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

রিহান হা-হা করে হেসে বলল, "আমি এমন অনেক জিনিস জানি যেটা তোমরা কেউ জান না! আমার কথা বিশ্বাস না হলে প্রভু ক্লডের কাছে যাও। নিজের কানে শুনে এস। নিজের চোখে দেখে এস।"

গ্রাউস অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইল।

মানুষজন হইচই করে ছোটাছুটি করছে তার মাঝে ভয়ংকর শব্দ করে এলার্ম বাজতে থাকে, কে কী করবে বুঝতে পারছে না। ছোট বাচ্চারা চিৎকার করে কাঁদছে, অনেকে হাঁটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে শুরু করেছে। গ্রাউস যে মানুষটিকে প্রভু ক্লডের কাছে পাঠিয়েছিল হঠাৎ করে দেখল সে বিবর্ণ ফ্যাকাসে মুখে ছুটতে ছুটতে আসছে। গ্রাউসের কাছে এসে বলল, "গ্রাউস!"

"কী হয়েছে?"

"প্রভু ক্লড কিছু বলছেন না—"

"কিছু বলছেন না মানে?"

"মানে কিছু বলছেন না! তার কাছে কোনো সমাধান নাই।"

গ্রাউস আর্তচিৎকার করে বলল, "কী বলছ তুমি পাগলের মতো?"

"আমি ঠিকই বলছি। বিশ্বাস না হলে তুমি যাও। তুমি শুনে এস।"

গ্রাউস ভয়ার্ত মুখে একবার চারদিকে তাকাল, তাকে কেমন জানি অসহায় দেখায়। রিহান গলা উঁচু করে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস হল গ্রাউস?"

গ্রাউসের চোখ-মুখ হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে, সে রিহানের কাছে ছুটে এসে বলল, "তুমি কিছু একটা করেছ! তুমি?"

রিহান হা-হা করে হেসে বলল, "আমি? আমি তুচ্ছ মানুষ ঈশ্বরের কাজে বাধা দেব? কী বলছ তুমি গ্রাউস?"

মানুষ ছুটোছুটি করে গ্রাউসের কাছে ছুটে আসতে থাকে, দেখতে দেখতে সবাই তাকে ঘিরে ফেলে, ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, "আমরা কী করব গ্রাউস? এখন আমরা কী করব?"

গ্রাউস আমতা-আমতা করে বলল, "আমি জানি না।"

"কী বলছ তুমি জান না? প্রভু ক্লড কী বলেছেন?"

"প্রভু ক্লডও জানেন না।"

গ্রাউসকে ঘিরে থাকা মানুষগুলো অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তারা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ছোট একটা বাচ্চাকে শক্ত করে বুকে ধরে রাখা মা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তা হলে কে জানে?"

রিহান গলা উঁচু করে বলল, "আমি জানি।"

একসাথে সবাই তার দিকে ঘুরে তাকাল। রিহান বলল, "হ্যাঁ, আমি জানি। এই এলার্ম সর্বোচ্চ বিপদের এলার্ম। এর অর্থ নিউক্লিয়ার রি-একটরের কোর গলতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মাঝেই অচিন্তনীয় পরিমাণ রেডিয়েশন বের হবে। তোমরা অর্ধেক মানুষ সাথে সাথে মারা যাবে, বাকি অর্ধেক মারা যাবে আগামী তিন মাসের মাঝে। তারপরেও যারা বেঁচে থাকবে, তারা ক্যান্সারে ভুগে ভুগে মারা যাবে।"

কয়েকজন চিৎকার করে বলল, "কিন্তু আমরা কী করব?"

"তোমরা পালাও।"

"পালাব?"

"হ্যাঁ, এই মুহূর্তে ট্রাকে উঠে পালাও। বাতাসের বিপরীত দিকে পালাও, কারণ কোর মেল্টডাউন হলে বাতাসে রেডিয়েশন ভেসে আসতে পারে!"

একজন ভয়ার্ত মুখে বলল, "কিন্তু প্রভু ক্লডের আদেশ ছাড়া আমরা পালাব?"

রিহান হা-হা করে হেসে বলল, "তোমাদের প্রভু ক্লডও তোমাদের সাথে পালাবেন। তিনি আর ঈশ্বর নন, তিনি এখন সাধারণ মানুষ! সত্যি কথা বলতে কী সাধারণ মানুষ তবু কোনো না কোনো কাজে লাগে, একজন ঈশ্বর যখন সাধারণ মানুষ হয়ে যায় সে কোনো কাজে আসে না—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত মানুষজন এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে রিহানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একজন কাঁপা গলায় বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

"আমি জানি। তোমাদের প্রভু ক্লড যে তথ্য দিয়ে ঈশ্বর হয়েছিল, সেই তথ্য তার কাছে আর আসছে না। তার কাছে আর কখনো আসবে না।!"

"কিন্তু–কিন্তু তুমি কেমন করে জান?"

"বেঁচে থাকলে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাব, এখন পালাও। দেরি কোরো না!"

জরুরি এলার্মটা তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হতে শুরু করেছে। শব্দের সাথে সাথে লাল আলো জ্বলতে শুরু করেছে, দেখতে দেখতে পুরো পরিবেশটা ভয়ংকর হয়ে উঠল। রিহান দেখতে পেল তার কথা শুনে ট্রাকে করে মানুষজন পালাতে শুরু করেছে। একটি ট্রাককে চলে যেতে দেখে সবাই ছুটোছুটি করে অন্য ট্রাকে উঠতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে পুরো এলাকাটি ফাঁকা হয়ে যেতে শুরু করে, শুধু ভয়ংকর এলার্মটি তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ করে বাজতে থাকে।

যে দুজন মানুষ রিহানকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করার জন্যে এনেছিল তাদেরকে কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়, তারা কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। রিহান তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা পালাবে না?"

"তোমাকে কী করব?"

"প্রভু ক্লড গুলি করে মারতে বলেছে, গুলি করে মার।"

মানুষ দুজন একটু অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকাল, এর আগে তারা কখনো কাউকে এত সহজে নিজেকে গুলি করার কথা বলতে শোনে নি। রিহান চোখ মটকে বলল, "যেটা করতে চাও, তাড়াতাড়ি কর।"

"কেন?"

রিহান হা–হা করে হেসে বলল, "তোমরা যে প্রভু ক্লডের ওপর ভরসা করে আছ ঐ যে তাকিয়ে দেখ সেও তোমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে!"

মানুষগুলো অবাক হয়ে দেখল সত্যি সত্যি আতঙ্কিত প্রভু ক্লড তার আর. ভি. থেকে বের হয়ে এসেছেন, কী করবেন বুঝতে না পেরে খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করেছেন।

রিহান বলল, "আমাকে মারার অনেক সুযোগ পাবে। যাও, আগে এই বুড়ো মানুষটাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য কর! ধরে কোনো একটা ট্রাকে তুলে দাও।"

স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা হাত বদল করে বলল, "কিন্তু তুমি—"

"আমি যদি তুমি হতাম তা হলে আমাকে ঘাঁটাতাম না! কারণ কী জান?"

"কী?"

"তোমার প্রভু ক্লড আর কোনোদিন তোমাদের সাহায্য করতে পারবে না। যে তথ্য দিয়ে সে তোমাদের সাহায্য করত সেই তথ্য বন্ধ হয়ে গেছে! কিন্তু আমি এখনো তোমাদের সাহায্য করতে পারব! শুধু আমি জানি কেমন করে এই নিউক্লিয়ার রি–এক্টর রক্ষা করা যায়।"

মানুষগুলো এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইল। রিহান নিচু গলায় বলল, "আর দেরি কোরো না, যা করার তাড়াতাড়ি কর। কিছুক্ষণের মাঝে রেড এলার্ট শুরু হয়ে যাবে, তখন আর কিছু করা যাবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে মানুষ দুটো নিজেদের ভেতর নিচু গলায় কথা বলল, তারপর এগিয়ে এসে রিহানকে খুলে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমরা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।"

"চমৎকার। তোমাদের ধন্যবাদ।"

"তুমি চেষ্টা করে দেখো রি-একটর মেল্টডাউন বন্ধ করতে পার কি না!"

"দেখব। তোমরা এখন পালাও।"

রিহান কিছুক্ষণের মাঝেই দুটো শক্তিশালী মোটরবাইকের শব্দ শুনতে পায়। মানুষ দুটো এই কমিউন ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুভয় খুব বড় ভয়।

রিহান একটা নিশ্বাস ফেলে প্রভু ক্লডের বাসভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পুরো কমিউনের সবাই সরে গেছে এখানে এখন আছে শুধু রিহান এবং প্রিমা। প্রিমাকে খুঁজে বের করতে হবে, সে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অধীর হয়ে আছে।

রিহান যখন প্রিমার হাত এবং পায়ের শেকল খুলছে তখন নিউক্লিয়ার রি-এক্টরের কোর মেল্টডাউন শুরু হয়ে গেছে, রেড এলার্ট হিসেবে ভয়ংকর সাইরেন বাজছে, ভয়ংকর রেডিয়েশন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। প্রিমা ভয়ার্ত গলায় রিহানের হাত আঁকড়ে ধরে বলল, "আমাদের কী হবে রিহান?"

রিহান হেসে বলল, "কিছু হবে না।"

"কোর মেল্টডাউন হচ্ছে, রেডিয়েশনে মারা যাব আমরা!"

"না, আমরা মারা যাব না।"

প্রিমা অবাক হয়ে বলল, "কেন মারা যাব না?"

"কারণ এখানে কিছু হচ্ছে না, শুধু প্রচণ্ড শব্দে একটা এলার্ম বাজছে।"

"শুধু এলার্ম বাজছে? সেটি কীভাবে সম্ভব?"

"খুব সম্ভব। এটা একটা হাস্যকর খেলনা যন্ত্র—ভয়ংকর এলার্ম বাজিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করে দেয়। আসলে কিছু না।"

"কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কেউ সেটা বুঝতে পারছে না কেন?"

"কারণ প্রভু ক্লডের তথ্য পাওয়ার জন্যে যোগাযোগ মডিউলে যে হলোগ্রাফিক ইন্টারফেস ছিল সেটা আর কাজ করছে না। তার বোঝার কোনো উপায় নেই। এখানে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত প্রভু ক্লড। প্রভু ক্লড যখন অচল হয়ে যায় সবকিছু অচল হয়ে যায়।"

প্রিমা চোখ বড় বড় করে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। আমি ঠিকই বলছি। যে যন্ত্রের ওপর ভরসা করে সবাই ঈশ্বর হত সেই যন্ত্র আর কোনোদিন কাজ করবে না। পৃথিবীতে আর কেউ ভবিষ্যতে ঈশ্বর হতে পারবে না।"

"কেন?"

"সেটি অনেক বড় কাহিনী।"

"আমি সেটি শুনতে চাই।"

রিহান হেসে বলল, "তার চাইতে ভালো একটা কাজ করা যায়।"

"কী করা যায়?"

"তোমাকে সেটা দেখানো যায়।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী দেখানো যায়?"

"আমি সেটা তোমাকে বলে বুঝাতে পারব না প্রিমা। সেটা বিশ্বাস করতে হলে তোমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি নিজের চোখে দেখেও সেটা বিশ্বাস করবে না।"

প্রিমা অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ছটফট করে বলল, "আমাকে দেখাও। এক্ষুনি দেখাও।"

"হ্যাঁ দেখাব, কিন্তু তার আগে চল এই এলার্মটা বন্ধ করে দিই। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।"

কিছুক্ষণের ভেতরেই দেখা গেল রিহান শক্তিশালী মোটরবাইকে করে মরুভূমির পাথুরে প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। পিছনের সিটে বসে প্রিমা রিহানকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। নিরাপত্তার জন্যে যতটুকু শক্ত করে ধরা দরকার প্রিমা তার চাইতে অনেক শক্ত করে ধরেছে। তাকে দেখলে মনে হয় সে ভাবছে এই মানুষটিকে ছেড়ে দিলেই বুঝি সে হারিয়ে যাবে। সে কিছুতেই এই মানুষটিকে হারাতে চায় না। কিছুতেই না।

AMARBOI.COM

শেষ কথা

চার বছর পরের কথা।

রিহান ককপিটে বসে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করতেই প্রপেলার ধরে রাখা মানুষটি সেটা ঘোরানোর চেষ্টা করল। রিহান ফুয়েল পাম্পে চাপ দিয়ে ইগনিশান কী-টা ঘোরানোর সাথেই ভট ভট শব্দ করে ইঞ্জিনটা চালু হবার চেষ্টা করে কয়েকবার শব্দ করে থেমে গেল। রিহান ফুয়েল পাম্পে কয়েকবার চাপ দিয়ে হাত দিয়ে আবার ইঙ্গিত করতেই প্রপেলারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা দ্বিতীয়বার গায়ের জোর দিয়ে প্রপেলারটা ঘোরানোর চেষ্টা করল, এবারে বার কতক ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ ইঞ্জিনটা বিকট শব্দ করে চালু হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ইঞ্জিনটা পুরো শক্তিতে ঘুরতে শুরু করে, প্রবল বাতাসে ধুলোবালি এবং খড়কুটো উড়ে যেতে শুরু করে। রিহান গগলসটা চোখে লাগিয়ে কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে প্লেনটা একটু সামনে নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিক তখন দেখতে পেল কে একজন হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে আসছে—মানুষটি ছুটতে ছুটতে প্রাণপণে রিহানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। রিহান একটু অবাক হয়ে দেখল, মানুষটি গ্রুস্তান, তার ডান হাতে একটা কাগজ এবং কাগজটা নাড়তে নাড়তে সে ছুটে আসছে।

রিহান সুইচ টিপে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ করে চোখের গগলসটা খুলে গ্রুস্তানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। এই চার বছরে গ্রুস্তানের দেহটি আরো বিস্তৃত হয়েছে এবং ছুটে আসার কারণে সে রীতিমতো হাঁপাতে থাকে। রিহান জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে গ্রুস্তান?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রস্তান প্রত্যেকটি শব্দের পর একটা করে নিশ্বাস নিয়ে বলল, "ঠিক সময়ে তোমাকে ধরেছি।"

"মোটেও ঠিক সময়ে আমাকে ধর নি। খুব ভুল সময়ে ধরেছ।" রিহান গলা উঁচু করে বলল, "আমি এক্ষুনি প্লেনটা ফিল্ড টেস্ট করতে নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

"সেজন্যেই বলেছি ঠিক সময়ে ধরেছি।" গ্রস্তান হঠাৎ করে তার মুখটা প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত গম্ভীর করে বলল, "তোমার এই প্লেনের কার্যক্রমের ওপর আইনগত বাধা এসেছে।"

রিহানের কথাটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল, সে মুখ হাঁ করে বলল, "কী বাধা?"

"আইনগত বাধা।"

"আইনগত বাধা?" রিহানের মুখ দেখে মনে হল সে কথাটার অর্থ বুঝতে পারছে না। বারকয়েক চেষ্টা করে আবার বলল, "আইনগত বাধা?"

"হ্যাঁ।" গ্রস্তান খুব চেষ্টা করে মুখে একটা কঠোর ভাব এনে বলল, "একজন নাগরিক তোমার প্লেনের কার্যক্রমের ওপর মামলা করেছে। সে বলেছে মানুষের আকাশে ওড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি প্রকৃতি চাইত মানুষ আকাশে উড়ুক তা হলে তাদের পাখির মতো ডানা থাকত। যেহেতু মানুষের ডানা নেই কাজেই তাদের আকাশে ওড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।"

রিহান খুব চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, "কোর্ট এই যুক্তি গ্রহণ করেছে?"

"করে নাই।" গ্রস্তান গম্ভীর গলায় বলল, "কোর্ট বলেছে বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে কোনো সীমা বেঁধে দেওয়া যাবে না। যার যেটা ইচ্ছে সে সেটা নিয়ে গবেষণা করতে পারবে।"

"তা হলে আইনগত বাধাটা এল কোথা থেকে?'

"কারণ মামলার আবেদনে আরো একটি কথা ছিল।"

'সেটি কী কথা?"

গ্রস্তান হাতের কাগজটি দেখে বলল, "সেখানে বলা হয়েছে তোমার প্লেনের কার্যক্রম এখনো পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে। এখনই এটার ফিল্ড টেস্ট করা হলে জানমালের ক্ষতি হতে পারে।"

রিহান এবার রেগে উঠতে শুরু করল, অনেক কষ্ট করে রাগটা প্রকাশ করতে না দিয়ে বলল, "জানমালের ক্ষতি হতে পারে? কোর্ট এই যুক্তি গ্রহণ করেছে?"

"আমাদের বিচারকরা মামলাটা খুব গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছেন। তারা অনেকক্ষণ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই মুহূর্তে এই প্লেন চালানো বেআইনি এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর।"

রিহানের মুখ রাগে থমথমে হয়ে ওঠে, সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে সেটা ক্ষতিকর?"

গ্রস্তান হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, "ঐ সব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে পরে শুনানি হবে। তুমি তখন বিচারকদের সামনে তোমার কথাগুলো বলার সুযোগ পাবে। তোমাকে সেটা বলার জন্যে ডাকা হবে।"

রিহান এবার রাগে ফেটে পড়ল, ককপিটের দরজা খুলে সে লাফিয়ে নিচে নেমে পা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাপিয়ে বলল, "তোমরা ফাজলেমি পেয়েছ? এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে তোমরা ঠাট্টা শুরু করেছ?"

"এটা মোটেও ঠাট্টা নয়।" গ্রস্তান কষ্ট করে মুখে একটা গাম্ভীর্য ধরে রেখে বলল, "কোর্টের সিদ্ধান্তকে ঠাট্টা বললে তোমার ওপর কোর্ট অবমাননার অভিযোগ আনা যায়।"

"কোর্ট অবমাননা?"

"কোর্ট অবমাননার শাস্তি হচ্ছে কারাদণ্ড। তোমাকে তা হলে আমাদের জেলখানায় এক সপ্তাহ আটকে রাখতে হবে।" গ্রস্তান সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বলল, "এক দিক দিয়ে তা হলে ভালোই হয়—আমাদের জেলখানাটা একটু ব্যবহার হয়! এতদিন হল জেলখানা তৈরি করেছি এখনো একজনকে ঢোকাতে পারলাম না! তোমাকে দিয়ে শুরু করলে মন্দ হয় না—"

রিহান হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "তোমরা মনে হয় ব্যাপারটা ধরতে পারছ না। আইন তৈরি করা হয় মানুষকে সাহায্য করার জন্যে, কারো ক্ষতি করার জন্যে নয়!"

"আমরা কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করছি না।"

"ক্ষতি করার চেষ্টা করছ না? এত দিন চেষ্টা করে আমরা একটা প্লেন দাঁড়া করিয়েছি, সবকিছু প্রস্তুত, আমরা যাচ্ছি ফিল্ড টেস্ট করতে ঠিক সেই মুহূর্তে এসে তোমরা এটাকে আটকে দিলে! কার বিরুদ্ধে সেটা করলে? আমার বিরুদ্ধে! আমি–রিহান, যে নাকি একা তোমাদের সবার বিরুদ্ধে থেকে সবার জন্যে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি! যে তথ্য পেয়ে আগে একজন মানুষ ঈশ্বর হয়ে যেত এখন কমিউনের যে কোনো মানুষ তার থেকে একশ গুণ বেশি তথ্য পেতে পারে। কে তার ব্যবস্থা করেছে? আমি! সেই আমার বিরুদ্ধে তোমরা ষড়যন্ত্র শুরু করেছ?"

গ্রস্তান গম্ভীর গলায় বলল, "আইনের চোখে সবাই সমান। তুমি পৃথিবীর সব মানুষের জন্যে তথ্য সরবরাহ করে ঈশ্বর–ঈশ্বরীর ব্যাপারটা শেষ করে দিয়েছ সেজন্যে আমরা সবাই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা স্কুলের জন্যে যে ইতিহাস বই লিখছি সেখানে তোমার ওপরে একটা চ্যাপ্টার আছে কিন্তু মনে করো না সেজন্যে তোমাকে আইনের চোখে আলাদাভাবে দেখা হবে। একজন নাগরিক মামলা করেছে আমাদের সেই মামলাটা বিবেচনা করতে হয়েছে। একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।"

"এই নাগরিকটা কে জানতে পারি?"

"তুমি নিয়মমাফিক আবেদন করলে কোর্ট তোমাকে এই সুনাগরিকের নাম জানাতে পারে।"

রিহান চোখ পাকিয়ে বলল, "দেখো গ্রস্তান, ভালো হবে না বলছি। কে এই সুনাগরিক?"

"প্রিমা"। গ্রস্তানের মুখ হঠাৎ কৌতুকের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! "তোমার বিবাহিত স্ত্রী, কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চিত করছি সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে তাকে আমরা একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করেছি। একবারও তোমার স্ত্রী হিসেবে দেখি নি—"

রিহান কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না, তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "প্রিমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

গ্রস্তান সহৃদয়ভাবে রিহানের হাত ধরে বলল, "মাথা খারাপ হবে কেন? তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একশবার বলেছে তুমি শোন নি, একটা প্লেন তো আর ছেলেখেলা নয়। অ্যাকসিডেন্ট তো হতেই পারে—"

"তাই বলে কোর্টে!"

"আহা–হা। এত কষ্ট করে আমরা একটা আইন বিভাগ দাঁড়া করিয়েছি কেউ যদি ব্যবহার না করে তা হলে কেমন করে হবে? বিচারকদের কথা চিন্তা কর—বেচারারা রীতিমতো ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছে কিন্তু এখন কোনো কাজ নেই! প্রিমার মামলার কারণে তবু শেষ পর্যন্ত একটা কাজ পেয়েছিল। সবার কী উৎসাহ তুমি যদি দেখতে!"

রিহান মাথা থেকে হেলমেট খুলে ককপিটের ভেতরে রেখে হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "প্রিমা কোথায়?"

"মনে হয় স্কুলে।"

"চলো যাই। দেখি অনুরোধ করে মামলাটা তুলিয়ে নেওয়া যায় কি না।"

স্কুলটা তৈরি করা হয়েছে খুব সুন্দর করে। সাদা দেয়ালের ওপর লাল টাইলের ছাদ। চারপাশে গাছের ছায়া। পাহাড়ের উপর থেকে একটা ঝরনা নেমে এসেছে, পাথরের উপর দিয়ে স্বচ্ছ পানিটুকু ঝিরঝির করে গড়িয়ে যাচ্ছে, শব্দটুকু ভারি সুন্দর। রিহানের কোনো কাজ না থাকলে সে পানিতে পা ডুবিয়ে বড় একটা পাথরে বসে থাকে। কিছুদিন হল কিছু পাখি এসে এখানে ভিড় জমিয়েছে, তাদের কিচিরমিচির শুনতে বেশ লাগে!

রিহান স্কুলের ভেতর ঢুকে ক্লাসরুমগুলোতে উঁকি দিল, বারো তেরো বছরের কিছু ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে প্রিমা কী একটা এক্সপেরিমেন্ট দাঁড়া করছিল, রিহানকে দেখে বলল, "কী ব্যাপার রিহান? কাজ শেষ?"

রিহান রাগের ভান করে বলল, "তোমার কী মনে হয়?"

প্রিমা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বলল, "কেমন জব্দ হলে আজ? আমাদের বিচার বিভাগের ক্ষমতা দেখলে?"

"সেটা নিয়েই তোমার সাথে কথা বলতে চাইছি।"

"একটু দাঁড়াও। আমি এদের প্লাঙ্ক কনস্টেন্টটা বের করে দিয়ে আসছি।"

"ঠিক আছে।"

রিহান সময় কাটানোর জন্যে ক্লাসরুমের করিডর ধরে হাঁটতে থাকে। একপাশে একটা ল্যাবরেটরিতে একটা মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে একটা মেয়ে কিছু একটা দেখছে, মাথা তুলতেই দেখল মেয়েটি ত্রানা। রিহান হাসিমুখে বলল, "কী খবর ত্রানা? কেমন চলছে তোমার গবেষণা?"

ত্রানা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল, "এক জায়গায় আটকে গেছি! কিছুতেই একটা জিনিস ধরতে পারছি না।"

"কী জিনিস?"

"তুমি বুঝবে না। জিনেটিক কোডিঙের একটা ব্যাপার।"

"তথ্যকেন্দ্র থেকে জেনে নাও।"

"উঁহু। আমি নিজে নিজে বের করতে চাই। জিজ্ঞেস করে জেনে নিলে লাভ কী?"

ত্রানা আবার মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখতে গিয়ে থেমে গিয়ে উচ্চ স্বরে ডাকল, "ক্রুড।"

পাশের ঘর থেকে ক্রুড বলল, "কী হল?"

"আমার পেটেরি ডিশগুলো কোথায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই যে নিয়ে আসছি।" বলে একটা ট্রেতে বেশ কিছু পেটরি ডিশ নিয়ে ক্লড ল্যাবরেটরির ঘরে ঢুকল। তার মাথার চুলগুলো আরো সাদা হয়েছে, মুখে বয়সের বলিরেখা। ত্রানা একটা পেটরি ডিশ হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে বলল, "এটা কি পরিষ্কার করা হল? তোমাকে এত করে বলেছি ভালো করে পরিষ্কার করতে কিন্তু তুমি আমার কথা শোননই না।"

ক্লড অপরাধীর মতো মুখ করে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "ইয়ে, মানে চেষ্টা করেছিলাম!"

"তুমি একটা পেটরি ডিশ ঠিক করে পরিষ্কার করতে পার না কিন্তু একসময় তুমি নাকি একজন ঈশ্বর ছিলে! মানুষ তোমাকে ডাকত প্রভু ক্লড আর তুমি কথায় কথায় মানুষকে ফাঁসি দিয়ে দিতে! তোমাকে দেখলে কেউ সেটা বিশ্বাস করবে?"

ক্লড কিছু একটা কথা বলতে যাচ্ছিল ত্রানা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এস আমার সাথে। আমি তোমাকে দেখিয়ে দিই কেমন করে পরিষ্কার করতে হয়। আর যেন ভুল না হয়।"

প্রিমা রিহানের হাত ধরে যাচ্ছে, বড় একটা পাথরের উপর থেকে পানির ধারা বাঁচিয়ে অন্য একটা পাথরে পা দিয়ে বলল, "তুমি কি রাগ করেছ রিহান?"

"করেছিলাম, কিন্তু এখন কমে গেছে।"

"কমে গেলেই ভালো।"

রিহান প্রিমাকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, "কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো, কোর্টে মামলা করার বুদ্ধিটা তোমাকে কে দিয়েছে?"

"কে আবার? গ্রুস্তান!"

"আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।"

প্রিমা রিহানের হাত টেনে বলল, "তুমি যেন আবার গ্রুস্তানের সাথে রাগারাগি না কর।"

"না, করব না।"

প্রিমা সুর পাল্টে বলল, "তুমি এরকম একটা পাগলামি করবে, আর আমার ভয় করবে না?"

"পাগলামি?"

"হ্যাঁ, যদি কিছু একটা হয়? সব বিপদের কাজগুলো তোমাকেই কেন করতে হয়? তুমি অন্যদের সুযোগ দিতে চাও না কেন?"

রিহান বলল, "কে বলেছে দিতে চাই না?"

"আমি জানি বিপদের কাজগুলো তুমি নিজে করতে চাও। মনে রেখো এখন কিন্তু তুমি মানে শুধু তুমি না। তুমি মানে তুমি আর আমি আর আমাদের বাচ্চা কিশি।"

রিহান কোনো কথা বলল না, ধীরে ধীরে একবার মাথা নাড়ল। প্রিমা হাত টেনে বলল, "মনে থাকবে তো?"

"থাকবে।"

রিহান তার টেবিলে একটা প্লেনের নকশার উপর ঝুঁকে পড়ে কত গতিবেগে কত লিফট হতে পারে সেটা হিসাব করে বের করছে। প্রিমা গিয়েছে কিশিকে ঘুম পাড়াতে। হিসাব করতে করতে রিহান শুনতে পেল কিশি বলছে, "মা আমাকে সেই পাখির গল্পটা বলো না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কোন পাখির গল্প?"

"ফিনিক্স পাখির গল্প।"

"এক গল্প কতবার শুনবে বোকা ছেলে।"

"শুনব মা শুনব! বলো না—"

রিহান শুনতে পেল প্রিমা তাদের সন্তানকে ফিনিক্স পাখির গল্প বলছে। কেমন করে ফিনিক্স পাখি আকাশের বুকে পাখা উড়িয়ে উড়ত—কেমন করে একদিন সেই ফিনিক্স পাখি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সেই ছাইয়ের ভেতর থেকে কেমন করে আবার নতুন ফিনিক্স পাখির জন্ম হল, বিশাল পাখা উড়িয়ে কীভাবে সেই পাখি আবার আকাশের বুকে ডানা মেলে দিল—

টেবিলের নকশার উপর ঝুঁকে কাজ করার ভান করতে করতে রিহান প্রিমার মুখ থেকে ফিনিক্স পাখির গল্প শুনতে থাকে।

তার ছেলের মতোই সমান আগ্রহে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

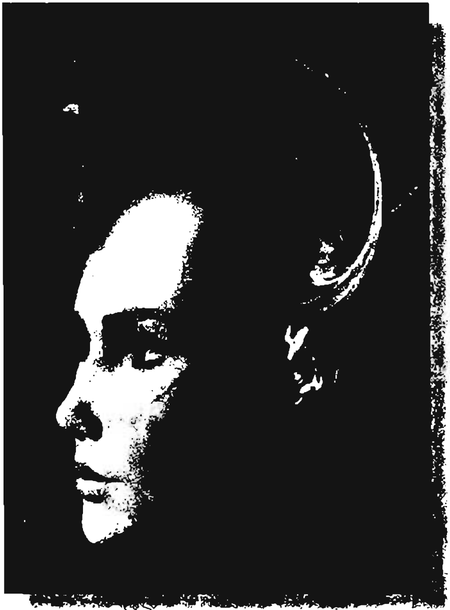

সায়রা সায়েন্টিস্ট

সা. ফি. স. (৪)—১৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জরিনি ইঁদুর

মগবাজারের মোড়ে স্কুটার থেকে নেমে আমি পকেট থেকে তিনটা দশ টাকার নোট বের করে স্কুটার ড্রাইভারের হাতে দিলাম। ড্রাইভার নোট তিনটার দিকে একনজর দেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "পঁয়ত্রিশ টাকা?"

স্কুটার ড্রাইভার তার পান খাওয়া দাঁত বের করে একগাল হেসে বলল, "জে। পঁয়ত্রিশ টাকা।"

"আপনি না ত্রিশ টাকায় রাজি হলেন?"

ড্রাইভার তার মুখের হাসি আরো বিস্তৃত করে বলল, "জে না। রাজি হই নাই।"

"সে কী!" আমি রেগে উঠে বললাম, "আপনি পঁয়ত্রিশ টাকা চেয়েছিলেন। আমি বললাম, ত্রিশ টাকায় যাবেন? আমার স্পষ্ট মনে আছে আপনি মাথা নাড়লেন।"

স্কুটার ড্রাইভার ভুরু কুঁচকে বলল, "মাথা নেড়েছিলাম?"

"হ্যাঁ।"

স্কুটার ড্রাইভার মুখ গম্ভীর করে তার মাথাটা নেড়ে দেখিয়ে বলল, "এইভাবে?"

"হ্যাঁ। এইভাবে।"

ড্রাইভারের মুখের গাম্ভীর্য সরে সেখানে আবার মধুর হাসি ফুটে উঠল। সে তার সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বলল, "সেটা অন্য ব্যাপার।"

"অন্য কী ব্যাপার?"

"গত রাতে বেকায়দা ঘুম গেছিলাম তাই ঘাড়ে ব্যথা।"

ত্রিশ টাকা ভাড়ার সাথে ঘাড়ে ব্যথার কী সম্পর্ক বুঝতে না পেরে আমি অবাক হয়ে বললাম, "ঘাড়ে ব্যথা?"

"জে। রগে টান পড়েছে। সকালবেলা গরম সরিষার তেলে রসুন দিয়ে মালিশ করেছি। একটু পরে পরে মাথা নাড়ি তখন ঘাড়ের এক্সারসাইজ হয়।"

"তার মানে—তার মানে—" আমি রেগে গিয়ে কথা শেষ করতে পারি না, কিন্তু স্কুটারওয়ালা একেবারেই বিচলিত হয় না। মুখে আরো মধুর হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমি মাথা নাড়লাম ঘাড় ব্যথার কারণে আর আপনি ভাবলেন ত্রিশ টাকায় রাজি হয়েছি! হা-হা-হা-"

আমি হতবুদ্ধি হয়ে স্কুটারওয়ালার দিকে তাকিয়ে রইলাম—ত্রিশ টাকার জায়গায় পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া দিতে আমার যে একেবারে জীবন চলে যাবে তা নয়, কিন্তু কেউ যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না। স্কুটারওয়ালা তার কেনে আঙুলটা কানে ঢুকিয়ে নির্মমভাবে কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আজকাল কি ত্রিশ টাকা স্কুটার ভাড়া আছে? নাই। চাক্কা ঘুরলেই চল্লিশ টাকা। আপনাকে দেখে মনে হল সোজাসিধে মানুষ, তাই মায়া করে বললাম পঁয়ত্রিশ টাকা—"

"মায়া করে বলেছেন পঁয়ত্রিশ টাকা?" আমার নাকি ব্লাড প্রেসার বেশি, ডাক্তার বলেছে রাস্তাঘাটে রাগারাগি না করতে—তাই অনেক কষ্ট করে মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বললাম, "মায়া করে আর কী কী করেন আপনি?"

আমার কথা শুনে মনে হল স্কুটার ড্রাইভারের মুখে একটা গভীর বেদনার ছাপ পড়ল। সে মাথা নেড়ে বলল, "আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না স্যার? আপনার মুখে একটা মাসুম মাসুম ভাব আছে—দেখলেই মায়া হয়। আমার কথা বিশ্বাস না করলে এই আপাকে জিজ্ঞেস করেন।"

স্কুটার ড্রাইভার কোন আপার কথা বলছে দেখার জন্য মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, আমাদের দুইজনের খুব কাছেই শাড়ি পরা একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে কিছুটা মোবাইল ফোন কিছুটা ক্যালকুলেটরের মতো একটা যন্ত্র। সেই মেয়েটি কিংবা মহিলাটি মনে হল খুব মনোযোগ দিয়ে আমার সাথে স্কুটার ড্রাইভারের কথাবার্তা শুনছে। ড্রাইভার তাকে সালিশ মানার পর সে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছে।"

"কী ঠিক বলেছে?" ডাক্তারের কড়া নির্দেশ তাই আমি কিছুতেই গলার স্বর উঁচু করলাম না, "আমার চেহারাটা মাসুম মাসুম সেইটা, নাকি আমার ওপরে মায়া করে সে স্কুটার ভাড়া বেশি নিচ্ছে সেইটা।"

মেয়েটা আমার কথায় উত্তর না দিয়ে বলল, "ইন্টারেস্টিং!"

"কী ইন্টারেস্টিং?"

"আপনি ভাব করছেন যে আপনি রাগেন নি—কিন্তু আসলে আপনি খুব রেগে গেছেন। পাঁচ টাকার জন্য মানুষ এত রাগ করতে পারে আমি জানতাম না।"

আমি গলার স্বর একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা করে বললাম, "আপনি কেমন করে জানেন যে আমি রাগ করছি?"

মেয়েটা কিছুটা মোবাইল ফোন কিছুটা ক্যালকুলেটরের মতো দেখতে যন্ত্রটা আমাকে দেখিয়ে বলল, "আমার ভয়েস সিন্থেসাইজার বলে দিচ্ছে। আজকেই প্রথম ফিল্ড টেস্ট করতে বের করেছি। এক্সেলেন্ট কাজ করছে। এই দেখেন।"

মেয়েটা কী বলছে বুঝতে না পেরে আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটা উৎসাহ নিয়ে বলল, "প্রত্যেকটা মানুষের ভোকাল কর্ডের কিছু ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। মানুষ যখন রেগে যায় তখন কয়েকটা ওভারটোন আসে। এই দেখেন আপনার মেগা ওভারটোন—যার অর্থ আপনি রেগে ফায়ার হয়ে আছেন।"

একজন মানুষ—বিশেষ করে একজন অপরিচিত মেয়েমানুষ যদি একটা যন্ত্র দিয়ে বের করে ফেলে আমি রেগে ফায়ার হয়ে আছি তখন রেগে থাকা ঠিক না—তাই আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম মেজাজটাকে নরম করার জন্য। স্কুটার ড্রাইভার এই সময় আবার তাগাদা দিল, "স্যার, ভাড়াটা দিয়ে দেন আমি যাই।"

মানুষের মেজাজ কতটুকু গরম হয়েছে বের করে ফেলার আজব যন্ত্রটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি হাসি হাসি মুখে বলল, "দিয়ে দেন। ড্রাইভার সত্যি কথাই বলছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কেমন করে জানেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা হাতে ধরে রাখা যন্ত্রটা উঁচু করে বলল, "আমার ভয়েস সিন্থেসাইজারের ফিল্ড টেস্ট হচ্ছে। মিথ্যা কথা বললে হায়ার হারমনিক্স আসে। এই দেখেন ড্রাইভারের গলার স্বরে কোনো হায়ার হারমনিক্স নাই।"

হায়ার হারমনিক্স কী, সেটা না থাকলে কেন মিথ্যা কথা বলা হয় না এই সব নিয়ে অনেক প্রশ্ন করা যেত কিন্তু আমার আর তার সাহস হল না। মানিব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে দিলাম। স্কুটারের ড্রাইভার উদাস উদাস ভাব করে বলল, "ভাংতি নাই স্যার—ভাংতি দেন।"

আমি কী বলতে কী বলে ফেলব আর এই আজব যন্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা সেখান থেকে কী বের করে ফেলবে সেই ভয়ে আমি হাত নেড়ে বললাম, "ঠিক আছে পুরোটাই রেখে দেন।"

ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, "পুরোটাই রেখে দেব?"

"হ্যাঁ।"

স্কুটার ড্রাইভার মুখে খুব অনিচ্ছার একটা ভঙ্গি করে টাকাটা পকেটে রেখে বলল, "আপনি যখন বলছেনই তখন আর কী করা স্যার, রাখতেই হবে। আমি কিন্তু এমনিতে কখনোই এক পয়সা বেশি রাখি না। যত ভাড়া তার থেকে এক পয়সা বেশি নেওয়া হচ্ছে হারাম খাওয়া। হারাম খাওয়া ঠিক না—হারাম খাওয়ার পর সেই হারাম রুজি দিয়ে শরীরের যে অংশে রক্ত–মাংস তৈরি হয় সেই অংশ দোজখের আগুনে পোড়ে শিক–কাবাবের মতো।"

স্কুটার ড্রাইভার দোজখের আগুনের বর্ণনা দিতে দিতে তার স্কুটার স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। ক্যালকুলেটর এবং মোবাইল ফোনের মতো দেখতে যন্ত্রটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি তার যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "এই যে হায়ার হারমনিক্স আসছে! তার মানে এই ব্যাটা মিথ্যা কথা বলেছে! স্কুটারওয়ালা—এই স্কুটারওয়ালা—"

AMARBOI.COM

কিন্তু ততক্ষণে স্কুটার ড্রাইভার তার স্কুটার নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। মেয়েটা রাগ রাগ মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখছেন ব্যাটা ধড়িবাজের কাজটা? ডাটা প্রসেস করতে একটু সময় নেয় তার মাঝে হাওয়া হয়ে গেল। ব্যাটা ফাজিল—"

আমি হাত নেড়ে বললাম, "যাক। পাঁচ টাকাই তো—"

মেয়েটা হাত ঝাঁকিয়ে বলল, "মিথ্যা কথা বলে পাঁচ টাকা কেন পাঁচ পয়সাও নিতে পারবে না।"

আমি একটু ভয়ে ভয়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম, রাগী মহিলাদের আমি খুব ভয় পাই। বিশেষ করে রাগী নারীবাদী মহিলারা খুব ডেঞ্জারাস হয়। ছাত্রজীবনে আমাদের সাথে ডালিয়া নামে একটা মেয়ে পড়ত, তাকে একবার ঢ্যালঢ্যালা ডালিয়া ডেকেছিলাম, সেটা শুনে তার নারীবাদী বান্ধবী আমাকে দেওয়ালে চেপে ধরে পেটে ঘুসি মেরেছিল। ঘুসি খেয়ে বেশি ব্যথা পাই নি কিন্তু পুরো প্রেস্টিজ ধসে গিয়েছিল। মেয়েদের হাতে মার খায় মানুষটা দেখতে কেমন তা দেখার জন্য আর্টস ফ্যাকাল্টি থেকে ছাত্রছাত্রীরা চলে আসত।

মেয়েটা তার যন্ত্রটির দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—আমি চলে যাব না থাকব বুঝতে পারলাম না। কিছু একটা বলার দরকার কিন্তু কী বলব সেটাও বুঝতে পারলাম না। মানুষের সাথে মোটামুটি আমি কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারি কিন্তু মেয়েদের বেলায় খুব সমস্যা হয়। অপরিচিত মানুষের সাথে কথা বলার জন্য তার বয়সটা জানলে খুব সুবিধা হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মেয়েদের বয়স আন্দাজ করা খুব কঠিন। একবার একটা পার্টিতে একটা মেয়ের থুতনি ধরে আদর করে বলেছিলাম, "খুকি তুমি কোন ক্লাসে পড়?" মেয়েটা ঝটকা মেরে আমার হাত সরিয়ে বলেছিল, "ফাজলেমি করেন? আমি ইউনিভার্সিটির টিচার।" শুনে আমার একেবারে হার্টফেল করার অবস্থা। একেবারে দুধের শিশুদের ইউনিভার্সিটির টিচার বানালে সেই ইউনিভার্সিটিতে কি পড়াশোনা হতে পারে? আরেকবার এক বাসায় গিয়ে মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলাকে বললাম, "আন্টি, আংকেল কি বাসায় আছেন?" সেই ভদ্রমহিলা ভ্যা করে কেঁদে দিল, বলল, "এঁ্যা এঁ্যা—আমি মাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ি—আমাকে এই মানুষটা আন্টি ডাকে! এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা—" সেই থেকে আমি কখনোই কোনো মেয়ের বয়স আন্দাজ করে বের করার চেষ্টা করি না। এখানেও এই মহিলার কিংবা মেয়ের বয়স কত অনুমান করার কোনো চেষ্টা না করে, শুধুমাত্র আলাপ চালানোর জন্য বললাম, "খুব মজার যন্ত্র। তাই না?"

মেয়েটা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "হুঁ।"

আমি গলার স্বরে একটা দার্শনিকতার ভাব এনে বললাম, "বিজ্ঞানের কত উন্নতি হয়েছে—একটা যন্ত্র দিয়ে মনের অনুভূতি বের করে ফেলা যায়। কী আশ্চর্য!"

মেয়েটা আবার বলল, "হুঁ।"

"বিদেশ থেকে এনেছেন বুঝি যন্ত্রটা? কত খরচ পড়েছে?"

মেয়েটা আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল, তারপর বুকে থাবা দিয়ে বলল, "এইটা আমি তৈরি করেছি।"

আমি চমকে উঠলাম, বলে কী মেয়েটা! আবার ভালো করে তাকালাম মেয়েটার দিকে, আমার সাথে ঠাট্টা করছে নাকি? মেয়েটার চোখে-মুখে অবিশ্যি ঠাট্টার কোনো চিহ্ন নেই—বলা যেতে পারে এক ধরনের রাগের চিহ্ন আছে। আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, "কী হল? আমার কথা বিশ্বাস হল না?"

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললাম, "না-না বিশ্বাস হবে না কেন? অবশ্যই বিশ্বাস হয়েছে।"

"তা হলে এরকম চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছেন কেন?"

"চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছি নাকি?" আমি চোখগুলো ছোট করার চেষ্টা করে এমন একটা ভান করার চেষ্টা করতে লাগলাম যেন রাস্তাঘাটে এরকম খ্যাপা টাইপের একটা মেয়ে যে নাকি ভয়ংকর যন্ত্রপাতি তৈরি করে তার সাথে দেখা হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

মেয়েটা বলল, "হ্যাঁ, আপনি চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছেন। আপনি মনে মনে কী ভাবছেন সেটাও আমি জানি।"

"কী ভাবছি?"

"আপনি ভাবছেন এই মেয়েটা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছে। মেয়েরা কি আবার কখনো সায়েন্টিস্ট হতে পারে? সায়েন্টিস্ট হবে ছেলেরা। তাদের মাথায় হবে উসকোখুসকো চুল, তাদের থাকবে কাঁচা-পাকা বড় বড় গোঁফ। তারা হবে আপনভোলা। তাদের চোখে থাকবে বড় বড় চশমা, তারা ঠিকমতো নাওয়া-খাওয়া করবে না, ভুশভুশে কাপড় পরে উদাস উদাস চোখে তারা ঘুরে বেড়াবে। ঠিক বলেছি কি না?"

আমি বললাম, "না, মানে ইয়ে—বলছিলাম কী—মানে ইয়ে—"

ঠিক তখন পাশে একটা শোরগোল শুরু হল, দেখলাম একজন লিকলিকে শুকনো মানুষ একজন ইয়া মুশকো জোয়ান মানুষের কলার ধরে রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে আনছে, দুইজনই চিৎকার করে হাত-পা নাড়ছে যেন পারলে একজন আরেকজনকে খুন করে

ফেলবে। খ্যাপা টাইপের মেয়েটি তার হাতের যন্ত্রটি সেদিকে উঁচু করে ধরল এবং আমি দেখতে পেলাম শোরগোল শুনে মেয়েটির চোখ উত্তেজনায় চকচক করতে শুরু করেছে। তার ভেতরে সে আমার দিকে আঙুল তুলে বলল, "কিন্তু আপনি ভুল। ভুল ভুল ভুল। ছেলেরা যে কাজ পারে মেয়েরাও সেই কাজ পারে। বরং আরো ভালো করে পারে। মেয়েরা প্রাইম মিনিস্টার হতে পারে, ডাকাতও হতে পারে। মেয়েরা হাউজ ওয়াইফ হতে পারে আবার পকেটমারও হতে পারে। ডাক্তারও হতে পারে মার্ডারারও হতে পারে। এস্ট্রোনট হতে পারে, সন্ত্রাসীও হতে পারে। মেয়েরা স্টুপিড হতে পারে আবার সায়েন্টিস্টও হতে পারে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে নিজের চোখে দেখেন—"

বলে মেয়েটা তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কার্ড বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার তার যন্ত্রের দিকে তাকাল। পাশে শোরগোল তখন আরো জমে উঠেছে, মানুষ দুইজন তখন হাতাহাতি প্রায় শুরু করে দিয়েছে, তাদের ঘিরে বেশ একটা ভিড় জমে উঠেছে। মেয়েটা তার মাঝে ঠেলেঠুলে তার যন্ত্র নিয়ে ঢুকে গেল, মনে হয় যখন কেউ মারামারি শুরু করে তখন তাদের গলার স্বরে কী রকম ওভারটোন হয় সেটা ফিল্ড টেস্ট করতে চায়।

মানুষের ভিড়ের সাথে মিশে গিয়ে মেয়েটা যখন চলে গেল তখন আমি তার কার্ডটার দিকে তাকালাম। ভেবেছিলাম সেখানে তার নাম ঠিকানা টেলিফোন এইসব থাকবে কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম সেখানে কিছু ইংরেজি অক্ষর লেখা। অনেকগুলো ডাব্লিউ, অনেকগুলো ফুলস্টপ এবং পড়তে গেলে দাঁত ভেঙে যাবার অবস্থা। এটা কি কোনো সাংকেতিক নাম-ঠিকানা আমার যেটা রহস্যভেদ করতে হবে? মেয়েটা কি আমার বুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে? আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। কী করব বুঝতে না পেরে আমি কার্ডটা আমার পকেটে রেখে দিলাম।

আমার যখন টাকাপয়সা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় তখন আমি আমার অর্থনীতিবিদ এক বন্ধুর সাথে কথা বলি, যখন রোগশোকের কোনো ব্যাপার হয় তখন কথা বলি এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে, রান্নাবান্না এবং খাওয়াদাওয়া নিয়ে কথা বলতে হলে আমি আমার ছোট খালার সাথে কথা বলি, ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি রাজাকার টাইপের এক মৌলবাদী বন্ধুকে ফোন করি (সে যেটা বলে ধরে নেই তার উল্টোটা হচ্ছে সত্যি) এবং বুদ্ধি সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার থাকলে আমি আমার ভাগ্নে বিল্টুর সাথে কথা বলি। আজকালকার যে কোনো বাচ্চার বুদ্ধি আমাদের থেকে অনেক বেশি আর বিল্টু তাদের মাঝেও এককাঠি সরেস। আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসে একবার দেখে বাথরুমে সিংক থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে সে চোখের পলকে মুখ থেকে চিউয়িংগাম বের করে সিংকের ফুটো সেরে দিয়েছিল। দুটো কাগজ ক্লিপ করার জন্য স্ট্যাপলার খুঁজে পাচ্ছি না, সে চিউয়িংগাম দিয়ে দুটো কাগজ লাগিয়ে দিল। একবার তার সমবয়সি একজনের সাথে ঝগড়া হয়েছে তখন পিছন থেকে বিল্টু তার চুলে চিউয়িংগাম লাগিয়ে দিল। চাঁদির কাছাকাছি প্রায় ছয় ইঞ্চি জায়গা কামিয়ে সেই চিউয়িংগাম সরাতে হয়েছিল। শুধুমাত্র চিউয়িংগাম দিয়েই সে এত কাজ করতে পারে—পৃথিবীর অন্য সব জিনিসের কথা ছেড়েই দিলাম। এখন তার বয়স বারো। যখন সে বড় হবে তখন কী কী করবে চিন্তা করেই আমি মাঝে মাঝে আনন্দে এবং বেশিরভাগ সময়ে আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠি।

কাজেই মগবাজারের মোড়ে সেই খ্যাপা মহিলার দেওয়া কার্ডটির কোনো মর্ম উদ্ধার করতে না পেরে আমি একদিন বিল্টুর কাছে হাজির হলাম। সে একটা কম্পিউটারের সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে বসে কী একটা টাইপ করছে এবং মুচকি মুচকি হাসছে। বিল্টু যখন মুচকি মুচকি হাসে তখন আমি খুব ভয় পাই। তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে বিল্টু? তুই এরকম ফ্যাকফ্যাক করে হাসছিস কেন?"

"আরাফাতের কাছে একটা ভাইরাস পাঠালাম। এক নম্বরি ভাইরাস—হার্ড ড্রাইভ ক্র্যাশ করে দিবে।"

সে কী বলছে তার কোনো মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারলাম না। শুধুমাত্র তার মুখের হাসিটি দেখে বুঝতে পারলাম কাজটা ভালো হতে পারে না। তাই মুখে মামাসুলভ একটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললাম, "কাজটা ঠিক হল না।"

বিল্টু আমার দিকে না তাকিয়ে কম্পিউটারে কিছু একটা টাইপ করতে করতে বলল, "তুমি এসব বুঝবে না মামা।"

"কেন বুঝব না? আমাকে কি গাধা পেয়েছিস নাকি?"

বিল্টু আমার কথার উত্তর না দিয়ে কম্পিউটারে টাইপ করতে লাগল, ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট—আমাকে সে গাধাই মনে করে। আমি তাকে আর না ঘাঁটিয়ে পকেট থেকে সেই কার্ডটা বের করে তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এইটা কী জানিস?"

বিল্টু কম্পিউটারে টাইপ করতে করতে চোখের কোনা দিয়ে একবার কার্ডটার দিকে তাকাল, কিন্তু কোনো কথা বলল না। আমি একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, "কী হল? কিছু বলছিস না কেন?"

বিল্টু তবুও কথার উত্তর না দিয়ে কম্পিউটারে খুটখাট করতে থাকে—এই যন্ত্রটা মনে হয় আসলেই শয়তানের বাক্স। বিল্টু ছেলেটা দুষ্টু এবং পাজি ছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে দুষ্টু, পাজি এবং বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে। আমি তার মেজো মামা—তাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, সে সেই কথাটার উত্তর পর্যন্ত দিচ্ছে না। কানে ধরে একটা রদ্দা দিলে মনে হয় সিধে হয়ে যাবে। কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েদের কানে ধরে রদ্দা দেওয়া যায় না। আমি নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "কী হল? কথা কানে যায় না? একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দিবি না?"

বিল্টু তার কম্পিউটারে খুটখাট বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মামা, তুমি যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করেছ তার উত্তর দিলে তুমি বুঝবে না।"

"আমি বুঝব না?"

বিল্টু মাথা নাড়ল, "না। তুমি কিছু জান না, বোঝ না—শুধু ভান কর যে সবকিছু জান আর বোঝ।"

আমি রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, বিল্টু তার সুযোগ দিল না, বলল, "তোমার কার্ডে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে একটা ইন্টারনেট ওয়েবসাইটের ইউ. আর. এল। তুমি কিছু বুঝলে?"

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "না, মানে ইয়ে—"

"তার মানে তুমি বোঝ নাই।"

"তাই বলে তুই বলবি না?"

"আমি ভাবছিলাম তোমাকে দেখিয়ে দিই।"

"কীভাবে দেখাবি?"

"সেটাও তুমি বুঝবে না। তার চাইতে তুমি মেজাজ গরম না করে দাঁড়িয়ে থাক—এক্ষুনি কম্পিউটারে এসে যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ক-কম্পিউটারে এসে যাবে?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "কোথা থেকে আসবে? কেমন করে আসবে?"

বিল্টু হতাশভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি বুঝবে না মামা, শুধু শুধু চেষ্টা করে লাভ নাই।"

কম্পিউটারে হঠাৎ করে কিছু ছবি চলে এল আমি অবাক হয়ে দেখলাম একটি ছবি হচ্ছে সেই খ্যাপা মেয়েটির, বিদঘুটে একটা যন্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, "এখানে কোথা থেকে এল এই মেয়ে? কী আশ্চর্য!"

বিল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "মামা তুমি পরে আশ্চর্য হয়ো। এখন যেটা দেখার দেখে নাও। গত মাসে আমার ইন্টারনেট বিল কত হয়েছিল জান?"

ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিলের কথা শুনেছি কিন্তু ইন্টারনেট বিল আবার কী জিনিস? কম্পিউটারে আরো ছবি আর লেখা বের হতে থাকে। কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়ব বুঝতে পারছি না। বিল্টু বলল, "তাড়াতাড়ি মামা। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "তাড়াতাড়ি করাবি না তো? আমি তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারি না।"

"সেটা আমি জানি। তুমি হচ্ছ আমাদের ঢিলেঢালা মামা।"

"ফাজলেমি করবি না।"

"তার চাইতে বলো তুমি কী চাও—আমি বের করে দিই।"

আমি বিদঘুটে যন্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখিয়ে বললাম, "এই যে দেখছিস মেয়েটা—এই মেয়ে হচ্ছে একজন খ্যাপা সায়েন্টিস্ট। এই মেয়ের নাম ঠিকানা টেলিফোন নাম্বারটা দরকার।"

"সেটা আগে বলবে তো!" বিল্টু তার কম্পিউটারে খুটখাট করতে করতে বলল, "তুমি হচ্ছ পুরান মডেলের মানুষ—সেই জন্য তোমার নাম-ঠিকানা দরকার! আজকাল মানুষ আর নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে না।"

"তা হলে কী ব্যবহার করে?"

"ই-মেইল।"

আমি হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "আমার ই-মেইল উ-মেইলের দরকার নেই—আমার দরকার নাম-ঠিকানা।"

"ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে—" বলে বিল্টু একটা কাগজে কিছু একটা লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে তোমার নাম-ঠিকানা। তুমি এখন বিদায় হও মামা। তুমি বড় ডিস্টার্ব কর।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মামাদের পিছনে ঘোরাঘুরি করতাম। তারা মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে বলতেন, "ভাগ এখান থেকে, ডিস্টার্ব করবি না।" এখন আমার ভাগ্নে আমাকে বলে তাকে ডিস্টার্ব না করতে! আস্তে আস্তে দুনিয়াটা কী হয়ে যাচ্ছে?

বাসাটা খুঁজে বের করতে আমার কালো ঘাম ছুটে গেল, যারা বাসার নম্বর দেয় তারা নিশ্চয়ই গুনতে জানে না। গুনতে জানলে কি কখনো বাহাত্তরের পর ছেচল্লিশ তারপর উনআশি হতে পারে? বাসাটা কিছুতেই খুঁজে না পেয়ে মোড়ের পান-সিগারেটের দোকানে জিজ্ঞেস করলাম, মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম কোনো লাভ হবে না কিন্তু দেখলাম কমবয়সি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকানদার একবারেই চিনে ফেলল, চোখ বড় বড় করে বলল, "ও সায়রা সাইন্টিষ্টের বাসা?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সায়রা সায়েন্টিস্ট?"

"ও! আপনি জানেন না বুঝি?" মানুষটা তার সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বলল, "আপা হচ্ছেন ওস্তাদ মানুষ। কালা ছগীরকে একদিন কী টাইট না দিলেন!"

"টাইট?"

"জে।" মানুষটা উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করল, "আপার এই রকম একটা যন্ত্র আছে, দেখে মনে হয় মোবাইল টেলিফোন। সেই যন্ত্রে টিপি দিলেই ইলেকটিরিক বের হয়। কালা ছগীর বুঝে নাই, নেশা করবে টাকা নাই, আপার ব্যাগে ধরে দিছে টান।"

"তারপর?"

"আপা বলছে খামোস! তারপর যন্ত্রে দিছে টিপি। ইলেকটিরিক দিয়ে কালা ছগীরের জান শেষ। খালি কাটা মুরগির মতো তড়পায়—" দৃশ্যটা চিন্তা করে মানুষটা আনন্দে হাসতে থাকে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "সেই আপার বাসাটা কোথায়?"

"সোজা চলে যান, তিন বাসা পরে হাতের ডানদিকে দোতলা বাসা, সবুজ রঙের গেইট।" মানুষটা একটা চোখ ছোট করে বলল, "তয় একটা জিনিস সাবধান।"

"কী জিনিস?"

"আপার সাথে কুনু দুই নম্বুরি কাজ করার চেষ্টা করবেন না। করলে কিন্তু—" মানুষটা হাত দিয়ে গলায় পোঁচ দেবার মতো ভঙ্গি করে বুঝিয়ে দিল 'আপা' আমাকে খুন করে ফেলবে।

আমি বললাম, "না, করব না।" কোনো এক নম্বুরি কাজ করারই সাহস পাই না, দুই নম্বুরি কাজ করব কেমন করে—তাও সাধারণ একজন মানুষের সাথে না, খ্যাপা একজন বিজ্ঞানীর সাথে? যে শুধু বিজ্ঞানী না, মহিলা বিজ্ঞানী এবং যে যন্ত্রে টিপ দিয়ে কালা ছগীরকে পর্যন্ত কাবু করে ফেলে!

এবারে বাসাটা খুঁজে পেতে কোনো সমস্যা হল না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপে দিলাম, মনে হল ভেতরে কোথাও একটা বিচিত্র শব্দ হল। আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করি, চাপা একটা ভুটভাট শব্দ হচ্ছে, কিসের শব্দ বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ করে একটা বিকট শব্দ হল এবং সাথে সাথে একটা মেয়ের গলা শুনতে পেলাম, মনে হল রেগে গিয়ে কাউকে বকাবকি করছে। আমি ইতস্তত করে আবার বেলে চাপ দিতেই খুট করে দরজা খুলে গেল, কালিঝুলি মাখা একটি মাথা উঁকি দিয়ে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

মগবাজারের মোড়ের সেই মেয়েটিই, তবে তাকে দেখতে এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে। সেদিন শাড়ি পরেছিল, আজকে পুরুষ মানুষের মতো একটা ওভারওল পরেছে। তার অনেকগুলো পকেট আর সেই পকেট থেকে নানা সাইজের স্ক্রু ড্রাইভার, প্লায়ার্স, রুলার, পেন্সিল, ফ্ল্যাশলাইট, সল্ডারিং আয়রন এইসব বের হয়ে আছে। কোমরে বেল্ট, সেই বেল্ট থেকে একটা বড় হাতুড়ি ঝুলছে। মেয়েটির মাথায় টকটকে লাল রঙের একটা রুমাল বাঁধা, শুধুমাত্র সেটা থাকার কারণেই তাকে দেখতে একটা মেয়ের মতো লাগছে, ঠিক করে বললে বলতে হয় একটা জিপসি মেয়ের মতো। আমি মেয়েটির কালিঝুলি মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে আমতা-আমতা করে বললাম, "আমাকে চিনতে পারছেন? আমি মানে ইয়ে—ঐ যে সেদিন মগবাজারে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, চিনেছি—আসেন, ভেতরে আসেন। আমি তখনই বুঝেছিলাম আপনি আসবেন।"

"কেমন করে বুঝেছিলেন?"

"আপনার চোখ দেখে। আপনার চোখে ছিল অবিশ্বাস। আপনি ভেবেছিলেন আমি মিথ্যে কথা বলছি। তাই আপনি নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলেন। ঠিক বলেছি কি না?"

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললাম—"না-না-না। আপনি একেবারেই ঠিক বলেন নি। আমি আপনাকে কখনোই অবিশ্বাস করি নি। আসলে ইয়ে—মানে সত্যি কথা বলতে কি—"

ঠিক তখন ভিতরে আবার 'ভুশ' করে একটা শব্দ হল এবং আমার মনে হল সারা ঘরে ডালে ফোড়ন দেওয়ার মতো একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। সায়রা মাথা নেড়ে কেমন যেন হতাশ হবার ভঙ্গি করে পা দিয়ে মেঝেতে একটা লাথি দিল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কী হয়েছে?"

"আমার যন্ত্রটার সেফটি ভাল্ব কাজ করছে না, একটু প্রেসার বিল্ড আপ করলেই লিক করছে। গন্ধ পাচ্ছেন না?"

আমি মাথা নাড়লাম, ইতস্তত করে বললাম, "কিন্তু গন্ধটা তো কেমন যেন ডালে ফোড়ন দেওয়ার মতো—"

"হ্যাঁ, এটা ডাল রান্না করার মেশিন।"

"ডাল রান্না করার মেশিন?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "ডাল রান্না করতে মেশিন লাগে?"

"ব্যবহার করলেই লাগে।" সায়রা কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এবারে লেকচার শুরু করে দেন—মেয়েরা কিছু পারে না, তাদের চিন্তাভাবনা রান্নাঘরের বাইরে যেতে পারে না—হ্যানো তেনো—"

আমি হাত নেড়ে বললাম, "না-না, এটা আপনি কী বলছেন! আমি সেটা কেন বলব? তবে—"

"তবে কী?"

"এত জিনিস থাকতে আপনার ডাল রাঁধার মেশিন তৈরি করার আইডিয়া কেমন করে হল?"

"সেটা আপনারা বুঝবেন না।"

"চেষ্টা করে দেখেন, বুঝতেও তো পারি।"

"আপনারা—পুরুষ মানুষেরা মেয়েদেরকে রান্নাঘরে আটকে রাখতে চান। ভাত রাঁধ, ডাল রাঁধ, মাছ মাংস সবজি রাঁধ—আপনাদের ধারণা রান্নাবান্না করাই আমাদের একমাত্র কাজ। সেজন্য আমি রান্না করার মেশিন তৈরি করছি।"

"রান্না করার মেশিন?"

"হ্যাঁ। ডাল দিয়ে শুরু করেছি। আস্তে আস্তে সবকিছু হবে। সকালে উঠে সুইচ টিপে দেবেন, দুপুর বেলা সবকিছু রান্না হয়ে যাবে। ভাত ডাল মাছ মাংস। মেয়েদের তখন রান্নাঘরে আটকা থাকতে হবে না।"

আমি মাথা চুলকালাম, যুক্তিটার মাঝে কিছু গোলমাল আছে মনে হল কিন্তু এখন সেটা নিয়ে কথা বলা মনে হয় ঠিক হবে না। আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি আসলে এসেছিলাম—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, কী বলছিলেন যেন?"

"আসলে ইন্টারেস্টিং মানুষ দেখতে, তাদের সাথে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে বোরিং। খায়-দায়, চাকরি করে আর ঘুমায়।"

"আমি ইন্টারেস্টিং?"

"অবিশ্যি। ডাল রান্না করার মেশিন আবিষ্কার করছে সেরকম মানুষ বাংলাদেশে কতজন আছে?"

সায়রা মুখটা গম্ভীর করে বলল, "আমি ভেবেছিলাম কাজটা সহজ হবে। কিন্তু আসলে মহা কঠিন। টেম্পারেচার ঠিক হওয়ার আগে যদি ডাল ঢেলে দেওয়া হয়—" কথা শেষ হবার আগেই আবার ভুশ করে একটা শব্দ হল এবং এবারে সাথে সাথে সারা ঘরে একটা পোড়া ডালের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "একটু দাঁড়ান। মেশিনটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।"

"আমি আসি আপনার সাথে?"

"আসবেন? আসেন।"

আমি সায়রার পিছু পিছু গেলাম, বড় একটা ঘরের মাঝামাঝি বিশাল একটা যন্ত্র। নানারকম পাইপ বের হয়ে আছে। মাঝখানে নানারকম আলো জ্বলছে এবং নিবছে। স্বচ্ছ একটা জায়গায় হলুদ রঙের কিছু একটা ভুটভাট করে ফুটছে। একপাশে একটা টিউব দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কিছু একটা বের হচ্ছে। সায়রা কোথায় টিপে ধরতেই নানা রকম শব্দ করে যন্ত্রটা থেমে গেল এবং ঘরের মাঝে এক ধরনের নৈঃশব্দ্য নেমে এল। ঠিক তখন মনে হল কে যেন খিকখিক করে হাসছে। সায়রা পিছনে ফিরে ধমক দিয়ে বলল, "খবরদার হাসবি না এরকম করে।" সাথে সাথে হাসির শব্দ থেমে গেল। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালাম, কেউ নেই ঘরে, কার সাথে কথা বলছে মেয়েটি?

আমি সায়রার দিকে তাকিয়ে বললাম, "কার সাথে কথা বলছেন?"

সায়রা মনে হল আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে চাইছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করে বলল, "জরিনির সাথে।"

"জরিনি? জরিনি কে?"

"ইঁদুর। ঐ যে দেখেন—"

আমি পিছনে তাকিয়ে দেখি একটি ছোট খাঁচা এবং সেখানে একটা ছোট নেংটি ইঁদুর ঠিক মানুষের মতো দুই হাত বুকে ভাঁজ করে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কানে দুল এবং গলায় মালা। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে হল ইঁদুরটার মুখে ফিচলে এক ধরনের হাসি। আমি অবাক হয়ে জরিনির দিকে তাকিয়ে বললাম, "এই ইঁদুরটা হাসছিল? ইঁদুর মানুষের মতো হাসতে পারে?"

"পারে না।" জরিনি মাথা নাড়ল, "ইঁদুরের ভোকাল কর্ড ছোট, শব্দ বের হয় অন্যরকম।"

"কিন্তু আমি যে হাসতে শুনলাম?"

"হাসির শব্দ টেপ করা আছে। যখন হাসার ইচ্ছে করে তখন সুইচ টিপে দেয়। বেটি মহা ফাজিল হয়েছে। যখনই আমার কিছু একটা গোলমাল হয় তখন ফ্যাকফ্যাক করে হাসে।"

আমি অবাক হয়ে সায়রার দিকে তাকালাম, কী বলছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ করে মনে হতে থাকে মেয়েটার হয়তো একটু মাথা খারাপ। সায়রা আমার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা দেখে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, "মানুষ একটা জিনিস বিশ্বাস করে কিংবা অবিশ্বাস করে কথাটা বোঝার পর। আপনি কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সায়রা মাথা নাড়ল, বলল, "বোঝার কথা না!"

"একটু বুঝিয়ে দেন।"

সায়রা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি আবার কাউকে বলে দেবেন না তো?"

"আপনি না করলে বলব না। কিন্তু মানুষকে বলার জন্য এর চাইতে মজার গল্প আর কী হতে পারে?"

"যত মজারই হোক আপনি কাউকে বলবেন না।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "ঠিক আছে বলব না।"

সায়রা ইঁদুরটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই যে ইঁদুরটা দেখছেন, এটার আই কিউ একশ বিশের কাছাকাছি। যার অর্থ এর বুদ্ধি আমাদের দেশের মন্ত্রীদের থেকে বেশি। আপনি বলতে পারেন সেটা খুব বেশি না—কিন্তু একটা ইঁদুরের জন্য সেটা অনেক। এটা অনেক শব্দ বুঝতে পারে—কথা বলতে পারে না কিন্তু সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে মোটামুটি বুঝিয়ে দিতে পারে। আমি মোটামুটি কিছু শব্দ তৈরি করে মাইক্রো সুইচে সাজিয়ে দেব বলে ঠিক করেছিলাম কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হবে না।"

"কেন?"

"ছেমড়ি মহা ফাজিল। খাবার দিতে একটু দেরি হলেই ধমকাধমকি শুরু করে দেয়!"

আমি ঢোক গিলে বললাম, 'তাজ্জবের ব্যাপার! কোথায় পেলেন এই চিজ?"

সায়রা আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "পাব আবার কোথায়? আমি তৈরি করেছি।"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "তৈরি করেছেন? ইঁদুর তৈরি করা যায়?"

"ইঁদুর তৈরি করি নি। ইঁদুর তো ইঁদুরই—সেটা আবার তৈরি করে কেমন করে! এর বুদ্ধিটা তৈরি করেছি।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "কেমন করে তৈরি করলেন?"

"সেটা অনেক লম্বা ইতিহাস।" সায়রা সেই ইতিহাসের সমান লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বলতে পারেন, এটা হচ্ছে দ্রুত এবং নিয়ন্ত্রিত বিবর্তন। বিবর্তন কী জানেন তো?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "একটু একটু জানি।"

"একটু জানলেই হবে। পৃথিবীর যত প্রাণী আছে, যত জীবজন্তু আছে সবার মিউটেশন হয়। নানা কারণে সেই মিউটেশন হতে পারে—রেডিয়েশন, এনভায়রনমেন্ট বা অন্যান্য ব্যাপার। সেই মিউটেশনের কারণে কোনো কোনো প্রাণী হয় ভালো—কোনো কোনোটা হয় খারাপ। যেটা খারাপ হয় সেটা টিকে থাকতে পারে না—যেটা ভালো সেটা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকতে পারে। এভাবে বিবর্তন এগিয়ে যায়—ধীরে ধীরে জীবজন্তু পরিবর্তন হয়। সেটা হতে লক্ষ বছর লেগে যায়।"

সায়রা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি এই বিবর্তনের ব্যাপারটার মাঝে দুটো জিনিস করেছি। এক : মিউটেশনের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর না করে হালকা ডোজ রেডিয়েশন দেওয়া শুরু করেছি এবং দুই : বেছে বেছে যারা সুপিরিয়র তাদের রিপ্রোডিউস করেছি। রেডিয়েশনের জন্য একটা খুব হালকা সিজিয়াম ওয়ান থার্টি এইট সোর্স ব্যবহার করেছি।" সায়রা থেমে গিয়ে বলল, "কাউকে বলে দেবেন না যেন!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, "সেটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না—কী বলছেন সেটার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝি নি। সিজি আম আর ফজলি আমের মাঝে কী পার্থক্য সেটাও আমি জানি না।"

সায়রা বিজ্ঞানীদের খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে বিরক্ত হয়ে বলল, "এটা কোনো আম না। এটা হচ্ছে এক ধরনের এলিমেন্ট। সিজিয়াম। আর সিজিয়াম ওয়ান থার্টি এইট হচ্ছে রেডিও একটিভ এলিমেন্ট। যাই হোক যেটা বলছিলাম, রেডিয়েশন দিয়ে মিউটেশন করে আমি অনেকগুলো ইঁদুরের বাচ্চা দিয়ে কাজ শুরু করলাম। সবগুলোকে একটা খাঁচায় রেখে তাদের একটা বুদ্ধির পরীক্ষার মাঝে ফেলে দিলাম। যে ইঁদুর একটা ছোট বলকে ঠেলে একটা গোল গর্তের মাঝে ফেলতে পারবে সে ভালো খাবার পাবে। বেশিরভাগই বুদ্ধির পরীক্ষায় ফেল করল—যারা পাস করল তাদের নিয়ে ইঁদুরের সংসার শুরু হল। আবার লো-ডোজ রেডিয়েশন, আবার বাচ্চাকাচ্চা এবং বাচ্চাকাচ্চার ওপর আবার নতুন করে বুদ্ধির পরীক্ষা, এবার পরীক্ষা আগের থেকেও কঠিন। ছোট একটা ত্রিভুজকে তিনকোনা একটা গর্তে ফেলতে হবে আর ছোট একটা চতুর্ভুজকে চারকোনা একটি গর্তে ফেলতে হবে!"

সায়রা নিশ্বাস নেবার জন্য একটু থামতেই আমি বললাম, "ইঁদুরে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বুঝতে পারে? আমিই তো পারি না।"

সায়রা গলা নামিয়ে বলল, "আস্তে আস্তে বলেন। জরিনি বেটি শুনতে পেলে দেমাগে মাটিতে পা পড়বে না! যাই হোক যেটা বলছিলাম, বুদ্ধির পরীক্ষায় এবারে যেগুলো পাস করল আবার সেগুলোকে নিয়ে নতুন ইঁদুরের সংসার। আবার তাদেরকে নতুন রেডিয়েশন ডোজ—নতুন মিউটেশন নতুন বুদ্ধির পরীক্ষা! বুঝতে পেরেছেন?"

যারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে তারা বিশ্বাস নাও করতে পারে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি টেকনিকটা বুঝে গেলাম। চোখ বড় বড় করে বললাম, "এভাবে অনেকবার করে ইঁদুরদের আইনস্টাইনকে বের করে ফেলেছেন?"

মেয়েটি ফিক করে হেসে বলল, "বলতে পারেন ইঁদুরদের আইনস্টাইন। শুধু একটা সমস্যা—"

"কী সমস্যা?"

"বুদ্ধির পরীক্ষা যখন কঠিন থেকে কঠিন হতে লাগল তখন পরীক্ষায় পাস করতে লাগল অল্প অল্প ইঁদুর। সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় পাস করেছে মাত্র একটা ইঁদুরী।"

"ইঁদুরী?"

"হ্যাঁ। মানে মেয়ে ইঁদুর। তার সাথে সংসার করবে সেরকম বুদ্ধিমান ছেলে ইঁদুর আর পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আমি আর আগাতে পারছি না। একটা মেয়ে ইঁদুরী নিয়ে বসে আছি। সেই ইঁদুরী মহা ফাজিল, আমার সাথে এমন সব কাণ্ড করে সেটা আর বলার মতো নয়!"

কী কাণ্ড করে সেটা না বলে মেয়েটা খুব একটা হতাশার ভঙ্গি করে মাথা নাড়তে লাগল। আমি এবারে ইঁদুরের খাঁচাটার দিকে এগিয়ে গেলাম, ছোট একটা নেংটি ইঁদুর দুই হাত বুকে ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে তড়াক করে ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানে ছোট একটা ঘরের মতো, তার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে টুক করে লাইট জ্বালিয়ে দিল। একটু পরে শুনলাম ভিতর থেকে একটা হিন্দি গানের সুর ভেসে আসছে, "লটপট লটপট সাইয়া সাইয়া কাহা…।"

সায়রা আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আপনাকে নতুন মানুষ দেখেছে তো তাই একটু রঙ দেখাচ্ছে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, হঠাৎ করে অন্য পাশ দিয়ে একটা দরজা খুলে গেল আর একটা খেলনা গাড়িতে করে ইঁদুরটা বের হয়ে এল—খাঁচার চারপাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সেটা আবার ভেতরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। হিন্দি গান বন্ধ হয়ে এবারে ইংরেজি গান শুরু হয়ে গেল। সায়রা বলল, "চলেন এখান থেকে যাই। আপনি যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ এই বেটি ঢং করতেই থাকবে!"

আমি বললাম, "কানে দুল পরেছে। গলায় মালা?"

"কানের দুলটি আমি পরিয়েছি—ওটা আসলে একটা মাইক্রোওয়েভ ট্র্যাকিং ডিভাইস। মালাটা নিজেই পরেছে। চলেন বের হই।"

আমি একেবারে হতবাক হয়ে মেয়েটার পিছু পিছু বের হয়ে এলাম, নিজের চোখে না দেখলে এটা বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! একটা ইঁদুরকে যদি এরকম বুদ্ধিমান করে ফেলা যায় তা হলে মানুষকে কী করে ফেলা যাবে?

সায়রা সায়েন্টিস্টের বাসা থেকে আমি সন্ধেবেলা ফিরে এলাম। আসার আগে আমি আমার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললাম, যদি জরিনিকে নিয়ে কিংবা অন্য কোনো কিছু নিয়ে কিছু একটা ঘটে আমাকে জানাতে। সায়রা আমার কাছে জানতে চাইল আমার ই-মেইল অ্যাড্রেস কী—শব্দটা বিল্টুর কাছে শুনেছি কিন্তু ব্যাপারটা কী আমি সেটাই জানি না। তাই আমতা-আমতা করে বললাম যে, খোঁজখবর নিয়ে তাকে নিশ্চয়ই জানাব।

AMARBOI.COM

আমার জটিল সমস্যা হলে আমি বিল্টুর কাছে যাই, কাজেই এবারেও আমি বিল্টুর কাছে হাজির হলাম—এবারেও দেখি সে কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। আমাকে দেখে তার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হওয়ার বদলে কেমন যেন ফিউজড্ বাল্বের মতো নিবে গেল। শুধু তাই নয়, মুখটা প্যাঁচার মতো করে বলল, "মামা, তুমি আবার এসেছ?"

আমি একটু রেগে উঠে বললাম, "তোরা এমন হয়েছিস কেন? আমরা যখন ছোট ছিলাম মামারা এলে কত খুশি হতাম, তোরা আমাদের দেখলেই মুখটা ব্যাজার করে ফেলিস!"

"তোমাদের মামারা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে অনেক মজার মজার জিনিস করত—তোমরা শুধু সমস্যা নিয়ে আস। বলো এখন তোমার কী সমস্যা।"

আমি ভাবলাম বলি যে কোনো সমস্যা নেই, এমনিতে তাকে দেখতে এসেছি। কিন্তু সেটা বলে আরো সমস্যায় পড়ে যাব। তাই সত্যি কথাটাই বললাম, "ঠিক আছে যা। তোর কাছে আর সমস্যা নিয়ে আসব না। এই শেষ।"

"বলো।"

"ই-মেইল জিনিসটা কী? তার অ্যাড্রেস কেমন করে পেতে হয়?"

বিল্টু এমন ভাব করতে লাগল যেন আমার কথা শুনতেই পায় নি, কম্পিউটারে খুটখুট করতে থাকে। আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, "শুনেছিস আমার কথা?"

"শুনছি। বলে যাও।"

"আর এই জিনিসটার নাম ই-মেইল কেন? এটাকে অ-মেইল বা আ-মেইল না বলে ই-মেইল কেন বলে?"

বিল্টু কম্পিউটারে খুটখুট করতে থাকে। আমি মাথা চুলকে বললাম, "এইটা কি রেলওয়ের ব্যাপার? কোনো মেইল ট্রেনের সাথে যোগাযোগ আছে? কোনো স্টেশনের ঠিকানা? তা হলে স্টেশনটা কোথায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিল্টু চোখের কোনা দিয়ে একবার আমাকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ছিমছাম পরিষ্কার মহিলারা তেলাপোকা দেখলে মুখটা যেরকম করে, তার মুখটা হল অনেকটা সেরকম। আমি বললাম, "কী হল? মুখটা এরকম প্যাঁচার মতো করছিস কেন?"

"আমার অনুরোধ তুমি এইসব ব্যাপার নিয়ে কখনো কারো সাথে কথা বলবে না। আর যদি বলতেই চাও, খবরদার কোনোভাবে বলবে না তুমি আমার মামা। যদি বলো—"

আমি গরম হয়ে বললাম, "যদি বলি?"

"যদি বলো তা হলে আমার সুইসাইড করতে হবে। তুমি কি চাও তোমার একটা ভাগনে মাত্র বারো বছর বয়সে সুইসাইড করে ফেলুক?'

"কেন? তোকে সুইসাইড করতে হবে কেন?"

"যে মামা মনে করে ই-মেইল একটা মেইল ট্রেন তার ভাগনেদের সুইসাইডই করা উচিত।" বিল্টু আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, "মামা, তুমি কি আফগানিস্তানে থাক? কোনোদিন পত্রিকা পড় না? রাস্তাঘাটে হাঁট না? দুনিয়ার খবর রাখে এরকম একজন মানুষকেও চিনো না? তোমার হয়েছেটা কী?"

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, "দেখ, বেশি পাকামো করবি না। একটা জিনিস জিজ্ঞেস করেছি জানলে বল, না জানলে সোজাসুজি বলে দে জানি না। এত ধানাইপানাই কিসের?"

"মামা। আমি মোটেই ধানাইপানাই করছি না। ধানাইপানাই করছ তুমি। যাই হোক—তোমার সাথে কথা বলা হচ্ছে সময় নষ্ট করা। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি কম্পিউটার কয় রকম, তুমি কী বলবে জান?"

"কী বলব?"

"তুমি বলবে দুই রকম। এক রকম হচ্ছে কম-পিউটার আরেক রকম হচ্ছে বেশি-পিউটার।" কথা শেষ করে বিল্টু খুব একটা রসিকতা করে ফেলেছে এরকম ভান করে দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে লাগল।

আমার এমন রাগ হল সেটা আর বলার মতো নয়, ইচ্ছে হল ঘাড়ে ধরে একটা দাবড়ানি দেই। আজকালকার ছেলেপিলেরা শুধু যে ফাজিল হয়েছে তা নয়, বড়দের মানসম্মান রেখেও কথা বলতে পারে না। আমি গম্ভীর হয়ে মেঘের মতো গর্জন করে বললাম, "ঠিক আছে। তুই যদি আমাকে বলতে না চাস বলিস না। তুই ভাবছিস আমি এটা অন্য কোনোখান থেকে জানতে পারব না?"

বিল্টু এবারে একটু নরম হয়ে বলল, "আহাহা-মামা, তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে বলছি ই-মেইলটা কী। এটা অ আ ই-এর ই না, এটা ইলেকট্রনিক-এর ই। ই-মেইল হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেইল। অর্থাৎ কাগজে লিখে খামে ভরে স্ট্যাম্প লাগিয়ে চিঠি না পাঠিয়ে কম্পিউটার আর নেটওয়ার্ক দিয়ে যে চিঠি পাঠানো যায় সেটাই হচ্ছে ই-মেইল। ই-মেইল পাওয়ার জন্য আর পাঠানোর জন্য যে ঠিকানা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে ই-মেইল অ্যাড্রেস। এখন বুঝেছ?"

পুরোপুরি বুঝতে পারলাম না কিন্তু তবুও সবকিছু বুঝে ফেলেছি এরকম একটা ভান করে বললাম, "বুঝেছি।"

বিল্টু এক টুকরা কাগজে কুটকুট করে কী একটা লিখে আমাকে দিয়ে বলল, "এই নাও।"

"এটা কী?"

"তোমার ই-মেইল অ্যাড্রেস।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ই-মেইল অ্যাড্রেস? কোথেকে এল?"
"আমি তৈরি করে দিলাম।"
"তুই তৈরি করে দিলি? কখন তৈরি করলি? কেমন করে তৈরি করলি?"
"এই তো এখন। তোমার সাথে কথা বলতে বলতে।"
আমি বিল্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম সে আমার সাথে ঠাট্টা করছে কি না—কিন্তু মুখে ঠাট্টার চিহ্ন নেই, সব সময় মুখে যে ফিচলে হাসি থাকে সেটাও নেই—বেশ গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "তুই কেমন করে তৈরি করে দিলি? তুই কি পোস্টমাস্টার নাকি যে সবাইকে ই-মেইল অ্যাড্রেস তৈরি করে দিবি?"
বিল্টু চোখ উল্টিয়ে বলল, "তোমাকে সেটা বোঝানো খুব কঠিন মামা। চেষ্টা করে লাভ নেই। তুমি ই-মেইল কী জানতে চেয়েছিলে, আমি সেটা তোমাকে বলে দিলাম, একটা তৈরিও করে দিলাম! এখন তুমি সারা পৃথিবীতে যে কোনো মানুষের কাছে ই-মেইল পাঠাতে পারবে আবার সারা পৃথিবীর যে কোনো মানুষের কাছ থেকে ই-মেইল পেতেও পারবে।"
"কত টাকা লাগে ই-মেইল পাঠাতে?"
"কোনো টাকা লাগে না। ফ্রি। ইন্টারনেট থাকলেই পারবে।"
"ফ্রি?" আমার বিশ্বাস হল না, পৃথিবীতে আবার ফ্রি বলে কিছু আছে নাকি! বললাম, "ফ্রি হবে কেমন করে?"
"হ্যাঁ মামা ফ্রি। বিশ্বাস না হলে দেখো একটা ই-মেইল পাঠিয়ে। কোথায় পাঠাবে বলো।"
আমি পকেট থেকে সায়রা সায়েন্টিস্টের সেই কাগজটা বের করে দিলাম, বিল্টু সেখান থেকে দেখে কম্পিউটারে খুটখুট করে কিছু একটা লিখে বলল, "বলো তুমি কী লিখতে চাও।"
আমি বললাম, "যেটা লিখব সেটাই চলে যাবে?"
"হ্যাঁ, ইংরেজিতে লিখতে হবে। বলো।"
আমি কেশে গলা পরিষ্কার করে ইংরেজিতে বললাম, "প্রিয় সায়রা সায়েন্টিস্ট, আমার শুভেচ্ছা নেবেন—"
বিল্টু কিছু না লিখে বসে রইল। আমি বললাম, "লিখছিস না কেন?"
"তুমি আগে বলে শেষ কর।"
"পুরোটা মনে থাকবে তোর?"
"তুমি আগে বলো তো!"
আমি আবার কেশে গলা পরিষ্কার করে ইংরেজিতে বলতে শুরু করলাম, "প্রিয় সায়রা সায়েন্টিস্ট, আমার শুভেচ্ছা নেবেন। আশা করি কুশলেই আছেন। আপনি সেদিন আমার ই-মেইল অ্যাড্রেস জানতে চেয়েছিলেন। শুনে সুখী হবেন যে, আমার একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস হয়েছে। আপনাকে সেই অ্যাড্রেস থেকে একটি ই-মেইল পাঠাচ্ছি। এটি পেলে আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না। তা হলে আমি বুঝতে পারব আপনি আমার ই-মেইলটি পেয়েছেন। আপনার সুস্বাস্থ্য এবং সাফল্য কামনা করছি। ইতি আপনার গুণমুগ্ধ জাফর ইকবাল।"
বিল্টু খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে খুটখুট করে কিছু একটা লিখে ফেলল। আমি বললাম, "কী লিখেছিস?"
"তুমি যেটা বলেছ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি তো কত কী বললাম—তুই তো লিখেছিস মাত্র একটা শব্দ। আমি কি তোকে একটা শব্দ বলেছি?"

বিল্টু আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "মামা, এটা ফ্রি সেই জন্য তোমাকে উপন্যাস লিখতে হবে না। ই-মেইলে মানুষ কখনো ভ্যাদর ভ্যাদর করে না। কখনো ফালতু একটা শব্দও বলে না! তুমি যে এত কিছু বলেছ তার মাঝে একটা কথাই জরুরি। সেটা হচ্ছে ই-মেইলটা পেয়েছ কি না জানাও। আমি সেটাই এক শব্দে লিখেছি। 'একনলেজ'-এর আগে-পিছে কিছু দরকার নাই।"

"নাম লিখবি না?"

"নাম নিজে থেকে চলে যাবে।"

"শুভেচ্ছা দিবি না?"

"ই-মেইলে কেউ বাজে কথা লিখে না।"

"শুভেচ্ছা বাজে কথা হল?"

বিল্টু গম্ভীর গলায় বলল, "ই-মেইলে শুভেচ্ছা বাজে কথা। মানুষ শুধুমাত্র কাজের কথা লিখে। বানানগুলো পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত—"

আমি গরম হয়ে বললাম, "আমার সাথে ফাজলেমি করবি না। যা যা বলেছি সবকিছু লেখ।"

বিল্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কেন খামোখা লিখব? তোমার ই-মেইল চলে গেছে।"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "চলে গেল মানে? কখন গেল? কীভাবে গেল?"

"আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে যেখানে যাবার কথা সেখানে চলে গেছে।"

আমি কিছুক্ষণ বিল্টুর দিকে চোখ পাকিয়ে থাকলাম। মানুষের চোখ থেকে সত্যিকার আগুন বের হলে এতক্ষণ এই ফাজিল ছেলেটি পুড়ে কাবাব হয়ে যেত। কী করব বুঝতে না পেরে আমি তাকে সেখানে রেখে রান্নাঘরের দিকে রওনা দিলাম, আমার বোনকে মনে হয় জানানো উচিত যে তার ছেলে এখনই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

আমার বোন চুলোর ওপর ডেকচিতে কী একটা ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। আমাকে বলল, "না খেয়ে যাস নে। রান্না প্রায় হয়ে গেছে।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "আর খাওয়া!"

"কোনদিন থেকে তুই খাওয়ার ওপর এরকম দার্শনিক হয়ে গেলি?"

"না তা হই নি।" আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "বিল্টুর সাথে একটু কথা বলছিলাম।"

আমার বোন ডেকচির ভেতরের জিনিসটাকে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল, "বিল্টু হতভাগার কথা আর বলিস না। দিন-রাত কী একটা শয়তানের যন্ত্র আছে কম্পিউটার—সেটা নিয়ে পড়ে থাকে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ নাওয়া নাই খাওয়া নাই পড়াশোনা নাই খেলাধুলা নাই—চব্বিশ ঘণ্টা এই কম্পিউটার!"

আমি নাক দিয়ে একটা শব্দ করলাম।

"বুঝলি ইকবাল, আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। এই শয়তানের বাক্স আমি গুঁড়ো করে ফেলে দেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "ঠিকই বলেছ আপা। ব্যাপারটা মনে হয় একটু কন্ট্রোল করা দরকার।"

আমার বোন ডেকচির জিনিসটা ঘাঁটাঘাঁটি বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই-ই পারবি।"

"কী পারব?"

"বিল্টুর এই নেশা ছুটাতে। তোকেই দায়িত্ব দিচ্ছি। এক ধমক দিয়ে সিধে করে দে—"

আমি চমকে উঠে বললাম, "আমি?"

"হ্যাঁ। ওকে বোঝা যে এটা হচ্ছে শয়তানের বাক্স। এটা যারা ব্যবহার করে তারা হচ্ছে বড় শয়তান!"

"বড় শয়তান?"

"হ্যাঁ!"

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন বিল্টু তার ঘর থেকে চিৎকার করে বলল, "মামা! তোমার ই-মেইলের উত্তর এসেছে!"

আমার বোন কোমরে হাত দিলে বলল, "কী বলছে পাজিটা? তোর ই-মেইল আসছে? তোকেও ভজিয়ে ফেলেছে? তুইও বিল্টুর সাথে তাল দিচ্ছিস? ঘরের শত্রু বিভীষণ? হ্যাঁ—"

বোনের চোখ লাল হওয়ার আগেই আমি সুড়ুৎ করে রান্নাঘরের দরজা থেকে সরে গেলাম। বিল্টুর কাছে যেতেই সে কম্পিউটারের মনিটরের দিকে দেখাল, সেখানে তিনটা ইংরেজি শব্দ, "জরুরি। দেখা করুন।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এর মাঝে উত্তরও চলে এসেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে হতে পারে—এই মাত্র না পাঠালি?"

"হ্যাঁ মামা, ই-মেইল তো আর কেউ ঘাড়ে করে নেয় না, নেটওয়ার্ক দিয়ে যায়। তাই দেরি হয় না। সাথে সাথে চলে যায়।"

"কী তাজ্জবের ব্যাপার! কয়দিন পরে শুনবে, ছবি চলে যাচ্ছে। কথা চলে যাচ্ছে। টেলিভিশনের মতো কথা বলছে।"

"কয়দিন পরে না মামা, সেটা এখনই করা যায়। আম্মুকে কিছুতেই পটাতে পারছি না একটা ছোট ভিডিও ক্যামেরা কিনে দিতে—তা হলে ভিডিও কনফারেন্স করা যেত!"

খেয়াল করি নি কখন আমার বোন এই ঘরে চলে এসেছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কী বললি? আমাকে পটাতে পারছিস না? এখনো জিনিস কেনা বাকি আছে? একেবারে ফতুর হয়ে গেলাম, তারপরেও শখ যায় না। একজনকে নিয়ে পারি না এখন দুইজন জুটেছে? দুইজনে মিলে ষড়যন্ত্র হচ্ছে? শয়তানের বাক্স নিয়ে মামু-ভাগ্নের শয়তানি?"

আমি বললাম, "না-না আপা! তুমি কী বলছ এটা? ষড়যন্ত্র কেন হবে?"

"ষড়যন্ত্র নয় তো কী? মামু-ভাগ্নে দুইজনে মিলে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছিস? ভাবলাম তুই অন্তত আমার ঝামেলাটুকু বুঝবি—আমার জন্য একটু মায়া হবে। আর শেষ পর্যন্ত তুইও বের হলি ঘরের শত্রু বিভীষণ?"

আপা খেপে গেলে তার মুখে একেবারে মেইল ট্রেন চলতে থাকে—আমি কিছুক্ষণেই কাবু হয়ে গেলাম। জরুরি কাজ আছে বলে এক-দুইবার উঠে যেতে চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো লাভ হল না, আপা হুঙ্কার দিয়ে বলেছে "তোর জরুরি কাজ আছে? আমাকে সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বিশ্বাস করতে বলিস? জীবনে তোকে দিয়ে কোনো কাজ হয়েছে? জরুরি কাজ ছেড়ে দে—সাধারণ একটা কাজও কখনো তোকে দিয়ে হয়েছে? বাজার করতে দিলে পর্যন্ত পচা মাছ কিনে নিয়ে আসিস। ডিমের হালি কত জানিস না। দেশের প্রেসিডেন্টের নাম জানিস না—"

কাজেই আমাকে বসে থাকতে হল। আপা টেবিলে খাবার দিতে দিতে বলল, "খেয়ে তুই বিল্টুকে নিয়ে বের হবি।"

আমি বিষম খেয়ে বললাম, "বি-বিল্টুকে নিয়ে বের হব? আমি?"

"হ্যাঁ। এই ছেলেকে এই শয়তানের বাক্স থেকে দূরে সরাতে হবে।"

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "দূরে কোথায় সরাব?"

"সেটা আমি কী জানি? মামারা ভাগ্নেদের নিয়ে কত আনন্দ করে, মজা করে সেসব করবি। চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবি। শিশুপার্কে নিয়ে যাবি।"

বিল্টু আঁতকে উঠে বলল, "চিড়িয়াখানা? শিশুপার্ক? সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কী হল?"

"আমার স্কুলের বন্ধুরা যদি খবর পায় আমি চিড়িয়াখানা গেছি কিংবা শিশুপার্কে গেছি, তা হলে তারা আমার সাথে কথা বলবে ভেবেছ?"

"কেন কথা বলবে না?"

"মনে করবে আমি ন্যাদা ন্যাদা বাচ্চা!"

আপা বলল, "সেটা তোর আর তোর এই নিষ্কর্মা অপদার্থ মামার মাথাব্যথা। খেয়ে তোরা এই বাড়ি থেকে বের হবি। রাত নয়টার আগে আমি তোদের দেখতে চাই না।"

আমি দুর্বলভাবে আপত্তি করার চেষ্টা করলাম, আপা ভাতের চামচ দিয়ে ডাইনিং টেবিলে ঘটাং করে মেরে আমাকে থামিয়ে দিল।

AMARBOI.COM

কাজেই দুপুরবেলা আমি বিল্টুকে নিয়ে বের হলাম। বিল্টুর মুখ শুকনো, আমার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু নিশ্চয়ই আমশি মেরে আছে। রাস্তার মোড় থেকে একটা রিকশা নিয়েছি। রিকশায় উঠে দুইজনের কেউই কথা বলছি না, অনেকক্ষণ পর বিল্টু একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সব দোষ তোমার মামা।"

"কেন, আমার কেন হবে?"

"তুমি যদি ই-মেইলের কথা না বলতে তা হলেই আজকের এই সর্বনাশটা হত না।"

"সর্বনাশ? কোন জিনিসটাকে সর্বনাশ বলছিস?"

"এই যে তোমার সাথে আজকে সারা দিন থাকতে হবে।"

আমি এভাবে বিল্টুর থেকেও একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "মামার সাথে থাকা তোর কাছে সর্বনাশ মনে হচ্ছে?"

"সর্বনাশ নয় তো কী? তুমিই বলো, তুমি কী ইন্টারেস্টিং জিনিস করতে পার, বলো?"

"আমরা দুইজনে মিলে একটা সিনেমা দেখতে পারি। অনেক দিন থেকে আমি সিনেমা দেখি না। সিনেমা হলে বসে সিনেমা দেখার মজাই অন্যরকম।"

বিল্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মামা, তুমি দুনিয়ার কোনো খবর রাখ না। তাই না?"

"কেন?"

"এই সপ্তাহে যে দুইটা সিনেমা রিলিজ হয়েছে তুমি তার নাম জান?"

"না, জানি না। কেন, কী হয়েছে?"

"একটার নাম হচ্ছে 'কিলিয়ে ভর্তা', অন্যটার নাম হচ্ছে 'টেংরিতে লেংড়ি'। কাহিনী শুনতে চাও?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "দেশটাতে হচ্ছেটা কী? সিনেমা হচ্ছে একটা শিল্পমাধ্যম। তার নাম কিলিয়ে ভর্তা?"

বিল্টু বলল, "মামা তুমি আসলে খুব ভালো আছ, দেশের কোনো কিছু জান না, খবরের কাগজ পড় না, মহানন্দে আছ।"

"তা হলে চল চিড়িয়াখানায় যাই।"

"না মামা। চিড়িয়াখানায় সব জন্তু-জানোয়ার বাথরুম করে রেখেছে, দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না।"

"তা হলে শিশুপার্কে যাবি?"

বিল্টু চোখ কপালে তুলে বলল, "শিশুপার্কে? আমি? আমি কি শিশু নাকি?"

"শিশু নয় তো কী? তোর কী এমন বয়স?"

বিল্টু মাথা নেড়ে বলল, "মামা তুমি জান না। শিশুপার্কে যায় বয়স্ক মানুষেরা, যাদের বুদ্ধি কম—শিশুদের সমান।"

"পার্কে যাবি?"

"গতকালকেই পার্কে দুইটা ছিনতাই হয়েছে।"

"তা হলে কোথায় যাবি?"

বিল্টু চোখ নাচিয়ে বলল, "এলিফেন্ট রোডে একটা কম্পিউটারের দোকান আছে—"

আমি শিউরে উঠে বললাম, "সর্বনাশ! আপা একেবারে খুন করে ফেলবে না?"

বিল্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তা হলে আর কী করব? রিকশাতেই বসে থাকি রাত নয়টা পর্যন্ত।"

আমি খুব দুশ্চিন্তার মাঝে পড়ে গেলাম, বারো বছরের একটা ছেলেকে নিয়ে সময় কাটানোর মতো কোনো বুদ্ধিই বের করতে পারব না? অনেক চিন্তা করে বললাম, "আমার একজন বন্ধু আছে। যা সুন্দর ক্লাসিক্যাল গান গায়!"

বিল্টু শিউরে উঠল। আমি বললাম, "একজন আর্টিস্ট বন্ধু আছে তার বাসায় যাবি? মডার্ন আর্ট করে—"

বিল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "মডার্ন আর্ট দেখলে ভয় করে।"

"পরিচিত একটা ভণ্ডপীরের বাসায় যাবি? যা ভংচং করে, দেখলে তোর তাক লেগে যাবে—"

বিল্টু এবারে খানিকটা কৌতূহল দেখাল কিন্তু ভিতরে গিয়ে পায়ে ধরে সালাম করতে হবে শুনে শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসল। তখন আমার সায়রা সায়েন্টিস্টের কথা মনে পড়ল। বললাম, "একজন সায়েন্টিস্টের কাছে যাবি?"

"কোন সায়েন্টিস্ট?"

"ঐ যে আজকে ই-মেইল পাঠিয়ে দেখা করতে বলেছে।"

"কী আবিষ্কার করেছে?"

"অনেক কিছু। দেখলে হাঁ হয়ে যাবি। সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে একটা ই—" হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমি সায়রাকে কথা দিয়েছি তার বুদ্ধিমান ইঁদুরী জেরিনির কথা কাউকে বলব না। কথা শেষ না করে থেমে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিল্টু পেটে খোঁচা দিয়ে বলল, "কী? বলো।"

"বলা যাবে না।"

"কেন?"

"এটা সিক্রেট। আমি সায়রাকে কথা দিয়েছি কাউকে বলব না।"

এই প্রথমবার বিল্টুর চোখ কৌতূহলে জ্বলজ্বল করতে থাকে। খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "চল যাই সায়রা সায়েন্টিস্টের কাছে।"

আমি আর বিল্টু তখন সায়রা সায়েন্টিস্টের বাসার দিকে রওনা দিলাম। যদি রওনা না দিতাম তা হলে পৃথিবীর ইতিহাসই হয়তো অন্যরকম করে লেখা হত।

বাসায় গিয়ে কয়েকবার বেল টিপলাম কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আবার টিপব না চলে যাব যখন বুঝতে পারছিলাম না, তখন হঠাৎ খুট করে দরজাটা খুলে গেল। খুব অল্প একটু দরজা ফাঁক করে সায়রা আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ঢুকে পড়েন। তাড়াতাড়ি।"

দরজার এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে কেমন করে আস্ত একটা মানুষ ঢুকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না। আমি ইতিউতি করছিলাম কিন্তু তার মাঝে বিল্টু দরজা টেনে ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে গেছে। সায়রা মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে এরকম ভান করে একেবারে হা হা করে উঠল এবং তার মাঝে আমিও ভিতরে ঢুকে গেলাম এবং সাথে সাথে সায়রা ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি অবাক হয়ে সায়রার দিকে তাকালাম, তাকে দেখাচ্ছে হলিউডের সিনেমার নায়িকাদের মতো। পিঠে যন্ত্রপাতি বোঝাই ব্যাকপেক, হাতে বিদঘুটে একটা অস্ত্র, কানে হেডফোন, মাথায় একটা টুপি এবং সেই টুপির ওপরে পাখার মতো একটা যন্ত্র আস্তে আস্তে ঘুরছে। সায়রার চুল উসকোখুসকো, চোখের নিচে কালি, গায়ে কালিঝুলি মাখা একটা ওভারঅল, শুধু মেয়ে বলে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নেই। আমি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সায়রার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "কী হয়েছে?"

সায়রা সারাক্ষণই ইতিউতি তাকাচ্ছে, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "সায়রা—কী হয়েছে?"

"সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"সর্বনাশ?" আমি শুকনো গলায় বললাম, "আপনার ডাল রান্নার মেশিনে কিছু গোলমাল?"

সায়রা হাত নেড়ে বলল, "আরে না! ডাল রান্নার মেশিনের কথা ছেড়ে দেন।'

"তা হলে?"

আমার কথার উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ করে মনে হল সায়রা তার হেডফোনে কিছু শুনতে পেল, সাথে সাথে তার চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল। সে হঠাৎ ঘুরে ছুটে যায় হাতের বিদঘুটে অস্ত্রটার ট্রিগার টেনে ধরে এবং সেখান থেকে বজ্রপাতের মতো একটা বিদ্যুৎ ঝলক বের হয়ে আসে, ঘরের ভেতরে একটা পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সাথে সাথে। বিল্টু চমকে উঠে আমার পিছনে লুকিয়ে আমার হাত খামচে ধরল ভয়ে। সায়রা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এই ঘরেই আছে এখন। পরিষ্কার সিগন্যাল পাচ্ছি।"

আমি ভয়ে ভয়ে সায়রার দিকে তাকালাম, মনে হতে থাকে মেয়েটা হয়তো পাগলটাগল হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে আপনার?"

"আমার কিছু হয় নি। জিজ্ঞেস করেন, পৃথিবীর কী হয়েছে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি শুকনো মুখে বললাম, "কী হয়েছে পৃথিবীর?"

"পৃথিবীর মহাবিপদ।"

"কেন?"

"জরিনি পালিয়ে গেছে।"

"তাই বলেন!" আমি বুক থেকে আটকে থাকা নিশ্বাসটা বের করে দিয়ে বললাম, "সেটা নিয়ে এত ঘাবড়ানোর কী আছে?"

সায়রা হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কী বললেন আপনি? জরিনি পালিয়ে গেছে এবং সেটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই?"

বিল্টু আমার হাত টেনে বলল, "মামা জরিনি কে?"

"একটা ইঁদুর।"

মনে হল সায়রা এই প্রথম বিল্টুকে দেখতে পেয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "এইটা কে?"

"আমার ভাগনে। নাম বিল্টু। খুব বুদ্ধিমান—আইকিউ বলতে পারেন জরিনির সমান।"

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "মামা, ইঁদুর আবার বুদ্ধিমান হয় কেমন করে?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "সেটা বলা নিষেধ—তাই না সায়রা?"

সায়রা হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "আর নিষেধ! জরিনি পালিয়ে গিয়ে যে সর্বনাশ করেছে এখন আর গোপন করে কী হবে?"

"কেন সর্বনাশ কেন?"

"বুঝতে পারছেন না কেন?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "না।"

সায়রা হতাশার মতো একটা ভঙ্গি করে বলল, "কারণ জরিনি হচ্ছে একটা নেংটি ইঁদুরী—"

বিল্টু বাধা দিয়ে বলল, "ইঁদুরী?"

আমি বিল্টুকে থামিয়ে বললাম, "ব্যাকরণ বইয়ে—পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ পড়িস নি? কুকুর কুকুরী, পিশাচ পিশাচী—সেরকম ইঁদুর ইঁদুরী। জরিনি হচ্ছে মেয়ে ইঁদুর—"

"কিন্তু—" বিল্টু আপত্তি করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সায়রা তাকে সেই সুযোগ দিল না। বলল, "নেংটি ইঁদুরের সাইজ মাত্র এতটুকু—তাদের শরীরের হাড়, জয়েন্ট পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল। এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ একটা ফুটো দিয়ে এরা বের হয়ে যেতে পারে। এদের অসাধ্য কোনো কাজ নেই। প্রতি বছর এরা কত কোটি টাকার ফসল নষ্ট করে জানেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, "জানি না।"

"শুধু কি ফসল? জামাকাপড়, ঘরবাড়ি, গাছপালা—কিছু বাকি নেই। এরা ইচ্ছে করলেই সারা পৃথিবী দখল করে নিতে পারে, নিচ্ছে না শুধু মানুষের কারণে। মানুষ নেংটি ইঁদুরকে কন্ট্রোলের মাঝে রেখেছে।"

সায়রা একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "এখন চিন্তা করুন জরিনির কথা—সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী। আইকিউ এক শ কুড়ির কাছাকাছি। মানুষের সাথে সে পাল্লা দিতে পারে। পালিয়ে যাবার পর গত দুই দিন থেকে আমি তাকে পৃথিবীর সেরা যন্ত্রপাতি দিয়ে ধরার চেষ্টা করছি—ধরতে পারছি না। কপাল ভালো সে আমাদের কিছু করতে পারছে না, কারণ সে একা। কিন্তু—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়রা হঠাৎ তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর করে থেমে গেল। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু?"

"কিন্তু সে একা থাকবে না।"

"কেন একা থাকবে না?"

"কারণ জরিনি ঘরসংসার করবে। তার বাচ্চাকাচ্চা হবে। বুদ্ধির জিনিসটা কোন ক্রমোজমে আছে জানি না, কিন্তু যেখানেই থাকুক তার বাচ্চাকাচ্চার মাঝে সেই বুদ্ধি ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের হিসেবে জরিনি হচ্ছে কিশোরী বালিকা। অন্তত এক ডজন বাচ্চা হবে তার—সেখান থেকে ডজন ডজন নাতি—সেখান থেকে ডজন ডজন ডজন পুতি—বুঝতে পারছেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "বুঝেছি একজন বুদ্ধিমান ইঁদুরী থেকে বারোটা বাচ্চা, চব্বিশটা নাতি, ছত্রিশটা পুতি—"

বিল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "না মামা। তুমি মনে হয় জীবনে অঙ্কে পাস কর নাই। এক ডজন বাচ্চা হলে নাতি হবে এক শ চুয়াল্লিশ আর পুতি হবে দেড় হাজারের মতো। সংখ্যাটা যোগ নয়—গুণ হবে।"

সায়রা মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক বলেছ। সঠিক সংখ্যা হবে এক হাজার সাত শ আটাশ। এই পুতিদের পুতি যখন হবে তাদের সংখ্যা হবে তিন মিলিয়ন। এখন চিন্তা করেন—ঢাকা শহরে তিন মিলিয়ন নেংটি ইঁদুর যাদের আইকিউ এক শ বিশ। চিন্তা করতে পারেন কী হবে?"

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "ইয়ে মানে—"

"সকল খাবার তারা দখল করে নেবে। টেলিফোনের তার কেটে যোগাযোগ নষ্ট করে দেবে। ইলেকট্রিক কন্ট্রোল সিস্টেমের তার কেটে পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট করে দেবে। দেশে কোনো ইলেকট্রিসিটি থাকবে না। ফাইবার অপটিক লাইন কেটে নেটওয়ার্ক নষ্ট করে দেবে। যে কোনো যন্ত্রের ভিতরে ঢুকে টুক করে একটা তার কেটে যন্ত্রটা নষ্ট করে দেবে। কম্পিউটার অচল হয়ে যাবে। ট্রেন চলবে না—গাড়ি চলবে না। প্লেন ক্র্যাশ করে যাবে। দেশের মানুষ খেতে পাবে না। পাবলিক খেপে যাবে। দেশে আন্দোলন হবে—গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে—" সায়রা কথা বলতে বলতে শিউরে উঠল।

আমি মাথা চুলকে বললাম, "এটা থামানোর কোনো উপায় নাই?"

সায়রা মাথা নাড়ল, বলল, "একমাত্র উপায় হচ্ছে জরিনিকে শেষ করে দেওয়া। আর যদি শেষ করা না যায় তা হলে কোনোভাবে তাকে এই ট্যাবলেটটা খাইয়ে দেওয়া।" সায়রা ছোট একটা ট্যাবলেট দেখাল, হলুদ রঙের লজেন্সের মতো।

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "কী হয় এটা খেলে?"

"এটা একটা হরমোন ট্যাবলেট। এটা খেলে হরমোনের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাবে, আর কখনো বাচ্চা হবে না।"

বিল্টু বলল, "ইঁদুর এত বড় ট্যাবলেট গিলতে পারবে? গলায় আটকে যাবে না?"

"এর মাঝে বাদামের গুঁড়ো, পনিরের টুকরো, মধু আর বিস্কুট মেশানো আছে। ইঁদুর খুব শখ করে খায়। কিন্তু জরিনিকে খাওয়ানোর জন্য ধরতেই পারছি না। জরিনি বেটি মহা ধুরন্ধর।"

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "এত যদি বুদ্ধিমান তা হলে এই বাসা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন?"

"চেষ্টা করছে—পারছে না। পুরো বাসাটা আমি সিল করে রেখেছি। জরিনির কানে একটা রিং লাগানো আছে। সেটা আসলে একটা মাইক্রোচিপ—সেখান থেকে বারো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেগাহার্টজ–এর একটা সিগন্যাল বের হয়। সেই সিগন্যালটা থেকে আমি বুঝতে পারি সে কোথায় আছে। যেমন এই মুহূর্তে সে সার্কিট ব্রেকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—"

"কেন?"

সায়রার মুখ শক্ত হয়ে উঠল, বলল, "নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে। টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে এখন নিশ্চয়ই ইলেকট্রিক লাইন কাটবে।"

"ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছাতু হয়ে যাবে—"

"হবে না। বেটি মহা ধুরন্ধর। একটা পাওয়ার লাইনে ঝুলে ঝুলে কাটে, গ্রাউন্ড থেকে দূরে থাকে।"

কথা শেষ হতে না হতেই ঘটাং ঘটাং করে কয়েকটা শব্দ হল এবং হঠাৎ করে ঘরবাড়ি একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। সায়রা পা দাপিয়ে বলল, "হতভাগীর কাজ দেখেছেন? কত বড় ধুরন্ধর—সরাসরি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে।"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "এখন কী হবে?"

"ঐ বেটি চলে ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায়। এই রকম একটা কাণ্ড করতে পারে আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল সেই জন্য একটা জেনারেটর রেডি রেখেছি। দুই মিনিটের মাঝেই সেটা চালু হয়ে যাবে।"

আমরা আবছা অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে রইলাম, শুনতে পেলাম কুটুর কুটুর শব্দ করে কিছু একটা ঘরের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে ছুটোছুটি করছে। নিশ্চয়ই জরিনি—সায়রার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে—কী হবে কে জানে? মিনিট দুয়েকের ভিতরে কোথায় জানি শব্দ করে জেনারেটর চালু হয়ে গেল—সাথে সাথে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, নানা ধরনের যন্ত্রপাতি গুঞ্জন করতে শুরু করে। সায়রা উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী জরিনি? ভেবেছিলি ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিবি? এখন?"

আমরা শুনতে পেলাম কিচকিচ শব্দ করে ইঁদুরটা কোথায় জানি ছুটে যাচ্ছে। বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "সায়রা খালা। জরিনি পালাল কেমন করে?"

সায়রা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সেটা আরেক ইতিহাস। জরিনি অনেক কায়দা করে পালিয়েছে।"

"কী রকম কায়দা?"

"প্রথমে ভান করল সে অসুস্থ। আস্তে আস্তে হাঁটে। ফেবারিট হিন্দি গান শোনে না। ভালো করে খায় না। শরীর এলিয়ে শুয়ে থাকে। আমি সমস্ত কিছু টেস্ট করে দেখি—কিন্তু কোনো রোগের চিহ্ন পাই না। ভাবলাম ব্যাপারটা হয়তো সাইকোলজিক্যাল। মন ভালো করার জন্য একটা ছোট টেলিভিশন সেট লাগিয়ে দিলাম, সাথে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির ভিডিও। কিন্তু কোনো লাভ হল না। একদিন সকালে উঠে দেখি জরিনি মরে পড়ে আছে। চার পা উপরে তুলে মুখ ভেংচি কেটে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মুখের কোনায় সাদা ফেনা—চোখ বন্ধ। আমি আর কী করব, গ্লাভস পরে মরা ইঁদুরটাকে বের করে এনেছি। ভাবলাম কেন মারা গেল সেটা পোস্টমর্টেম করে দেখি। একটা ট্রের উপরে রেখেছি। হঠাৎ করে সে লাফ দিয়ে উঠল তারপর ছুটে শেলফের উপর উঠে গেল—" সায়রা থেমে একটা নিশ্বাস ফেলল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কী হল?"

"আমি পিছনে পিছনে ছুটে গেলাম। সেই বেটি উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে একটা জাইলিনের বোতল আমার উপর ফেলে দিল। এই দেখেন কপালে লেগে কেমন ফুলে উঠেছে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়রা তার মাথাটা আমাদের দিকে এগিয়ে দেয়। আমি এমনি দেখলাম বিল্টু একটু টিপে দেখল।

সায়রা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তারপর সে শেলফের একেবারে উপরের র‍্যাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি করে আমাকে ভেংচি কাটতে লাগল। কী বেয়াদবের মতো কাজ আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

ইঁদুর কেমন করে বেয়াদব হয় আমি বুঝতে পারলাম না—কিন্তু এখন এটা জিজ্ঞেস করা মনে হয় ঠিক হবে না। সায়রা একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তারপর নিজের লেজটাকে একটা গিটারের মতো ধরে গান গাইতে লাগল—"

"গান গাইতে লাগল? ইঁদুর গান গাইতে পারে?"

"তার ভাষায় গান :

কিচি কিচি কিচি কিচি ফু
কিচি মিচি কিচি মিচি
মিচি কিচি কু—"

"এইটা গান?"

"আমাকে বিরক্ত করার চেষ্টা আর কি! তারপর কী করল আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

"কী করল?"

"তাকের উপরে ইথাইল অ্যালকোহলের একটা বোতল আছে, সেটা খুলে দুই ঢোক খেয়ে নেশা করে ফেলল।"

"নেশা?"

"হ্যাঁ। নেশা করে লাফায়–ঝাঁপায় ধাক্কা দিয়ে এটা ফেলে দেয়, সেটা ফেলে দেয়। সবচেয়ে ভয়ংকর কাজ কী করল জানেন?"

বিল্টু আর আমি একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, "কী?"

"রান্নাঘর থেকে একটা কাঠি এনে কয়েকবার চেষ্টা করে জ্বালিয়ে নেয় তারপর সেটাকে মশালের মতো করে ধরে স্লোগান দেয়। মশাল মিছিলের মতো।"

"স্লোগান? কী স্লোগান—"

সায়রা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কিচমিচ করে কী একটা বলে—শুনে মনে হয় বলছে 'ধ্বংস হোক' 'ধ্বংস হোক'। সেটাই শেষ না—খানিকক্ষণ জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠিটা হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে উপর থেকে ছুড়ে দেয়। একবার খবরের কাগজের উপর পড়ে আগুন ধরে গেল তাই দেখে জরিনির কী আনন্দ!"

"আগুন ধরে গেল?" আমি আঁতকে উঠে বললাম, "সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের আপনি দেখেছেন কী?" সায়রা মুখ কালো করে বলল, "যখন বুঝতে পারল আগুন দিয়ে সব জ্বালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় তখন সে ইচ্ছে করে আগুন ধরানোর চেষ্টা করতে লাগল। অ্যালকোহলের একটা বোতল ধাক্কা দিয়ে ফেলে ভেঙে তার উপর জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ফেলে দিল। সারা ঘরে তখন দাউদাউ আগুন। কী অবস্থা চিন্তা করতে পারবেন না। আরেকটু হলে ফায়ারব্রিগেড ডাকতে হত।"

"সর্বনাশ!" আমি বললাম, "কী ভয়ানক অবস্থা!"

"ভয়ানক বলে ভয়ানক।" সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "এর মাঝে সে গোপনে তার গাড়িটা চুরি করে নিয়ে গেল—সারা রাত গাড়ি করে টহল দেয়। একটু হয়তো অন্যমনস্ক হয়েছি—পায়ের তলা দিয়ে সাঁই করে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির হর্নে কান ঝালাপালা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়রার কথা শেষ হতেই মনে হয় আমাদের দেখানোর জন্য প্যাঁ প্যাঁ করে হর্ন বাজিয়ে জরিনি তার গাড়ি চালিয়ে একটা টেবিলের তলা থেকে বের হয়ে অন্য পাশে ছুটে চলে গেল। সায়রা তার অদ্ভুত অস্ত্র দিয়ে বজ্রপাতের মতো শব্দ করে বিদ্যুতের একটা ঝলক দিয়ে জরিনিকে কাবু করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

বিল্টুর চোখ উত্তেজনায় চকচক করতে থাকে, হাতে কিল দিয়ে বলে, "কী সাংঘাতিক!"

"হ্যাঁ।" সায়রা বলল, "আসলেই সাংঘাতিক অবস্থা। কলিংবেলের কানেকশনটা খুলে রেখেছি, যেই ঘুমাতে যাই কানেকশন দিয়ে বসে থাকে। সারা রাত বেলের শব্দে ঘুমাতে পারি নাই।" কথা বলতে বলতে হঠাৎ সায়রার মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল, চোখ বড় বড় হয়ে যায়, নাকের পাট ফুলে ওঠে, ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু জরিনি টের পায় নি কত ধানে কত চাল। কত গমে কত আটা। কঠিন একটা যন্ত্র দাঁড় করিয়েছি। জরিনি এখন কোথায় আছে আমি বলে দিতে পারি। কন্ট্রোলরুমে মনিটরে সবকিছু দেখা যায়। একা বলে পাজিটাকে শেষ করতে পারছিলাম না। এই জন্য আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।"

আমি ঢোক গিলে বললাম, "আমাকে কী করতে হবে?"

সায়রা আমার হাতে বিদঘুটে অস্ত্রটা দিয়ে মেঘস্বরে বলল, "জরিনিকে ঘায়েল করতে হবে!"

"আমি?"

"হ্যাঁ। আমি কন্ট্রোলরুম থেকে আপনাকে বলে দেব কোনদিকে যেতে হবে, আপনি সেদিকে যাবেন, যখন বলব ট্রিগার টেনে ধরতে তখন ট্রিগার টেনে ধরবেন—"

"আ-আমি?"

"আপনি না হলে কে করবে? পৃথিবীকে বাঁচানোর এই এত বড় একটা দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।"

"কি-কিন্তু—" আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "আমি কখনো খুনখারাবি করি নাই। ভায়োলেন্স দেখতে হবে বলে খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি।"

সায়রা বিরক্ত হয়ে বলল, "এর মাঝে আপনি ভায়োলেন্স কোথায় দেখলেন? একটা নেংটি ইঁদুরকে ঘায়েল করা ভায়োলেন্স হল? যখন মশা মারেন তখন কি দুঃখে আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে?"

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম তখন বিল্টু বলল, "সায়রা খালা আমাকে দেন— আমি পারব।"

সায়রা কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বিল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল এবং হঠাৎ করে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। বিল্টুকে দেওয়াই ঠিক। যতবার আমি ধাওয়া করি তখন জরিনি স্টোররুমে একটা চিপার মাঝে ঢুকে পড়ে—সেখানে আপনি আপনার মোটা ভুঁড়ি নিয়ে ঢুকতে পারবেন না। যদি কষ্ট করে ঢুকেও যান মাঝখানে গিয়ে আটকে যাবেন—আপনাকে তখন টেনে বের করা যাবে না। জরিনি যদি বুঝতে পারে আপনি আটকে গেছেন তখন বড় বিপদ হতে পারে।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কী রকম বিপদ?"

"আপনার মাথার মাঝে কেরোসিন ঢেলে চুলে আগুন ধরিয়ে দিল। কিংবা ইলেকট্রিক তার এনে আপনার নাকের মাঝে ইলেকট্রিক শক দিল। কিংবা—"

আমি শিউরে উঠে বিদঘুটে অস্ত্রটা তাড়াতাড়ি বিল্টুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "থাক! থাক—আর বলতে হবে না। বিল্টুই যাক। সে-ই ভালো পারবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিল্টু মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি এরকম অস্ত্র দিয়ে প্রতিদিন গোলাগুলি করি।"

সায়রা ভুরু কুঁচকে বলল, "কোথায় গোলাগুলি কর?"

"কম্পিউটার গেমে। আজকেই গুলি করে এই বিশাল একটা ডাইনোসর মেরেছি। টি-রেক্স।"

"ভেরি গুড।" সায়রা তার কান থেকে হেডফোন খুলে বিল্টুকে লাগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা দিয়ে আমরা তোমার সাথে কথা বলতে পারব, তুমিও আমাদের সাথে কথা বলতে পারবে।" মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা একটা রাডারের মতো। এটা মাথায় থাকলে তুমি আগেই সিগন্যাল পেয়ে যাবে। জরিনি তোমাকে পিছন থেকে অ্যাটাক করতে পারবে না।"

বিল্টু অস্ত্র হাতে বলল, "আমাকে অ্যাটাক করা এত সোজা না। আমার ধারেকাছে এলে একেবারে ছাতু করে দেব।"

"ভেরি গুড। এবার তা হলে তুমি যাও।"

বিল্টু একেবারে যুদ্ধসাজে জরিনিকে ঘায়েল করতে এগিয়ে যেতে থাকে। সায়রা আমাকে বলল, "আপনি আসেন আমার সাথে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়?"

"কন্ট্রোলরুমে।"

কন্ট্রোলরুমে বড় টেলিভিশনের স্ক্রিনের মতো একটা স্ক্রিন। তার আশপাশে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি নানা ধরনের শব্দ করছে। স্ক্রিনের মাঝামাঝি জায়গায় একটা লাল বিন্দু জ্বলছে এবং নিবছে। সায়রা বিন্দুটিতে আঙুল দিয়ে বলল, "এইটা হচ্ছে জরিনি। বসার ঘরে সোফার নিচে।" কাছাকাছি আরেকটা সবুজ বিন্দু জ্বলছে এবং নিবছে, সায়রা আঙুল দিয়ে সেটা ছুঁয়ে বলল, "আর এইটা হচ্ছে বিল্টু। আমাদের হিটম্যান।"

সায়রা কাছাকাছি রাখা একটা মাইক্রোফোন টেনে নিয়ে বলল, "হ্যালো বিল্টু—আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

স্পিকারে বিল্টুর কথা শুনতে পেলাম। "শুনতে পাচ্ছি। রজার।"

"তোমার সামনে দশ ফুট গিয়ে ডানদিকে চার ফুট গেলে জরিনিকে পাবে।"

"টু ও ক্লক পজিশন?"

"রজার। টু ও ক্লক।"

আমি সায়রার দিকে তাকিয়ে বললাম, "টু ও ক্লক? মানে কী?"

"ঘরটাকে একটা ঘড়ির মতো চিন্তা করেন—ঠিক সামনে হচ্ছে বারোটা। দুইটা মানে হচ্ছে একটু সামনে একটু ডানে। বুঝেছেন?"

আমি কিছু বুঝলাম না কিন্তু সেটা বলতে লজ্জা লাগল, তাই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললাম, "বুঝেছি। বুঝেছি।"

সায়রা মাইক্রোফোনে বলল, "বিল্টু। ডানদিকে সোফার নিচে লুকিয়ে আছে। ডাইভ দাও।"

আমরা স্ক্রিনে দেখতে পেলাম সবুজ বিন্দুটা একটু ডাইভ দিল কিন্তু লাল বিন্দুটা তিন লাফে সরে স্ক্রিনের কোনায় চলে এল। সায়রা বলল, "বিল্টু জরিনি এখন ফাইভ ও ক্লক পজিশনে।"

এইটার মানে কী আমি বুঝতে পারলাম না কিন্তু বিল্টু ঠিকই বুঝল, দেখলাম সবুজ বিন্দুটা আবার লাল বিন্দুটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লাভ হল না—জরিনি মহা ধুরন্ধর। ঠিক শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে সরে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় আধঘণ্টা এরকম লুকোচুরি খেলা হল। আমি যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ করে শুনতে পেলাম সায়রা দাঁতের ফাঁক দিয়ে আনন্দের একটা শব্দ করল। আমি বললাম, "কী হয়েছে?"

"এবারে বাছাধন আটকা পড়েছে।"

"আটকা পড়েছে?"

"হ্যাঁ—এখান থেকে পালানোর জায়গা নেই। যাকে বলে একেবারে অন্ধ গলি!" সায়রা মাইক্রোফোনে মুখ লাগিয়ে বলল, "বিল্টু! এইবারে আটকানো গিয়েছে।"

"রজার।"

"টুয়েলভ ও ক্লক। শার্প।"

"রজার।"

"উবু হয়ে ঢুকে যাও। ছয় ফুট দূর থেকে শুট কর।"

বিল্টু খানিকক্ষণ পর উত্তর করল, "ভিতরে অন্ধকার।"

"তোমার কোমরে সুইচ আছে। জ্বালিয়ে নাও।"

বিল্টু নিশ্চয়ই জ্বালিয়ে নিল, কারণ শুনতে পেলাম সে বলছে, "এবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।"

"জরিনিকে দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"শুট কর।"

আমরা কন্ট্রোলরুমে বসে একটা বজ্রপাতের মতো শব্দ শুনতে পেলাম। সায়রা নিশ্বাস আটকে রেখে বলল, "ঘায়েল হয়েছে? হয়েছে?"

AMARBOI.COM

"বুঝতে পারছি না।"

আমরা দেখতে পেলাম জরিনির লাল বিন্দুটি একই জায়গায় আছে—বিল্টুর সবুজ বিন্দু এগিয়ে যাচ্ছে। দুটি খুব কাছাকাছি চলে এল—আবার বজ্রপাতের মতো শব্দ হল। লাল বিন্দুটি কয়েকবার কেঁপে উঠল। সায়রা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এবারে একেবারে শেষ! বাঁচার কোনো উপায়ই নেই।"

আমরা দেখতে পেলাম লাল বিন্দু এবং সবুজ বিন্দু খুব কাছাকাছি। সায়রা মাইক্রোফোনে জিজ্ঞেস করল, "কী অবস্থা বিল্টু?"

বিল্টু কোনো উত্তর করল না। সায়রা আবার জিজ্ঞেস করল, "বিল্টু কী অবস্থা?"

বিল্টু এবারেও কোনো উত্তর করল না। শুধু দেখলাম লাল বিন্দু এবং সবুজ বিন্দু খুব কাছাকাছি। সায়রা একটু দুশ্চিন্তিত হয়ে ডাকল, "বিল্টু। তুমি ঠিক আছ তো?"

"জি ঠিক আছি।"

"মিশন কমপ্লিট?"

"কমপ্লিট। জরিনি ছ্যাড়াবেড়া হয়ে গেছে। কানের সাথে একটা রিং ছিল শুধু সেটা আছে। আর কিছু নাই।"

সায়রা জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, "হাইভোল্টেজে ভস্মীভূত হয়ে গেছে শুধু মাইক্রোওয়েভ ট্যাগটা আছে।"

বিল্টু জানতে চাইল, "ওটা কি নিয়ে আসব?"

"হ্যাঁ নিয়ে এস।" সায়রা হঠাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের মাঝেই বিল্টু ফিরে এল। যদিও বুঝতে পারছিলাম এরকম বুদ্ধিমান নেংটি ইঁদুর ছাড়া পেয়ে যাওয়া পৃথিবীর জন্য খুব বড় বিপদের ব্যাপার। তারপরেও এরকম চালাক-চতুর ইঁদুরটা এভাবে মারা গেল চিন্তা করে আমার খুব খারাপ লাগছিল। বিদঘুটে অস্ত্র হাতে ইঁদুরকে মেরে ফেলা আমার কাছে মানুষ মেরে ফেলার মতো বড় অপরাধ মনে হতে লাগল। আমি সায়রার মুখের দিকে তাকালাম—এত বড় একটা বিপদ থেকে সারা পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে কিন্তু তার মুখে এখন আর সেরকম আনন্দ দেখা যাচ্ছে না। শুধু বিল্টুর চোখে-মুখে ঝলমলে আনন্দ—ছোট বাচ্চারা মনে হয় একটু নিষ্ঠুর হয়।

পরিবেশটা কেমন জানি ভার ভার হয়ে রইল। জরিনির কানে যে রিংটা ছিল সায়রা অনেকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "জরিনি বেটি মাপ করে দিস আমাকে।" আমি দেখলাম সায়রার চোখ ছলছল করছে।

আমি আর বিল্টু যখন সায়রার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছি তখন হঠাৎ করে বিল্টু বলল, "সায়রা খালা—"

"উঁ।"

"আপনি হলুদ রঙের একটা ট্যাবলেট দেখিয়েছেন না— যেটা খেলে ইঁদুরের বাচ্চাকাচ্চা হয় না?"

"হ্যাঁ। কী হয়েছে সেটার?"

"আমাকে একটা ট্যাবলেট দেবেন?"

"কেন কী করবে?"

"আমাদের বাসায় কয়দিন থেকে খুব ইঁদুরের উৎপাত। এটা ফেলে রাখব—ইঁদুর খেয়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং করবে। আর ইঁদুরের বাচ্চা হবে না।"

সায়রা একটা নিশ্বাস ফেলে টেবিলের উপর থেকে একটা কৌটা বের করে একটা ট্যাবলেট বের করে বিল্টুর হাতে দিয়ে বলল, "নাও। জরিনির জন্য তৈরি করেছিলাম—সেই যখন নেই এই ট্যাবলেট দিয়ে আমি আর কী করব?" সায়রা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল—জরিনির শোকে বেচারি হঠাৎ করে খুব কাতর হয়ে গেছে।

আমি আর বিল্টু রিকশা করে যাচ্ছি। রাত সাড়ে আটটার মতো বাজে—নয়টার ভিতরে বাসায় পৌঁছে যাব। রিকশাটা টুকটুক করে যাচ্ছে, বেশ সুন্দর একটা ঝিরঝিরে বাতাস দিচ্ছে। বিল্টু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা বিল্টু, তুই যে এতটুকুন একটা ইঁদুরের বাচ্চাকে এভাবে গুলি করে মারলি তোর খারাপ লাগল না?"

"কেন? খারাপ লাগবে কেন?"

"ইঁদুর হলেও তো একটা প্রাণী। বিশেষ করে এরকম বুদ্ধিমান একটা প্রাণী। আইকিউ মানুষের সমান।"

বিল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "না, মামা। আমার একটুও খারাপ লাগছে না।"

"একটুও না?"

"না। একটুও না। বরং খুব ভালো লাগছে।"

আমি একটু অবাক হয়ে বিল্টুর দিকে তাকালাম, এইটুকুন ছেলে এরকম নিষ্ঠুর? জিজ্ঞেস করলাম, "তোর ভালো লাগছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। কেন জান?"

"কেন?"

"এই দেখ।" বলে বিল্টু তার পকেটে হাত দেয় এবং সাবধানে হাতটা বের করে আনে, সেখানে জরিনি পিছনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে আছে। সেটি চুকচুক করে একবার বিল্টুর দিকে আরেকবার আমার দিকে তাকাল। বিল্টু জরিনির মাথায় আঙুল দিয়ে আদর করে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই জরিনি। আর কেউ তোমাকে মারতে পারবে না।"

জরিনি সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল। আমি অবাক হয়ে একটা চিৎকার দিয়ে রিকশা থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্ট করে নিজেকে সামলে বললাম, "জ–জ–জরিনি মরে নি?"

"উঁহু।" বিল্টু দাঁত বের করে হেসে বলল, "কথা বলতে পারলে জরিনি বলত—আমি মরি নি!"

"কিন্তু, কিন্তু—" আমি আমতা–আমতা করে বললাম, "আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলাম তুই গুলি করেছিস!"

"ফাঁকা গুলি করেছি উপরের দিকে। তখনই জরিনি বুঝতে পারল আমি বাঁচাতে এসেছি। চোখ টিপে হাত দিয়ে ডাকতেই সুড়ুৎ করে চলে এল। কান থেকে রিংটা খুলে তাকে পকেটে রেখে দিয়েছি। একটুও শব্দ করে নি!"

"এখন যদি তোর হাত থেকে পালিয়ে যায়?"

"কেন পালিয়ে যাবে? আমি আর জরিনি এখন প্রাণের বন্ধু! তাই না জরিনি?"

জরিনি ঠিক মানুষের মতো মাথা নাড়ল। বিল্টু বলল, "তা ছাড়া আমি সায়রা খালার কাছ থেকে হলুদ ট্যাবলেট নিয়ে এসেছি। সেটা এখন খাইয়ে দেব।"

"কীভাবে খাওয়াবি?"

"এই যে এইভাবে।" বলে বিল্টু অন্য পকেট থেকে হলুদ ট্যাবলেটটা বের করে জরিনিকে জিজ্ঞেস করল, "খিদে পেয়েছে?"

জরিনি মাথা নাড়ল। বিল্টু তার হাতে ট্যাবলেটটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "নাও খাও।"

জরিনি কুটকুট করে খেতে থাকে, আমি রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে তাকিয়ে থাকি, সমস্ত পৃথিবীর একটা মহাপ্রলয় থেকে উদ্ধার পাওয়া নির্ভর করছে এই ট্যাবলেটটা খেয়ে শেষ করার ওপরে।

সপ্তাহ খানেক পরে বোনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছি—বোন আমাকে দেখে বলল, "বুঝলি ইকবাল। তোকে সব সময় আমি অপদার্থ জেনে এসেছি। কিন্তু তুই দেখি ম্যাজিক করে দিলি।"

"কী ম্যাজিক?"

"বিল্টুর মাথা থেকে কম্পিউটারের ভূত দূর করে দিয়েছিস। সেই যে সেদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য নিয়ে গিয়েছিলি কীভাবে বুঝিয়েছিস কে জানে। ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। এখন দেখি দিন-রাত ঘরে দরজা বন্ধ করে হাতের কাজ করে।"

"হাতের কাজ?"

"হ্যাঁ। ছোট ছোট চেয়ার-টেবিল তৈরি করেছে। একটা ছোট বিছানাও। সেদিন দেখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা খেলনা গাড়ির মাঝে কীভাবে কীভাবে ব্যাটারি দিয়ে একটা ইঞ্জিন বসাবে। দিন-রাত দেখি ব্যস্ত।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। লাইব্রেরি থেকে বই এনে বেশ পড়াশোনাও করে।"

"কীসের ওপর বই?"

"জন্তু-জানোয়ারের ওপর বই। শুরু করেছে ইঁদুরের বই দিয়ে।"

আমি কেশে গলা পরিষ্কার করে বললাম, "ও আচ্ছা!"

"আর কী একটা হয়েছে—দুই চোখে বিড়াল দেখতে পারে না। বাসায় কোথা থেকে একটা হুলো বিড়াল এসেছিল, নিজে সেটাকে ধরে বস্তায় ভরে বুড়িগঙ্গার ঐ পারে ফেলে এসেছে।"

আমি খুব অবাক হবার ভান করলাম। আপা অবিশ্যি হঠাৎ মুখ কালো করে বললেন, "তবে—"

"তবে কী?"

"এই বাসাটার কিছু একটা দোষ হয়েছে।"

"দোষ?"

"হ্যাঁ।"

"কী দোষ?"

"সেদিন দেখি সিলিং থেকে একটা জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি নিচে পড়ল।"

"জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি?"

"হ্যাঁ। একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আর কোনো মানুষ নেই জন নেই মাঝরাতে হঠাৎ করে কলিংবেল বাজতে থাকে।"

"কী আশ্চর্য!"

বোন মুখ গম্ভীর করে বললেন, "ভালো একটা বাসা পেলে জানাবি—এই দোষে পাওয়া বাসায় থাকতে চাই না।"

"ঠিক আছে আপা, জানাব।"

বোনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিল্টুর সাথে দেখা করতে গেলাম। অন্যবারের মতো আমাকে দেখে মুখ কালো করে ফেলল না বরং তার মুখ পুরোপুরি এক শ ওয়াট না হলেও মোটামুটি চল্লিশ ওয়াট বাল্বের মতো জ্বলে উঠল। আমি গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "জরিনির কী খবর?"

বিল্টু ফিসফিস করে বলল, "ভালো। তবে—"

"তবে কী?"

"খুব মেজাজ গরম। পান থেকে চুন খসলে রক্ষা নাই। সেদিন একটু বকেছি তখন ম্যাচ নিয়ে সিলিঙে উঠে গেল! তারপর—"

"জানি। আপা বলেছে।"

"তার সাথে না খেললে সারা রাত কলিংবেল বাজায়।'

"কী খেলিস?"

"দাবা। ওপেনিং মুভ যাচ্ছেতাই—"

"ও।"

"খুব ভয়ে ভয়ে আছি মামা, কোন দিন না আম্মুর কাছে ধরা পড়ে যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম্মু কম্পিউটারকে যত ঘেন্না করে—ইঁদুরকে তার চেয়ে এক শ গুণ বেশি ঘেন্না করে।"

"আপাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নেংটি ইঁদুরকে ভালবাসার কারণ আছে?"

বিল্টু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ-স-স-স, জরিনি শুনলে খবর আছে!"

শেষ খবর অনুযায়ী সায়রা সায়েন্টিস্টের ডাল রাঁধার যন্ত্রের কাজ প্রায় শেষ। জরিনি আসলে মারা যায় নি শুনে সে খুব খুশি হয়েছে। বিল্টুকে সে রাখতে দিয়েছে তবে কঠিন একটা শর্ত আছে—কোথা থেকে পেয়েছে কাউকে বলতে পারবে না!

বিল্টুর তাতে সমস্যা নেই—সে যে একটা নেংটি ইঁদুর পেয়েছে সেই কথাটিই এখনো কেউ জানে না। আমি ছাড়া।

মোল্লা গজনফর আলী

আমি কলিংবেলে চাপ দিয়ে বিল্টুকে বললাম, "বুঝলি বিল্টু, যদি দেখা যায় সায়রা বাসায় নাই, কিংবা বাসায় আছে কিন্তু দরজা খুলছে না কিংবা দরজা খুলছে কিন্তু ভেতরে আসতে বলছে না কিংবা ভেতরে আসতে বলছে কিন্তু খেতে বলছে না তা হলে কিন্তু অবাক হবি না।"

বিল্টু ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন মামা?"

"কারণ এইটাই সায়েন্টিস্টদের ধরন। সব সময় কঠিন কঠিন জিনিস নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তো, তাই সাধারণ জিনিসগুলি তারা ভুলে যায়।"

"এইটা কি সাধারণ জিনিস হল? আমাদের খেতে দাওয়াত দিয়েছে—এখন ভুলে গেলে চলবে?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "সাধারণ মানুষের বেলায় চলবে না—কিন্তু সায়েন্টিস্টদের বেলায় কিছু বলা যায় না। সবকিছু ভুলে যাওয়া হচ্ছে তাদের কাজ।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"সিনেমায় দেখেছি।"

আমার কথা বিল্টু পুরোপুরি বিশ্বাস করল বলে মনে হল না, সে নিজেই এবারে কলিংবেল টিপে ধরল, যতক্ষণ টিপে ধরে রাখা ভদ্রতা তার থেকে অনেক বেশিক্ষণ। এবারে কাজ হল, কিছুক্ষণের মাঝেই খুট করে দরজা খুলে গেল এবং সায়রা মাথা বের করে বলল, "ও! আপনারা চলে এসেছেন?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, মানে ইয়ে, আমরা একটু আগেই চলে এলাম।"

"ভালো করেছেন। আপনারাও তা হলে দেখতে পারবেন।"

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "কী দেখতে পারব?"

"আমার রান্না করার মেশিন।" সায়রা গম্ভীর হয়ে বলল, "এখন পর্যন্ত তিনটা ইউনিট রেডি হয়েছে। ভাত, ডাল আর ডিমভাজি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিল্টুর চক্ষুলজ্জা স্বাভাবিক মানুষ থেকে অনেক কম। সে জিজ্ঞেস করল, "তার মানে আমরা শুধু ভাত, ডাল আর ডিমভাজি খাব?"

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "মেশিন যেটা রাঁধে সেটাই তো খাবি, গাধা কোথাকার!"

বিল্টু মুখটা প্যাঁচার মতো করে বলল, "বিরিয়ানি রাঁধতে পারে এরকম একটা মেশিন তৈরি করলেন না কেন সায়রা খালা?"

সায়রা কিছু বলার আগেই আমি বললাম, "বিরিয়ানিতে কত কোলেস্টেরল জানিস না বোকা? খেয়ে মারা যাবি নাকি?"

সায়রা বলল, "আস্তে আস্তে হবে। রান্নার বেসিক অপারেশন হচ্ছে তিনটা—সিদ্ধ, ভাজা এবং পোড়া। কাজেই যে মেশিন সিদ্ধ করতে পারে, ভাজতে পারে এবং পোড়াতে পারে, সেটা দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু রান্না করা যাবে। মেশিনের সামনে একটা ডায়াল থাকবে, সেখানে শুধু টিপে দেবে—ব্যস, অটোমেটিক রান্না হয়ে যাবে।"

"সবকিছু রান্না হবে?"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "অবশ্যই সবকিছু রান্না হবে।"

বিল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "আপনার এমন একটা মেশিন তৈরি করা উচিত যেটা সবজি রাঁধবে না, দুধ গরম করবে না। তা হলে দেখবেন সেটা কত বিক্রি হবে! বাচ্চারা পাগলের মতো কিনবে।"

আমি বিল্টুকে ধমক দিয়ে বললাম, "থাক—তোকে আর উপদেশ দিতে হবে না।"

সায়রা একটু হাসল। তাকে আমি হাসতে দেখেছি খুব কম। আমি আবিষ্কার করলাম সে হাসলে তাকে বেশ সুন্দর দেখায়।

আমি বললাম, "চলেন আপনার যন্ত্রটা দেখি।"

"চলেন।"

ঘরের মাঝামাঝি প্রায় ছাদ-সমান উঁচু বিশাল একটা যন্ত্র। নানা রকমের বাতি জ্বলছে এবং নিবছে। উপরে বেশ খানিকটা অংশ স্বচ্ছ, সেখানে অনেকগুলো খোপ। খোপগুলোর একেকটাতে একেকটা জিনিস। কোনোটাতে চাল, কোনোটাতে ডাল, কোনোটাতে ডিম। এ ছাড়াও আছে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ, শুকনো মরিচ, লবণ এবং তেল। সামনে একটা ডায়াল, সেখানে লেখা—ভাত, ডাল এবং ডিমভাজি। সায়রা জিজ্ঞেস করল, "আগে কোনটা রাঁধব?"

আমি কিছু বলার আগেই বিল্টু বলল, "ডিমভাজি।"

"ঠিক আছে।" সায়রা ডায়ালটা দেখিয়ে বলল, "এখানে চাপ দাও।"

বিল্টু ডায়ালটা চেপে ধরল—সাথে সাথে মনে হল মেশিনের ভেতর ধুন্ধুমার কাজ শুরু হয়ে গেল। ডিমের খোপ থেকে ডিমগুলো গড়িয়ে আসতে থাকে বিশাল একটা পাত্রে। সেগুলো টপটপ করে পড়ে ভেঙে যেতে থাকে। ছাঁকনির মতো একটা জিনিস ডিমের খোসাগুলোকে তুলে নেয় এবং বিশাল একটা ঘুঁটনির মতো জিনিস সেটাকে ঘুঁটতে শুরু করে। অন্য পাশ থেকে পোঁ পোঁ করে একটা শব্দ হয় এবং প্রায় কয়েক কেজি পেঁয়াজ গড়িয়ে আসতে থাকে, মাঝামাঝি আসতেই ধারালো একটা তরবারির মতো জিনিস পেঁয়াজটাকে কুপিয়ে ফালাফালা করে দেয়। সেটা শেষ হবার সাথে সাথে কাঁচা মরিচ নেমে আসে এবং ছোট একটা চাকু সেটাকে কুচি কুচি করে ফেলে। উপরে কী একটা খুলে যায় এবং ঝুরঝুর করে খানিকটা লবণ এসে পড়ল। হঠাৎ সাইরেনের মতো একটা শব্দ হতে থাকল, দেখলাম বিশাল একটা কড়াইয়ের ভেতর গলগল করে প্রায় দুই লিটার তেল এসে পড়ল। বিস্ফোরণের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো একটা শব্দ হল এবং কড়াইয়ের নিচে হঠাৎ ফার্নেসের মতো আগুনের শিখা বের হয়ে এল। দেখতে দেখতে তেল ফুটতে থাকে এবং বিদঘুটে একটা শব্দ করে ঘুঁটে রাখা ডিম সেখানে ফেলে দেওয়া হল। প্রচণ্ড শব্দ করে ডিম ভাজা হতে থাকে। সারা ঘর ভাজা ডিমের গন্ধে ভরে যায়। সায়রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল, এবারে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "সাবধান! সবাই দূরে সরে যান।"

বিল্টু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন সায়রা খালা?"

"ডিমভাজিটা এখন প্লেটে ছুড়ে দেবার চেষ্টা করবে, মাঝে মাঝে মিস করে, তখন বিপদ হতে পারে।"

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভয়ংকর, কারণ উপরে অ্যাম্বুলেন্সের মতো লালবাতি জ্বলতে শুরু করে। মাঝামাঝি একটা জায়গায় কাউন্ট-ডাউন শুরু হয়ে যায়, দশ নয় আট সাত...।

আমরা দূরে সরে গিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ হল এবং মনে হল বিছানার তোশকের মতো হলুদ রঙের একটা জিনিস আকাশের দিকে ছুটে গেল। চাকার মতো সেটা ঘুরতে থাকে—ঘুরতে ঘুরতে সেটা ঘরের এক কোনায় বিশাল এক গামলার মাঝে এসে পড়ল। সায়রা হাততালি দিয়ে বলল, "পারফেক্ট ল্যান্ডিং।"

আমি আর বিল্টু সায়রার পিছু পিছু ডিমভাজিটা দেখতে গেলাম। এর আগে আমি কিংবা মনে হয় পৃথিবীর আর কেউ এত বড় ডিমভাজি দেখে নি। আড়াআড়িভাবে এটা পাঁচ ফিট থেকে এক ইঞ্চি কম হবে না। আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "এত বড় ডিমভাজি?"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "আস্তে আস্তে মেশিনটা স্কেল ডাউন করতে হবে। প্রথমে শুরু করার জন্য সব সময় একটা বড় মডেল তৈরি করতে হয়।"

বিল্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "আমাদের পুরোটা খেতে হবে?"

সায়রা হেসে বলল, "না না, পুরোটা খেতে হবে না। যেটুকু ইচ্ছে হবে সেটুকু খাবে।"

বিল্টু খুব সাবধানে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এই ডিমভাজিটা কমপক্ষে চল্লিশ জন খেতে পারবে।"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। এটা তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, সবকিছু বেশি বেশি করে হয়।"

সায়রা যে মিথ্যে বলে নি একটু পরেই তার প্রমাণ পেলাম—কারণ রান্না করার পর ভাত এবং ডাল ডাইনিং রুমে বড় বড় বালতি করে আনতে হল। আমরা খাবার টেবিলে খেতে বসেছি—চামচ দিয়ে মেঝেতে রাখা বালতি থেকে ভাত-ডাল তুলে নিতে হল। ডিমভাজি চাকু দিয়ে কেটে আলাদা করতে হল।

আমরা খেতে শুরু করা মাত্রই সায়রা চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, "কেমন হয়েছে?"

মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় এবং সেই পাপের কারণে নাকি দোজখের আগুনে শরীরের নানা অংশ পুড়তে থাকবে, কিন্তু আমার ধারণা—কারো মনে কষ্ট না দেবার জন্য মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় না। আমি খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছি এরকম ভান করে বললাম, "খুব ভালো হয়েছে। একেবারে ফার্স্ট ক্লাস।"

বিল্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ফার্স্ট ক্লাস? কী বলছ মামা! খাবার মুখে দেওয়া যায় না। কোনো স্বাদ নাই।"

বিল্টুকে থামানোর জন্য আমি টেবিলের তলা দিয়ে তার পায়ে লাথি মারার চেষ্টা করলাম, লাথিটা লাগল সায়রার পায়ে এবং সে মৃদু আর্তনাদ করে উঠল। বিল্টু অবিশ্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্রূক্ষেপ করল না, বলল, "সায়রা খালা, আপনার মেশিনের রান্নার স্বাদ যদি এরকম হয় তা হলে তার একটাও বিক্রি করতে পারবেন না।"

সায়রা খানিকক্ষণ হতচকিত হয়ে বিল্টুর দিকে তাকিয়ে থেকে ইতস্তত করে বলল, "আমি তো আসলে ঠিক বিক্রি করার জন্য এটা আবিষ্কার করি নাই। এটা আবিষ্কার করেছি নারী জাতিকে রান্নাঘর থেকে মুক্ত করার জন্য।"

কীভাবে কথাবার্তা বলতে হয় সেটা যে বিল্টুকে শেখানো হয় নি আমি এবারে সেটা আবিষ্কার করলাম, সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এটা দিয়ে নারী জাতির মুক্তি হবে না সায়রা খালা, বরং উল্টোটা হতে পারে।"

"উল্টোটা?"

"হ্যাঁ। যে এটা দিয়ে রান্না করবে তাকে ধরে সবাই পিটুনি দিতে পারে। গণপিটুনি।"

আমি এবারে ভাবনাচিন্তা করে বিল্টুর পা কোনদিকে নিশ্চিত হয়ে একটা লাথি কশালাম। বিল্টু ককিয়ে উঠে বলল, "উহ্! মামা—লাথি মারলে কেন?"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "লাথি মারি নি। পা লেগে গেছে!"

"খাবার টেবিলে বসে তুমি কি পা দিয়ে ফুটবল খেল? এত জোরে পা লেগে যায়!"

সায়রার চোখ এড়িয়ে আমি বিল্টুর চোখে চোখ রেখে একটা সিগন্যাল দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো লাভ হল না। বিল্টু বলতেই লাগল, "সায়রা খালা, তোমার এই মেশিন বিক্রি করলে লাভ থেকে ক্ষতি হবে বেশি।"

"কেন?"

"কারণ কেউ এর রান্না খাবে না। যদি কাউকে খাওয়াতে চাও তোমাকে টাকাপয়সা দিয়ে খাওয়াতে হবে। এক প্লেট ভাত দশ টাকা। এক বাটি ডাল বিশ টাকা। ডিমভাজি পঞ্চাশ টাকা। কমপক্ষে সত্তর টাকা।"

আমি আর না পেরে বিল্টুকে ধমক দিয়ে বললাম, "কী আজেবাজে কথা বলছিস বিল্টু? সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা?"

বিল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "না মামা, আমি একটুও ঠাট্টা করছি না। সত্যি কথা বলছি। একেবারে কিরে কেটে বলছি।"

"আমি খাচ্ছি না?" আমি জোর করে মুখে কয়েক লোকমা ভাত ঠেসে দিয়ে বললাম, "আমার তো খেতে বেশ লাগছে!"

"তোমার কথা আলাদা মামা। তুমি নিশ্চয়ই পাগল। আম্মা সব সময় বলে তোমার জন্মের সময় ব্রেনে নাকি অক্সিজেন সাপ্লাই কম হয়েছিল, সেজন্য তুমি কোনো কিছু বোঝ না।"

সায়রাকে বেশ চিন্তিত দেখাল। সে একটা বড় কাগজ দেখতে দেখতে বলল, "আমার মেশিনের রিপোর্ট তো ঠিকই দিয়েছে। এই দেখেন—ডিমভাজার সালফার কন্টেন্ট লিমিটের মাঝে। ডালের পিএইচ পারফেক্ট। ভাতের সারফেস টেক্সচার অপটিমাম।"

আমি উৎসাহ দেবার জন্য বললাম, "মেশিন যেহেতু বলেছে ঠিক, এটা অবিশ্যি ঠিক। বিল্টু সেদিনের ছেলে, সে কী বোঝে? তার কোনো কথা শুনবেন না।"

বিল্টু মুখ বাঁকিয়ে বলল, "সব ঠিক থাকতে পারে কিন্তু কোনো স্বাদ নাই।"

সায়রা হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হয়ে গেল, কিছুক্ষণ কী একটা ভেবে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা জাফর ইকবাল সাহেব, স্বাদ মানে কী?"

হঠাৎ করে এরকম একটা জটিল প্রশ্ন শুনে আমি একেবারে ঘাবড়ে গেলাম। আমতা-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমতা করে বললাম, "স্বাদ মানে হচ্ছে—যাকে বলে—আমরা যখন খাই তখন মানে—ইয়ে—যাকে বলে—"

আরো কিছুক্ষণ হয়তো এরকম আমতা-আমতা করতাম কিন্তু সায়রা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এটা হচ্ছে একটা অনুভূতি। আমরা যখন কিছু খাই তখন জিব তার একটা অনুভূতি পায়, নাক একটা গন্ধ পায়। দাঁত–মাঢ়ী এক ধরনের স্পর্শ অনুভব করে, তার সবগুলো নার্ভ দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছায়। সেখানে নিউরনে এক ধরনের সিনান্স কানেকশন হতে থাকে। মস্তিষ্কের সেই অনুভূতি থেকে আমরা বলি স্বাদটি ভালো কিংবা স্বাদটি খারাপ।"

সায়রার চোখ দুটো এক ধরনের উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করতে থাকে। আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে বুঝতে পারছেন?"

আমি ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে বললাম, "না।"

"তার মানে একটা জিনিসের স্বাদ ভালো করার জন্য কষ্ট করে সেটাকে ভালো করে রান্না করার দরকার নেই। আমরা যদি খুঁজে বের করতে পারি ব্রেনের কোন জায়গাটাতে আমরা খাবারের স্বাদ অনুভব করি সেখানে যদি আমরা এক ধরনের স্টিমুলেশন দিই তা হলে আমরা যেটা খাব সেটাকেই মনে হবে সুস্বাদু।"

বিল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

"এক শ বার সত্যি। তার মানে আমি যদি সেরকম একটা মেশিন তৈরি করতে পারি যেটা দিয়ে ব্রেনের নির্দিষ্ট জায়গায় স্টিমুলেশন দেওয়া যায় তা হলে খবরের কাগজ ছিড়ে ছিড়ে খেলে মনে হবে কোরমা-পোলাও খাচ্ছি!"

আমি চমকে উঠে বললাম, "খবরের কাগজ?"

"হ্যাঁ। স্পঞ্জের স্যান্ডেল খেলে মনে হবে সন্দেশ খাচ্ছেন। কেরোসিন খেলে মনে হবে অরেঞ্জ জুস খাচ্ছেন। পৃথিবীতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দেওয়া যাবে!"

বিল্টু ঢোক গিলে বলল, "কিন্তু সেটা মাথার ভেতরে বসানোর জন্য আপনাকে ব্রেনের অপারেশন করতে হবে! আপনাকে আগে ব্রেনের সার্জারি শিখতে হবে। যদি শিখেও যান তারপরও আমার মনে হয়—"

সায়রা ভুরু কুঁচকে বলল, "কী মনে হয়?"

"খবরের কাগজ, স্পঞ্জের স্যান্ডেল আর কেরোসিন খাবার জন্য কেউ ব্রেনের সার্জারি করতে রাজি হবে না।"

"রাজি হবে না?"

"উঁহু।"

সায়রাকে হঠাৎ খুব চিন্তিত মনে হল।

আমাদের খাওয়ার দাওয়াতটা মোটামুটিভাবে মাঠে মারা গেল বলা যায়। ব্রেনের ভেতরে স্টিমুলেশন দেওয়ার কথা সায়রার মাথায় আসার পর থেকে সে অন্যমনস্ক হয়ে রইল, ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল এবং মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে লাগল। আমরা তাকে আর ঘাঁটালাম না, বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

বিল্টু আর আমি একটা ফাস্টফুডের দোকান থেকে হ্যামবার্গার খেয়ে সে রাতে বাসায় ফিরেছিলাম।

বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমি আগে যেরকম হাবাগোবা ছিলাম এখন আর সেরকম বলা যাবে না। সায়রা সায়েন্টিস্টের সাথে পরিচয় হওয়ার জন্যই হোক আর বিল্টুর জ্বালাতনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণেই হোক আমি মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানের লাইনে এক্সপার্ট হয়ে গিয়েছি। সেদিন বাথরুমের বাল্ব ফটাশ শব্দ করে ফিউজ হয়ে গেল। আমি একটুও না ঘাবড়ে একটা বাল্ব কিনে নিজে লাগিয়ে দিলাম—আমার জীবনে প্রথম। বিল্টু একদিন আমাকে দেখিয়ে দিল, তারপর থেকে আমি নিজে মোড়ের একটা সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ই-মেইল পাঠানো শুরু করে দিয়েছি। প্রথমে পাঠানোর লোক ছিল মাত্র দুজন—সায়রা সায়েন্টিস্ট আর বিল্টু। বিল্টু আরেকদিন আমাকে শিখিয়ে দিল কেমন করে অন্য মানুষের ই-মেইল বের করতে হয়—সেটা জানার পর আমি অনেক জায়গায় ই-মেইল পাঠাতে শুরু করে দিলাম। প্রথমেই আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে খুব কড়া ভাষায় তাদের পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করার জন্য উপদেশ দিয়ে একটা ই-মেইল পাঠিয়ে দিলাম। জার্মানির চ্যান্সেলরের কাছে ই-মেইল পাঠিয়ে তাদের ইমিগ্রেশন পলিসি ঠিক করার জন্য অনুরোধ করলাম। ব্রাজিল ওয়ার্ল্ডকাপে জিতে যাবার পর তাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে ই-মেইল পাঠিয়ে লিখে দিলাম, "শুধু ফুটবল খেললেই হবে না—পড়াশোনাতেও মনোযোগ দিতে হবে, কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।" আমাদের দেশের মন্ত্রীদের বোকামির তালিকা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা ই-মেইল পাঠাব ভাবছিলাম কিন্তু সবাই নিষেধ করল। তা হলে নাকি এসএসএফ-এর লোকজন এসে ক্যাঁক করে ধরে ডিবি পুলিশের হাতে দিয়ে দিবে। তারা রিমান্ডে নিয়ে রামধোলাই দিয়ে অবস্থা কেরোসিন করে দেবে। তবে আমি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় ই-মেইলে সম্পাদকদের কাছে চিঠি পাঠাতে লাগলাম। কয়েক দিনের মাঝেই 'দৈনিক মোমের আলো' পত্রিকায় একটা চিঠি ছাপা হয়ে গেল। চিঠিটা এরকম—

AMARBOI.COM

শৃঙ্খলাবোধ এবং জাতির উন্নতি

পৃথিবীর সকল জাতি যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতেছে তখন আমরা শৃঙ্খলাবোধের অভাবে ক্রমাগত পশ্চাদমুখী হইয়া পড়িতেছি। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, ট্রাফিক সার্জেন্ট যখন রাস্তার মোড়ে একটি ট্রাক ড্রাইভারকে আটক করিয়া ঘুষ আদায় করে তখন কখনো পঞ্চাশ কখনো এক শ কখনো-বা দুই শ টাকা দাবি করেন। ট্রাক ড্রাইভাররা এই অর্থ দিতে গড়িমসি করেন। ইহাতে ট্রাফিক সার্জেন্টদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। তাহারা তাহাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে পারেন না। আন্তর্জাতিক টেন্ডার পাওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয়দের ঘুষ দেওয়া হইতে শুরু করিয়া সচিবালয়ের পিয়নদেরকে পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। ঘুষের রেট নির্ধারিত নয় বলিয়া দর কষাকষি করিতে হয়। উভয় পক্ষের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

কাজেই আমি প্রস্তাব করিতেছি—অবিলম্বে ঘুষের রেট নির্ধারণ করিয়া জাতীয় সংসদে পাস করানোর পর তাহা সরকারি গেজেটভুক্ত করিয়া দেওয়া হোক। যাহারা এই রেট অনুযায়ী ঘুষ দিতে আপত্তি করিবেন তাহাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। পুরো প্রক্রিয়াটি একটি শৃঙ্খলার ভিতরে আনিয়া জাতিকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করানোর পথ সুগম করানো হোক।

জাফর ইকবাল
পল্লবী, মিরপুর

শুধু যে পত্রিকায় ই-মেইল ব্যবহার করে চিঠি পাঠাতে শুরু করলাম তা নয়, পরিচিত লোকজনকে আমার নতুন প্রতিভার কথা জানাতে শুরু করলাম। নতুন কারো সাথে পরিচয়

হলেই তার ই-মেইল অ্যাড্রেস কী জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম এবং ই-মেইল অ্যাড্রেস না থাকলে সেটি নিয়ে বাড়াবাড়ি ধরনের অবাক হতে শুরু করলাম।

আমি যত ই-মেইল পাঠাতে শুরু করলাম সেই তুলনায় উত্তর আসত খুব কম। বিল্টু এবং সায়রা ছাড়া আর কেউ উত্তর দিত না, তাদের উত্তরও হত খুব ছোট—তিন-চার শব্দের। তবুও যেদিন একটা ই-মেইল পেতাম আমি উৎসাহে টগবগ করতে শুরু করতাম, রক্ত চনমন করতে শুরু করত। সায়রার বাসায় সেই দাওয়াত কেলেঙ্কারির প্রায় এক মাস পর হঠাৎ তার কাছ থেকে একটা ই-মেইল পেলাম, সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায়—

> মস্তিষ্কে স্টিমুলেশন সমস্যা সমাধান।
> ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর। প্রোটোটাইপ প্রস্তুত।
> গিনিপিগ প্রয়োজন। দেখা করুন। জরুরি।
>
> সায়রা

সায়রার ই-মেইল বোঝা খুব কঠিন—বিল্টুর কাছে নিয়ে গেলে হয়তো মর্মোদ্ধার করে দিত কিন্তু আমি আর তাকে বিরক্ত করতে চাইলাম না। অনেকবার পড়ে আমার মনে হল, সে একটা যন্ত্র তৈরি করেছে যেটা পরীক্ষা করার জন্য গিনিপিগ দরকার। সে দেখা করতে বলেছে। গিনিপিগসহ নাকি গিনিপিগ ছাড়া যেতে বলেছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। এক হালি গিনিপিগ নিয়েই যাব যাব চিন্তা করে কাঁচাবাজারে বিকেলবেলা খুঁজে দেখলাম, কেউ জিনিসটা চিনতেই পারল না। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত গিনিপিগ ছাড়াই সায়রার বাসায় হাজির হলাম।

আমাকে দেখে সায়রার মুখ এক শ ওয়াট বাল্বের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দরজা খুলে বলল, "এই তো আমার গিনিপিগ চলে এসেছে।"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "আসলে আনতে পারি নাই। কাঁচাবাজারে খোঁজ করেছিলাম, সেখানে নাই।"

"কী নাই?"

"গিনিপিগ।"

সায়রা আমার কথা শুনে হি হি করে হেসে উঠল, মেয়েটা হাসে কম, কিন্তু যখন হাসে তখন দেখতে বেশ ভালোই লাগে। আমি বললাম, "হাসছেন কেন?"

"আপনার কথা শুনে।"

"আমি কি হাসির কথা বলেছি?"

"হ্যাঁ।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কখন?"

"এই যে আপনি বললেন, কাঁচাবাজার থেকে গিনিপিগ আনতে চেয়েছেন। এটাই হাসির কথা—কারণ কাঁচাবাজার থেকে গিনিপিগ আনতে হবে না। আপনিই গিনিপিগ!"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "আমিই গিনিপিগ?"

"যার ওপরে এক্সপেরিমেন্ট করা হয় সে হচ্ছে গিনিপিগ। আপনার ওপর আমার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটরটা পরীক্ষা করব—তাই আপনি হবেন আমার গিনিপিগ।"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "আমার ওপরে পরীক্ষা করবেন?"

"তা না হলে কার ওপরে করব? কে রাজি হবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিটার মাঝে কিছু গোলমাল আছে, কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে পারি না, তাই এবারেও গোলমালটা ধরতে পারলাম না। আমতা-আমতা করে বললাম, "ইয়ে মানে—ব্রেনের মাঝে স্টিমুলেশন—কোনো সমস্যা হবে না তো?"

"এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপার, কখন কী সমস্যা হয় সেটা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে? পারে না।"

"তা হলে?"

সায়রা মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমিও সেটা বলতে চাচ্ছি। ব্রেনের মাঝে সরাসরি স্টিমুলেশন দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা? লেভেলের তারতম্য হতে পারে, বেশি হয়ে যেতে পারে, ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে—সেটা টেস্ট করার জন্য আমি ভলান্টিয়ার কোথায় পাব? সারা পৃথিবীতে কেউ রাজি হত না। তখন হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ল—আপনাকে ই-মেইল পাঠালাম, আপনি এক কথায় রাজি হয়ে চলে এলেন। কী চমৎকার ব্যাপার।"

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "না, মানে ইয়ে—বলছিলাম কী—"

সায়রা বলল, "না না—আপনার কিছু বলার দরকার নেই, আমি জানি আপনি কী বলবেন। আপনি বলতে চাইছেন যে আপনি বিজ্ঞানের 'ব'ও জানেন না—কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আপনি জীবন পর্যন্ত দিতে রাজি আছেন। ঠিক কি না?"

আমি ঢোক গিলে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না। সায়রা মধুর ভঙ্গিতে হেসে বলল, "বিজ্ঞানের উন্নতি কি একদিনে হয়েছে? হয় নি। হাজার হাজার বছর লেগেছে। আমরা শুধু বিজ্ঞানীদের নাম জানি—কিন্তু এই হাজার হাজার বছর ধরে যে লক্ষ লক্ষ ভলান্টিয়ার বিজ্ঞানের জন্য তাদের জীবন দিয়েছে তাদের নাম আমরা জানি না। জানার চেষ্টাও করি না।"

"ভ-ভ-ভলান্টিয়াররা মারা যায়?"

"যায় না? অবশ্যই যায়।" সায়রা মৃদু হেসে বলল, "কিন্তু এখন সেটা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই না—আপনি নার্ভাস হয়ে যাবেন। আসেন আমার সাথে।"

তেলাপোকা যেভাবে কাঁচপোকার পিছু পিছু যায় আমি অনেকটা সেভাবে সায়রার পিছু পিছু তার ল্যাবরেটরি ঘরে গেলাম। একটা টেবিলের উপর নানারকম যন্ত্রপাতি। মনিটরে নানারকম তরঙ্গ খেলা করছে, নানারকম আলো জ্বলছে এবং নিবছে। যন্ত্রপাতিগুলো থেকে ভোঁতা এক ধরনের শব্দ বের হচ্ছে। টেবিলের পাশে ডেন্টিস্টের চেয়ারের মতো একটা চেয়ার। তার কাছে একটা টুল, সেই টুলে মোটরসাইকেল চালানোর সময় যেরকম হেলমেট পরে সেরকম একটা হেলমেট। হেলমেট থেকে নানা ধরনের তার বের হয়ে এসেছে, সেগুলো যন্ত্রপাতির নানা জায়গায় গিয়ে লেগেছে। সায়রা হেলমেটটা দেখিয়ে বলল, "এই যে জাফর ইকবাল সাহেব, এইটা হচ্ছে আমার নিজের হাতে তৈরি ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর।"

"ট্রা-ট্রা-ট্রা—" আমি কয়েকবার যন্ত্রটার নাম বলার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, "কী হয় এই যন্ত্রটা দিয়ে?"

"মনে আছে, খাবারের স্বাদ নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"মনে আছে, আমি বলেছিলাম ব্রেনের নির্দিষ্ট কোনো একটা জায়গায় স্টিমুলেশন দিয়ে খাবারের স্বাদ পাওয়া সম্ভব?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

AMARBOI.COM

"মনে আছে, তখন বিল্টু বলেছিল সেটা করার জন্যে ব্রেন সার্জারি করে ব্রেনের ভেতরে কোন ধরনের ইলেকট্রড বসাতে হবে?"

আমি আবার মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ, মনে আছে।"

সায়রা একগাল হেসে বলল, "আসলে ব্রেনের ভেতরে গিয়ে স্টিমুলেশন দিতে হবে না। বাইরে থেকেই দেওয়া সম্ভব।"

"বাইরে থেকেই?"

"হ্যাঁ। খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সির ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে বাইরে থেকে ব্রেনের ভিতরে স্টিমুলেশন দেওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি, যন্ত্রটা এর মাঝে আবিষ্কার হয়ে গেছে। আমেরিকার ল্যাবরেটরিতে সেটা ব্যবহার হয়। যন্ত্রটার নাম ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর। এটা কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে এনে এখানে তৈরি করেছি। সবকিছু রেডি—এখন শুধু পরীক্ষা করে দেখা।"

"পরীক্ষা করে দেখা?"

"হ্যাঁ। আপনার মাথায় লাগিয়ে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেব—আপনি এক ধরনের স্বাদ অনুভব করতে থাকবেন। মনে হবে পোলাও খাচ্ছেন।"

"যদি মনে না হয়?" আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "যদি অন্য কিছু হয়?"

"তা হলে সেটা দেখতে হবে অন্য কী হচ্ছে। কেন হচ্ছে? কীভাবে হচ্ছে—এটাই হচ্ছে গবেষণা। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান।"

আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সায়রার সামনে আমি না করতে পারলাম না। আমাকে রীতিমতো জোর করে ডেন্টিস্টের চেয়ারে বসিয়ে সে বলল, "চেয়ারের হাতলে হাত রাখেন।"

আমি হাতলের উপর হাত রাখতেই নাইলনের দড়ি দিয়ে সায়রা হাতগুলো বেঁধে ফেলল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "হাত বাঁধছেন কেন?"

"ব্রেনের মাঝে স্টিমুলেশন দিচ্ছি—কী হয় কে বলতে পারে? হয়তো হাত-পা ছুড়ে আপনার শরীরে খিচুনি শুরু হয়ে যাবে। রিস্ক নিয়ে লাভ আছে?"

আমি আর কোনো কথা বলার সাহস পেলাম না। চুপচাপ চেয়ারে বসে রইলাম। বুক ঢাকের মতো শব্দ করে ধকধক করতে লাগল, গলা শুকিয়ে কাঠ। সায়রা কাছে এসে আমার মাথায় হেলমেটটি পরিয়ে দিয়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে সেটা থুতনির সাথে বেঁধে দিয়ে তার যন্ত্রপাতির সামনে চলে গেল। নানারকম সুইচ টেপাটিপি করে বলল, "জাফর ইকবাল সাহেব, আপনি চেয়ারে মাথা রেখে রিলাক্স করেন।"

আমি চি চি করে বললাম, "করছি।"

"স্টিমুলেশন দেওয়ার পর আমি আপনাকে প্রশ্ন করব। আপনি তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। ঠিক আছে?"

আমি আবার চি চি করে বললাম, "ঠিক আছে।"

সায়রা একটা হ্যান্ডেল টেনে বলল, "এই যে আমি স্টিমুলেশন দিতে শুরু করেছি। দশ ডিবি পাওয়ার, কিছু টের পাচ্ছেন?"

আমি ভেবেছিলাম মাথার ভেতরে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে শুরু করবে কিন্তু কিছুই ঘটল না। বললাম, "না।"

"ঠিক আছে পাওয়ার বাড়াচ্ছি। বারো, তেরো, চৌদ্দ ডিবি। এখন কিছু টের পাচ্ছেন?"

আমি কিছুই টের পেলাম না, শুধু হঠাৎ করে একটা দুর্গন্ধ নাকে ভেসে এল। বললাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, কিছুই টের পাচ্ছি না। তবে কোথা থেকে জানি দুর্গন্ধ আসছে।"

সায়রা অবাক হয়ে বলল, "দুর্গন্ধ?"

"হ্যাঁ।"

"কী রকম দুর্গন্ধ?"

"ইঁদুর মরে গেলে যেরকম দুর্গন্ধ হয়।"

সায়রা এদিক-সেদিক শুঁকে বলল, "নাহ্, কোনো দুর্গন্ধ নেই তো? যাই হোক, পরে দেখা যাবে দুর্গন্ধ কোথা থেকে আসছে। এখন আমার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটরটা পরীক্ষা করি। আপনি যেহেতু কোনো কিছু টের পাচ্ছেন না, সিগন্যালটা আরেকটু বাড়াই। এই যে ষোলো–সতেরো–আঠারো ডিবি।"

হঠাৎ একটা বিদঘুটে জিনিস ঘটে গেল—কোথা থেকে একটা মরা ইঁদুর কিংবা ব্যাঙ লাফিয়ে আমার মুখের ভেতর ঢুকে গেল। প্রচণ্ড দুর্গন্ধে আমার বমি এসে যায়। আমি ওয়াক থু করে মুখ থেকে মরা ব্যাঙ কিংবা ইঁদুরটা বের করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু বের করতে পারলাম না। হাত–পা বাঁধা, তাই হাত দিয়েও টেনে বের করতে পারলাম না। আমি গোঙানোর মতো শব্দ করতে লাগলাম। সায়রা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"মুখের ভিতরে—"

"মুখের ভিতরে কী?"

"কী যেন একটা ঢুকে গেছে। পচা ইঁদুর, না হয় ব্যাঙ। ছি, কী দুর্গন্ধ!" আমি প্রায় বমি করে দিচ্ছিলাম।

সায়রা আমার কাছে এসে মুখের ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, "না! আপনার মুখে তো কিছু নেই। সব আপনার কল্পনা।"

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললাম, "না, না, আছে। ভালো করে দেখেন।" আমি মুখ বড় করে হাঁ করলাম।

সায়রা বলল, "আপনার চমৎকার একটা স্বাদের অনুভূতি পাওয়ার কথা। যতক্ষণ না পাচ্ছেন ততক্ষণ পাওয়ার বাড়াতে থাকি।"

আমি চিৎকার করে 'না' করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সায়রা আমার কথা শুনল না। হ্যান্ডেলটা টেনে পাওয়ার আরো বাড়িয়ে দিল। আর আমার মনে হল কেউ যেন আমাকে হাঁ করিয়ে এক বালতি পচা গোবর আমার গলা দিয়ে ঠেসে দিতে শুরু করেছে। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চাইল, ছটফট করে আমি একটা গগনবিদারী চিৎকার দিলাম। আমার চিৎকার শুনে সায়রা নিশ্চয়ই হ্যান্ডেলটা নামিয়ে স্টিমুলেটরের পাওয়ার বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন হঠাৎ করে ম্যাজিকের মতো পচা গোবর, মরা ইঁদুর আর ব্যাঙ, দুর্গন্ধ সবকিছু চলে গেল। আমি এত অবাক হলাম যে বলার মতো নয়—রাগ হলাম আরো বেশি। সায়রার দিকে চোখ পাকিয়ে বললাম, "আপনার এই যন্ত্র মোটেই কাজ করছে না। ভালো স্বাদ পাবার কথা অথচ পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছি।"

সায়রা চোখ বড় বড় করে বলল, "কী বলছেন আপনি! ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর পুরোপুরি কাজ করছে। শুধুমাত্র ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন দিয়ে আপনাকে স্বাদের অনুভূতি দিয়েছি। ভালো না হোক খারাপ তো দিয়েছি!"

"সেটা এক জিনিস হল?"

"এক না হলেও কাছাকাছি।"

"পচা ইঁদুরের স্বাদ আর পোলাওয়ের স্বাদ কাছাকাছি হতে পারে?"

সায়রা বিশ্ব জয় করার মতো একটা ভঙ্গি করে বলল, "হতে পারে। ব্রেনের যে অংশে

AMARBOI.COM

স্বাদের অনুভূতি সেখানে ভালো আর খারাপ অনুভূতি খুব কাছাকাছি। খারাপটা যখন পেয়েছি কাছাকাছি খুঁজলে ভালোটাও পাব।"

"খুঁজলে? কীভাবে খুঁজলে?"

"ট্রায়াল এন্ড এরর। আপনার ব্রেনে যেখানে স্টিমুলেশন দিয়েছি, এখন তার থেকে একটু সরিয়ে অন্য জায়গায় দেব। সেখানে না হলে অন্য জায়গায়, এভাবে খোঁজাখুঁজি করলেই পেয়ে যাব।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি রাজি না। আমার ব্রেনে আপনাকে আমি আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেব না।"

সায়রা মধুরভাবে হেসে বলল, "আপনি এটা কী বলছেন? এত আগ্রহ নিয়ে ভলান্টিয়ার হয়েছেন অথচ এখন বলছেন রাজি না। বিজ্ঞানের জগতে এটা জানাজানি হয়ে গেলে কী হবে আপনি জানেন?"

"যা হয় হোক।"

"ছেলেমানুষি করবেন না জাফর ইকবাল সাহেব—" বলে সায়রা আমার মাথার কাছে এসে মাথায় লাগানো হেলমেটটার মাঝে কী একটা করতে লাগল। খানিকক্ষণ পর তার যন্ত্রপাতিগুলোর কাছে ফিরে গিয়ে বলল—"এখন অন্য জায়গায় গিয়ে স্টিমুলেশন দিচ্ছি। দেখি কী হয়?"

আমি প্রচণ্ড রেগেমেগে বললাম, "না, কিছুতেই না।"

কিন্তু তার আগেই সায়রা হ্যান্ডেলটা টেনে ধরেছে এবং হঠাৎ করে আমার সমস্ত রাগ কেমন করে জানি উবে গেল। শুধু যে রাগ অদৃশ্য হয়ে গেল তাই নয়, আমার হঠাৎ করে কেন জানি হাসি পেতে শুরু করল। আমি সায়রার দিকে তাকালাম এবং তার চেহারাটা এত হাস্যকর মনে হতে লাগল যে আমি আর হাসি আটকে রাখতে পারলাম না, হঠাৎ খিকখিক করে হেসে ফেললাম।

AMARBOI.COM

সায়রা ভুরু কুঁচকে বলল, "কী হল, আপনি হাসছেন কেন?"

"না, না—এমনি।"

"এখন একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছে—এর মাঝে যদি হাসি-তামাশা করেন তা হলে কাজ করব কেমন করে?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আর হাসব না—" বলেও আমি আবার হেসে ফেললাম, হাসতে হাসতে বললাম, "আসলে আপনি একটু সরে দাঁড়ান। আপনাকে দেখলেই হাসি পেয়ে যাচ্ছে।"

সায়রা চোখ পাকিয়ে বলল, "কী বললেন আপনি? আমাকে দেখলেই হাসি পেয়ে যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, আপনার চেহারাটা—হি হি হি—"

সায়রা বেজার মুখ করে বলল, "কী হয়েছে আমার চেহারায়?"

"আয়নাতে কখনো দেখেন নি? মনে হয় নাকটা কেউ অন্য জায়গা থেকে তুলে সুপার গ্লু দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে!" আমি হাসি থামাতে পারি না, হি হি করে হাসতেই থাকি।

সায়রা থমথমে গলায় বলল, "সুপার গ্লু দিয়ে?"

আমি কোনোমতে হাসি থামিয়ে বললাম, "হ্যাঁ। সুপার গ্লু দিয়ে লাগানোর পর মনে হয় দেড়টনি একটা ট্রাক আপনার নাকের ওপর দিয়ে চলে গেছে। পুরো নাকটা ফ্ল্যাট, চ্যাপ্টা এবং ধ্যাবড়া। হি হি হি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়রা খানিকক্ষণ আমার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "দেখেন জাফর ইকবাল সাহেব, আমার ধারণা ছিল আপনি খুব বুদ্ধিমান মানুষ না হলেও মোটামুটি একজন ভদ্র মানুষ। আমার সাথে ভদ্রতাটুকু বজায় রাখবেন। আপনি আমার চেহারা নিয়ে হাসাহাসি করবেন সেটা আমি কখনোই আন্দাজ করতে পারি নি।"

আমি অনেক কষ্ট করে হাসি থামিয়ে বললাম, "আই অ্যাম সরি, সায়রা। আমার অন্যায় হয়েছে—এই যে আমি মুখে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম, আর আমি হাসব না।"

"হ্যাঁ, শুধু শুধু ফ্যাক ফ্যাক করে হাসবেন না। আপনার ব্রেনে এখন দশ ডিবি পাওয়ার যাচ্ছে। এটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, আপনার কী অনুভূতি হয় বলবেন। ঠিক আছে?"

সায়রার মাস্টারনীর মতো কথা বলার ভঙ্গি দেখে হাসিতে আমার পেট ভুটভুট করছিল, কিন্তু আমি অনেক কষ্ট করে হাসি আটকে রেখে বললাম, "ঠিক আছে।"

সায়রা হ্যান্ডেলটা টেনে বলল, "দশ থেকে বাড়িয়ে চৌদ্দ ডিবি করে দিলাম।"

সাথে সাথে আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম।

সায়রা রেগে গিয়ে বলল, "কী হল? আপনাকে বললাম হাসবেন না—শুধু বলবেন কেমন লাগছে। আবার আপনি হাসছেন?"

হাসতে হাসতে আমার চোখে পানি এসে গেল, কোনোমতে নিজেকে থামাতে পারছি না। সায়রা ধমক দিয়ে বলল, "কেন আপনি হাসছেন?"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "হি হি হি—আপনার চোখ!"

"আমার চোখ?"

"হ্যাঁ, মনে হয় ইঁদুরের চোখ! কুতকুত করে তাকিয়ে আছেন। হি হি হি।"

সায়রা কঠিন মুখ করে বলল, "আমি কুতকুত করে তাকিয়ে আছি?"

"হ্যাঁ।" আমি কোনোমতে হাসি আটকে বললাম, "আপনার চোখ দেখলে কী মনে হয় জানেন?"

"কী?"

"কেউ যেন দুইটা তরমুজের বিচি লাগিয়ে দিয়েছে। কালো কালো দুইটা বিচি। হি হি হি—"

সায়রার মুখ এবারে রাগে লাল হয়ে গেল এবং তখন তাকে দেখে আমার হঠাৎ করে পাকা টম্যাটোর কথা মনে পড়ে গেল। আমি অনেক কষ্ট করে হাসি থামিয়ে রাখলাম। সায়রা পাথরের মতো মুখ করে বলল, "আপনাকে নিয়ে কাজ করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে জাফর ইকবাল সাহেব। আপনি কোনোরকম সাহায্য তো করছেনই না শুধু আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছেন।"

"আর করব না। আর করব না সায়রা। খোদার কসম। হাত দুটো খোলা থাকলে দুই হাত জোড় করে আপনার কাছ থেকে মাফ চাইতাম।"

"ঠিক আছে। এবারে একটু মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। আপনার অনুভূতিটি কী বোঝার চেষ্টা করে আমাকে বলার চেষ্টা করুন। বুঝেছেন কী বলেছি?"

"বুঝেছি। একেবারে জলবৎ তরলং।"

"এইবারে পাওয়ার আরেকটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। চৌদ্দ ডিবি থেকে বাড়িয়ে একেবারে বিশ ডিবি। কেমন লাগছে এখন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কোনো কথা না বলে অনেক কষ্ট করে হাসি আটকে রাখার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ করে আমার মনে হতে লাগল, সায়রার থুতনিতে যদি ছাগলের মতো একগোছা দাড়ি থাকত তা হলে কী হত? ব্যাপারটা মাথা থেকে যতই সরিয়ে রাখার চেষ্টা করি না কেন তাতে যেন কোনো লাভ হল না—দৃশ্যটা বারবার আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল এবং আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাৎ করে হাসিতে গড়িয়ে পড়লাম। সায়রার চোখ দিয়ে এবারে একেবারে আগুন বের হতে লাগল—সে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "এবারে আমার কোন জিনিসটা দেখে হাসছেন?"

আমি হাসি থামিয়ে বললাম, "সেটা শুনলে আপনিও হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাবেন।"

"তাই নাকি?" সায়রা ঠাণ্ডা গলায় বলল, "শুনি ব্যাপারটা।"

"আপনার থুতনিতে যদি ছাগলের মতো একটু দাড়ি থাকত তা হলে কী কাণ্ড হত চিন্তা করতে পারেন?" এরকম হাসির একটা ব্যাপার শুনেও সায়রা একটুও হাসল না—কিন্তু আমি হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলাম।

সায়রা খানিকক্ষণ আমার দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "বেশ! আপনি যদি ঠিক করে থাকেন আমাকে সাহায্য করবেন না তা হলে তাই হোক। আপনি যদি আপনার অনুভূতিটা বলতে না চান তা হলে বলবেন না।" সায়রার নাকের পাটা ফুলে উঠল, চোখ থেকে আগুন বের হতে লাগল, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আপনাদের মতো মানুষের সাহায্য ছাড়াই আমি আমার রিসার্চ চালিয়ে যাব। আমি আমার স্টিমুলেটর বন্ধ করে দিচ্ছি—আপনি আপনার বাসায় যান।"

সায়রার রাগ হয়ে কথা বলার ভঙ্গিটা এত মজার যে হাসিতে আমার পেট ফেটে যাচ্ছিল। আমি দেখলাম সার্কাসের জোকারদের মতো সে তার যন্ত্রের হ্যান্ডেলটা টেনে ধরে স্টিমুলেটরের পাওয়ার বন্ধ করে দিল। মুহূর্তে আমার সমস্ত হাসি থেমে গেল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম—মানুষ কত বড় গাধা হলে আমার মতন এরকমভাবে বোকার মতো হাসতে পারে? শুধু কি হাসি—নির্বোধের মতো সায়রার চেহারা নিয়ে কী সব বলেছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি ফ্যালফ্যাল করে সায়রার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সায়রা আমার কাছে এসে আমার হাতের বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, "আপনাকে এখানে আসতে বলাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। শুধু বলবেন আপনার স্বাদের অনুভূতিটি কী, ঝাল না মিষ্টি, টক না তেতো, কিন্তু তা না করে আমার চেহারা নিয়ে টিটকারি মারতে লাগলেন।"

আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগল। আমি কেমন করে এরকম আজেবাজে কথা বলতে পারলাম? সায়রার নাক তো এমন কিছু চ্যাপ্টা নয়, চোখগুলোও বেশ সুন্দর। অথচ একটু আগে একেবারে গাধার মতো সেগুলো নিয়ে হাসাহাসি করেছি। কী লজ্জা! কী লজ্জা!

লজ্জার ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে গিয়েই হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটা আমার পরিষ্কার হয়ে গেল। সায়রার এই যন্ত্র স্টিমুলেশন দিয়ে ঝাল মিষ্টি স্বাদ নয়—আমার হাসির ব্যাপারটা বের করে এনেছে। কী আশ্চর্য! এই সহজ জিনিসটা আমি বুঝতে পারছি না, সায়রাও বুঝতে পারে নি। আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, "সায়রা!"

সায়রা একেবারে আইসক্রিমের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, "বলুন।"

"আপনি বুঝতে পেরেছেন, কী হয়েছে?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। আমার নাকের ওপর দিয়ে দেড়টনি ট্রাক চলে গেছে। আমার চোখগুলো ইঁদুরের মতো কুতকুতে আর আমার থুতনিতে একগোছা ছাগল দাড়ির খুব দরকার।"

"না না, না না।" আমি প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললাম, "আপনার এই যন্ত্র এটা করেছে। আমাকে হাসাতে শুরু করেছে। তুচ্ছ কারণে হাসি। অকারণে হাসি। পাগলের মতো হাসি!"

সায়রা খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি সত্যি বলছেন? আপনি আমার সাথে কোনো ধরনের মশকরা করছেন না?"

"আপনার সঙ্গে কেন আমি মশকরা করব? সত্যিই এটা হয়েছে!"

ধীরে ধীরে হঠাৎ করে সায়রার মুখ একেবারে টিউবলাইটের মতো জ্বলে উঠল, চোখ বড় বড় করে বলল, "তার মানে আমার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর দিয়ে মানুষের সবরকম অনুভূতি তৈরি করে দিতে পারব। হাসি কান্না রাগ ভালবাসা—"

"হ্যাঁ।" আমি মাথা নাড়লাম, "সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা।"

সায়রা বলল, "ন্যায় এবং অন্যায়। সৎ এবং অসৎ।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "সত্যি? সৎ মানুষকে অসৎ, অসৎ মানুষকে সৎ বানাতে পারবেন?"

সায়রা টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "অবশ্যই পারব। অবশ্যই!"

আমি ভেবেছিলাম সায়রা একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে, কিন্তু সে যে সত্যি কথা বলছে সেটা কয়দিন পরেই আমি টের পেয়েছিলাম।

পরের একমাস আমি সায়রার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলাম। আমি হচ্ছি তার গিনিপিগ, আমি যদি যোগাযোগ না রাখি কেমন করে হবে? অনেক সময় নিয়ে ঘেঁটেঘুঁটে সে আমার মস্তিষ্কের সবকিছু বের করে ফেলল। যেমন আমার মস্তিষ্কের একটা জায়গা আছে, সেখানে স্টিমুলেশন দিলে কেমন জানি কান্না পেতে থাকে। তখন আমার সারা জীবনের সব দুঃখের কথাগুলো মনে পড়ে গেল, সেই ছোটবেলায় একটা ফুলদানি ভেঙেছিলাম বলে আমার মা কানে ধরে একটা চড় মেরেছিলেন, সেই কথাটা মনে পড়ে বুকটা প্রায় ভেঙে যাবার মতো অবস্থা হল। পাওয়ার একটু বাড়িয়ে দিতেই আমি এত বড় ধাড়ি মানুষ ভেউভেউ করে কেঁদে ফেললাম—জিনিসটা একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপার, তা না হলে তো লজ্জাতেই মাথা কাটা যেত! কান্না পাবার অংশের কাছাকাছি আর একটা জায়গাতে স্টিমুলেশন দিতেই বুকের ভেতরে কেমন যেন ভালবাসার জন্ম হয়। বিল্টুর জন্য ভালবাসা, অফিসের বড় সাহেবের জন্য ভালবাসা, সায়রার জন্য ভালবাসা, এমনকি গত রাতে মশারির ভেতরে ঢুকে পড়া যে বেয়াদব মশাটাকে রাত দুটোর সময় মারতে হয়েছিল সেটার জন্যও কেমন যেন ভালবাসা এবং মায়া হতে থাকে।

অনুভূতির এইসব জটিল জায়গা থেকে সরে যাবার পর সায়রা আমার মস্তিষ্কের সৃজনশীল জায়গাগুলো বের করে ফেলল। সেখানে এক জায়গায় স্টিমুলেশন দিতেই আমার ভেতরে একটা চিত্রশিল্পীর জন্ম হয়ে গেল। কাগজে একটা ছবি আঁকার জন্য হাত নিশপিশ করতে শুরু করল। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একবার চিত্রপ্রদর্শনীতে গিয়ে যে আধুনিক পেইন্টিংগুলোর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি নি হঠাৎ করে সেটার অন্তর্নিহিত অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মস্তিষ্কের এই এলাকার কাছাকাছি নিশ্চয়ই কবিতা লেখার ব্যাপারটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, সেখানে স্টিমুলেশন দিতেই আমার মাথার মাঝে কবিতা গুড়গুড় করতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি, আমি সায়রার দিকে তাকিয়ে মুখে মৃদু মৃদু হাসি নিয়ে বললাম—

"হে সায়রা
তোমার আবিষ্কার যেন আকাশের পায়রা"

আমার নিজেকে একেবারে কবি কবি মনে হতে লাগল। দাড়ি না কামিয়ে চুল লম্বা করার জন্য হঠাৎ করে ভেতর থেকে কেমন যেন চাপ অনুভব করতে থাকলাম।

মস্তিষ্কের মাঝে কবিতার এলাকার খুব পাশেই নিশ্চয়ই গানের এলাকা। সেখানে স্টিমুলেশন দিতেই আমার গান গাইবার জন্য গলা খুশখুশ করতে লাগল। বেসুরো গান নয়, একেবারে তাল-লয়-ছন্দ মিলিয়ে গান। গুনগুন করে দুই লাইন গেয়েও ফেলেছিলাম কিন্তু তার আগেই সায়রা মাথার মাঝে জায়গা পাল্টে দিল।

ছবি, কবিতা এবং গানের কাছাকাছি জায়গায় আমার অঙ্কের এলাকাটা পাওয়া গেল। সেখানে স্টিমুলেশন দিতেই আমি জীবনের এই প্রথমবার বুঝতে পারলাম যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ মিলিয়ে বিদঘুটে এবং জটিল অঙ্ককে কেন সরল অঙ্ক বলে! শুধু তাই না, বানরের তেল মাখানো একটা বাঁশ বেয়ে ওঠা এবং পিছলে পড়ার একটা অঙ্ক আছে যেটা আমি আগে কখনোই বুঝতে পারি নি—সেই অঙ্কটা হঠাৎ করে আমার কাছে পানির মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার মস্তিষ্কের এই জায়গায় ভালোমতো স্টিমুলেশন দিলে আমি নিশ্চয়ই ল. সা. গু. গ. সা. গু. ব্যাপারটাও বুঝে ফেলতাম কিন্তু সায়রা তার আর চেষ্টা করল না।

মস্তিষ্কের এরকম মজার মজার জায়গা খুঁজে বের করার সাথে সাথে কিছু বিপজ্জনক জায়গাও বের হল। তালুর কাছাকাছি একটা জায়গায় স্টিমুলেশন দিতেই আমি হঠাৎ করে এত ভয় পেয়ে গেলাম যে আর সেটা বলার মতো নয়। সায়রার ল্যাবরেটরিটিকে মনে হতে লাগল একটা অন্ধকার গুহা, সায়রাকে মনে হতে লাগল একটা পিশাচী। তার চোখের দিকে আমি তাকাতে পারছিলাম না। মনে হতে লাগল, সে বুঝি এক্ষুনি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলার রগে কামড় দিয়ে সব রক্ত শুষে খেয়ে ফেলবে। ভয় পেয়ে আমি যা একটা চিৎকার দিয়েছিলাম সেটা আর বলার মতো নয়। ব্যাপারটা টের পেয়ে সায়রা সাথে সাথে পাওয়ার বন্ধ করে আমার জান বাঁচিয়েছে।

মাথার সামনের দিকে একটা অংশে স্টিমুলেশন দিতেই আমি কেমন জানি অসৎ হয়ে গেলাম। গালকাটা বক্কর, তালুছোলা ফাক্কু এরকম সব সন্ত্রাসী, পাজি সাংসদ আর অসৎ মন্ত্রীদের কেমন জানি নিজের মানুষ বলে মনে হতে লাগল! সায়রাকে একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে কীভাবে তার বাসার সবকিছু খালি করে নিয়ে ধোলাইখালে বিক্রি করে দেওয়া যায়—তার একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা আমার মাথায় চলে এল। শুধু তাই না, আমার মনে হতে লাগল খামকা কাজকর্ম করে সময় নষ্ট না করে একটা ব্যাংক ডাকাতি করলে মন্দ হয় না। কোথা থেকে সস্তায় সেজন্য অস্ত্র কেনা যাবে সেই ব্যাপারটাও মাথার মাঝে চলে এল। এতদিন কেন চুরিচামারি করি নি—সেটা ভেবে কেমন যেন দুঃখ দুঃখ লাগতে লাগল। আরো বেশি সময় স্টিমুলেশন দিলে কী হত কে জানে, কিন্তু সায়রা হ্যান্ডেল টেনে পাওয়ার কমিয়ে আনল।

তবে আমার মস্তিষ্কের সবচেয়ে ভয়ংকর জায়গাটা ছিল মাথার তালু থেকে একটু ডানদিকে। সায়রা যখন আমার এই জায়গাটা বের করে স্টিমুলেশন দিয়েছে তখন হঠাৎ করে আমার কেমন জানি রাগ উঠতে থাকে। কেন ফ্যানটা ঘুরছে সেটা নিয়ে রাগ, কেন আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেন্টিস্টের চেয়ারের মতো চেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছি সেটা নিয়ে রাগ, কেন মাথায় হেলমেটের মতো এই জিনিসটা সেটা নিয়ে রাগ, সায়রা কেন যন্ত্রপাতির সামনে বসে আছে সেটা নিয়ে রাগ। শুধু তাই নয়—হঠাৎ করে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল আর আমি সেই টিকটিকির ওপরে এমন রেগে উঠলাম যে বলার মতো নয়। আমি যে রেগে উঠেছি সায়রা সেটা বুঝতে পারে নি। সে হ্যান্ডেল টেনে পাওয়ারটা একটু বাড়িয়ে দিল। সাথে সাথে আমি রাগে একেবারে অন্ধ হয়ে গেলাম। কী করছি বুঝতে না পেরে আমি আঁ আঁ করে চিৎকার করে সায়রার গলা টিপে ধরার জন্য ছুটে গেলাম। ভাগ্যিস সায়রা হ্যান্ডেল টেনে পাওয়ার কমিয়ে দিল, তা না হলে কী যে হত চিন্তা করেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়! কে জানে হয়তো খুনের দায়ে বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটাতে হত!

যাই হোক শেষ পর্যন্ত মাসখানেক পরে যন্ত্রটা যখন শেষ হল সেটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একটা বাক্সের মতো জিনিসে সব ধরনের ইলেকট্রনিক্স, সেখান থেকে একটা মোটা তার গিয়েছে লাল রঙের একটা হেলমেটে। হেলমেটটা মাথায় দিলে খুব হালকা টুংটাং একটা বাজনা শোনা যায়। এই যন্ত্রটা কন্ট্রোল করার জন্য টিভির রিমোট কন্ট্রোলের মতো একটা জিনিস, সেখানে লেখা আছে, 'হাসি', 'রাগ', 'ভালবাসা', 'কবিত্ব ভাব' এই ধরনের কথাবার্তা। নির্দিষ্ট সুইচটা টিপে ধরলেই হেলমেট পরা মানুষের মাথায় সেই অনুভূতিগুলো আমার মস্তিষ্ক ব্যবহার করে বের করা হয়েছে চিন্তা করেই গর্বে আমার বুক দশ হাত ফুলে উঠতে লাগল।

সবকিছু দেখে আমি সায়রাকে বললাম, "এই আবিষ্কারের কথাটা খবরের কাগজে দিতে হবে।"

"খবরের কাগজে?"

"হ্যাঁ।" আমি একগাল হেসে বললাম, "বড় করে একটা রঙিন ছবি থাকবে। আমি হেলমেট পরে হাসিমুখে বসে আছি, পাশে আপনি যন্ত্রের হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। নিচে ব্যানার হেডলাইন—

বাঙালি মহিলার যুগান্তকারী আবিষ্কার—
মানুষের অনুভূতি এখন হাতের মুঠোয়।"

AMARBOI.COM

সায়রা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি এতটুকু নিরুৎসাহিত না হয়ে বললাম, "ভেতরে লেখা থাকবে, বাঙালি মহিলার যুগান্তকারী আবিষ্কারের কারণে এখন মানুষের অনুভূতি হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারে তার অন্যতম সহযোগী বিজ্ঞানের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, নিঃস্বার্থ, জনদরদি, সাহসী, অকুতোভয়, স্বেচ্ছাসেবক মুহম্মদ জাফর ইকবাল!"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "আপনার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। খবরের কাগজের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই—এইসব খবর ছাপবে! এক্সপেরিমেন্ট করার সময় যদি কোনোভাবে আপনার ব্রেন সিদ্ধ হয়ে যেত তা হলে হয়তো ছাপাত!"

আমি বললাম, "কে জানে, হয়তো খানিকটা সিদ্ধ হয়েছে।"

সায়রা উদাস মুখে বলল, "হয়তো হয়েছে। আপনি যখন থুথুড়ে বুড়ো হবেন তখন বোঝা যাবে। ততদিনে সেটা তো আর খবর থাকবে না!"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আপনি যা-ই বলেন না কেন—আমার মনে হয় এটা গরম একটা খবর হতে পারে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "বিজ্ঞানের আবিষ্কারের খবর, খবরের কাগজে ছাপানোর কথা না—সেটা ছাপানোর কথা জার্নালে!"

কথাটা আমার একেবারেই পছন্দ হল না, ছোট ছোট টাইপে লেখা খটমটে বিজ্ঞানের ভাষায় লেখা জিনিস জার্নালে ছাপা হলেই কি, আর না হলেই কি? জার্নালে ছাপালে নিশ্চয়ই আমার ছবি ছাপা হবে না। আমি বললাম, "জার্নালে-ফার্নালে না, এটা খবরের কাগজেই ছাপাতে হবে, তার সাথে টেলিভিশনে একটা সাক্ষাৎকার।"

আমি খুব একটা হাস্যকর কথা বলেছি—সেরকম ভান করে সায়রা হি হি করে হাসতে শুরু করল।

আমি অবশ্য হাল ছাড়লাম না, পরদিন কাজে লেগে গেলাম।

প্রথমে যে খবরের কাগজের সম্পাদক আমার সাথে দেখা করতে রাজি হলেন তাঁকে দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম—মাথায় বিশাল পাগড়ি এবং প্রায় দেড়ফুট লম্বা দাড়ি। দাড়ি একসময় সাদা ছিল, এখন মেহেদি দিয়ে টকটকে লাল। আমি যখন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম, ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "কী বললেন? মহিলা সায়েন্টিস্ট? নাউজুবিল্লাহ!"

আমি বললাম, "নাউজুবিল্লাহ কেন হবে? মেয়েরা কি সায়েন্টিস্ট হতে পারে না? হাদিসে আছে—"

পুরুষ এবং মহিলার পড়াশোনা নিয়ে হাদিসটা সম্পাদক সাহেব শুনতে রাজি হলেন না। বললেন, "আমাদের পত্রিকা চলে মিডলইস্টের টাকাতে। সেই দেশের মেয়েরা ভোট দিতে পারে না—আর আমি লিখব মহিলা সায়েন্টিস্টের কথা? আমার রুটিরুজি বন্ধ করে দেব? আমার মাথা খারাপ হয়েছে?"

কাজেই আমাকে অন্য একটি পত্রিকা অফিসে যেতে হল। সম্পাদক সাহেব আমার সব কথা শুনে অনেকক্ষণ সরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কোন পার্টি?"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "কোন পার্টি মানে?"

"মানে কোন পার্টি করে? আমাদের এইটা পার্টির পত্রিকা। আমাদের পার্টি না হলে ছাপানো যাবে না—"

"কিন্তু সে তো পার্টি করে না।"

"গুড! আজকেই তা হলে পার্টির মেম্বার হয়ে যেতে বলুন। মহিলা শাখা আছে, তাদের মিটিং-মিছিলে যেতে হবে কিন্তু—"

সম্পাদক সাহেব আরো অনেক কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার আর শোনার সাহস হল না। তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

এর পরের পত্রিকার সম্পাদকের সাথে দেখা করার জন্য অনেক ঘোরাঘুরি করতে হল। শেষ পর্যন্ত যখন দেখা হল, ভদ্রলোক আমার কথা শোনার সময় সারাক্ষণ একটা ম্যাচের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলেন। আমার কথা শেষ হবার পর বললেন, "ভালো একটা নিউজ হতে পারে।"

আমি উৎসাহ পেয়ে বললাম, "আরো অনেক আবিষ্কার আছে। সব শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন।"

সম্পাদক সাহেব আরেকটা ম্যাচের কাঠি বের করে কান চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "তবে আমাদের পত্রিকা তো ট্যাবলয়েড, আমরা একটু রগরগে জিনিস ছাপাতে পছন্দ করি। পাবলিক ভালো খায়, পত্রিকা বেশি বিক্রি হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রগরগে?"

"হ্যাঁ। নিউজটা ইন্টারেস্টিং করার জন্য খবরটা একটু রগরগে করতে হবে। কিছু স্ক্যান্ডাল ঢোকাতে হবে।"

আমি অবাক হয়ে মুখ হাঁ করে বললাম, "স্ক্যান্ডাল?"

"হ্যাঁ। খুঁজলেই পাওয়া যায়।" ভদ্রলোক কান চুলকানো বন্ধ করে খুব মনোযোগ দিয়ে ম্যাচের কাঠিটা পর্যবেক্ষণ করে বললেন, "আর না থাকলে ক্ষতি কী? আমরা বানিয়ে বসিয়ে দেব। পাবলিক কপ কপ করে খাবে।"

পত্রিকার খবর আমি এতদিন পড়ার জিনিস বলে জানতাম, এখানে এসে শুনছি সেটা খাবার জিনিস। আরো নতুন জিনিস শেখার একটা সুযোগ ছিল কিন্তু স্ক্যান্ডাল বানানো নিয়ে সম্পাদক সাহেবের উৎসাহ দেখে আমার আর থাকার সাহস হল না। বিদায় না নিয়েই সরে এলাম।

এর পরে অনেক খোঁজখবর করে যে পত্রিকা অফিসে গেলাম সেটার নাম 'দৈনিক মোমের আলো'। এই পত্রিকায় আমার একটা চিঠি ছাপা হয়েছিল বলে আমার ধারণা পত্রিকার ওপর আমার একটু দাবিও আছে। সম্পাদক সাহেব খুব ব্যস্ত—আমি কথা শুরু করতেই বললেন, "বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর খবর?"

"হ্যাঁ। খুব সাংঘাতিক আবিষ্কার—"

সম্পাদক সাহেব হা হা করে হেসে বললেন, "আমি তো বিজ্ঞানের 'ব'-ও জানি না, তাই আবিষ্কারের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝব না। তবে—"

"তবে কী?"

"আমাদের বিজ্ঞানের পাতা দেখার জন্য আমরা ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ রাখি। সেই প্রফেসর সাহেব এইসব ব্যাপারগুলো দেখে দেন। সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি আগে এই প্রফেসরের সাথে দেখা করেন।"

"কী নাম প্রফেসরের?"

"প্রফেসর এম. জি. আলী।"

আমি প্রফেসর এম. জি. আলীর বাসার ঠিকানা নিয়ে এলাম—তার ভালো নাম মোল্লা গজনফর আলী। ইউনিভার্সিটির মাস্টার কিন্তু মনে হল ঢাকা শহরের সব স্কুল-কলেজ-ট্রেনিং সেন্টারে পড়ান। অনেক কষ্ট করে তাঁকে একদিন টেলিফোনে ধরতে পারলাম। কী জন্য ফোন করেছি বলার পর গজনফর আলী বললেন, "বুঝতেই পারছেন, মোমের আলো—এত বড় একটা পত্রিকা তো আর সোজা ব্যাপার না, ইচ্ছা করলেই তো সেখানে কিছু ছাপানো যায় না। আমার কথায় কাজ হয়—"

আমি বিনয় করে বললাম, "সেই জন্যই তো আপনার কাছে ফোন করেছি।"

গজনফর আলী বললেন, "ফোনে কি আর কাজ হয়? পত্রিকায় ছাপা হলে ন্যাশনাল ব্যাপার হয়ে যায়। বিজনেস কমিউনিটি ইন্টারেস্ট দেখায়—লাখ লাখ টাকার ট্রানজেকশন হতে পারে—হে হে হে—"

বাক্য শেষ না করে হঠাৎ করে তিনি কেন হাসলেন বুঝতে পারলাম না। বললাম, "আবিষ্কারটা আমি নিয়ে আসব?"

"আবিষ্কার কি নিয়ে আসার জিনিস? যেটা আনলে কাজ হবে সেটা নিয়ে আসেন। একটা পেটমোটা এনভেলপ। হে হে হে—"

গজনফর আলী কেন এনভেলপের কথা বললেন আর আবার কেন হাসলেন আমি বুঝতে পারলাম না। বললাম, "যিনি আবিষ্কার করেছেন তাকে সহ নিয়ে আসব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি মনে হয় বুঝতে পারছেন না।" গজনফর আলী একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, "আমি আপনাকে দেখব। আপনি আমাকে দেখবেন। এইটা দুনিয়ার নিয়ম। বুঝেছেন?"

"জ্বি জ্বি বুঝেছি। আমি কালকেই আপনার বাসায় চলে আসব—তখন আপনি আমাকে দেখবেন আমিও আপনাকে দেখব। সামনাসামনি দেখে পরিচয় হবে।"

ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন জানি গজনফর আলী হঠাৎ করে আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠলেন। আমি অবিশ্যি কিছু মনে করলাম না—গরজটা যখন আমার কিছু তো সহ্য করতেই হবে! মোল্লা গজনফর আলীকে যদি নরম করতে পারি তা হলেই পত্রিকায় একটা ছবি ছাপানো যাবে। সারা জীবনের শখ পত্রিকায় একটা ছবি ছাপানো—কাজেই আমি তার বিরক্তিটা হজম করে নিলাম।

তবে ঝামেলাটা হল সম্পূর্ণ অন্য জায়গায়—সায়রা বেঁকে বসল। মাথা নেড়ে বলল, "আমি কোথাও যেতে পারব না।"

"না গেলে কেমন করে হবে? পত্রিকায় একটা নিউজ করতে চাইলে একটু কষ্ট করতে হবে না?"

"আমি কি খুন করেছি না মার্ডার করেছি যে পত্রিকায় নিউজ হতে হবে?"

"কী বলছেন আপনি?" আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, "এই একটা সুযোগ, পত্রিকায় আপনার সাথে আমার একটা ছবি ছাপা হত—দশজনকে দেখাতাম।"

সায়রা মুচকি হেসে বলল, "আপনার যখন এত শখ ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর নিয়ে আপনি চলে যান।"

"আমি?" সায়রা ঠাট্টা করছে কি না আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, বললাম, "আমি যন্ত্রটার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারি না—আর আমি সেটা নিয়ে যাব?"

"আপনাকে আমি সব শিখিয়ে দিচ্ছি। কেমন করে চালায় সেটাও শিখিয়ে দেব।"

"আমি এখনো নিজে নিজে টেলিভিশন চালাতে পারি না—"

সায়রা হেসে বলল, "ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর চালানো টেলিভিশন চালানো থেকে সোজা!"

যন্ত্রপাতিকে আমি খুব ভয় পাই—কিছুতেই আমি রাজি হতাম না, কিন্তু পত্রিকায় ছবি ছাপা হবে ব্যাপারটা আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম।

গজনফর আলীর বাসার বাইরে থেকেই ভেতরে একটা তুলকালাম কাণ্ড হচ্ছে বলে মনে হল, একজন মহিলা খনখনে গলায় বলল, "তোমার সাথে বিয়ে হয়ে আমার জীবন বরবাদ হয়ে গেছে। আমার বাবা যদি হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দিত তা হলেই আমি ভালো থাকতাম।"

শুনতে পেলাম গজনফর আলী বলছেন, "তোমাকে না করেছে কে? হাত-পা বেঁধে এখন নদীতে লাফাও না কেন? আমার জানে তা হলে পানি আসে।"

"কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? তুমি জান আমার বাবার ড্রাইভারের বেতন তোমার থেকে বেশি?"

গজনফর আলী বললেন, "শুধু বেতন কেন? সবকিছুই তো বেশি।"

মহিলা খনখনে গলায় বললেন, "কী বলতে চাইছ তুমি?"

"বলতে চাইছি যে তোমার মায়ের ওজন চিড়িয়াখানার হাতির ওজনের থেকে বেশি। তোমার ওজন—"

গজনফর আলী কথা শেষ করতে পারলেন না—মনে হল তাকে কিছু একটা আঘাত করল। আরো বেশি সময় অপেক্ষা করলে অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে তাই আমি কলিংবেলটা চেপে ধরলাম। ভেতরে হইচই এবং তুলকালাম কাণ্ড হঠাৎ করে থেমে গেল। গজনফর আলী নাকি গলায় বললেন, "কে?"

"আমি।"

"আমি কে?"

"ঐ যে কালকে যে আবিষ্কার নিয়ে কথা বলেছিলাম—সেটা নিয়ে এসেছি।"

মনে হল ভেতরে কেউ গজগজ করে নিচু স্বরে কথা বলল, তারপর দরজা খুলে দিল। প্রফেসর গজনফর আলী একটা রুমাল দিয়ে নাক চেপে দাঁড়িয়ে আছেন। নাকের ওপর একটা আঘাত এসেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পাশের ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই তার স্ত্রী—সাইজে গজনফর আলীর দ্বিগুণ। ভদ্রলোকের সাহস আছে মানতে হয়, তা না হলে কেউ এরকম একজন স্ত্রীর সাথে এভাবে ঝগড়া করে?

গজনফর আলী রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে নাকি গলায় বললেন, "যেটা আনতে বলেছি সেটা এনেছেন?"

"না, মানে ইয়ে—সায়েন্টিস্ট? তিনি আসতে রাজি হলেন না, আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

গজনফর আলী খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি কি সায়েন্টিস্টের কথা বলেছি? আমি এনভেলপের কথা বলছি। আপনাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না, শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট করেন।"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "একবার এই যন্ত্রটা দেখেন! এটার নাম হচ্ছে ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর—"

আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে গজনফর আলী বললেন, "এটা ছাতামাতা যাই হোক আপনি রেখে যান। আমি দেখে নেব।"

"আপনি নিজে নিজে দেখতে পারবেন না। কীভাবে কাজ করে দেখিয়ে দিই।"

গজনফর আলী মুখ বাঁকা করে বললেন, "একটা সিস্টেম কীভাবে কাজ করে সেটা আপনি জানেন না—আর আপনি আমাকে এই যন্ত্র কীভাবে কাজ করে সেটা শিখাবেন?"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেললাম, "আপনাদের ফ্যামিলির জন্য এটা খুব দরকারি হতে পারত—"

গজনফর আলী নাক থেকে রুমাল সরিয়ে বললেন, "আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?"

"না মানে ইয়ে—বলছিলাম কী, বাইরে থেকে শুনেছিলাম দুইজনে ঝগড়া করছিলেন।"

এবারে গজনফর আলীর স্ত্রী হাত মুষ্টিবদ্ধ করে এক পা এগিয়ে এসে বললেন, "আপনার এত বড় সাহস? দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের ব্যক্তিগত কথা শোনেন?"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, "আসলে চোখের যেরকম পাতি আছে কানের তো সেটা নেই। তাই চোখের পাতি ফেলে দেখা বন্ধ করে ফেলা যায়, কিন্তু শোনা তো বন্ধ করা যায় না—"

"তাই বলে আপনি—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কিন্তু এই যন্ত্রটা ব্যবহার করে দেখেন আপনাদের ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ হয়ে যাবে।"

গজনফর আলীর স্ত্রী চোখ ছোট ছোট করে বললেন, "কীভাবে সেটা সম্ভব হবে?" তিনি গজনফর আলীকে দেখিয়ে বললেন, "এই চামচিকে যে বাসায় থাকে সেই বাসায় কি ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ হতে পারে?"

গজনফর আলী হাত নেড়ে বললেন, "মুখ সামলে কথা বলো, না হলে কিন্তু খুনোখুনি হয়ে যাবে—"

"কী? তুমি আমাকে খুন করবে? তোমার এত বড় সাহস?"

আবার দুজনের মধ্যে একটা হাতাহাতি শুরু হতে যাচ্ছিল, আমি কোনোমতে থামালাম। বললাম, "ঝগড়া না করে এই যন্ত্রটা ব্যবহার করে দেখেন।"

গজনফর আলীর স্ত্রী বললেন, "কী হবে এই যন্ত্রটা ব্যবহার করলে?"

আমি রিমোট কন্ট্রোলের মতো জিনিসটা দেখিয়ে বললাম, "এই যে দেখছেন এখানে লেখা আছে 'ভালবাসা'—এই বোতামটা টিপলেই আপনার হাজব্যান্ডের জন্যে ভালবাসা হবে।"

"বোতাম টিপলেই?"

"আগে যন্ত্রটার পাওয়ার অন করে এই হেলমেটটা পরে নিতে হবে।"

"তা হলেই এই চামচিকার জন্য আমার ভালবাসা হবে?"

"হ্যাঁ।"

তারপরে যে ঘটনাটা ঘটল আমি সেটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ করে ভদ্রমহিলা হি হি করে হাসতে হাসতে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হাসতে হাসতে প্রথমে তার চোখে পানি এসে গেল এবং শেষের দিকে তার হেঁচকি উঠতে লাগল। কোনোমতে বললেন, "এই চামচিকার জন্য ভালবাসা? যাকে দেখলেই মনে হয় ছারপোকার মতো টিপে মেরে ফেলি, তার জন্য ভালবাসা? যার চেহারাটা ছুঁচোর মতো, স্বভাবটা চিকার মতো—তার জন্য ভালবাসা? হি হি হি।"

আমি কী করব বুঝতে পারলাম না, বলা যেতে পারে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। গজনফর আলীর স্ত্রী হাসতে হাসতে মনে হয় একসময় ক্লান্ত হয়ে সোফার মাঝে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক আছে! লাগান আমার মাথায়, দেখি এটা কী করে?"

গজনফর আলী খুব রাগ রাগ চোখে আমার দিকে আর তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তার মাঝেই ভয়ে ভয়ে যন্ত্রটার সুইচ অন করে হেলমেটটা গজনফর আলীর স্ত্রীর মাথায় পরিয়ে দিলাম। তারপর কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে হালকাভাবে 'ভালবাসা' বোতামটিতে চাপ দিলাম।

এতক্ষণ গজনফর আলীর স্ত্রীর মুখে এক ধরনের তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার ভাব ছিল, বোতামটা টিপতেই সেটা সরে গিয়ে তার মুখটা কেমন জানি নরম হয়ে গেল। গজনফর আলীও তার স্ত্রীর নরম মুখটা দেখে কেমন জানি অবাক হয়ে গেলেন।

আমি বোতামটা আরো একটু চাপ দিয়ে মস্তিষ্কে স্টিমুলেশন আরেকটু বাড়িয়ে দিলাম, সাথে সাথে গজনফরের স্ত্রীর গলা দিয়ে বাঁশির মতো এক ধরনের সুর বের হল, তিনি তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওগো! তুমি ওরকম মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমার পাশে এসে বস।"

স্ত্রীর গলার স্বর শুনে গজনফর আলী একেবারে হকচকিয়ে গেলেন, কেমন জানি ভয়ের চোখে একবার আমার দিকে আরেকবার তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তার স্ত্রীর চোখ কেমন জানি ঢুলুঢুলু হয়ে এসেছে, একরকম মায়া মায়া গলায় বললেন, "ওগো! তোমার সাথে আমি

কত খারাপ ব্যবহার করেছি। কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও গো!"

আমি সুইচ টিপে পাওয়ার আরেকটু বাড়াতেই গজনফর আলীর স্ত্রীর গলা দিয়ে একেবারে মধু ঝরতে লাগল, "ওগো গজু। ওগো সোনামণি। ওগো আমার আকাশের চাঁদ— আমি কত নিষ্ঠুরের মতন তোমার নাকে ঘুসি মেরেছি। আমার হৃদয়ের টুকরোর ওপর কেমন করে এই অত্যাচার আমি করতে পারলাম! হাবিয়া দোজখেও তো আমার জায়গা হবে না। আমি কোথায় যাব গো গজু! আমার কী হবে গো গজু!"

গজনফরের স্ত্রী এবারে ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বলো আমাকে ক্ষমা করেছ? বলো গো সোনার টুকরা। চাঁদের খনি। তুমি বলো, তা না হলে আমি তোমার পায়ে মাথা ঠুকে আত্মঘাতী হব। এই জীবন আমি রাখব না—কিছুতেই রাখব না—"

গজনফর আলীর স্ত্রী সত্যি সত্যি সোফা থেকে উঠে তার স্বামীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি সুইচ থেকে হাত সরিয়ে স্টিমুলেশন বন্ধ করে দিলাম।

গজনফর আলীর স্ত্রী কেমন জানি ভ্যাবাচেকা মেরে সোফায় বসে রইলেন। একবার আমার দিকে তাকান, একবার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর যন্ত্রের দিকে, আরেকবার তার স্বামী গজনফর আলীর দিকে তাকান। অনেকক্ষণ পর ফিসফিস করে বললেন, "কী আশ্চর্য! কী আচানক ব্যাপার!"

আমি তখন মোটামুটি যুদ্ধজয়ের ভঙ্গি করে গজনফর আলীর দিকে তাকিয়ে বললাম, "দেখেছেন? এটার নাম হচ্ছে ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর।" সায়রা যেসব জিনিস মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিল, সেগুলি মুখস্থ বলতে শুরু করলাম, "মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট জায়গায় উচ্চ কম্পনের চৌম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে এটার স্টিমুলেশন দেওয়া হয়। স্টিমুলেশন দিয়ে একেক রকম অনুভূতি জাগিয়ে তোলা যায়। যেমন মনে করেন—"

গজনফর আলী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এটা কে তৈরি করেছে?"

"একজন মহিলা সায়েন্টিস্ট—তার নাম হচ্ছে সায়রা সায়েন্টিস্ট।"

গজনফর আলী খুব তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে আর যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কী কী অনুভূতি তৈরি করা যায়?"

আমি রিমোট কন্ট্রোলের মতো যন্ত্রটা দেখিয়ে বললাম, "এই যে দেখেন, এখানে সব লেখা আছে। হাসি কান্না ভালবাসা থেকে শুরু করে রাগ দুঃখ ভয় সবকিছু।" আমি তারপর গজনফর আলীকে সাবধান করে দিয়ে বললাম রাগ দুঃখ ভয় এইসব অনুভূতি থেকে খুব সাবধানে থাকতে—বিপদ হয়ে যেতে পারে। গজনফর আলী খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে বললেন, "এটা কেমন করে চালায়?"

আমি গজনফর আলীকে ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর চালানোটা শিখিয়ে দিলাম। গজনফর আলীর চোখ কেমন জানি চকচক করতে লাগল, একটা নিশ্বাস আটকে রেখে বললেন, "ঠিক আছে জাফর ইকবাল সাহেব, আপনার যন্ত্রটা আপনি আজকে রেখে যান, আমি দেখি। কালকে আপনি একবার আসেন, তখন ঠিক করা যাবে এটা নিয়ে কী ধরনের রিপোর্ট লেখা যায়।"

সায়রা সায়েন্টিস্টের তৈরি এই যন্ত্রটা আমার একেবারেই রেখে যাওয়ার ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু আমি না করতে পারলাম না। এই মানুষটা না বলা পর্যন্ত 'দৈনিক মোমের আলো' পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপা হবে না—আমার ছবি ছাপা হবে না, কাজেই কিছু করার নেই। তবে

মোল্লা গজনফর আলী আজকে একেবারে নিজের চোখে এটার কাজ দেখেছেন, কাজেই ভালো একটা রিপোর্ট না লিখে যাবেন কোথায়?

পরের দিন অফিস থেকে একেবারে সোজা গজনফর আলীর বাসায় চলে গেলাম। আজকে আর ভেতরে হইচই হচ্ছে না, আমি তাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কলিংবেল টিপলাম। বেশ কয়েকবার টেপার পর গজনফর আলী দরজা খুললেন। আমাকে দেখে কেমন যেন ভঙ্গি করে বললেন, "কাকে চান?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমাকে চিনতে পারছেন না? গতকাল ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর নিয়ে এসেছিলাম!"

"ও! ও!" হঠাৎ মনে পড়েছে সেরকম ভান করে বললেন, "ঐ যে খেলনাটা নিয়ে এলেন!"

"খেলনা?" আমি প্রায় আর্তনাদ করে বললাম, "খেলনা কী বলছেন? যুগান্তকারী আবিষ্কার।"

গজনফর আলী মুখ বাঁকা করে হেসে বললেন, "আপনাদের নিয়ে এই হচ্ছে সমস্যা! কোনটা আবিষ্কার আর কোনটা খেলনা তার পার্থক্য ধরতে পারেন না।"

"কী বলছেন আপনি?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "আপনার স্ত্রীর মাথায় লাগিয়ে পরীক্ষা করলাম আমরা, মনে নাই? আপনাকে ভালবেসে গজু বলে ডাকলেন—"

গজনফর আলী হাত নেড়ে বললেন, "ঠাট্টা সব ঠাট্টা। আমার স্ত্রী খুব রসিক, সে ঠাট্টা করছিল, আমাকে বলেছে।"

"অসম্ভব!" আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, "হতেই পারে না।"

গজনফর আলী চোখ পাকিয়ে বললেন, "আপনি আমার বাসায় এসে আমার ওপর গলাবাজি করছেন, আপনার সাহস তো কম নয়।"

আমি গলা আরো উঁচু করে বললাম, "আপনি আমার সাথে মিথ্যা কথা বলবেন আর আমি সেটা সহ্য করব?"

গজনফর আলী ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "আপনি চলে যাবার পর আপনার ঐ খেলনাটা আমি এক ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করেছি। কোনো কাজ করে না। মাঝে মাঝে হালকা টুংটাং শব্দ শোনা যায়। উল্টো হেলমেটের সাইডে ধারালো একটা জিনিসে ঘষা লেগে আমার গাল কেটে গেছে। এই দেখেন...।" গজনফর আলী তার গালে একটা কাটা দাগ দেখালেন।

আমি বললাম, "মিথ্যা কথা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে শেভ করতে গিয়ে কেটেছে।"

"শেভ কীভাবে করতে হয় আমি জানি। আপনার জন্মের আগে থেকে আমি শেভ করি।" গজনফর আলী চোখ পাকিয়ে বললেন, "এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটা ভাঁওতাবাজি। মানুষকে ঠকানোর একটা বুদ্ধি। আপনাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কেস করা উচিত। চার শ বিশ ধারার কেস।"

রাগে আমার মাথা গরম হয়ে উঠল, ইচ্ছে করল গজনফর আলীর নাকে ঘুসি মেরে চ্যাপ্টা নাকটা আরো চ্যাপ্টা করে দিই। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বললাম, "ভাঁওতাবাজি কে করছে আমি খুব ভালো করে জানি।"

"জানলে তো ভালোই।" গজনফর আলী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি আমার অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছেন।"

"ঠিক আছে আর সময় নষ্ট করব না। আমি যাচ্ছি। আমার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটরটা দেন।"

গজনফর আলী হাত নেড়ে বললেন, "আপনার ঐ যন্ত্র নিয়ে আমি বসে আছি নাকি?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানে?"

"আমার বাসায় আপনাদের সব জঞ্জাল ফেলে রাখবেন আর আমি সেটা সহ্য করব?"

গজনফর আলী কী বলছেন আমি তখনো বুঝতে পারলাম না, অবাক হয়ে বললাম, "কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।"

"বলছি যে আপনার ঐ জঞ্জাল আমি ফেলে দিয়েছি।"

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, রীতিমতো আর্তনাদ করে বললাম, "ফেলে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না, কয়েকবার চেষ্টা করে বললাম, "কোথায় ফেলে দিয়েছেন?"

"বাসার সামনে ময়লা ফেলার জায়গায়।"

আমি রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে বললাম, "আপনি আমাদের জিনিস ফেলে দিলেন মানে?"

"আপনাদের জিনিস কে বলেছে? আপনি গতকাল আমাকে দিয়ে গেলেন না?"

"দেখতে দিয়েছি। ফেলে দিতে তো দেই নি।"

গজনফর আলী চোখ ছোট ছোট করে বলল, "আপনি কী জন্য দিয়েছেন সেটা তো আর আমার জানার কথা না। আপনার কাজ আপনি করেছেন, আমার কাজ আমি করেছি। আবর্জনা ফেলে দিয়েছি।"

আমি এত খেপে গেলাম যে সেটা আর বলার কথা নয়। এই লোকটা—যে নাকি ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর, যে এরকম চোখের ওপর ডাহা একটা মিথ্যা কথা বলতে পারে আমি নিজের চোখে না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতাম না। সায়রার এই সাংঘাতিক আবিষ্কারটা সে চুরি করেছে। চুরি না বলে বলা উচিত ডাকাতি। একেবারে দিনদুপুরে ডাকাতি। আমি কী করব বুঝতে না পেরে বললাম, "আপনার নামে আমি কেস করব। থানায় জিডি করব।"

গজনফর আলী খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে বললেন, "করেন গিয়ে, তখন টের পাবেন কত ধানে কত চাল! পুলিশের লোকেরা কাউকে ভয় পায় না, শুধু খবরের কাগজকে ভয় পায়। আমি হচ্ছি সেই খবরের কাগজের লোক। এই টেলিফোন দিয়ে আমি একটা ফোন করব, আর আপনি থানায় যাওয়ামাত্র আপনাকে ক্যাঁক করে অ্যারেস্ট করে হাজতে নিয়ে যাবে। তারপর শুরু হবে রিমান্ড। রিমান্ড কী জিনিস আপনি জানেন?"

"এটা কি মগের মুল্লুক নাকি?"

গজনফর আলী মুখে মধুর একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, "আপনি মনে হয় খবরের কাগজ পড়েন না, তাই দেশের অবস্থা জানেন না। দেশের অবস্থা এখন মগের মুল্লুক থেকে খারাপ। হে হে হে।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। গজনফর আলী গলার স্বর নরম করে বললেন, "আপনাকে একটা উপদেশ দেই। এটা নিয়ে কোনো তেড়িবেড়ি করবেন না, তা হলে অবস্থা খারাপ হবে। প্রথমে আপনাকে নিয়ে আর সেই মহিলা সায়েন্টিস্টকে নিয়ে পত্রিকায় জঘন্য জঘন্য রিপোর্ট বের হবে! তাতেও যদি শান্ত না হন আমার অন্য ব্যবস্থা আছে।"

"অন্য কী ব্যবস্থা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"গালকাটা বক্করের নাম শুনেছেন?"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "শুনেছি।"

"সাতাশটা কেস আছে, তার মাঝে বারোটা মার্ডার কেস। পুলিশের বাবার সাধ্য নাই তাকে ধরে। সবার নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে গালকাটা বক্করের?"

"আমার কথায় ওঠে-বসে। আমার মোবাইলে নম্বর ঢোকানো আছে। খালি একটা মিস কল দিব, ব্যস—।" গজনফর আলী হাত দিয়ে গলায় পোচ দেবার একটা ভঙ্গি করলেন। আমি অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সায়রা যখন শুনবে তার এই ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর প্রফেসর গজনফর আলী চুরি করে রেখে দিয়েছে—তখন কী করবে সেটা চিন্তা করে আমার পেটের ভাত একেবারে চাল হয়ে গেল। খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি তাকে খবরটা দিতে গেলাম। কিন্তু সায়রা দেখলাম ব্যাপারটার কোনো গুরুত্বই দিল না। গজনফর আলীর পাহাড়ের মতো স্ত্রী 'গজু' বলে মধুর গলায় ডাকছিল সেই অংশটা শুনে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "আপনি হাসছেন? দিনদুপুরে এরকম ডাকাতি করল আর আপনি সেটা শুনে হাসছেন?"

"ছোট একটা যন্ত্র চুরি করে রেখেছে, রাখতে দিন! বউয়ের ভালবাসার জন্য করেছে—আহা বেচারা!"

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, "কাকে আপনি বেচারা বলছেন? গজনফর আলী কত বড় বদমাশ আপনি জানেন? এই লোকের এক শ বছর জেল হওয়া উচিত!"

সায়রা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সোসাইটিতে সবাই যদি একরকম হয় তা হলে লাইফটা বোরিং হয়ে যাবে। এই জন্য কাউকে হতে হয় ভালো, কাউকে খারাপ আর কাউকে হতে হয় গজনফর আলীর মতো বদমাশ!"

আমি অবাক হয়ে সায়রার দিকে তাকিয়ে রইলাম, সায়রা যদি বিজ্ঞানীর সাথে সাথে দার্শনিক হতে শুরু করে তা হলে তো মহাবিপদ হয়ে যাবে। আমি বললাম, "কিন্তু আপনার এত মূল্যবান একটা যন্ত্র—"

"কে বলেছে মূল্যবান! কয়টা কয়েল, একটা পুরোনো পাওয়ার সাপ্লাই, একটা সস্তা হেলমেট—সব মিলিয়ে দুই হাজার টাকার জিনিস আছে কি না সন্দেহ!"

"কিন্তু আপনার পরিশ্রম?"

"কে বলেছে পরিশ্রম! এসব কাজ করতে ভালো লাগে, কোনো পরিশ্রম হয় না।"

"তাই বলে ঐ বদমাশ গজনফর আলী এত সুন্দর একটা জিনিস নিয়ে যাবে?"

"আপনি চিন্তা করবেন না। ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর কীভাবে তৈরি করতে হয় আমি জানি। দরকার হলে আমি ডজন ডজন তৈরি করে দেব।"

"কিন্তু একটা মানুষ এত বড় অন্যায় করে পার পেয়ে যাবে? কোনো শাস্তি পাবে না?"

"অন্যায়? শাস্তি?" হঠাৎ করে সায়রা অন্যমনস্ক হয়ে কী একটা ভাবতে লাগল। আমি সায়রার দিকে তাকালাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু আমাকে দেখছে না! গভীর কোনো একটা চিন্তায় ডুবে গেছে।

বিজ্ঞানীরা যখন গভীর চিন্তায় ডুবে যায় তখন তাদের ঘাঁটানো ঠিক না, তাই তাকে বিরক্ত না করে আমি চলে এলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা, "দৈনিক মোমের আলো' পত্রিকার সাহিত্যপাতায় দেখি একটি কবিতা ছাপা হয়েছে। কবিতার নাম 'তোমাকে স্পর্শ করি' এবং কবিতাটি লিখেছেন মোল্লা গজনফর আলী। দেখে আমি রীতিমতো আঁতকে উঠলাম—মোল্লা গজনফর আলীর মতো মানুষ কবিতা লিখে ফেলেছে? সেই কবিতা আবার ছাপাও হয়েছে? আমি কবিতাটি পড়ার চেষ্টা করলাম, শুরু হয়েছে এভাবে—

"বুকের ভেতর খেলা করে আমার সকল বোধ
তোমাকে স্পর্শ করি—"

কবিতাটি পড়ে আমার কোনো সন্দেহই থাকল না যে আসলে এই বদমাশ মানুষটা সায়রার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর ব্যবহার করে কবিতাটা লিখে ফেলেছে। রাগে আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেল কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কিছু করার চেষ্টা করলে মোল্লা গজনফর আলী নিশ্চয়ই গালকাটা বক্করকে কাটা রাইফেল দিয়ে আমার বাসায় পাঠিয়ে দেবে।

ব্যাপারটা আমার একেবারে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন দেখলাম বইমেলায় মোল্লা গজনফর আলীর একটা কবিতার বই বের হয়েছে, বইয়ের নাম 'অনুভূতির চেনা বাতাস'। শুধু যে বের হয়েছে তা নয়, বই নাকি একেবারে মার মার কাট কাট করে বিক্রি হচ্ছে। 'দৈনিক মোমের আলো'র শেষ পৃষ্ঠায় ছবি বের হল—মোল্লা গজনফর আলী পাঞ্জাবি পরে বইয়ে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন আর তার চারপাশে কমবয়সি মেয়েরা ভিড় করে আছে।

বইমেলার শেষের দিকে বিশেষ বই নিয়ে আলোচনা বের হল, সেখানে 'অনুভূতির চেনা বাতাস' বইয়ের ওপর বিশাল আলোচনা। লেখা হয়েছে, "আমাদের কাব্য অঙ্গনের স্থবিরতা দূর করতে যে মানুষটি প্রায় হঠাৎ করে উপস্থিত হয়েছেন তার নাম মোল্লা গজনফর আলী। কবিতার জগতে তার পদচারণা ফাল্গুনের ঝড়ো হাওয়ার মতো—সাহসী এবং বিক্ষুব্ধ..."

আমি শেষ পর্যন্ত পড়তে পারলাম না, খবরের কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলাম।

মাসখানেক পর নীলক্ষেত থেকে রিকশা করে আসছি, আর্ট ইনস্টিটিউটের সামনে দেখি মানুষের ভিড়। সুন্দর জামাকাপড় পরা মানুষজন গাড়ি থেকে নামছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি গেটের পাশে ফেস্টুন, বড় বড় করে লেখা—

'মোল্লা গজনফর আলীর একক চিত্রপ্রদর্শনী।'

আমি রিকশায় বজ্রাহতের মতো বসে রইলাম। রাগে–দুঃখে ঐ এলাকা দিয়েই হাঁটাচলা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু তাতে কি আর রক্ষা আছে? একদিন টেলিভিশন দেখছি, হঠাৎ দেখি টেলিভিশনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে এক উপস্থাপিকা মোল্লা গজনফর আলীকে নিয়ে এসেছে। দেখলাম তাকে জিজ্ঞেস করছে, "আপনি বিজ্ঞানের প্রফেসর, হঠাৎ করে কবিতা এবং ছবি আঁকায় উৎসাহী হলেন কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোল্লা গজনফর আলী হাত দিয়ে মাথার এলোমেলো চুলকে সোজা করতে করতে বললেন, "আসলে সৃজনশীলতা একটি অনুভবের ব্যাপার। আমার হঠাৎ করে মনে হল, সারা জীবন তো বিজ্ঞানের সেবা করেছি—সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির অন্য মাধ্যমগুলোয় একটু পদচারণা করে দেখি।"

উপস্থাপিকা ন্যাকা ন্যাকা গলার স্বরে ঢং করে বলল, "কিন্তু আপনার পদচারণা তো ভীরু পদচারণা নয়, সাহসী পদচারণা, দৃপ্ত পদচারণা—"

মোল্লা গজনফর আলী স্মিত হেসে বললেন, "প্রতিভার ব্যাপারটি তো আসলে নিয়মকানুন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না—"

এই পর্যায়ে আমি লাথি দিয়ে আমার টেলিভিশনটা ফেলে দিলাম, সেটা উল্টে পড়ে ভেতরে কী একটা ঘটে গেল, বিকট একটা শব্দ হল এবং কালো ধোঁয়া বের হতে লাগল।

মোল্লা গজনফর আলী যখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা সিডি বের করে ফেললেন, তখন ব্যাপারটা আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, সায়রার কাছে গিয়ে নালিশ করলাম।

পুরো ব্যাপারটা শুনে সায়রা হেসে কুটিকুটি হয়ে বলল, "আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন?"

"রাগব না? এই বেটা বদমাশ শুধু যে আপনার যন্ত্র চুরি করল তাই নয়, এখন সেটা ব্যবহার করে কবি হয়েছে, আর্টিস্ট হয়েছে—এখন গায়ক হচ্ছে!"

"হলে ক্ষতি কী?"

"কোনো ক্ষতি নাই?"

"না।"

"আমিও তো গজনফর আলীর মতো কবি, শিল্পী আর গায়ক হতে পারতাম—পারতাম না?"

সায়রা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "উঁহু, আপনি পারতেন না। মানুষকে ঠকানোর জন্য যে ফিচলে বুদ্ধি দরকার, আপনার সেটা নাই। আপনি হচ্ছেন সাদাসিধে মানুষ।"

কাজেই সায়রাকে কোনোভাবেই কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজি করানো গেল না।

যত দিন যেতে লাগল মোল্লা গজনফর আলী ততই বিখ্যাত হতে লাগলেন। ম্যাগাজিনে তার সাক্ষাৎকার ছাপা হতে লাগল, বিভিন্ন সংগঠন থেকে পুরস্কার পেতে লাগলেন। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হল, যখন দেখলাম, মোল্লা গজনফর আলী প্রধান অতিথি হয়ে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গিয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পুরস্কার দিচ্ছে। পুরস্কার দিয়ে তাদেরকে সুনাগরিক হয়ে দেশ এবং সমাজের সেবা করার উপদেশ দিচ্ছে। আমার জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেল। মনে হতে লাগল, মোল্লা গজনফর আলীকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলে যাই। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না। ব্যাটা বদমাশ তখন 'শহীদ' হয়ে যাবে—তার নামে স্মৃতিসৌধ তৈরি হয়ে যাবে!

মোল্লা গজনফর আলীর উৎপাতে যখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার কথা চিন্তাভাবনা করছি তখন হঠাৎ করে পত্রিকায় একটা খবর ছাপা হল যেটা দেখে আমার পুরো চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। খবরটি এরকম, উপরে হেডলাইন—

বাঙালি বিজ্ঞানীর যুগান্তকারী আবিষ্কার
মানুষের অনুভূতি এখন হাতের মুঠোয়

তার নিচে ছোট ছোট করে লেখা—

> বাংলাদেশের বিজ্ঞানী—যিনি একাধারে কবি, শিল্পী এবং গায়ক হিসেবে এই দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অঙ্গনে সুপরিচিত, তার যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা জাতির সামনে প্রকাশ করছেন। প্রফেসর মোল্লা গজনফর আলী জানিয়েছেন, মানুষের মস্তিষ্কে উচ্চ কম্পনের চৌম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে তাদের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছেন।
>
> আগামী মঙ্গলবার স্থানীয় প্রেসক্লাবে তিনি তার আবিষ্কারটি জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন।

পাশেই একটি রঙিন ছবি, মোল্লা গজনফর আলী রিমোট কন্ট্রোলের মতো দেখতে কন্ট্রোলটি হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, পাশে তার স্ত্রী হেলমেটটি মাথায় দিয়ে বসে আছে। দুইজনের মুখেই স্মিত হাসি। নিচে মোল্লা গজনফর আলীর জীবনবৃত্তান্ত।

খবরটি দেখে আমার মাথার ভেতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। আমি তখন তখনই কাগজটা হাতে নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে সায়রার বাসায় হাজির হলাম। আমাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে সায়রা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

আমি কাগজটা তার হাতে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, "এই দেখেন!"

সায়রা ছবিটা দেখল এবং খবরটা পড়ল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলল। প্রত্যেকবার সে যেরকম পুরো ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, এবারে সেরকম হেসে উড়িয়ে দিল না, তার মুখটা কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেল। আমি বললাম, "কী হল?"

"মানুষটাকে শাস্তি দেওয়ার একটা সময় হয়েছে। কী বলেন?"

আমি হাতে কিল দিয়ে বললাম, "এক শ বার।"

"ঠিক আছে। মঙ্গলবার দেখা হবে।"

"কোথায় দেখা হবে?"

"প্রেসক্লাবে।"

সায়রা কী করবে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, কিন্তু এই মেয়েটার ওপরে আমার বিশ্বাস আছে। আমি মঙ্গলবারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম—মনে হতে লাগল ঘণ্টা, মিনিট আর সেকেন্ডগুলো এত আস্তে আস্তে আসছে যে মঙ্গলবার বুঝি কোনোদিন আসবেই না!

প্রেস কনফারেন্সের সময় দেওয়া ছিল বিকেল চারটা, আমি তিনটার সময় হাজির হয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি আমি আসার আগেই আরো অনেকে চলে এসেছে। গজনফর আলী আমাকে চিনে ফেলতে পারে বলে আমি একটু পিছনের দিকে বসলাম। আমার পাশের চেয়ারটি সায়রার জন্য বাঁচিয়ে রাখলাম।

স্টেজটি একটু সাজানো হয়েছে, পেছনে একটা বড় ব্যানার, সেখানে লেখা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে একটা টেবিল, সেই টেবিলে সায়রার তৈরি করা ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর যন্ত্রটি। পাশে গদি আঁটা একটি চেয়ার। সেই চেয়ারের উপর হেলমেটটি সাজানো। গজনফর আলী বলেছিলেন তিনি নাকি এগুলোকে আবর্জনা হিসেবে ফেলে দিয়েছিলেন।

সায়রা এল ঠিক সাড়ে তিনটার সময়।

আমি ভেবেছিলাম হাতে যন্ত্রপাতি বোঝাই একটা ব্যাগ থাকবে, কিন্তু সেরকম কিছু নেই। কীভাবে সে গজনফর আলীকে শায়েস্তা করবে বুঝতে পারলাম না। আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল?"

"কীসের কী হল?"

"আপনার যন্ত্রপাতি কই?"

"কীসের যন্ত্রপাতি?'

"গজনফর আলীকে শায়েস্তা করার জন্য?"

সায়রা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "আমার তাকে শায়েস্তা করতে হবে কে বলেছে?"

"তা হলে কে শায়েস্তা করবে?"

"নিজেই নিজেকে শায়েস্তা করবে!"

মেয়েটা ঠাট্টা করছে কি না আমি বুঝতে পারলাম না। আমি একটু ভয় নিয়ে সায়রার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঠিক চারটার সময় মোল্লা গজনফর আলী এসে হাজির হলেন। আজকে চকচকে একটা চকোলেট রঙের সুট পরে এসেছেন। সাথে তার স্ত্রী, এমনভাবে সেজেগুজে এসেছেন যে দেখে মন হয় বারো বছরের খুকি। তারা দুইজন স্টেজে গিয়ে বসলেন। তখন তেইশ-চব্বিশ বছরের একটা মেয়ে মাইকের সামনে গিয়ে প্রেস কনফারেন্সের কাজ শুরু করে দিল। সে প্রথমে একটা লিখিত রিপোর্ট পড়ে শোনাল—সেখানে বর্ণনা করা আছে মোল্লা গজনফর আলী জিনিসটা কেমন করে আবিষ্কার করেছেন, সেটি তার কত দীর্ঘদিনের সাধনা, এটা দিয়ে পৃথিবীর কী কী মহৎ কাজ করা হবে ইত্যাদি। শুনে আমার সারা শরীর একেবারে তিড়বিড় করে জ্বলতে লাগল।

এরপর গজনফর আলী উঠে দাঁড়ালেন এবং তখন সবার মাঝে একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। গজনফর আলী মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "উপস্থিত সুধী মহল এবং সাংবাদিকবৃন্দ, আমি নিশ্চিত এতক্ষণে এই রিপোর্টে যা বলা হল আপনারা তার সবকিছু বিশ্বাস করেন নি। আপনাদের জায়গায় থাকলে আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না—এটি কেমন করে সম্ভব, যে অনুভূতিটুকু এতদিন আমরা আমাদের একেবারে নিজস্ব বলে জেনে এসেছি সেটি একটি যন্ত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? তা হলে মানুষের অস্তিত্বই কি অর্থহীন হয়ে যায় না?"

গজনফর আলী উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। আপনারা নিজের চোখে দেখুন, তারপর প্রশ্নের উত্তর বের করে নিন।" মোল্লা গজনফর আলী একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "প্রথমে আমার দরকার একজন ভলান্টিয়ার। হাসিখুশি ভলান্টিয়ার, যে মনে করে পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু নেই!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যেরা হাত তোলার আগেই প্রায় তড়াক করে লাফ দিয়ে একটা হাসিখুশি মেয়ে উঠে দাঁড়াল। গজনফর আলী তাকে স্টেজে ডাকলেন। স্টেজে যাবার পর তাকে গদি আঁটা চেয়ারে বসিয়ে মাথায় হেলমেটটা পরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মনের অনুভূতিটি কী?"

"আনন্দের।"

"ভেরি গুড। দেখি আপনি আপনার এই আনন্দের অনুভূতিটি ধরে রাখতে পারেন কি না।"

গজনফর আলী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটরের রিমোট কন্ট্রোলের মতো জিনিসের সুইচটা টিপে ধরলেন, দেখতে দেখতে মেয়েটার মুখ একেবারে বিষণ্ন হয়ে গেল। গজনফর আলী কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনার এখন কেমন লাগছে?"

"খুব মন খারাপ লাগছে।"

"কেন?"

"জানি না।" মেয়েটা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

গজনফর আলী বিশ্বজয়ের ভঙ্গি করে সবার দিকে তাকালেন এবং উপস্থিত সবাই হাততালি দিতে শুরু করল। গজনফর আলী মাথা নুয়ে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সুইচটা ছেড়ে দিতেই মেয়েটা চোখ মুছে অবাক হয়ে তাকাল। গজনফর আলী তার মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে তার কাছে মাইক্রোফোন নিয়ে বলেন, "আপনি কি উপস্থিত সবাইকে আপনার অভিজ্ঞতাটুকু বলবেন?"

মেয়েটা উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে বলল, "কী আশ্চর্য! একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! আমি বুকের মাঝে আনন্দের অনুভূতি নিয়ে বসে আছি, হঠাৎ কী হল—একটা গভীর দুঃখ এসে ভর করল। কী গভীর দুঃখ আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না। আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে কাঁদতে শুরু করেছিলাম—আমি জীবনে কখনো কেঁদেছি বলে মনে করতে পারি না। তারপর ম্যাজিকের মতো হঠাৎ করে সেই দুঃখ চলে গেল। একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।"

যারা সামনে বসেছিল আবার আনন্দে হাততালি দিতে থাকে। গজনফর আলী হাত তুলে তাদের থামিয়ে বললেন, "এবারে আমার আরেকজন ভলান্টিয়ার দরকার, যে বাঘের বাচ্চার মতো সাহসী। যে কোনো কিছুতে ভয় পায় না।"

গাট্টাগোট্টা টাইপের একজন এবারে উঠে দাঁড়াল। গজনফর আলী তাকে স্টেজে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। মাথায় হেলমেটটি পরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি সাহসী?"

মানুষটি দাঁত বের করে হেসে বলল, "হ্যাঁ আমি সাহসী।"

"আমাকে দেখে আপনার কি ভয় লাগছে?"

"নাহ্! কেন ভয় লাগবে?"

"ভেরি গুড। দেখা যাক সত্যি আপনি সাহসী থাকতে পারেন কি না।"

গজনফর আলী কন্ট্রোলটা নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে সুইচটা টিপে ধরতেই মানুষটা দুই হাত দুই পা নিজের ভেতরে নিয়ে এসে ভয় পাওয়া গলায় এমন চিৎকার দিল যে উপস্থিত যারা ছিল সবাই চমকে উঠল। গজনফর আলী মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি ভয় লাগছে?"

মানুষটা দুই হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকে একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠল। গজনফর আলী সবার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে সুইচটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আপনারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যে, ভয়ের অনুভূতিটি কিন্তু এই যন্ত্র থেকে এসেছে।"

দর্শক এবং সাংবাদিকরা আবার হাততালি দিতে শুরু করে। গজনফর আলী মাইক্রোফোনটা হেলমেট মাথায় মানুষটির হাতে দিয়ে বললেন, "আপনার অনুভূতির কথাটি শুনি?"

মানুষটা তখনো দরদর করে ঘামছে, মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে পাংশু মুখে বলল, "কী ভয়ংকর একটা অভিজ্ঞতা! আমি নিশ্চিত ছিলাম পুরো ব্যাপারটা আসলে বানানো। একেবারেই বিশ্বাস করি নি। চেয়ারে বসেছিলাম হঠাৎ করে এমন একটা অমানুষিক ভয় এসে ভর করল যে ভাষায় সেটার বর্ণনা করা যায় না। মনে হল এটা অন্ধকার একটা শ্মশান, চারপাশে ভূতপ্রেত, আর বিজ্ঞানী গজনফর আলী একজন দৈত্য!"

খুব মজার একটা রসিকতা হয়েছে এরকম ভান করে গজনফর আলী হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, "আমার মনে হয় এখন নতুন কোনো ভলান্টিয়ার পাওয়া খুব মুশকিল হবে! কাজেই আমিই হব ভলান্টিয়ার। এই যন্ত্রটা আমি মাথায় দেব এবং আমার স্ত্রী কন্ট্রোলটা দিয়ে আমার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কীসের অনুভূতি?"

গজনফর আলী চেয়ারে বসে মাথায় হেলমেটটা পরে বললেন, "এতক্ষণ আপনাদের যা দেখানো হয়েছে সেটা মজার ব্যাপার হতে পারে, কৌতূহলের ব্যাপার হতে পারে কিন্তু তার কোনো বাস্তব গুরুত্ব নেই। এখন আপনাদের দেখাব কীভাবে এই যন্ত্রটি দিয়ে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটানো যায়। মানুষের ভেতরে গাণিতিক প্রতিভা কীভাবে বের করে নেওয়া যায়! আমি একজন সাধারণ মানুষ আপনাদের চোখের সামনে গাণিতিক প্রতিভা হয়ে যাব।"

গজনফর আলী তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সুইচটা টিপে দাও।"

গজনফর আলীর স্ত্রী কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে ঠিক সুইচটা টিপে ধরলেন। গজনফর আলীর মুখ হঠাৎ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "আপনারা আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমি হঠাৎ করে একটা গাণিতিক প্রতিভা হয়ে গেছি! আমি ইচ্ছে করলে এখন মুখে মুখে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে পারি। পাইয়ের গঠন শত ঘর পর্যন্ত বলতে পারি। মুখে মুখে বড় বড় গুণ ভাগ করে ফেলতে পারি।"

সায়রা তার ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করে তার শাড়ির আঁচলে ঢেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "বাছাধনকে এখন বোঝাব মজা।"

আমিও ফিসফিস করে বললাম, "কীভাবে?"

"গজনফরের ওয়াইফের কাছে যে কন্ট্রোলটা আছে সেটা এখন জ্যাম করে দিয়ে আমি কন্ট্রোল করব।"

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী কন্ট্রোল করবেন?"

"আপনি দেখেন।"

গজনফর আলী তখনো বলছে, "আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। বড় বড় গুণ ভাগ দিতে পারেন, যে কোনো সংখ্যার নামতা জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

সামনে বসে থাকা একজন বলল, "ছেচল্লিশের নামতা বলেন দেখি!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ছেচল্লিশ তো সোজা।" গজনফর আলী বলতে শুরু করল, "ছেচল্লিশ একে ছেচল্লিশ, ছেচল্লিশ দ্বিগুণে বিরানব্বই, তিন ছেচল্লিশে—"

সায়রা ফিসফিস করে বললেন, "এই যে, সুইচ টিপে দিলাম।"

সাথে সাথে গজনফর আলী থেমে গিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। দর্শকদের মাঝে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল, একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হল? থেমে গেলেন কেন?"

গজনফর আলী বললেন, "একটা খুব বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে।"

"কী বিচিত্র ব্যাপার?'

"হঠাৎ করে আমার অঙ্ক করার ক্ষমতা চলে গিয়ে অন্য একটা ক্ষমতা এসেছে।"

"কী ক্ষমতা?"

"সত্যি কথা বলার ক্ষমতা। এখন আমি কোনো সত্যি কথা বলতে ভয় পাব না।"

উপস্থিত দর্শক সাংবাদিক সবাই চুপ করে গেল কিন্তু গজনফর আলী থামলেন না, সামনে বসে থাকা একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যেমন আপনাকে বলতে পারি, আপনি যে দাড়ি রেখেছেন সেটাকে বলে ছাগলদাড়ি, আপনাকে তাই ছাগলের মতো দেখাচ্ছে। আর ঐ যে ডান পাশে বসে আছেন নীল শাড়ি পরে—পাউডার দিয়ে না হয় আপনার কালো রঙকে ঢাকলেন, কিন্তু বোঁচা নাককে সোজা করবেন কীভাবে?"

দর্শকদের মাঝে হঠাৎ একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। একজন সাংবাদিক দাঁড়িয়ে একটু রেগে বলল, "আপনি হঠাৎ করে এরকম আপত্তিকর কথা বলতে শুরু করলেন কেন? আমাদের অপমান করছেন কেন?"

গজনফর আলী একটুও রাগলেন না। হাসি হাসি মুখে বললেন, "আমি মোটেও অপমান করছি না, সত্যি কথা বলছি।"

"তা হলে আপনি নিজের সম্পর্কে কিছু সত্যি কথা বলেন।"

"অবশ্যই বলব। আপনি কি ভাবছেন আমি ভয় পাব? এই যে দেখছেন আমার নাক, এটা এরকম চ্যাপ্টা হয়েছে কেমন করে জানেন?"

দর্শকেরা মাথা নাড়ল, তারা জানে না।

গজনফর আলী বললেন, "আমার স্ত্রীর ঘুসি খেয়ে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার স্ত্রী হচ্ছে একটা গরিলার মতো সাইজের, যখন রেগে ওঠে তখন কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, আমাকে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেয়!"

সবাই একেবারে বজ্রাহতের মতো চুপ করে রইল। গজনফর আলী থামলেন না, বলতেই থাকলেন, "এরকম গরিলার মতো একটা বউকে আমি কেমন করে কন্ট্রোল করি জানেন?" গজনফর আলী মাথায় টোকা দিয়ে বললেন, "বুদ্ধি দিয়ে। আপনারা সবাই যেরকম একটু বেকুব টাইপের, হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আমার কথা শুনছেন, আমি যেটাই বলছি সেটাই বিশ্বাস করছেন আমি সেরকম না। আমি খানিকটা ধুরন্ধর।" গজনফর আলী একটু দম নিয়ে বললেন, "এই যে যন্ত্রটা দেখছেন আপনারা ভাবছেন সেটা আমি তৈরি করেছি?"

সাংবাদিকরা এবারে চঞ্চল হয়ে উঠল, কয়েকজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে তৈরি করেছে?"

"ঠিক জানি না। হাবাগোবা টাইপের একজন মানুষ নিয়ে এসেছিল পত্রিকায় রিপোর্ট করার জন্য, বলেছিল একটা মহিলা সায়েন্টিস্ট তৈরি করেছে। আমি তাকে ঠকিয়ে রেখে দিয়েছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

একজন মেয়ে সাংবাদিক দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি এটা আবিষ্কার করেন নাই? এটা আরেকজনের আবিষ্কার?"

"ঠিকই বলেছেন। আমার মেধা খুব কম। চা চামচের এক চামচ থেকে বেশি হবে না। তবে আমার ফিচলে বুদ্ধি অনেক। মানুষ ঠকিয়ে খাই। টাকাপয়সা নিয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপাই—ব্ল্যাকমেইল করি।"

বয়স্ক একজন সাংবাদিক দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি যে সবার সামনে এগুলো বলছেন আপনার সম্মানের ক্ষতি হবে না?"

"সম্মান থাকলে তো ক্ষতি হবে! আমি একজন চোর। আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন। আমি যে কবিতা লিখেছি, ছবি এঁকেছি, গান গেয়েছি সব এই যন্ত্র দিয়ে। আমার নিজের কোনো প্রতিভা নাই!"

গজনফরের স্ত্রী এতক্ষণ চোখ বড় বড় করে এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন, এবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি কী করছ? সবকিছু বলে দিচ্ছ কেন?"

"আমার কোনো কন্ট্রোল নাই! দেখছ না আমার সত্যি কথা বলার রোগ হয়েছে।"

"না, তুমি আর কিছু বলবে না।" গজনফরের স্ত্রী তার স্বামীর দিকে ছুটে এলেন, তার মুখ চেপে ধরার চেষ্টা করলেন। গজনফর আলী হঠাৎ করে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই, সত্যি কথা বলতে কোনো ভয় নেই। তুমিও পারবে।"

"না, খবরদার, চুপ কর।"

"ঠিক আছে তা হলে এই হেলমেটটা পর—তা হলে পারবে।" এবং কেউ কিছু বোঝার আগে গজনফর আলী হেলমেটটা তার স্ত্রীর মাথায় পরিয়ে দিলেন। তার স্ত্রী একবার চোখ ঘুরিয়ে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিকই বলেছিস, চামচিকার বাচ্চা চামচিকা, তুই হচ্ছিস চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমাশ! মানুষ ঠকানো তোর স্বভাব। তোকে দেখলে পাপ হয়—"

সায়রা ফিসফিস করে বলল, "মহিলাকে একটু রাগিয়ে দেওয়া যাক।"

"এমনিতেই তো রেগে আছে!"

"এটা কি রাগ হল? দেখেন মজা—।" সায়রা রাগের সুইচ টিপে দিল, তারপর যা একটা কাণ্ড হল সেটা দেখার মতো দৃশ্য। গজনফর আলীর স্ত্রী একটা হুঙ্কার দিয়ে গজনফর আলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, নাকে এবং পেটে ঘুসি মেরে একেবারে ধরাশায়ী করে দিলেন। গজনফর আলীকে বাঁচানোর জন্য কয়েকজন স্টেজে ওঠার চেষ্টা করছিল, চেয়ার দিয়ে তাদের পিটিয়ে তিনি তাদের লম্বা করে ফেললেন। মাইকের স্ট্যান্ড ঘুরিয়ে ছুড়ে মারলেন। ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। আঁ আঁ করে বুকে থাবা দিয়ে চেয়ার ঘুরাতে ঘুরাতে তিনি স্টেজ থেকে নিচে নেমে এলেন।

চেয়ারে বসে থাকা দর্শক এবং সাংবাদিকরা কোনোভাবে সেখান থেকে পালিয়ে রক্ষা পেল! আমিও সায়রার হাত ধরে টেনে কোনোভাবে সেই ভয়াবহ কাণ্ড থেকে পালিয়ে এসেছি।

পরের দিন সব পত্রিকায় খবরগুলো খুব বড় করে এসেছিল।

'মোল্লা গজনফর আলীর কুকীর্তি' শিরোনামে 'দৈনিক মোমের আলো'তে নিয়মিত ফিচার বের হতে শুরু করেছে।

সব সাংবাদিক এখন যে 'হাবাগোবা' লোকটি এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি মোল্লা গজনফর আলীর কাছে প্রথম নিয়ে গিয়েছিল তাকে খুঁজছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে হাবাগোবা মানুষ বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে না বলে কাউকে আর পরিচয় দিই নি—তা না হলে এবারে বিখ্যাত হবার খুব বড় একটা সুযোগ ছিল।

তবে সায়রা সায়েন্টিস্টের সাথে যোগাযোগ রাখছি। সে নিশ্চয়ই আরেকটা সুযোগ করে দেবে। ঠিক করেছি সেই সুযোগটা আমি আর কিছুতেই গুবলেট করে ফেলব না।

মালিশ মেশিন

আমার মাঝে মধ্যে ভালো-মন্দ খাওয়ার ইচ্ছে করলে বোনের বাসায় হাজির হই—কখনো অবিশ্যি স্বীকার করি না যে খেতে এসেছি, ভান করি এই দিকে কাজে এসেছিলাম যাবার সময় দেখা করে যাচ্ছি। বোনের বাসা দোতলায়—সিঁড়ি দিয়ে উঠছি হঠাৎ দেখি কে যেন ঠিক সিঁড়ির মাঝখানে একটা কলার ছিলকে ফেলে রেখেছে, মানুষের কাণ্ডজ্ঞান কত কম হলে এরকম একটা কাজ করতে পারে? কেউ যদি ভুল করে এই ছিলকের উপর পা দেয় তা হলে কী ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটে যাবে—প্রথমত পা পিছলে সে পড়ে যাবে তারপর সিঁড়ি দিয়ে গাছের গুঁড়ির মতো গড়িয়ে যাবে। সিঁড়ির শেষ মাথায় পৌঁছে এসে সে দেওয়ালে আঘাত করবে তখন তার হাত-পা ভেঙে যাবে, মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়ে যাবে, কে জানে হয়তো ব্রেন ড্যামেজ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে।

কাজেই আমি খুব সাবধানে কলার ছিলকে বাঁচিয়ে সিঁড়িতে পা ফেললাম; আর কী আশ্চর্য—ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে ঘটল সেটা এখনো একটা রহস্যের মতো; আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি ঠিক ছিলকেটার ওপর পা ফেলেছি। তারপর ঠিক আমি যা ভেবেছিলাম তাই ঘটল, আমি প্রথমে পা পিছলে দড়াম করে পড়ে গেলাম, তারপর গাছের গুঁড়ির মতো গড়িয়ে যেতে লাগলাম। প্রায় অনন্তকাল গড়িয়ে আমি সিঁড়ির নিচে পৌঁছে দেওয়ালটাকে আঘাত করলাম, আমার হাত ভাঙল, পা ভাঙল, মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়ে গেল, মাথার ভেতরে ঘিলু নড়ে উঠে ব্রেন ড্যামেজ হয়ে গেল এবং আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। কে জানে হয়তো শুধু অজ্ঞান নয়, মরেই গেলাম।

আমার ওজন নেহায়েৎ কম নয় (দেখলে মন খারাপ হয় বলে আজকাল অবিশ্যি ওজন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি), কলার ছিলকেতে পা পিছলে আমি নিশ্চয়ই ভীষণ শব্দ করে পড়েছি, দেওয়ালে মাথা ঠুকে যাবার সময় নিশ্চয়ই একটা গগনবিদারী চিৎকারও করেছিলাম—কারণ দেখতে পেলাম দরজা খুলে আমার বোন, দুলাভাই, বিল্টু এবং কাজের বুয়া ছুটে এসেছে। বিল্টু ছোট বলে সে সবার আগে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "মামা, তুমি এখানে শুয়ে আছ কেন?"

সবাইকে যখন দেখতে পাচ্ছি, কথা শুনতে পাচ্ছি তার মানে নিশ্চয়ই মরে যাই নি বা অজ্ঞানও হয়ে যাই নি। কথা যেহেতু বুঝতে পারছি মনে হয় এখনো পুরোপুরি ব্রেন ড্যামেজ হয় নি। আমি কোকাতে কোকাতে বললাম, "পিছলে পড়ে গিয়েছি।"

বিল্টু কলার ছিলকেটা আবিষ্কার করে বলল, "তুমি হাঁটার সময় কি চোখগুলো খুলে পকেটের মাঝে রেখে দাও? কলার ছিলকেটা দেখ নি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ফাজলেমি করবি না বিল্টু—দেখছিস না হাত-পা সব ভেঙে গেছে? মাথা ফেটে গেছে।"

"তোমার কিছু হয় নি মামা, ওঠ।"

ততক্ষণে বোন, দুলাভাই এবং বুয়াও চলে এসেছে। বুয়া বলল, "না বিল্টু বাই, মামার অবস্থা কেরাসিন। মনে হয় হাত-পা ভাইঙ্গা লুলা হইয়া গেছে।"

দুলাভাই এসে আমাকে টিপেটুপে দেখে বলল, "তুমি পড়েছ খুব জোরে, কিন্তু কিছু ভাঙে টাঙে নাই।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

"উঠতে পারবে? নাকি ধরে নিতে হবে।"

বুয়া শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে এগিয়ে এসে বলল, "মামারে আমার কোলে তুইল্যা দেন—আমি উপরে নিয়া যাই।" আমি নিজে নিজে উপরে উঠতে পারব ভরসা ছিল না, কিন্তু টিঙটিঙে বুয়া যেভাবে আমাকে কোলে করে উপরে নিয়ে যেতে হাজির হল যে আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে গেলাম। এক হাত দুলাভাইয়ের উপর আরেক হাত বিল্টুর ঘাড়ে দিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উপরে উঠে এলাম। দুলাভাইয়ের কথা সত্যি হাত-পা কিছু ভাঙে নি, মাথাও ফাটে নি। খুব বেঁচে গেছি এই যাত্রা।

আমাকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে দুলাভাই বললেন, "তোমাকে আরো সাবধান হতে হবে। যেখানেই যাও সেখানেই যদি এইভাবে আছাড় খাও তা হলে ঢাকা শহরের সব বিল্ডিং ধসিয়ে ফেলবে।"

বোন এক গ্লাস পানি এনে বললেন, "খা তাড়াতাড়ি।"

"কী এটা?"

"লবণ পানি। পড়ে গিয়ে শক পেলে খেতে হয়।"

এটা কোন দেশী চিকিৎসা জানি না কিন্তু বোনের কথা না শুনে উপায় নেই। তাই পুরোটা খেতে হল। বোন বললেন, "সর্ষে দিয়ে ইলিশ রেঁধেছিলাম—কিন্তু তোর যা অবস্থা, তুই তো খেতেও পারবি না।"

আমি হালকাভাবে আপত্তি করে কিছু একটা বলতে চাইছিলাম কিন্তু বুয়া চিৎকার করে বলল, "কী কন আম্মা আপনি খাওয়ার কথা? মামা এখন খাইলে উপায় আছে? শরীরের বিষ নাইম্যা যাইব না? সর্বনাশ!"

কাজেই শরীরে যেন বিষ নেমে না যায় সেজন্য আমি সোফায় উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম, অন্যেরা যখন হইচই করে সর্ষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ খেল তখন আমি খেলাম আধবাটি বার্লি।

কিছুক্ষণ পর বোন এসে জিজ্ঞেস করল, "তোর শরীরের অবস্থা কী?"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "এখন মনে হয় ভালো। তবে ঘাড়ে খুব ব্যথা।"

"কোথায়?"

আমি হাত দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম। বোন বলল, "দে একটু মালিশ করে দিই। ভালো লাগবে।"

আমি বললাম, "না, না, লাগবে না—"

বোন আমার কথা শুনল না, মাথার কাছে বসে আমার ঘাড় মালিশ করতে লাগল। প্রথমে এক-দুইবার ব্যথার একটা খোঁচা অনুভব করলাম, তারপর কিন্তু বেশ আরামই লাগতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগল। আমি চোখ বুজে আরামে আহা-উঁহু করতে লাগলাম। বোন বলল, "দাঁড়া একটু সর্ষের তেল দিয়ে নিই, দেখবি ব্যথা কোথায় পালাবে।"

ঘাড় মালিশ করতে করতে বোন বুয়াকে ডেকে খানিকটা সর্ষের তেল গরম করে দিয়ে যেতে বলল। বুয়া একটু পরেই গরম তেল দিয়ে গেল, সেটা হাতে নিয়ে বেশ কায়দা করে ঘাড়ে তেল মালিশ করে দিতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি বাংলা ভাষায় 'তেল মালিশ' বলে যে একটা শব্দ আছে সেটা কোথা থেকে এসেছে কেমন করে এসেছে—এই প্রথমবার আমি সেটা বুঝতে পারলাম। ঘাড় থেকে আরামটা আমার সারা শরীরে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল—আমার চোখ বুজে এল এবং মনে হতে লাগল বেঁচে থাকাটা মন্দ ব্যাপার নয়। বেহেশতে নিশ্চয়ই হুর পরীরা এভাবে ঘাড় মালিশ করে দেবে। আমার ভেতরে একটা বেহেশতের ভাব চলে এল এবং ঠিক বেহেশতের মতো মুরগি রোস্টের গন্ধ পেতে লাগলাম।

বেহেশতি এই ভাবটা নিশ্চয়ই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। কারণ হঠাৎ করে আমার বোন বলল, "মুরগি রোস্টের গন্ধ কোথেকে আসছে?"

আমি চমকে উঠলাম, বললাম, "তুমিও গন্ধ পাচ্ছ?"

বোন অবিশ্যি পুরো ব্যাপারটিকে স্বর্গীয় অনুভূতি হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল না, হুঙ্কার দিয়ে বলল, "বুয়া।"

বুয়া প্রায় সাথে সাথে ছুটে এল, "আমারে ডাকছেন আম্মা?"

বোন তেলের বাটিটা দেখিয়ে বললেন, "এইখানে কী দিয়েছ?"

"সর্ষের তেল শেষ। মুরগি রোস্টের থেকে চিপে ঘি বের করে গরম করে দিয়েছি আম্মা!"

এক মুহূর্তে আমার স্বর্গীয় আনন্দ উবে গেল, সমস্ত ব্যথা ভুলে আমি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বললাম, "কী বললে তুমি? কী বললে? মুরগি রোস্টের ঘি?"

বুয়া অবাক হয়ে বলল, "এত রাগ হন কেন মামা? ঘি কি খারাপ জিনিস?"

আমি চিৎকার করে বললাম, "রসগোল্লাও তো ভালো জিনিস—তাই বলে তুমি শরীরে রসগোল্লা মেখে বসে থাকবে?"

বুয়া অবাক হয়ে বলল, "মামা, এইসব কী কয়? মানুষ শরীলে রসগুল্লা মাখবে কেন? মামার কি মাথা খারাপ হইছে?"

আমার ইচ্ছে হল বুয়ার গলা টিপে তাকে খুন করে ফেলি, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। বোন খানিকক্ষণ চোখ লাল করে বুয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করে হি হি করে হেসে ফেলল, কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারে না। তার হাসি শুনে দুলাভাই আর বিল্টু ছুটে এল, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

বোন আমাকে দেখিয়ে বলল, "শুঁকে দেখ।"

দুলাভাই আর বিল্টু সাবধানে আমাকে শুঁকে দেখল। বিল্টু ভুরু কুঁচকে বলল, "মামা তোমার শরীর থেকে চিকেন রোস্টের গন্ধ বের হচ্ছে কেন?"

দুলাভাই বললেন, "নতুন ধরনের কোনো আফটার শেভ?"

বুয়া ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করল, "জে না। মামা শরীরে মুরগির রোস্টের ঘি মাখছে—"

দুলাভাই চোখ কপালে তুলে বলল, "সে কী? এরকম কাজ করলে কেন?"

আমি মেঘস্বরে বললাম, "আমি করি নাই।"

"তা হলে কে করেছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপা।"

দুলাভাই বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা কোন ধরনের রসিকতা? দশটা নয় পাঁচটা নয় আমার একটা মাত্র শালা তাকে তুমি ঘি মাখিয়ে রাখছ? মানুষটা সাদাসিধে বলে সবাই মিলে কেন বেচারাকে উৎপাত কর?"

বোন মাথা নাড়ল, হাসির দমকে কথা বলতে পারছে না, কোনোমতে বলল, "আমি ইচ্ছা করে করি নাই—এই বুয়া।"

সবাই মিলে হাসাহাসি করছে দেখে বুয়াও হঠাৎ করে খুব উৎসাহ পেয়ে গেল, সেও হাসতে হাসতে বলল, "গোন্ধটা খারাপ না। এখন আপনাকে দেখলে মনে হয় একটা কামড় দেই। হি হি হি—"

আমার ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, বাম পা–টা টনটন করছে, কপালের কাছে খানিকটা ফুলে গেছে এবং সেই অবস্থায় ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আমি চলে এলাম, ঠিক করলাম যতদিন এই বুয়া বাসায় আছে আমি আর সেই বাসায় যাচ্ছি না।

পরের এক সপ্তাহ আমার শরীর থেকে মুরগির রোস্টের গন্ধ বের হতে লাগল। যার সাথেই দেখা হয় সেই বলে, "চিকেন রোস্ট আপনার খুব ফেবারিট? আচ্ছামতন খেয়েছেন মনে হচ্ছে—শরীর থেকে গন্ধ বের হচ্ছে!"

সপ্তাহ দুয়েক পর ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলাম রাতে নিশ্চয়ই বেকায়দায় ঘুমিয়েছি, ঘাড়ে ব্যথা। এর আগের বার বোন মালিশ করে দিয়েছিল—ভারি আরাম লেগেছিল সেদিন, আমি তাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ঘাড় মালিশ করতে শুরু করলাম। একটু পরেই আবিষ্কার করলাম আজকে সেরকম আরাম লাগছে না। অন্যে মালিশ করে দিলে যেরকম আরামে একেবারে চোখ বন্ধ হয়ে আসে নিজে মালিশ করলে তার ধারেকাছে যাওয়া যায় না। কারণটা কী? এর নিশ্চয়ই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। অনেক দিন সায়রা সায়েন্টিস্টের বাসায় যাওয়া হয় নি, একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করে এলে হয়। যারা খেতে পছন্দ করে তাদের বাসায় দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে যেতে হয়, যে কবি তার বাসায় যেতে হয় কবিতার বই নিয়ে। যে গান গায় সে নিশ্চয়ই খুশি হয় গানের সিডি পেলে, যে বিজ্ঞানী তার কাছে নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়েই যাওয়া উচিত। পরদিন বিকেলবেলা আমি সায়রা সায়েন্টিস্টের বাসায় হাজির হলাম। আমাকে দেখে সায়রা বললেন, "ভালোই হয়েছে আপনি এসেছেন। মনে মনে আমি আপনাকেই খুঁজছি।"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? আবার কোনো এক্সপেরিমেন্ট?"

"না, এক্সপেরিমেন্ট না। একটা মতামত জানার জন্য আপনার খোঁজ করছিলাম।"

সায়রার কথা শুনে গর্বে আমার বুকটা কয়েক ইঞ্চি ফুলে গেল, আমার পরিচিতদের কেউই আমাকে খুব সিরিয়াসলি নেয় না। কখনো কেউ আমার মতামত জানতে চেয়েছে বলে মনে পড়ে না। অথচ সায়রা এত বড় বিজ্ঞানী হয়ে আমার মতামত জানতে চাইছে! আমি মুখে এটা গাম্ভীর্য এনে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন বিষয়ে মতামত?"

"রসগোল্লা না সন্দেশ, কোনটা আপনার পছন্দ?"

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম, ভেবেছিলাম সায়রা বুঝি দেশ, সমাজ, রাজনীতি, ফিলসফি এরকম কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে! অবিশ্যি একদিক দিয়ে ভালোই হল জটিল কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে যেত—সেই হিসেবে এই প্রশ্নটাই ভালো। আমি বললাম, "আমার ব্যক্তিগত পছন্দ রসগোল্লা—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন?"

"জিনিসটা রসালো, নরম, মিষ্টি বেশি।"

"না, না, না—" সায়রা আমাকে থামিয়ে দিয়ে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "আমি স্বাদের কথা বলছি না।"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "তা হলে?"

"আকারের কথা বলছিলাম।"

"আকার?"

"হ্যাঁ।" সায়রা গম্ভীর মুখে বলল, "একটা হচ্ছে গোল, আরেকটা চতুষ্কোণ। কোনটা সঠিক?"

আমি মাথা চুলকাতে শুরু করলাম। রসগোল্লা আর সন্দেশের আকারে যে সঠিক আর বেঠিক আছে কে জানত? আমতা-আমতা করে বললাম, "ইয়ে—দুইটা দুই রকম। মনে করেন রসগোল্লা যদি চারকোনা হত তা হলে কি সেটাকে রসগোল্লা বলা যেত? বলতে হত রসকিউব। কিন্তু যেমন কেউ ভয় পেলে আমরা বলি চোখ রসগোল্লার মতো বড় হয়েছে—যদি রসগোল্লা না থেকে শুধু রসকিউব থাকত তা হলে আমরা কি সেটা বলতে পারতাম?"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "আপনি ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। আমি বলছি আকার আর সাইজের দিক থেকে! মনে করেন আপনি পুরো ফ্রিজ রসগোল্লা আর সন্দেশ দিয়ে ভরে ফেলতে চান। কোনটা বেশি রাখতে পারবেন?"

আমি আবার মাথা চুলকালাম, এক ফ্রিজ বোঝাই শুধু রসগোল্লা কিংবা শুধু সন্দেশ—চিন্তা করেই আমার গা গুলিয়ে যায়। কী উত্তর দেব বুঝতে পারছিলাম না, সায়রা বক্তৃতা দেওয়ার মতো করে বলল, "সন্দেশ! কেন জানেন?"

"কেন?"

"কারণ সন্দেশ হচ্ছে কিউব, তাই সন্দেশ গায়ে গায়ে লেগে থাকতে পারে—কোনো জায়গা নষ্ট হয় না। কিন্তু রসগোল্লা হচ্ছে গোলক, এগুলো রাখলে তার মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকে।"

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম কিন্তু এত জিনিস থাকতে সায়রা কেন এই জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে বুঝতে পারলাম না। আমার মুখ দেখে মনে হয় সায়রা সেটা টের পেল, জিজ্ঞেস করল, "কেন আমি এটা বলছি বুঝতে পারছেন?"

"না।"

"খুব সহজ।" সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "মনে করেন ডিমের কথা। ডিম যদি ডিমের মতো না হয়ে চারকোনা কিউবের মতো হত তা হলে কী হত?"

"ডিম পাড়তে মুরগিদের খুব কষ্ট হত।"

"না-না সেটা বলছি না!"

"তা হলে কোনটা বলছেন?"

"ডিম স্টোর করা কত সহজ হত চিন্তা করতে পারেন? একটার ওপর আরেকটা রেখে দেওয়া যেত। সেরকম তরমুজ যদি চারকোনা হত তা হলে অল্প জায়গায় অনেক বেশি তরমুজ রাখা যেত। আলু-টম্যাটো যদি চারকোনা হত—অল্প জায়গায় অনেক বেশি জিনিস রাখা যেত।"

আমি চতুষ্কোণ কিউবের মতন ডিম, আলু, তরমুজ কিংবা টম্যাটো চিন্তা করার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলাম—কিন্তু কাজটা কেন জানি সহজ হল না, উল্টো আমার শরীর কেমন জানি শিরশির করতে লাগল। সায়রা সেটা লক্ষ করল না, মুখ শক্ত করে বলল, "আমি ঠিক করেছি যত ফলমূল আছে সবকিছু চতুষ্কোণ কিউবের মতো বানিয়ে ফেলব।"

"সব?"

"হ্যাঁ। লাউ কুমড়া পটল ঝিঙে থেকে শুরু করে আলু টম্যাটো ডিম কিছুই বাকি রাখব না। গরিব দেশে কোল্ড স্টোরেজে এসব রাখতে কত জায়গা নষ্ট হয়—একবার কিউব বানিয়ে ফেললে আর কোনো জায়গা নষ্ট হবে না। কী বলেন আপনি?"

আমি মাথা চুলকালাম—উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তাই বলে চারকোনা কিউবের মতো লাউ? কুমড়া? পটল? ডিম? সবকিছুই যদি চারকোনা হয়ে যায় তখন কী হবে? গাড়ির চাকা চারকোনা, চোখের মণি চারকোনা—ফুটবল চারকোনা—আকাশের চাঁদ চারকোনা—চিন্তা করেই আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আমার জন্য শেষ পর্যন্ত সায়রার মনে হয় একটু মায়াই হল, বলল, "আপনি আসার পর থেকেই শুধু আমিই বকবক করে যাচ্ছি। এবারে আপনার কী খবর বলেন?"

আমি বললাম, "ভালো। তবে—"

"তবে কী?"

"খুব ভালো ছিলাম না।"

"কেন?"

আমি তখন কলার ছিলকে আর মুগরির রোস্টের কাহিনী শুনালাম। সায়রা মোটামুটি ভদ্র মেয়ে—অন্যদের মতো হেসে গড়িয়ে পড়ল না। গল্প শেষ করে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সেই ঘটনার পর আপনার কাছে একটা প্রশ্ন।"

"কী প্রশ্ন?"

"মালিশ করলে খুব আরাম লাগে, কিন্তু নিজে নিজে মালিশ করলে এত আরাম লাগে না, ব্যাপারটা কী?"

আমার প্রশ্ন শুনে সায়রা ফিক করে একটু হেসে ফেলল, বলল, "কঠিন প্রশ্ন করে ফেলেছেন! সত্যিই তো তাই!" সে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "মালিশ করলে সেখানে ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায়, নার্ভ দিয়ে একটা স্টিমুলেশন যায় সেজন্য ভালো লাগে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, আপনাকে ব্যাপারটা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাই।"

"কী এক্সপেরিমেন্ট?"

"এই দেওয়ালে একটা ঘুসি মারেন দেখি।"

"দেওয়ালে ঘুসি মারব? ব্যথা লাগবে না?"

"না ব্যথা লাগবে না—আমি ব্যথা না লাগার একটা স্পেশাল ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি।" সায়রা উঠে গিয়ে পানির মতো কী একটু ওষুধ এনে আমার হাতের আঙুলে লাগিয়ে দিল। বলল, "মারুন ঘুসি।"

আমি দেওয়ালে ঘুসি মেরে বাবাগো বলে হাত চেপে বসে পড়লাম, মনে হল সবগুলো আঙুল ভেঙে গেছে। বাম হাত দিয়ে ডান হাতের ব্যথা পাওয়া জায়গায় হাত বুলাতে বুলাতে ভাঙা গলায় বললাম, "আপনার ওষুধ কাজ করল না দেখি! ভয়ংকর ব্যথা লেগেছে।"

"এইটা ওষুধ ছিল না। এইটা ছিল পানি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তা হলে?"

"ইচ্ছে করে বলেছিলাম যেন আপনি একটু ব্যথা পান।"

"কেন? আমি কী করেছি? আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন কেন?"

"আপনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন।"

"আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি? কখন?"

সায়রা হাসি হাসি মুখে বলল, "এই যে আপনি যেখানে ব্যথা পেয়েছেন সেখানে হাত বুলাচ্ছেন। এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট।"

"কীভাবে?"

"মানুষ যখন ব্যথা পায় তখন ব্যথার অনুভূতিটা নার্ভের ভেতর দিয়ে ব্রেনে যায়, তখন ব্যথা লাগে। যখন আপনি ব্যথা পাওয়া জায়গায় হাত বুলাতে থাকেন তখন ব্যথার সাথে স্পর্শের অনুভূতিটাও পাঠাতে হয়। আপনার নার্ভ তখন কিছু সময় পাঠায় ব্যথার অনুভূতি—অন্য সময় পাঠায় স্পর্শের অনুভূতি—যেহেতু ব্যথার অনুভূতিটা স্পর্শের অনুভূতির সাথে ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে তাই সেটা কমে যায়। বুঝেছেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, "বুঝেছি।" সায়রার কথা বিশ্বাস করে মনে হয় একটু বেশ জোরেই ঘুসি মেরেছিলাম। ভাগাভাগি করার পরও হাতটা ব্যথায় টনটন করছে।

"কাজেই যখন নিজে মালিশ করেন তখন মালিশের যে আরামের অনুভূতি—সেটা মালিশ করার সাথে ভাগাভাগি করে হয়—আমার মনে হয় সেটা একটা কারণ হতে পারে—যে কারণে অন্য কেউ মালিশ করলে পুরো আরামের অনুভূতিটা পাওয়া যায়।"

"কিন্তু মালিশ করার জন্য অন্য মানুষকে ভাড়া করা জিনিসটা কেমন দেখায়?"

সায়রা মাথা নাড়ল, "একেবারেই ভালো দেখায় না।"

"কাজেই এরকম আরামের একটা জিনিস—কিন্তু কখনোই পাওয়া যাবে না।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। একজন মানুষ খালি গায়ে বসে আছে আরেকজন তাকে তেল মাখিয়ে দলাইমলাই করছে ব্যাপারটা খুবই কুৎসিত। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

সায়রা হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একবার সে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে হঠাৎ করে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। দশটা প্রশ্ন করলে একটার উত্তর দেয়, সেই উত্তরও হয় দায়সারা—কাজেই আমি আর সময় নষ্ট না করে সায়রার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন আমি সায়রার ই-মেইল পেলাম। বরাবরের মতো ছোট ই-মেইল, সেখানে লেখা :

জরুরি। দেখা করুন।

আমি সেদিন বিকালবেলাতেই সায়রার বাসায় হাজির হলাম। সায়রার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে, নতুন কিছু আবিষ্কার করলে তার মুখে এরকম আনন্দের ছাপ পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন নাকি?"

"বলতে পারেন করেছি।"

"কী জিনিস?"

"আপনাকে দেখাব, ধৈর্য ধরেন। তার আগে অন্য একটা জিনিস দেখাই।"

"কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়রা তার শেলফের দিকে দেখিয়ে বলল, "এই দেখেন।" আমি তাকিয়ে দেখি তার শেলফ বোঝাই মালিশের বই। মাথা মালিশ, ঘাড় মালিশ, পেট মালিশ, পিঠ মালিশ থেকে শুরু করে চোখের ভুরু মালিশ, চোখের পাতি মালিশ এমনকি কানের লতি মালিশ পর্যন্ত আছে! সেই মালিশের কায়দাকানুন এসেছে সারা পৃথিবী থেকে—ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় মালিশ থেকে শুরু করে চীন–জাপান–কোরিয়ান মালিশ, আমেরিকান পাওয়ার মালিশ, মেক্সিকান ঝাল মালিশ, আফ্রিকান গরম মালিশ, এমনকি একেবারে এস্কিমো ঠাণ্ডা মালিশও আছে। শুধু যে বই তাই নয়, ভিডিও, সিডি, কাগজের বান্ডিল সবকিছুতে বোঝাই। আমি অবাক হয়ে বললাম, "করেছেন কী? পৃথিবীর সব মালিশের বই সিডি ক্যাসেট নিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"ব্যাপারটা একটু স্টাডি করে দেখলাম।"

"কী দেখলেন?"

"আপনি এই চেয়ারটায় বসেন, আমি দেখাই।"

এর আগেও সায়রার কথা শুনে এরকম চেয়ারে বসে বড় বড় বিপদে পড়েছি। ভয়ে ভয়ে বললাম, "কোনো বিপদ হবে না তো?"

"না। কোনো বিপদ হবে না।"

আমি সাবধানে চেয়ারে বসলাম। সায়রা বলল, "চোখ বন্ধ করেন।"

যে ব্যাপারটাই ঘটুক—চাইছিলাম চোখের সামনেই সেটা হোক, কিন্তু সায়রার কথা শুনে চোখ বন্ধ করতে হল। সায়রা পেছনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি খুব সাবধানে আপনার ঘাড় স্পর্শ করছি।"

টের পেলাম সায়রা আমার দুই ঘাড় স্পর্শ করল। "এবারে হালকাভাবে মালিশ করে দিচ্ছি—এটি হচ্ছে কোরিয়ান মালিশ।"

আমি চোখ বন্ধ করে টের পেলাম খুব দক্ষ মানুষের মতো সায়রা আমার ঘাড় মালিশ করতে শুরু করেছে। সায়রার মতো এরকম একজন ভদ্রমহিলা আমার ঘাড় মালিশ করে দিচ্ছে চিন্তা করে আমার একটু অস্বস্তি হতে লাগল কিন্তু সে এমন এক্সপার্টের মতো হাত চালিয়ে যাচ্ছে যে আরামে আমার শরীর অবশ হয়ে এল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর আমি বললাম, "এখন চোখ খুলতে পারি?"

সায়রা বলল, "খোলেন।"

আমি চমকে উঠলাম, সায়রা আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ঘাড় মালিশ করে দিচ্ছে কিন্তু উত্তরটা আসলো সামনে থেকে। আমি চোখ খুলে একেবারে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম, সায়রা সামনে একটা চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে! অন্য কেউ আমার ঘাড় মালিশ করছে।

আমি পেছনে তাকালাম, কেউ নেই। ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি দুটো হাত ঘাড়ের মাংসপেশি ডলে দিচ্ছে। একটু ভালো করে তাকালাম, সত্যিকারের হাত কোনো সন্দেহ নেই—কিন্তু সেটা কনুইয়ের কাছে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। আতঙ্কে চিৎকার করে আমি হাত দুটি ধরে ছুড়ে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেগুলো প্রচণ্ড শক্তিশালী, আমার ঘাড় কিছুতেই ছাড়বে না। আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে সারা ঘরে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলাম, পায়ের সাথে ধাক্কা লেগে একটা টেবিল ল্যাম্প, দুইটা ফুলদানি, বইয়ের শেলফ উল্টে পড়ল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি লাফিয়ে কুঁদিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে সেই ভয়ংকর ভৌতিক দুটো হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম—কিন্তু কিছুতেই ছাড়া পেলাম না। আমার লাফঝাঁপ দেখে সায়রা ভয় পেয়ে কোথায় জানি ছুটে গিয়ে একটা সুইচ টিপ দিতেই হঠাৎ করে হাত দুটো আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল। আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দুই লাফে সরে গিয়ে ভয়ে ভয়ে সেই কাটা হাত দুটোর দিকে তাকালাম, এখনো প্রচণ্ড আতঙ্কে আমার বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ করছে।

সমস্ত ঘরের একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থা, এর মাঝে সায়রা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটু শান্ত হবার পর সায়রা জিজ্ঞেস করল, "আপনি—আপনি কী করছেন?"

আমি হাত দুটো দেখিয়ে বললাম, "এগুলো কার কাটা হাত?"

সায়রা হেঁটে গিয়ে হাত দুটো তুলে বলল, "কাটা হাত? কাটা হাত কেন হবে? এটা পলিমারের হাত। ভেতরে মাইক্রো প্রসেসর কন্ট্রোলড যন্ত্রপাতি আছে।"

আমার তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না, বড় বড় নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তার মানে এইগুলো সত্যিকারের হাত না?"

সায়রা চোখ কপালে তুলে বলল, "আপনি সত্যিই মনে করেন আমি মানুষের হাত কেটে বাসায় নিয়ে আসব?"

"না, মানে ইয়ে—" আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "আমি ভেবেছিলাম ভৌতিক কিছু।"

"ভৌতিক? দিনদুপুরে ভৌতিক?" সায়রা রেগে গিয়ে বলল, "আপনি সত্যিই মনে করেন পৃথিবীতে ভৌতিক জিনিস থাকা সম্ভব?"

ভূত আছে কি নেই সেটা নিয়ে একটা তর্ক শুরু হয়ে গেলে বিপদে পড়ে যাব, তাই আমি কথা ঘোরানোর জন্য বললাম, "এইগুলি আপনি নিজে তৈরি করেছেন?"

ভাঙা টেবিল ল্যাম্প, ফুলদানি তুলতে তুলতে সায়রা মুখ বাঁকা করে বলল, "না, এগুলো তো কিনতে পাওয়া যায় তাই আমি ধোলাইখাল থেকে কিনে এনেছি!"

আমিও লণ্ডভণ্ড ঘরটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "আই অ্যাম সরি—হঠাৎ করে দেখে এত ভয় পেয়ে গেলাম!"

সায়রা কঠিন মুখ করে বলল, "আপনি যখন এরকম ভীতু মানুষ—আপনার ঘর থেকেই বের হওয়া উচিত না। দরজা বন্ধ করে বসে থাকবেন, একটু পরে পরে আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিবেন। আরো ভালো হয় কোনো পীর সাহেবকে ধরে গলায় একটা তাবিজ লাগিয়ে নিলে—"

সায়রা রেগে গেছে, আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললাম, "আমাকে শুধু শুধু দোষ দিচ্ছেন। হাত দুটো এমন চমৎকারভাবে আমার ঘাড় মালিশ করছিল যে আমি একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর ছিলাম যে এগুলো আপনার হাত! যখন তাকিয়ে দেখি আপনি সামনে—আর হাত দুটো কনুই পর্যন্ত—ভয়ে আমার পেটের ভাত চাল হয়ে গেল। আপনি আমার জায়গায় থাকলে আপনারও হত—"

আমার কথা শুনে সায়রার রাগ একটু কমল মনে হল, বলল, "তা হলে আপনি বলছেন এটা একেবারে সত্যিকারের হাতের মতো?"

"সত্যিকার থেকে ভালো। কেমন করে তৈরি করলেন?"

"অনেক যন্ত্রণা হয়েছে। আঙুল কীভাবে নড়াব, কতটুকু চাপ দেবে, কতটুকু ঘষা দেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছু হিসাব করে বের করতে হয়েছে। তারপর যান্ত্রিক একটা হাত তৈরি করতে হয়েছে, সেটার সাথে মাইক্রো প্রসেসর ইন্টারসেফ লাগাতে হয়েছে। প্রোগ্রামিং করতে হয়েছে, পুরো প্রোগ্রামটি ডাউনলোড করে ই-প্রম ব্যবহার করে ভেতরে বসাতে হয়েছে।"

"এত কষ্ট করে এটা তৈরি করলেন?"

সায়রা উদাস গলায় বলল, "খালি গায়ে একজন তেল মেখে বসে আছে আরেকজন তাকে দলাইমলাই করছে দৃশ্যটা এত কুৎসিত—তাই এটা তৈরি করলাম। যে কেউ পড়াশোনা করতে করতে, টিভি দেখতে দেখতে কিংবা গান শুনতে শুনতে শরীরের যে কোনো জায়গা ম্যাসেজ করাতে পারবে।"

আমি বললাম, "কী সাংঘাতিক!"

"হ্যাঁ।" সায়রা বলল, "আমি এটা তৈরি করেছিলাম আপনার জন্য—কিন্তু আপনি যা একটা কাণ্ড করলেন, এখন মনে হচ্ছে বাক্সে তালা মেরে রাখতে হবে।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "আ-আ-আমার জন্য তৈরি করেছেন? আ-আ-আমার জন্য?"

সায়রা বলল, "আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই—এটা আপনাকে নিতে হবে না! এটা দেখে ভয় পেয়ে হার্টফেল করে আপনি মারা যাবেন আর পুলিশ এসে আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে! আমি তার মাঝে নেই।"

আমি হড়বড় করে বললাম, "না-না-না! আমি আর ভয় পাব না। একেবারেই ভয় পাব না। বিশ্বাস করেন—এই যে আমার নাক ছুঁয়ে বলছি, চোখ ছুঁয়ে বলছি—"

সায়রা ভুরু কুঁচকে বলল, "নাক ছুঁয়ে বললে চোখ ছুঁয়ে বললে কী হয়?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "তা তো জানি না। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়।"

সায়রা হেসে বলল, "তার মানে আপনি বলছেন এই রবোটিক হ্যান্ড ফর অটোমেটেড মাসল রিলাক্সিং ডিভাইস উইথ মাইক্রো প্রসেসর ইন্টারফেসটা নিতে আপনার আপত্তি নেই?"

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললাম, "না, কোনো আপত্তি নাই।"

সায়রা বলল, "আপনি কিন্তু মনে করবেন না এটা আপনাকে দিচ্ছি শুধু মজা করার জন্যে। এর পিছনে কিন্তু গভীর বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আছে।"

আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললাম "কী ধরনের ব্যাপার?"

"আপনি এটার ফিল্ড টেস্ট করবেন। আপনাকে একটা ল্যাবরেটরি নোটবই কিনতে হবে এবং সেখানে সবকিছু লিখে রাখতে হবে। আপনি আমার জন্যে ডাটা রাখবেন।"

ব্যাপারটা কীভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে আমার কোনো ধারণা নেই কিন্তু আমি তবু ঘাবড়ালাম না, মাথা নেড়ে বললাম, "রাখব।"

"ভেরি গুড।" সায়রা বলল, "এখন তা হলে আপনাকে দেখিয়ে দেই এটা কীভাবে কাজ করে।"

আমি বললাম, "তার আগে আমার একটি কথা আছে।"

"কী কথা?"

"আপনার এই যন্ত্রকে এরকম কটমটে নাম দিয়ে ডাকতে পারব না।"

"তা হলে এটাকে কী ডাকবেন?"

"আমি এটাকে ডাকব 'মালিশ মেশিন'।"

আমার কথা শুনে সায়রা হি হি করে হেসে বলল, "আমার এত কষ্ট করে তৈরি করা এরকম মডার্ন একটা যন্ত্রের এরকম মান্ধাতা আমলের নাম দিয়ে দিলেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, "আমি মানুষটাই তো মান্ধাতা আমলের।"

"ঠিক আছে!" সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "আপনার যেটা ইচ্ছে হয় সেটাই ডাকেন। আগে আসেন আপনাকে শিখিয়ে দেই এটা কীভাবে কাজ করে।"

আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললাম, "আমি কি শিখতে পারব?"

"নিশ্চয়ই পারবেন।" সায়রা তার যন্ত্রের হাত দুটোকে তুলে নিয়ে বলল, "আমি এটা এমনভাবে ডিজাইন করেছি যেন খুব সহজে ব্যবহার করা যায়।"

আমি খুশি হয়ে বললাম, "ভেরি গুড।" তারপর সায়রার পিছু পিছু তার ল্যাবরেটরির ঘরের দিকে রওনা দিলাম।

সন্ধেবেলা আমি আমার ঘরে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেছি। আমার কোলে একটা নোটবই এবং একটা বল পয়েন্ট কলম। নোটবইয়ের উপরে লেখা 'মালিশ মেশিন সংক্রান্ত তথ্য'। সায়রা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছে ঠিক সেভাবে আজকে আমি বৈজ্ঞানিক তথ্য নেব—বলা যায় জীবনের প্রথম। সায়রার তৈরি করা হাত দুটো সামনে রাখা আছে—আমি জানি এটা যান্ত্রিক হাত, ভেতরে যন্ত্রপাতি এবং ইলেকট্রনিক্স এবং পুরোটা এক ধরনের পলিমার দিয়ে তৈরি। তারপরেও মেঝেতে রেখে দেওয়া হাত দুটোকে দেখে আমার কেমন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে।

সায়রা পুরোটা এমনভাবে তৈরি করেছে যেন ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা না হয়। পুরোটা সাউন্ড অ্যাকটিভেটেড অর্থাৎ শব্দ দিয়ে চালু করা যায়। আমাকে কোনো সুইচ টিপতে হবে না শুধু জোরে একবার হাততালি দিতে হবে। বন্ধ করার জন্য তিনবার, দু বার কাছাকাছি তৃতীয়বার একটু পরে। এখন মালিশ মেশিন চালু করার জন্য আমি হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে জোরে একবার হাততালি দিলাম।

সাথে সাথে হাত দুটো জীবন্ত হাতের মতো নড়ে উঠল। আমি নিশ্চিতভাবে জানি এটা যন্ত্রের হাত তারপরেও আমার কেমন জানি ভয়ে শরীর শিরশির করতে থাকে। হাত দুটো কেমন জানি গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে, তারপর আঙুলগুলো দিয়ে হাঁটতে থাকে, আমি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম, দেখলাম হাত দুটো মেঝেতে খামচে খামচে আমার পিছনে গিয়ে চেয়ার বেয়ে উঠতে লাগল। একটু পরে টের পেলাম দুটো হাত আমার ঘাড়ের দুই পাশে আঁকড়ে ধরেছে। আমি শক্ত হয়ে বসে রইলাম এবং টের পেলাম হাত দুটো খুব সাবধানে আমার ঘাড় মালিশ করতে শুরু করেছে। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে তারপর একটু জোরে। হাত দুটো আমার ঘাড় থেকে দুই পাশে একটু নেমে গেল, গলায় হাত বুলিয়ে পিঠের দিকে মালিশ করে দিল। আস্তে আস্তে হাত নাড়িয়ে সেটা নিচে থেকে উপরে, উপর থেকে নিচে তারপর দুই পাশে সরে যেতে লাগল। খুব ধীরে ধীরে আমার শরীরটা শিথিল হয়ে আসে, এক ধরনের আরাম সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, আমার হাত-পা, ঘাড়, মাথা সবকিছু কেমন জানি অবশ হয়ে আসে। আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে থাকে এবং আমি আরামে আহ্ উহ্ করে একেবারে নেতিয়ে পড়তে থাকি। রাতে ঘুমানোর আগে 'মালিশ মেশিন সংক্রান্ত তথ্য' নোটবইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখলাম :

১৪ই অক্টোবর রাত্রি দশটা তিরিশ মিনিট

অত্যন্ত কার্যকরী সেশান। অল্প কাতুকুতু অনুভব হয়।
তবে মেঝেতে খামচে খামচে আসার দৃশ্যটি ভীতিকর।
দুর্বল হার্টের মানুষের জন্য সুপারিশ করা গেল না।
মালিশের সাথে তৈল প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের লেখাটি পড়ে আমি বেশ মুগ্ধ হয়ে গেলাম, কী সুন্দর গুছিয়ে লিখেছি, পড়লেই একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা গবেষণা ভাব আছে বলে মনে হয়।

মালিশ মেশিনের হাত দুটো কোথায় রাখা যায় ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, আজকের জন্য আপাতত খাটের নিচে রেখে দিলাম। মশারি টাঙিয়ে শুয়ে শুয়ে আমি 'মালিশ মেশিন' নিয়ে কী কী করা যায় সেটা চিন্তা করতে করতে ঘুমানোর চেষ্টা করতে থাকি। দেশের অবস্থা খারাপ, চোর-ডাকাতের উৎপাত খুব বেড়েছে। প্রতিদিনই খবর পাচ্ছি আশপাশে কারো বাসা থেকে কিছু না কিছু চুরি হচ্ছে। আমার বাসায় এমনিতেই কিছু নেই কিন্তু চোর এসে যদি মালিশ মেশিনের হাত দুটো চুরি করে নিয়ে যায় তা হলে আমি খুব বিপদে পড়ে যাব। কালকেই ভালো দেখে একটা লোহার ট্রাঙ্ক কিনে আনতে হবে—দেরি করা ঠিক হবে না।

আমি অবিশ্যি তখনো জানতাম না যে আসলে এর মাঝেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

এমনিতে আমার ঘুম খুব গভীর, বাসায় বোমা পড়লেও ঘুম ভাঙে না—কিন্তু ঠিক কী কারণ জানি না রাত্রিবেলা আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি শুয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করলাম কেন হঠাৎ ঘুমটা ভেঙেছে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না। তলপেটে একটু চাপ অনুভব করছিলাম, বাথরুমে গিয়ে সেই চাপটা কমিয়ে আসব কিনা চিন্তা করছিলাম কিন্তু বিছানা থেকে ওঠার ইচ্ছে করছিল না তাই আবার ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। ঠিক তখন মনে হল ঘরের ভেতর কয়েকজন মানুষ ঘোরাঘুরি করছে। আমি এই বাসায় একা থাকি—আর কারো ঘোরাঘুরি করার কথা নয়। যারা ঘোরাঘুরি করছে তারা নিশ্চয়ই ভুল করে চলে আসে নি—ইচ্ছে করেই এসেছে। ইচ্ছেটা যে খুব মহৎ না সেটাও বোঝা খুব সহজ। আমার জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ঘুমের ভাব করে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা, মানুষগুলো যখন দেখবে এখানে নেওয়ার মতো কিছু নেই তখন নিজেরাই যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। আমার শরীরের বিভিন্ন অংশ মনে হয় আমার ইচ্ছেমতো চলে না—নিজেদের একটা স্বাধীন মতামত আছে। এই মাত্র কিছুদিন আগে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার পা একটা কলার ছিলকের মাঝে পা দিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। আজকেও তাই হল, আমি হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম যে আমি বলে বসেছি—"কে?"

ঘরের ভেতরে যারা ঘোরাঘুরি করছিল—তারা যে যেখানে ছিল সেখানে থেমে গেল। শুনলাম একজন বলল, "কাউলা, মক্কেল তো ঘুম থেকে উঠছে মনে লয়।"

কাউলা নামের মানুষটা বলল, "ঠিকই কইছেন ওস্তাদ। গুলি করমু?"

"অন্ধকারে করিস না। মিস করলে গুলি নষ্ট হইব। গুলির কত দাম জানস না হারামজাদা?"

অন্ধকারে গুলি করে পাছে গুলি নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে ঘরের ভেতরের মানুষগুলো লাইট জ্বালাল। আমি দেখলাম দুইজন মানুষ, একজন কুচকুচে কালো। মনে হয়, সেইজন্যই নাম কাউলা। অন্যজন শুকনো এবং দুবলা, নাকের নিচে ঝাঁটার মতো গোঁফ, ঠিক কী কারণ জানি না, মাথার মাঝে একটা বেসবল ক্যাপ। দুইজনেই হাফপ্যান্ট পরে আছে—হাফপ্যান্টের নিচে শুকনো শুকনো পাগুলো কেমন যেন বিতিকিচ্ছি হয়ে বের হয়ে আছে। কাউলার পরনে একটা লাল গেঞ্জি। ওস্তাদ একটা সবুজ রঙের টি-শার্ট পরে আছে, টি-শার্টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকেল জ্যাকসনের ছবি। কাউলার হাতে একটা বন্দুকের মতো অস্ত্র—মনে হয় এইটাকে কাটা রাইফেল বলে। ওস্তাদের হাতে একটা পিস্তল। হঠাৎ আলো জ্বালানোতে সবার চোখই একটু ধাঁধিয়ে গেছে। ওস্তাদ তার মাঝে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে মশারির কাছে এগিয়ে এসে আমাকে দেখার চেষ্টা করল, আমাকে দেখে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কাউলা!"

"জে ওস্তাদ।"

"ভুল বাসা।"

কাউলা নামের মানুষটা চমকে উঠে বলল, "কী কন ওস্তাদ! ভুল বাসা?"

"হয় হারামজাদা। এই দ্যাখ—" বলে মানুষটা মশারি তুলে আমাকে দেখাল।

আমি জানি, আমাকে দেখে মানুষজন খুব খুশি হয় না—কিন্তু এই মাঝরাতে আমাকে দেখে দুই ডাকাতের যা মনখারাপ হল সেটা আর বলার মতো নয়।

কাউলা বলল, "হায় হায়। এইটা তো দেহি সেই হাবাগোবা মানুষটা!"

ওস্তাদ চোখ লাল করে কাউলার দিকে তাকিয়ে বলল, "হারামজাদা, একটা সহজ কাজ করতে পারস না? এত কষ্ট করে গ্রিল কাইটা ঢুকলাম—আর অহন দেহি ভুল বাসা।"

কাউলা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "ভুল হয়ে গেছে ওস্তাদ! বাইরে থন মনে হইল দোতলা—আসলে তিন তলা।"

"এখন কী করবি?"

"আইছি যহন যা পাই লইয়া যাই।"

তখন কাউলা এবং ওস্তাদ দুইজনেই আমার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওস্তাদ বলল, "এর তো দেহি কিছুই নাই। একটা বাক্স পর্যন্ত নাই।"

কাউলা বলল, "খালি একটা টেলিভিশন।"

এতক্ষণ আমি কোনো কথাবার্তা বলি নাই, তাদের কথাবার্তায় আমার যোগ দেওয়াটা মনে হয় ঠিক ভদ্রতাও হত না, কিন্তু টেলিভিশনের ব্যাপারটা চলে আসায় আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, "ইয়ে—মানে টেলিভিশনটা নষ্ট।"

ওস্তাদ বলল, "নষ্ট? কেমন করে নষ্ট হল?"

"লাথি দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম। বাজে প্রোগ্রাম হচ্ছিল তো—"

ওস্তাদ এবং কাউলা মনে হয় প্রথমবার আমার দিকে ভালো করে তাকাল এবং আমি স্পষ্ট দেখলাম ওস্তাদের মুখটায় কেমন যেন ভয়ের ছাপ পড়ল। সে ঘুরে কাউলার দিকে তাকিয়ে বলল "কাউলা, চল যাই।"

"চলে যাব?"

"হ্যাঁ। আমি কামকাজ শিখছি সুলেমান ওস্তাদের কাছে। সুলেমান ওস্তাদ কইছে কখনো হাবাগোবা মানুষের বাড়িতে চুরি-ডাকাতি করতে যাবি না।"

"কেন ওস্তাদ?"

"বিপদ হয়। অনেক বড় বিপদ হয়।"

কাউলাকেও এবারে খুব চিন্তিত দেখাল। আমি আমার বাসায়, আমার বিছানায় মশারির ভেতরে জবুথবু হয়ে বসে আছি। আর দুইজন ডাকাত আমার দিকে দুশ্চিন্তা নিয়ে তাকিয়ে আছে—পুরো ব্যাপারটার মাঝে একটা কেমন যেন অবিশ্বাসের ব্যাপার আছে। কাউলা কাছে এসে মশারিটা তুলে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—আমি মুখটাকে একটু হাসি হাসি করার চেষ্টা করলাম কিন্তু খুব একটা লাভ হল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউলা ওস্তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওস্তাদ হাবাগোবা মানুষের বাড়িতে চুরি-ডাকাতি করলে বিপদ হয় কেন?"

"একজন মানুষ কখন কী করবে সেটা আন্দাজ করা যায়, তার জন্য রেডি থাকা যায়। কিন্তু বোকা মানুষ কখন কী করবে সেটা আন্দাজ করা যায় না। এরা একেবারে উল্টাপাল্টা কাজ করে সিস্টিম নষ্ট করে দেয়।"

কাউলা চিন্তিতভাবে বলল, "ওস্তাদ, বিপদ ডেকে লাভ আছে? গুলি কইরা ফিনিস কইরা দেই।"

ওস্তাদ প্রস্তাবটা খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "নাহ্। গুলির অনেক দাম। বাজে খরচ করে লাভ নাই।"

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, আমার জানের দাম গুলি থেকে কম হওয়ায় মনে হয় এই যাত্রা বেঁচে গেলাম।

কাউলা বলল, "এসেই যখন গেছি, যা পাই নিয়া নেই?"

ওস্তাদ টেবিলের কাছে রাখা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে উদাস গলায় বলল, "নে।"

কাউলা তখন আমার কাছে এগিয়ে আসে, হাতের বন্দুকটা দিয়ে মশারিটা উপরে তুলে বলল, "টাকাপয়সা যা আছে দেন।"

আমি তাড়াতাড়ি বালিশের নিচে থেকে মানিব্যাগটা বের করে সেখান থেকে সব টাকা বের করে কাউলার হাতেই দিয়ে দিলাম। কাউলা গুনে মুখ বিকৃত করে বলল, "মাত্র সাতাইশ টাকা? তার মাঝে একটা দশ টাকার নোট ছিঁড়া?"

সাতাশ টাকার মাঝে একটা নোট ছেঁড়া বের হওয়ার জন্য লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, "খেয়াল করি নাই, এক রিকশাওয়ালা গছিয়ে দিয়েছে।"

"মাত্র সাতাইশ টাকা দিয়ে কী হইব? গ্রিল কাটার ভাড়া করছি দুই শ টাকা দিয়ে।"

ওস্তাদ বলল, "বাদ দে কাউলা, বাদ দে।"

"বাদ দেই কেমন কইরা?" কাউলা মহাখাপ্পা হয়ে বলল, "বউয়ের সোনা গয়না অলংকার কই?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "জি, এখনো বিয়ে করি নাই।"

ওস্তাদ চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছিল। পা নাচানো বন্ধ করে বলল, "এখনো বিয়া করেন নাই?"

"জি না।"

"বয়স কত?"

"সার্টিফিকেটে পঁয়ত্রিশ। অরিজিনাল আরো দুই বছর বেশি।"

"সাঁইত্রিশ বছর বয়স এখনো বিয়া করেন নাই? তা হলে বিয়ে করবেন কখন? বুড়া হইলে?"

সাঁইত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেল এখনো বিয়ে হয় নি—সেজন্য আবার আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আমতা-আমতা করে বললাম, "ইয়ে—চেষ্টা করে যাচ্ছি—কিন্তু কোনো মেয়ে রাজি হতে চায় না।"

কাউলা অবিশ্যি বিয়ের আলাপে একেবারে উৎসাহ দেখাল না। আমার দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "মূল্যবান আর কী আছে বাসায়?"

"জাহানারা ইমামের নিজের হাতে অটোগ্রাফ দেওয়া একটা বই আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউলা কিছু না বুঝে ওস্তাদের দিকে তাকাল, ওস্তাদ হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "কাউলা, আয় যাই। হাবাগোবা মানুষের কাছাকাছি থাকা খুব বড় রিস্ক।"

কাউলা অবিশ্যি তবু হাল ছাড়ল না, আমার দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "সত্যিকারের মূল্যবান কী আছে? ঘড়ি? আংটি?"

"আংটি নাই।" আমি ঢোক গিলে বললাম, "একটা ঘড়ি আছে।"

"দেখি।"

আমি বালিশের তলা থেকে আমার ঘড়িটা বের করে দিলাম। ডিজিটাল ঘড়ি স্টেডিয়ামের সামনে ফুটপাত থেকে দশ টাকায় কিনেছিলাম। আরো ভালো করে দরদাম করলে মনে হয় আরো দুই টাকা কম রাখত। ঘড়িটা দেখে কাউলা খুব রেগে গেল, চিৎকার করে বলল, "আপনি একজন ভদ্রলোক মানুষ এই ঘড়ি পরেন? রিকশাওয়ালারাও তো এইটা পরে না।"

আমি বললাম, "জি খুব ভালো টাইম দেয়। প্রতি ঘণ্টায় শব্দ করে।"

"শব্দের খেতা পুড়ি"—বলে কাউলা ঘড়িটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো করে ফেলল।

ওস্তাদ পা নাচানো বন্ধ করে মেঘের মতো গর্জন করে বলল, "কাউলা?"

"জে ওস্তাদ।"

"তুই এইটা কী করলি? তোরে কতবার বলেছি অপারেশন করার সময় রাগ করতে পারবি না। মাথা ঠাণ্ডা রাখবি। রাগ করলেই কামকাজে ভুল হয়, বিপদ হয়। বলি নাই তোরে?"

"জে, বলেছেন ওস্তাদ।"

"এই মানুষ চরম হাবাগোবা—এর সামনে খুব সাবধান।"

"গত পরশু যে চাকু মারলাম একজনরে—"

"চাকু মারা ঠিক আছে। ভাবনা-চিন্তা করে ঠাণ্ডা মাথায় বাড়ির মালিকরে চাকু মারতেই বউ স্টিলের আলমারির চাবি দিয়ে দিল। এখানে তুই রাগ করে ঘড়িটা গুঁড়া করে দিলি তাতে কী লাভ হল?"

কাউলা আমাকে দেখিয়ে বলল, "এরে একটা চাকু মারা ঠিক আছে?"

ওস্তাদ উদাস গলায় বলল, "মারতে চাইলে মার। চাকু মারায় খরচ নাই, গুলি নষ্ট হয় না। পত্রিকায় খবর ওঠে, মানুষ ভয়ভীতি পায়, বিজনেসের জন্য ভালো। চাকু আছে সাথে?"

কাউলা মাথা নাড়ল, বলল, "জে না। বড় অপারেশন মনে করে কাটা রাইফেল নিয়ে বের হইছিলাম।"

"তা হলে?"

কাউলা কিছুক্ষণ মাথা চুলকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার কাছে আছে?"

"জি একটা আছে। বেশি বড় না। একটু ভোঁতা।"

"ভোঁতা?" কাউলা খুব বিরক্ত হল, "ভোঁতা চাকু কেউ ঘরে রাখে নাকি?"

বাসায় একটা ভোঁতা চাকু রাখার জন্য আবার লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। কাউলা মুখ খিচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "চাকুটা কই?"

"রান্নাঘরে। ড্রয়ারের ভিতরে।"

কাউলা খুব বিরক্ত হয়ে রান্নাঘরে চাকু আনতে গেল। আমি আর ওস্তাদ চুপচাপ বসে আছি। আমি মশারির ভিতরে, ওস্তাদ চেয়ারের উপর। কোনো কথা না বলে দুইজন চুপচাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে থাকা এক ধরনের অভদ্রতা—আমি তাই আলাপ চালানোর জন্য বললাম, "ইয়ে—চাকু মারলে কি ব্যথা লাগে?"

ওস্তাদ বলল, "কোথায় মারে তার ওপর নির্ভর করে। পেটে মারলে বেশি লাগে না।"

"আপনারা কোথায় মারবেন?"

"সেইটা কাউলা জানে—তার কোথায় মারার শখ। হাত পাকে নাই এখনো, প্র্যাকটিস দরকার।" ওস্তাদ আমাকে ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, "আপনাকে মনে হয় পেটেই মারবে। ভুঁড়িটা দেখে লোভ হয়।"

"ও।" এরপর কী নিয়ে কথা বলা যায় চিন্তা করে পেলাম না। অবিশ্যি আর দরকারও ছিল না। কাউলা ততক্ষণে চাকু আর একটা বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে চলে এসেছে।

ওস্তাদ বিরক্ত হয়ে বলল, "তোকে কতবার কইছি জিহ্বাটারে সামলা? অপারেশনে গিয়ে কখনো খাইতে হয় না, কই নাই?"

'কইছেন ওস্তাদ।"

"তাইলে?"

"আপনার জন্য আনছি। কিরিম বিস্কুট।"

ওস্তাদের মুখটা একটু নরম হল, বলল, "ও, কিরিম বিস্কুট? দে তাইলে।" ওস্তাদ আর কাউলা তখন টেবিলের দুই পাশে দুইটা চেয়ার নিয়ে বসে ক্রিম বিস্কুট খেতে লাগল। মাত্র গতকাল কিনে এনেছি, যেভাবে খাচ্ছে মনে হয় এক্ষুনি পুরো প্যাকেট শেষ করে ফেলবে।

মশারির ভেতরে বসে বসে আমি কাউলা আর তার ওস্তাদকে দেখতে লাগলাম, বিস্কুট খাওয়া শেষ করেই তারা আমার পেটে চাকু মারবে। কী সর্বনাশ ব্যাপার! আমি এখন কী করব? মশারিসহ তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ব? চিৎকার করে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করব? হাত জোড় করে কাকুতি-মিনতি করব? নাকি সিনেমায় যেরকম দেখেছি নায়কেরা মারামারি করে সেভাবে মারামারি শুরু করে দেব?

কিন্তু আমার কিছুই করা লাগল না, তখন সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার ঘটল এবং সেটা ঘটাল একটা মশা। মশাটা সম্ভবত ওস্তাদের ঘাড়ে বসে কামড় দিয়ে খানিকটা রক্ত খাবার চেষ্টা করল, ওস্তাদ বিরক্ত হয়ে হাত দিয়ে মশাটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, "ওহ্! এই মশার যন্ত্রণায় মনে হয় চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দিতে হবে।"

"ওস্তাদ, মশারে তাচ্ছিল্য কইরেন না।" কাউলা বলল, "ডেঙ্গু মশা বিডিআর থেকেও ডেঞ্জারাস।"

"ঠিকই কইছিস।" ওস্তাদ এবারে মশাটাকে লক্ষ করে, তার নাকের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, দুই হাত দিয়ে সশব্দে সেটাকে থাবা দিয়ে মেরে ফেলল—হাততালি দেবার মতো একটা শব্দ হল তখন।

সাথে সাথে খাটের নিচে রাখা মালিশ মেশিনের দুইটা হাত চালু হয়ে যায়। সেটাকে প্রোগ্রাম করা আছে যেদিকে শব্দ হয়েছে সেদিকে এগিয়ে যাবার জন্য। কাজেই খাটের নিচে হাত দুটো আঙুল ভর করে এগিয়ে আসতে শুরু করল। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখলাম সেগুলো মেঝে খামচে খামচে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওস্তাদের কাছাকাছি গিয়ে চেয়ারের পা বেয়ে হাত দুটো উপরে উঠতে শুরু করেছে।

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম এবং দেখলাম মাথার কাছাকাছি গিয়ে হাত দুটো নিঃশব্দে হঠাৎ করে ওস্তাদের ঘাড় চেপে ধরল। ওস্তাদ চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। খপ করে পিস্তলটা হাতে নিয়ে পিছনে তাকাল, পিছনে কেউ নেই। সে হতবাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে ঘুরে সামনে তাকাল, সামনেও কেউ নেই। কাউলা ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছে—ভয়ে তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, গলায় কোথায় জানি একটা তাবিজ আছে সেই তাবিজটা ধরে কাঁপা গলায় বলল, "কসম লাগে—জিন্দাপীরের কসম লাগে—আল্লাহ্‌র কসম লাগে।"

ওস্তাদ হাত দিয়ে ঘাড়ে ধরে রাখা হাত দুটো ছোটানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সেগুলো লোহার মতো শক্ত, কারো সাধ্যি নেই ছোটায়। দুই হাতে ধরে টানাটানি করে ভয়ে চিৎকার করে বলল, "কাউলা—হাত লাগা—বাঁচা আমারে—"

"না ওস্তাদ। আমি পারুম না। এইটা নিশ্চয়ই ঘাউড়া ছগিরের কাটা হাত। আল্লাহ্‌র গজব লাগছে, কাটা হাত চইলা আইছে—"

ওস্তাদ অনেক কষ্ট করে একটা হাত ছুটিয়ে আনল কিন্তু তাতে ফল হল আরো ভয়ানক। হাতটা ছুটে গিয়ে এবারে সামনে দিয়ে গলায় চেপে ধরল এবং ওস্তাদ আ-আ করে সারা ঘরে ছুটে টেবিলে ধাক্কা লেগে দড়াম করে পড়ে গেল। নিচে পড়ে গিয়ে সে দুই হাত দুই পা ছুড়তে থাকে—বিকট গলায় চিৎকার করতে থাকে, "কাউলারে কাউলা, বাঁচা আমারে আল্লাহ্‌র কসম লাগে—"

কাউলা এবারে তার কাটা রাইফেল তাক করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। চিৎকার করে হাত দুটিকে বলল, "খামোস, খামোস বলছি—গুলি কইরা দিমু, বেরাশ মারমু—"

ওস্তাদ হাত তুলে চিৎকার করে বলল, "কাউলা হারামজাদা গুলি করে আমারে মারবি নাকি—খবরদার।"

কাউলা বুঝতে পারল গুলি করায় সমস্যা আছে—তখন কাটা রাইফেলটা লাঠির মতো ধরে হাতটাকে মারার চেষ্টা করল, ঠিকভাবে মারতে পারল না, রাইফেলের বাঁটটা লাগল ওস্তাদের মাথায়, ঠকাস করে একটা শব্দ হল আর চোখের পলকে মাথার এক অংশ গোল আলুর মতো ফুলে উঠল।

ওস্তাদ গগনবিদারী একটা চিৎকার করে দুই পা ছুড়ে একটা লাথি দিয়ে কাউলাকে ঘরের অন্য মাথায় ফেলে দেয়। কাউলা আবার উঠে আসে, কাটা রাইফেলটা দিয়ে আবার হাতটাকে আঘাত করার চেষ্টা করল, ওস্তাদ ক্রমাগত ছটফট করছিল বলে এবারেও আঘাতটা লাগল মুখে এবং শব্দ শুনে মনে হল তার চোয়ালটা বুঝি ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেছে। কাউলা অবিশ্যি হাল ছাড়ে না, ওস্তাদের গলার মাঝে চেপে ধরে রাখা হাতটাকে আবার তার কাটা রাইফেল দিয়ে মারার চেষ্টা করল। এবারে সত্যি সত্যিই মারতে পারল কিন্তু তার ফল হল ভয়ানক!

কাটা হাতটা এতক্ষণ মালিশ করার চেষ্টা করছিল—রাইফেলের বাঁটের আঘাত খেয়ে তার যন্ত্রপাতি গোলমাল হয়ে গেল, সেটা তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে থাকে এবং যেটাকেই হাতের কাছে পেল সেটাকেই ধরার চেষ্টা করতে লাগল। কাউলা ব্যাপারটা বুঝতে পারে নাই—হঠাৎ করে হাতটা তার উরুর মাঝে খামছে ধরে, কাউলা যন্ত্রণায় চিৎকার করে ঘরময় লাফাতে থাকে—আমার খাটের সাথে পা বেধে সে আছাড় খেয়ে পড়ল, বেকায়দায় পড়ে তার নাকটা থেঁতলে গেল এবং আমি দেখলাম নাক দিয়ে ঝরঝর করে আধ লিটার রক্ত বের হয়ে এল।

দুইজন নিচে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আমি সাবধানে বিছানা থেকে নেমে প্রথমেই অস্ত্রগুলো আলাদা করলাম, ওস্তাদের পিস্তল, কাউলার কাটা রাইফেল আর আমার রান্নাঘরের চাকু। তখন শুনতে পেলাম কে যেন আমার ঘরের দরজা ধাক্কা দিচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানকার ভয়ংকর নর্তন-কুর্দন শুনে এই বিল্ডিঙের সবাই নিশ্চয়ই চলে এসেছে। দরজা খুলতে যাবার আগে আমার মালিশ মেশিনের হাতগুলো সামলানো দরকার। আমি তিনবার হাততালি দিলাম, দুইবার সাথে সাথে, তৃতীয়বার একটু পরে, ঠিক যেরকম সায়রা শিখিয়ে দিয়েছিল। সাথে সাথে হাতগুলো নেতিয়ে পড়ে যায়। আমি সাবধানে হাতগুলো নিয়ে খাটের নিচে রেখে দরজা খুলতে ছুটে গেলাম, আর একটু দেরি হলে মনে হয় দরজা ভেঙে সবাই ঢুকে যাবে। তখন বাড়িওয়ালাকে ব্যাপারটা বোঝানো খুব কঠিন হয়ে যাবে।

কাউলা এবং ওস্তাদের যে অবস্থা—তারা আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

পুলিশ যখন কোমরে দড়ি বেঁধে কাউলা আর ওস্তাদকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন শুনলাম ওস্তাদ ফ্যাসফ্যাসে গলায় কাউলাকে বলছে, "তোরে কইছিলাম না—হাবাগোবা মানুষের বাসায় চুরি-ডাকাতি করতে হয় না? অহন আমার কথা বিশ্বাস করলি?"

কাউলা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "জে ওস্তাদ, করেছি। এই জন্মে আর হাবাগোবা মানুষের বাড়িতে ঢুকুম না। খোদার কসম।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুহানের স্বপ্ন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুমান ইঞ্জিন

রিশি মনিটরে একটা গ্রহকে স্পষ্ট করতে করতে বলল, "আমি আমার জীবনে যতগুলো গ্রহ দেখেছি তার মাঝে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে এই গ্রহটা।"

টিরিনা তার অবাধ্য চুলগুলোকে পিছনে সরিয়ে বলল, "কেন? তুমি হঠাৎ এই গ্রহটার বিপক্ষে প্রচার শুরু করছ কেন? একটা গ্রহ হচ্ছে গ্রহ—তার মাঝে আবার ভালো খারাপ আছে নাকি?"

"থাকবে না কেন? একশবার থাকবে।"

টিরিনা মুখ টিপে হেসে বলল, "কী রকম?"

"মনে কর যে গ্রহে খোলা আকাশ, নিশ্বাস নেবার মতো বাতাস আর পানিতে ঢাকা বিশাল বিশাল সাগর বা হ্রদ আছে সেটা হচ্ছে ভালো গ্রহ। যে গ্রহে সেগুলো নেই সেটা হচ্ছে খারাপ গ্রহ।"

টিরিনা খিলখিল করে হেসে বলল, "তার মানে তুমি আসলে পৃথিবীকে ধরে নিয়েছ আদর্শ গ্রহ—যে গ্রহ যত বেশি পৃথিবীর কাছাকাছি সেই গ্রহ তোমার কাছে তত ভালো।"

রিশিকে এক মুহূর্তের জন্য একটু বিভ্রান্ত দেখায়, সে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "সেটা কি খুব অযৌক্তিক ব্যাপার হল? এখন না হয় আমরা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছি—কিন্তু একসময় তো আমরা সবাই পৃথিবীতেই থাকতাম। আমাদের শরীরের বিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর পরিবেশের উপযোগী হয়ে—কাজেই পৃথিবীর মতো গ্রহকে ভালো বললে তোমার এত আপত্তি কেন?"

টিরিনা হাসল। বলল, "মোটেও আপত্তি নেই। আমি শুধু বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছি।"

রিশি টিরিনার মুখে সূক্ষ্ম হাসি আবিষ্কার করে মুখটা অকারণে কঠোর করে বলল, "উঁহু, তুমি বোঝার চেষ্টা করছ না।"

"তা হলে আমি কী করছি?"

"তুমি আমার সাথে কৌতুক করার চেষ্টা করছ।"

টিরিনা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, "ঠিক আছে সেটাই না হয় হল—এটাও কি খুব বড় অপরাধ? আমরা দুইজন একটা মহাকাশযানে করে প্রায় আস্ত একটা গ্যালাক্সি পার হয়ে যাচ্ছি। বেশিরভাগ সময় কাটে আমাদের হিমঘরে। লিকুইড হিলিয়াম তাপমাত্রায় জমে পাথর হয়ে থাকি। দশ–বারো বছরে এক–আধবার আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগিয়ে তোলা হয়। কিছুদিন আমরা জেগে থাকি তখন তোমার সাথে আমি কৌতুকও করতে পারব না?"

রিশি বলল, "না সেটা আমি বলি নি। কৌতুক করতে পারবে না কেন, অবশ্যই পারবে। মানুষের যদি কৌতুকবোধ না থাকত তা হলে তারা মনে হয় এখনো বিবর্তনের উল্টো রাস্তায় গিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত।"

টিরিনা চোখ বড় বড় করে রিশির দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে তোমার ধারণা বিবর্তনে আমরা ঠিক দিকেই এগুচ্ছি?"

রিশি বলল, "কেন? তোমার কি সন্দেহ আছে নাকি?"

"কী জানি?" টিরিনা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "এই আমাদের ছোটাছুটি দেখে মনে হয় বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেই বুঝি ভালো ছিল। তুমি দেখেছ আমরা এখন এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিই না। দশ-বারো বছরে একবার আমাদের হিমঘর থেকে বের করে, আমরা তখন ছোটাছুটি করতে থাকি। ইঞ্জিন পরীক্ষা করি, জ্বালানি পরীক্ষা করি, ট্রাজেক্টরি পরীক্ষা করি, মনিটরের আসনে বসে থাকি—তোমার কি ধারণা এটা খুব চমৎকার একটা জীবন?"

রিশি একটু অবাক হয়ে বলল, "তোমার কী হয়েছে টিরিনা? আমি ভেবেছিলাম তুমি খুব আগ্রহ নিয়ে এই স্পেসশিপে এসেছিলে! হঠাৎ করে খেপে গেলে কেন?"

টিরিনা হাসল। বলল, "না খেপি নি। এগুলোও বিবর্তনের ফল, মেয়েদের শরীরে অন্যরকম হরমোন থাকে—তোমরা ছেলেরা সেটা বুঝবে না। ছেলেরা এসব বিষয়ে একটু ভোঁতা হয়—"

এবারে রিশি হা হা করে হেসে উঠল, বলল, "তোমার কপাল ভালো মহাকাশযানে শুধু আমি আর তুমি! অন্য কেউ হলে পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করে দিত, পঞ্চম মাত্রার অপরাধ হিসেবে তোমার এতক্ষণে বিচার হয়ে যেত!"

"ভারি তোমার বিচার—তোমার এই বিচারকে আমি ভয় পাই নাকি? বড়জোর এক বেলা কফি খেতে দেবে না।"

"শাস্তি হচ্ছে শাস্তি। কী পরিমাণ শাস্তি পেয়েছ সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। শাস্তি পেয়েছ কি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ।"

"মহাকাশযানের এই লম্বা যাত্রাগুলোতে যারা কোনো শাস্তি পায় না, উল্টো তাদেরই শাস্তি হওয়া দরকার—বুঝতে হবে তাদের ভেতরে কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই। আনন্দ-স্ফূর্তি নেই।"

"ভালোই বলেছ।" বলে হাসতে হাসতে রিশি আবার মনিটরের দিকে তাকাল এবং তার মুখের হাসি মিলিয়ে সেখানে এবারে একটা বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে ওঠে। সে মাথা নেড়ে বলল, "ছি! এটা একটা গ্রহ হল নাকি?"

টিরিনা একটু এগিয়ে যায় গ্রহটা দেখার জন্য, মনিটরে কদাকার গ্রহটিকে একনজর দেখে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ, এটা ভালো গ্রহ না। বিচ্ছিরি একটা গ্রহ।"

"এর মাঝে বাতাস আছে কিন্তু সেই বাতাস হালকাভাবে বিষাক্ত। এই গ্রহ শীতল নয়—কিন্তু তাপমাত্রা এমন যে তুমি কখনোই অভ্যস্ত হবে না। আলো আছে কিন্তু ঠিক ভুল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের, সবকিছুকে দেখাবে লালচে—পচা ঘায়ের মতো।"

টিরিনা গ্রহটাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে দেখতে বলল, "গ্রহটার কোনো নাম আছে নাকি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। এই পচা গ্রহকে কেউ নাম দিয়ে সময় নষ্ট করবে ভেবেছ? এর কোনো নাম নেই—এটার কপালে জুটেছে শুধু একটা সংখ্যা, সাত সাত তিন দুই নয়।"

টিরিনা তথ্যকেন্দ্রের মডিউলটি টেনে নামাতে নামাতে বলল, "দেখি আমাদের তথ্যকেন্দ্রে এর সম্পর্কে কোনো তথ্য আছে নাকি।"

মডিউলের সাথে যোগাযোগ করার এক মুহূর্ত পরেই টিরিনা চিৎকার করে বলল, "কী আশ্চর্য!"

রিশি এগিয়ে আসে, "কী হয়েছে?"

টিরিনা উত্তেজিত গলায় বলল, "তুমি এটা বিশ্বাস করবে না, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।"

"কী বিশ্বাস করব না?"

"তোমার এই ভয়ংকর পচা গ্রহটাতে কোনো একজন মানুষ আটকা পড়ে আছে! সে বিপদ সংকেত পাঠাচ্ছে!"

রিশি চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"আমি ঠিকই বলছি, এই দেখ।" টিরিনা তথ্যকেন্দ্রের মডিউলটি রিশির সামনে খুলে দিল। সত্যি সত্যি সেখানে দেখা যাচ্ছে এই গ্রহটি থেকে কোনো একজন মানুষ চতুর্থ মাত্রার একটা বিপদ সংকেত পাঠাচ্ছে! বিপদ সংকেতটি কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি থেকে আসছে না—তার মাঝে বিপদ সংকেতের বিভিন্ন পর্যায়ের কোড রয়েছে, সেটি নিখুঁতভাবে নিরাপত্তাসূচক সংকেত ব্যবহার করছে। বিপদ সংকেতটি খুব দুর্বল। যে পাঠাচ্ছে সে তার শক্তিটুকু অপচয় করছে না, যে পরিমাণ সংকেত না পাঠালেই নয় তার বেশি কিছু পাঠাচ্ছে না।

রিশি আর টিরিনা বিপদ সংকেতটি বিশ্লেষণ করল, যে এখানে আটকা পড়ে আছে তার ভয়াবহ সংকট। খাবার এবং পানীয় শেষ হয়ে গেছে, কোনোরকম জ্বালানি নেই, সঞ্চিত শক্তিও শেষ হয়ে যাচ্ছে। টিরিনা কিছুক্ষণ তথ্যকেন্দ্রের মডিউলটির দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, "একটা জিনিসের হিসাব মিলছে না।"

"কী জিনিস?"

"এই গ্রহে কোনো মানুষের বেঁচে থাকার কথা নয়।"

"পরিষ্কার সিগন্যাল পাঠাচ্ছে—"

"সিগন্যালও পাঠানোর কথা নয়।"

"কেন?"

"এই গ্রহ থেকে প্রাকৃতিকভাবে কোনো শক্তি আসবে না—যতখানি শক্তি নিয়ে শুরু করবে সেটাই সম্বল।"

"হ্যাঁ।" রিশি মাথা নাড়ল, বলল, প্রায় কুড়ি বছর আগে প্রথম দলটা গিয়েছে। তাদের সাথে যে সাপ্লাই ছিল সেটা খুব বেশি হলে চার বছরের। চার বছরের আগেই ঠিক করা হল গ্রহটা ছেড়ে চলে আসা হবে—"

টিরিনা উত্তেজিত গলায় বলল, "এই এখানেই হিসেব মিলছে না—যতবার তাদেরকে উদ্ধার করতে পাঠানো হয়েছে ততবারই অভিযাত্রী দল রয়ে গিয়েছে—ফিরে আসে নি। কিন্তু যে পরিমাণ রসদ আছে সেটা দিয়ে কিছুতেই তাদের চলার কথা নয়।"

রিশি মাথা নাড়ল, "কিন্তু চলছে। এই দেখ একজন হলেও সে কোনোভাবে বেঁচে আছে। সে পাগলের মতো বিপদ সংকেত পাঠিয়ে যাচ্ছে।"

"তার মানে কিছু বুঝতে পারছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিশি বলল, "না। তুমি বুঝতে পারছ?"

"হ্যাঁ।"

"কী?"

"আমাদের এই গ্রহে গিয়ে এই উন্মাদ মানুষটাকে উদ্ধার করতে হবে!"

রিশি ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কেমন করে জান মানুষটা উন্মাদ?"

"এরকম জঘন্য একটা গ্রহে কোনোরকম খাবার পানীয় ছাড়া একা একা কুড়ি বছর থাকতে হলে যে কোনো মানুষ পাগল হয়ে যাবে।"

রিশি বলল, "ঠিকই বলেছ। আমি হলে আত্মহত্যা করে ঝামেলা চুকিয়ে দিতাম।"

"এই মানুষ করে নি, সেই জন্যই বলছি মানুষটা নিশ্চয়ই উন্মাদ। এই গ্রহটাকে মোটামুটিভাবে ভালবেসে ফেলেছে।"

"যে মানুষটা আছে তার পরিচয়টা কী? বের করা যাবে?"

"উঁহু। এখন পর্যন্ত অনেকে গিয়েছে, যে কেউ হতে পারে।"

রিশি বলল, "যাবার আগে মানুষগুলো সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিয়ে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ। আমি তথ্যকেন্দ্র থেকে বের করছি।"

"আমি তা হলে স্কাউটশিপটা রেডি করি।" রিশি কন্ট্রোল রুম থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলল, "একটু আগে তুমি অভিযোগ করেছিলে শুধু হিমঘরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময় কাটাতে হয়, জীবনে কোনো উত্তেজনা নেই! এখন কী মনে হচ্ছে—জীবনে উত্তেজনা এসেছে?"

টিরিনা হাসল। বলল, "হ্যাঁ খানিকটা উত্তেজনা এসেছে। মানুষটা একটু খ্যাপা টাইপের মতো হলে উত্তেজনাটুকু আরেকটু বাড়বে।"

AMARBOI.COM

দূর থেকে গ্রহটাকে যত কদাকার মনে হচ্ছিল কাছে এসে সেটা তার চাইতে অনেক বেশি কদাকার মনে হল। রিশি ঠিকই বলেছিল এই গ্রহের প্রাকৃতিক আলোটা লালচে, পুরো গ্রহটাকে কেমন যেন পচা ঘায়ের মতো মনে হয়। স্কাউটশিপ দিয়ে গ্রহটার ভেতরে নামতে নামতে টিরিনা এক ধরনের বিতৃষ্ণা নিয়ে গ্রহটার দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো একজন মানুষ যদি একা একা এখানে কুড়ি বছর কাটিয়ে দেয় তার নিশ্চিতভাবেই পাগল হয়ে যাবার কথা।

বিপদ সংকেতের সিগন্যালটি খুঁজে বের করে কিছুক্ষণেই তারা একটা বিধ্বস্ত আবাসস্থল খুঁজে বের করে ফেলল। স্কাউটশিপ দিয়ে আবাসস্থলের উপরে দুপাক ঘুরে তারা কাছাকাছি নেমে আসে। বৈরী গ্রহটায় টিকে থাকার উপযোগী মহাকাশচারীর পোশাক পরতে পরতে টিরিনা বলল, "রিশি, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা নিতে ভুলো না।"

"কেন?"

"যে মানুষটা আছে সে কেমন মানুষ আমরা জানি না। যদি বাড়াবাড়ি খ্যাপা ধরনের হয় তা হলে একটু সাবধান থাকা ভালো।"

"হুম।" রিশি মাথা নেড়ে বলল, "এটাই এখন বাকি আছে—একটা মানুষকে উদ্ধার করতে এসে আমরা তাকে খুন করে যাই!"

"আমি বলি নি তাকে খুন করে যাও। বলেছি একটু সাবধান থাক!"

রিশি হাসল। বলল, "আমি জানি টিরিনা। তোমার সাথে ঠাট্টা করছি। একটু পরে যখন এই মানুষটার সাথে দেখা হবে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তখন কোনো ঠাট্টা-তামাশা করা যাবে না!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকাশচারীর প্রায় আধা কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরে দুজনে পা টেনে টেনে প্রায় বিধ্বস্ত আবাসস্থলের কাছে হাজির হল। পুরোটা প্রায় ধসে আছে—সত্যিকার অর্থে কোনো দরজা নেই। কিছু ইট-পাথর সরিয়ে একটা সুড়ঙ্গ মতন করে রাখা আছে—এটাকেই মনে হয় দরজা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রিশি গিয়ে সেই দরজায় ধাক্কা দিল, একটু পেছনে টিরিনা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে রইল। বার কয়েক শব্দ করার পর ঘড়ঘড় করে শব্দ করে একটা গোলাকার দরজা খুলে যায়। রিশি সতর্কভাবে ভেতরে ঢুকল, পেছনে পেছনে টিরিনা। ভেতরে আবছা অন্ধকার, চারপাশে একটা মলিন বিবর্ণ ভাব, দেখেই কেমন যেন অসুস্থ-অশুভ বলে মনে হয়। ঘড়ঘড় শব্দ করে আবার দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়, তারা শুনতে পারল একটা দুর্বল পাম্প ভেতরের বিষাক্ত বাতাস সরিয়ে নিশ্বাস নেবার উপযোগী বাতাস দিয়ে ভরে দিচ্ছে। সহজ কাজটুকু করতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল, যে মানুষটি এখানে থাকে সে তার সঞ্চিত শক্তি বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোথাও এতটুকু বাজে খরচ করতে রাজি নয়।

একসময় ভেতরে বাতাসের চাপ গ্রহণযোগ্য হয়ে এল এবং তখন ঘড়ঘড় শব্দ করে ভেতরের দরজা খুলে গেল। রিশি এবং টিরিনা হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি ধরে রাখে। দরজার অন্যপাশে উসকোখুসকো চুলের মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটিও দুই হাতে একটি টাইটেনিয়ামের রড ধরে রেখেছে, তার চোখ দুটো অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো জ্বলজ্বল করছে। রিশি একটু ইতস্তত করে বলল, "আমরা তোমার বিপদ সংকেত পেয়ে তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

মানুষটা হাতের টাইটেনিয়ামের রডটি ধরে রেখে সতর্ক গলায় বলল, "এস। ভেতরে এস।" মানুষটির গলার স্বর শুষ্ক এবং কঠিন।

রিশি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "আমার নাম রিশি। আর আমার সাথে আছে টিরিনা।"

মানুষটি বলল, "আমার নাম দ্রুমান।"

"তোমাকে অভিবাদন দ্রুমান।"

"তোমাদেরকেও অভিবাদন। আমাকে উদ্ধার করতে আসার জন্য তোমাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা।"

রিশি একটু অবাক হয়ে দেখল, মানুষটি মুখে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে কিন্তু হাতে শক্ত করে টাইটেনিয়ামের রডটি ধরে রেখেছে। মানুষটি বলল, "তোমরা ইচ্ছে করলে এই পোশাক খুলে ফেলতে পার। আমার এই ঘর দেখে খুব বিবর্ণ মনে হলেও এটি পুরোপুরি নিরাপদ।"

রিশি এবং টিরিনাও সেটা লক্ষ করেছে।। মহাকাশচারীর পোশাকের নিরাপত্তাসূচক আলোটি অনেকক্ষণ থেকেই সবুজ হয়ে আছে। টিরিনা তার পোশাকটি খুলতে গিয়ে থেমে গেল, জিজ্ঞেস করল, "দ্রুমান। তুমি হাতে এই টাইটেনিয়ামের রডটি অস্ত্রের মতো করে ধরে রেখেছ কেন?"

দ্রুমান নিজের হাতের দিকে তাকাল এবং মনে হল ব্যাপারটি প্রথমবার লক্ষ করল। সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাতের টাইটেনিয়ামের রডটি একটা শেলফে রেখে বলল, "তোমরা কিছু মনে করো না। আমি বিশ বছর একা একা এই গ্রহটাতে আছি। আমার আচার-ব্যবহারে নানা ধরনের অসঙ্গতির জন্ম হয়েছে—তোমরা কিছু মনে করো না।"

টিরিনা হেলমেটটা খুলে হাতে নিয়ে বলল, "না আমরা কিছু মনে করব না। একা একা থাকার জন্য বিশ বছর খুব দীর্ঘ সময়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিশি বলল, "কোনো রকম খাওয়া, পানীয়, জ্বালানি ছাড়া তুমি কেমন করে এতদিন এখানে বেঁচে আছ?"

"কষ্ট করে।"

"কিন্তু শুধু কষ্ট করে তো এটি সম্ভব নয়।"

দ্রুমান একটু হাসার চেষ্টা করল, সব মানুষকেই হাসলে সুন্দর দেখায় কিন্তু যে কোনো কারণেই হাসিমুখে দ্রুমানকে মুহূর্তের জন্য কেমন জানি ভয়ংকর দেখাল। সে তার এই ভয়ংকর হাসিটি বিস্তৃত করে বলল, "আমাকে বেঁচে থাকার জন্য অনেক ফন্দিফিকির করতে হয়েছে।"

রিশি তার পোশাক খুলতে খুলতে বলল, "হ্যাঁ, ফিরে যাবার আগে আমরা তোমার ফন্দিফিকির দেখতে চাই।"

দ্রুমান আবার ভয়ংকর হাসিটি হেসে বলল, "দেখবে। নিশ্চয়ই দেখবে।"

টিরিনা বলল, "তোমার এখানে দেখছি নিয়মিত ইলেকট্রিক সাপ্লাই আছে। তার মানে কোনো এক ধরনের জেনারেটর আছে!"

দ্রুমান মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ আছে।"

"সেটা তুমি কী দিয়ে চালাও? আমাদের মহাকাশযানের তথ্যকেন্দ্রে দেখেছি এই গ্রহটাতে বাইরের কোনো শক্তি নেই। খুব বাজে গ্রহ।"

দ্রুমান বিচিত্র একটি দৃষ্টিতে টিরিনার দিকে তাকাল। বলল, "আমার কাছে এখন এটাকে আর বাজে গ্রহ মনে হয় না। মানুষ যখন দীর্ঘদিন কোনো রোগে ভোগে তখন সেই রোগটার জন্য মায়া পড়ে যায়। আর এটা একটা অদ্ভুত গ্রহ!"

টিরিনা চোখ কপালে তুলে বলল, "তার মানে এই গ্রহটার জন্যও তোমার একটু মায়া পড়ে গেছে?"

দ্রুমান একটা নিশ্বাস ফেলল। বলল, "গ্রহটার থেকে বেশি মায়া পড়েছে আমার এই জায়গাটার জন্য। এর প্রত্যেকটা পাথরের টুকরো আমার নিজের হাতে বসানো। বেঁচে থাকার জন্য কী না করেছি। শেষ পর্যন্ত যখন ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে পারলাম তখন মনে হল হয়তো বেঁচে যাব।"

রিশি বলল, "তোমাকে অভিনন্দন দ্রুমান—এরকম একটা পরিবেশে বেঁচে থাকা প্রায় অলৌকিক একটা ব্যাপার।"

দ্রুমান মাথা ঘুরিয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ, আসলেই এটা অলৌকিক।"

টিরিনা ঘরটির ভেতরে ঘুরে দেখে। দেয়ালে আলোর সুইচ ছিল। প্রায় অন্যমনস্কভাবে সে একটা সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল, সাথে সাথে পুরো ঘরটি উজ্জ্বল আলোতে ভরে যায়। দ্রুমান হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, "না।"

"না?" টিরিনা অবাক হয়ে বলল, "কী না?"

দ্রুমান কঠিন গলায় প্রায় ছুটে এসে আলোটা নিভিয়ে দিতেই পুরো ঘরটি আবার আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেল। দ্রুমান কঠিন গলায় বলল, "তুমি আলো জ্বালবে না। শক্তির অপচয় করবে না।"

টিরিনা একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝে তোমাকে আমরা নিয়ে যাব। তোমাকে এখানে থাকতে হবে না। এতদিন যেভাবে শক্তি বাঁচিয়েছ তোমাকে আর সেভাবে শক্তি বাঁচাতে হবে না!"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ।" রিশি বলল, "তুমি দুই-তিন বছরে যে পরিমাণ শক্তি খরচ কর আমাদের স্কাউটশিপে তার থেকে বেশি শক্তি জমা আছে!"

"থাকুক। তার মানে এই নয় যে তুমি শক্তির অপচয় করবে।"

রিশি আর তর্ক করল না। বলল, "ঠিক আছে। এটা তোমার জায়গা, তুমি যেটা বলবে সেটাই নিয়ম।"

"হ্যাঁ।" দ্রুমান মাথা নেড়ে বলল, "সেটা সব সময় মনে রাখবে। এটা আমার জায়গা। আমার অনুমতি ছাড়া এখানে তোমরা কিছু স্পর্শ করবে না। বুঝেছ?"

রিশি মাথা নাড়ল। বলল, "বুঝেছি।"

মানুষটি একা একা থেকে পুরোপুরি অসামাজিক হয়ে গেছে, স্বাভাবিক ভদ্রতার বিষয়গুলোও পুরোপুরি ভুলে গেছে।

শুধু যে স্বাভাবিক ভদ্রতার বিষয়গুলো ভুলে গেছে তাই নয় রিশি আর টিরিনা একটু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, মানুষটির আরেকটি বিচিত্র অভ্যাসের জন্ম হয়েছে। সে সব সময় নিজের সাথে কথা বলে। বেশিরভাগ সময় বিড়বিড় করে কিন্তু প্রায় সময়েই বেশ জোরে জোরে। তার এই ঘর, থাকার জায়গা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শক্তি, শক্তির অপচয়, খাবার আর পানীয়ের সঞ্চয় এইসব বিষয় নিয়ে সব সময় নিজের সাথে পরামর্শ করছে। মানুষটি আবার দুর্ব্যবহার করবে এ ধরনের একটা ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও টিরিনা জিজ্ঞেস করল, "দ্রুমান, তুমি নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন সত্যিকারের খাবার খাও নি?"

"না। আমার সব খাবার পুনরুজ্জীবিত খাবার।"

শরীর থেকে যে বর্জ্য বেরিয়ে আসে সেটাকে পরিশোধন করে আবার খাবার তৈরির পদ্ধতিটি অনেক পুরোনো কিন্তু তার পরেও একজন মানুষ দিনের পর দিন এরকম খাবার খেয়ে যাচ্ছে চিন্তা করে রিশির শরীর কেমন জানি গুলিয়ে এল। টিরিনা বলল, "আজকে তোমার সম্মানে এখানে একটি আনুষ্ঠানিক ভোজের আয়োজন করতে পারি।"

দ্রুমান ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমাদের কাছে কী কী খাবার আছে?"

"মেষ শাবকের মাংস থেকে শুরু করে সমুদ্রের মাছ, যবের রুটি থেকে শুরু করে ভুট্টা দানা, সত্যিকার ফলের কাস্টার্ড থেকে শুরু করে স্নায়ু উত্তেজক পানীয় সবকিছু আছে।"

দ্রুমানের চোখ কেমন জানি চকচক করে ওঠে, সে সুড়ুৎ করে জিবে লোল টেনে বলল, "চমৎকার!"

রিশি বলল, "আমাদের হাতে খুব সময় নেই। আমার মনে হয় আমরা আমাদের ভোজটি দ্রুত সেরে নিয়ে রওনা দিয়ে দিই।"

দ্রুমান রিশির কথার কোনো উত্তর দিল না। অবিশ্বাস্য ব্যাপার কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় এই অশুভ গ্রহের অসুস্থ পরিবেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার তার কোনো তাড়াহুড়ো নেই। রিশি বলল, "দ্রুমান। তোমার কি প্রস্তুত হতে সময় লাগবে? স্কাউটশিপ দিয়ে মহাকাশযানে পৌঁছাতে বেশ সময় লাগবে—সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?"

দ্রুমান কোনো উত্তর দিল না, বিড়বিড় করে বর্জ্য পরিশোধনের সময় নিয়ে সে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা বলল। রিশি মোটামুটি নিশ্চিত হতে শুরু করেছে এই মানুষটি সম্ভবত খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ।

ঘরটিতে তিন জন মানুষের বসে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। দুটি এলুমিনিয়ামের বাক্স এনে রিশি এবং টিরিনার বসার জায়গা করা হল। যে টেবিলটাকে খাবারের টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে টিরিনা তার উপর একটা নিও পলিমারের চাদর বিছিয়ে দিল। তার উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানা রকম খাবার, গরম করে রাখা হয়েছে। দ্রুমান লোভাতুর চোখে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে—সে শেষবার কবে এরকম একটি ভোজে অংশ নিয়েছিল নিশ্চয়ই মনে করতে পারবে না।

টিরিনা স্নায়ু উত্তেজক পানীয়ের বোতলটি খুলে দ্রুমানকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কাছে গ্লাস আছে?"

দ্রুমান মাথা নাড়ল, বলল, "আছে।" তারপর উঠে একটা ড্রয়ার খুলে তিনটা ক্রিস্টালের গ্লাস নিয়ে এল। টিরিনা গ্লাসে পানীয় ঢালতে ঢালতে বলল, "কী সুন্দর গ্লাস!"

দ্রুমান মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। বিশেষ বিশেষ দিনে আমি এই গ্লাস ব্যবহার করি।"

টিরিনা তার গ্লাসটি উঁচু করে বলল, "দ্রুমান, এই গ্রহে তোমার শেষ দিনটি উপলক্ষে—"

রিশি মাথা নাড়ল, বলল, "শেষ দিন উপলক্ষে।"

দ্রুমান কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। যখন এক-দুটি কথা বলা ভদ্রতা তখন সে চুপ করে থাকে, কিন্তু যখন প্রয়োজন নেই তখন সে নিজের সাথে বিড়বিড় করে কথা বলে।

টিরিনা পানীয়টিতে চুমুক দিয়ে বলল, "চমৎকার পানীয়।"

রিশিও পানীয়তে চুমুক দিয়ে বলল, "হ্যাঁ। চমৎকার।"

দ্রুমান বিড়বিড় করে বলল, "নিহিলিয়ান ডাবল ডোজ।"

স্নায়ুকে আক্রমণ করার এক ধরনের ভয়ংকর বিষের নাম নিহিলিয়ান। দ্রুমান হঠাৎ করে এই বিষটির নাম উচ্চারণ করছে কেন ভেবে টিরিনা খুব অবাক হল। সে ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি নিহিলিয়ানের কথা কী বলছ?"

"গ্লাসের ভেতরে আমি দিয়ে রাখি। শুকিয়ে থাকে দেখে বোঝা যায় না।"

রিশি আর টিরিনা ভয়ংকরভাবে চমকে উঠল, টিরিনা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ চমৎকার বিষ। আমার সবচেয়ে পছন্দের।"

রিশি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, হঠাৎ করে তার হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। সে দাঁড়াতে পারছে না। নড়তে পারছে না।

দ্রুমান একদৃষ্টে রিশি আর টিরিনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমরা আর নড়তে পারবে না। আরো কিছুক্ষণ তোমার জ্ঞান থাকবে, তারপর তোমরা অজ্ঞান হয়ে যাবে।"

রিশি অনেক কষ্ট করে কোনোভাবে বলল, "কেন?"

"কারণ তোমরা হবে আমার শক্তির সঞ্চয়। আমি একা একা এখানে কীভাবে এতদিন বেঁচে আছি তোমরা বুঝতে পারছ না? বেঁচে আছি কারণ আমি শক্তির কোনো অপচয় করি নি। আমি আমার জেনারেটরের জন্য কী ইঞ্জিন ব্যবহার করেছি জানতে চাও? ব্যবহার করেছি সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিন। তোমরা জান সেটা কী?"

রিশি ফিসফিস করে বলল, "মানুষের শরীর?"

"হ্যাঁ। মানুষের শরীর। দ্রুমান জিব দিয়ে পরিতৃপ্তির একটা শব্দ করে বলল, "বিবর্তনে লক্ষ লক্ষ বছরে মানুষের শরীরকে নিখুঁত করা হয়েছে, সৃষ্টি জগতে এর চাইতে ভালো কোনো ইঞ্জিন তৈরি হয় নি। আমি সেই ইঞ্জিনকে ব্যবহার করেছি আমার জেনারেটরে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিশি জিজ্ঞেস করতে চাইল সেই ইঞ্জিনগুলো কারা—কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না, হঠাৎ করে তার হাত-পা অবশ হয়ে আসতে শুরু করেছে, সে দেখতে পাচ্ছে শুনতে পাচ্ছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না।

দ্রুমান বিড়বিড় করে বলল, "নিহিলিয়ান হচ্ছে বিষের রাজা। একটু হিসেব করে দিতে হয়, বেশি দিলে কোমাতে চলে যাবে—কম দিলে ঘণ্টা খানেকের মাঝে শরীর মেটাবলাইজ করে ফেলবে, শরীর সচল হয়ে যাবে। মাঝামাঝি একটা পরিমাণ আছে যেটা দিলে তোমরা প্রথমে সবকিছু দেখবে, বুঝবে কিন্তু কিছু করতে পারবে না। আস্তে আস্তে জ্ঞান হারাবে। সেই জন্য এটা আমার প্রিয় বিষ।"

দ্রুমান ঘর থেকে বের হয়ে একটা ট্রলি নিয়ে এল। ট্রলিটা রিশির পাশে রেখে আবার নিজের সাথে কথা বলতে থাকে, "এখন তোমাদের আমি ইঞ্জিন ঘরে নিয়ে যাব। এত সুন্দর করে ডিজাইন করেছি, তোমাদের এটা দেখা উচিত। মানুষ যখন একটা সুন্দর সঙ্গীত রচনা করে তখন সে চায় এটা দশজন শুনুক, সুন্দর ভাস্কর্য করলে চায় দশজন দেখুক।"

দ্রুমান রিশিকে টেনে ট্রলির উপরে শুইয়ে বলল, "এইখানেও সেই একই ব্যাপার। একজন মানুষ একা একা বিশ বছর থেকে এখানে আছে, সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনকে ব্যবহার করছে জেনারেটর চালানোর জন্য, শক্তির কোনো অপচয় নেই। একেবারে নিখুঁত একটা প্রক্রিয়া, আমি কীভাবে করেছি এটা তোমাদের দেখা দরকার। এইজন্য আমি নিহিলিয়ান বিষটা পছন্দ করি। তোমাদের শরীর পুরোপুরি অচল, কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ, তুমি শুনতে পাচ্ছ, বুঝতে পারছ। কী চমৎকার!"

দ্রুমান প্রথমে রিশিকে তারপর টিরিনাকে ট্রলিতে করে ঠেলে ঠেলে এক পাশে একটা বন্ধ ঘরের সামনে নিয়ে আসে। ঘরের বড় তালা খুলতেই একটা বোঁটকা গন্ধ পেল রিশি। সে তার মাথা ঘুরাতে পারছে না, তাই এখনো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। দ্রুমান রিশি আর টিরিনাকে ভেতরে ঢুকিয়ে ট্রলিটা ভাঁজ করে তাদেরকে আধশোয়া অবস্থায় নিয়ে আসতেই তারা পুরো দৃশ্যটি দেখতে পেল, একটা ভয়ংকর আতঙ্কে তারা চিৎকার করে উঠত কিন্তু তাদের শরীর পুরোপুরি অবশ বলে তারা শুধু নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল।

ঘরের মাঝামাঝি জেনারেটরটি দাঁড় করানো আছে তার চারপাশে প্রায় পঞ্চাশ জন নগ্ন মানুষ শুয়ে আছে। মানুষগুলো নিশ্চয়ই অচেতন, কারণ তাদের কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই, শুধু তাদের পাগুলো জেনারেটরের মূল শ্যাফটটাকে যন্ত্রের মতো ঘুরিয়ে যাচ্ছে। দ্রুমান এক ধরনের উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, "দেখেছ আমার ইঞ্জিন? আমি এটার নাম দিয়েছি দ্রুমান ইঞ্জিন।"

সে কাছাকাছি একজন মানুষের কাছে গিয়ে বলল, "ভালো করে তাকিয়ে দেখ, এই যে এই টিউব দিয়ে তার জন্য পুষ্টিকর তরল আসছে। এই টিউবটা নাকের ভেতর দিয়ে সরাসরি ফুসফুসে চলে গেছে। আমি এটা দিয়ে একেবারে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সাপ্লাই দিই। শরীরের যা বর্জ্য সেগুলো এই টিউব দিয়ে আমি বের করে নিয়ে আসি। ডান দিকে তাকিয়ে দেখ আমার সিনথেজাইজার বর্জ্য থেকে সবগুলো যৌথমূল আলাদা করে আবার নূতন করে পুষ্টিকর তরল তৈরি করা হয় সেটা আবার তাদের শরীরে চলে আসছে। একটা পরিপূর্ণ সিস্টেম, বাইরে থেকে বলতে গেলে আমার কিছুই লাগছে না।"

দ্রুমান তার জেনারেটর ঘরের ভেতর ঘুরতে থাকে, কোনো কোনো মানুষের চোখের পাতা তুলে পরীক্ষা করে সন্তুষ্টির মতো শব্দ করে আবার রিশি আর টিরিনার কাছে ফিরে আসে, "তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ মানুষগুলো এটা কেন করছে? অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুমান নিজেই তার চোখে–মুখে প্রশ্ন করার ভঙ্গি নিয়ে এসে বলল, "আর এই প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে আমার সাফল্য! আমার আবিষ্কার।"

দ্রুমান কাছাকাছি এসে একজনের হাতটা একটু উপরে তুলে আবার ছেড়ে দিতেই সেটা নির্জীবের মতো পড়ে যায়, দ্রুমান বলল, "দেখেছ? হাতগুলো পুরোপুরি অচল। আস্তে আস্তে শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গেছে। জেনারেটরের শ্যাফটটা ঘোরানো হচ্ছে পা দিয়ে, হাতের কোনো প্রয়োজন নেই তাই আস্তে আস্তে হাতগুলো অচল হয়ে যাচ্ছে। এই জেনারেটর চালানোর জন্য আমার দরকার একেবারে সুস্থ সবল নীরোগ মানুষ। এখানে সবাই সুস্থ সবল আর নীরোগ। শুধু সুস্থ সবল আর নীরোগ নয়, তারা অসম্ভব সুখী মানুষ। তোমরা দেখতে পাচ্ছ তাদের মুখে এক ধরনের পরিতৃপ্তির হাসি? দেখেছ?"

খুব ধীরে ধীরে রিশির চেতনা লোপ পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার ভেতরেও সে দেখতে পেল কাছাকাছি শুয়ে থাকা নগ্ন মেয়েটির মুখে সূক্ষ্ম এক ধরনের হাসি, সেই মুখে কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। দ্রুমানের নিজের মুখেও এক ধরনের পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল, সে বলল, "দুঃখ কষ্ট আনন্দ বেদনা এর সবই তো আসলে আমাদের মস্তিষ্কের এক ধরনের প্রক্রিয়া। আমি সেই প্রক্রিয়াটাকেই নিয়ন্ত্রণ করছি। এদের মস্তিষ্কের কিছু কিছু জায়গা পাকাপাকিভাবে নষ্ট করে দিয়েছি যেন তারা আর কোনো দিন জেগে উঠে কারো কাছে অভিযোগ করতে না পারে। কিছু কিছু জায়গা একটু পরিবর্তন করে দিয়েছি যার কারণে তাদের মুখে এরকম আনন্দের হাসি। তারা খুব আনন্দের সাথে এই কাজটা করছে।। তাদের ভেতরে কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই, হিংসা নেই, রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, তারা খুব সুখে আছে। মাঝে মাঝে তাদেরকে দেখলে আমার এক ধরনের হিংসা হয়। মনে হয় আহা আমিও যদি তাদের মতো সুখী হতে পারতাম, আনন্দিত হতে পারতাম।"

দ্রুমানের মুখে সত্যিই এক ধরনের বিষণ্ণভাব ফুটে ওঠে। তাকে দেখে মনে হতে থাকে সত্যি বুঝি এই মানুষগুলোর মতো সুখী হবার জন্য তার ভেতরে এক ধরনের ব্যাকুলতার জন্ম হয়েছে। সে রিশির চোখের পাতা টেনে চোখের মণিটা একনজর দেখে বলল, "নিহিলিয়ানের কাজ শুরু করেছে। এখন তোমরা অচেতন হয়ে গেছ। তোমরা আর আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি একা একা কথা বলতে পারি। আমি বিশ বছর থেকে নিজের সাথে কথা বলছি। নিজের সাথে কথা বলার থেকে চমৎকার ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। এর মাঝে কোনো বিরোধ নেই, তর্কবিতর্ক নেই। তোমরা ব্যাপারটা চেষ্টা করে দেখলে পারতে। এখন অবিশ্যি দেরি হয়ে গেছে, কারণ তোমরা আর কোনো দিন চেতনা ফিরে পাবে না। এক ধরনের ঐশ্বরিক আনন্দ দিয়ে আমি তোমাদের দ্রুমান ইঞ্জিন তৈরি করে ফেলব।"

দ্রুমান টিরিনার ট্রলিটা ঠেলে ঘরের এক কোনায় নিতে নিতে বলল, "আমার এই ইঞ্জিন ঘরেই সবকিছু। অস্ত্রোপচারটাও এই ঘরে করি। অবিশ্যি অস্ত্রোপচারের কাজটা খুব সহজ। আমি এই হেলমেটটা তোমাদের মাথায় পরিয়ে দেব—" দ্রুমান একটা হেলমেট তুলে দেখাল, তারপর বলল, "হেলমেটের নয়টা জায়গায় নয়টা স্ক্রু আছে সেগুলো ঘুরিয়ে টাইট করতে হয়, ব্যস সাথে সাথে কাজ শেষ। ভিতরে কয়টা লিভার আছে, সেগুলো মস্তিষ্কের ঠিক ঠিক জায়গায় ফুটো করে কিছু পরিবর্তন করে দেয়। অত্যন্ত চমৎকার একটা যন্ত্র। এটা আমাকে তৈরি করে দিয়েছে ডক্টর নিশিনা—ঐ দেখ ডান দিক থেকে তিন নম্বর জায়গায় শুয়ে নগ্ন দেহে হাসিমুখে সে কাজ করে যাচ্ছে। বেচারা বুঝতেই পারে নি আমি তার ওপরে সেটা প্রথমবার ব্যবহার করব। কিছু কিছু মানুষ জীবনের জটিলতাগুলো বুঝতে পারে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুমান টিরিনার ট্রলিটা তার কাজ চালানোর মতো অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে উপরের উজ্জ্বল আলোটা জ্বেলে দিয়ে বলল, "এই আলোটা জ্বালানোর জন্য আমার বাড়তি কিছু শক্তি ক্ষয় হচ্ছে কিন্তু আমি সেজন্য আজকে মোটেও চিন্তিত নই। আমি একটু বাড়তি আলো আজকে ব্যবহার করতেই পারি কারণ আমার জেনারেটরে আজকে দুটো নতুন দ্রুমান ইঞ্জিন লাগাতে যাচ্ছি। তোমরা দুজন। আমার বিদ্যুৎ শক্তি কয়েক শতাংশ বেড়ে যাবে আজ থেকে। কী চমৎকার!"

দ্রুমান টিরিনার অচেতন দেহের দিকে তাকিয়ে জিব দিয়ে একটা শব্দ করে বলল, "তোমার পোশাকটা আগে খুলে নিই! কিছুক্ষণের ভেতরেই তুমি বেঁচে থাকার জন্য যেসব বাহুল্য করতে হয় তার সবকিছু থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। তোমার শরীরে যে পোশাক আছে বা নেই তুমি সেটাও জানবে না।" দ্রুমান টিরিনার পোশাকের জিপ টেনে খুলতে খুলতে বলল, "তোমার এই সুন্দর সুগঠিত শরীর অন্যরকম হয়ে যাবে, হাতগুলো আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে, ঘাড় আর বুকের মাংসপেশি অকেজো হয়ে যাবে। তবে পা দুটো আরো সুগঠিত হয়ে যাবে। কোমরের মাংসপেশিগুলো হবে শক্ত—"

দ্রুমান টিরিনার পোশাকের জিপ টেনে নিচে নামিয়ে এনে বলল, "আমি তোমাকে এভাবে নগ্ন করে ফেলছি, তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?"

ঠিক তখনই একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, টিরিনার চোখ দুটো খুলে যায়। সে একদৃষ্টে দ্রুমানের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, "হ্যাঁ আপত্তি আছে।"

দ্রুমান ইলেকট্রিক শক খাওয়া মানুষের মতো ছিটকে পেছনে সরে যায়। তার চোখে-মুখে বিস্ময় এবং তার থেকে বেশি আতঙ্ক। সে একটা হাত সামনে বাড়িয়ে অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো বলল, "তু-তু-তুমি-তুমি—"

"হ্যাঁ আমি।" টিরিনা তার ট্রলিতে উঠে বসল তারপর পোশাকের খুলে ফেলা জিপটি টেনে আবার বন্ধ করে দিয়ে বলল, "তুমি দীর্ঘদিন একা একা আছ তাই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির কী কী উন্নতি হয়েছে তার খবর রাখ না।"

দ্রুমান এদিক-সেদিক তাকিয়ে ছুটে গিয়ে স্টেইনলেস স্টিলের একটা ধারালো সার্জিক্যাল চাকু হাতে নিয়ে চাপা গলায় চিৎকার করে বলল, "খবরদার। খবরদার বলছি—"

টিরিনা ট্রলি থেকে তার পা দুটো নিচে নামিয়ে বলল, "তুমি শুধু শুধু উত্তেজিত হয়ো না দ্রুমান।"

"খুন করে ফেলব আমি, তোমাকে খুন করে ফেলব।"

"আমার জন্য এই শব্দটা ব্যবহার করায় একটা সমস্যা আছে।" টিরিনা হাসি হাসি মুখ করে বলল, "একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে খুন করতে পারে। আমি তো ঠিক মানুষ নই।"

দ্রুমান ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তুমি তা হলে কী?"

"সেটি আমিও পুরোপুরি নিশ্চিত নই। খুব স্থূলভাবে যদি বলতে চাও রোবট বা এনরয়েড বলতে পার। কেউ কেউ আবার সাইবর্গ বলে। তুমি কোনটা বলতে চাও সেটা আমি জানি না।" টিরিনা উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুমানের দিকে অগ্রসর হয়ে বলল, "তবে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না। যে জিনিসটা তোমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে তোমার জেনে রাখা ভালো যে তুমি যে চাকুটা হাতে নিয়েছ সেটা দিয়ে আমার চামড়ায় আঁচড়ও দিতে পারবে না। কাটার কোনো প্রশ্নই আসে না।"

দ্রুমান বিড়বিড় করে বলল, "মিথ্যা কথা বলছ। তুমি মিথ্যা কথা বলছ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিরিনা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "তোমাকে কোনো কিছু বিশ্বাস করানোর জন্য আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তবে আমি চাই না তুমি নতুন করে কোনো বোকামি কর। আমি খালি হাতে তোমার মাথাটা গুঁড়ো করে ফেলতে পারব।"

"মিথ্যা কথা বলছ তুমি—"

"আমার চোখের দিকে তাকাও দ্রুমান।"

দ্রুমান টিরিনার চোখের দিকে তাকায় এবং আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে থাকে। টিরিনার দুটি চোখ জ্বলছে, তীব্র আলোতে ঝলসে উঠছে দুটি চোখ।

টিরিনা ফিসফিস করে বলল, "আমি মানুষ নই। কিন্তু আমার ভাবনা-চিন্তা মানুষের মতো। আরেকজন মানুষ এখন যা করত এখন আমিও তোমাকে তাই করব।"

"কী করবে তুমি?"

টিরিনা এক পা এগিয়ে হঠাৎ খপ করে দ্রুমানের হাত ধরে ফেলল, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় দ্রুমান আর্তনাদ করে ওঠে, তার হাত থেকে ধারালো চাকুটা পড়ে যায়। টিরিনা ফিসফিস করে বলল, "তুমি তোমার এই জেনারেটরে আরো একটি দ্রুমান ইঞ্জিন হয়ে থাকবে।"

দ্রুমান কাতর গলায় বলল, "না!"

"নগ্ন দেহে পা দিয়ে প্যাডেল ঘুরিয়ে তুমি তোমার বন্ধু ডক্টর নিশিনার পাশাপাশি শুয়ে থাকবে। তোমার বন্ধু ডক্টর নিশিনার মুখে যেরকম প্রশান্তির হাসি ফুটে আছে তোমার মুখেও সেরকম হাসি ফুটে থাকবে।"

"না-না—"

টিরিনা তার যান্ত্রিক হাত দিয়ে মুহূর্তে দ্রুমানকে ট্রলিতে চিৎ করে শুইয়ে ফেলল। দ্রুত হাতে নিও পলিমারের স্ট্র্যাপ দিয়ে ট্রলিতে বেঁধে ফেলে বলল, "তুমি একটু আগে বলেছ তোমার এককালীন সহকর্মী, তোমাকে উদ্ধার করতে আসা মহাকাশচারীদের দেখে মাঝে মাঝে তোমার হিংসা হয়। তোমার আর হিংসা হবে না। তুমি এখন তাদের একজন হয়ে যাবে।"

দ্রুমান মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমি তাদের একজন হতে চাই না।"

টিরিনা শেলফের ওপর রাখা হেলমেটটা হাতে নিয়ে দ্রুমানের দিকে এগিয়ে আসে, তার মাথায় পরিয়ে নিচু গলায় বলল, "চুপ করে শুয়ে থাক দ্রুমান। শক্তির অপচয় করো না।"

AMARBOI.COM

স্কাউটশিপের মৃদু কম্পনে রিশির জ্ঞান ফিরে আসে। সে ঘোলাটে চোখে টিরিনার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কোথায়?"

"তুমি স্কাউটশিপে।"

রিশি প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করে, কিছু একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছিল মানুষের শরীর নিয়ে। নগ্ন দেহে অসংখ্য মানুষ কোথায় জানি শুয়ে আছে, কিন্তু সে মনে করতে পারছে না। টিরিনা তার মাথায় হাত রেখে বলল, "তুমি ঘুমাও রিশি। তোমার কোনো ভয় নেই। কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।"

রিশি কয়েক মুহূর্ত টিরিনার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ বন্ধ করে ফেলল। স্মৃতি মুছে ফেলার যে ওষুধটা দেওয়া হয়েছে সেটা কাজ করতে শুরু করেছে।

টিরিনা এক ধরনের গভীর ভালবাসা নিয়ে রিশির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই মানুষটিকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার জন্য সে এসেছে। সে নিশ্চয়ই তাকে রক্ষা করবে। বুক আগলে রক্ষা করবে।

মানুষের মতো অসহায় আর কে এই জগতে?

ঘৃণার সঙ্গে বসবাস

নিশি গোল কোয়ার্টজের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নির্দিষ্ট জিনের কিছু বেস পেয়ারকে পরিবর্তন করে আজকাল যে কোনো মানবীকে সুন্দরী করে দেওয়া যায় বলে সৌন্দর্যের গুরুত্বটি কমে এসেছে—তারপরও একটু ভালো করে লক্ষ করলেই বোঝা যায় নিশির সৌন্দর্যটি অন্যরকম। তার কিশোরীর মতো ছিপছিপে দেহ, সেখানে ঢলঢলে এক ধরনের লাবণ্য, আকাশের মতো নীল চোখ, লালচে চুল এবং কোমল ও মসৃণ ত্বক। তার ভেতরে এক ধরনের সতেজ আত্মবিশ্বাস, যেটি সব সময়েই চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে থাকে। তার অনুভূতি সব সময়েই খুব চড়া সুরে বাঁধা থাকে, এই মুহূর্তে যেটি উত্তেজনায় প্রায় আকাশছোঁয়া হয়ে আছে। তার সমস্ত মুখমণ্ডল প্রচণ্ড ক্রোধে রক্তাভ এবং অপ্রতিরোধ্য এক ধরনের আক্রোশে তার শরীর অল্প অল্প কাঁপছে। নিশি এক ঝটকা মেরে তার মুখের ওপর পড়ে থাকা চুলগুলোকে পেছনে সরিয়ে ঘরের মাঝামাঝি বসে থাকা অশুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার এবং আমার মাঝে যে সম্পর্ক সেটা সম্ভবত পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে খারাপ সম্পর্ক।"

অশুন নিশির আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করা স্বামী। অশুন সুদর্শন-শক্ত-সমর্থ এক যুবক। তার বয়স নিশির বয়সের কাছাকাছি, মানসিক কাঠামো, বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্বাস এমনকি কথা বলার ভঙ্গিও দুজনের প্রায় একই রকম। দুজন এত কাছাকাছি ধরনের মানুষ হবার পরও কোনো একটি বিচিত্র কারণে একজন আরেকজনকে গ্রহণ করতে পারে নি। এই গ্রহণ করতে না পারাটুকু যদি মৃদু অপছন্দের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকত তা হলে একটি কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি, তারা একজন আরেকজনকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে। প্রাচীনকালে পরিবারের কাঠামোটির খুব গুরুত্ব ছিল, পরিবার হিসেবে টিকে থাকার একটি বড় শর্ত ছিল সন্তান পালন করা। তখন একজন পুরুষ ও রমণীর পক্ষে পরস্পরকে এত তীব্রভাবে ঘৃণা করে একসাথে বসবাস করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন পরিবেশটি অন্যরকম। নিশি এবং অশুন যে একসাথে স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে বসবাস করছে তার একটিমাত্র কারণ হচ্ছে পরস্পরের প্রতি অকল্পনীয় এক ধরনের ঘৃণা। এই ঘৃণা এত তীব্র এবং গভীর যে নিজের অজান্তেই তারা সেই ঘৃণাকে ভালবাসতে শুরু করেছে, লালন করতে শুরু করেছে। দুজন দুজনকে ছেড়ে গেলে এই তীব্র ঘৃণাটুকু হারিয়ে যাবে বলেই হয়তো তারা আর আলাদা হয়ে যেতে পারছে না।

নিশি তীব্র দৃষ্টিতে অশুনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে তোমাকে আমি একদিন বিয়ে করেছিলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগুন একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "কেন? বিশ্বাস না করার কী আছে?"

"তুমি বলতে চাও তোমাকে সত্যি আমি একসময় পছন্দ করতাম? তোমাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভালবেসেছিলাম?"

"না।" অগুন মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি আমাকে কোনো দিন ভালবাস নি, আমি এই ব্যাপারটি তোমাকে নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি।"

নিশি তার সুন্দর ভুরু দুটি কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই ব্যাপারটিতে এত নিশ্চিত কেমন করে হলে?"

"কারণ আমাকে বা অন্য কোনো মানুষকেই তোমার ভালবাসার ক্ষমতা নেই। প্রকৃতপক্ষে তোমার মস্তিষ্কের গঠনে কাউকে ভালবাসা সম্ভব নয়।"

নিশি কষ্ট করে নিজের ক্রোধকে সংবরণ করে বলল, "তাই যদি সত্যি হয় তা হলে তোমাকে কেন আমি একদিন বিয়ে করেছিলাম?"

"কৌতূহল।" অগুন মাথা নেড়ে বলল, "তুমি একজন মেয়ে, পুরুষ কেমন করে আচরণ করে সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা ছিল না। তাই তুমি কৌতূহলী হয়ে আমাকে বিয়ে করেছিলে।"

"আর তুমি?" নিশি তীব্র স্বরে বলল, "আর তুমি কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে?"

অগুন আনন্দহীন এক ধরনের হাসি হেসে বলল, "ভুল করে। আমি তোমাকে ভুল করে বিয়ে করেছিলাম। এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে তোমার ভেতরে এক ধরনের সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল, সে কারণে আমি তোমার প্রতি এক ধরনের জৈবিক আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম।"

"এখন সেই সম্মোহনী ক্ষমতা নেই? সেই জৈবিক আকর্ষণ নেই?"

"না নেই।" অগুন প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, "বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। আমার কাছে তুমি আর একটি ঘিনঘিনে বিষাক্ত সাপের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। একটা বিষাক্ত সাপকে আমি যেরকম বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পিষে মেরে ফেলতে পারি ঠিক সেরকম তোমাকেও পিষে মেরে ফেলতে আমার একটুও দ্বিধা হবে না।"

নিশি নিচু গলায় হিসহিস করে বলল, "তা হলে মেরে ফেলছ না কেন?"

অগুন হা-হা করে হেসে বলল, "আইনের ভয়ে। যদি আইনের কোনো বাধা না থাকত তা হলে এতদিনে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে খুন করে ফেলতাম। আজ থেকে এক শ বছর আগে হলে আমি নিশ্চিতভাবে তোমাকে শারীরিকভাবে আঘাত করতাম! তোমার খুব সৌভাগ্য যে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে মহিলাদের শারীরিক শক্তি পুরুষের সমান করে ফেলা হয়েছে। তা না হলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে নির্দয়ভাবে আঘাত করতাম।"

নিশি বিস্ফারিত চোখে অগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। অগুন মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমার প্রিয় ফ্যান্টাসি কী জান?"

"কী?"

"তোমাকে জনসমক্ষে অপমান করে একটি শারীরিক শাস্তি দিচ্ছি!"

নিশি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি এখন একটু একটু বুঝতে পারছি কেন তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। তুমি ঠিকই বলেছ, কৌতূহল এবং সম্ভবত এই কৌতূহলের কারণেই আমি তোমাকে এখনো স্বামী হিসেবে রেখে দিয়েছি। রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেই নি। কিছু একটাকে কেউ যখন খুব ঘেন্না করে তখন মানুষের সেটাকে নিয়ে এক ধরনের কৌতূহল হয়। শরীরের কোথাও যদি ঘা হয় তখন বারবার সেটা দেখার কৌতূহল হয়—

অনেকটা সেরকম। তুমি হচ্ছ আমার জীবনের সেই দগদগে ঘা। লাল হয়ে পেকে থাকা পুঁজে ভরা বিষাক্ত ঘা।"

অগুন এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে নিশির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। নিশি থামতেই সে মাথা নেড়ে বলল, "তুমি এখনো খুব গুছিয়ে কথা বলতে পার নিশি।"

"এর মাঝে গুছিয়ে বলার কিছু নেই। সত্যি কথা গুছিয়ে বলতে হয় না—উচ্চারণ করলেই হয়। তোমার সাথে বিয়ে না হলে ঘৃণা ব্যাপারটি কী সেটা আমি কোনো দিন জানতে পারতাম না। আমার জীবনটা এক অর্থে অসম্পূর্ণ থেকে যেত।"

"ঘৃণা একটা পারস্পরিক ব্যাপার।" অগুন মাথা নেড়ে বলল, "এটা কখনো একপক্ষীয় হতে পারে না। নিশি, আমিও তোমাকে ঘৃণা করি। ভয়ংকর ঘৃণা করি। সত্যি কথা বলতে কী মেয়েমানুষ কত খারাপ হতে পারে সেটা তোমাকে না দেখলে আমি কখনো জানতে পারতাম না।"

নিশির মুখে বিদ্রুপের একটা হাসি ফুটে উঠল। বলল, "চমৎকার! তোমার মতো নিচু শ্রেণীর মানুষের কাছে আমি এর থেকে ভালো কোনো কথা আশা করি নি।"

"কেন? আমি নতুন কী বলেছি?"

"তুমি ঘৃণা কর আমাকে অথচ সেজন্য পুরো নারী জাতিকে নিয়ে একটা কুৎসিত কথা বললে!"

অগুন এতক্ষণ ঘরের মাঝামাঝি বসে ছিল, এবারে সে খানিকটা ব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল এবং নিশির কাছাকাছি হেঁটে এসে বলল, "তুমি একটা জিনিস জান? আমি কিন্তু তোমাকে 'তুমি' হিসেবে ঘৃণা করি না। নিশি নামের একটি নির্বোধ মহিলা হিসেবে তুমি কিন্তু খুব খারাপ নও। বলা যেতে পারে একটা নির্বোধ মহিলার পক্ষে যতটুকু ভালো হওয়া সম্ভব তুমি মোটামুটি তাই। আমি তোমাকে ঘৃণা করি একটি মেয়ে হিসেবে। তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে তুমি একজন মেয়ে। বড় ধরনের সার্জারি না করে তুমি এর থেকে মুক্তি পাবে না। মেয়েমানুষ বিবর্তনের খুব বড় একটি ত্রুটি।"

নিশির চোখ থেকে আগুন বের হতে থাকে। সে জোরে জোরে কয়েকবার নিশ্বাস নিয়ে বলল, "আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখছি। একটা লোহার রড দিয়ে আঘাত করে তোমার খুলি গুঁড়ো করে দেওয়া উচিত।"

অগুন হালকা পায়ে একটা নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে বলল, "তুমি না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে হলে সম্ভবত তাই করত। আমার ধারণা নির্বোধ মেয়ে প্রজাতির তুমি মোটামুটি একটি গ্রহণযোগ্য সদস্য।"

নিশি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "অগুন, তুমি কোনো দিন প্রাচীন ইতিহাস পড়েছ?"

"হ্যাঁ। কিছু পড়েছি।"

"তুমি জান আজ থেকে কয়েকশ বছর আগে পৃথিবীর সব পুরুষ তোমার মতো চিন্তা করত? তাদের সবাই ভাবত পৃথিবীতে পুরুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ? নারী হচ্ছে দুর্বল? তুমি যে একজন আদিম মানুষ সেটি কি জান?"

অগুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ জানি। আমি একজন প্রাচীন মানুষের মতো চিন্তা করি। প্রাচীন সবকিছু কিন্তু ভুল নয়, প্রাচীন অনেক কিছু সত্যি। অনেক কিছু খাঁটি। প্রাচীনকালে মানুষ অনেক কিছু অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার করেছিল, তার বেশিরভাগ ছিল সত্যি। এটিও তাই। মেয়ে হচ্ছে নিকৃষ্ট জীব। সত্যি স্বীকার করে নাও নিশি।"

নিশি তীব্র দৃষ্টিতে অশুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি জান এই কথাগুলো বলে তুমি প্রমাণ করেছ যে তুমি একটি আকাট নির্বোধ? আহাম্মক? বুদ্ধিহীন জড়পদার্থ? অশিক্ষিত মূর্খ? জংলি ভূত?"

অশুন শব্দ করে হেসে বলল, "অপ্রিয় সত্যি কথা সবার ভালো নাও লাগতে পারে।"

"তুমি কি হিটলারের নাম শুনেছ? যে মনে করত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। তুমি কি জান তার কী অবস্থা হয়েছিল? ইতিহাস তাকে কীভাবে আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলেছিল তুমি জান?"

"জানি।"

"তোমার মতো একটা মূর্খ আহাম্মক বুদ্ধিহীন জড়পদার্থ অশিক্ষিত জংলি ভূতের সেই একই অবস্থা হবে। চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই জানি তবুও আমি চেষ্টা করে দেখি তোমাকে খানিকটা জ্ঞান দেওয়া যায় কি না! তুমি কি জান মায়ের গর্ভে প্রতিটি সন্তান প্রকৃতপক্ষে মেয়ে হয়ে বড় হতে থাকে, ওয়াই ক্রমোজম শুধুমাত্র মেয়ে হয়ে গড়ে ওঠাকে বন্ধ করে দেয়—আর সেই ব্যাপারটিকে বলা হয় পুরুষ। তুমি কি জান পুরুষ বলে আসলে কোনো প্রজাতি নেই? যারা মেয়ে হয়ে বড় হতে পারে নি সেটাই হচ্ছে পুরুষ—তুমি কি এটা জান?"

অশুন মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। আমি শুনেছি।"

"শুনেছ। কিন্তু বিশ্বাস কর নি।"

"আমি বিশ্বাস করলেই কী আর না করলেই কী আসে যায়?"

"অনেক কিছু আসে যায়। তুমি কি আসলেই গর্দভ নাকি শুধু গর্দভের ভান করছ সেটা আমার জানা দরকার।"

অশুন ক্রুদ্ধ চোখে নিশির দিকে তাকাল। নিশি তার মুখে শ্লেষের হাসি ফুটিয়ে বলল, "তুমি জান মানব প্রজাতির অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য আসলে পুরুষ মানুষের কোনো প্রয়োজন নেই? তুমি জান শুধুমাত্র মেয়েদের দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখা যায়? তুমি জান মানুষের ক্লোন করার জন্য পুরুষের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র নারীদের দিয়েই ক্লোন করা সম্ভব।"

"হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু এটা দিয়ে তুমি কী বোঝাতে চাইছ?"

নিশি মাথা নেড়ে বলল, "আমি কী বোঝাতে চাইছি সেটা যদি তুমি এখনো বুঝতে না পার তা হলে আমি নিশ্চয়ই আমার সময় নষ্ট করছি। তোমার বুদ্ধিমত্তা যদি শিম্পাঞ্জির কাছাকাছি হয়ে থাকে তা হলে আমার সম্ভবত তোমার সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না!"

অশুন মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়ে বলল, "এমনও তো হতে পারে যে তুমি মেয়েদের স্বভাবসুলভ জড়তার, বুদ্ধিহীনতার কারণে সহজে একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে পারছ না?"

"না, সেটা হতে পারে না। কিন্তু তবু তুমি যদি চাও আমি তোমাকে আরো পরিষ্কার কথা বলতে পারি। আমি বলতে চাইছি এটি বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য যে পুরুষ হচ্ছে বাহুল্য। অশুন, তোমার ভাগ্য খুব ভালো যে তুমি এই সময়ে পুরুষ হিসেবে জন্ম নিয়েছ। আজ থেকে কয়েকশ বছর পর পুরুষ হিসেবে জন্ম নেওয়ার চেষ্টা কর নি। তা হলে তোমার জন্ম হত না। কারণ বসন্ত রোগের জীবাণুকে যেভাবে পৃথিবী থেকে অপসারণ করা হয়েছে প্রকৃতি ঠিক সেভাবে তোমাদের মতো পুরুষকে পৃথিবী থেকে অপসারণ করত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগুন অবাক হয়ে নিশির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি সত্যিই এটা বিশ্বাস কর, নাকি আমার সাথে ঝগড়া করার জন্য এটা বলছ?"

নিশি বলল, "এর মাঝে বিশ্বাস করা না করার কী আছে? এটি বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য—বিশ্বাস করা না করার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান বলেছে বংশ বৃদ্ধি করার জন্য পুরুষ মানুষের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি বাহুল্যকে সহ্য করে না—প্রকৃতি পুরুষকেও সহ্য করবে না!"

অগুন এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে নিশির দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তুমি বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যের কথা বলছ কিন্তু বিজ্ঞানের অবদানের কথা বলছ না?"

"বিজ্ঞানের কোন অবদান?"

"মানুষের জন্ম প্রক্রিয়ার ব্যাপারটি। পুরুষ আর মহিলার এক ধরনের জৈবিক প্রক্রিয়া দিয়ে শিশুর জন্ম হত। শিশুর জন্ম নিশ্চিত করার জন্য প্রকৃতি সেই জৈবিক প্রক্রিয়ার মাঝে এক ধরনের আনন্দের ব্যবস্থা রেখেছিল। তুমি কি জান মানুষের মস্তিষ্কে স্টিমুলেশন দিয়ে এখন কৃত্রিমভাবে তার থেকে এক শ গুণ বেশি আনন্দ দেওয়া সম্ভব? তুমি কি জান শিশুর জন্ম দেওয়ার জন্য সেই জৈবিক প্রক্রিয়া এখন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়? তুমি কি জান যে এখন একটি শিশুর জন্ম দেওয়ার জন্য পুরুষ কিংবা মহিলা কিছুরই প্রয়োজন নেই? হিসাব করে সাজিয়ে রাখা কিছু ডিএনএ দিয়ে একটা জৈব ল্যাবরেটরিতে এখন যে মানুষের জন্ম দেওয়া যায় সেটা তুমি জান?"

"জানি।"

অগুন এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে বলল, "তা হলে ভবিষ্যতে যে মানব শিশুর জন্ম হবে ল্যাবরেটরিতে, তাদের যে বড় করা হবে কমিউনে সেটা কি তুমি অনুমান করতে পারছ না? এখন মেয়েদের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে গর্ভধারণ করা এবং সন্তানের জন্ম দেওয়া। জন্ম দেওয়ার সেই প্রক্রিয়াটিই যখন উঠে যাবে তখন এই পৃথিবীতে মেয়েদের যে কোনো প্রয়োজনই থাকবে না তুমি কি সেটা জান না?"

নিশি কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে অগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি সত্যিই আমাকে এটা বিশ্বাস করতে বলো?"

"হ্যাঁ বলি।" অগুন কঠিন মুখে বলল, "সত্যকে স্বীকার করে নাও, কারণ সত্য তোমাকে মুক্তি দেবে।"

নিশি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "মানুষ নির্বোধ হলে খুব সুবিধা। তখন তাদের খুব ছোট একটা জগৎ হয় আর সেই বোকার জগতে তারা মহানন্দে বেঁচে থাকতে পারে। তুমিও সেরকম বোকার একটা স্বর্গে মহানন্দে বেঁচে আছ। কৃমি যেরকম বিষ্ঠায় বেঁচে থাকে অনেকটা সেরকম! কী আশ্চর্য, এই যুগে একজন মানুষ বলছে ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে থাকবে শুধু পুরুষ!"

অগুন জোরগলায় বলল, "অবিশ্যি থাকবে শুধু পুরুষ। পুরুষ মানুষ শক্তিশালী, তাদের বুদ্ধিমত্তা বেশি, তারা বেশি সৃজনশীল, তারা কর্মঠ, তাদের রসবোধ তীক্ষ্ণ, তারা ত্যাগী, তারা আত্মবিশ্বাসী তারা সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি কেন তা হলে এই শ্রেষ্ঠ প্রজাতিকে বেছে নেবে না? মেয়েদের একমাত্র দায়িত্ব সন্তান জন্ম দেওয়া, সেটিই যখন তাদের হাতে থাকবে না তখন তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনটা কোথায়? তারা তখন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল। তারা নোংরা আবর্জনা।"

নিশি তীব্র দৃষ্টিতে অন্তনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার ধারণাটা সত্যি কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চাও?"

অন্তন ভুরু কুঁচকে বলল, "সেটা কীভাবে করা হবে?"

"আমি তোমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দেব। সেই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ কর।"

"কী চ্যালেঞ্জ?"

"তুমি জান প্রযুক্তি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ইচ্ছে করলে একজন মানুষকে শীতলঘরে কয়েক হাজার বছর রেখে দেওয়া যায়।"

অন্তন ভুরু কুঁচকে বলল, "হ্যাঁ জানি।"

"তোমাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে আমার সাথে এরকম একটি শীতলঘরে এক হাজার বছর থেকে বের হয়ে এসে দেখবে কার কথা সত্যি। তোমার না আমার?"

অন্তন অবাক হয়ে নিশির দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল সে কি ঠাট্টা করছে নাকি সত্যি কথা বলছে। কিন্তু নিশির চোখে-মুখে ঠাট্টার কোনো চিহ্ন নেই। সে ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু এটি বেআইনি কাজ। পৃথিবীতে এভাবে ভবিষ্যতে যাওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর আইন রয়েছে।"

নিশি শব্দ করে হেসে বলল, "এই আইনকে ফাঁকি দেওয়ার অনেক উপায় আছে অন্তন।"

"কিন্তু—"

অন্তনকে বাধা দিয়ে নিশি বলল, "আমি জানি আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস তোমার নেই। অন্তন তুমি আর দশটা পুরুষ মানুষের মতো ভীতু, দুর্বল এবং কাপুরুষ। সবচেয়ে বড় কথা তুমি খুব ভালো করে জান তুমি যদি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এক হাজার বছর ভবিষ্যতে যাও তা হলে হিমঘর থেকে বের হয়ে দেখবে সারা পৃথিবীতে শুধু মেয়ে, পুরুষ মানুষের কোনো চিহ্ন নেই। তোমাকে যখন দেখবে আমি নিশ্চিত তোমাকে চিড়িয়াখানায় উলঙ্গ করে রেখে দেবে। ভবিষ্যতের মেয়েরা টিকিট কেটে তোমাকে দেখতে আসবে চিড়িয়াখানায়! সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এই মানব প্রাণীটি কেমন করে পৃথিবীতে এসেছিল সেটা নিয়ে কথা বলে তারা সম্ভবত হাসতে হাসতেই মারা যাবে!"

অন্তন মুখে শ্লেষের হাসি ফুটিয়ে বলল, "আর যদি ঠিক তার উল্টো হয়? যদি দেখা যায় সবাই পুরুষ—মহিলা বলে কিছু নেই এবং তোমাকেই যদি উলঙ্গ করে চিড়িয়াখানায় রেখে দেয়?"

নিশি মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "সেটাই যদি তুমি বিশ্বাস কর তা হলে আমার চ্যালেঞ্জটুকু গ্রহণ করার সাহস তোমার নেই কেন?"

"কে বলেছে সাহস নেই?"

"তা হলে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর।"

অন্তন কঠোর মুখে বলল, "অবশ্যই গ্রহণ করব। কেন গ্রহণ করব জান?"

"কেন?"

"যখন আমরা হিমঘর থেকে বের হয়ে আসব, তখন তোমাকে যেভাবে টেনেহিঁচড়ে ধ্বংস করে প্রকৃতিকে ত্রুটিমুক্ত করবে সেই দৃশ্যটি দেখার জন্য। এই দৃশ্যটি দেখে আমি যে আনন্দ পাব পৃথিবীর আর কেউ সে আনন্দ কোনো দিন পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

নিশি মাথা নাড়ল। বলল, "আমি তোমার মনের ভাবটি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি অন্তন। আমি ঠিক জানি তুমি কী ভাবছ—কারণ আমিও ঠিক একই জিনিস ভাবছি। তোমাকে ধ্বংস

হতে দেখার চাইতে বেশি আনন্দ পৃথিবীতে আর কিছুতে নেই। এই পরিচিত জগৎ থেকে এক হাজার বছর ভবিষ্যতের অনিশ্চিত জগতে যেতে আমার কোনো দ্বিধা নেই শুধু এই একটি কারণে, আমি এই তীব্র আনন্দটুকু পেতে চাই। এই আনন্দটুকুর জন্য আমি সবকিছু দিতে পারি!"

"চমৎকার।"

নিশি শীতল গলায় বলল, "তুমি তা হলে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে?"

"হ্যাঁ করছি।"

নিশি এবং অশুন একজন আরেক জনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেই দৃষ্টিতে এত ভয়ংকর ঘৃণা প্রকাশ পেতে থাকে যে নিজের অজান্তেই দুজনের বুক কেঁপে ওঠে।

* * * * *

স্টিল ভল্টের দরজা খুলে নিশি এবং অশুন হিমঘর থেকে বের হয়ে এল। পৃথিবীতে এর মাঝে এক হাজার বছর পার হয়ে গেছে, যদিও এই দুজনের কাছে মনে হচ্ছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে তারা এর মাঝে প্রবেশ করেছে।

নিশি অশুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে তোমার মতো একটি নর্দমার কীটের সাথে আমি এক হাজার বছর কাটিয়ে দিয়েছি!"

"হ্যাঁ।" অশুন একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, "ভাগ্যিস আমার দেহ কয়েক ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় ছিল, তোমার কাছে অচেতন না হয়ে থাকার কথা কল্পনা করা যায়?"

নিশি ছটফট করে বলল, "আমার আর অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই। আমি এই মুহূর্তে বের হয়ে যেতে চাই। দেখতে চাই পৃথিবীতে শুধু মেয়ে আর মেয়ে। আমি চাই তারা মুহূর্তে তোমাকে ধরে নিয়ে যাক, তোমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলুক।"

"হ্যাঁ।" অশুন মাথা নেড়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমিও আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমরা যখন বের হব তারপর আর হয়তো তোমার সাথে দেখা হবে না। তোমাকে শেষ একটি কথা বলে যাই।"

"কী কথা?"

"তোমাকে যখন ধ্বংস করতে নিয়ে যাবে তখন তুমি একটি জিনিস ভেবে আনন্দ পাবার চেষ্টা করো।"

নিশি জিজ্ঞেস করল, "কী জিনিস?"

"তোমার মৃত্যুটি আমাকে অপূর্ব এক ধরনের আনন্দ দেবে। অচিন্তনীয় আনন্দ। তোমার কারণে আমি এই আনন্দটি পেতে পেরেছি।"

"সেটি নিয়ে কথা না বলে পরীক্ষা করেই দেখা যাক। চল আমরা বাইরে যাই। মানুষ খুঁজে বের করি।"

"হ্যাঁ চল।" অশুন বলল, "আর কিছুক্ষণ পর তোমাকে আর কখনোই দেখতে হবে না ব্যাপারটি চিন্তা করেই আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।"

নিশি মুচকি হেসে বলল, "দেখা যাক কে সত্যিই নাচে।"

নিশি এবং অশুন বাইরে এসে আবিষ্কার করল চারপাশের পৃথিবীটি তারা যেরকম কল্পনা করেছিল প্রায় সেভাবেই গড়ে উঠেছে। মানুষ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ না করে তার সাথে সহাবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে চারপাশে এক ধরনের শান্ত কোমল পরিবেশ। বড় বড় গাছ, নির্মেঘ আকাশ, হ্রদে টলটল জলরাশি। তারা যেখানে আছে সেটি একটি বনাঞ্চল।

চারপাশে বিচিত্র বুনোফুল, সেখানে প্রজাপতি খেলা করছে। গাছের ডালে পাখির কিচিরমিচির শব্দ, বাতাসে হেমন্তকালের শীতল বাতাসের স্পর্শ।

দুজনে প্রায় আধাঘণ্টা হেঁটে প্রথমবার একটি লোকালয়কে খুঁজে পেল। ছবির মতো সুন্দর বাসার সামনে নানা বয়সী মানুষ একটি আনন্দমুখর পরিবেশে হইচই করছে। নিশি এবং অশুন নিশ্বাস বন্ধ করে মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। প্রথমে একটি শিশু তাদের দেখে হঠাৎ আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে এবং অন্যরা তাদের দিকে এগিয়ে আসে, কিছুক্ষণের মাঝেই নানা বয়সী মানুষ এক ধরনের বিস্ময়াভিভূত চোখ নিয়ে তাদের ঘিরে দাঁড়ায়। নিশি এবং অশুন মানুষগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করে এরা কি পুরুষ নাকি নারী? কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। মানুষগুলো অবোধ্য ভাষায় কথা বলছে, তারা কিছু বুঝতে পারছে না—কিছুক্ষণের মাঝেই একজন একটি ভাষা অনুবাদক যন্ত্র নিয়ে আসে। মধ্যবয়স্ক মানুষটি সেটি মুখে লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কী? তোমরা কোথা থেকে এসেছ?"

নিশি এবং অশুন একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, এটি কী ধরনের প্রশ্ন? অশুন বলল, "আমরা মানুষ। আমরা সুদূর অতীত থেকে এসেছি।"

"কী আশ্চর্য!" কম বয়সী একজন আশ্চর্যধ্বনি করে বলল, "তোমরা দুজন দেখতে দুরকম কেন?"

নিশি এবং অশুন এই প্রথমবারের মতো নিজেদের ভেতর সূক্ষ্ম এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। নিশি কাঁপা গলায় বলল, "আমরা দুজন দেখতে দুরকম কারণ আমাদের একজন নারী অন্যজন পুরুষ।"

নিশির কথা শুনে আতঙ্কের একটা শব্দ করে সবাই এক পা পিছিয়ে যায়। মানুষগুলো ফিসফিস করে ভয় পাওয়া গলায় বলে, "সর্বনাশ! পুরুষ! নারী!"

মানুষগুলো একটু দূর থেকে তাদের ভয় পাওয়া চোখে দেখতে থাকে। ছোট ছোট শিশুগুলো বড়দের পেছনে লুকিয়ে যায়। মধ্যবয়স্ক মানুষটি কাঁপা গলায় বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে! প্রাচীনকালের পুরুষ আর নারী চলে এসেছে! এক্ষুনি নিরাপত্তাকর্মীদের ডাক।"

নিশি অবাক হয়ে বলল, "তোমরা এত অবাক হচ্ছ কেন? তোমরা কি নারী না পুরুষ?"

মানুষগুলো কোনো কথা না বলে অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিশি এবং অশুন বুঝতে পারে মানুষগুলোর চেহারা পুরুষ বা নারী দুইই হতে পারে। তারা আগে কখনো এরকম চেহারার মানুষ দেখে নি। অশুন বলল, 'তোমরা কথা বলছ না কেন? তোমরা কি পুরুষ না নারী?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "নারী–পুরুষ এইসব আদিম বিভাজন বহু আগে শেষ হয়ে গেছে। এখন এখানে নারী–পুরুষের মতো কোনো ভাগ নেই। এখানে সবাই মানুষ!"

"কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"নারী আর পুরুষ যদি না থাকে তা হলে শিশুদের জন্ম হয় কেমন করে?"

"শিশুদের জন্ম হয় না। ডিজাইন করে তৈরি করা হয়।"

"কে তৈরি করে?"

"আমাদের ল্যাবরেটরিতে।"

নিশি কাঁপা গলায় বলল, "তোমরা তোমাদের শিশুদের ভালবাস?"

AMARBOI.com

"কেন ভালবাসব না? আমাদের সবাইকে নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে। তোমরা সেটা বুঝবে না।"

"কেন বুঝব না?" নিশি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বলল, "না বোঝার কী আছে?"

"আমরা জানি প্রাচীনকালে মানুষের মস্তিষ্ক অপরিণত ছিল। তারা পুরুষ-মহিলা, সাদা-কালো, জাতি-ধর্ম-ভাষা এসব নিয়ে মাথা ঘামাত। এখন আমরা তার উর্ধ্বে এসেছি।"

"কিন্তু—" অন্তন বলল, "কিন্তু—"

"তোমরা বুঝবে না।" মধ্যবয়স্ক মানুষটি এক ধরনের ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আমার মনে হয় তোমাদের এখনই নিরাপত্তা বেষ্টনীতে নিয়ে যাওয়া দরকার।"

নিশি এবং অন্তন ঠিক তখন এক ধরনের চাপা যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পেল। তারা চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, আকাশপথে নিরাপত্তাকর্মীরা আসছে। নিশি এবং অন্তন একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণার সাথে সাথে এই প্রথমবারের মতো আতঙ্কের ছায়া ফুটে ওঠে।

*   *   *   *   *

ভবিষ্যতের পৃথিবীতে নিশি এবং অন্তন দীর্ঘদিন বেঁচে ছিল। তাদেরকে একটা ছোট ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি একজনের প্রতি অন্যজনের প্রচণ্ড ঘৃণা তাদেরকে এই দীর্ঘসময় বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছিল।

AMARBOI.COM

সুহানের স্বপ্ন

এক

সুহান চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল, সোনালি রঙের চতুষ্কোণ বড় খাম, খামের ডান পাশে হলোগ্রাফিক সরকারি সিল। সাধারণ মানুষের মতো তার যদি একটা ভিডিফোন থাকত তা হলে নিশ্চয়ই এরকম বড় একটা খামে করে তার কাছে চিঠি পাঠাত না—সরাসরি ভিডিফোনে কথা বলত। ভিডিফোন নেই বলে তার কাছে এরকম একটা চিঠি পাঠাতে হয়েছে, নিশ্চয়ই কত জায়গা ঘুরে ঘুরে তার কাছে চিঠিটা এসেছে। রুরাক কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে চোখ বড় বড় করে বলল, "এটা কী?"

সুহান বলল, "চিঠি। সরকার থেকে এসেছে।"

রুরাক অবাক হয়ে বলল, "চিঠি? কী আশ্চর্য!" তারপর আশ্চর্য হবার ভঙ্গি করার চেষ্টা করতে লাগল।

সুহান রুরাকের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে জানে রুরাক আসলে আশ্চর্য হয় নি, তার অপরিণত মস্তিষ্কের আশ্চর্য হবার ক্ষমতা নেই, সে শুধু স্বাভাবিক মানুষের মতো আশ্চর্য হবার, খুশি হবার এবং দুঃখ পাবার ভঙ্গি করে। রুরাক আরেকটু কাছে এসে বলল, "চিঠিটা খোলো, দেখি কী আছে ভেতরে।"

সুহান বলল, "খুলতে হবে না, আমি জানি ভেতরে কী আছে।"

রুরাককে এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত দেখায়, সে ঠিক বুঝতে পারছে না সুহান কী বলছে। আমতা-আমতা করে বলল, "না খুলেই তুমি জান?"

"হ্যাঁ। আমি একটা চাকরি পেয়েছি।"

"চাকরি পেয়েছ? তুমি?" রুরাকের মুখে প্রথমে এক ধরনের অবিশ্বাস তারপর হঠাৎ আনন্দের ছাপ পড়ল, "সত্যি, তুমি চাকরি পেয়েছ?"

"হ্যাঁ। চাকরি না দিলে এরকম সরকারি চিঠি আসে না।" সুহান একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আমি কত দিন কত জায়গায় চাকরির জন্য চিঠি লিখেছি—এর আগে কেউ কোনো চিঠির উত্তর দেয় নাই। এই প্রথম চিঠি এসেছে, তার মানে একটা চাকরি।"

রুরাককে এবারে সত্যিই উত্তেজিত দেখায়, সে জোরে জোরে কয়েকটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি সবাইকে গিয়ে বলি?"

"দাঁড়াও, আগে খামটা খুলে সত্যি সত্যি দেখে নিই!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুস্রাক ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল, খামের ভেতর হালকা নীল রঙের একটা চিঠি, উপরে সরকারি সিল, স্মারক নম্বর, হলোগ্রাফিক চিহ্ন, নিচে গোটা গোটা টাইপে লেখা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি। রুস্রাক দুই একটা অক্ষরের বেশি পড়তে পারে না তারপরও সে চিঠির ওপর ঝুঁকে পড়ল। সুহান চিঠিটা পড়ে মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আসলেই আমি চাকরি পেয়েছি।"

রুস্রাক বিস্ময়াভিভূতভাবে সুহানের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তার মানে তোমার একটা ভিডিফোন হবে, গাড়ি হবে?"

সুহান হেসে ফেলল। একটা বড় ডাটাবেস অফিসে সিকিউরিটির চাকরি, যে বেতনের কথা লিখেছে সেটা দিয়ে ভালো করে খেতে-পরতে পারবে কিনা সেটাই সন্দেহ! কিন্তু রুস্রাককে এসব বলে লাভ নেই, তার অপরিণত মস্তিষ্কের জন্য সেটা খুব বেশি হয়ে যাবে, সে বলল, "একদিনে তো হবে না। আস্তে আস্তে হবে।"

রুস্রাক উত্তেজিত গলায় বলল, "তোমার যখন ভিডিফোন হবে তখন আমাকে সেটা দিয়ে কথা বলতে দেবে?"

সুহান হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, "কার সাথে কথা বলবে?"

রুস্রাক বলল, "এখন বলব না।"

"আমি জানি তুমি কার সাথে কথা বলবে।"

রুস্রাক একটু শঙ্কিত হয়ে বলল, "কার সাথে?"

"নাতালিয়ার সাথে।"

রুস্রাকের চোখে-মুখে প্রথমে অবিশ্বাস এবং হঠাৎ করে এক ধরনের ছেলেমানুষি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ, আমি আসলে নাতালিয়ার সাথেই কথা বলতে চাই।" একটু ইতস্তত করে বলল, "তোমার কী মনে হয় সুহান, নাতালিয়া কি আমার সাথে কথা বলবে?"

নাতালিয়া টেলিভিশনের একটা সস্তা বিনোদন অনুষ্ঠানের নায়িকা, সে সত্যিকার চরিত্র নয়, এনিমেশন করে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু রুস্রাক সেটা কখনো ধরতে পারে না। এই কাল্পনিক কমবয়সী মেয়েটার জন্য তার অনুরাগের কথা অনাথাশ্রমের সবাই জানে। সুহান রুস্রাককে আশ্বস্ত করে বলল, "বলবে না কেন অবশ্যই বলবে!"

নাতালিয়ার সাথে সে ভিডিফোনে কথা বলছে ব্যাপারটা কল্পনা করে রুস্রাক পরিতৃপ্ত মুখে একটা নিশ্বাস ফেলল। সে কোনো বিষয় নিয়েই বেশি সময় চিন্তা করতে পারে না, এবারেও পারল না। আবার সে আগের বিষয়ে ফিরে এসে বলল, "এবার তা হলে আমি সবাইকে গিয়ে বলি যে তোমার চাকরি হয়েছে?"

"তোমার ইচ্ছে রুস্রাক!"

কিছুক্ষণের মাঝেই অনাথাশ্রমের সবাই জেনে গেল যে সুহান একটা চাকরি পেয়েছে। কী চাকরি, কোথায় চাকরি, কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না, সে চাকরি পেয়েছে সেটাই বড় কথা। এই অনাথাশ্রমে যারা থাকে তাদের সবাই জিনেটিক দিক দিয়ে ক্যাটাগরি-বি. গ্রুপের। অনেকেই অপরিণত-বুদ্ধির মানুষ, পৃথিবীর জটিল বিষয়গুলো তারা বুঝতে পারে না, কিন্তু তারপরও এটুকু জানে যে চাকরি পেয়ে এখান থেকে চলে যাওয়া বিষয়টা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার। যারা এই অনাথাশ্রম থেকে বাইরে যেতে পারে না তাদের জীবনটা খুব দুঃখের জীবন। যারা এখানে থাকে তারা সেই জীবন নিয়ে কথা বলতে চায় না। তাই একজন একজন করে অনাথাশ্রমের সবাই সুহানের কাছে এল, তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। যারা খুশি হয়েছে তারা যেরকম তাদের

আনন্দটুকু গোপন রাখে নি, ঠিক সেরকম যারা ঈর্ষান্বিত হয়ে আছে তারাও তাদের ঈর্ষাটুকু গোপন রাখল না। সবাই চলে যাবার পর সুহান সরকারের সোনালি রঙের খামটা হাতে নিয়ে বের হয়। অনাথাশ্রমের দেওয়ালঘেরা কম্পাউন্ডের এক কোনায় ছোট একটা বাসায় অনাথাশ্রমের ডিরেক্টর লারার বাসা। লারা মধ্যবয়সী হাসিখুশি মহিলা, সুহানকে খুব স্নেহ করে, তাকে খবরটা দেওয়া দরকার।

ঘরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে লারা ভিডিফোনে কার সাথে জানি কথা বলছিল, সুহানকে দেখে ভিডিফোনটা ভাঁজ করে সরিয়ে রেখে বলল, "কী খবর সুহান?"

"লারা, আমি একটা চাকরি পেয়েছি।"

"সত্যি?" লারার চোখে-মুখে আনন্দের ছায়া পড়ল, "কী চমৎকার!"

সুহান কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল। লারা উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, "কী হল সুহান—তুমি খুশি হও নি?"

সুহান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর ফিসফিস করে বলল, "ডাটাবেসের একটা অফিসে নিরাপত্তা প্রহরীর চাকরি। বেতন তিন শ বিশ ইউনিট। দুই বছর অবেক্ষমাণ।"

লারা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নরম গলায় বলল, "সুহান, আমি খুব দুঃখিত যে তুমি তোমার ক্ষমতার উপযুক্ত একটা কাজ পেলে না। আমি জানি তুমি একটা কলেজের শিক্ষক হবার ক্ষমতা রাখ, ইচ্ছে করলে তুমি ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডাক্তার হতে পারতে—"

সুহান মাথা নাড়ল, বলল, "না লারা, আমি পারতাম না। আমি জিনেটিক গ্রুপে ক্যাটাগরি-বি. মানুষ। এই পৃথিবীতে ক্যাটাগরি-বি. মানুষের কোনো জায়গা নেই।"

লারা চুপ করে রইল, কারণ কথাটা সত্যি। মানুষের জিনেটিক প্রোফাইল দেখে তাদেরকে জিনেটিক-এ. এবং বি. এই দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে।

এ ক্যাটাগরির মানুষেরা দেশের প্রকৃত নাগরিক। তাদেরকে লেখাপড়ায় সুযোগ দেওয়া হয়, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বিজ্ঞানী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। নির্বাচনের সময় তারা ভোট দিতে পারে, সরকারি চাকরি পেতে পারে, ক্যাটাগরি-বি. গ্রুপের মানুষের কোনো সুযোগ নেই। শোনা যাচ্ছে আইন করে ক্যাটাগরি-বি. গ্রুপের মানুষকে অবমানব নামে একটা গোষ্ঠীতে ফেলা হবে, তখন তাদের জীবনের কোনো মূল্য থাকবে না। তাদেরকে বিপজ্জনক কাজের মাঝে ঠেলে দেওয়া হবে, গবেষণার কাজে তাদেরকে ব্যবহার করা যাবে, এমনকি তাদেরকে কেউ খুন করে ফেললেও কোনো বিচার হবে না।

সুহান বলল, "তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—আমাকে এই চাকরিটা দেবার পেছনে কোনো একটা কারণ আছে।"

"কী কারণ?"

"নিশ্চয়ই এই চাকরিটা মানুষের জন্য খুব বিপজ্জনক তাই এটা আমাকে দিয়েছে। নিশ্চয়ই ছয় মাসের ভেতর আমি মারা পড়ব!"

লারা জোর করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "কেন তুমি আগেই এরকম করে ভাবছ? হয়তো চাকরিটা ভালো। হয়তো যাদের সাথে কাজ করবে তারাও চমৎকার মানুষ—"

সুহান লারাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "হতে পারে, কিন্তু আমি ক্যাটাগরি-বি. মানুষ, আমার সাথে চমৎকার হওয়ার তো কোনো কারণ নেই।"

লারার মুখে বেদনার একটা ছায়া পড়ল। সে নিচু গলায় বলল, "এই ক্যাটাগরি-এ. আর ক্যাটাগরি-বি.-এর পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে এক ধরনের পাগলামি, আমার এখনো বিশ্বাস

হচ্ছে না যে এটা সত্যিই ঘটে গেছে। তোমার উদাহরণটাই দেখ—আমি তো তোমার মতো চমৎকার বুদ্ধিমান মানুষ আগে দেখি নি, অথচ সরকারিভাবে তুমি ক্যাটাগির-বি. মানুষ! রসিকতার তো একটা মাত্রা থাকা দরকার।"

সুহান জোর করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ লারা আমার সম্পর্কে এরকম একটা সুন্দর কথা বলার জন্য।"

"তোমাকে খুশি করার জন্য তো বলি নি। সত্যি জেনেই বলেছি।" লারা সুর পাল্টে বলল, "এস, ভেতরে এস এক কাপ কফি খাও।"

সুহান ম্লান মুখে বলল, "সত্যি তুমি কফি খেতে ডাকছ?"

লারা অবাক হয়ে বলল, "কেন সত্যি ডাকব না?"

"তুমি জান না ক্যাটাগরি-বি. মানুষকে বাসার ভেতরে আনা তৃতীয় মাত্রার অপরাধ?"

লারা স্থির দৃষ্টিতে সুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমাকে এই ক্যাটাগরির বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে হবে সুহান। যখন কেউ তোমাকে নিজের মানুষ বলে গ্রহণ করতে চাইবে তখন তোমাকে সেটা গ্রহণ করতে হবে। মনে রেখ এই ভাগাভাগিটা কৃত্রিম, মানুষের সাথে মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। সরকার এটা করে ফেললেও সত্যিকার অর্থে মানুষ ভাগাভাগি হয় নি।"

সুহান লারার বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি দুঃখিত লারা, আমি আসলে তোমাকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে চাই নি।"

"আমি জানি সুহান।" লারা ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "আমার মনে হয় তুমি খুব চমৎকার একটা সুযোগ পেয়েছ। যদি তুমি এই চাকরিটা না পেতে তোমাকে হয়তো সামনের বছরেই ইউরিনিয়াম খনিতে যেতে হত। কিংবা কে জানে তোমার এই সুস্থ সবল শরীর দেখে তোমাকে হয়তো মহাকাশ গবেষণার কোনো পরীক্ষায় ঢুকিয়ে দিত।"

"সেটা এখনো করতে পারে।"

"তা হয়তো পারে—কিন্তু তারপরও তুমি এই সুযোগটা পেয়েছ। সামনাসামনি কারো প্রশংসা করতে হয় না, কিন্তু তবু করছি। তুমি অসম্ভব বুদ্ধিমান, তুমি উৎসাহী আর পরিশ্রমী। তুমি যত তুচ্ছ কাজ দিয়েই শুরু কর না কেন, তুমি উপরে উঠে আসবে। আমি তোমার সাথে বাজি রেখে এ কথাটা বলতে পারি।"

সুহান কোনো কথা বলল না, তার মুখে সূক্ষ্ম একটা হাসি এক মুহূর্তের জন্য উঁকি দিয়ে গেল। লারা ভুরু কুঁচকে বলল, "কী হল তুমি ওভাবে হাসছ কেন?"

সুহান মাথা নেড়ে বলল, "তোমার কথা শুনে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি বুঝি একজন সত্যিকারের মানুষ।"

লারা মাথা ঘুরিয়ে তীব্র স্বরে বলল, "সুহান তোমাকে জানতে হবে যে তুমি সত্যিই একজন মানুষ। তুমি ক্যাটাগরি-বি. হতে পার, কিন্তু ক্যাটাগরি-বি. মানুষ। অন্য কিছু নও। নিজের ওপরে সেই বিশ্বাসটা রাখতে হবে। বুঝেছ?"

সুহান মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি। আমি দুঃখিত লারা, আমি এরকমভাবে কথা বলছি। আমি আসলেই দুঃখিত।"

"ব্যস অনেক হয়েছে। এখন আমাকে কফির কৌটাটা নামিয়ে দাও। উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এই কফিটা এসেছে—ভারি চমৎকার খেতে। এর মাঝে দুই ফোঁটা স্নায়ু উত্তেজক নির্যাস দিয়ে দেব, দেখ খাওয়ার সাথে সাথে তোমার মনটা কত ভালো হয়ে যায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুহান মুখে হাসি টেনে বলল, "তা হলে দুই ফোঁটা কেন, বেশি করেই দাও। পারলে পুরো বোতলটাই ঢেলে দাও!"

সুহানের কথা বলার ভঙ্গি শুনে লারা হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল—হাসি খুব চমৎকার একটা ব্যাপার, হঠাৎ করে এই ঘরের ভেতরকার গুমট এবং অবরুদ্ধ যন্ত্রণা ও হতাশাটুকু কেটে সেখানে এক ধরনের স্নিগ্ধ আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে।

সুহান একটা পাইন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অনাথাশ্রমের বড় দালানটার দিকে তাকিয়ে রইল। শ্রীহীন নিরানন্দ এই কংক্রিটের দালানটার জন্য সে হঠাৎ এক ধরনের বেদনা অনুভব করে, তার জীবনের বড় একটা অংশ সে এই কংক্রিটের দেওয়ালের ভেতরে কাটিয়ে এসেছে। এখানে আসার আগে সে আরো দুই একটা অনাথাশ্রমে বড় হয়েছে কিন্তু সেগুলোর কথা সে স্পষ্ট মনে করতে পারে না। নিষ্ঠুর ভালবাসাহীন কিছু মানুষের সাথে দীর্ঘ নিরানন্দ দিন, চাপা ভয় এবং আতঙ্ক ছাড়া তার আর কিছু মনে পড়ে না। যে বয়সে শিশুরা মা–বাবার আশ্রয়ে, পরিবারের ভালবাসায় বড় হয় সেই বয়সে সে শিখে গিয়েছিল এই পৃথিবী অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপর। সে জেনে গিয়েছিল এখানে সে অপাঙ্‌ক্তেয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। তাকে বোঝানো হয়েছিল সে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ, তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, একটা পশুর জীবনের সাথে তার জীবনের কোনো পার্থক্য নেই, তার থেকে বেশি স্বপ্ন দেখার তার কোনো অধিকার নেই। তবু সে স্বপ্ন দেখেছে, তার চারপাশে তার চাইতেও হতভাগ্য যে মানুষগুলো ছিল সে তাদেরকেও স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছিল। খুব যে আহামরি স্বপ্ন তা নয়, কিন্তু আজকের দিন থেকে আগামী দিনটা যে আরো সুন্দর হবে সেই বিশ্বাসের স্বপ্ন।

সুহান একটা নিশ্বাস ফেলে কুশ্রী কংক্রিটের দালানটার দিকে এগিয়ে আসে। রাতের অন্ধকারও এই দালানটার দীনতা ঢাকতে পারছে না, কিন্তু তারপরও হঠাৎ করে সুহান এই কদাকার কংক্রিটের দালানটার জন্য এক ধরনের গভীর মমতা অনুভব করে। তার সুদীর্ঘ জীবনের এই আবাসস্থল ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে, সে সম্ভবত আর কখনোই এখানে আসবে না। এই অনাথাশ্রমের মানুষগুলোকে সে আর কখনোই দেখবে না। কিশোর রুবাকের পুরোপুরি অর্থহীন যুক্তিতর্ক তাকে আর শুনতে হবে না। অপরিণত–বুদ্ধি তরুণী দিনিয়ার অর্থহীন হাসির শব্দ শুনে সে আর ঘুম থেকে জেগে উঠবে না। গভীর রাতে কোনো এক দুঃখী মেয়ের ইনিয়েবিনিয়ে কান্নার শব্দ শুনে সে নিদ্রাহীন চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে না। অপ্রকৃতিস্থ দ্রুমার উন্মত্ত ক্রোধকে সংবরণ করার জন্য তাকে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে স্নায়ু শীতল করার ইনজেকশন দিতে হবে না। সুহান এই দালানের ভেতর থেকে কত দিন বাইরে যাবার স্বপ্ন দেখেছে, শেষ পর্যন্ত যখন তার স্বপ্নটা সত্যি হবার সময় এসেছে হঠাৎ করে মনে হচ্ছে এই নিরানন্দ দালানটাই বুঝি তার সত্যিকারের আশ্রয়, এখানকার অপরিণত–বুদ্ধি মানুষগুলোই বুঝি তার সত্যিকারের আপনজন।

সুহান একটা নিশ্বাস ফেলে করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে। কাল ভোরে সে তার এই অনাথাশ্রম ছেড়ে চলে যাবে। আনুষ্ঠানিকভাবে সে কারো কাছ থেকে বিদায় নেবে না। ছোট একটা ব্যাগে তার কিছু কাপড়, দুই একটা বই, কিছু তথ্য–ক্রিস্টাল, দৈনন্দিন ব্যবহারের কিছু জিনিসপত্র নিয়ে সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগে সে এখান থেকে বের হয়ে যাবে। ক্যাটাগরি–বি. মানুষ বলে সে এই অনাথাশ্রম থেকে খুব বেশি বের হয় না, শহরের কোথায় কী আছে সে খুব ভালো করে জানে না। কিন্তু সে খুঁজে বের করে নেবে। তার কাছে কিছু ইউনিট আছে, লারা জোর করে তার একাউন্টে আরো এক শ ইউনিট প্রবেশ করিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহ তার থাকা-খাওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। তারা বলেছে তার সরকারি চিঠিটা দেখালে তাকে কোনো ইউনিট ছাড়াই ট্রেনে উঠতে দেবে, স্বল্পমূল্যের হোটেলে থাকতে দেবে, এমনকি রেস্টুরেন্টে খেতেও দেবে। সরকারি চিঠিতে যে তারিখ দেওয়া আছে যে করেই হোক তার ভেতরে অবিশ্যি তাকে সেই তথ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। সুহান নিশ্চয়ই তার ভেতরে পৌঁছে যাবে। সে অনাথাশ্রমে একা একা বড় হয়েছে, বাইরের পৃথিবী নিয়ে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু সে জানে কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সে সবকিছু সামলে নিতে পারবে। সে ক্যাটাগরি-বি. মানুষ হতে পারে কিন্তু সে জানে সে অন্য সবার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। সেটা কাউকে বোঝানো যাবে না সত্যি, কিন্তু সুযোগ পেলে সুহান সেটা প্রমাণ করে দিতে পারবে। সুহান জানে হয়তো সে জীবনে কখনোই সেই সুযোগ পাবে না, হয়তো কেউ তাকে সে সুযোগটা দেবে না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, জীবনটা তার কাছে যেভাবে আসবে সে সেভাবেই গ্রহণ করবে, সেভাবেই চেষ্টা করবে। সে কখনো চেষ্টা করা ছেড়ে দেবে না। কোনো একটা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে সে পড়েছে সফল হওয়া বড় কথা নয় সফল হওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে বড় কথা। প্রাচীনকালে মানুষ যখন ধর্মকে বিশ্বাস করে সবকিছু কোনো প্রশ্ন না করে মেনে নিত তখন কি জীবনটা অন্যরকম ছিল? সুহান বিষয়টা নিয়ে ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময় হঠাৎ সে কান্নার শব্দ শুনতে পেল। কেউ একজন ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছে।

আহা! এই চার দেওয়ালের মাঝখানে কত দুঃখই না জানি লুকিয়ে আছে।

AMARBOI.COM

দুই

অফিসের দরজা বন্ধ। লোকজন তাদের কার্ড ঢুকিয়ে ভেতরে যাচ্ছে এবং আসছে, সুহানের কোনো কার্ড নেই, সে কেমন করে ঢুকবে বুঝতে পারল না। অন্য একজনের পিছু পিছু ঢুকে যাবার চেষ্টা করাটা নিশ্চয়ই একটা বেআইনি কাজ হবে, সে ক্যাটাগরি-বি. মানুষ এরকম একটা কাজের ঝুঁকি নেওয়া মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মোটামুটি সদয় চেহারার একজন মানুষকে দেখে সে এগিয়ে গেল, "এই যে একটু শুনুন।"

মানুষটা ভুরু কুঁচকে তাকাল এবং মুহূর্তে সদয় মানুষটাকে অত্যন্ত কঠিন চেহারার রূঢ় একজন মানুষ বলে মনে হতে থাকে। সুহান হড়বড় করে বলল, "আমার একটু এই অফিসের ভেতরে যাওয়া দরকার।"

"দরকার হলে যাও। তোমাকে তো কেউ নিষেধ করছে না।"

সুহান ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু আমার কাছে কোনো কার্ড নেই।"

"কার্ড নেই?" মানুষটার কথা শুনে মনে হল সে যদি বলত 'আমার মাথা নেই' তা হলে সে আরো কম অবাক হত। খানিকক্ষণ ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে বুঝতে না পেরে বলল, "কার্ড নেই কেন?"

সুহান বিব্রত হয়ে বলল, "আমি আসলে ক্যাটাগরি-বি. মানুষ।"

"ক্যাটাগরি-বি?" সুহান লক্ষ করল মানুষটা সাবধানে একটু পিছিয়ে গেছে যেন ক্যাটাগরি-বি. মানুষের এক ধরনের ভয়াবহ ছোঁয়াচে রোগ রয়েছে। "তুমি যদি ক্যাটাগরি-বি. মানুষ হয়ে থাক তা হলে এখানে ঢোকার চেষ্টা করছ কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুহান তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সরকারের হলোগ্রাম দেওয়া চিঠিটা বের করে বলল, "এই যে, সরকার এই চিঠিতে আমাকে এখানে এসে যোগাযোগ করতে বলেছে।"

মানুষটা চিঠিটা না ছুঁয়ে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে চিঠিটা একনজর দেখে বলল, "ও।"

"আপনি যদি ভেতরে সিকিউরিটির একজনকে বলেন একটু আমাকে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিতে—"

"ঠিক আছে। বলব।" মানুষটা আরেকবার সুহানকে আপাদমস্তক দেখে ভেতরে ঢুকে গেল।

সুহান আবার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, সে কিছুতেই অসহিষ্ণু হবে না, ধৈর্য ধরে সে অপেক্ষা করবে। সমস্ত পৃথিবী একটা অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতির মাঝে ঢুকে গেছে, সে দুর্ভাগা তাই সে এর বাইরে। তাই যতবার সে এই পদ্ধতির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে ততবার ধাক্কা খেতে হচ্ছে। অনাথ আশ্রম থেকে এই পর্যন্ত আসতে তার কি কম ঝামেলা হয়েছে? প্রতিটা পদক্ষেপে তার কাউকে না কাউকে কিছু একটা জবাবদিহি করতে হয়েছে। সম্পূর্ণ অকারণে তাকে নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। অবহেলা সহ্য করতে হয়েছে। সে হাসিমুখে সব সহ্য করবে, কারণ সে ক্যাটাগরি-বি. মানুষ হয়ে সত্যিকারের মানুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে চায়। অকারণেই সুহান তার মুখ শক্ত করে যখন চতুর্থবার বিল্ডিংটার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার উপরে উঠে এলো তখন হঠাৎ করে একটা দরজা খুলে যায়। হালকা-পাতলা একজন মানুষ বের হয়ে বলল, "এখানে কে ক্যাটাগরি-বি.?"

সুহান তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, "আমি।"

হালকা-পাতলা মানুষ ভুরু কুঁচকে বলল, "কী হয়েছে?"

সুহান পকেট থেকে হলোগ্রাম দেওয়া চিঠিটা বের করে আবার পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল, কিন্তু মানুষটা তার আগেই বলল, "এস। ভেতরে এস।"

ভেতরে চারদিকে খোপ খোপ অফিস এবং তার ভেতরে মানুষ কাজ করছে। হালকা-পাতলা মানুষটা তাকে একটা খোপের দিকে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে সোনালি চুলের একজন মহিলা ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল। সুহান তাকে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমার কাছে এই চিঠিটা এসেছে, আমাকে বলেছে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে।"

মহিলাটা সবিস্ময়ে বলল, "চিঠি?" মহিলার কথা শুনে আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকে মাথা ঘুরিয়ে সুহানের দিকে তাকাল। চিঠি একটা প্রাগৈতিহাসিক বিষয়, আজকাল কোনো কাজেই চিঠি ব্যবহার করা হয় না। মহিলাটা বলল, "চিঠি কেন? তোমাকে ভিডিফোনে জানাল না কেন?"

"আমার ভিডিফোন নেই।"

অত্যন্ত দরিদ্র মানুষ বা হতভাগা ধরনের মানুষের কখনো কখনো ভিডিফোন থাকে না, তাকেও সেরকম একজন ধরে নিয়ে মহিলাটা বলল, "কেন? ভিডিফোন নেই কেন?"

সুহান বিষয়টাকে আরো জটিল করে না ফেলে সোজাসুজি বলে দিল, "আমি আসলে ক্যাটাগরি-বি. মানুষ।"

মহিলাটা এবারে রীতিমতো চমকে উঠে সোজা হয়ে বসে বলল, "ক্যাটাগরি-বি.?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে তুমি এই চিঠি কেমন করে পেয়েছ?"

এ প্রশ্নের উত্তর সুহানের জানার কথা নয় কাজেই সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মহিলাটা সরকারি চিঠিটা স্ক্যান করিয়ে নেয়, সুহান দেখতে পায় স্ক্রিনে তার ছবি বের হয়ে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিলাটা কিছুক্ষণ ছবিটা পরীক্ষা করে তার দিকে ডিএনএ প্রোফাইল বের করার ছোট যন্ত্রটা এগিয়ে দেয়। সুহান টিউবে তার আঙুলটা প্রবেশ করাতেই মৃদু একটা খোঁচা অনুভব করে। তার শরীরের টিস্যু নিয়ে সেটা বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হয়ে নেয় যে এই চিঠির বাহক আসলেই যাকে উদ্দেশ করে চিঠি পাঠানো হয়েছে সেই একই মানুষ।

মহিলাটা এবারে সুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এখন এই সাদা বৃত্তের ভেতরে দাঁড়াও। এখন তোমার ছবি নেওয়া হবে। এগুলো হলোগ্রাফিক ছবি, কাজেই তুমি নড়বে না।"

মহিলাটা কথা বলল ধীরে ধীরে বেশ স্পষ্ট করে, ছোট বাচ্চাদের সাথে একজন বড় মানুষ যেভাবে কথা বলে অনেকটা সেভাবে। মহিলাটা ধরে নিয়েছে সে যেহেতু ক্যাটাগরি-বি. মানুষ কাজেই সে নির্বোধ এবং স্বল্পবুদ্ধির, তাকে সবকিছু আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলে না দিলে সে বুঝবে না। সুহান ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে এবং শেষ পর্যন্ত মহিলাটা তার হাতে ছোট একটা কার্ড ধরিয়ে দেয়।

সুহান কার্ডটা হাতে নিয়ে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে, তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে, দেশের সত্যিকার নাগরিকের মতো তার একটা পরিচয় আছে। পথেঘাটে যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে 'তোমার পরিচয়' তখন তাকে আমতা-আমতা করে কৈফিয়ত দিতে হবে না। সে ইচ্ছে করলে অন্য দশজনের মতো মিউজিয়ামে যেতে পারবে, লাইব্রেরিতে যেতে পারবে এমনকি বড় কোনো দোকানে গিয়ে কিছু উত্তেজক পানীয় কিনতে পারবে। কার্ডের এক কোনায় বেশ বড় বড় করে ক্যাটাগরি-বি. কথাটা লেখা আছে কিন্তু লেখা থাকলেও এটা সত্যিকারের একটা কার্ড।

মহিলাটা বলল, "এই কার্ডটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা সব সময় তোমার কাছে রাখবে। কার্ডটা যদি হারিয়ে যায় সাথে সাথে সেটা নিরাপত্তা দপ্তরে জানাবে। এই কার্ডে তোমার হলোগ্রাফিক ছবি, ডিএনএ প্রোফাইল দেওয়া আছে, কাজেই অন্য কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে না। এই কার্ড সাত শ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, পানিতে ভিজলে নষ্ট হবে না, পিএইচ দুই থেকে বারো পর্যন্ত সহ্য করতে পারে। মেডিকেল ইমার্জেন্সির সময়..."

মহিলাটা তোতাপাখির মতো মুখস্থ বলে যেতে থাকে, তবে কথাগুলো বলল ধীরে ধীরে বেশ স্পষ্টভাবে যেন সুহানের বুঝতে অসুবিধা না হয়! মহিলাটার কথা শেষ হওয়ার পর সুহান তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বের হয়ে আসে। ভেতরে ঢোকার জন্য তার অনেক ঝামেলা করতে হয়েছিল বের হল খুব সহজে। দরজায় কার্ডটা স্পর্শ করানোর সাথে সাথে দরজাটা খুলে যায়, সুহান মাথা উঁচু করে বের হয়ে আসে।

সুহান শহরে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। মানুষজন ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। রাস্তার দুই পাশে বড় বড় অফিস। মাঝে মাঝে খানিকটা জায়গা ঘিরে ঘিরে সুদৃশ্য দোকানপাট। পাতাল ট্রেন এসে থামছে—ওপরে মনোরেল, ট্যাক্সি এবং বাস। সুহান ইচ্ছে করলে এসব জায়গায় এখন ঢুকতে পারবে কেউ তাকে থামাবে না। সে ছোট একটা খাবার দোকানে ঢুকে অর্ধেক ইউনিট খরচ করে এক বাটি সুপ আর প্রোটিনে মোড়ানো দুই টুকরো রুটি খেয়ে নেয়। একটা যোগাযোগ কেন্দ্রে ঢুকে আধা ইউনিট খরচ করে সে নিজের জন্য একটা ভার্চুয়াল ঠিকানা তৈরি করে নিল। এখন সে যে কোনো মানুষের কাছে এখান থেকে যোগাযোগ করতে পারবে। রাতটা কোথায় কাটাবে সে জানে না, তবে আগামী দুদিনের মাঝে তার তথ্যকেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার কথা। সুহান সাত-পাঁচ ভেবে এখনই তার কাজে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে নিল। পাতাল ট্রেন স্টেশন থেকে বের হয়ে তাকে প্রায় কয়েক কিলোমিটার হাঁটতে হল। জায়গাটা শহরের বাইরে এবং বেশ নির্জন। পাশাপাশি কয়েকটা নিচু দালানের একটা তার তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিন। সে ঠিকানা মিলিয়ে নিশ্চিত হয়ে দরজায় তার কার্ডটা প্রবেশ করাতেই একটা এলার্ম বাজতে থাকে। কিছুক্ষণেই ঘড়ঘড় শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল এবং সুহান দেখল দুজন সশস্ত্র মানুষ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সুহান ভয়ে ভয়ে বলল, "আমি একটা সরকারি চিঠি পেয়েছি যেখানে আমাকে বলা হয়েছে—"

সশস্ত্র প্রহরী দুজনের একজন তার অস্ত্রটা নাড়িয়ে বলল, "এস আমার সাথে।"

একজন সুহানের সামনে আরেকজন পেছনে থেকে তাকে নানা করিডোর হাঁটিয়ে একটা ঘরে এনে হাজির করল। সেখানে রাগী চেহারার একজন মহিলা সুহানের হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে তার যোগাযোগ মডিউলে প্রবেশ করিয়ে দিতেই স্ক্রিনে তার ছবি ফুটে ওঠে। রাগী মহিলাটা ছবির সাথে সুহানের চেহারা মিলিয়ে নিয়ে চোখের রেটিনা স্ক্যান করার জন্য যন্ত্রটা তার দিকে এগিয়ে দেয়, সুহান যন্ত্রটাতে তার চোখ লাগিয়ে তাকিয়ে রইল, নিশ্চয়ই অবলাল আলোতে স্ক্যান করিয়েছে কারণ কখন স্ক্যান করা হয়ে গেল সে কিছু বুঝতেই পারল না। রেটিনা স্ক্যান করার পর সুহানের শরীর থেকে এক বিন্দু রক্ত নিয়ে ডিএনএ প্রোফাইল করা হল। হাত এবং পায়ের আঙুলের ছাপ রাখা হল, শরীরের ছবি নেওয়া হল, এক্স-রে করা হল এবং পুরো শরীরের অভ্যন্তরীণ ত্রিমাত্রিক ছবি নেওয়া হল। সব শেষ করে রাগী চেহারার মহিলাটা সুহানের কার্ডটা ফেরত দিয়ে বলল, "তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিন-এ তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

সুহান বলল, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।" একটু ইতস্তত করে যোগ করল, "আমি এই প্রথম কোথাও কাজ করতে এসেছি সেজন্য একটু ভয় ভয় করছে।"

রাগী চেহারার মহিলাটার মুখের কাঠিন্য হঠাৎ একটু শিথিল হয়ে আসে, সে নরম হয়ে বলল, "জীবনে সবকিছুই কখনো না কখনো প্রথমবার শুরু করতে হয়। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই সুহান।"

আজ এই প্রথম কেউ সুহানকে তার নাম ধরে সম্বোধন করল এবং সুহান প্রথমবার নিজেকে একজন রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে অনুভব করল। সে কৃতজ্ঞ গলায় বলল, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"আমার নাম কিরিনা।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কিরিনা।"

কিরিনা সুহানের হাতে একটা ছোট প্যাকেট দিয়ে বলল, "তুমি এখন তিন শ বারো নম্বর ঘরে রিপোর্ট কর। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান রিগা সেখানে আছে। সে তোমাকে তোমার কাজ বুঝিয়ে দেবে।"

সুহান আবার কিরিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বের হয়ে আসে। সুহানের এখনো বিশ্বাস হয় না যে সে এখন তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিন-এর একজন নিরাপত্তাকর্মী, সে এখন এখানে স্বাধীনভাবে হেঁটে বেড়াতে পারে। সুহান কিছুক্ষণের মাঝেই আবিষ্কার করল একটা দরজার সামনে আসতেই তার পকেটে রাখা কার্ড থেকে সিগন্যাল পেয়ে করিডোরের দরজাগুলো নিজের থেকে খুলে যাচ্ছে। সুহান হাঁটাহাঁটি করে তিন শ বারো নম্বর ঘরটা খুঁজে বের করে দরজাটা একটু খুলে ভেতরে উঁকি দেয়। বড় একটা টেবিলের এক পাশে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বসে নির্মমভাবে তার গাল চুলকাতে চুলকাতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষের সাথে কথা বলছে। এই মানুষটা নিশ্চয়ই রিগা, সুহানকে দরজা খুলে উঁকি দিতে দেখে বলল, "কে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি সুহান। আমি আজকে এখানে কাজে যোগ দিয়েছি।"

"এস। ভেতরে এস।"

সুহান ভেতরে ঢুকল। মানুষটা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ সুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি তো দেখি একটা কচি খোকা, এখানে কাজ করবে কেমন করে?"

এটা সত্যিকার অর্থে কোনো প্রয়োজনীয় কথা নয় তাই সুহান কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সে যদি এখানে কাজের উপযুক্ত মানুষ না হত তা হলে নিশ্চয়ই তাকে এখানে কাজ করতে পাঠাত না। মানুষটা আবার নির্মমভাবে তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "তোমার নাম কী বলেছ?"

সুহান দ্বিতীয়বার তার নাম বলল, "সুহান।"

"আগের কোনো কাজের অভিজ্ঞতা আছে?"

"না, নেই।"

মানুষটা খুব বিরক্ত হবার ভান করে কাছাকাছি রাখা মনিটরে সুহানের প্রোফাইলটা দেখতে শুরু করে। স্ক্রিনে তার ছবি এবং পরিচয় দেখে হঠাৎ সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, "আরে! তুমি দেখি ক্যাটাগরি-বি.!"

সুহান মাথা নাড়ল। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান রিগা খানিকক্ষণ চোখ বড় বড় করে সুহানের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মুখ বিকৃত করে বলল, "তুমি এখানে কীভাবে এসেছ?"

সুহান দাঁতে দাঁত চেপে অপমানটুকু সহ্য করে বলল, "আমি নিজে থেকে এখানে আসি নি। আমাকে সরকারি দপ্তর থেকে এখানে পাঠানো হয়েছে।"

মানুষটা টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "ভুল হয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে। তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিন হাই সিকিউরিটি তথ্যকেন্দ্র, এখানে বানর-শিম্পাঞ্জি দিয়ে কাজ হবে না। আমার সত্যিকারের মানুষ দরকার।"

অপমানে সুহানের কানের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। সে তবুও অনেক কষ্ট করে অপমানটুকু সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষটা আবার স্ক্রিনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু দেখে বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "সত্যিই দেখি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। কী আশ্চর্য!"

মানুষটা বেশ কিছুক্ষণ সুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি আগে কখনো ক্যাটাগরি-বি. মানুষ দেখি নি।"

এটাও কোনো প্রশ্ন নয়, সুহানকে নিশ্চয়ই এর উত্তর দিতে হবে না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যে কারণেই হোক, সুহানের চুপ করে থাকার জন্য এই মানুষটা আরো রেগে ওঠে। তার মুখে বিষাক্ত এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল, চোখ ছোট ছোট করে বলল, "আমি শুনেছি ক্যাটাগরি-বি. মানুষ আসলে পশুর কাছাকাছি। শুধু আইনগত জটিলতার জন্য তাদেরকে মানুষ বলা হয়।"

এত বড় একটা কথা সুহানের পক্ষে চুপ করে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, সে মাথা নেড়ে বলল, "এটা সত্যি নয়।"

মানুষটা সুহানের কথা শুনে রীতিমতো চমকে উঠল, সে কখনো কল্পনা করে নি সুহান এরকম একটা পরিবেশে তার কথার প্রতিবাদ করবে। রিগা এটাকে তার প্রতি ব্যক্তিগত অপমান ধরে নিয়ে চিৎকার করে বলল, "তুমি বলতে চাও আমি মিথ্যা কথা বলছি? আমি— নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান লেফটেন্যান্ট রিগা তোমার মতো নগণ্য একটা ক্যাটাগরি-বি. মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুহান একটু বিপন্ন অনুভব করতে থাকে। রিগার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, "আমি সেটা বলি নি। তবে ক্যাটাগরি-বি. মানুষকে শুধু আইনগত জটিলতার জন্য মানুষ বলা হয় এটা ভুল তথ্য।"

"আমি নিজে পড়েছি যে তারা বিবর্তনে মানুষ থেকে অনেক পেছনে। তাদের পশু প্রবৃত্তি আছে। এমনকি তাদের শরীরে এখনো পশুর চিহ্ন আছে।"

সুহানের পক্ষে এটাও সহ্য করা সম্ভব হল না, রিগার দিকে তাকিয়ে বলল, "পশুর চিহ্ন বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ?"

"তাদের বেশিরভাগেরই নাকি এখনো ছোট লেজ আছে।"

সুহান নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না যে সত্যিই এখনো এরকম মানুষ আছে যারা মনে করে ক্যাটাগরি-বি. মানুষ আসলে পশুর কাছাকাছি। সুহান হঠাৎ করে প্রতিবাদ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। এই অমার্জিত এবং রূঢ় মানুষটার সাথে কথা বলে কী লাভ, সে তো কোনোভাবেই তার সংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন করতে পারবে না। সুহান নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল এবং তার নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকাটাকে রিগা আবার এক ধরনের বেয়াদবি হিসেবে বিবেচনা করল। রিগা ভয়ানক মুখভঙ্গি করে বলল, "আমরা এখনই সেই পরীক্ষা করে ফেলতে পারি।"

সুহান একটু অবাক হয়ে তাকাল, "কী পরীক্ষা?"

"তোমার শরীরে পশুর চিহ্ন আছে কি না।"

সুহান তখনো ঠিক বুঝতে পারল না রিগা কী বলতে চাইছে। রিগা কঠোর মুখে বলল, "তুমি তোমার কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াও।"

সুহানের মনে হল তার মাথার ভেতরে একটা ছোট বিস্ফোরণ ঘটে গেল, সে হিংস্র চোখে রিগার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কখনো একজন মানুষকে এরকম নির্দেশ দিতে পার না।"

রিগা টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "পারি। তুমি আমার আদেশে, আমার নির্দেশে তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনে কাজ করবে।"

"সেটা হবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ। আমার সম্মান নষ্ট করে তুমি আমাকে কোনো নির্দেশ দিতে পারবে না। আমাদের সংবিধান প্রত্যেকটা মানুষের সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে।"

"সত্যিকারের মানুষের। তোমার মতো ক্যাটাগরি-বি. শিম্পাঞ্জির নয়।"

সুহান কঠোর মুখে বলল, "আমি ক্যাটাগরি-বি. শিম্পাঞ্জি নই। আমি ক্যাটাগরি-বি. মানুষ। একজন মানুষের যত অধিকার থাকার কথা তার অনেক কিছু আমাদের নেই। কিন্তু আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারটা এখনো আছে।"

রিগা হুঙ্কার দিয়ে বলল, "সেই অধিকারটাও থাকবে না। সেজন্য নতুন আইন পাস করা হচ্ছে।"

সুহান একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "যখন সেই আইনটা পাস হবে তখন তুমি বলতে এস। এখন বলো না।"

রিগা হঠাৎ চোখ ছোট ছোট করে বলল, "তুমি মনে করেছ আমাদের সেই আইনটা পাস করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে? তুমি মনে করেছ আমি এখনই তোমাকে উলঙ্গ করতে পারব না?"

সুহান পাথরের মতো মুখ করে বলল, "না পারবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিগা হঠাৎ তার ড্রয়ারের তলা থেকে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বের করে নিয়ে বলল, "পারব না?"

সুহান তার শেষ বাক্যটা সংশোধন করে বলল, "প্রাণ থাকতে পারবে না।"

"তুমি জান আমি যদি এই ঘরে তোমাকে গুলি করে হত্যা করে বলি আত্মরক্ষার জন্য আমার তোমাকে হত্যা করতে হয়েছে তা হলে কেউ আমাকে অবিশ্বাস করবে না?"

সুহান পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "এই ঘরে আরো একজন মানুষ আছে। একই ঘরে একইসাথে ঠিক তোমার মতো চরিত্রের দুই জন মানুষকে পেয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব কম। সে তোমার কথার প্রতিবাদ করতে পারে। সে ক্যাটাগরি-বি. মানুষ নয়, কাজেই সে তোমার মিথ্যে কথা শুনতে বাধ্য নয়।"

"তুমি তাই মনে কর?" রিগা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা সুহানের দিকে তাক করে ধরে বলল, "ঠিক আছে তা হলে সেই পরীক্ষাটাই হয়ে যাক।"

সুহান রিগার চোখের দিকে তাকাল এবং হঠাৎ সেখানে নিশ্চিত মৃত্যুকে দেখতে পায়। মানুষটা সত্যিই তাকে খুন করে ফেলবে, এই মানুষটা উন্মাদ। সুহান হঠাৎ অসহায় অনুভব করে—তার জীবনটা দ্রুত এত অর্থহীনভাবে শেষ হয়ে যাবে সে কখনো কল্পনা করে নি। সে কি কিছু করতে পারবে না? শুধু মানুষের সম্মান পাবার জন্য তাকে এভাবে মারা পড়তে হবে?

সুহান দেখতে পেল রিগা ট্রিগারে আঙুল রেখে বলল, "কেউ তোমাকে রক্ষা করতে আসবে না!"

সুহান শেষ চেষ্টা করল, শুধু বেঁচে থাকার জন্য সে শেষ চেষ্টা করল, সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর ভরসা করে বলল, "আশা করি, আমাকে খুন করার জন্য তোমার কারণটা যেন যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়। সারা পৃথিবী থেকে খুঁজে যখন একজন ক্যাটাগরি-বি. মানুষ আনা হয় তার পেছনে একটা কারণ থাকে।"

AMARBOI.COM

রিগাকে এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত দেখা গেল, সুহান সত্যি কথা বলছে না মিথ্যে কথা বলছে সেটা খুব সহজে রিগা বুঝতে পারবে না। রিগা বলল, "তোমাকে সারা পৃথিবী থেকে খুঁজে আনা হয়েছে?"

"আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি খোঁজ নিতে পার।"

সুহান ভেবেছিল মানুষটা খোঁজ নেবে না, কিন্তু সে আতঙ্কিত হয়ে দেখল রিগা মনিটরে ঝুঁকে পড়েছে। সুহান বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে গেছে, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলি নাকি মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়ার অপমান—কোনটা বেশি যন্ত্রণাদায়ক হবে?

রিগা মনিটরের দিকে আরো ঝুঁকে পড়ল। হঠাৎ করে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, সে যখন মাথা ঘুরিয়ে সুহানের দিকে তাকিয়েছে তখন সেখানে এক ধরনের বিচিত্র দৃষ্টি, খানিকটা ভয় এবং অনেকখানি বিস্ময়। রিগা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা ড্রয়ারের ভেতরে রেখে তার গালটা নির্মমভাবে চুলকাতে থাকে। তারপর সুহানের পাশে দাঁড়ানো মানুষটাকে বলল, "কিরি, তুমি এই ছেলেটাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও।"

সুহান প্রথমবার তার পাশে দাঁড়ানো মানুষটার দিকে তাকাল, সোনালি চুল এবং নীল চোখ। মানুষটা সুদর্শন, চেহারায় এক ধরনের কাঠিন্য রয়েছে কিন্তু কোনো নিষ্ঠুরতা নেই। মানুষটা বলল, "ঠিক আছে রিগা।"

"তুমি তোমার কাজটা এই ছেলেকে বুঝিয়ে দাও। এখন থেকে তোমরা দুই জন একসাথে থাকবে। বুঝেছ?"

"হ্যাঁ রিগা। বুঝেছি।"

তিন

কিরি বলল, "তুমি আমাকে একটু ছুঁয়ে দাও তো।"

সুহান একটু অবাক হয়ে বলল, "আমি? তোমাকে ছুঁয়ে দেব?"

কিরি বলল, "হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমার খুব কপাল খারাপ। তুমি ছুঁয়ে দিলে হয়তো আমার কপালটা একটু ভালো হবে।"

সুহান মাথা ঘুরিয়ে কিরির দিকে তাকাল, সে তার সাথে ঠাট্টা করছে কি না বোঝার চেষ্টা করল, কিন্তু না, তার চোখে-মুখে ঠাট্টার কোনো চিহ্ন নেই।

সুহান বলল, "তোমার কেন ধারণা হল আমি ছুঁয়ে দিলে তোমার কপাল ভালো হবে?"

"কারণ আমি আমার জীবনে তোমার চাইতে সৌভাগ্যবান কোনো মানুষ দেখি নি।"

সুহান অবাক হয়ে বলল, "আমার চাইতে সৌভাগ্যবান কোনো মানুষ দেখ নি?"

"না।" কিরি মাথা নেড়ে বলল, "তোমার খুন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তোমার লাশ এখন পলিমারের প্যাকেটে করে হিমঘরে নেওয়া উচিত ছিল। তার বদলে তুমি এখন হাঁটছ।" কিরি তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "নাও আমাকে ছুঁয়ে দাও।"

সুহান কিরির হাতটা ছুঁয়ে বলল, "এই যে ছুঁয়েছি। এখন কি তোমার নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে?"

কিরি একটু হাসল, বলল, "সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে।"

"আমি জানতাম না সৌভাগ্য চর্মরোগের মতো ছোঁয়াচে। ছুঁয়ে দিলে ঘটে যায়।"

"আমিও জানতাম না। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি।"

সুহানের এই মানুষটাকে বেশ পছন্দ হল। তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনে এই মানুষটার সাথে থাকবে ভেবে হঠাৎ করে তার মনটা ভালো হয়ে যায়। একটু আগে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান রিগার সাথে তার যে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা এখনো সে ভুলতে পারছে না।

একটা লিফটে করে দুজনে উপরে উঠে এল। বড় করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিরি বলল, "আমি জানতাম না তুমি এত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। সারা পৃথিবী থেকে তোমাকে বেছে আনা হয়েছে।"

"আমিও জানতাম না।"

কিরি অবাক হয়ে বলল, "তুমিও জানতে না? তার মানে? তুমি না রিগাকে সেটা বললে?"

"বাঁচার জন্য বানিয়ে বলেছিলাম।"

"বানিয়ে বলেছিলে?"

সুহান বলল, "হ্যাঁ। তুমি আমাকে যতটা সৌভাগ্যবান মনে কর আমি নিজেকে ততটা সৌভাগ্যবান মনে করি না। তাই জান বাঁচানোর জন্য আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হয়।"

AMARBOI.COM

"কিন্তু এটা তো মিথ্যা কথা নয়। তোমার সামনেই তো রিগা পরীক্ষা করে দেখল—আসলেই তোমাকে সারা পৃথিবী থেকে বেছে আনা হয়েছে।"

সুহান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ, সেটা দেখেই তো এখন আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। ভেবে পাচ্ছি না কেন আমাকে এনেছে।"

কিরি অন্যমনস্কভাবে বলল, "ভারি আশ্চর্য!"

সুহান বলল, "তুমি যদি খুব ভালো করে চিন্তা কর তা হলে দেখবে এটা সেরকম আশ্চর্য নয়।"

"কেন?"

"আমার কী মনে হয় জান?" সুহান একটু চিন্তা করে বলল, "আমার মনে হয় এই তথ্যকেন্দ্রে হয়তো খুব বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা আছে। কেউ হয়তো মারা পড়তে পারে। তাই আমাকে এনেছে, বিপজ্জনক কাজে ব্যবহার করবে, মারা যদি যেতেই হয় তা হলে একটা ক্যাটাগরি-বি. মানুষ মারা যাক।"

"মারার জন্যই যদি আনতে হয় তা হলে তো সারা পৃথিবী খুঁজে আনতে হয় না।" কিরি হঠাৎ করে সুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, আমাকে একটা জিনিস বল, তুমি কি খুব প্রতিভাবান?"

সুহান একটু ইতস্তত করে বলল, "সেটা আমি নিজের সম্পর্কে কেমন করে বলি? আমি তো অনাথাশ্রমে বড় হয়েছি কখনো পড়াশোনা করার সুযোগ পাই নি। নিজে নিজে পড়েছি, ঘরে বসে পরীক্ষাগুলো দিয়েছি।"

"কেমন হয়েছে পরীক্ষা?"

সুহান হাসল, বলল, "খুব ভালো। আমি যদি ক্যাটাগরি-বি. মানুষ না হয়ে তোমাদের মতো একজন হতাম তা হলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে যেতাম।"

"সত্যি?" কিরির দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, "তুমি সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ। আমি সত্যি বলছি।"

"কী ভয়ংকর অন্যায়। তোমার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার কথা, জ্ঞানী মানুষদের সাথে কথা বলার কথা, তার বদলে তুমি আমার মতো একজন হতভাগার সাথে নিরাপত্তা প্রহরীর কাজ করছ!"

সুহান বলল, "কিন্তু তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে কিরি। আমার মনে হয় গোমড়ামুখী বুড়ো প্রফেসরদের সাথে জ্ঞানের কথা বলা থেকে তোমার সাথে কাজ করা অনেক বেশি আনন্দের হবে।"

কিরি বলল, "সেটা তুমি আমাকে খুশি করার জন্য বলেছ, সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে যে অন্যায় করা হয়েছে সেটা তো চলে যাচ্ছে না।"

সুহান বলল, "ওসব নিয়ে আর কথা না বললাম।"

"ঠিক আছে তুমি যদি না চাও তা হলে বলব না।"

"আমাকে তা হলে বলে দাও আমার কী করতে হবে। আমি আগে কখনো কোনো ধরনের কাজ করি নি।"

"সেটা সমস্যা হবার কথা না। এই তথ্যকেন্দ্রে নিরাপত্তার সকল কাজ করা হয় ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করে। যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা, কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক এগুলোই সব কাজ করে। আমাদের রাখা হয়েছে একটা বাড়তি স্তর হিসেবে। যন্ত্রপাতির চোখ এড়িয়ে যেতে পারে এরকম কিছু যদি ঘটে যায় সেগুলো দেখার জন্য।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেরকম কিছু কি ঘটেছে?"

কিরি একটু ইতস্তত করে বলল, "আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের জানানো হয় নি কিন্তু আমার মনে হয় ঘটেছে। কয়েকদিন আগে দুর্ঘটনায় দুজন মারা গেছে, কিন্তু আমার মনে হয় সেগুলো দুর্ঘটনা নয়। আমার মনে হয় দুজন মানুষ বাইরে থেকে এই তথ্যকেন্দ্রে ঢুকে গিয়েছিল।"

সুহান অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি?"

"আমার তাই ধারণা। যাই হোক ওসব পরের ব্যাপার, এখন কাজের কথায় আসি। তুমি কি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করতে পার?"

সুহান হাসল, বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র কোথায় পাব?"

"বুলেট প্রুফ জ্যাকেট কখনো চোখে দেখ নি?"

"না।"

"শরীরের কোথায় খালি হাতে আঘাত করে একজন মানুষকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য অচেতন করে রাখা যায় সেটা সম্পর্কেও তোমার নিশ্চয়ই কোনো ধারণা নেই।"

"তুমি যদি জিজ্ঞেস কর তা হলে আমি অনুমান করার চেষ্টা করতে পারি।"

"এর মাঝে অনুমানের কোনো জায়গা নেই।"

"তা হলে তোমার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, না।"

কিরি বলল, "ঠিক আছে তা হলে তোমার ট্রেনিং শুরু হয়ে যাক।"

"কখন?"

"এখন থেকেই। তার আগে চল তোমাকে তোমার থাকার জায়গা দেখিয়ে দিই। মাঝে মাঝে তোমাকে এখানে একনাগাড়ে কয়েক দিন থাকতে হতে পারে তখন এখানে ঘুমাতে পারবে।"

"চমৎকার।"

AMARBOI.COM

সুহান তথ্যকেন্দ্র থেকে যখন বের হয়েছে তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। তাকে এখন কিছু খেয়ে রাতে ঘুমানোর একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ছোট একটা রেস্টুরেন্টে কিছু একটা খেয়ে সে ঘুমানোর জন্য একটা সস্তা হোটেল খুঁজতে থাকে। একটু গুছিয়ে নেবার পর তাকে একটা এপার্টমেন্ট বা ঘর খুঁজে নিতে হবে। সুহান আলোকোজ্জ্বল রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশের দালানগুলো দেখতে থাকে। একটা হোটেলকে মোটামুটিভাবে বেশ ভালোই মনে হল। সে একটু ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকে যায়। লবিতে ছোট যন্ত্রটার মাঝে কার্ডটা প্রবেশ করিয়ে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট একটা জানালা খুলে একজন মহিলার মাথা উঁকি দেয়, "সুহান?"

"হ্যাঁ, আমি সুহান।"

"তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনের নিরাপত্তাকর্মী?"

"হ্যাঁ। আমি আজ থেকে সেখানে কাজ করছি।"

"চমৎকার।" মহিলাটা মুখে একেবারে মাপা একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?"

"আজ রাতে থাকার জন্য আমার একটা রুম দরকার।"

মনিটরের স্ক্রিনে চোখ রেখে কিছু একটা দেখতে দেখতে বলল, "আমাদের কাছে তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের রুম আছে— সুলভ, সাধারণ আর ডিলাক্স। সুলভ রুমের ভাড়া—" হঠাৎ মেয়েটা থেমে গেল। বলল, "তুমি ক্যাটাগরি-বি. মানুষ?"

সুহান হঠাৎ অসহায় বোধ করে। সে ইতস্তত করে বলল, "হ্যাঁ।"

"ক্যাটাগরি-বি. মানুষ হয়ে তুমি সাধারণ মানুষের হোটেলে কেন এসেছ?"

"আমি বাইরে থেকে এসেছি। এই শহরে আমার কোনো থাকার জায়গা নেই। আমাকে আজ রাতে কোথাও থাকতে হবে।"

মহিলাটার মুখটা হঠাৎ খুব কঠোর হয়ে উঠল, বলল, "তুমি পৃথিবীতে কী ঘটছে তার কোনো খোঁজ রাখ না?"

"আমার পক্ষে যেটুকু রাখা সম্ভব সেটা রাখার চেষ্টা করি।"

"ক্যাটাগরি-বি. মানুষকে আইন করে মানুষের স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে সেটা জান না?"

"সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আইনটা পাস হয় নি। যতদিন পাস না হচ্ছে আমাদের মৌলিক কিছু অধিকার আছে। মানুষের মৌলিক অধিকার।" সুহানের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে একই দিনে দ্বিতীয়বার তাকে একই জিনিস ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে।

মহিলাটা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ছেলে, তুমি বিষয়টা বুঝতে পারছ না। আমাদের এই হোটেলটা একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। তোমাকে আমরা এখানে রাখতে পারব না। যদি জানাজানি হয়ে যায় তা হলে আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে।"

সুহান আবিষ্কার করল, সে একেবারে নির্বোধের মতো জিজ্ঞেস করে বসেছে, "কেন?"

"আমাদের রান্নাঘরে যদি তেলাপোকা পাওয়া যায়, বাথরুমে যদি ইঁদুর পাওয়া যায় তা হলে যে কারণে ব্যবসার ক্ষতি হয় সেই একই কারণে। বুঝেছ?"

সুহান মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।" সে স্লট থেকে কার্ডটা বের করে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে বলল, "বিষয়টা বুঝিয়ে দেবার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

সুহান হোটেলের দরজা খুলে বের হতে যাচ্ছিল তখন মহিলাটা তাকে ডাকল, বলল, "শোন।"

সুহান কোনো কথা না বলে মাথা ঘুরে দাঁড়াল। মহিলাটা বলল, "শহরের বাইরে ক্যাটাগরি-বি. মানুষদের একটা বস্তির মতো এলাকা গড়ে উঠেছে। আমি নিশ্চিত তুমি সেখানে রাত কাটানোর মতো একটা জায়গা পেয়ে যাবে। সাত নম্বর পাতাল রেল দিয়ে যদি শেষ মাথায় নেমে যাও, বাকিটুকু হেঁটে চলে যেতে পারবে।"

"ধন্যবাদ।" সুহান হোটেলের দরজা খুলে বের হয়ে এল।

সুহান দীর্ঘসময় শহরের মাঝে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। যতদিন অনাথাশ্রমে ছিল ক্যাটাগরি-বি. মানুষের যন্ত্রণাটা সে বুঝতে পারে নি। অনাথাশ্রমের বাইরে এসে হঠাৎ করে সে এর প্রকৃত গুরুত্বটা বুঝতে পারছে। তার ভেতরে এক ধরনের যন্ত্রণা হতে থাকে, এক ধরনের ক্রোধ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ইচ্ছে হয় কোনো একটা কিছু ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো করে ফেলে, ধ্বংস করে দেয়, গুঁড়িয়ে দেয়।

সুহান অবিশ্যি তার কিছুই করল না, সে সাত নম্বর পাতাল ট্রেনে করে একেবারে শেষ স্টেশনে নেমে যায়। স্টেশন থেকে বের হয়েই সে বুঝতে পারে সে সম্ভবত ঠিক জায়গাতেই এসেছে। আধো অন্ধকারে ঢাকা জরাজীর্ণ শহর। বিধ্বস্ত দালানের উপরে সস্তা নিয়ন আলো,

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তার পাশে নেশাসক্ত মানুষ। সুহান অন্যমনস্কভাবে কয়েক পা হেঁটে যায়, একটা ছোট দোকানের বাইরে একজন মানুষ বসে আছে, এক ধরনের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে মানুষটা সুহানের দিকে তাকাল। সুহান জিজ্ঞেস করল, "এখানে এক রাত থাকার মতো কোনো হোটেল আছে?"

মানুষটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "নতুন এসেছ বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কী কর?"

সুহান একটু ইতস্তত করে বলল, "নিরাপত্তা প্রহরীর একটা চাকরি পেয়েছি।"

"সাবধান। তুমি নতুন এসেছ, এখনো কিছু জান না। তোমার গুদাম লুট করে নেবার জন্য এরা যা কিছু করতে পারে।" মানুষটা ধরেই নিয়েছে সে কোনো একটা গুদামের দারোয়ান। সে যে আসলে একটা সরকারি তথ্যকেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রহরী, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে শুরু করে স্টান্ট বোমা পর্যন্ত ব্যবহার করা শিখছে, প্রয়োজনে রাত কাটানোর জন্য তার যে নিজস্ব একটা ঘর রয়েছে, সেই ঘরটাতে পৃথিবীর সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে—এই বিষয়গুলো মানুষটা চিন্তাও করতে পারবে না। সুহান মানুষটাকে এগুলো জানানোর কোনো চেষ্টা করল না, আবার জিজ্ঞেস করল, "আছে কোনো হোটেল?"

"হোটেল তুমি কোথায় পাবে? মিলিনা একটা সরাইখানার মতো চালায়, তার কাছে একটা ঘর থাকতে পারে। তবে বুড়ির মেজাজ খুব গরম, ব্যবহার খুব খারাপ।"

আজকে এখন পর্যন্ত সে যেরকম ব্যবহার পেয়ে এসেছে তার তুলনায় এখানকার যে কোনো ব্যবহারই মনে হয় মধুর মতো মনে হবে। সুহান জিজ্ঞেস করল, "মিলিনার সরাইখানাটা কোথায়?"

"সোজা চলে যাও। ল্যাম্পপোস্টের ওখানে গিয়ে ডানদিকে যাও, আধ কিলোমিটারের মতো গেলে একটা ছোট বাজারের মতো পাবে। সেখানে কাউকে জিজ্ঞেস করলে তোমাকে দেখিয়ে দেবে।"

"ধন্যবাদ তোমাকে।"

মানুষটা সুহানের কথার উত্তর দিল না। ভদ্রতাসূচক অর্থহীন কথাগুলোর মনে হয় এর কাছে খুব বেশি গুরুত্ব নেই।

সুহান ল্যাম্পপোস্টের দিকে হাঁটতে থাকে। রাস্তাটা খানাখন্দে ভরা, ফুটপাতটাও সেরকম। আবছা অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে, ফুটপাতে ভাঙা বোতল আর এলুমিনিয়াম ক্যান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মাঝে মাঝে দুই একজন মানুষ কথা বলতে বলতে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়, মানুষগুলোর কথার মাঝে এক ধরনের আঞ্চলিকতার টান। ল্যাম্পপোস্টের কাছাকাছি গিয়ে সে ডানদিকে হাঁটতে থাকে। দুই পাশে ঘিঞ্জি বাড়িঘর, ভেতরে মানুষের কথাবার্তা, মহিলাদের হাসি আর ছোট বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ করে একটা বাসা থেকে একজন মানুষ কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করতে করতে বের হয়ে এল, পেছনে একটা মেয়ের কান্নার শব্দ শোনা যেতে থাকে। নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে বিলাপ করতে করতে মেয়েটা ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছে।

সুহান শেষ পর্যন্ত বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। জায়গাটা মোটামুটি আলোকিত, অনেকগুলো দোকানপাট, নাইট ক্লাব এবং রেস্টুরেন্ট। একটা বড় হলঘরের ভেতর থেকে গানবাজনা এবং মানুষের হৈ-হুল্লোড় শব্দ ভেসে আসছে। সুহান কাছাকাছি একটা দোকানের ভেতর ঢুকে জিজ্ঞেস করল, "মিলিনার সরাইখানাটা কোথায় বলতে পারবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকানি মানুষটা ব্যস্তভাবে একটা কার্ড বোর্ডের বাক্স থেকে ছোট ছোট শুকনো খাবারের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, "সামনে ডানদিকে তিনটা দোকান পরে। বাইরে দেখবে বগনভিলা গাছ।"

সুহান মানুষটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বের হয়ে এল। রাস্তায় লোকজনের ভিড় পাশ কাটিয়ে সে কয়েক মিনিটে মিলিনার সরাইখানা পেয়ে যায়। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই একটা খাবার জায়গা, মানুষ বসে নিচু গলায় কথা বলতে বলতে খাচ্ছে। পেছনে একটা কাউন্টারে মোটাসোটা মধ্যবয়স্ক একজন মহিলা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয় সে বুঝি এখনই কারো ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হলঘরের এক পাশে একটা বড় ভিডিস্ক্রিনে একটা সস্তা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং একজন ভাঁড়ের স্থূল রসিকতার সাথে শব্দ করে একসাথে অনেকে হেসে উঠছে। সুহান টেবিলগুলো পাশ কাটিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল, মধ্যবয়স্ক মহিলাটা চোখ পাকিয়ে সুহানের দিকে তাকাল যেন সে একটা বড় অপরাধ করে ফেলেছে। সুহান ইতস্তত করে বলল, "রাত কাটানোর জন্য আমার একটা ঘর দরকার।"

মধ্যবয়স্ক মহিলাটা সুহানের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলল, "আমি তোমাকে রুম দিই আর তুমি সবকিছু নিয়ে চুরি করে পালাও!"

কথাটা এত অবিশ্বাস্য এবং বিচিত্র যে সুহানের হাসি পেয়ে যায়, সে হাসি আটকে বলল, "তোমার ভয় নেই আমি কিছু চুরি করে নিয়ে পালাব না।"

"তুমি কোথা থেকে এসেছ? কী কর?"

সুহান বলল, "আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। এক জায়গায় নিরাপত্তা প্রহরীর কাজ পেয়েছি।"

"কোনোরকম নেশা-ভাং কর না তো?"

"না, করি না।।"

মধ্যবয়স্ক মহিলাটা একটা মোটা খাতা বের করে খালি একটা পৃষ্ঠা বের করে বলল, "নাও লিখ।"

সুহান নিজের নাম-ঠিকানা রাত কাটানোর উদ্দেশ্য লিখতে থাকে। দেয়ালে ঝোলানো চাবিগুলো থেকে একটা চাবি বের করে নিয়ে বলল, "তিন শ আট নম্বর রুম। এক রাতের জন্য দুই ইউনিট।"

সুহান তার কার্ডটা বের করল না, এখানে এই কার্ডটা ব্যবহার করার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হল না। সে খুচরো দুটি ইউনিট বের করে টেবিলে রাখে, মুদ্রাগুলো চোখের কাছে নিয়ে পরীক্ষা করে মিলিনা বলল, "সাতটার সময় নাস্তা দেওয়া হবে। দশটার মাঝে ঘর খালি করে দেবে।"

"ঠিক আছে।"

তিন তলার তিন শ আট নম্বর ঘরটা ছোট। জানালা খুলতেই অন্য পাশে আরেকটা বড় বিল্ডিঙের পেছনের অংশ দেখা গেল। সেখানে লাগানো উজ্জ্বল নিয়ন আলো জ্বলছে এবং নিভছে, ঘরের ভেতরে সেই আলোর ছটা এসে পড়েছে। সুহান কিছুক্ষণ মন খারাপ করা এই কুশ্রী দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর টেবিলে রাখা ব্যাগ খুলে তার পরিষ্কার কাপড় বের করতে শুরু করে।

গরম এবং ঝাঁজালো জীবাণু নিরোধক পানিতে গোসল করে সুহানের নিজেকে খানিকটা সতেজ মনে হয়। সে পরিষ্কার একপ্রস্ত পোশাক পরে রুমে তালা দিয়ে বের হল, নিচে রেস্টুরেন্টে বসে কোনো এক ধরনের উত্তেজক পানীয় খেয়ে একটু সময় কাটিয়ে আসবে।

AMARBOI.COM

বড় একটা গ্লাসে সে ঝাঁজালো একটা উষ্ণ পানীয় নিয়ে এসে একটা কাউন্টারে বসে সেটাতে চুমুক দিতে দিতে মানুষগুলোকে দেখে। মানুষগুলো দরিদ্র, তাদের চোখে-মুখে জীবনের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাবার চিহ্ন স্পষ্ট। বেশিরভাগ মানুষ মধ্যবয়স্ক—মহিলার সংখ্যা কম। উৎকট পোশাক পরা দু-একজন মহিলা অকারণে হাসাহাসি করছে এবং উত্তেজক পানীয়ের কারণে একজন আরেকজনের ওপর ঢলে পড়ছে। বড় ভিডিস্ক্রিনে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন বাড়ানো সংক্রান্ত ওষুধের একটা বিজ্ঞাপন হচ্ছে এবং বিজ্ঞাপনটা শেষ হতেই সংবাদ বুলেটিন শুরু হয়ে গেল। সংবাদ বুলেটিনে কী প্রচারিত হচ্ছে সুহানের জানার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মানুষের হট্টগোলে সুহান পরিষ্কার শুনতে পেল না। সুহান আবার তার চারপাশের মানুষগুলোকে দেখতে থাকে। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা মিলিনা একজনের সাথে ঝগড়া করছে, দেখে মনে হয় সে তাকে মেরে বসবে! এক কোনায় কমবয়সী একজন তরুণ এবং তরুণী খুব কাছাকাছি মাথা রেখে নিচু গলায় কথা বলছে, মনে হচ্ছে চারপাশে কী হচ্ছে তার কিছুই তারা জানে না। তাদের পাশেই মোটা একজন মানুষ চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে—সম্ভবত নেশাগ্রস্ত। ঘরের মাঝামাঝি একটা হট্টগোলের মতো হল তখন একজন বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে উঠল, "চুপ। সবাই চুপ।"

রেস্টুরেন্টে নীরবতা নেমে আসে এবং একজন ভিডিস্ক্রিনের ভলিউম বাড়িয়ে দেয়, সেখানে ক্যাটাগরি-বি. মানুষ নিয়ে একটা আলোচনা হচ্ছে। একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ চেহারার মানুষকে কিছু সাংবাদিক ঘিরে রেখেছে, তাদের প্রশ্নের উত্তরে মানুষটা বলল, "আমরা এখনো সিদ্ধান্ত নিই নি। এত বড় একটা বিষয়ে আমরা কোনো চিন্তাভাবনা না করে সিদ্ধান্ত নেব না।"

একজন সাংবাদিক বলল, "আমরা শুনতে পেয়েছি আইনটার ড্রাফট করা হয়ে গেছে।"

গুরুত্বপূর্ণ চেহারার মানুষটা বলল, "আমি সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।"

লাল চুলের একজন মহিলা সাংবাদিক গুরুত্বপূর্ণ চেহারার মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "ক্যাটাগরি-বি. মানুষ আসলেই মানুষের সম্মান পাবার যোগ্য কি না সেই বিষয়টা বের করার জন্য বিজ্ঞানীদের একটা টিম দীর্ঘদিন গবেষণা করে একটা রিপোর্ট দিয়েছেন, সেই রিপোর্টে কী ছিল?

গুরুত্বপূর্ণ চেহারার মানুষটা বলল, "যথাসময়ে এই রিপোর্টটা প্রকাশ করা হবে।"

"শোনা যায় বিজ্ঞানীদের কমিটির আহ্বায়ক একটা রহস্যজনক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন?"

গুরুত্বপূর্ণ চেহারার মানুষটা শব্দ করে হেসে বলল, "এটা একটা গুজব। এ ধরনের কিছু ঘটে নি।"

বয়স্ক একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, "ক্যাটাগরি-বি. মানুষ সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কী?"

গুরুত্বপূর্ণ চেহারার মানুষটা বলল, "আমরা সবাই জানি পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক ক্যাটাগরি-বি. মানুষকে সাধারণ মানুষরা প্রতিপালন করছে। হয় ক্যাটাগরি-বি. মানুষকে কর্মক্ষম করে তোলা প্রয়োজন এবং যদি সেটা সম্ভব না হয় তা হলে তাদের কথা ভুলে গিয়ে শুধু সত্যিকারের মানুষদের নিয়ে পৃথিবীটাকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

"শুয়োরের বাচ্চা হারামখোর—" বলে কে একজন ভিডিস্ক্রিনের দিকে একটা বোতল ছুড়ে দেয়, গ্লাস ভাঙার একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হয় এবং একসাথে অনেক মানুষ চিৎকার করে

গালাগালি করতে থাকে। সবার গলা ছাপিয়ে মিলিনার গলা শোনা গেল, সে বলল, "যদি এত সাহস থাকে তা হলে যাও, গিয়ে এই হতভাগা কমিশনারের টুঁটি চেপে ধর—আমার রেস্টুরেন্টে কোনো মাতলামো চলবে না।"

যে বোতলটা ছুড়ে মেরেছিল সে গলা উঁচিয়ে বলল, "শুয়োরের বাচ্চা কমিশনারের কথা তোমরা শোন নি? পরিষ্কার বলে দিয়েছে ক্যাটাগরি-বি. মানুষদের কথা ভুলে যেতে হবে। শুনেছ?"

"শুনেছি।"

"তা হলে? আমরা খালি ঘরে বসে থাকব? কিছু একটা করব না?"

মিলিনা গর্জন করে বলল, "করতে হলে বাইরে গিয়ে কর। আমার রেস্টুরেন্টে বোতল ছোড়াছুড়ি করতে পারবে না। অপদার্থ কোথাকার!"

মানুষটা গজগজ করতে করতে সুহানের পাশের টেবিল এসে বসে। হিংস্র চোখে চারদিকে তাকায়। সুহান কোনার টেবিলে বসে থাকা তরুণ এবং তরুণীটার দিকে তাকাল, এখনো তারা মাথা দুটি কাছাকাছি রেখে বসে আছে। তারা এখন কথা না বলে অন্যদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে-মুখে বেদনার চিহ্ন। বেদনা এবং আতঙ্ক। আতঙ্ক এবং হতাশা। মানুষের স্বপ্ন দেখার অধিকারটুকু সরিয়ে নেওয়া হলে তাদের জীবনে আর বাকি থাকে কী? শুধুমাত্র ক্যাটাগরি-বি. মানুষ হিসেবে জন্ম নেবার কারণে একজন মানুষ তার জীবন নিয়ে স্বপ্নও দেখতে পারবে না?

AMARBOI.COM

চার

সপ্তাহখানেকের মাঝে সুহান মোটামুটিভাবে তার কাজগুলো শিখে নেয়। তার দায়িত্বের সবগুলোই যে সে পছন্দ করেছে তা নয়। ডিউটিতে থাকার সময় তাকে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, সে এখনো এই বিষয়টাতে অভ্যস্ত হতে পারে নি। মানুষকে সবচেয়ে কার্যকরভাবে খুন করার জন্য মানুষেরাই একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে এবং সেটা সে ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাপারটা মাঝে মাঝে তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তবে তার কাজটা খারাপ নয়। এই তথ্যকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য অসংখ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে, শুধু সেগুলোর ওপরে ভরসা না করে কিছু মানুষকেও বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা ইতস্তত এই তথ্যকেন্দ্রে ঘুরে বেড়ায়। সুহান সেরকম একজন মানুষ—যদিও সে পুরো দলের মাঝে একেবারেই নিচের সারিতে। বলা যেতে পারে অন্যদের ফাইফরমাশ খাটাই হচ্ছে তার আসল কাজ, কিন্তু সেটা নিয়ে সুহানের এতটুকু ক্ষোভ নেই। বিল্ডিঙের সব জায়গায় সে যেতে পারে না, তাকে সে অধিকার দেওয়া হয় নি। কিন্তু যেখানে তার যাবার অধিকার আছে সেখানে সে খুব উৎসাহ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নিরাপত্তা বাহিনীর অন্য সদস্যদের কাছে তার এই বাড়াবাড়ি উৎসাহ এক ধরনের কৌতুকের বিষয়। সুহান সেটা নিয়ে কিছু মনে করে না—প্রথমদিন রিগার সাথে সেই ভয়ংকর সাক্ষাতের পর তার সাথেও সুহানের আর দেখা হয় নি। এখানে তার সময় মোটামুটি খারাপ কাটছে না। এই সপ্তাহের বেতন পাওয়ার পর সে কিছু উপহার কিনে তার অনাথাশ্রমে পাঠিয়েছে। লারার জন্য একটা পারফিউম, রুবাকের জন্য গানের অ্যালবাম, অন্যদের কারো জন্য শুকনো ফল, কারো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারো জন্য চকোলেট আর হালকা পানীয়। উপহারগুলো পৌঁছানোর পর সেখানে কেমন আনন্দের বান ডেকে যাবে সেটা সে এখানে বসেই দেখতে পায়।

থাকার জন্য সে আর কোনো বাসা বা অ্যাপার্টমেন্ট খোঁজ করছে না, মিলিনার সরাইখানাতেই একটা রুম পাকাপাকিভাবে নিয়ে নিয়েছে। মিলিনা যদিও কোনোভাবেই প্রকাশ করে না কিন্তু সুহানের ধারণা এই মধ্যবয়স্ক বদমেজাজি মহিলাটা তাকে পছন্দই করে। স্থানীয় অনেকের সাথে তার পরিচয় হয়েছে, কেউ কেউ বুদ্ধিমান, কেউ কেউ হিংসুটে, কেউ কেউ উদাসী আবার কেউ কেউ ভয়ংকর হতাশাগ্রস্ত। ভবিষ্যতে কী হবে সেটা নিয়ে সবার ভেতরে এক ধরনের চাপা আতঙ্ক, কিন্তু সেটা নিয়ে কিছু করা যাবে কি না সে ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। কোনো কিছু অর্জন করতে হলে সংগঠিত হতে হয়, কিন্তু এখানে কেউ সংগঠিত নয়, সংগঠিত হবার মতো তাড়নাও কারো ভেতরে নেই। তবে পুরোটাই যে হতাশাব্যঞ্জক তা নয়, মনে হয় এর ভেতরেও কোথায় জানি আশার আলোর আছে। পৃথিবীর অনেক মানুষ জিনেটিক কোড দিয়ে মানুষকে বিভাজন করার বিরুদ্ধে। সবাই জানে একদল বিজ্ঞানী এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছিলেন। বিজ্ঞানীদের সেই রিপোর্টটাতে কী আছে তাই সেটা নিয়ে সবার খুব কৌতূহল। এখানে সবার ধারণা বিজ্ঞানীদের প্রকৃত রিপোর্টটা প্রকাশ করা হবে না এবং বিজ্ঞানীদের দলনেতাকে এর মাঝে মেরে ফেলা হয়েছে। আসলে কী হয়েছে কেউ সেটা জানে না। সুহান ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না কিন্তু তার মনে হয় কিছু কিছু মানুষ খুব গোপনে সংগঠিত হচ্ছে—তারা খুব বড় একটা কিছু করতে চাইছে। কিন্তু কারা কীভাবে এটা করছে কিংবা আসলেই কেউ এটা করছে কি না সুহান কোনোভাবেই সেটা নিশ্চিত হতে পারছে না। যতদিন সে ধরনের কিছু না হচ্ছে সে কাঁধে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনে ঘুরতে থাকবে। যদি কখনো তাদের বিরুদ্ধে আইন পাস করে নেওয়া হয় সে তার কাজ ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর অন্যসব ক্যাটাগরি-বি. মানুষের সাথে চলে যাবে। আবার নতুন করে তাদের জীবন শুরু করবে। নতুন করে তাদের সভ্যতা তৈরি করতে শুরু করবে। তার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার ক্ষমতা ছিল, সে কি আর ক্যাটাগরি-বি. শিশুদের পড়াতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে, একটা জীবন সে দেখতে দেখতে কাটিয়ে দেবে।

যতদিন সেটা না হচ্ছে ততদিন সে এই তথ্যকেন্দ্রে ঘুরে বেড়াবে। পুরো তথ্যকেন্দ্রের নিরাপত্তার বিষয়টাকে সে একটা ধাঁধা হিসেবে বিবেচনা করছে। কোথায় কোথায় ক্যামেরাগুলো আছে, মোশান ডিটেক্টরগুলো আছে সে পরীক্ষা করে দেখে। কোন সিগন্যালটা থেকে কোন সিগন্যালটা শুরু হয় সে বোঝার চেষ্টা করে। এর মাঝেই সে কিছু কিছু ভুল বের করে ফেলেছে কিন্তু সেটা কিরি ছাড়া আর কাউকে বলে নি। কিরি শুনে হা হা করে হেসে বলেছে, "সিস্টেমে ভুল থাকলে থাকুক সেটা যাদের ঠিক করার কথা তারা ঠিক করবে! তুমি কি ভেবেছ আমরা সেটা রিপোর্ট করলে তারা বিশ্বাস করবে? সত্যি সত্যি যদি সিস্টেমে গোলমাল থাকে আর তুমি সেটা বের করে ফেল তা হলে চেপে যাও! ওরা জানতে পারলে তোমার চাকরি চলে যাবে।"

সুহান বলল, "আমার কেন চাকরি যাবে? আমি কী করেছি?"

"তুমি ভুলটা বের করেছ। গুরুত্বপূর্ণ মানুষের ভুল বের করা খুব বড় অপরাধ। বুঝেছ?"

সুহান মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

কিন্তু সে যে আসলেই ব্যাপারটা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে তা নয়। যারা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তারা কেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে দেখবে না? প্রথম দিন রিগার সাথে তার যখন দেখা হয়েছিল তখন সে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছিল কারণ রিগাকে সে বুঝিয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে নিজে খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। সারা পৃথিবী থেকে খুঁজে খুঁজে তাকে বের করা হয়েছে—আর কী কাকতালীয় ব্যাপার—সেটা সত্যি বের হয়ে গেছে! কীভাবে হল ব্যাপারটা? আসলেই কি সে গুরুত্বপূর্ণ? কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ? কী করা হবে তাকে দিয়ে? একজন ক্যাটাগরি-বি. মানুষ কেমন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়? সুহান কিছু ভেবে পায় না—তখন সে একসময় হাল ছেড়ে দেয়, এই মুহূর্তে তার যেটা দায়িত্ব সেটা নিয়েই মাথা ঘামায়। কাঁধে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঝুলিয়ে সে তথকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনের করিডোরে করিডোরে ঘুরে বেড়ায়। যেসব জায়গায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা দুর্বল সেসব জায়গায় সে একটু বেশি সময় দেয়। হঠাৎ করে কেউ যদি তথ্যকেন্দ্রে চলে আসে সে তাকে ধরে ফেলতে চায়, ধরে ফেলে প্রমাণ করতে চায় ক্যাটাগরি-বি. মানুষ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মানুষ নয়। তাদেরকে হেলাফেলা করা যায় না।

সুহান প্রকৃত অর্থে কখনো বিশ্বাস করে নি সত্যি সত্যি সে একজন দুর্বৃত্তকে ধরে ফেলবে, পুরো ব্যাপারটাই ছিল তার একটা কল্পনা। তাই যখন একদিন মাঝরাতে সে দোতলায় নিরাপত্তার অবলাল রশ্মিটাকে অকেজো দেখতে পেল সে খুব দুশ্চিন্তিত হল না, ইলেকট্রনিক্স এবং যন্ত্রপাতি যত নিখুঁতভাবেই তৈরি করা হোক সেগুলো কখনো না কখনো অকেজো হয়ে যায়। এটাও নিশ্চয়ই সেরকম একটা কিছু। কাছাকাছি সার্কিট ব্রেকারের কাছে গিয়ে দেখল সেটাও বন্ধ হয়ে আছে। পরপর দুটো স্বল্প সম্ভাবনার ঘটনা ঘটে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম এবং তখন সে দুশ্চিন্তিত হয়ে চারতলায় ছুটে গেল এবং বড় করিডোরে গিয়ে দেখতে পেল টেলিভিশন ক্যামেরাটা ছাদের দিকে মুখ করে রাখা আছে—এই করিডোর দিয়ে গোপনে কোনো মানুষ যেতে চাইলে ক্যামেরাটা এভাবে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুহান করিডোরের শেষ মাথায় তাকাল এবং আবিষ্কার করল দরজার ফাঁক দিয়ে আলো বের হচ্ছে। এটা তথ্যকেন্দ্রের একটা মূল কক্ষ, বিশেষ প্রয়োজন না হলে কেউ এখানে ঢোকে না এবং সারাক্ষণই এই ঘরের আলো নেভানো থাকে। কেউ ভেতরে থাকলে এর ভেতরে আলো জ্বলার কথা—কিন্তু এর ভেতরে এখন কেউ নেই। সুহান কী করবে ঠিক বুঝতে পারল না, নিরাপত্তা কেন্দ্রে ব্যাপারটা জানানোর আগে সে দরজাটা একটু ধাক্কা দিয়ে আসতে চায়—দরজাটা নিশ্চিতভাবেই বন্ধ থাকার কথা। সুহান নিঃশব্দে দরজাটার কাছে গিয়ে খুব আস্তে দরজাটায় ধাক্কা দিল, কারণ একটু জোরে চাপ পড়লেই এলার্ম বেজে উঠবে। সুহান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল যখন তার হাতের স্পর্শে খুব ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল। সুহান নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না যে এই গভীর রাতে কোনো একজন মানুষ তথ্যকেন্দ্রে ঢুকে পড়েছে। সুহান দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল, উঁকি দিয়ে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে দেখল, ঘরের মাঝামাঝি একটা চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে একজন মানুষ কাজ করছে। কী-বোর্ডে তার হাত দ্রুত নড়ছে। তাকে দেখে মনে হতে পারে সে এখানেই থাকে এবং এখানেই কাজ করে। সুহান বজ্রাহত মানুষের মতো দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, হাতে অস্ত্রটা নিতেও মনে থাকল না। মানুষটা মুখ তুলে সুহানের দিকে তাকাল এবং একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, তাকে দেখে মানুষটা চমকে উঠল না। এমনভাবে তার দিকে তাকাল যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, সুহানের মনে হল মানুষটা যেন খুব পরিচিত একজনের মতো তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। সুহানের হঠাৎ সংবিৎ ফিরে এল, সে চোখের পলকে হাতে অস্ত্রটা নিয়ে সেটা মানুষটার মাথার দিকে তাক করে বলল, "তুমি কে?"

মানুষটা হাসার চেষ্টা করে আবার মনিটরে চোখ নামিয়ে নিয়ে কী-বোর্ডে কাজ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। কী-বোর্ডে কাজ করতে করতে বলল, "আমি কে শুনে তুমি কী করবে? তুমি কি আমাকে চিনবে?"

"তুমি এখানে কেমন করে এসেছ?"

মানুষটা চোখ না তুলে কী-বোর্ডে কাজ করতে করতে বলল, "একটু ফন্দিফিকির করে এসেছি।"

মানুষটা পরিচিত মানুষের মতো কথা বলছে যেন অনেকদিন থেকে তার সাথে পরিচয়। সুহানের এখন রেগে যাওয়া উচিত, কাজেই সে খুব রেগে যাবার ভঙ্গি করে বলল, "তুমি কেন এখানে এসেছ?" মানুষটা সুহানের দিকে চোখ না তুলে কী-বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দ্রুত কাজ করতে করতে বলল, "সেটা তোমাকে বোঝানো খুব সহজ হবে না!"

সুহান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তুমি এখনই এখান থেকে বের হয়ে আস, তা না হলে কিন্তু আমি গুলি করতে বাধ্য হব।"

মানুষটা মাথা নেড়ে ভালো মানুষের মতো বলল, "উঁহু। আমার সেটা বিশ্বাস হয় না। গুলি করার হলে তুমি এতক্ষণে গুলি করে দিতে। আমার ধারণা তুমি আগে কখনো কাউকে গুলি কর নি।"

"আমি সেই তথ্যটা তোমাকে দিতে বাধ্য নই। তুমি এখনই তোমার দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াও।"

মানুষটা সুহানের কথা পুরোপুরি উপেক্ষা করে কাজ করে যেতে থাকে। তাকে দেখে মনে হয় সে মোটামুটিভাবে কাজের একটা পর্যায় শেষ করে ফেলেছে। তার মুখে বেশ পরিতৃপ্তির একটা ভাব ফুটে ওঠে, মনিটরে কিছু একটার দিকে তাকিয়ে সে বেশ আনন্দের একটা ভঙ্গি করে মাথা নাড়তে থাকে। সুহান চিৎকার করে বলল, "তুমি এখনই হাত তুলে দাঁড়াও তা না হলে কিন্তু গুলি করে দেব।"

মানুষটা আবার কী-বোর্ডে ঝুঁকে বলল, "তুমি গুলি করবে না। কারণ তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখান থেকে গুলি করলে পেছনের মূল্যবান সার্ভারের বারোটা বেজে যাবে! তোমার সেই ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।"

সুহান নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, সত্যি সত্যিই একজন মানুষ মধ্যরাতে একটা গোপন তথ্যকেন্দ্রের ভেতরে এসে এভাবে কাজ করে যাচ্ছে? যার বুকের ভেতর বিন্দুমাত্র ভয় নেই? পুরো ব্যাপারটাকে একটা তামাশা হিসেবে নিয়েছে?

সুহান কী করবে বুঝতে না পেরে ওয়্যারলেস সেটের বোতাম চাপ দিয়ে কিরির সাথে যোগাযোগ করল, "কিরি।"

"কী ব্যাপার সুহান?"

"পাঁচ তলার মূল সার্ভার রুমে একজন মানুষ।"

কিরি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তুমি ঠাট্টা করছ, তাই না?"

"না।"

"মানুষটা কী করছে?"

"সার্ভারের ইন্টারফেসে কাজ করছে?"

"তুমি কী করছ?"

"আমি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা তার দিকে তাক করে রেখেছি।"

কিরি নিশ্বাস আটকে রেখে বলল, "তুমি তাক করে রাখ, আমি ব্যবস্থা করছি।"

সুহান অস্ত্রটা শক্ত করে ধরে রেখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের মাঝেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলার্ম বেজে উঠতে থাকে। চারপাশে উজ্জ্বল আলো জ্বলে ওঠে এবং অনেক মানুষের পদক্ষেপ শোনা যায়। কী–বোর্ডে ঝুঁকে থাকা মানুষটাকে প্রথমবার একটু বিচলিত হতে দেখা গেল, একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সময় তা হলে শেষ। কী বলো?"

সুহান কোনো কথা বলল না, মানুষটি আবার তার কী–বোর্ডে ঝুঁকে পড়ে শেষ মুহূর্তের মতো কিছু কাজ করতে শুরু করে। কয়েক সেকেন্ডের ভেতরেই অনেকগুলো সশস্ত্র মানুষ ছুটে আসে, সুহানকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তারা ভেতরে ঢুকে যায়, সবার সামনে রয়েছে রিগা, তার হাতে একটা ছোট আগ্নেয়াস্ত্র। রিগা কোনো রকম দ্বিধা না করে মানুষটার কাছে এগিয়ে যায় এবং একটা কথাও না বলে মানুষটাকে গুলি করল। পরপর অনেকবার।

সুহান এর আগে কখনো কোনো মানুষকে হত্যা করতে দেখে নি, দৃশ্যটা তার কাছে ভয়ংকর অমানবিক এবং পৈশাচিক বলে মনে হল। নিজের অজান্তেই সে চিৎকার করে ছুটে যায় এবং গুলিবিদ্ধ মানুষটাকে ধরে ফেলার চেষ্টা করে। মানুষটার রক্তে তার হাত মাখামাখি হয়ে যায়, সে চিৎকার করে বলতে থাকে, "না! না! না!"

কে একজন হ্যাঁচকা টান দিয়ে সুহানকে সরিয়ে নেয়। বেশ কয়েকজন মানুষ গুলিবিদ্ধ মানুষটাকে ঘিরে দাঁড়ালে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা পরীক্ষা করতে থাকে। সুহান শুনতে পেল, কেউ একজন বলছে, "না। কোনো পরিচয় নেই।"

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, "সার্ভার থেকে কী তথ্য বের করেছে?"

"জানি না। শেষ মুহূর্তে সবকিছু মুছে দিয়েছে।"

কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, "মুছে দেবার সময় পেয়েছে?"

"হ্যাঁ। অনেক সময় পেয়েছে।"

"আরো আগে গুলি করা উচিত ছিল।"

সুহান ফ্যালফ্যাল করে মানুষগুলোর দিকে তাকাল—তার আরো আগেই গুলি করা উচিত ছিল? একজন মানুষকে গুলি করা কি এতই সহজ?

সুহানকে কে যেন হাত ধরে টানছে। সুহান মাথা ঘুরিয়ে দেখল কিরি। কিরি বলল, "চলে এস সুহান। তোমার এখন আর করার কিছু নেই।"

সুহান হতচকিতের মতো কিরির দিকে তাকিয়ে বলল, "মানুষটাকে মেরে ফেলল?"

কিরি বলল, "ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। চল। এখান থেকে চল।" সুহান কিরির পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে, তার তখনো পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। সে যদি এভাবে মানুষটাকে খুঁজে বের না করত তা হলে হয়তো তার এভাবে মারা যেতে হত না। সুহান জোর করে পুরো ব্যাপারটা মাথা থেকে সরিয়ে দিতে চায়, কিন্তু পারে না। ঘুরেফিরে বারবার হত্যা–দৃশ্যটা তার মাথায় আসতে থাকে, মনে হয় এটা দীর্ঘদিন তাকে তাড়না করিয়ে বেড়াবে। করিডোরের মোড়ে কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। যারা যাচ্ছে কিংবা আসছে তাদের সবার পরিচিতি পরীক্ষা করে দেখছে। সুহান তার কার্ড দেখিয়ে যখন তার জিনেটিক ম্যাপিঙের জন্য ছোট যন্ত্রটার ভেতরে তার আঙুল প্রবেশ করিয়েছে তখনই একটা বিপদ সংকেত শুনতে পেল। যন্ত্রের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা হাতের অস্ত্র উদ্যত করে বলল, "তুমি কে? এখানে কোথা থেকে এসেছ? তোমার কার্ডের সাথে পরিচয় মিলছে না কেন?"

সুহান অবাক হয়ে বলল, "পরিচয় মিলছে না?"

"না। এই দেখ।"

সুহান অবাক হয়ে দেখল, সত্যি সত্যি মনিটরে কিছু বিদঘুটে সংখ্যা এবং 'তথ্যকেন্দ্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য নেই' বলে একটা লেখা বড় বড় করে ফুটে উঠেছে। সুহান যন্ত্রটা থেকে তার হাত বের করে হঠাৎ কারণটা বুঝতে পারল। বলল, "বুঝেছি। আমি গুলিবিদ্ধ মানুষটাকে ধরেছিলাম বলে আমার হাতে তার রক্ত লেগেছে। সেই রক্ত থেকে জিনেটিক কোডিং করে ফেলেছে—আমার টিস্যু দিয়ে নয়।"

যন্ত্রের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা বলল, "তুমি তোমার আঙুলটা পরিষ্কার করে আবার পরীক্ষা কর।"

সলভেন্ট দিয়ে আঙুল পরিষ্কার করে সুহান আবার তার জিনেটিক কোডিং বের করল, এবারে কোডিংটুকু তার কার্ডের তথ্যের সাথে মিলে গেল। উদ্যত অস্ত্র হাতের মানুষটা তার অস্ত্র নামিয়ে বলল, "চমৎকার। এবারে তুমি যেতে পার।"

সুহান বলল, "ধন্যবাদ।"

কিরি আর সুহান হাঁটতে থাকে। কিরি কিছু একটা বলছে, সুহান ঠিক ভালো করে শুনছে না। তার মনটা হঠাৎ করে খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। গুলিবিদ্ধ মানুষটার রক্ত থেকে ভুল করে জিনেটিক কোডিং বের করা তথ্যটা সে একনজর দেখেছে। সেখানে কিছু বিদঘুটে সংখ্যা ছিল, বড় করে লেখা ছিল 'তথ্যকেন্দ্রে তথ্য নেই' কিন্তু তার সাথে আরো একটা জিনিস লেখা ছিল। লেখা ছিল 'ক্যাটাগরি–বি. মানুষ!' এই মানুষটা কে তার পরিচয় কেউ জানে না, শুধু জানে যে সে একজন ক্যাটাগরি–বি. মানুষ। সুহান কিছুতেই বুঝতে পারে না একজন ক্যাটাগরি–বি. মানুষ কেমন করে এত সুরক্ষিত একটা তথ্যকেন্দ্রে চলে এসেছিল? মানুষটা এত সহজে কেমন করে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে? সে যদি কোনো গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে এসে থাকে তা হলে একবারও সে সেই তথ্য নিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল না কেন?

"তোমার কী মনে হয়েছে?"

সুহান হঠাৎ করে চমকে উঠে লক্ষ করল কিরি তাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করেছে, প্রশ্নটা পুরোপুরি শুনতে পায় নি। সে লজ্জা পেয়ে বলল, "আমি ঠিক খেয়াল করি নি—তুমি কী জিজ্ঞেস করেছ?"

"আজকে রিগাকে দেখে তোমার কী মনে হয়েছে?"

"মনে হয়েছে মানুষটা একটা পেশাদার খুনি।"

"সেটা তো সবাই জানে। আর কিছু মনে হয় নি?

"না, আমার আর কিছু মনে হয় নি। শুধু—"

"শুধু কী?"

"শুধু মনে হয়েছে আমি যেন কখনো তার মতো না হয়ে যাই। এত সহজে মানুষ দূরে থাকুক আমি যেন একটা পতঙ্গকেও কখনো হত্যা করতে না পারি।"

কিরি কোনো কথা না বলে একবার সুহানের দিকে তাকাল তারপর নিচু গলায় বলল, "পৃথিবী বড় কঠিন একটা জায়গা সুহান।"

পাঁচ

পাতাল ট্রেনের স্টেশন থেকে বের হয়ে সুহান আধো অন্ধকার রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। প্রথম প্রথম ক্যাটাগরি–বি. মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই এলাকাটাকে তার অত্যন্ত নিরানন্দ মনে হত, ধীরে ধীরে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ইদানীং সারা দিন কাজ করার পর

AMARBOI.COM

সে ভেতরে ভেতরে তার নিজের জায়গায় ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই এলাকার মানুষজনের সাথে পরিচয় হয়েছে, কারো কারো সাথে তার আন্তরিক সম্পর্কও হয়েছে। আধো অন্ধকার রাস্তায় ভাঙা কাচ, কাচের বোতল বাঁচিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

"দাঁড়াও।" বাজখাঁই গলায় একটা ধমক শুনে সুহান থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সামনে প্রায় পাহাড়ের মতো উঁচু একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। অবিশ্যি দাঁড়িয়ে আছে কথাটা বলা হয়তো একটু ভুল হবে, বলা উচিত দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে, মানুষটা জড়িত গলায় বলল, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, ঝটপট একটা ইউনিট বের করে দাও দেখি।"

সুহান খুব বিরক্ত হল, সত্যি সত্যি একটা ইউনিট দিয়ে দেবে নাকি এই নেশাগ্রস্ত মানুষের নেশার খোরাক না যুগিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে সেটা একবার চিন্তা করল। মানুষটা বিশাল, ইচ্ছে করলে তাকে জাপটে ধরে নতুন আরেকটা সমস্যা করতে পারে তাই সে একটা ইউনিট দিয়ে দেওয়াই ঠিক করল। ইউনিটটা বের করার জন্য সে যখন পকেটে হাত ঢুকিয়েছে ঠিক তখন সে অবাক হয়ে দেখল আরো তিন জন মানুষ তাকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

এই তিন জন মানুষ নেশাগ্রস্ত মানুষটার মতো টলছে না, তারা কেউ নেশাগ্রস্ত নয়। সুহান হঠাৎ এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তোমরা কারা?"

তিন জন মানুষ কোনো উত্তর দিল না, তারা আরো কাছাকাছি এগিয়ে এল এবং তখন সে তাদের হাতে ছোট আগ্নেয়াস্ত্রগুলো দেখতে পেল। এ ধরনের বিপদের মুখোমুখি হলে কী করতে হয় সে গত কয়েক সপ্তাহ থেকে কিরির কাছে শিখছে, সেই বিদ্যেটুকু কাজে লাগানোর জন্য সে লাফ দিয়ে সামনের মানুষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল কিন্তু তার আগেই কানের কাছে একজন তাকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছে। মুহূর্তে তার সামনে পুরো জগৎটুকু অন্ধকার হয়ে যেতে থাকে। সে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল তার আগেই একজন তাকে ধরে ফেলল, সুহান জ্ঞান হারানোর আগে এক মুহূর্তের জন্য মানুষটাকে দেখতে পায়—এই মানুষটাকে সে আগে কোথায় জানি দেখেছে।

পাহাড়ের মতো মানুষটা ব্যাকুল গলায় আরো একবার বলল, "আমার ইউনিট?"

কিন্তু সুহান তখন সেটা শুনতে পেল না। অন্য তিন জন মানুষ যে তার অচেতন দেহটাকে নিয়ে কাছাকাছি একটা কালো ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছে সেটাও সে জানতে পারল না।

মিলিনার সরাইখানায় মিলিনা অনেক রাত পর্যন্ত সুহানের জন্য অপেক্ষা করল। সুহান নামের এই ছেলেটার জন্য তার ভেতরে এক ধরনের মমতার জন্ম হয়েছে—ছেলেটি ফিরে না আসায় সে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের আশঙ্কা অনুভব করতে থাকে। কিন্তু সে জানে তার কিছু করার নেই। পুলিশ বা হাসপাতালে ক্যাটাগরি–বি. মানুষের খোঁজ নেওয়া যায় না।

সুহানের জ্ঞান ফিরে এল ছাড়া ছাড়া ভাবে। তার মনে হতে লাগল অসংখ্য মানুষ তার সাথে কথা বলছে, সেই কথাগুলো সে মাঝে মাঝে পরিষ্কার বুঝতে পারে আবার মাঝে মাঝে তার কাছে পুরোপুরি দুর্বোধ্য মনে হয়। কথাগুলো কে বলছে সে বুঝতে পারে না। কখনো কখনো মনে হয় সে নিজেই এই কথা বলছে। যে কথাগুলো তার মাথার মাঝে ঘুরপাক খায় তার মাঝে 'ক্যাটাগরি–বি.', 'অস্তিত্ব', 'ভবিষ্যৎ', 'গোপনীয় রিপোর্ট' এ ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়গুলোই বেশি। জ্বরাক্রান্ত মানুষের মাথার মাঝে কোনো একটা ভাবনা যেরকম ঘুরপাক খেতে থাকে অনেকটা সেরকম, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি জীবন্ত।

সুহান ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকাতেই তার ওপর একজন ঝুঁকে পড়ল, মানুষটা একজন ডাক্তার। সুহান ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "আমি কোথায়?"

"তুমি হাসপাতালে। শহরতলি এলাকায় তোমাকে কজন নেশাগ্রস্ত মানুষ আক্রমণ করেছিল।"

সুহান বলতে চাইল, না, আমাকে নেশাগ্রস্ত মানুষ আক্রমণ করে নি, যারা আক্রমণ করেছিল তারা প্রফেশনাল, তাদের হাতে অস্ত্র ছিল এবং তাদের একজনকে আমি আগে কোথাও দেখেছি। কিন্তু তার কিছুই বলার ইচ্ছে করল না, সে নিঃশব্দে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার বলল, "তোমার মাথায় আঘাত লেগেছিল এবং তোমাকে বাঁচানোর জন্য তোমার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে।"

সুহান হতচকিতের মতো ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে? সে একজন ক্যাটাগরি–বি. মানুষ, তাকে বাঁচানোর জন্য তার মাথায় অস্ত্রোপচার করেছে? কেন?

"মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার একটা জটিল বিষয়।" ডাক্তার তার ওপর ঝুঁকে পড়ে মৃদুস্বরে বলল, "প্রথম প্রথম সেজন্য তোমার বিচিত্র কিছু অনুভূতি হবে, তুমি সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।"

সুহান ফিসফিস করে বলল, "দুশ্চিন্তা করব না?"

"না। তোমার কেমন লাগছে, কী হচ্ছে, কী রকম অনুভব করছ সবকিছু আমাদের বলবে। আমরা তোমাকে সাহায্য করব।"

"ধন্যবাদ।" সুহান হঠাৎ এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করে, তার আর কথা বলার ইচ্ছে করে না। সে চোখ বন্ধ করল। ডাক্তার বলল, "তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আমি একটা ইনজেকশন দিই, তুমি ঘুমিয়ে যাও।"

সুহান গভীর ঘুমে ঢলে পড়ার আগে শুনতে পেল কে যেন তার মস্তিষ্কের মাঝে বলছে, "সাবধান। সুহান তুমি সাবধান! তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ভয়ংকর ষড়যন্ত্র।"

কে তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে, কীসের ষড়যন্ত্র কিছু বোঝার আগেই সুহান গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

সুহান তার বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসে আছে, তাকে ঘিরে বেশ কয়েকজন মানুষ। তাদের সবাই যদিও সাদা গাউন পরে আছে কিন্তু বোঝা যায় সবাই ডাক্তার নয়। কেউ কেউ নিশ্চয়ই নিরাপত্তা বাহিনীর। মধ্যবয়স্ক একজন বলল, "তোমার এখন কেমন লাগছে আমাদেরকে বলো।"

"আমার মাথার মাঝে মনে হয় অনেক মানুষ কথা বলছে।"

মানুষগুলো একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল, মনে হল তারা এটা শুনে খুব আশ্বস্ত বোধ করছে। কিন্তু কথায় সেটা প্রকাশ করল না, খুব দুশ্চিন্তার ভঙ্গি করে একজন বলল, "মাথার ভেতরে কথা বলছে? কী আশ্চর্য!"

আরেকজন একটু এগিয়ে এসে বলল, "কী নিয়ে কথা বলে?"

সুহান মানুষটার মুখের দিকে তাকাল, কেউ একজন তার মাথায় তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, ভয়ংকর একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাকে খুব সাবধান থাকতে হবে। সে সাবধানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত না হচ্ছে ততক্ষণ সে কিছুই বলবে না। কিন্তু তাকে কথা বলতে হবে তা না হলে তাকে সন্দেহ করবে। কথা বলতে হবে বিশ্বাসযোগ্যভাবে। বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা কথা বলা সোজা, সেটা হতে হয় সত্যের খুব কাছাকাছি। কাজেই সে সত্যের কাছাকাছি মিথ্যা কথা বলবে। মানুষটা আরেকটু এগিয়ে এসে বলল, "কী নিয়ে কথা বলে তোমার সাথে?"

"সেটা বুঝতে পারি না।" সুহান মাথা নাড়ল, বলল, "অবিশ্যি বোঝার চেষ্টাও করি না। এমন তো না যে বাইরে থেকে কেউ আমার সাথে কথা বলছে—তাই কথাটা বোঝার দরকার আছে। আমি যে কথাগুলো শুনি সেটা নিশ্চয়ই আমার নিজের মস্তিষ্কের একটা প্রতিক্রিয়া, আমার অবচেতন মনের কথা। এটা শুনেই কী আর না শুনেই কী?"

ডাক্তারের পোশাক পরা মানুষটাকে এবারে খানিকটা বিপন্ন মনে হল, আমতা-আমতা করে বলল, "তা হলে তুমি কথাগুলো বোঝার চেষ্টা কর না?"

"না!" সুহান সরল মুখ করে বলল, "কেন করব? আমি তো আর পাগল না যে নিজের সাথে নিজে কথা বলব। তাই চেষ্টা করি না শুনতে।"

"কিন্তু—কিন্তু—" মানুষটাকে হঠাৎ কেমন যেন বিপদগ্রস্ত মনে হয়, "কিন্তু সেই কথাটা যদি ডাক্তার না জানে সে তা হলে তোমার চিকিৎসা করবে কেমন করে?" মানুষটা ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই না ডাক্তার?"

ডাক্তার অনিশ্চিতের মতো মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"তুমি তা হলে চেষ্টা কর শুনতে। তোমার মস্তিষ্কে কী কথা হচ্ছে সেটা শুনে ডাক্তারকে জানাবে। সাথে সাথে জানাবে। একেবারেই দেরি করবে না।"

সুহান মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।" মানুষটার কথা বলার ভঙ্গি, আচার-আচরণটা অত্যন্ত সন্দেহজনক। এদের উদ্দেশ্য কী পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কিছুতেই তাদেরকে কোনো কিছু জানানো যাবে না। কোনোভাবেই না। সুহান ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমার কী হয়েছে? আমি কেন এরকম মানুষের কথা শুনতে পাই?"

ডাক্তার মানুষটা সুহানের চোখ এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত জটিল একটা বিষয়। বিজ্ঞানের এত উন্নতির পরেও মানুষ মস্তিষ্ককে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি। তোমার সেই মস্তিষ্কে আঘাত লেগেছে, সেখানে রক্তক্ষরণ হয়েছে, সেখানে একটা চাপের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই চাপটা কমানোর জন্য অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে, অস্ত্রোপচারের সময় মস্তিষ্কের কোনো কোনো অংশে কোনো ধরনের পরিবর্তন হতে পারে, তার জন্য সাময়িক কোনো প্রতিক্রিয়া হতে পারে।"

"তা হলে আমি যেটা শুনছি সেটা কোনো সত্যি ব্যাপার নয়—সেটা পুরোপুরি আমার কল্পনা?"

"না—মানে ইয়ে—" ডাক্তারকে কেমন যেন বিপন্ন দেখায়। "মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত জটিল একটা বিষয় সেটা কীভাবে কাজ করে আমরা এখনো ঠিক জানি না। মস্তিষ্ক নিয়ে অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে।"

সুহান ব্যাপারটি নিয়ে আর কিছু বলল না। সে বুঝে গেছে তার প্রশ্নের সত্যিকার উত্তর আর পাবে না। সে তাই অন্য প্রসঙ্গে এল, বলল, "আমাকে কবে যেতে দেবে?"

"আরো দুই-তিন দিন পর্যবেক্ষণে রেখে আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব।"

"আমাকে কি এই কয়েকদিন সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে?"

"না, সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে না। তবে তোমার মাথায় কিছু সেন্সর লাগানো আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুয়ে না থাকলে আমরা সেই সেন্সরগুলো লক্ষ করতে পারব না। কাজেই আপাতত তোমার জন্য শুয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

সুহানের কেবিন থেকে সবাই বের হয়ে গেলে সুহান তার চোখ বন্ধ করল এবং হঠাৎ করে মনে হল কেউ একজন তাকে বলল, "চমৎকার! ভারি চমৎকার।"

সুহান অবাক হয়ে লক্ষ করল সে আবার মনে মনে কথা বলতে শুরু করেছে। নিজেকে নিজে বলছে, "কে আবার কথা বলছে?"

"তুমি। তুমি তোমার সাথে কথা বলছ।"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না।" সুহান ছটফট করে বলল, "আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি।"

"না তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ না।"

"তা হলে?"

"সুহান তুমি ধৈর্য ধর। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ—তুমি সবকিছু বুঝতে পারবে।"

"কখন বুঝতে পারব?"

"সময় হলেই বুঝতে পারবে।"

"কখন সময় হবে?"

"তুমি সেটা জানবে। এখন তুমি উত্তেজিত হয়ো না। ব্যস্ত হয়ো না। তোমার ওপর খুব বিপদ। তোমাকে নিয়ে ভয়ংকর ষড়যন্ত্র হচ্ছে, কাজেই তুমি খুব সাবধানে থেকো। তোমার চারপাশে যারা আছে তারা তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। তাদের থেকে সাবধান।"

সুহান অসহায়ের মতো নিজেকে বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

তার মস্তিষ্কের ভেতরে কেউ একজন বলল, "তুমি সব বুঝতে পারবে। একসময় তুমি সবকিছু বুঝতে পারবে। এখন তুমি বিশ্রাম নাও।"

"আমার মাথার ভেতরে শত শত মানুষ কথা বললে আমি কেমন করে বিশ্রাম নেব?"

"তোমাকে বিশ্রাম নেওয়া শিখতে হবে। শত মানুষের কথার মাঝে বিশ্রাম নেওয়া শিখতে হবে। আমরা তোমাকে সাহায্য করব।"

"তোমরা কারা?"

"আমরা আর তুমি এক।"

"কী বলছ তুমি? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারবে। একসময় বুঝতে পারবে। তুমি ডাক্তারকে বোলো তোমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে।"

সুহান চোখ খুলে তাকিয়ে বলল, "ডাক্তার।"

একজন ডাক্তার তার কাছে এগিয়ে আসে। সুহান ক্লান্ত গলায় বলল, "আমাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারবে?"

"কেন?"

"আমার মাথার মাঝে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"কেউ কি তোমার সাথে কথা বলছে?"

"হ্যাঁ।"

ডাক্তার চকচকে চোখে তার দিকে এগিয়ে আসে, "কী বলছে তোমার মাথার ভেতরে?"

"বলছে ঘুমের ওষুধ দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে।"

"ও।" ডাক্তারের এক ধরনের আশাভঙ্গ হল। সে ওষুধের কেবিনেটের কাছে ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল, একটা ছোট সিরিঞ্জ নিয়ে ফিরে এসে সুহানের হাতে সিরিঞ্জটা ঢুকিয়ে দিতেই তার সারা শরীরে একটা আরামদায়ক আলস্য ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সুহানের সারা শরীরে ঘুম নেমে আসতে থাকে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুহান দীর্ঘ সময় ধরে রিয়ানা নামের একটা মেয়েকে স্বপ্নে দেখল। কমবয়সী হালকা–পাতলা তেজস্বী একটা মেয়ে, মাথার অবাধ্য চুলকে উজ্জ্বল লাল রঙের একটা স্কার্ফ দিয়ে বেঁধে রেখেছে। মেয়েটার বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, রোদে পোড়া ত্বক। প্রসাধনহীন মুখে এক ধরনের অগোছালো সৌন্দর্য। ছটফটে চঞ্চল এবং খানিকটা বেপরোয়া, হাসিটা খুব সুন্দর কারণ মেয়েটার মুক্তার মতো ঝকঝকে দাঁত। স্বপ্নটি শুরু হল এভাবে, শহরের মাঝামাঝি অতলান্ত সড়ক নামে যে ব্যস্ত ছোট রাস্তাটা আছে সেখানে কিশলয় ক্যাফের ভেতর থেকে রিয়ানা নামে মেয়েটি বের হয়ে বলল, "এই যে শোন, তুমি এদিকে তাকাও।"

সুহান তাকিয়ে মেয়েটাকে দেখতে পেল। মেয়েটা বলল, "আমার নাম রিয়ানা। নামটা তোমার মনে থাকবে তো?"

সুহান বলল, "কেন থাকবে না? রিয়ানা তো মনে রাখার জন্য এমন কোনো কঠিন নাম নয়।"

রিয়ানা হাসল, বলল, "হ্যাঁ। একেবারেই কঠিন নাম নয়। খুব সাধারণ নাম, মনে রাখা খুব সহজ। কিন্তু তুমি তো এখন স্বপ্ন দেখছ। মানুষ যেটা স্বপ্নে দেখে জেগে ওঠার পর সেটা ভুলে যায়। তুমিও যদি ভুলে যাও?"

সুহান বলল, "স্বপ্নের কথা মনে রাখতে হবে, কেন?"

"মাঝে মাঝে মনে রাখতে হয়। তোমাকে এই স্বপ্নটার কথা মনে রাখতে হবে।"

"কেন? এই স্বপ্নটা কেন মনে রাখতে হবে?"

"সেটা আমি তোমাকে এখন বোঝাতে পারব না। বোঝালেও তুমি বুঝবে না।"

"কেন বুঝব না?"

"কারণ এটা স্বপ্ন। স্বপ্নে সবকিছু বোঝা যায় না।" রিয়ানা নামে মেয়েটা বলল, "তোমার খানিকক্ষণ সময় আছে?"

"হ্যাঁ আছে।"

"তা হলে এস আমার সাথে। এই ফুটপাত ধরে হাঁট। চেষ্টা কর সবকিছু মনে রাখতে। প্রথমে একটা ছোট ফুলের দোকান তারপর একটা ক্রিস্টালের দোকান। মনে থাকবে তো?"

"হ্যাঁ মনে থাকবে।"

"চমৎকার।" রিয়ানা সুহানের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, "তোমার নাম কী?"

"সুহান।"

"সুহান!" রিয়ানা হাসল এবং হাসির সাথে সাথে তার মুক্তার মতো দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল।

সুহান বলল, "তোমার দাঁতগুলো খুব সুন্দর।"

রিয়ানা হঠাৎ খিলখিল করে হাসতে থাকে। সুহান বলল, "তুমি কেন হাসছ?"

"তোমার কথা শুনে হাসছি।

"আমি কি কোনো হাসির কথা বলেছি?"

"না। বল নি। আমি হাসছি অন্য কারণে।"

"কী কারণে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একটা মেয়ের সাথে তোমার দেখা হয়েছে এক মিনিটও হয় নি, তুমি সেই মেয়েটাকে বলছ তার দাঁতগুলো খুব সুন্দর। কেন বলছ জান?"

"কেন?"

"কারণ এটা স্বপ্ন। স্বপ্নে মানুষের কোনো ভান থাকে না। যেটা সত্যি সেটা বলে দেয়। সেটা করে ফেলে।"

"কী আশ্চর্য!"

"কোন জিনিসটা তোমার আশ্চর্য মনে হচ্ছে সুহান?"

"এই পুরো ব্যাপারটা। এই স্বপ্নটা এত বাস্তব যে মনে হচ্ছে এটা সত্যি সত্যি ঘটছে।"

'মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন তার কাছে সেটা সব সময় সত্যি মনে হয়।"

"কিন্তু এটা অন্যকরম।"

রিয়ানা হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ঠিক আছে তা হলে তুমি মনে রেখ তোমার এই স্বপ্নটা একটু অন্যকরম। মনে থাকবে?"

"হ্যাঁ। মনে থাকবে।" সুহান রিয়ানার দিকে তাকিয়ে বলল, "রিয়ানা।"

"বলো।"

"তোমার চোখগুলোও খুব সুন্দর।"

রিয়ানা এবারে আগের মতো খিলখিল করে হেসে উঠল না, কিছুক্ষণ সুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার ভালবাসার কোনো মেয়ে আছে সুহান?"

"না নেই।"

"কেন নেই?"

"আমি ক্যাটাগরি-বি. মানুষ। ক্যাটাগরি-বি. মানুষের খুব দুঃখ। তাদের স্বপ্ন দেখতে নেই। ভালবাসার মেয়ে থাকতে নেই। কারো স্বপ্নকে নষ্ট করতে নেই।"

রিয়ানা চোখ বড় বড় করে সুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। সুহান বলল, "আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি রিয়ানা?"

"না সুহান, আজকে নয়। তুমি আমাকে কী প্রশ্ন করবে আমি জানি। আরেকদিন জিজ্ঞেস করো।"

"কিন্তু এটা তো একটা স্বপ্ন। আরেকদিন তো এই স্বপ্ন আমি দেখব না। সেই স্বপ্নে তুমি থাকবে না।"

"তুমি যদি চাও তা হলে তুমি আবার এই স্বপ্ন দেখতে পাবে।"

"সেটা কীভাবে সম্ভব?"

"সেটা সম্ভব। কারণ এটা অন্যরকম স্বপ্ন।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।" রিয়ানা সুন্দর করে হাসল, বলল, "এটা হবে তোমার আর আমার স্বপ্ন। তুমি দেখতে চাইলেই এই স্বপ্নটা দেখতে পারবে।"

"তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ?"

"হ্যাঁ আমি কথা দিচ্ছি।" রিয়ানার চোখে-মুখে হঠাৎ এক ধরনের ব্যস্ততার ছাপ ফুটে ওঠে, সে সুহানের হাত ধরে বলল, "সুহান আমাদের সময় নেই। তাড়াতাড়ি এস।"

"কোথায়?"

"এস আমার সাথে।"

সুহান রিয়ানার সাথে হাঁটতে থাকে। একটা পোশাকের দোকান, তার পাশে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাস্কর্যের দোকান, তারপরে একটা ক্যাফে। বাইরে টেবিল, টেবিলকে ঘিরে ছোট ছোট চেয়ার। সেখানে তরুণ-তরুণীরা বসে কফি খাচ্ছে, নিচু গলায় কথা বলছে, হাসছে। রিয়ানা বলল, "ওই ক্যাফেটার নাম ক্যাফে অর্কিড। নামটা মনে থাকবে?"

"হ্যাঁ।"

"এই যে খালি টেবিলটা দেখছ, তুমি এখানে বস সুহান।"

সুহান খালি টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসল। রিয়ানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি? তুমি বসবে না?"

"হ্যাঁ বসব। কিন্তু তোমার সাথে না। অন্যখানে।"

"কেন রিয়ানা? আমার সাথে নয় কেন?"

"কারণ আছে সুহান।"

"কী কারণ?"

"সেই কারণটি আরেকদিন বলব।"

সুহান ব্যাকুল হয়ে বলল, "আরেকদিন কেন? আজকে কেন নয়?"

ঠিক তখন সুহানের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল, তার কাছাকাছি একজন ডাক্তার এবং দুজন নার্স দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার তার ওপর ঝুঁকে বলল, "তুমি স্বপ্ন দেখছিলে?"

"হ্যাঁ দেখছিলাম। তুমি কেমন করে জান?"

"তোমার আর.ই.এম. হচ্ছিল। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন তার আর.ই.এম. হয়।"

"ও।"

ডাক্তার আরো একটু ঝুঁকে পড়ল, বলল, "তুমি কী স্বপ্ন দেখছিলে সুহান?"

সুহান ডাক্তারের দিকে তাকাল, হঠাৎ করে এই মানুষটার কৌতূহলটাকে তার অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হতে থাকে। তার ভেতরে বিচিত্র একটা ক্রোধ জেগে উঠতে থাকে কিন্তু তাকে তার ক্রোধটাকে গোপন রাখতে হবে। ভেতরকার সত্যি কথাটাও তার গোপন রাখতে হবে। ডাক্তার তার কথা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, কিছু একটা তাকে বলতে হবে। সুহান বলল, "আমি স্বপ্নে দেখেছি একটা সার্কাস।"

"সার্কাস?"

"হ্যাঁ। সার্কাস।"

"কী হচ্ছে সেই সার্কাসে?"

"সার্কাসে একটা মানুষ অনেকগুলো সিংহকে নিয়ে খেলছে।"

"স্বপ্নে কেউ কিছু বলেছে তোমাকে?"

"হ্যাঁ বলেছে।"

"কে বলেছে? কী বলেছে?" ডাক্তারের চোখ হঠাৎ চকচক করে ওঠে।

"সিংহগুলো। সিংহগুলো আমাকে বলেছে।"

ডাক্তারের চোখ-মুখের উৎসাহ একটু থিতিয়ে যায়, ইতস্তত করে বলে, "সিংহ কি কখনো কথা বলে?"

সুহান হাসার ভঙ্গি করল, বলল, "স্বপ্নের ব্যাপার! স্বপ্নের কি কোনো মাথামুণ্ডু আছে নাকি? স্বপ্নে সিংহ কথা বলে। হাতি ওড়ে।"

"তা ঠিক।"

সুহান বলল, "সিংহগুলো কী বলছে শুনতে চাও?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তারের উৎসাহ এতক্ষণে অনেক কমে এসেছে, তবুও জিজ্ঞেস করল, "কী বলেছে?"

বলেছে, "আমরা সকালে ক্যাটাগরি-বি. মানুষের কলজে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। দুপুর বেলা খাই তাদের কিডনি।"

ডাক্তার এক ধরনের বিতৃষ্ণা নিয়ে সুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। সুহান বলল, "সিংহগুলো ডিনারের সময় কী খেতে চায় জান?"

ডাক্তার মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ! শুনে কাজ নেই। তুমি বরং একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা কর।"

সুহান আবার চোখ বুজল। তার মাথার মাঝে আবার অসংখ্য মানুষের কথার শব্দ ভেসে আসে। সে জোর করে তার মাথা থেকে কথাগুলো সরিয়ে দেয়। হঠাৎ করে তখন তার রিয়ানার কথা মনে হল। কী অসম্ভব বাস্তব এই স্বপ্নটুকু। এখনো মনে হচ্ছে স্বপ্ন নয় সত্যি। কী বিচিত্র এই স্বপ্নটুকু। কী আশ্চর্য!

সুহান রিয়ানার কথা ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে গেল।

ছয়

সুহানকে তিন দিন পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল। কিন্তু তাকে তার নিজের জায়গায় ফিরে যেতে দিল না—তাকে শহরের ভেতরে একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। সে একজন তুচ্ছ ক্যাটাগরি-বি. মানুষ, তার জন্য এত আয়োজনের কারণটুকু সে জানতে চেয়েছিল, সঠিক উত্তরটুকু কেউ দিতে পারল না। ভাসা ভাসা ভাবে শুনতে পেল যে তথ্যকেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রহরীর এই দায়িত্বটার একটা অন্য ধরনের গুরুত্ব রয়েছে—তাকে সঠিক নিরাপত্তা দেওয়া এখন সরকারের দায়িত্বের মাঝে এসে পড়েছে।

সুহান খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাল না। সে এখনো দুর্বল। মাথার ভেতরে সব সময়ে মানুষের কোলাহল, তার কী হয়েছে সে এখনো বুঝতে পারে নি। মাঝে মাঝে মনে হয় সে বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছে। শুধু যে মানুষের কথা শুনতে পায় তা নয়, সে আবিষ্কার করেছে সে অন্যরকম একটা মানুষ হয়ে গেছে। ধীরলয়ের সঙ্গীত সে একেবারেই পছন্দ করত না, এখন মাঝে মাঝে সেটা শুনতে তার বেশ ভালো লাগে। হঠাৎ হঠাৎ তার মাঝে খুব বড় পরিবর্তন হয়, সে কিছুক্ষণের জন্য একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায়। একদিন সকালে হঠাৎ করে সে আবিষ্কার করল—সে মধ্যযুগের সকল চিত্রশিল্পীর নাম জানে। কিছুক্ষণ পর সে নামগুলো ভুলে গেল। মাঝখানে একবার তার মনে হল সে মানুষের রোগের চিকিৎসা করতে পারবে—সব রোগের চিকিৎসা সবকিছুই সে জানে। এই অনুভূতিগুলো তার আসে এবং যায় কিন্তু একটা ব্যাপার মোটামুটি পাকাপাকিভাবে ঘটে গেছে। সেটা হচ্ছে তার স্মৃতিশক্তি—সেটা অসম্ভব বেড়ে গেছে, কোনো একটা কিছু একবার দেখলেই সে খুঁটিনাটি সবকিছু মনে রাখতে পারে। এটা কেমন করে ঘটেছে সে কিছুতেই ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না।

নিজের ছোট অ্যাপার্টমেন্টে আসার একদিন পর সে ঘর থেকে হাঁটতে বের হল। সে এখনো দুর্বল, কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে ক্লান্তি অনুভব করতে থাকে তখন ফুটপাতে একটা ছোট বেঞ্চে বসে সে বিশ্রাম নিতে থাকে। অন্যমনস্কভাবে সামনে তাকিয়ে সে হঠাৎ চমকে ওঠে, এই জায়গাটা সে আগে দেখেছে—বাস্তবে নয় স্বপ্নে, এই রাস্তাটার নাম অতলান্তে সড়ক, ছোট কিন্তু ব্যস্ত একটা রাস্তা—আজকে নিজের অজান্তেই সে এদিকে হেঁটে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে। একদিন সে এই রাস্তাটাকেই স্বপ্নে দেখেছিল। সে ডানে এবং বামে তাকাল এবং অবাক হয়ে দেখল সত্যিই সেখানে কিশলয় ক্যাফে নামে একটা ক্যাফে রয়েছে।

মুহূর্তের মাঝে সুহান তার ক্লান্তি ভুলে উঠে দাঁড়াল। সে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে ক্যাফেটার দিকে হাঁটতে থাকে। ক্যাফেটার সামনে গিয়ে সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কী আশ্চর্য! সে সত্যি সত্যি স্বপ্নে এই ক্যাফেটা দেখেছিল।

ঠিক তখন ক্যাফেটার দরজা খুলে গেল, সুহান নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না, ভেতর থেকে একটা মেয়ে বের হয়ে এসেছে, মেয়েটি তার মাথার অবাধ্য চুলগুলোকে একটা লাল স্কার্ফ দিয়ে বেঁধে রেখেছে। মেয়েটার গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে, চোখগুলো বুদ্ধিদীপ্ত এবং উজ্জ্বল। মেয়েটা ঠোঁট চেপে মুখ বন্ধ করে রেখেছে কিন্তু সুহান নিশ্চিতভাবে জানে যখন এই মেয়েটা হাসবে তখন দেখা যাবে তার দাঁতগুলো মুক্তার মতো ঝকঝকে। সুহান চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিল "রিয়ানা, তুমি?" কিন্তু ঠিক তখন কেউ একজন তার মাথার ভেতরে ফিসফিস করে বলল, "খবরদার সুহান, তুমি আমাকে ডেকো না। আমাকে চেনার ভান করো না। কিছুতেই না।"

"কেন নয়?" সুহান অবাক হয়ে দেখল একটা কথা উচ্চারণ না করে সে রিয়ানার সাথে কথা বলছে।

"তোমার আশপাশে নিরাপত্তা বাহিনীর লোক কিলবিল করছে।"

"সত্যি?"

সুহান দেখল তার পাশ দিয়ে রিয়ানা অপরিচিতের মতো হেঁটে চলে গেল। যাবার সময় তার মস্তিষ্কে ফিসফিস করে বলল, "তুমি জান কোথায় যেতে হবে?"

"হ্যাঁ জানি।"

"এস। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"বেশ।"

"আমার পিছু পিছু নয়—একটু সময় নাও। তারপর এস।"

"ঠিক আছে রিয়ানা।" সুহান অবাক হয়ে দেখল কী অবলীলায় সে একটা শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে শুধু চিন্তা করে কথা বলে ফেলছে। কেমন করে সে পারছে?

সুহান মাথা ঘুরিয়ে না তাকিয়েও বুঝতে পারল তার আশপাশে কিছু মানুষ তাকে লক্ষ করছে। নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষ। তাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে, সে কী করে সেটা লক্ষ করছে। কিশলয় ক্যাফের সামনে সে থমকে দাঁড়িয়েছে তাই এর ভেতরেই তার ঢোকা উচিত। সুহান ক্যাফেটাতে ঢোকে, ভেতরে বেশ ভিড়। খালি টেবিল নেই। দূরে একটা টেবিল খালি হয়েছে, সে সেখানে গিয়ে বসে। এখানে খানিকক্ষণ সময় কাটাবে সে, স্নায়ুকে শীতল করার জন্য একটা পানীয় খাবে তারপর হেঁটে হেঁটে যাবে ক্যাফে অর্কিডে। ঠিক যেরকম সে স্বপ্নে দেখেছিল।

মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ সুহানকে জিজ্ঞেস করল, "আমি তোমার টেবিলে বসতে পারি?" ক্যাফেতে খালি টেবিল নেই তাই তার এখানে বসতে চাইছে। সুহান মাথা নাড়ল। মানুষটার ধৈর্য নেই, সে বসেই উচ্চৈঃস্বরে ওয়েট্রেসকে ডাকতে শুরু করে। ওয়েট্রেস এলে দুজনেই পানীয়ের অর্ডার দিল, একজন স্নায়ু শীতল অন্যজন স্নায়ু উত্তেজক পানীয়।

সুহান স্নায়ু শীতল করার পানীয়টা চুমুক দিয়ে চোখের কোনা দিয়ে মানুষটাকে লক্ষ করে। এই দুপুর বেলা সে যে পানীয়টা খাচ্ছে সেটা দুপুরে খাবার কথা নয়। মানুষটা সম্ভবত উত্তেজক পানীয়তে নেশাগ্রস্ত। সুহান একটু শঙ্কিত হয়ে বসে থাকে, একই টেবিলে বসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে মানুষটা যদি হঠাৎ করে তার সাথে কথা বলতে শুরু করে সেটা একটা অহেতুক বিড়ম্বনা হবে। তার এখন কথা বলার ইচ্ছে করছে না, একটু আগে যে ব্যাপারটা ঘটেছে সেটা সে এখনো পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারে নি। নেশাগ্রস্ত মানুষটা অবিশ্যি কথা বলার উৎসাহ দেখাল না। গভীর মনোযোগ দিয়ে তার পানীয়তে চুমুক দিতে থাকল।

কিশলয় ক্যাফে থেকে বের হয়ে সুহান ডানদিকে হাঁটতে থাকে। প্রথমে একটা ফুলের দোকান, তার পাশে ক্রিস্টালের দোকান। রিয়ানা চাইছে একটু সময় নিতে, তাই সে ক্রিস্টালের দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে ক্রিস্টালগুলো দেখতে থাকে। খানিকটা অন্যমনস্ক ছিল বলে সে লক্ষ করল না, কিশলয় ক্যাফে থেকে উত্তেজক পানীয় নেশাসক্ত মধ্যবয়স্ক মানুষটাকে নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষটা ভয়ার্ত গলায় বলছে, "কী করেছি আমি? কী করেছি?" উত্তেজক পানীয় খাবার জন্য ঘটনাক্রমে সুহানের টেবিলটা বেছে নিয়ে সে যে নিজের ওপর কী ভয়ানক দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে সে সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

সুহান ফুটপাত ধরে হেঁটে হেঁটে যায়। ডানদিকে হেঁটে সে পোশাকের দোকানটা পার হল। তার পাশে ভাস্কর্যের দোকান—তার পাশে ক্যাফে অর্কিড। ইতস্তত তরুণ-তরুণীরা বসে আছে, নিচু গলায় কথা বলছে, হাসছে। সুহান সেদিকে হেঁটে যায়, তাকে কোথায় বসতে হবে সে জানে, তার টেবিলটা খালি।

সুহান টেবিলটাতে বসার সময় শুনতে পেল রিয়ানা তার মস্তিষ্কের ভেতর বলছে, "আমি তোমার কাছাকাছি আছি, কিন্তু তুমি কোনোভাবেই আমাকে চেনার ভান করবে না।"

"করব না রিয়ানা।"

"চমৎকার।"

"তোমার সাথে সাথে এখানে অসংখ্য নিরাপত্তাকর্মী চলে এসেছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। তোমার ডান দিকে যে মোটা মানুষটা বসেছে সে একজন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। পিছনে যে দুজন বসেছে তারাও। ভাস্কর্যের দোকানের সামনে যে মহিলা দুজন দাঁড়িয়েছে তারাও। এইমাত্র রাস্তার পাশে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল, সেটাও নিশ্চয়ই নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি। কাজেই সাবধান।"

সুহান একটা শব্দও উচ্চারণ না করে বলল, "রিয়ানা আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে এটা ঘটছে। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে এটা সত্যি।"

"এটা সত্যি। আমি তোমার দুই টেবিল সামনে বসেছি। আমার সাথে আরো দুজন আছে। আমরাও একটা উত্তেজক পানীয় খেতে খেতে তর্ক করছি। পুরোটা একটা অভিনয়। আমরা এসেছি তোমার জন্য। তোমার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করার জন্য।"

সুহান চেয়ারে হেলান দিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, সত্যি সত্যি তার টেবিল থেকে দুই টেবিল সামনে রিয়ানা বসে আছে, তার দুই পাশে দুজন সুদর্শন তরুণ।

সুহান তার মস্তিষ্কে ফিসফিস করে রিয়ানাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কারা রিয়ানা? আমি কেমন করে তোমার সাথে কথা বলছি? স্বপ্নে কেমন করে আমার তোমার সাথে পরিচয় হল?"

"বলব, তোমাকে আমি সব বলব। কিন্তু তার আগে তুমি একটু সহজ ভঙ্গিতে বস। কিছু একটা খাবার অর্ডার দাও। খাবার খেতে খেতে একা একা মানুষ যা করে তাই কর, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কাগজে কিছু আঁকাআঁকি কর। আঁকাআঁকি করতে করতে সেখানে লিখবে ৩৭ নেপচুন এভিনিউ। তারপর এই কাগজটা এখানে ফেলে যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন রিয়ানা?"

"নিরাপত্তা বাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য। আমরা ৩৭ নেপচুন এভিনিউতে কিছু গোপন লিফলেট, বেআইনি কাগজ ফেলে রাখব। তারা সেগুলো উদ্ধার করবে। তোমাকে তখন আরো বেশি বিশ্বাস করবে।"

সুহান চেয়ারে হেলান দিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে দূরে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না রিয়ানা। আমাকে কে বিশ্বাস করবে? কেন বিশ্বাস করবে?"

"বলছি।" রিয়ানা নরম গলায় বলল, "সবকিছু বলছি। তার আগে তোমার অন্য একটা প্রশ্নের উত্তর দিই। স্বপ্নে তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিল মনে আছে? আমি বলেছিলাম প্রশ্নটা তুমি এখন করো না, পরে করো। মনে আছে?"

সুহান অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! আমি স্বপ্নে কী প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম তুমি সেটা জান?"

"হ্যাঁ। জানি। কারণ সেই স্বপ্নটা আমি তৈরি করেছিলাম।"

"কেমন করে তৈরি করেছিলে?"

"তার আগে তুমি কি তোমার প্রশ্নের উত্তর জানতে চাও না?"

"হ্যাঁ জানতে চাই।"

রিয়ানা নরম গলায় বলল, "তুমি প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলে আমি কি সাধারণ মানুষ নাকি ক্যাটাগরি-বি., তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তোমাকে আমরা এখানে এনেছি।" রিয়ানা নিচু গলায় বলল, "আমরা তোমার মতো ক্যাটাগরি-বি. মানুষ। আমরা তোমার মতোই সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করছি।"

সুহান বলল, "আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"মানুষকে ক্যাটাগরি-বি. হিসেবে ভাগ করে দিয়ে তাদেরকে উপেক্ষা করার ব্যাপারটা আসলে একটা খুব বড় হীন ষড়যন্ত্র। ক্যাটাগরি-বি. মানুষ কোনোভাবেই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ নয়। মানুষের মাঝে যে স্বাভাবিক বৈচিত্র্য আছে এটা তার ভেতরের একটা অংশ।"

"আমিও সেটা বিশ্বাস করি।"

"আমরা সবাই সেটা বিশ্বাস করি।" রিয়ানা বলল, "সেই বিশ্বাসের পেছনে যুক্তি আছে। বিজ্ঞানীদের একটা টিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেটা গবেষণা করে একটা রিপোর্ট দিতে। তারা অত্যন্ত সুন্দর একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন।"

সুহান জানতে চাইল, "সেই রিপোর্টটা কোথায়?"

"তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনে।"

সুহানকে ঘিরে অনেক নিরাপত্তাকর্মী বসে আছে, নিশ্চয়ই তাকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে, তাই অনেক কষ্ট করে সে তার মুখের বিস্ময়টুকু গোপন করার চেষ্টা করল। ফিসফিস করে বলল, "তোমরা সেই রিপোর্টটা উদ্ধার করার চেষ্টা করছ?"

"হ্যাঁ।"

"কিছুদিন আগে একজন মানুষকে তথ্যকেন্দ্রে খুন করা হয়েছিল, আমি তখন সেখানে ছিলাম, সে কি তোমাদের একজন?"

"হ্যাঁ, সে আমাদের একজন। সে আমাদের তোমার কথা বলেছে।"

সুহান অনেক কষ্ট করে মুখের বিস্ময়টুকু গোপন করে রেখে বলল, "সে কেমন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল? আমি নিজের চোখে দেখেছি তাকে রিগা গুলি করে মেরেছে—সে বের হতে পারে নি।”

“সে জানত সে কখনো বের হতে পারবে না। সে জানত তাকে গুলি করে মারা হবে। কিন্তু তবুও তোমার সাথে তার কী কথা হয়েছে আমরা সেটাও জানি।”

“কেমন করে জান?”

“আমি এখন তোমার সাথে যেভাবে কথা বলছি, ঠিক সেভাবে তার সাথেও কথা বলছিলাম। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কথা বলছিলাম।”

সুহান অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। রিয়ানা বলল, “আমরা তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। নিরাপত্তার অনেকগুলো স্তর পার হয়ে গেছি। আর একবার তথ্যকেন্দ্রের ভেতরে যেতে পারলে আমরা বিজ্ঞানীদের দেওয়া সত্যিকার রিপোর্টটা বের করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু ঠিক তখন হঠাৎ করে তুমি এসে হাজির হয়েছ। আমাদের সব পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে গেছে।”

“কেন?” সুহান অবাক হয়ে বলল, “আমি কী করেছি?”

“আমাদের অসম্ভব বড় একটা সৌভাগ্য যে তুমি এরকম বুদ্ধিমান একটা ছেলে, জেনে না জেনে এখন পর্যন্ত কোথাও তুমি একটা ছোট ভুলও কর নি। কিন্তু তোমার কারণে আমরা খুব বিপদের ভেতরে আছি। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।”

“আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি না।”

“বলছি তোমাকে। আমাদের হাতে কিন্তু খুব বেশি সময় নেই, আমরা ঝুঁকি নেব না—আমরা কিছুক্ষণের মাঝে উঠে যাব। তুমি আরো কিছু সময় বসে থেকে তারপর ফিরে যেও।”

“ঠিক আছে।” সুহান বলল, “এখন বলো আমি কীভাবে তোমাদের বিপদের মাঝে ফেলেছি।”

রিয়ানা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “পৃথিবীর ক্যাটাগরি-বি. মানুষরা যখন বুঝতে পারল তাদের বিরুদ্ধে খুব একটা অন্যায় ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তখন তাদের একটা ছোট দল অত্যন্ত বিচিত্র উপায়ে সংঘবদ্ধ হয়েছে।”

“সেটা কী রকম?

“আমরা প্রত্যেকেই আলাদা। প্রত্যেকটা মানুষের মস্তিষ্ক আলাদা, তাদের ভাবনা-চিন্তা আলাদা। মাঝে মাঝে অনেকে একসাথে বসে চিন্তা-ভাবনা করে পরামর্শ করে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে করে। আমাদের ভেতরে একজন বড় বিজ্ঞানী আছেন তিনি ঠিক করলেন আমাদের অনেকের মস্তিষ্ক একসাথে জুড়ে দেবেন। তখন আমরা আর আলাদা আলাদা মানুষ থাকব না, আমরা সবাই মিলে একজন মানুষ হয়ে যাব। আমাদের সবার মস্তিষ্ক মিলে একটা মস্তিষ্ক হয়ে যাবে। তাতে কী লাভ হবে বুঝতে পেরেছ?”

“হ্যাঁ। কাউকে না জানিয়ে নিজেরা যোগাযোগ রাখতে পারব। অত্যন্ত নিরাপদ।”

“হ্যাঁ। সেটা একটা কারণ। যেমন এই মুহূর্তে কয়েক ডজন নিরাপত্তাকর্মীদের নাকের ডগায় বসে আমরা কথা বলছি। তারা কিছু করতে পারছে না। কিন্তু সেটা বড় কারণ নয়।”

“বড় কারণটা কী?”

“বড় কারণটা হচ্ছে অনেক মানুষের মস্তিষ্ক যখন একসাথে কাজ করে তখন সবাই মিলে একটা সমন্বিত মানুষ হয়ে যায়। এই সমন্বিত মানুষটা আসলে একটা অতিমানব। তার বুদ্ধির কাছে কেউ আসতে পারে না। তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিন নিরাপত্তা ভেদ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ কোনো মানুষের যাওয়া অসম্ভব একটা ব্যাপার, কিন্তু আমরা গিয়েছি। তুমি নিজের চোখে দেখেছ। ক্যাটাগরি-বি. মানুষের এই অসম্ভব ক্ষমতার সামনে ষড়যন্ত্রকারীরা অসহায় হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তখন বিপদের শুরু হল। তোমাকে দিয়ে—"

"আমাকে দিয়ে?"

"হ্যাঁ। আমরা মানুষের মস্তিষ্ককে সমন্বিত করার জন্য ছোট একটা ইন্টেগ্রেটেড সার্কিট তৈরি করেছি। সেটা এমনভাবে কোড করা আছে যে ক্যাটাগরি-বি. মানুষ না হলে কাজ করবে না। মস্তিষ্কের ভেতর সেটা বসাতে হয়। সেটা বসানোর খুব দীর্ঘ পদ্ধতি আছে। আমরা মানুষটাকে পুরোপুরি আলাদা রেখে তার সাথে একজন একজন করে সমন্বয় করি। সেজন্য বিশেষ ড্রাগ রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করি। মানুষটা নিজে প্রস্তুত থাকে বলে সেও সহযোগিতা করে। খুব ধীরে ধীরে একজন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে—আমাদের একজন হয়ে ওঠে।"

সুহান ফিসফিস করে বলল, "আমার মাথার ভেতরে সেরকম একটা ইন্টেগ্রেটেড সার্কিট বসিয়ে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনে যাকে খুন করেছে তার মস্তিষ্কের ইন্টেগ্রেটেড সার্কিটটা এখন তোমার মাথায়। এটা যে কী ভয়ঙ্কর একটা কাজ তুমি জান না।"

"আমি অনুমান করতে পারি।"

"না তুমি অনুমান করতে পারবে না। যে প্রক্রিয়াটাতে অভ্যস্ত করার জন্য আমরা কয়েক মাস সময় নিই তোমাকে কয়েক সেকেন্ডের মাঝে সেখানে ঠেলে দেওয়া হল। তোমার পাগল হয়ে যাবার কথা ছিল।"

সুহান বলল, "হ্যাঁ। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।"

"তোমার ব্যক্তিগত যন্ত্রণা এবং বিপদ হচ্ছে একটা ব্যাপার। আমাদের নিরাপত্তা হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার। হঠাৎ করে তাদের একজন মানুষ আমাদের সবচেয়ে গোপন সার্কিটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না—অথচ তোমার মস্তিষ্ক আমাদের মস্তিষ্কের সাথে সমন্বিত, তুমি চিন্তা করতে পার?"

"হ্যাঁ। সেটা নিশ্চয়ই খুব বিপজ্জনক।"

"আমাদের এই সমন্বিত সত্তাটা হচ্ছে ক্যাটাগরি-বি. মানুষের একমাত্র আশা। আমরা পুরো ব্যাপারটাকে নেতৃত্ব দিই, আমরা সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি এই সময় সবাই যদি ধরা পড়ে যেতাম কী ভয়াবহ ব্যাপার হত তুমি চিন্তা করতে পার?"

সুহান কিছু না বলে চুপ করে রইল। রিয়ানা বলল, "আমাদের খুব সৌভাগ্য আমরা ধরা পড়ি নি—তুমি আমাদের রক্ষা করেছ। তোমার প্রতি আমাদের সবার কৃতজ্ঞতা।"

"কৃতজ্ঞতা জানাবার কিছু নেই। আমি যা করছি সেটা নিজের জন্য করেছি।"

"তুমি প্রথমে ছিলে আমাদের সবার সবচেয়ে বড় বিপদ। এখন তুমি হচ্ছ আমাদের সবচেয়ে বড় সুযোগ।"

"কীভাবে?"

"তুমি তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনের নিরাপত্তা প্রহরী। যেখানে ঢোকার জন্য আমাদের কয়েক মাস পরিকল্পনা করতে হয়, দু-একজনকে প্রাণ দিতে হয়, তুমি সেখানে যখন খুশি ঢুকতে পার এবং সবচেয়ে বড় কথা তুমি এখন আমাদের একজন। তুমি কি আমাদের সাহায্য করবে?"

"সেই বিষয়টি নিয়ে তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে রিয়ানা?"

"না নেই। তবুও আনুষ্ঠানিকভাবে জানার একটা ব্যাপার আছে। এতক্ষণ যদিও শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তোমার সাথে কথা বলছি কিন্তু আসলে সবাই আছে এখানে। আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকি, অনেক দূরে থাকি কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক একটা, আমাদের অস্তিত্ব একটা, ক্যাটাগরি-বি. মানুষদের রক্ষা করার জন্য আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে সমন্বিত অস্তিত্বকে গ্রহণ করেছি। আজ থেকে তুমি আমাদের সমন্বিত অস্তিত্বের একজন। তোমাকে আমরা গভীর ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ করছি সুহান।"

"তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।"

"এখন আর এখানে আমি এবং তুমি নেই। আমরা সবাই এক!"

সুহান হঠাৎ প্রথমবার তৃতীয় একজন মানুষের কণ্ঠস্বর নিজের মস্তিষ্কে শুনতে পেল, "সুহান, আমি থিরু। তোমাকে আমাদের মাঝে সত্যিকার অর্থে সমন্বয় করার জন্য আমাদের আরো একটা জিনিস দরকার হবে।"

"সেটা কী থিরু?"

"তোমার জিনেটিক কোডিং। সেটা বের করার জন্য আমাদের দরকার তোমার মাথার একটা চুল কিংবা এক ফোঁটা রক্ত।"

"আমি সেটা কীভাবে দেব?"

"তুমি তোমার টেবিলে মাথার একটা চুল ফেলে যেও। সেটাই সহজ। আমরা তুলে নেব।"

"ঠিক আছে থিরু।"

সুহান আবার রিয়ানার কথা শুনতে পেল, "আমরা এখন যাচ্ছি সুহান।"

"ঠিক আছে।"

"আমরা নিশ্চয়ই একদিন পাশাপাশি বসব—একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকাব, মুখ দিয়ে কথা বলব, কান দিয়ে শুনব, একজন আরেকজনকে স্পর্শ করব।"

"নিশ্চয়ই করব রিয়ানা। নিশ্চয়ই করব।"

AMARBOI.COM

সাত

সুহান খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করে নিরাপত্তা বাহিনীকে ধোঁকা দেওয়া শুরু করল। প্রথমে সে তার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে জানতে চাইল সে কয়েকজন মানুষের কথা শুনতে পাচ্ছে তার কোনো গুরুত্ব আছে কি না। ডাক্তার জানতে চাইল কথাগুলো কী। সুহান বলল কথাগুলো ব্যক্তিগত কথা—অর্থ নেই, মনে হয় কয়েকজনের কথোপকথন। তবে কয়েকবার নেপচুন এভিনিউ কথাটা শুনতে পেয়েছে। ডাক্তার জানতে চাইল কত নম্বর নেপচুন এভিনিউ। সুহান যদিও খুব ভালো করে জানে তার বলার কথা ৩৭ নেপচুন এভিনিউ তারপরও সে ইতস্তত করে বলল তার ভালো করে মনে নেই সেটা ২৭ কিংবা ৩৭ কিংবা অন্য যে কোনো সংখ্যা হতে পারে।

এই তথ্যটা পৌঁছে দেওয়ার পরদিন থেকে সুহানের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। নিরাপত্তা বাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তারা তার সাথে দেখা করতে এলে তাকে একটা শক্তিশালী ভিডিফোন দিয়ে বলে গেল যে কোনো প্রয়োজনে সে এটা ব্যবহার করতে পারবে। হঠাৎ করে সে যদি তার মস্তিষ্কের ভেতর কোনো কথা শুনতে পায় এবং সেটা ডাক্তারকে জানাতে হয় সে যেন এটা ব্যবহার করতে কোনো দ্বিধাবোধ না করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিশালী ভিডিফোনটা হাতে নিয়ে তার অনাথাশ্রমের রুমমেটদের কথা মনে পড়ল। তার খুব ভিডিফোনের শখ ছিল—যদি তাদের কারো কাছে ব্যক্তিগত ভিডিফোন থাকত তা হলে সে এখন তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারত। এখন করতে হলে সেটা করতে হবে অফিসের মাধ্যমে—তার যন্ত্রণা অনেক। হঠাৎ করে সে তার অনাথাশ্রমের বন্ধুদের অভাব অনুভব করতে থাকে। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে তাদের সাথে দেখা করতে যাবে।

সুহান দুদিন পর আবার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করল। ঘণ্টা দুয়েক আগে রিয়ানা মস্তিষ্কের ভেতরে খবর দিয়ে গেছে ডাক্তারকে কী বলতে হবে। অতলান্ত স্ট্রিটে একটা সুপার মার্কেটে সি ফুডের দোকানের সামনে রিহা আর কিলি নামে দুজন থাকবে। সুহান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "দুজন মানুষকে ধরিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ।" রিয়ানা বলেছিল, "আমরা যেভাবে সম্ভব তোমাকে সন্দেহের বাইরে রাখতে চাই। দরকার হলে আমাদের দুএকজন মানুষকে ধরিয়ে দিয়েও।"

সুহান জিজ্ঞেস করল, "যাদেরকে ধরিয়ে দিচ্ছি তারা জানে?"

"হ্যাঁ তারা স্বেচ্ছায় ধরা দিতে রাজি হয়েছে।"

"তাদের কী করবে?"

রিয়ানা বলেছিল, "আমরা জানি না। যদি ভাগ্য ভালো থাকে বেঁচে থাকবে।"

সুহান আর কথা বাড়ায় নি, সে বিশাল একটা পরিকল্পনার অংশ। তাকে যেটা করতে হবে সে সেটা করবে, এ ছাড়া উপায় কী?!

ভিডিফোনে যোগাযোগ করতেই ডাক্তার উদগ্রীব গলায় বলল, "কী হয়েছে সুহান?"

"আমি কিছুতেই ঘুমাতে পারছি না। আমি কি একটু ঘুমের ওষুধ খেতে পারি?"

"তার আগে শুনি কেন ঘুমাতে পারছ না? কী হয়েছে?"

"একজন মানুষ ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না।"

"কী নিয়ে কথা বলছে?"

"দুজন মানুষের সাথে দেখা করা নিয়ে মানুষটা খুব দুশ্চিন্তা করছে।"

"মানুষটা কে?"

সুহান অধৈর্য গলায় বলল, "আমি কেমন করে বলব? আমার মস্তিষ্কে কি আর বাইরের মানুষ কথা বলতে পারে? নিশ্চয়ই আমার অবচেতন মন আমার সাথে কথা বলছে।"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলল, "তা ঠিক। তা ঠিক। নিশ্চয়ই তোমার অবচেতন মন।"

"আমাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিন। খেয়ে অবচেতন এবং চেতন মন দুটোকেই কাবু করে ঘুমিয়ে থাকি।"

"দেব। নিশ্চয়ই দেব।" ডাক্তার বলল, "তার আগে শুনি তোমার অবচেতন মন কার সাথে দেখা করা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে।"

"দুজন মানুষ। একজনের নাম রিহা আরেকজন কিলি।"

"তুমি কি রিহা আর কিলি সম্পর্কে আর কিছু জান?"

"হ্যাঁ। অনেক কিছু জানি—কিন্তু তার কি কোনো গুরুত্ব আছে? পুরোটা নিশ্চয়ই আমার কল্পনা।"

ডাক্তার গম্ভীর গলায় বলল, "কিন্তু তবু ডাক্তার হিসেবে আমার শুনে রাখা উচিত।"

সুহান গলার স্বরে এক ধরনের বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, "রিহা আর কিলি নাকি অতলান্ত স্ট্রিটে একটা সুপার মার্কেটে সি ফুডের দোকানে যাচ্ছে।"

"ও আচ্ছা।"

"আমি এখন কী করব ডাক্তার?"

"তুমি বিশ্রাম নাও। তোমার জন্য আমি যে ঘুমের ওষুধ দিয়েছি তার দুটি খেয়ে ঘুমিয়ে যাও।"

সুহান দুটি ঘুমের ওষুধ টয়লেটে ফ্ল্যাশ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমানোর জন্য তার কখনোই ঘুমের ওষুধের দরকার হয় না।

সুহান খুব ধীরে ধীরে তার মাথার ইন্টেগ্রেটেড সার্কিটে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে। যে মানুষগুলোর সাথে তাকে সমন্বয় করেছে সে একজন একজন করে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে শিখেছে। একসাথে তাদের সবার সাথে কোনো কিছু নিয়ে ভাবতে পারে, জটিল কোনো সমস্যার সমাধান বের করতে পারে। তার জন্য সবচেয়ে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হচ্ছে অন্যের চোখ দিয়ে দেখা। ঠিক কী কারণ জানা নেই, সবার সাথে সে সমান দক্ষতা দিয়ে কাজ করতে পারে না। থিরু নামের তরুণটার সাথে তার সবচেয়ে ভালো সমন্বয় হল—খুব মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করলে সে থিরুর চোখে দেখতে পায়। প্রথমবার যখন দেখতে পেল তখন থিরু একটা মনিটরের সামনে বসে কাজ করছে। সুহান এক মুহূর্তের জন্য আবছাভাবে মনিটরটা দেখতে পেল এবং হঠাৎ করে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুহান ফিসফিস করে বলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি থিরু।"

থিরু বলল, "চমৎকার। তুমি আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য—তোমাকে অন্যের চোখে দেখা শিখতে হবে। অন্যের মস্তিষ্কে ভাবতে হবে।"

"আমি চেষ্টা করব।"

"যখন তুমি পুরোপুরি অন্য মানুষ হয়ে যেতে পারবে তখন বুঝতে পারবে যে তুমি সমন্বিত মানুষ হতে পেরেছ। সেজন্য তোমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে।"

সুহান তাই চেষ্টা করে যেতে থাকে। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকরা তাকে এখন অনেক স্বাধীনতা দিয়েছে। রিহা আর কির্লিকে ধরিয়ে দেবার পর তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। সে কবে তার কাজে ফিরে যেতে পারবে জানতে চেয়েছে, নিরাপত্তা দপ্তর থেকে জানিয়েছে খুব শিগগিরই।

সুহান সেজন্য অপেক্ষা করে আছে। তাকে যেদিন কাজে যেতে দেবে সেদিনই তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনে শেষবার হানা দেবার কথা। সুহান তার প্রস্তুতি নিচ্ছে, সম্ভবত তাকেই হানা দিতে হবে—তথ্যকেন্দ্রটা তার চাইতে ভালো করে আর কেউ জানে না। অন্য সবার সাথে সমন্বিত হয়ে থাকবে সে, তাকে কী করতে হবে সবাই বলে দেবে। তথ্যকেন্দ্রের শেষ কোডটা ভেঙে তাকে বিজ্ঞানীদের সেই রিপোর্ট নেটওয়ার্কে দিয়ে দিতে হবে। মুহূর্তের মাঝে পৃথিবীর সবাই জেনে যাবে ক্যাটাগরি-বি. নামের ধারণাটা আসলে একটা বিশাল প্রতারণা, একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র।

সুহান ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। তাকে পুরোপুরি সুস্থ হবার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী অপেক্ষা করছে। ক্যাটাগরি-বি. মানুষের সমন্বিত দলটাও অপেক্ষা করছে সেজন্য।

এর মাঝে একদিন সুহান তার জীবনের সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজটা করল। সে অবিশ্যি একা একা করল না, তাকে সবাই মিলে সাহায্য করল। সে ভোরবেলা ঘর থেকে বের হচ্ছে ঠিক তখন সে তার মস্তিষ্কে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "সুহান।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কে? রিয়ানা?"

"হ্যাঁ"

"আজকে তুমি আমাদের কাছে আসবে? তোমার সাথে আমাদের সবার দেখা হবে।"

সুহান অবাক হয়ে বলল, "আজকে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু সেটি কীভাবে সম্ভব? নিরাপত্তাকর্মীরা আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।"

রিয়ানা শব্দ করে হাসল। বলল, "সেটা তুমি আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। ঠিক আছে?"

সুহান একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু আমি যে একেবারেই প্রস্তুত নই। যদি এক-দুই দিন আগে বলতে—"

"আমরা ইচ্ছে করে তোমাকে এক-দুই দিন আগে বলি নি। আমরা অনেক দিন থেকে প্রস্তুতি নিয়েছি, তোমার প্রস্তুতি নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। একটু পরেই তুমি দেখবে।"

সুহান বলল, "ঠিক আছে।"

"চমৎকার।"

"আমি তা হলে কী করব?"

"প্রত্যেকদিন যা কর ঠিক তাই করবে। ঘর থেকে বের হয়ে লিফটে উঠবে। লিফটে তোমার সাথে একজনের দেখা হবে—চমকে উঠো না তাকে দেখে—ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"এখন ঘর থেকে বের হও সুহান।"

সুহান ঘর থেকে বের হল। লম্বা করিডোর ধরে হেঁটে সে লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। লিফটের বোতাম স্পর্শ করে সে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকে। লিফটটি প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল, দরজা খুলতেই সে ভেতরে এসে ঢুকল, একজন মানুষ তাকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লিফটটি চলতে শুরু করতেই মানুষটি ঘুরে তার দিকে তাকাল। সুহান ভয়ানক চমকে ওঠে, মানুষটি হুবহু তার মতো। মানুষটি তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমাদের হাতে সময় নেই। এই লিফটা নিচে পৌছানোর আগে আমি যেরকম করে সুহান হয়েছি, তোমাকে সেরকমভাবে থিরুু হয়ে যেতে হবে!"

সুহান ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু—কিন্তু—"

মানুষটি একটি রবারের মাস্ক হাতে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দেয়, "এটা মুখে লাগিয়ে নাও। ঠিক তোমার মুখের মাপে তৈরি করা হয়েছে।"

"আমি আগে কখনো মাস্ক পরি নি—"

সুহানের মতো মানুষটি নরম গলায় বলল, "আমরা কেউই আগে অনেক কিছু করি নি। এখন করি। করতে হয়।"

সুহান মাস্কটি মুখে লাগিয়ে নেয়, চটচটে এক ধরনের আঠালো জিনিস তার মুখের সাথে লেগে যায়। সুহানের মনে হতে থাকে তার নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে আসবে। মানুষটি বলল, "তুমি নার্ভাস হয়ো না, এক্ষুনি অভ্যস্ত হয়ে যাবে।"

কথাটি সত্যি, কিছুক্ষণেই সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। মানুষটি নরম গলায় বলল, "এখন তোমার জ্যাকেটের সাথে আমার জ্যাকেট পাল্টে নিতে হবে। তোমার জ্যাকেটের পকেটে তোমার কার্ডটা আছে তো?"

"আছে।"

"চমৎকার।"

মানুষটি জ্যাকেট পাল্টে নিতে নিতে বলল, "তোমার যা যা দরকার সব তোমার পকেটে পাবে।"

সুহানের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "সকাল সাড়ে দশটার সময় মেডিক্যাল কিটে আমার রক্ত পরীক্ষা করা হয়—"

মানুষটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "জানি। এজন্য তোমার একটু রক্ত নেব।"

সুহান দেখল লোকটা তার পকেট থেকে একটা সিরিঞ্জ বের করেছে। কিছু বোঝার আগেই সুহান তার কনুইয়ের কাছে একটা খোঁচা অনুভব করল। মানুষটি হাসি হাসি মুখে বলল, "আমরা নিচে নেমে গেছি। আমি আগে বের হব। তুমি একটু পরে।"

"আমি এখন কী করব?"

"সেটা নিয়ে চিন্তা করো না। রিয়ানা তোমাকে বলে দেবে। শুধু একটা জিনিস মনে রেখো।"

"কী?"

"তুমি এখন সুহান নও। তুমি এখন থিরু।"

নিঃশব্দে লিফটের দরজা খুলে গেল। কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাঝে কেউ নিশ্চয়ই নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষ। সুহান লিফট থেকে বের হয়ে এল। তার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড ধকধক করতে থাকে। সুহানের মতো মানুষটি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে ঠিক যেভাবে সুহান হেঁটে যায়। সুহান চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ করল মানুষটি কফি হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যে কফি হাউসে সুহান যায়। খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ তাকে অনুসরণ করছে।

সুহান একটা নিশ্বাস ফেলে দুই পা অগ্রসর হতেই সে তার মস্তিষ্কে একটা পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "সুহান।"

"বলো রিয়ানা।"

"আমরা একটা হলুদ রঙের ট্যাক্সিতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"কোথায়?"

"ডান দিকে কয়েকশ মিটার সামনে। তুমি এস।"

"ঠিক আছে।"

সুহান রাস্তায় নেমে ডান দিকে হাঁটতে থাকে। মানুষজন যাচ্ছে–আসছে। রাস্তায় বাস, ট্রাম, গাড়ি এবং ট্যাক্সি। সুহান ফুটপাত ধরে এগিয়ে যায়, সামনে রাস্তার পাশে একটা হলুদ রঙের ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে, সে কাছে আসতেই তার দরজা খুলে গেল। সুহান রিয়ানার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "ভেতরে ঢুকে যাও, সুহান।"

সুহান ভেতরে ঢুকে গেল। পেছনের সিটে রিয়ানা বসে আছে, তার দিকে তাকিয়ে সে মুখ টিপে হাসল, বলল, "কেমন আছ সুহান?"

"ভালো।"

ট্যাক্সিটা গর্জন করে ছুটে যেতে শুরু করতেই রিয়ানা বলল, "এর ভেতর আমরা নিরাপদ কিন্তু তবু আমরা কোনো ঝুঁকি নেব না।"

"তার অর্থ আমরা মুখে কথা বলব না?"

"ঠিক ধরেছ। আগে আমরা নিজেদের আস্তানায় চলে যাই।" রিয়ানা ট্যাক্সির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, "জেরিকো, তুমি আমাদের পিয়ারে নিয়ে যাও।"

ড্রাইভার রিয়ানার দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ।"

"রিয়ানা, সেখানে কিন্তু গার্ড বসিয়েছে।"

"সেজন্যই যেতে চাইছি। জায়গাটা আজ নিরাপদ হবে।"

ড্রাইভার ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে সমুদ্রোপকূলের দিকে নিতে থাকে। রিয়ানা সুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার পকেটে কিছু রক্তের প্যাঁচ পাবে। আঙুলের মাঝে লাগিয়ে নাও। গার্ড যদি জিনেটিক কোডিং করার জন্য তোমার রক্ত নিতে চায় তা হলে থিরুর রক্ত পাবে।"

সুহান তার পকেটে স্টিকারের মতো ছোট ছোট প্যাঁচগুলো খুঁজে পেল। তার আঙুলের ডগায় সেগুলো লাগিয়ে নেয়—দেখে বোঝার উপায় নেই কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করার জন্য রক্ত নেওয়া হলে সুহানের রক্তের বদলে থিরুর রক্ত পাবে। সুহান একটু অবাক হয়ে বলল, "তোমরা খুঁটিনাটি সবকিছু ভেবে রেখেছ?"

"হ্যাঁ। যে মানুষটি আজকে সুহান হয়ে তোমার বাসায় থাকবে তাকে দেখে বুঝতে পার নি?"

"পেরেছি। গলার স্বরটা পর্যন্ত আমার মতো।"

"হ্যাঁ।" রিয়ানা বলল, "শুধু রেটিনাটা তোমার মতো করতে পারি নি। তোমাকে তো আগে পাই নি—এই প্রথমবার পেয়েছি। এখন তোমার সব ধরনের প্রোফাইল নিয়ে নেব।"

ট্যাক্সির ড্রাইভার নিচু গলায় বলল, "সামনে গার্ড, রিয়ানা।"

"ঘাবড়ানোর কিছু নেই জেরিকো।"

রিয়ানা সুহানের দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গি করে একটু হাসল।

স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা কঠোর চেহারার একজন ট্যাক্সিটি দাঁড়াতেই রিয়ানা জানালার কাচ নামিয়ে দিয়ে মাথা বের করল। কঠোর চেহারার গার্ডটা ভাবলেশহীন মুখে বলল, "কার্ড।"

রিয়ানা এবং রিয়ানার দেখাদেখি সুহান তার কার্ডটি বের করে দেয়। কার্ডটি স্ক্যান করে গার্ডটি তীক্ষ্ণ চোখে তাদের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

"পিয়ারে।"

"কেন?"

"আমরা সেখানে কাজ করি।"

গার্ড রক্ত পরীক্ষা করার ছোট যন্ত্রটা তাদের দিকে এগিয়ে দেয়, রিয়ানা ভেতরে আঙুল প্রবেশ করে গার্ডের সাথে অনেকটা খোশগল্প করার ভঙ্গি করে বলল, "আজ অনেক কড়াকড়ি, কিছু হয়েছে নাকি?"

গার্ড তার নাক দিয়ে একটা শব্দ করে বলল, "সব সময় কিছু না কিছু হচ্ছে।"

সুহানের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটি ধকধক করে শব্দ করছে। গার্ড তার দিকে যন্ত্রটা এগিয়ে দিয়েছে, যদি ঠিক ঠিক রক্ত না নিতে পারে সে এক্ষুনি ধরা পড়ে যাবে। সুহান ফ্যাকাসে মুখে গার্ডের দিকে তাকাল। ঠিক তখন শুনল তার মস্তিষ্কে রিয়ানা কথা বলছে, "কোনো ভয় নেই সুহান, তোমার আঙুলটা ঢোকাও।"

সুহান কাঁপা হাতে আঙুলটি যন্ত্রের ভেতর প্রবেশ করাল, সূক্ষ্ম একটা খোঁচা অনুভব করল সাথে সাথে। গার্ড ভুরু কুঁচকে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে, ঘুরে একবার সুহানের দিকে তাকাল, তারপর হাত নেড়ে তাদের চলে যেতে বলল। ট্যাক্সিটি চলতে শুরু করা মাত্র সুহান তার বুকের ভেতর আটকে থাকা নিশ্বাসটি বের করে দেয়। রিয়ানা তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, "খুব ভয় পেয়েছিলে। তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুহান মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"তোমার কোনো ভয় নেই সুহান। তুমি হচ্ছ আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সদস্য—আমরা কিছুতেই তোমাকে ধরা পড়তে দেব না।"

"যদি কিছু একটা গোলমাল হয়ে যেত গার্ডের ওখানে?"

"সেজন্য আমাদের প্ল্যান বি. রেডি আছে।"

"সেটি কী?"

"আমরা রক্তপাত পছন্দ করি না তাই প্ল্যান বি. রক্তপাতহীন পরিকল্পনা। সেটাও যদি গোলমাল হয়ে যায় তখন প্ল্যান সি কাজে লাগাতে হয়। সেখানে খানিকটা রক্তপাত আছে।"

সুহান এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে রিয়ানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ট্যাক্সিটা থামার পর দরজা খুলে রিয়ানা এবং রিয়ানার পিছু পিছু সুহান বের হয়ে আসে। একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দুজন উপরে উঠে যায়। একটা দীর্ঘ করিডোর ধরে দুজন হেঁটে বড় একটা হলঘরে এসে পৌঁছাল। হলঘরের একপাশে খোলা জানালা। সেদিকে আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র এবং সমুদ্রের নোনা বাতাস ঘরের ভেতরে লুটোপুটি খাচ্ছে। হলঘরের ভেতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেশ কিছু মানুষ বসে আছে। সুহান এবং রিয়ানাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল।

রিয়ানা অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, "আমার প্রিয় কমরেডস—তোমাদের সবার সামনে উপস্থিত করেছি আমাদের সবচেয়ে নতুন সদস্য সুহানকে!"

মধ্যবয়স্কা একজন মহিলা রহস্য করে বলল, "আগে মাস্ক খুলুক তারপর বিশ্বাস করব। তোমাদের আমি বিশ্বাস করি না!"

রিয়ানা হাসতে হাসতে সুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "মাস্কটা খোলো সুহান।"

"আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে না?"

"ফিরে যাবার সময় তোমাকে আবার আমরা থিরু বানিয়ে দেব। তোমার সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।"

সুহান তার ঘাড়ের কাছে খিমচে ধরে মাস্কটা টেনে খোলার চেষ্টা করতে থাকে। কমবয়সী একজন তরুণ এসে তাকে সাহায্য করল, পাতলা মাস্কটি খুলে এল সহজেই।

উপস্থিত সবাই একটা আনন্দের শব্দ করল। সুহান কী করবে বুঝতে না পেরে সবার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল।

একজন বয়স্ক মানুষ এগিয়ে এসে সুহানের হাত স্পর্শ করে বলল, "এস সুহান, এতদিন আমরা তোমার কথা শুনেছি, আজ চোখে দেখতে পেলাম।" বয়স্ক মানুষটি সহৃদয় ভঙ্গিতে হেসে বলল, "আমার নাম পিরান। ডক্টর পিরান।"

রিয়ানা বলল, "ডক্টর পিরান আমাদের মূল মস্তিষ্ক। আমাদের মস্তিষ্ক সমন্বয়ের পুরো ব্যাপারটি ডক্টর পিরানের পরিকল্পনা।"

ডক্টর পিরান বলল, "বুঝলে সুহান, এখন সবাই মস্তিষ্ক সমন্বয়ের কথায় একেবারে আবেগে আপ্লুত। প্রথম যখন বলেছিলাম তখন কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না।"

কমবয়সী তরুণটি বলল, "বিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল? আমার মাথা ফুটো করে সেখানে একটা ইন্টেগ্রেটেড সার্কিট বসানো হবে সেটা মেনে নেওয়া কি এত সোজা?"

রিয়ানা বলল, "ঠিক আছে কুরু। তোমাদের ঝগড়াঝাঁটি-হইচই পরে হবে। সুহান প্রতিদিন সকালে বের হয়ে কফি হাউসে গিয়ে এক মগ কফি খায়। আজ তার জায়গায় কফি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়েছে থিরু। সুহানের এখনো কফি খাওয়া হয় নি—তাকে এক কাপ কফি খাওয়ানো যাক।”

মধ্যবয়স্কা মহিলাটি বলল, “শুধু কফি নয়, কফির সাথে খাওয়ার জন্য চমৎকার কিছু প্যাস্ট্রি আনিয়ে রেখেছি। এস সবাই।”

পেস্ট্রি এবং কফি খেতে খেতে সবার সাথে হালকা কথাবার্তা হল। সুহানের সবার সাথে পরিচয় হল—মস্তিষ্কের সমন্বয় হয়ে আছে বলে তাদের সবার চিন্তাভাবনার সাথে সে জড়িয়ে আছে, এই প্রথমবার তাদেরকে সে দেখছে। খাওয়া শেষ হবার সাথে সাথেই সবাই কাজে লেগে যায়। সুহানের শরীরের মাপ নেওয়া হয়, চোখের আইরিস, রেটিনার ছবি নেওয়া হয়। মস্তিষ্কের স্ক্যান করা হয়, শরীরের ভেতরকার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ত্রিমাত্রিক ছবি নেওয়া হয়। মস্তিষ্কের ভেতরে বসানো ইন্টেগ্রেটেড সার্কিটের ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়। গলার স্বরে নিখুঁত প্রোফাইল বের করা হয়। সবকিছু যখন শেষ করা হয়েছে তখন অপরাহ্ন হয়ে এসেছে।

রিয়ানা বলল, “সুহান, তোমার ফিরে যাবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে।”

সুহান খোলা জানালা দিয়ে বাইরে আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “হ্যাঁ। আমি প্রস্তুত।”

রিয়ানা সুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি কি ফিরে যাবার আগে সমুদ্রের বালুবেলায় একটু হাঁটতে চাও?”

সুহান উজ্জ্বল চোখে বলল, “সময় হবে আমাদের?”

“অবশ্যই হবে। এস।”

সুহান সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিয়ানার সাথে সাথে একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সমুদ্রের বালুবেলায় নেমে এল। দুজনে হেঁটে হেঁটে সমুদ্রের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়, সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে, সুহান এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পর রিয়ানার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি আগে কখনো সমুদ্র দেখি নি।”

রিয়ানা নরম গলায় বলল, “জীবনে প্রথমবার সমুদ্র দেখা অত্যন্ত বড় একটা অভিজ্ঞতা।”

“আমি একটা অনাথাশ্রমে বড় হয়েছি। তথ্যকেন্দ্রের এই চাকরিটা না পেলে হয়তো অনাথাশ্রমের দেয়ালে কিংবা কোনো একটা ইউরেনিয়াম খনি ছাড়া আর কিছু দেখতামই না।”

রিয়ানা কোনো কথা না বলে সুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। সুহান নিচু গলায় বলল, “অনাথাশ্রমে আমার যেসব বন্ধুবান্ধব আছে তারা কেউ কোনো দিন সেখান থেকে বের হয় নি। পৃথিবীর কোনো সৌন্দর্য দেখে নি। পৃথিবী যে কত সুন্দর তারা জানে না। কারণ তারা ক্যাটাগরি-বি. মানুষ।”

রিয়ানা সুহানের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, “আমরা তার পরিবর্তন করব সুহান।”

সুহান ঘুরে রিয়ানার দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বলল, “কিন্তু কেন পরিবর্তন করে সেটা ঠিক করতে হবে? কেন সেটাই হল না?” সুহান হাত দিয়ে সমুদ্রটাকে দেখিয়ে বলল, “দেখ এই সমুদ্রটাকে দেখ—কী বিশাল! এই পৃথিবীটা দেখ—কী বিশাল! আর তার মাঝে আমাদের মতো মানুষের কোনো জায়গা নেই—এটা কি হতে পারে?”

রিয়ানা একটা নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। বলল, “না, সুহান এটা হতে পারে না। এটা হবে না।”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু সেটাই তো হচ্ছে। আইন করে ক্যাটাগরি-বি. মানুষকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে—"

"কিন্তু আমরা কি সেটা হতে দেব? তথ্যকেন্দ্র থেকে আমরা যখন বিজ্ঞানীদের সেই রিপোর্ট বের করে পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেব তখন এক মুহূর্তে পুরো অবস্থাটা পাল্টে যাবে।"

সুহান রিয়ানার দিকে তাকাল, "আমরা কি পারব রিয়ানা?"

রিয়ানা একটু হাসার চেষ্টা করল। বলল, "সব এখন তোমার ওপর নির্ভর করছে সুহান।"

"কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমি যে তথ্যকেন্দ্র, সার্ভার, নেটওয়ার্ক এসব কিছুই জানি না। আমি কি পারব প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে?"

"পারবে। কারণ আমরা সবাই তোমার মস্তিষ্কের সাথে সমন্বিত হয়ে থাকব। আমরা সবাই তোমাকে সাহায্য করব।"

সুহান বুকের ভেতর আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে দেয়। পারবে সে—নিশ্চয়ই পারবে। সে যদি না পারে তা হলে ক্যাটাগরি-বি. মানুষেরা কখনোই মানুষের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না।

রিয়ানা সুহানের হাত স্পর্শ করে বলল, "চলো সুহান আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"চলো।"

"তোমার মাস্কটা পরে নিয়ে তোমাকে আবার থিরু হয়ে যেতে হবে।"

সুহান মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। চলো আবার থিরু হয়ে যাই।"

দুজনে বালুবেলা ধরে হাঁটতে থাকে। সমুদ্রের ঢেউ একটু পরপর আছড়ে পড়ছে কিন্তু সুহান সেটি আর শুনছে না, সে হঠাৎ কেমন জানি আনমনা হয়ে ওঠে।

আট

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার সুহানকে তার কাজে ফিরে যাবার অনুমতি দিল। তার শরীরের রক্ত, ত্বক, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্ক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বলল, "তুমি এখন পুরোপুরি সুস্থ সুহান। তুমি এখন তোমার কাজে ফিরে যেতে পার।"

কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে সুহানের বুকের ভেতর রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। সে বলল, "আমি কাজে ফিরে যেতে পারব?"

"হ্যাঁ।"

"কখন যেতে পারব ডাক্তার?"

"ইচ্ছে করলে কালকেই। আমি তোমার সুস্থ দেহের সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি।"

"অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার।"

"তোমার মস্তিষ্কের কথাগুলোর খবর কী?"

"এখনো হয়। তবে আমি সেগুলো নিয়ে বেঁচে থাকতে শিখে গেছি! মাথার ভেতরে কথা হলে আমি সেগুলো শুনেও শুনি না!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ও আচ্ছা। ও আচ্ছা।" ডাক্তার একটু ইতস্তত করে বলল, "তবুও তুমি যদি কখনো মনে কর আমাদের জানানো দরকার তা হলে আমাদের জানিও।"

"অবশ্যই জানাব।" সুহান সরল মুখ করে হেসে বলল, "তুমি এত বড় ডাক্তার, আমার জীবন বাঁচিয়েছ, তোমাকে যদি না জানাই তা হলে কাকে জানাব?"

সুহানের কথায় কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে ডাক্তার মানুষটা খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

সুহান বাসায় এসে দীর্ঘ সময় চুপচাপ জানালার কাছে বসে থাকে। সে আগামীকাল কাজে ফিরে যাবে, আগামীকাল হবে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। সে কি পারবে তার ওপর দেওয়া এত বড় দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে? সে কি সেখান থেকে বেঁচে আসতে পারবে? তার চোখের সামনে বারবার একটি দৃশ্য ভেসে আসে, একজন মানুষ শান্ত মুখে কী-বোর্ডের সামনে বসে কাজ করছে, আর রিগা একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে তাকে গুলি করছে—একবার দুইবার অনেকবার। সুহান নিজের অজান্তেই শিউরে ওঠে, জোর করে সে চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দেয়।

সুহান উঠে দাঁড়াল, ঘরের ভেতরে কয়েকবার পায়চারি করে সে তার ভিডিফোনটা তুলে নেয়, তার হঠাৎ কোনো একজন আপনজনের সাথে কথা বলার ইচ্ছে করছে। সে ভিডিফোনে ডায়াল করল, তার অনাথাশ্রমের ডিরেক্টর লারার সাথে সে কথা বলবে। ডায়াল করতেই স্ক্রিনে লারার ছবি ভেসে ওঠে, সুহানকে দেখে তার মুখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, প্রায় চিৎকার করে বলে, "সুহান! তুমি?"

"হ্যাঁ লারা, আমি।"

"এতদিন পরে তোমাকে দেখে কী ভালো লাগছে আমার!"

সুহান বলল, "আমারও খুব ভালো লাগছে।"

"তুমি নিশ্চয়ই খুব ভালো করছ সুহান।" লারা আনন্দিত গলায় বলল, "তোমার নিজের ভিডিফোন হয়েছে।"

সুহান ম্লান মুখে বলল, "সেটা এমন কিছু নয়। তোমাদের কথা বলো লারা। সবাই কেমন আছ?"

"সবাই—সবাই—" লারা একটু ইতস্তত করে বলল, "আছে একরকম।"

"রুরাক কেমন আছে লারা?"

"ভালোই আছে। একটু চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল।"

"দিনিয়া? দ্রুমা?"

"দিনিয়া আগের মতোই আছে। কিন্তু দ্রুমা—"

সুহান উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "কী হয়েছে দ্রুমার?"

"কিছুদিন আগে তার আবার অ্যাটাক হল, মস্তিষ্কের একটা ধমনি ফেটে গিয়েছিল। দু দিন কোমায় ছিল।"

সুহান নিচু গলায় বলল, "ও।"

"তুমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না সুহান। নিজের কাজ করে যাও।"

"হ্যাঁ করব।" সুহান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "লারা।"

"বলো।"

"তুমি রুরাক দিনিয়া কিশি সবাইকে আমার ভালবাসা জানিয়ে দিও।"

"দেব। নিশ্চয়ই দেব।"

AMARBOI.COM

"তোমার জন্যও অনেক ভালবাসা লারা।"

লারা সুন্দর করে হাসল, বলল, "তোমার জন্যও সুহান।"

ভিডিফোনটা রেখে দিয়ে সুহান আবার নিজের ভেতরে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। নিঃসঙ্গতাকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে যখন তার জানালার সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তখন সে তার মস্তিষ্কের ভেতর রিয়ানার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "সুহান।"

"বলো রিয়ানা।"

"কালকে আমাদের সেই দিন।"

"হ্যাঁ।"

"তোমার ভয় করছে সুহান?"

সুহান একটু হাসল, বলল, "আমাদের মস্তিষ্ক সমন্বিত, তুমি তো জান রিয়ানা আমার কেমন লাগছে।"

"হ্যাঁ, জানি। পুরোটুকু জানি না, অনেকখানি জানি। ভয়ের কিছু নেই সুহান। আমরা সবাই তোমার সাথে একসাথে আছি।"

সুহান কোনো কথা বলল না। রিয়ানা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কাল তোমার সবচেয়ে গভীরভাবে সমন্বয় করতে হবে থিরুর সাথে। থিরু আমাদের সার্ভার, নেটওয়ার্ক, ডাটাবেস আর সিকিউরিটি এক্সপার্ট।"

"আমি চেষ্টা করব।"

"আমার মনে হয় এখন থিরুর সাথে তুমি একটা সেশন কর।"

"ঠিক আছে।" সুহান ডাকল, "থিরু। থিরু তুমি কোথায়?"

"এই যে, আমি এখানে।" থিরু তার স্বাভাবিক শান্ত গলায় বলল, "আমি তোমার চোখ দিয়ে দেখতে চাই সুহান।"

"আমি চেষ্টা করছি।"

সুহান তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, কয়েক মুহূর্তের মাঝে থিরুর সাথে সে পুরোপুরি সমন্বিত হয়ে যায়। সুহান দেখতে পায় সে একটি মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। মনিটরে নানা ধরনের সংখ্যা খেলা করছে। তার সামনে কী-বোর্ড, কী-বোর্ডে তার আঙুলগুলো যন্ত্রের মতো ছোটাছুটি করছে। সে থিরুর মতো দেখছে, থিরুর মতো শুনছে, থিরুর মতো নিশ্বাস নিচ্ছে। নিজের অজান্তেই সে থিরুর সাথে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

পরদিন সুহান তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হল খুব ভোরে। আগে সে পাতাল ট্রেনে যাতায়াত করেছে, এখন দীর্ঘদিন সে ঘরে বসে আছে, খরচ নেই কিন্তু বেতনের ইউনিটগুলো নিয়মিত তার অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে, বেশ কিছু ইউনিট হয়ে গেছে তার, ইচ্ছে করলে একটা ট্যাক্সিতে যেতে পারে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সে যখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ঠিক তখন তার কাছাকাছি একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। খুট করে দরজা খুলে যায় এবং সুহান শুনতে পেল তার মস্তিষ্কে কেউ একজন বলল, "উঠে যাও।"

সুহান চমকে উঠে বলল, "উঠে যাব?"

"হ্যাঁ।"

"যদি কেউ দেখে ফেলে?"

"দেখবে না। কেউ নেই। তোমাকে তথ্যকেন্দ্রে নামিয়ে দিই।"

সুহান ট্যাক্সিতে উঠতেই মৃদু গর্জন করে সেটা এগিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যকেন্দ্রের সামনে নামিয়ে দেবার পরও সুহান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এর আগে কতবার সে এখানে এসেছে, ভেতরে ঢুকেছে। কাজ করেছে কাজ শেষে বের হয়ে এসেছে। আজ সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, সে ভেতরে ঢুকবে কিন্তু সে জানে না সে বের হতে পারবে কি না। সুহান জোর করে মাথা থেকে চিন্তা দূর করে দিল, বের হতে না পারলে নেই, কিন্তু তার ওপরে যে দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে সে সেটা শেষ করবে। সুহান একটা বড় নিশ্বাস ফেলে তার কার্ডটা হাতে তথ্যকেন্দ্রের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দরজায় কার্ডটা দেওয়ার সময় হঠাৎ তার হাত কেঁপে উঠল। আজ কি দরজা খুলবে তার জন্য? নিরাপত্তাকর্মীরা কি কোনোভাবে তার মনের কথা জেনে গেছে? কিন্তু না, তারা কেউ জানে না। ঘড়ঘড় শব্দ করে দরজা খুলে গেল, সুহান দেখতে পেল জিনেটিক কোডিং করার জন্য যন্ত্রটা নিয়ে নিরাপত্তা প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে। সুহান একটু এগিয়ে গিয়ে যন্ত্রের ভেতরে আঙুলটা প্রবেশ করিয়ে দিতেই একটা মৃদু খোঁচা অনুভব করে, প্রায় সাথে সাথে মনিটরে সুহানের চেহারা ফুটে ওঠে। উপরে একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে—

নিরাপত্তা প্রহরী তীক্ষ্ণ চোখে সুহানের দিকে তাকাল, বিড়বিড় করে বলল, "অনেক দিন পরে?"

সুহান মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। অনেক দিন পর।"

"অ্যাক্সিডেন্ট?"

সুহান বলল, "হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্টের মতোই।" সুহান ভেতরে ভেতরে এক ধরনের আতঙ্কবোধ করে, তার গলার স্বরটি কি আজ একটু অন্যরকম শোনাচ্ছে, নিরাপত্তাকর্মীটি কি তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে? না, সেরকম কিছু না, শেষ পর্যন্ত সে হাত নেড়ে তাকে ভেতরে যেতে বলল, বুকের ভেতরে আটকে থাকা একটি নিশ্বাসকে বের করে দিয়ে সুহান ভেতরে ঢুকে গেল।

আর কোনো ভয় নেই। এই তথ্যকেন্দ্রটাকে সুহান হাতের তালুর মতো চেনে। সে একেবারে নিচু পর্যায়ের নিরাপত্তাকর্মী, কাজেই তার সব জায়গায় যাবার অনুমতি নেই। কিন্তু যেখানে যেখানে যাবার অনুমতি আছে সে জায়গাগুলোর কোথায় কোন ত্রুটি আছে সেটি তার মুখস্থ। সেই ত্রুটিগুলো ব্যবহার করে কীভাবে একটার পর আরেকটা নিরাপত্তা ব্যূহ ভেদ করে একেবারে সার্ভার রুমে যেতে হয় সেটাও সে জানে। আজকে তাকে সেগুলো ব্যবহার করে একেবারে ভেতরে ঢুকে যেতে হবে। সুহান ঘড়ির দিকে তাকাল, তার হাতে অল্প কিছু সময় আছে। এখন তার নিজের ঘরে গিয়ে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা তুলে নেবার কথা। সেটা হাতে নিয়ে তার নিচে যাবার কথা। সেখানে তাকে আজকের ডিউটি বুঝিয়ে দেওয়া হবে, তখন তাকে ডিউটিতে যেতে হবে। কিন্তু সে এখন নিচে যেতে চায় না, নিচে গেলেই সবার সাথে দেখা হবে, সবার সাথে তার কথা বলতে হবে, সে এখন কথা বলতে চায় না। সে এখন কারো সাথে দেখা করতে চায় না। ডিউটিতে রিপোর্ট করতে যাবার আগে তার হাতে অল্প কয়েক মিনিট সময় আছে, সে সেই সময়টাই ব্যবহার করতে চায়। এই সময়ের ভেতরেই নিরাপত্তা ব্যূহ ভেদ করে সে ভেতরে ঢুকে যেতে চেষ্টা করবে। এখনই সবচেয়ে ভালো সময়, সবচেয়ে বড় সুযোগ। একটু পর সে সুযোগ আর নাও পেতে পারে।

সুহান তার ঘরে গিয়ে অস্ত্রটা তুলে নেয়, ভাগ্যিস সেখানে এখন রিকি নেই। রিকি থাকলে এখন তার কিছুক্ষণ রিকির সাথে কথা বলতে হত—রিকি তার অ্যাক্সিডেন্টের খোঁজ নিত। কোন হাসপাতালে ছিল, ডাক্তাররা কী বলেছে—সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইত। রিকি খুব চমৎকার একজন মানুষ, তার সাথে কথা বলতে সুহানের খুব ভালো লাগে কিন্তু এই মুহূর্তে সে কারো সাথে কথা বলতে চায় না।

সুহান অস্ত্রটা কাঁধে ঝুলিয়ে করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে, করিডোরের একেবারে শেষ মাথায় লিফট। লিফটে করে সুহান তিন তালায় উঠে এল। সামনে এক শ মিটার পর্যন্ত নিরাপদ এলাকা, এইটুকু সে যেতে পারবে, এরপর নিষিদ্ধ এলাকা, সেখানে কারো যাবার অনুমতি নেই। কেউ যেন ভুল করে চলে না যায় সে জন্য দুটো অদৃশ্য অবলাল আলোর রশ্মি বাম থেকে ডান দিকে গিয়েছে, একটি মেঝে থেকে আধামিটার ওপর দিয়ে অন্যটি দেড় মিটার ওপর দিয়ে। অসতর্ক কেউ এখানে চলে এলে অবলাল রশ্মিটি বাধাপ্রাপ্ত হয়, সাথে সাথে কর্কশ স্বরে এলার্ম বাজতে শুরু করে। সুহান সেটা জানে তাই সে খুব সাবধানে একটা রশ্মির ওপর দিয়ে অন্যটির নিচে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, কোনো এলার্ম বাজল না। সুহান তখন দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে। শ খানেক মিটার দূরে এই তথ্যকেন্দ্রের প্রথম ত্রুটিপূর্ণ লেজার, সুহান এটা আবিষ্কার করেছে। লেজারটি বন্ধ করে দেবার সাথে সাথে নিরাপত্তা সার্কিট অন হয়ে যাবার কথা। কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে সেটি অন হয় না এবং অমূল্য দুই মিনিটের সময় পাওয়া যায়, এই দুই মিনিটে যদি মূল করিডোরের ক্যামেরাটি একটু ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তা হলে ক্যামেরার দৃষ্টিসীমার বাইরে দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাওয়া যায়।

সুহান লেজারটির কাছে গিয়ে ক্ষিপ্র হাতে সেটা বন্ধ করে প্রায় ছুটতে ছুটতে মূল করিডোরে ফিরে এল, ক্যামেরাটা এখন কাজ করছে না, আগের ছবিটা এখানে ফ্রিজ হয়ে আছে। দুই মিনিট সময়ের ভেতর ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দিতে হবে, বেশি ঘোরালে ধরা পড়ে যাবে, কম ঘোরালে কাজ করবে না, এর মাঝামাঝি একটা জায়গায় আটকে দিতে হবে। সুহান নিশ্বাস বন্ধ করে ক্যামেরাটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘুরিয়ে লেজারটির কাছে ফিরে গেল, এখনো কর্কশ স্বরে এলার্ম বাজতে শুরু করছে না, তার মানে এখনো সে ধরা পড়ে যায় নি। সুহান নিশ্বাস বন্ধ করে লেজারটি আবার চালু করে দিল, কোথাও এবারও এলার্ম বেজে উঠছে না, কাজেই সবকিছু পরিকল্পনা মতো কাজ করছে। চমৎকার!

সুহান ঘড়ির দিকে তাকাল, কাজ শুরু করার পর মাত্র দুই মিনিট পার হয়েছে—অথচ তার কাছে মনে হচ্ছে বুঝি কয়েক যুগ কেটে গেছে। সুহান পিঠে ঝুলিয়ে রাখা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা পরীক্ষা করে এবারে মূল করিডোরের দিকে হাঁটতে থাকে। ক্যামেরাটা একটু অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, সুহান দেয়াল ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে গেল, ক্ষিপ্র পায়ে সে ছুটে যায়, সামনে সার্ভার রুম। সুহান সার্ভার রুমের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দরজায় গোপন সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। সুহান গোপন সংখ্যাটি জানে না, তার এখন সাহায্যের দরকার। তাকে সাহায্য করার জন্য এখন তাদের সমন্বিত সত্তা অপেক্ষা করছে। সুহান বলল, "সংখ্যাটি কি বের করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"বলো আমাকে।"

"বলছি। খুব সাবধান—একটি ভুল সংখ্যা প্রবেশ করালেই কিন্তু ধরা পড়ে যাবে।"

"ঠিক আছে।"

"প্রথম দুটি হচ্ছে সংখ্যা। তারপর তিনটি অক্ষর তারপর চারটি সংখ্যা। বুঝেছ?"

"বুঝেছি। তোমরা বলো।"

সুহান দরজার নিরাপত্তা প্যানেলে একটি একটি সংখ্যা আর অক্ষর প্রবেশ করাতে থাকে। শেষ সংখ্যাটি প্রবেশ করানোর সাথে সাথে খুট করে দরজাটি খুলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চমৎকার!" সুহান বিড়বিড় করে বলল, "এখন আমার দরকার দশ মিনিট সময়। মাত্র দশ মিনিট।"

রিয়ানা চাপা গলায় বলল, "হ্যাঁ। সেই দশ মিনিট সময় তুমি পাবে। তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাক। আমরা সবাই তোমার সাথে সমন্বিত হয়ে আছি। তুমি এখানে একা নও।"

"জানি।" সুহান বলল, "আমি সেটা জানি।"

"যাও, তুমি কাজ শুরু করে দাও।"

সুহান পিঠ থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা খুলে নিচে নামিয়ে রাখল তারপর বড় সার্ভারের সামনে গিয়ে তার দরজাটা খুলে নেয়। কী-বোর্ডটি বের করে নিয়ে আসে, সুইচ স্পর্শ করতেই সেটি অবলাল রশ্মি দিয়ে সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করে। সুহান একটা চেয়ারে বসে কী-বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ে। তার হাত হঠাৎ করে জীবন্ত প্রাণীর মতো কী-বোর্ডের ওপর ছুটতে থাকে। ঠিক তিন মিনিট পর সুহান একটা লম্বা নিশ্বাস নিল। সে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদনটা খুঁজে পেয়েছে। বিশাল প্রতিবেদন, প্রথমে সব বিজ্ঞানীদের পরিচিতি। দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন একজন বয়স্ক সমাজবিজ্ঞানী, হাসিখুশি মানুষ। এই রিপোর্টটি তৈরি করার অপরাধে তাকে নাকি খুন করে ফেলা হয়েছে। মনিটরে হাসিখুশি মানুষটিকে দেখে সেটি বিশ্বাস করতে মন চায় না। দলটিতে আরো অনেক বিজ্ঞানী রয়েছেন, সবাই মিলে পুরো ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করেছেন, অসংখ্য মানুষকে পরীক্ষা করেছেন, তাদের বুদ্ধিমত্তা আর সৃজনশীলতা পরিমাপ করেছেন। তাদের একজনের সাথে আরেকজনের তুলনা করেছেন। ক্যাটাগরি-বি. মানুষের বিশেষ জিনগুলো অন্য মানুষের ওপর প্রতিস্থাপন করেছেন, তাদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। দীর্ঘ গবেষণা শেষে তারা প্রতিবেদনটি তৈরি করে মানুষের ভেতরে বিভাজন করার এই পুরো ব্যাপারটিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। প্রতিবেদনটি দেখার সময় নেই, সুহান তাই দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হতে চায় এখানেই পুরোটা রয়েছে কি না। প্রতিবেদনের শেষ অংশটা সুহানের চোখে পড়ে যায়, "কিছু মানুষকে ক্যাটাগরি-বি. হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে পৃথিবীর সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার এই উদ্যোগটা ষড়যন্ত্রমূলক, অন্যায়, অমানবিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই মুহূর্তে মানুষের মাঝে ক্যাটাগরি-বি. হিসেবে বিভাজন বন্ধ করে যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে এমন একটি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন যেন ভবিষ্যতে কখনো কেউ এরকম হীন ষড়যন্ত্র করার সাহস না পায়।"

সুহান প্রতিবেদন থেকে চোখ সরিয়ে এনে নেটওয়ার্কের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার কাজে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল। একজন মানুষের পক্ষে এটি করা সম্ভব নয়, কিন্তু সে একজন মানুষ নয়। সে অনেক মানুষের সমন্বিত একটি অস্তিত্ব। দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা করে সবাই মিলে এর প্রস্তুতি নিয়েছে, সে নিশ্চয়ই নেটওয়ার্কের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে বাইরের পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের এই প্রতিবেদনটি পাঠিয়ে দিতে পারবে। নিশ্চয়ই পারবে।

সুহান দাঁতে দাঁত চেপে তার কী-বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ঝড়ের বেগে তার হাত কী-বোর্ডের ওপর ছোটাছুটি করতে থাকে। অনেকগুলো প্রতিরক্ষা ব্যূহ রয়েছে, একটি ভেদ করেই শুধুমাত্র পরের ব্যূহে যেতে পারে। প্রথম ব্যূহ থেকে পরেরটি কঠিন, তার 'পরেরটি আরো কঠিন। শেষ ব্যূহগুলোর সাথে হার্ডওয়্যারের সংযোগ আছে, সেগুলো স্পর্শ করা মাত্রই তীব্র স্বরে এলার্ম বেজে উঠবে, সাথে সাথে শত শত সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী ছুটে আসবে এই সার্ভার ঘরে। এলার্ম বাজার পর থেকে এই ঘরে তাদের আসতে বড়জোর তিন থেকে চার মিনিট সময় নেবে, তার ভেতরে তার শেষ ব্যূহটা ভেদ করে প্রতিবেদনটি মূল নেটওয়ার্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছে দিতে হবে। সে কি সত্যিই পারবে সেটা করতে? সুহান জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দেয়, এই মুহূর্তে সে শুধু কাজ করে যাবে। সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবে নিরাপত্তা ব্যূহ ভেদ করার কাজে। একটু একটু করে সে ক্যাটাগরি–বি. মানুষকে পৃথিবীতে মুক্ত মানুষ হিসেবে পৌঁছে দেবার কাজে এগিয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থ ব্যূহটি ভেঙে নেটওয়ার্কের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার সাথে সাথে সমস্ত তথ্যকেন্দ্র কাঁপিয়ে কর্কশ এলার্ম বেজে উঠল, সুহানের সারা শরীর হঠাৎ আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে ওঠে। তার হাতে আর মাত্র কয়েক মিনিট সময়, দেখতে দেখতে নিরাপত্তাকর্মীরা চলে আসবে এর মাঝে সে যদি শেষ ব্যূহটা ভেদ করতে না পারে তা হলে ক্যাটাগরি–বি. মানুষ আর কখনোই সত্যিকারের মানুষ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

সুহান তার কী–বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল। দ্রুত কিছু সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে মনিটরের দিকে তাকায়, সঠিক সংখ্যাগুলো প্রবেশ করাতে পেরেছে কি? সুহান নিশ্বাস বন্ধ করে মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকে, হ্যাঁ, সে সঠিক সংখ্যাগুলো প্রবেশ করেছে, শেষ ব্যূহটা ভেঙে যাচ্ছে। দুর্বোধ্য সংখ্যা মনিটরের স্ক্রিনটা প্লাবিত করে রেখেছে কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে এই শেষ ব্যূহটা। সুহান এবারে পায়ের শব্দ শুনতে পেল, নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষেরা চলে এসেছে। দরজায় হাত রেখেছে তারা, এখনো ব্যূহটা ভেদ হয় নি। আতঙ্কে সুহানের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে কি সে পারবে না? তার একটু সময় দরকার, বেশি নয়, মাত্র কয়েক মিনিট।

ঠিক তখন তার আগ্নেয়াস্ত্রটির কথা মনে পড়ল। নিচু হয়ে সেটি তুলে নিয়ে দরজার দিকে লক্ষ করে এক পশলা গুলি করল। বাইরে নিরাপত্তাকর্মীদের আতঙ্কিত চিৎকার শুনতে পায় সে, এগিয়ে আসতে সাহস করছে না কেউ। আরো কিছুক্ষণ সময় পেয়েছে সে। আবার সে ঝুঁকে পড়ল কী–বোর্ডের ওপর।

খুব ধীরে ধীরে নিরাপত্তা ব্যূহটি সরে যাচ্ছে। সুহান বিস্ফারিত চোখে দেখতে পায় ধীরে ধীরে নেটওয়ার্কটি উন্মুক্ত হয়ে আসছে তার সামনে। আর অল্প কিছু সময় পেলেই সে বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদনটুকু পাঠিয়ে দিতে পারবে বাইরে।

দরজায় আবার সে হুটোপুটি শুনতে পায়, নিরাপত্তাকর্মীরা আবার এগিয়ে আসছে তার কাছে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা হাতে নিয়ে সুহান আবার এক পশলা গুলি করার চেষ্টা করল, মাঝপথে হঠাৎ গুলি থেমে যায়, গুলি শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে বাড়তি ম্যাগজিন নেই, বিষয়টি বুঝতে বেশি সময় লাগল না, সাথে সাথে নিরাপত্তাকর্মীরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল।

চোখের কোনা দিয়ে সুহান দেখতে পেল নিরাপত্তাকর্মীরা এগিয়ে আসছে। সবার সামনে রিগা, তার হাতে ছোট আগ্নেয়াস্ত্র, যেটা দিয়ে সে এর আগে আরো একজনকে হত্যা করেছিল।

সুহানের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, কী হবে এখন? ঠিক সেই মুহূর্তে মনিটরে দুর্বোধ্য সংখ্যার প্লাবন বন্ধ হয়ে একটা লেখা ফুটে ওঠে—"নিরাপত্তা ব্যূহ অপসারিত, উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক।"

নেটওয়ার্ক উন্মুক্ত হয়েছে, তার আর মাত্র একটি মুহূর্ত সময় দরকার। মাত্র একটি মুহূর্ত। সুহান কাঁপা হাতে কী–বোর্ডের তিনটা অক্ষর স্পর্শ করল, সাথে সাথে বিজ্ঞানীদের গোপন প্রতিবেদনটি পৃথিবীর মূল নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে যায়, কয়েক সেকেন্ডের মাঝে সেটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি আর সেটি আটকে রাখতে পারবে না।

সুহান মাথা ঘুরিয়ে রিগার দিকে তাকাল, তার মুখে বিচিত্র এক ধরনের হাসি। রিগা উন্মত্ত মানুষের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "ক্যাটাগরি–বি. জানোয়ার। প্রথম দিনেই তোকে আমার খুন করা উচিত ছিল।"

সুহান হাসল, বলল, "সেজন্য এখন খুব দেরি হয়ে গেছে।"

রিগা হিংস্র গলায় বলল, "না। হয় নি।" তারপর সে তার ছোট আগ্নেয়াস্ত্রটা তুলে গুলি করল, মস্তিষ্ক চূর্ণ হয়ে গেল সুহানের। রক্ত ছিটকে এসে লাগল রিগার চোখে–মুখে। প্রাণহীন দেহটা চেয়ার থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়, উন্মত্ত রিগা তবু থামে না, হিংস্র দানবের মতো গুলি করতে থাকে তার মৃতদেহকে।

নিরাপত্তাকর্মীদের ঠেলে কিরি হঠাৎ ছুটে এল। চিৎকার করে বলল, "থাম। থাম রিগা—"

"কেন? কী হয়েছে?"

কিরি এগিয়ে এসে মৃতদেহের পাশে ঝুঁকে পড়ে সেটা পরীক্ষা করে বলল, "এটা সুহান না।"

রিগা চিৎকার করে উঠল, "সুহান না?"

"না। সুহানের মতো দেখতে একটা রবারের মাস্ক পরেছে—খুলে এসেছে এখন।"

রিগাকে কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়। "তা হলে ভেতরে ঢুকল কেমন করে?"

"সুহানের কার্ডটা নিয়ে এসেছে। জিনেটিক কোডিং করার জন্য আঙুলে একটা কৃত্রিম ত্বক তৈরি করেছে, এই দেখ সুহানের রক্ত আছে সেখানে, সুহানের মতো কণ্ঠস্বর করার জন্য ভোকাল কর্ডে একটা ইমপ্লান্ট!"

রিগা বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কী করতে এসেছে এখানে?"

কিরি মনিটরে তাকিয়ে বলল, "কী একটা ফাইল নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"কিসের ফাইল?"

কিরি বলল, "আমি জানি না। আমি এসব বুঝি না। মনে হয় দশম মাত্রার গোপনীয়।"

রিগা হুঙ্কার দিয়ে বলল, "বের কর কী ফাইল।"

"কেমন করে বের করতে হয় আমি জানি না।"

রিগা চিৎকার করে বলল, "সিস্টেমের লোক কোথায়? এক্ষুনি আসতে বলো। এক্ষুনি।"

AMARBOI.COM

সেটা বের করার তখন কোনো প্রয়োজন ছিল না, সারা পৃথিবীতে ততক্ষণে বিজ্ঞানীদের গোপন প্রতিবেদনটা পৌঁছে গেছে। ক্যাটাগরি–বি. মানুষের বিরুদ্ধে যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল সেটা প্রচারিত হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর মানুষ হতবিহ্বল হয়ে মাত্র বুঝতে শুরু করেছে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ কী ভয়ংকর একটি ষড়যন্ত্র করেছিল, কী অমানবিক এবং নিষ্ঠুর সেই ষড়যন্ত্র।

সুহান থরথর করে তার চেয়ারে বসে কাঁপছিল। রিয়ানা তাকে ধরে রেখে বলল, "শান্ত হও সুহান। শান্ত হও।"

সুহান বলল, "কেমন করে শান্ত হব। আমি স্পষ্ট দেখেছি রিগা আমার মাথায় গুলি করল, মস্তিষ্ক চূর্ণ হয়ে গেল আমার।"

"তোমার নয়, থিরুর। তোমার মতো একটা রবারের মুখোশ পরে তথ্যকেন্দ্র চার চার শূন্য তিনে গিয়েছে। তুমি এখানে বসে তার সাথে নিজেকে সমন্বিত করেছ। থিরু নিজেকে সুহান ভেবেছে। সুহান হয়ে তথ্যকেন্দ্রে ঢুকে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুহান শূন্য দৃষ্টিতে রিয়ানার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি সব জানি রিয়ানা, সব জানি কিন্তু তারপরেও বিশ্বাস হয় না। তুমি বিশ্বাস করবে না রিয়ানা কী ভয়ংকর সেই অনুভূতি। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কী ভয়ংকর একটি শূন্যতা এসে গ্রাস করে—"

"কিন্তু সেটি সত্যি নয় সুহান। তুমি বেঁচে আছ—"

সুহান রিয়ানার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল, "আমি আমার নিজের কথা বলছি না রিয়ানা। আমি থিরুর কথা বলছি! মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার বুকের ভেতর যে ভয়াবহ শূন্যতা ছিল, যে দুঃখ ছিল সেটি তুমি কল্পনা করতে পারবে না। পৃথিবীর কেউ পারবে না।"

রিয়ানা মাথা নেড়ে একটা নিশ্বাস ফেলল, নরম গলায় বলল, "আমাদের কিছু করার ছিল না সুহান। তোমাদের দুজনের একজনকে আমরা হারাতাম। আমরা ভেবেছিলাম তোমার কথা, থিরু কিছুতেই রাজি হল না, সে বলল নেটওয়ার্কের ভেতরে ঢুকে যাবার বিষয়টি সে অন্য কারো সাথে সমন্বিত করে করতে চায় না, নিজে করতে চায়।"

সুহান বলল, "হ্যাঁ এখন বুঝতে পারছি।"

"তুমি সমন্বিত হয়েছিলে শেষ মুহূর্তে যখন একটু বাড়তি সময় লাগল, তুমি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে গুলি করে খানিকটা সময় নিলে—"

"আমি জানি। কী ভয়ংকর বাস্তব সেই অনুভূতি—"

"তোমাদের দুজনের সমন্বয় ছিল অসাধারণ—আমরা তা না হলে কিছুতেই পারতাম না। কিছুতেই না—"

"আমি সব বুঝতে পারছি রিয়ানা কিন্তু তবু কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।" সুহান মাথা নেড়ে বলল, "কিছুতেই না।"

"সুহান, আমরা সবাই একসাথে সমন্বিত হয়ে ছিলাম। থিরুর মাঝে আমরা বেঁচে ছিলাম, আমাদের মাঝে থিরু বেঁচে ছিল। থিরু চিরদিনের জন্য আমাদের মাঝে সমন্বিত হয়ে গেছে। আমাদের সবার মাঝে থিরুর একটা অংশ বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে।"

সুহান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক এরকম সময় লাল চুলের একটা ছেলে ছুটে এল, চিৎকার করতে করতে বলল, "তোমরা এস। তাড়াতাড়ি এস। দেখ ভিডিস্ক্রিনে কী দেখাচ্ছে।"

রিয়ানা আর সুহান বের হয়ে এল। বাইরে বিশাল ভিডিস্ক্রিনের সামনে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, কালো চুলের একটি মেয়ে উত্তেজিত গলায় কথা বলছে সেখানে, "মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমাদের সবার হাতে বিজ্ঞানীদের একটি প্রতিবেদন এসে পৌঁছেছে। এটি কেমন করে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সেটি এখনো রহস্যাবৃত। আমাদের বিশেষজ্ঞরা এই মুহূর্তে সেটি বিশ্লেষণ করছেন, আমরা ইতোমধ্যে এর ভেতরের সত্যটুকু জেনে গেছি। যে বিষয়টি নিয়ে পৃথিবীর সত্যানুসন্ধানী মানুষেরা কথা বলে আসছিল সেটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের মাঝে কোনো বিভাজন নেই।"

কালো চুলের মেয়েটি তার অবাধ্য চুলকে পেছনে সরিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, "পৃথিবীর সকল মানুষ এক। তাদের সবার দেহে একই রক্ত। তাদের মাথার চুল, গায়ের রং, মুখের ভাষা কিংবা ক্রোমোজম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তারা একই মানুষ। মানুষে মানুষে কোনো বিভাজন নেই। আগেও ছিল না ভবিষ্যতেও থাকবে না।"

মেয়েটি হাতের মাইক্রোফোনটা হাতবদল করে বলল, "সারা পৃথিবী থেকে আমাদের কাছে খবর এসে পৌঁছাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের ক্লাস রুম থেকে বের

AMARBOI.COM

হয়ে এসেছে। তারা রাজপথে মিছিল করে তথাকথিত ক্যাটাগরি-বি. ছেলেমেয়েদেরকে এই মুহূর্তে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পাশাপাশি পড়াশোনার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।"

"আমাদের কাছে খবর এসেছে শহরতলিতে নির্বাসিত তথাকথিত ক্যাটাগরি-বি. মানুষদের আবাসস্থলে হাজার হাজার মানুষ গিয়ে ভিড় করেছে। সেখানে মানুষের একটি অপূর্ব মিলনমেলার সৃষ্টি হয়েছে।"

ভিডিস্ক্রিনে সবাই দেখতে পেল হাজার হাজার মানুষ একজন আরেকজনকে আলিঙ্গন করছে। ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্মিত ছোট ছোট দুস্থ শিশু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, নানা বয়সী মানুষ তাদের গভীর মমতায় বুকে চেপে ধরছে। যে মানুষদের এতদিন ক্যাটাগরি-বি. মানুষ হিসেবে অবহেলা করে এসেছে, সেই দুঃখী-অসহায় মানুষগুলোকে সাধারণ মানুষ জড়িয়ে ধরেছে গভীর ভালবাসায়।

যে ভালবাসা পৃথিবীর মানুষের সবচেয়ে পুরাতন অনুভূতি, সবচেয়ে অকৃত্রিম অনুভূতি, সবচেয়ে খাঁটি অনুভূতি।

যে অনুভূতি পৃথিবীর মানুষকে মানুষের পরিচিতি দিয়েছে।

AMARBOI.COM

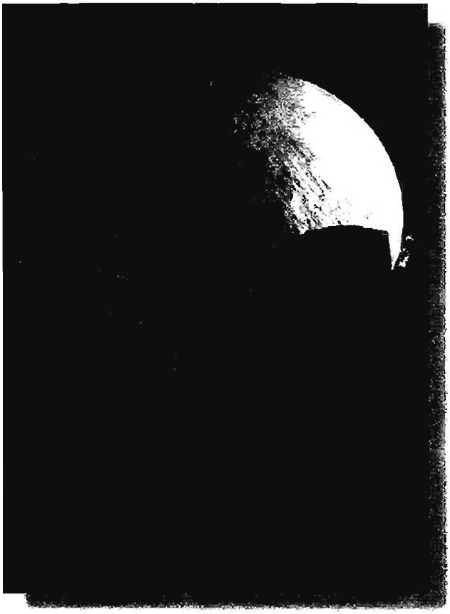

অবনীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন বর্কেন হাত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে টেবিলে শব্দ করতে করতে মনিটরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। পেছনে মৃদু একটা শব্দ শুনে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখেন, মহাকাশযানের শিক্ষানবিশ ক্রু রিরা কন্ট্রোলরুমের পেছনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেন বর্কেন একটু অবাক হয়ে বললেন, "তুমি এখানে?"

"মহামান্য ক্যাপ্টেন, আমাকে এখানে ডিউটি দেওয়া হয়েছে।"

ক্যাপ্টেন হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটি উড়িয়ে দেবার মতো করে বললেন, "কন্ট্রোলরুমে এখন কোনো কাজ নেই রিরা। তুমি এখন বিশ্রাম নিতে যেতে পার।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন এই মহাকাশযানের দলপতি, তার সাধারণ কথাই আদেশের মতো। রিরার মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে চলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু সে একটু ইতস্তত করে বলল, "আর কিছুক্ষণ এখানে থাকার অনুমতি চাইছি মহামান্য ক্যাপ্টেন।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটু অবাক হয়ে কমবয়সী এই মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকালেন। কিশোরীর মতো মুখ, হালকা-পাতলা ছিপছিপে শরীর, ছোট করে ছাঁটা বাদামি চুল। বড় বড় চোখে কৌতূহল এবং একধরনের নিষ্পাপ সারল্য। জীবনে প্রথমবার মহাকাশযানের দীর্ঘ অভিযানে এসে তার চোখে-মুখে একধরনের উত্তেজনার ছাপ, যেটি অনেক কষ্ট করে ঢেকে রেখে সে একধরনের শান্ত ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। ক্যাপ্টেন বর্কেন মনিটর থেকে পা নামিয়ে হালকা গলায় বললেন, "কন্ট্রোলরুম হচ্ছে মহাকাশযানের সবচেয়ে আনন্দহীন এবং সবচেয়ে একঘেয়ে জায়গা। তুমি এখানে থেকে কী করবে?"

"আমার কাছে এটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক জায়গা মহামান্য ক্যাপ্টেন। আমাদের একাডেমিতে এসব শিখানো হয়েছে। কিন্তু এই প্রথমবার আমি সত্যিকারের কন্ট্রোলরুম নিজের চোখে দেখছি!"

ক্যাপ্টেন বর্কেন মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "এস, তা হলে কাছে এসে দেখ!"

রিরা মেয়েটি সতর্ক পা ফেলে মনিটরের কাছাকাছি এগিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন বর্কেন তার পাশের চেয়ারটি ঘুরিয়ে তাকে বসার জায়গা করে দিয়ে বললেন, "নাও, এখানে বস।"

মহাকাশযানের ক্যাপ্টেনের পাশে বসার সুযোগ পেয়ে রিরার চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার একটা স্পষ্ট ছাপ পড়ল। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মহামান্য ক্যাপ্টেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এর মাঝে ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। তুমি নতুন এসেছ বলে সবকিছু এরকম মনে হচ্ছে—দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে যাবে। একাডেমিতে তোমাদের অনেক আইনকানুন শিখিয়েছে না?"

"শিখিয়েছে মহামান্য ক্যাপ্টেন।"

"তুমি দেখবে আমরা এগুলো নিয়ে এখানে মাথা ঘামাই না।"

রিরা একটু অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন বর্কেনের দিকে তাকাল, ক্যাপ্টেন বর্কেন একটু হেসে বললেন, "সব মানুষের নিজের একটা নিয়ম থাকে। আমার মহাকাশযানের নিয়মটা খুব সহজ।"

"সেটি কী মহামান্য বর্কেন?"

"মহাকাশযানটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব—নিয়মগুলো করা হয়েছে সেজন্য। এই নিয়মগুলো অল্পবিস্তর শর্ট সার্কিট করে যদি মহাকাশযানকে আরো সহজে চালানো যায়, আমার আপত্তি কোথায়?"

রিরা মুখে এক ধরনের গাম্ভীর্য এনে বলল, "আমাদের একাডেমিতে আপনার সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করা হয় মহামান্য ক্যাপ্টেন। আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি আপনার মহাকাশযানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন শব্দ করে হেসে বললেন, "আমি খুব নিশ্চিত না যে, তুমি সপ্তাহখানেক পরে এই কথা বলবে। আইনকানুন নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না সত্যি, কিন্তু কাজকর্ম নিয়ে আমি খুব খুঁতখুঁতে! কয়দিন পরেই টের পাবে।"

ক্যাপ্টেন বর্কেনের হালকা কথাবার্তা শুনে রিরা এর মাঝে খানিকটা সহজ হয়ে এসেছে—এই প্রথমবার তার মুখে হালকা হাসির একটা ছাপ পড়ল, বলল, "আমি সেটা টের পাবার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি ক্যাপ্টেন বর্কেন।"

"চমৎকার।" ক্যাপ্টেন বর্কেন আঙুল দিয়ে টেবিলে শব্দ করতে করতে বললেন, "মহাকাশযানের সমস্যাটা কী জান?"

"কী মহামান্য ক্যাপ্টেন?"

"এর সবকিছু নিজে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই কন্ট্রোলরুমের মূল যে প্রসেসর, সেটা তোমার কিংবা আমার মস্তিষ্ক থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এখানে কারো কিছু করার নেই। কিন্তু—"

ক্যাপ্টেন বর্কেন কথা থামিয়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রিরা ধৈর্য ধরে ক্যাপ্টেন বর্কেনের দিকে তাকিয়ে রইল; ক্যাপ্টেন বর্কেন একটা নিশ্বাস ফেলে রিরার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু এখানে সব সময় খুব সতর্ক থাকতে হয়, এমন বিচিত্র সমস্যা হতে পারে, যেটা কেউ আগে কোনো দিন চিন্তা করে নি। এখন পর্যন্ত একটি অভিযানও হয় নি যেখানে আমাকে বিচিত্র কিছু করতে হয় নি।"

"মহামান্য ক্যাপ্টেন।"

"বলো।"

"আপনার কি মনে হয় আমাদের এই অভিযানে বিচিত্র কোনো অভিজ্ঞতা হতে পারে?"

"নিশ্চয়ই হতে পারে রিরা।"

"সেটি কি বিপজ্জনক কিছু হতে পারে?" রিরা তার গলায় একটা স্বাভাবিক ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলেও সেখানে আশঙ্কাটুকু গোপন থাকল না।

ক্যাপ্টেন বর্কেন মৃদু হেসে বললেন, "বিপজ্জনক তো হতেই পারে রিরা—লক্ষ লক্ষ মাইলের নির্জন মহাকাশে কত কী ঘটতে পারে। কিন্তু তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিরা সোজা হয়ে বসে বলল, "আমি ভয় পাচ্ছি না মহামান্য ক্যাপ্টেন।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন হাসি গোপন করে বললেন, "অবিশ্যি তুমি ভয় পাচ্ছ না রিরা। আমি জানি তুমি সাহসী মেয়ে। সাহসী না হলে কেউ মহাকাশযানের অভিযাত্রী হয় না।"

দুজন বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। মহাকাশযানটি প্রায় নিঃশব্দ, খুব চেষ্টা করলে তার শক্তিশালী ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। রিরা একটু ইতস্তত করে বলল, "মহামান্য ক্যাপ্টেন, আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"হ্যাঁ, জিজ্ঞেস কর।"

"আমাদের এই মহাকাশযানে করে আমরা নাকি একটা বিপজ্জনক কার্গো নিয়ে যাচ্ছি?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটু অবাক হয়ে বললেন, "তুমি কোন কার্গোর কথা বলছ রিরা?"

"এই মহাকাশযানে করে নাকি একটা নীলমানবের দল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। আমাদের মহাকাশযানে সতের জন নীলমানব আছে। ক্রুড উপগ্রহের যুদ্ধে এরা ধরা পড়েছে।"

"এরা নাকি অত্যন্ত ভয়ংকর?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটু হেসে বললেন, "আমরা যে জিনিসটা জানি না সেটাকেই মনে করি ভয়ংকর। নীলমানব সম্পর্কেও সেটা সত্যি—তাদেরকে ভয়ংকর ভাবার কারণ হচ্ছে আমরা তাদের সম্পর্কে খুব বেশি জানি না। কদাচিৎ আমরা তাদের ধরতে পারি, এই প্রথমবার একসাথে সতের জনকে ধরতে পেরেছি।"

"কিন্তু সেজন্য আমাদের নাকি ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হয়েছে?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, সেটা সত্যি। নীলমানব নতুন কিছু অস্ত্র তৈরি করেছে, যেগুলো খুব শক্তিশালী। তাদের মহাকাশযানের টেকনোলজিটাও ভিন্ন।"

"মহামান্য ক্যাপ্টেন, আমরা কি নীলমানবকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করি?"

"না, করি না। মানুষের বিবর্তন হয় স্বাভাবিকভাবে। নীলমানব নিজেদের মাঝে জোর করে বিবর্তন এনেছে। তাদের চোখ ইনফ্রারেড থেকে শুরু করে আলট্রাভায়োলেট পর্যন্ত সংবেদন করে ফেলেছে। তাদের রক্ত কপারভিত্তিক, তাই তাদের গায়ের রঙ হালকা নীল। আমি যতদূর জানি তারা ফুসফুসের আকার অনেক বড় করেছে, বাতাসে কম অক্সিজেনেও বেঁচে থাকতে পারে। শরীরের ভেতরে নাকি নতুন নতুন পরিবর্তন এনেছে।"

রিরা একটু শিউরে উঠে বলল, "কী সর্বনাশ!"

"এগুলো হচ্ছে কাঠামোগত পরিবর্তন। আমি শুনেছি এদের চিন্তার জগৎটাও অনেক ভিন্ন। মানুষের মতো এরা বিচ্ছিন্ন না, এদের পুরো দলটি একসাথে কাজ করে।"

"সেটা কীভাবে সম্ভব?"

"আমরা সেটা এখনো জানি না, বোঝার চেষ্টা করছি। সতের জনের এই দলটাকে মূল বিজ্ঞান একাডেমিতে পৌঁছে দিতে পারলে অনেক কিছু জানা যাবে।" ক্যাপ্টেন বর্কেন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি সিকিউরিটি ডিভিশনকে বলেছিলাম, পুরো দলটিকে ঘুম পাড়িয়ে শীতল ঘরে নিয়ে যেতে। তা হলে আমাদের ঝামেলা খুব কম হত, কিন্তু বিজ্ঞান একাডেমি রাজি হয় নি।"

"কেন রাজি হয় নি মহামান্য ক্যাপ্টেন?"

"এই মহাকাশযানে করে যখন নেওয়া হবে তখন তারা কী করে বিজ্ঞান একাডেমি সেটা দেখতে চায়। তারা কীভাবে কথা বলে, কীভাবে সময় কাটায়—ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিরা একটু অবাক হয়ে বলল, "এর মাঝে গবেষণা করার কী আছে মহামান্য ক্যাপ্টেন?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটু হেসে বললেন, "নীলমানবরা অসম্ভব সাহসী, অসম্ভব একরোখা, প্রায় খ্যাপা ধরনের প্রাণী। তারা মহাকাশযান থেকে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করবেই— কীভাবে চেষ্টা করবে সেটাই দেখতে চায়।"

রিরার মুখে আতঙ্কের একটা ছাপ পড়ল, বলল, "সর্বনাশ! যদি সত্যি বের হয়ে যায়?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন হাসলেন, বললেন, "এত সোজা নয়। ওদের পুরো ঘরটা চব্বিশ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আমি ছয় জন নিরাপত্তা প্রহরীকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে—অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে সাথে সাথে গুলি করার অনুমতি আছে।"

রিরা সাবধানে একটা নিশ্বাস ফেলল। খানিকক্ষণ দেয়ালের বিশাল মনিটরটির দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে ক্যাপ্টেন বর্কেনকে জিজ্ঞেস করল, "মহামান্য ক্যাপ্টেন, নীলমানবেরা কী ভাষায় কথা বলে?"

"তাদের নিজেদের ভাষা রয়েছে। একসময় তো নীলমানবেরা মানুষই ছিল, তাই আমাদের ভাষার সাথে মিল আছে। কথা শুনলে মোটামুটি বোঝা যায়।"

"ওরা এখানে কী নিয়ে কথা বলছে?"

"প্রথম কয়েকদিন লক্ষ করেছিলাম—একেবারে দৈনন্দিন কথাবার্তা। মেঝেতে দাগ কেটে কী একটা খেলা খেলছে, অনেকটা দাবার মতো। বসে বসে সেটা খেলে।"

"কোনোরকম দুশ্চিন্তা নেই?"

"থাকলেও কথায় বার্তায় সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। খুব চাপা স্বভাবের।"

"ওদের মাঝে কি মেয়ে আছে?"

"আছে। ছেলেমেয়ের ব্যাপারটা আমাদের মতোই, সব কাজে সমান সমান। এখানে সতের জনের মাঝে আট জনই মেয়ে। দলটার যে নেতৃত্ব নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে সেও একজন মেয়ে। কমবয়সী একরোখা ধরনের।"

"মহামান্য ক্যাপ্টেন, আমি কি তাদের দেখতে পারি?"

"যখন তোমার ডিউটি দেওয়া হবে, তখন তো দেখবেই। কাছে থেকে দেখবে। এখন দেখতে চাইলে এই মনিটরে দেখ।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটা সুইচ টিপে দিতেই বড় মনিটরে অবরুদ্ধ একটা ঘরের ছবি ফুটে উঠল। ঘরের ভেতর সতের জন নানাবয়সী নীলমানব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। একজন মাথার নিচে হাত দিয়ে শুয়ে নিষ্পলক চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে, মুখে গভীর একটা বিষণ্নতার ছাপ। গায়ের রঙ হালকা নীল, দেখে মনে হয় বুঝি কোনো একটি অশরীরী প্রাণী। দুজন মেঝেতে দাগ কাটা ছকের দু পাশে বসে খেলছে—খেলাটি প্রাচীন দাবার মতো, ঘুঁটি নেই বলে খাবারের জন্য দেওয়া শুকনো রুটির টুকরো কেটে কেটে ঘুঁটিগুলো তৈরি করেছে। খেলোয়াড় দুজন গালে হাত দিয়ে ভাবছে। তাদের ঘিরে আরো কয়েকজন। নিচু গলায় কথা বলছে। দেখে মনে হয় কীভাবে খেলতে হবে, সে বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছে।

বন্ধ ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে বেশ কয়েকজন। একজন নিচু গলায় একটা গান গাইছে। গানের কথাগুলো বোঝা যায় না কিন্তু সুরটুকু খুব বিষণ্ন এবং করুণ, বুকের ভেতর এক ধরনের হাহাকারের মতো অনুভূতি হয়। রিরা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে নীলমানবদের দলটির দিকে তাকিয়ে রইল। এই মানুষগুলো আসলে ভয়ংকর একরোখা, দুর্ধর্ষ এবং নৃশংস। কিন্তু চুপচাপ নিঃশব্দে বসে থাকতে দেখে সেটি একেবারেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। একাডেমিতে মানুষের এই অপভ্রংশ সম্পর্কে তাদেরকে পড়ানো হয়েছে, তাদের সম্পর্কে রিরার এক ধরনের বিচিত্র কৌতূহল ছিল, মনিটরে সরাসরি দেখতে পেয়ে সে বিস্ময়াভিভূত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

রিরা তখনো জানত না তার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটবে এই নীলমানবদের নিয়েই।

তীক্ষ্ণ একটা অ্যালার্মের শব্দ শুনে রিরা ঘুম থেকে জেগে উঠল। মহাকাশযানে এই অ্যালার্মটি একটি বিপদসংকেত। একাডেমিতে তাদের অনেকবার শোনানো হয়েছে। রিরা লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে তার কাপড় পরতে শুরু করে, জরুরি অবস্থার জন্য আলাদা করে রাখা ব্যাকপেকটা পেছনে ঝুলিয়ে সে দ্রুত দরজা খুলে বের হয়ে এল। মহাকাশযানের অন্যরাও ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে, রিরা ভয় পাওয়া গলায় কমবয়সী একজনকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে জান?"

"উঁহু জানি না।" মানুষটি হাত দিয়ে পুরো ব্যাপারটি উড়িয়ে দেবার একটা ভঙ্গি করে বলল, "আমার মনে হয় ড্রিল।"

"ড্রিল?"

"হ্যাঁ। মহাকাশযানে রওনা দেবার পর প্রথম প্রথম ইচ্ছে করে এরকম ড্রিল করানো হয়।"

রিরা ছুটতে ছুটতে মহাকাশযানের কন্ট্রোলরুমে হাজির হয়ে দেখতে পেল, সেখানে এর মাঝে অন্য সবাই পৌঁছে গেছে। ক্যাপ্টেন বর্কেন বড় মনিটরটির দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছেন। তিনি মনিটরটি বন্ধ করে মাথা ঘুরিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি অ্যালার্ম বাজিয়ে সবাইকে ডেকে এনেছি—যদিও তোমাদের মনে হতে পারে ডেকে আনার প্রয়োজন ছিল না। তোমাদের মনে হতে পারে এটি মোটেও মহাকাশযানের একটি জরুরি ঘটনা নয়।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন চুপ করলেন এবং মধ্যবয়স্ক ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার লি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে মহামান্য ক্যাপ্টেন?"

"তোমরা সবাই জান আমরা আমাদের এই মহাকাশযানে করে সতের জন নীলমানবকে বিজ্ঞান একাডেমিতে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা নিশ্চয়ই এটাও জান যে নীলমানবেরা এই মহাজগতের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ এবং সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী। আমি যদি তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে শীতলঘরে করে নিতে পারতাম, তা হলে স্বস্তিবোধ করতাম। কিন্তু বিজ্ঞান একাডেমির বিশেষ নির্দেশে আমরা তাদেরকে একটা ঘরে বন্ধ করে মুক্ত অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছি।" ক্যাপ্টেন বর্কেন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার একটি সন্দেহ ছিল যে, এরা নিশ্চয়ই কোনোভাবে এখান থেকে নিজেদের মুক্ত করে মহাকাশযানটি দখল করার চেষ্টা করবে।"

ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার লি শঙ্কিত গলায় বললেন, "তারা কি কিছু করেছে?"

"আমার ধারণা প্রক্রিয়াটি তারা শুরু করেছে।"

উপস্থিত সবাই একসাথে চমকে উঠল। কমবয়সী একটা মেয়ে বলল, "তারা কী করছে?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কিছুক্ষণ আগে একজন নীলমানব তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের কবজির ধমনিটা কেটে ফেলেছে। তার শরীর থেকে নীল রক্ত বের হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মাঝেই এই নীলমানবটি মারা যাবে।"

কমবয়সী মেয়েটা ছটফট করে বলল, "কিন্তু এটা তো আত্মহত্যা। নীলমানবেরা নিজেরা আত্মহত্যা করে কেমন করে আমাদের মহাকাশযান দখল করবে?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "নীলমানবেরা যে ঘরটিতে আছে, সেটা বলা যেতে পারে একটা দুর্ভেদ্য ঘর, তার ভেতরে কারো যাবার কিংবা বের হবার ব্যবস্থা নেই। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দিয়ে তাদের খাবার দেওয়া হয়, তাদের বর্জ্য সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু এখন—"

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটু থামলেন—সবার দিকে একনজর দেখে বললেন, "কিন্তু এখন এই দুর্ভেদ্য ঘরের দরজা আমাদের খুলতে হবে। নীলমানবেরা মানুষ নয়—তাই যে নীলমানবটি তার হাতের কবজি কেটে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে, তাকে বাঁচানোর আমাদের কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু বিজ্ঞান একাডেমি এদেরকে জীবন্ত পেতে চায়। আমাদের এখন একে বাঁচাতে চেষ্টা করতে হবে। এবং সেজন্য এখন আমাদের এই ঘরের দরজা খুলে ঢুকতে হবে।"

মহাকাশযানের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ক্রুশ ভুরু কুঁচকে বললেন, "মহামান্য ক্যাপ্টেন, আপনার ধারণা এই ঘরের দরজা খোলার জন্য নীলমানবটি আত্মহত্যা করেছে?"

"আমার তা-ই ধারণা।"

"তা হলে এর একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। নীলমানবেরা সবাই মিলে এই পরিকল্পনাটি করেছে?"

"হ্যাঁ। নীলমানব বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। তারা সব সময় একসাথে কাজ করে। এরা এক ধরনের সমন্বিত প্রাণসত্তা।"

নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ক্রুশ গম্ভীর মুখে বললেন, "যদি তারা সত্যিই এটি পরিকল্পনা করে থাকে, তা হলে আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম সেটি জানবে। কারণ আমরা তাদের প্রত্যেকের প্রতিটি পদক্ষেপ মনিটর করছি। আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম কী বলছে?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন বললেন, "সেটাই হচ্ছে সমস্যা। আমাদের মহাকাশযানের মূল সিকিউরিটি প্রসেসর যে রিপোর্ট দিয়েছে, সেখানে কোথাও কোনো ধরনের পরিকল্পনার কথা নেই। কোনো ষড়যন্ত্র নেই। নীলমানবেরা হালকা কথাবার্তা বলেছে, দাবা জাতীয় একটা খেলা খেলে সময় কাটিয়েছে, গান করেছে এবং বেশিরভাগ সময়ে কিছু না করে চুপচাপ ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থেকেছে।"

নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ক্রুশ একটি নিশ্বাস ফেলে সহজ গলায় বললেন, "মহামান্য বর্কেন, আমার মনে হয় আপনার সন্দেহটি অমূলক। নীলমানবের আত্মহত্যাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমাদের মহাকাশযান দখল করার প্রক্রিয়া এটা নয়।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন কিছুক্ষণ ক্রুশের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমি সত্যিই চাই যে, তোমার ধারণা সত্যি প্রমাণিত হোক এবং আমি ভুল প্রমাণিত হই। কিন্তু—"

"কিন্তু?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন হাত দিয়ে বড় মনিটরের সুইচটা স্পর্শ করে সেটা অন করে দিলেন। নীলমানবদের ঘরের দৃশ্যটি মুহূর্তের মাঝে ফুটে উঠল।

একজন নীলমানব মেঝেতে নিথর হয়ে শুয়ে আছে। তার চোখ দুটো খোলা, ডান হাতটি অবসন্ন হয়ে পাশে পড়ে আছে। কবজির খানিকটা অংশ কাটা। সেখান থেকে রক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুইয়ে চুইয়ে বের হয়ে শরীরের নিচে জড়ো হয়েছে। রক্তের রঙ নীল, এখন কালচে হয়ে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। তার মাথার কাছে একজন নীলমানব স্থির হয়ে বসে আছে—তার মুখ পাথরের মতো ভাবলেশহীন। দুজন মেঝেতে ছক কেটে রাখা ঘরের দু পাশে বসে খেলছে। তাদের পাশে আরো দুজন স্থির হয়ে বসে আছে। একজন করুণ বিষণ্ন স্বরে গান গাইছে। অন্যেরা দেয়ালে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে বসে আছে।

সমস্ত দৃশ্যটি একটি পরাবাস্তব দৃশ্যের মতো।

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি নীলমানবদের বিশেষজ্ঞ নই কিন্তু তারপরও আমি বলতে পারি, এই দৃশ্যটি স্বাভাবিক নয়। এটি স্বাভাবিক হতে পারে না। একজন মানুষের মৃত্যুর সময়ে অন্যেরা এত নিস্পৃহ হতে পারে না। নীলমানব হলেও না।"

নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ক্রুশ বললেন, "দৃশ্যটি অস্বাভাবিক হতে পারে মহামান্য ক্যাপ্টেন, কিন্তু এখানে তো কোনো ষড়যন্ত্রের আভাস নেই।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ক্রুশের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর শান্ত গলায় বললেন, "এই দৃশ্যটিতে ষড়যন্ত্রের কোনো আভাস নেই—আমার ধারণা সেটাই হচ্ছে ষড়যন্ত্র।"

ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার লি বললেন, "এই নীলমানবটিকে বাঁচানোর জন্য কী করা হবে মহামান্য ক্যাপ্টেন?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন মনিটরটির দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "প্রথমে ঘরটিতে নিথিলিয়াম গ্যাস দেওয়া হবে। গ্যাসের বিক্রিয়ায় সবাই অচেতন হয়ে যাবার পর নিরাপত্তাকর্মীরা ঘরটিতে ঢুকবে। কবজি কেটে যে নীলমানবটি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে, তাকে বের করে আনা হবে চিকিৎসা করার জন্য।"

"তাকে কি বাঁচানো সম্ভব হবে?"

"জানি না। শুনেছি নীলমানবদের প্রাণশক্তি আমাদের প্রাণশক্তি থেকে অনেক বেশি। হয়তো বেঁচে যেতেও পারে।"

নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ক্রুশ বললেন, "আমরা তা হলে কাজ শুরু করে দিই?"

"হ্যাঁ। শুরু করে দাও।" ক্যাপ্টেন বর্কেনকে হঠাৎ কেন জানি ক্লান্ত দেখায়, তিনি ঘুরে অন্য সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "অ্যালার্মের শব্দ শুনে চলে আসার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমি সবাইকে সবকিছু জানিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, যেন হঠাৎ করে আমরা আক্রান্ত হয়ে না পড়ি।"

কমবয়সী মেয়েটি বলল, "কিন্তু আমাদের তো এখন আক্রান্ত হবার কোনো আশঙ্কা নেই—তাই না?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন কোনো কথা না বলে অন্যমনস্কভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ক্রুশ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "না, কোনো আশঙ্কা নেই। এখন আপনারা সবাই নিজেদের কেবিনে কিংবা নিজেদের স্টেশনে ফিরে যেতে পারেন।" ক্রুশ মাথা ঘুরিয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কমান্ডে যারা আছ, তারা আমার সাথে এস। সবাই নিজেদের অস্ত্রগুলো লোড করে রেখ।"

মহাকাশচারীরা একজন একজন করে কন্ট্রোলরুম থেকে বের হয়ে যেতে শুরু করার পর ক্যাপ্টেন বর্কেন মনিটরের সামনে বড় চেয়ারটিতে বসলেন। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে মনিটরটি চালু করে কার্গো বে'তে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে হাত দিয়ে টেবিলে শব্দ করতে লাগলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মহামান্য ক্যাপ্টেন—" গলার স্বর শুনে ক্যাপ্টেন বর্কেন মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন রিরা তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাপ্টেন বর্কেন হালকা গলায় বললেন, "কী ব্যাপার রিরা?"

"আমি কি আপনার সাথে এখানে কিছুক্ষণ থাকতে পারি?"

"এখানে থাকতে চাও?"

"জি মহামান্য ক্যাপ্টেন।"

"কেন?"

রিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় বলল, "আমাদের একাডেমিতে কয়েকটা কেস স্টাডি পড়ানো হয়েছিল, তার ভেতরে আপনার দুটো অভিযানের ঘটনা ছিল। আমি সেগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। আমার মনে হয়েছে, কিছু কিছু বিষয়ে আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। গ্রিসান গ্রহপুঞ্জে আপনি যেভাবে বিপদের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটি রীতিমতো অলৌকিক।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন কোনো কথা না বলে একটু হাসলেন। রিরা একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "আমার ধারণা নীলমানবদের ব্যাপারে আপনি যে আশঙ্কাটুকুর কথা বলেছেন, সেটা সত্যি প্রমাণিত হবে।"

"তোমার তাই ধারণা?"

"আমার নিজের কোনো ধারণা নেই মহামান্য ক্যাপ্টেন, আমার এই বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি, সেটা থেকে আমার ধারণা আপনার আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হবে। নীলমানবেরা মহাকাশযান দখল করার চেষ্টা করবে। আমি আপনার কাছাকাছি থেকে পুরো ব্যাপারটি দেখতে চাই মহামান্য ক্যাপ্টেন। আপনি কীভাবে পুরো বিষয়টির অবসান ঘটান, আমি সেটা নিজের চোখে দেখতে চাই মহামান্য ক্যাপ্টেন।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "গ্রিসান গ্রহপুঞ্জে আমার ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে কাজে লেগেছে, সেরকম অনেক জায়গায় আমার ভবিষ্যদ্বাণীর ভুল বের হয়েছে। আমি খুব আন্তরিকভাবে চাই, এবারে আমার আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হোক। তা না হলে—"

"তা না হলে?"

"এখানে যে ভয়ংকর রক্তারক্তি হবে, সেটি কোনো মহাকাশযানের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটে নি।" ক্যাপ্টেন বর্কেন সোজা হয়ে তার চেয়ারে বসে মনিটরটি উজ্জ্বল করতে করতে বললেন, "এবং সেই রক্তের রঙ হবে লাল ও নীল।"

রিরা কোনো কথা বলল না, কিন্তু নিজের অজান্তেই সে কেমন জানি শিউরে ওঠে।

নিথিলিয়াম গ্যাস সিলিন্ডারের ভাল্বটি খোলার সাথে সাথে নীলমানবদের একজন উপরের দিকে তাকাল। ক্যাপ্টেন দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "বুঝতে পেরেছে।"

রিরা একটু অবাক হয়ে বললেন, "কেমন করে বুঝতে পেরেছে? নিথিলিয়াম বর্ণহীন এবং গন্ধহীন গ্যাস।"

"নিথিলিয়াম আমাদের কাছে বর্ণহীন এবং গন্ধহীন গ্যাস। নীলমানবদের ইন্দ্রিয় আমাদের থেকে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাও আমাদের থেকে বেশি।"

রিরা নিশ্বাস আটকে রেখে বলল, "এখন কী হবে মহামান্য ক্যাপ্টেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছুই হবে না। আগে হোক পরে হোক ওরা বুঝতে পারত, আমরা নিথিলিয়াম বা অন্য কোনো গ্যাস দিয়ে তাদের অচেতন করে ফেলব।"

রিরা রুদ্ধশ্বাসে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইল। যে নীলমানবটি উপরের দিকে তাকিয়েছিল সে উঠে দাঁড়াল এবং রিরা বুঝতে পারল সে একজন নারী। ক্যাপ্টেন বর্কেন বললেন, "এই মেয়েটি সম্ভবত অন্তঃসত্ত্বা—অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল হয়।"

মেয়েটি অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দুই পা হেঁটে হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলল এবং তখন একসাথে সবাই উপরের দিকে তাকাল। তারা বুঝতে পারছে এই ঘরের ভেতর নিথিলিয়াম গ্যাস দেওয়া হচ্ছে। তাদের মুখে কোনো ধরনের অনুভূতির চিহ্ন ফুটে উঠল না, স্থির হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ক্যাপ্টেন বর্কেন ফিসফিস করে বললেন, "বাতাসে এক পিপিএম নিথিলিয়াম থাকলেই মানুষ অচেতন হয়ে যায়। এদের দেখ দশ পিপিএম দিয়েও কিছু হচ্ছে না।"

ক্যাপ্টেন বর্কেনের কথা শেষ হবার আগেই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকা একজন নীলমানব কাত হয়ে পড়ে গেল। রিরা বলল, "অচেতন হতে শুরু করেছে।"

"হ্যাঁ।" কিছুক্ষণের মাঝেই আরো দু-একজন কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিও একসময় হাঁটু ভেঙে নিচে পড়ে গেল। ক্যাপ্টেন বর্কেন নিচু গলায় বললেন, "চমৎকার। নিথিলিয়াম কাজ করতে শুরু করেছে। কিন্তু—"

"কিন্তু কী মহামান্য ক্যাপ্টেন?"

"কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে এখানে।"

রিরা একটু অবাক হয়ে বলল, "কী অস্বাভাবিক ব্যাপার?"

"আমি বুঝতে পারছি না—কিন্তু কিন্তু—" ক্যাপ্টেন বর্কেনের ভুরু কুঁচকে উঠল, তিনি অবাক হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকা নীলমানবদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই দৃশ্যে কিছু একটা অস্বাভাবিকতা আছে, ব্যাপারটি তিনি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারছেন, কিছু বুঝতে পারছেন না।

কন্ট্রোলরুমের বড় মনিটরে হঠাৎ করে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ক্রুশের ছবি ভেসে উঠল। ক্রুশ মাথা তুলে ক্যাপ্টেন বর্কেনের কাছে ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন। বললেন, "আমার দলটি প্রস্তুত মহামান্য বর্কেন। আমরা কি ভেতরে যেতে পারি?"

"একটু দাঁড়াও ক্রুশ।"

"কেন মহামান্য ক্যাপ্টেন?"

"আমার কাছে কিছু একটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।"

"সেটা কী মহামান্য বর্কেন?"

"আমি এখনো জানি না।"

"আমরা কি অপেক্ষা করব? আহত নীলমানবটির কিন্তু অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে, তা ছাড়া নিথিলিয়াম খুব তাড়াতাড়ি অক্সিডাইজড হয়ে যায়—আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।"

"আমি জানি।" ক্যাপ্টেন বর্কেন বললেন, "তবুও একটু অপেক্ষা কর।"

ক্রুশের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "আপনি শুধু শুধু আশঙ্কা করছেন মহামান্য ক্যাপ্টেন। আপনি আমাদের ওপর ভরসা করতে পারেন। আমার দলটি অত্যন্ত সুগঠিত এবং দায়িত্বশীল। ভেতরে কোনো ধরনের অঘটন ঘটা সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা ছাড়া নীলমানবেরা সবাই অচেতন হয়ে আছে। নিথিলিয়াম গ্যাসটি অত্যন্ত কার্যকর গ্যাস।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বেশ। তোমরা ঢোকো।"

রিরা ফিসফিস করে বলল, "মহামান্য ক্যাপ্টেন, আপনি অনুমতি না দিলেই পারতেন। আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাধারণত ভুল করে না।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন রিরার কথায় উত্তর না দিয়ে ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ চোখে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইলেন, ঘরের ভেতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নীলমানবেরা পড়ে আছে—দৃশ্যটি দেখে মনে হয় কোনো পরাবাস্তব জগতের দৃশ্য।

নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান শক্তিশালী আরগন লেজার দিয়ে বন্ধ ঘরের দরজা কেটে আলাদা করতে শুরু করতেই ক্যাপ্টেন বর্কেন লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, চিৎকার করে বললেন, "সর্বনাশ!"

রিরা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে মহামান্য ক্যাপ্টেন?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন চিৎকার করে বললেন, "থামো। থামো তোমরা—।"

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, বিশাল দরজা হাট করে খুলে ভেতরে ঢুকে গিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন। ভেতরের নিথিলিয়াম থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাদের শরীরে বায়ুরোধক পোশাক, সেই পোশাকে তাদেরকে দেখাচ্ছে অতিকায় পতঙ্গের মতো। তাদের হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো দেখাচ্ছে খেলনার মতো।

রিরা ভয় পাওয়া মুখে বলল, "কী হয়েছে মহামান্য ক্যাপ্টেন? কী হয়েছে?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন খুব ধীরে ধীরে তার চেয়ারে বসে ফিসফিস করে বললেন, "আমরা সবাই শেষ হয়ে গেলাম।"

"কী বললেন?" আর্তচিৎকার করে রিরা বলল, "কী বললেন আপনি?"

"আমরা শেষ হয়ে গেলাম। কেউ আর আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।"

"কেন?"

"নীলমানবেরা নিথিলিয়াম গ্যাস দিয়ে আক্রান্ত হয় নি। তারা ভান করেছে আক্রান্ত হয়েছে।"

"আপনি কেমন করে জানেন?"

"সবাই অচেতন হয়েছে একইভাবে—একই ভঙ্গিতে—মাথা নিচু করে উপুড় হয়ে—কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না—সবাই মুখ ঢেকে রেখেছে।"

"এখন কী হবে?"

"ওরা উঠে দাঁড়াবে।"

ক্যাপ্টেন বর্কেনের কথা শেষ হবার আগেই ঘরের একেবারে অন্যপ্রান্তে পড়ে থাকা নীলমানবটি উঠে দাঁড়াল—হঠাৎ করে লাফিয়ে নয়, খুব সহজ ভঙ্গিতে। যেন কিছুই হয় নি—কোনো একজন পুরাতন বন্ধুকে দেখে একজন মানুষ যেভাবে উঠে দাঁড়ায় সেভাবে। তারপর টলতে টলতে সে এগিয়ে আসতে থাকে নিরাপত্তা বাহিনীর দলটির দিকে। নিরাপত্তা বাহিনীর দলটি হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—কী করবে বুঝতে পারে না।

রিরা চাপা গলায় বলল, "এখন কী হবে?"

"গুলি করবে। গুলি করে মারবে নীলমানবটিকে।"

"কেন মারবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড শব্দে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র গর্জন করে উঠল—নীলমানবটির শরীর ঝাঁজরা হয়ে যায় মুহূর্তে। ঝনঝন করে কাচ ভেঙে পড়ল ঘরের ভেতর!

"ঘরের ভেতর বিশুদ্ধ বাতাস আনার ব্যবস্থা করল—আর ভয় নেই নীলমানবদের। নিথিলিয়ামে অচেতন থাকবে না কেউ।"

ক্যাপ্টেন বর্কেনের কথা শেষ হবার আগেই ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা নীলমানবেরা উঠে দাঁড়ায়, টলতে টলতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষগুলোর ওপর। প্রচণ্ড গুলির শব্দে কানে তালা লেগে গেল, ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

"তুমি কিছু বোঝার আগে নীলমানবেরা ছুটে আসবে—একজন একজন করে সবাইকে হত্যা করবে ওরা।" ক্যাপ্টেন বর্কেনের গলার স্বর হঠাৎ আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে গেল, তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "কী আশ্চর্য! আমি এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারি নি।"

রিরা রক্তশূন্য মুখে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে রইল। মনিটরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, নীলমানবেরা অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে প্রতিরক্ষা বাহিনীর দলটির থেকে—বায়ু নিরোধক পোশাক পরে থাকায় তারা ঠিকভাবে নড়তে পারছিল না, ক্ষীপ্র নীলমানবেরা অবলীলায় তাদের কাবু করেছে। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে বেশ কয়জন নীলমানবের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু সেজন্য কারো ভেতর এতটুকু ভয়ভীতি বা দুর্বলতা এসেছে বলে মনে হল না। নীলমানবেরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে বেপরোয়াভাবে গুলি করতে করতে ছুটে আসছে। তাদের ভাবলেশহীন মুখে এই প্রথমবার হিংস্র প্রতিহিংসার একটা চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করতে করতে তারা মহাকাশযানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পুরো মহাকাশযানটাকে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত না করে তারা থামবে না।

রিরা ক্যাপ্টেন বর্কেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা এখন কী করব মহামান্য ক্যাপ্টেন?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "আমাদের করার কিছু নেই। এই মহাকাশযানে যারা আছে, তারা সাধারণ মহাকাশচারী। এই নীলমানবেরা যোদ্ধা—ওদের হাতে এখন অস্ত্র। আমাদের আর কিছু করার নেই।"

"কিন্তু—"

ক্যাপ্টেন বর্কেন এক ধরনের স্নেহ নিয়ে রিরার দিকে তাকিয়ে শোনা যায় না এরকম গলায় বললেন, "আমরা যদি নীলমানবদের ভেতরে এই ভয়ানক প্রতিহিংসার জন্ম না দিতাম, তা হলে হয়তো এই অবস্থা হত না। নীলমানবদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত ছিল।"

"কিন্তু এখন কিছুই কি করতে পারব না?"

ক্যাপ্টেন বর্কেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "কিছু একটা চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। কার্গো বে থেকে মূল মহাকাশযানের করিডরটাতে যদি এদের কিছুক্ষণ আটকে রাখা যায়, তা হলে মহাকাশযানের অন্য ক্রুরা হয়তো খানিকটা সময় পাবে। তারা হয়তো কিছু ভারী অস্ত্র বের করে এনে সত্যিকারের একটা প্রতিরোধ দিতে পারে।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন দেয়ালের একটা সুইচ স্পর্শ করে বেশ বড় একটা অংশকে নামিয়ে আনলেন। ভেতরে বড় বড় কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সাজানো। তিনি একটা বহু ব্যবহৃত অস্ত্র টেনে নামিয়ে দক্ষ হাতে লোড করে বললেন, "কখনো ভাবি নি এটা আবার ব্যবহার করতে হবে। ভেবেছিলাম খুনোখুনির পর্যায় পার হয়ে এসেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিরা দেয়াল থেকে অন্য একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নামিয়ে নিল, ক্যাপ্টেন বর্কেন তাকে বাধা দিলেন না। এই অস্ত্র কে কখন কীভাবে ব্যবহার করতে পারবে—সেটি নিয়ে নানারকম নিয়মকানুন আছে, কিন্তু সেসব এখন পুরোপুরি অর্থহীন। ক্যাপ্টেন বর্কেন বললেন, "তুমি ডান দিক দিয়ে যাও, আমি বাম দিকে আছি, মিনিট পাঁচেক আটকে রাখতে পারলেই অনেক। মাথা ঠাণ্ডা রেখ—খুব কাছে না আসা পর্যন্ত গুলি করো না। নিশানা ঠিক রেখ—হত্যা খুব ভয়ংকর একটা ব্যাপার—কিন্তু তারপরেও আমাদের করতে হয়। বেঁচে থাকার জন্য ফুড চেইন নামে একটা প্রক্রিয়ায় একজন প্রাণী অন্য প্রাণীকে বহুদিন থেকে হত্যা করে আসছে। মনে রেখ যত বেশিজন নীলমানবকে হত্যা করতে পারবে, আমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি।"

রিরা মাথা নাড়ল, ক্যাপ্টেন বর্কেন তার হাত স্পর্শ করে বললেন, "আমি খুব দুঃখিত রিরা। খুব দুঃখিত।"

"আপনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি।"

ক্যাপ্টেন বর্কেন শব্দ করে হাসলেন, বললেন, "যদিও সেই সুযোগটা হচ্ছে খুব অল্পবয়সে নীলমানবের হাতে খুন হয়ে যাওয়ার সুযোগ।"

কার্গো বে'-র করিডরে বড় ধাতব দরজার নিচু অংশে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি বসিয়ে রিরা অপেক্ষা করতে থাকে। দূরে গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। নীলমানবেরা গুলি করতে করতে ছুটে আসছে। নৃশংস নীলমানব নিয়ে তার খুব কৌতূহল ছিল, একটু পরেই তাদেরকে সে দেখবে। প্রথমবার তাদেরকে সামনাসামনি দেখবে, হয়তো শেষবার।

AMARBOI.COM

রিরা খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। মহাকাশযানটিতে এক বিস্ময়কর নীরবতা। কিছুক্ষণ আগেই ভয়ংকর শব্দে পুরো মহাকাশযানটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল—এখন হঠাৎ করে এই নৈঃশব্দ্যকে অসহনীয় আতঙ্কের মতো মনে হতে থাকে। রিরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি হাতে নিয়ে চারদিকে তাকাল। পুরো মহাকাশযানটি একটি ধ্বংসস্তূপের মতো, দেয়ালে বড় বড় গর্ত, ধাতব বিম ভেঙে পড়েছে, এদিকে সেদিকে আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছে, চারদিকে কালো ধোঁয়া এবং পোড়া গন্ধ।

রিরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—পুরো মহাকাশযানে কোথাও কোনো জীবিত প্রাণীর শব্দ নেই। কারো কথা, কারো নিশ্বাস, এমনকি যন্ত্রণার একটু কাতরধ্বনিও নেই। নীলমানব আর এই মহাকাশযানের মহাকাশচারীরা কি তা হলে পরস্পর পরস্পরকে একেবারে পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দিয়েছে? হঠাৎ করে রিরার ভেতরে এক অচিন্তনীয় আতঙ্ক এসে ভর করে—সে কি তা হলে এই মহাকাশযানে একমাত্র জীবিত প্রাণী? রিরা ফিসফিস করে নিজেকে বলল, "না না—এটা হতে পারে না। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। নিশ্চয়ই বেঁচে আছে।"

রিরা খুব সতর্ক পায়ে হাঁটতে শুরু করে, তীক্ষ্ণ চোখে সে তাকায়—কোথাও কি কেউ আছে?

করিডরের গোড়ায় সে ক্যাপ্টেন বর্কেনের মৃতদেহটি দেখতে পেল—ভয়ংকর গোলাগুলির মাঝে থেকেও তার মৃতদেহটি আশ্চর্যরকম অক্ষত। মুখে এক ধরনের প্রশান্তির চিহ্ন, দেখে মনে হয় কোনো একটা কিছু দেখে কৌতুক বোধ করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিরা কিছুক্ষণ মৃতদেহটির কাছে দাঁড়িয়ে রইল, তার ভেতরে দুঃখ, ক্রোধ বা হতাশা কোনো ধরনের অনুভূতিই নেই, সে ভেতরে এক ধরনের আশ্চর্য শূন্যতা অনুভব করে। রিরা অনেকটা যন্ত্রের মতো মৃতদেহটি ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করে।

দুজন নীলমানবের মৃতদেহ পাওয়া গেল কন্ট্রোলরুমের দরজায়। শক্তিশালী কোনো বিস্ফোরকের আঘাতে একজনের মস্তিষ্কের বড় অংশ উড়ে গেছে। গুলির আঘাতে দ্বিতীয়জনের বুকের একটা অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে। কালচে এক ধরনের রক্তে পুরো জায়গাটা ভিজে আছে। মহাকাশযানের অভিযাত্রীদের মৃতদেহের বেশিরভাগ তাদের কেবিনের কাছাকাছি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। তাদের বেশিরভাগই ছিল নিরস্ত্র, প্রতিরোধ দূরে থাকুক নিজেদের রক্ষা করার সুযোগও কেউ পায় নি। ইঞ্জিনঘরের কাছাকাছি মনে হয় একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে, সেখানে ইতস্তত অনেকগুলো মৃতদেহ পড়ে আছে। নীলমানবদের মৃতদেহের বেশিরভাগই কুরু ইঞ্জিনের আশপাশে—মনে হয় তারা ইঞ্জিনটা ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল। উপরে নিরাপত্তাকর্মীরা থাকায় শেষপর্যন্ত ধ্বংস করতে পারে নি। ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের মৃতদেহটি পাওয়া গেল কন্ট্রোল প্যানেলের উপর—তার পায়ের কাছেই একজন নীলমানবের মৃতদেহ পড়ে আছে। আশপাশে চারদিকে ধস্তাধস্তির চিহ্ন—একপর্যায়ে মনে হয় অস্ত্র হাতে এরা হাতাহাতি যুদ্ধ করেছে, কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি, একটি মানুষ কিংবা নীলমানবও বেঁচে নেই। পুরো ইঞ্জিনঘরটির ভেতরে মনে হয় একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে—তার ভেতরে ধক ধক শব্দ করে এখনো ইঞ্জিনটি চলছে, সেটাই একটি রহস্য।

রিরা ইঞ্জিনঘর থেকে বের হয়ে কমিউনিকেশনস ঘরে গেল, সেখান থেকে মূল প্রসেসর ঘরে। প্রসেসর ঘর থেকে শীতলঘর, সেখান থেকে কার্গোঘরে—কোথাও একজন জীবিত প্রাণী নেই। একজন মানুষ কিংবা একজন নীলমানব কেউ বেঁচে নেই। এই পুরো মহাকাশযানে সে একা অসংখ্য মানুষ এবং নীলমানবের মৃতদেহ নিয়ে মহাকাশ পাড়ি দেবে—রিরা হঠাৎ করে অসহনীয় আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে।

ঠিক তখন সে একটা শব্দ শুনতে পেল, কোনো একজনের পদশব্দ কিংবা কোনো কিছু সরে যাবার শব্দ। নিজের অজান্তেই সে চিৎকার করে উঠল, "কে?"

নিঃশব্দে মহাকাশযানে তার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দেয় না। রিরা তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি হাতে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে তাকায়। কোনো মহাকাশচারী হলে নিশ্চয়ই তার প্রশ্নের উত্তর দিত—এটি হয়তো কোনো নীলমানব। ভয়ংকর দুর্ধর্ষ নৃশংস একজন নীলমানব। রিরা নিশ্বাস বন্ধ করে তার অস্ত্রটি ধরে রাখে, কোনো একটা কিছুকে নড়তে দেখলেই সে গুলি করবে।

আবার কিছু একটা নড়ে যাবার শব্দ হল—মনের ভুল নয়, নিশ্চিত শব্দ, কোনো জীবন্ত প্রাণীর সরে যাবার শব্দ। রিরা শক্ত হাতে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে এগুতে থাকে, করিডরের পাশেই একটা ছোট ঘর, তার ভেতর থেকে শব্দটা এসেছে। দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ করে লাথি দিয়ে দরজাটা খুলে অস্ত্র উদ্যত করে ভেতরে ঢুকে গেল সে—একমুহূর্ত সে নিশ্বাস নিতে পারে না আতঙ্কে। দেয়ালে হেলান দিয়ে স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে একজন নীলমানব। কী ভয়ংকর ক্রূর সে দৃষ্টি! রিরার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল আতঙ্কে।

রিরা নীলমানবটির মাথার দিকে অস্ত্রটি উদ্যত করে রেখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারল নীলমানবটি নিরস্ত্র ও আহত। পায়ের কাছাকাছি কোথাও গুলি লেগেছে। নীল রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ে পুরো জায়গাটা কালচে হয়ে আছে। নীলমানবটি ইচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেই তাকে হত্যা করতে পারবে না বুঝতে পেরে হঠাৎ সে তার শরীরে শক্তি ফিরে পায়, অস্ত্র হাতে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে সে অস্ত্রটি নীলমানবের মাথার দিকে তাক করে। হত্যা খুব ভয়ংকর ব্যাপার, তারপরেও আমাদের হত্যা করতে হয়। ক্যাপ্টেন বর্কেন বলেছিলেন, নিজেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনে অন্যকে হত্যা করতে হয়। রিরা এই মুহূর্তে নীলমানবটিকে হত্যা করবে। সে অস্ত্রটি নীলমানবের মাথার দিকে তাক করে ট্রিগার টেনে ধরল। কান ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দে পুরো ঘর প্রকম্পিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোনো শব্দ হল না; খট করে একটা শব্দ করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠল মাত্র। রিরা অস্ত্রটির দিকে তাকায়—গুলি শেষ হয়ে গেছে। কোমর থেকে নতুন ম্যাগজিন বের করে অস্ত্রতে লোড করে আবার সেটি উদ্যত করল নীলমানবের মাথার দিকে। নীলমানবটি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে—কী ভয়ংকর ক্রূর তার দৃষ্টি, মুখমণ্ডলে কী ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা! একটু আগে কী নৃশংসভাবেই না তারা এই মহাকাশের সবাইকে হত্যা করেছে! রিরা ট্রিগারে চাপ দিতে গিয়ে থেমে গেল, দৃষ্টিতে কি শুধু অমানবিক নিষ্ঠুরতা? তার সাথে কি একটু ভয়, একটু আতঙ্ক এবং শূন্যতা নেই? তাকে হত্যা না করার জন্য কাতর প্রার্থনা নেই? বেঁচে থাকার জন্য আকুলতা নেই?

রিরা অস্ত্রটি নামিয়ে রাখল, পায়ে গুলি লেগে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, নীলমানবটি এমনিতেই মারা যাবে—তার মাথায় গুলি করে তাকে আলাদাভাবে হত্যা করার প্রয়োজন নেই। সে ঘরটির চারদিকে তাকাল, এখান থেকে বের হয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখলে নীলমানবটি এই ঘর থেকে বের হতে পারবে না—আপাতত আটকে থাকুক এই ঘরে। রিরা ঘরটি বন্ধ করে বের হয়ে এল।

কন্ট্রোলরুমের দরজায় ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকা নীলমানবটির মৃতদেহ ডিঙিয়ে রিরা কন্ট্রোলরুমের ভেতরে এসে ঢোকে। ক্যাপ্টেন বর্কেন যে চেয়ারটিতে বসতেন, তার পাশে দাঁড়িয়ে সে সুইচ স্পর্শ করল। মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কেউ এই কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহার করার কথা নয়। কিন্তু এখন পুরোপুরি ভিন্ন একটা অবস্থা, জরুরি অবস্থায় যে-কেউ মূল প্রসেসরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। শিক্ষানবিশ মহাকাশচারী হিসেবে তাদেরকে অনেকবার এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। রিরা তার রেটিনা স্ক্যান করিয়ে গোপন পাসওয়ার্ডটি প্রবেশ করাল। সাথে সাথেই উত্তর আসার কথা কিন্তু কোনো উত্তর না এসে মনিটরটি নিরুত্তর হয়ে রইল। রিরা এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে, সে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করল। দুই চোখের রেটিনা স্ক্যান করিয়ে সে আবার গোপন পাসওয়ার্ডটি প্রবেশ করাল। কয়েক মুহূর্ত পরে মনিটরে কিছু আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যায় এবং শুষ্ক কণ্ঠস্বরে মূল প্রসেসর যোগাযোগ করার চেষ্টা করল, "জরুরি পর্যায় আট, আমি আবার বলছি মহাকাশযানে জরুরি পর্যায় আট।"

রিরা এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। মহাকাশযান অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে জরুরি পর্যায় দশ ঘোষণা করা হয়—এই মহাকাশযানটি সেই পর্যায় থেকে মাত্র দুই পর্যায় উপরে রয়েছে। নীলমানবেরা যখন মহাকাশযানে আক্রমণ করেছিল, তখন মহাকাশযানটিকে নিশ্চয়ই পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। জরুরি পর্যায় পাঁচ পর্যন্ত মহাকাশযান সহ্য করতে পারে। জরুরি পর্যায় আট পৌঁছে গেলে সেটা পরিত্যাগ করে সরে যাবার কথা—যে কোনো মুহূর্তে সেটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। রিরা কাঁপা গলায় বলল, "আমি মহাকাশযানচারী রিরা। মহাকাশযানে একমাত্র জীবিত মানুষ—আমার সাহায্যের প্রয়োজন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুষ্ক কণ্ঠস্বরে মহাকাশযানের প্রসেসর উত্তর করল, "এই মহাকাশযান খুব শিগগিরই ধ্বংস হয়ে যাবে। মহাকাশযানের বায়ুর পরিশীলন সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বাতাসের চাপ কমে আসছে। কুরু ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জ্বালানি টিউবে ফুটো হওয়ার কারণে জ্বালানি ছড়িয়ে পড়ছে।"

রিরা নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, "কেন্দ্রীয় মহাকাশ কেন্দ্রে খবর পাঠানো প্রয়োজন। জরুরি সাহায্য না পেলে—"

"বিস্ফোরণের কারণে যোগাযোগ কেন্দ্র নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের পক্ষে বাইরে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়।"

রিরা আর্তচিৎকার করে বলল, "বাইরে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়?"

"না।"

"এই মহাকাশযানটা কয়েকদিনের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ। মহাকাশযানে বাতাসের চাপ কমে আসছে। ইঞ্জিনঘরে যে জ্বালানি ছড়িয়ে পড়েছে, যে কোনো মুহূর্তে সেটা দিয়ে বিস্ফোরণ হতে পারে।"

"এবং সাহায্য পাবার কোনো আশা নেই?"

মহাকাশযানের মূল প্রসেসর শুষ্ক কণ্ঠে বলল, "সাহায্য পাবার সম্ভাবনা দশমিক শূন্য তিন।"

"চমৎকার!" রিরা হঠাৎ আবিষ্কার করল পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তার যেরকম অস্থির হয়ে যাবার কথা ছিল, সে মোটেও সেরকম অস্থির হয়ে উঠছে না। বরং পুরো ব্যাপারটা সে বেশ সহজভাবেই মেনে নিয়েছে। একটা নিশ্বাস ফেলে সে বেশ শান্ত গলায় বলল, "যদি তা-ই সত্যি হয় যে, এই মহাকাশযানে আগামী কয়েকদিনই আমার জীবনের শেষ কয়েকদিন, তা হলে সময়টা আমি ভালোভাবে কাটাতে চাই।"

মূল প্রসেসর শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করতে চাও রিরা?"

"প্রথমত মহাকাশযানে যে অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে আছে, সেগুলো যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সমাহিত করতে চাই। সেটা সম্ভব না হলে সেগুলোকে অন্তত হিমঘরে সংরক্ষণ করতে চাই।"

"কাজটা একটু কঠিন হবে। মহাকাশযানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ অনেক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

"কঠিন হলেও করতে হবে।" রিরা একটু থেমে যোগ করল, "আমি এতগুলো মৃতদেহের মাঝে একদিনও থাকতে পারব না।"

"রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে যদি দুএকটি নিচু শ্রেণীর রোবট অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, তা হলে তাদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

"ঠিক আছে। মৃতদেহগুলো সরিয়ে নেবার পর মহাকাশযানটিকে পরিষ্কার করতে হবে। সব জায়গা রক্ত এবং ক্লেদে মাখামাখি হয়ে আছে।"

"ভ্যাকুয়াম সিস্টেম ব্যবহার করে সেটা সহজেই পরিষ্কার করা যাবে।"

"আমার থাকার জন্য খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে দিলেই আপাতত কাজ চলে যাবে।"

"সেটি কোনো সমস্যা নয়, ক্যাপ্টেনের নিজস্ব অতিরিক্ত কেবিনটি তুমি ব্যবহার করতে পারবে। সেখানে আরামদায়ক বিছানা, ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য বিনোদন কেন্দ্র, বিশেষ স্নায়ু-উত্তেজক পানীয় এই সবকিছু আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তার কোনো প্রয়োজন নেই। এখন মৃতদেহ সংরক্ষণের কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।"

রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে চারটি নিচু শ্রেণীর রোবট পেয়ে যাবার পরও মহাকাশকেন্দ্রের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহগুলো শীতল ঘরে নিয়ে সংরক্ষণ করে মহাকাশযানটি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য করতে করতে প্রায় আট ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়ে গেল। কাজ শেষ করে রিরা যখন ক্যাপ্টেনের অতিরিক্ত কেবিনে শুতে এসেছে, তখন সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। বিছানায় শোয়ার সাথে সাথে তার চোখে ঘুম নেমে এল—শুনতে পেল তার মহাকাশযানের মূল প্রসেসর শুষ্ক কণ্ঠে বলছে, "রিরা, অভুক্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তুমি আর কিছু না হলেও বলকারক একটু পানীয় মুখে দিয়ে নাও।"

না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে শরীরের কী কী ক্ষতি হতে পারে আবছাভাবে শুনতে শুনতে রিরা গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

রিরার ঘুম ভাঙল ভয়ংকর খিদে নিয়ে। ঘুম থেকে উঠে সে খানিকক্ষণ নরম বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে রইল। তার মনে পড়ল—সে একটি মহাকাশযানে একা এবং এই মহাকাশযানটি আগামী কয়েকদিনের মাঝেই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। ব্যাপারটি নিয়ে তার যেরকম বিচলিত হওয়ার কথা ছিল, সে সেরকম বিচলিত হল না। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে তার ভাবনা-চিন্তা সবকিছুই কেমন যেন ভোঁতা হয়ে এসেছে। রিরা কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল; মহাকাশযানের ইঞ্জিনের চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে—গুঞ্জনটির মাঝে কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে, যদিও সে পরিবর্তনটা ঠিক ধরতে পারল না। রিরা একসময় উঠে দাঁড়াল, শরীরের অবসাদ কেটে গেছে, ভালো করে কিছু খেয়ে নিতে পারলে সে দিনটি ভালোভাবে শুরু করতে পারবে। মহাকাশযানের সব মহাকাশচারী মারা গিয়েছে, বেঁচে আছে শুধু সে একা—জেনে প্রথমে তার ভেতরে এক ভয়াবহ আতঙ্কের জন্ম হয়েছিল। সে কী করবে কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না। মহাকাশযানটি কয়েকদিনের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাবে শুনে হঠাৎ করে তার আতঙ্ক এবং অস্থিরতা পুরোপুরি কেটে গেছে, সে আবিষ্কার করেছে তার আসলেই কিছু করার নেই। কাজেই জীবনের শেষ কয়টি দিনকে এখন যতটুকু সম্ভব অর্থবহ করাই হতে পারে একমাত্র অর্থপূর্ণ কাজ।

রিরা দীর্ঘ সময় নিয়ে শরীর পরিষ্কার করে সত্যিকার পানিতে স্নান সেরে নিয়ে পরিষ্কার একটি ওভার-অল পরে নেয়। ক্যাপ্টেনের সুদৃশ্য টেবিলে বসে সে যখন কী খাবে সেটা নিয়ে মহাকাশযানের প্রসেসরের সাথে কথা বলছিল, ঠিক তখন তার নীলমানবটির কথা মনে পড়ল। কী আশ্চর্য! সে একটি আহত নীলমানবকে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যাবার জন্য একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে তার কথা পুরোপুরি ভুলে গেছে! রিরা তার বিছানায় বসে দ্রুত খেয়ে নেয়। এক টুকরো রুটি, সত্যিকারের মাখন, পনির এবং খানিকটা কৃত্রিম প্রোটিন। খাবার শেষে এক মগ গরম কফি। রিরা খাওয়া শেষ করে তার অস্ত্রটি খুঁজে বের করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে কার্গো বে'র করিডরের শেষ মাথায় বন্ধ ঘরটিতে হাজির হল। সাবধানে তালা খুলে সে দরজা টেনে ভেতরে উঁকি দেয়, মনে মনে আশা করেছিল নীলমানবটি এতক্ষণে মরে গিয়ে সব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে দেখতে পেল নীলমানবটি এখনো বেঁচে আছে। রিরা নিজের ভেতরে এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করে, সে তার অস্ত্রটি হাতবদল করে হিংস্র আক্রোশ নিয়ে নীলমানবটির দিকে তাকাল, দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা গলায় বলল, "এখনো বেঁচে আছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীলমানবটি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আশ্চর্য রকমের এক ধরনের ভরাট গলায় বলল, "পানি।"

"পানি!" রিরা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, আহত নীলমানবটি তার কাছে পানি চাইতে পারে সেটি নিজের কানে না শুনলে সে বিশ্বাসই করত না। রিরা ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "আমার মহাকাশযানের সব মানুষকে একজন একজন করে গুলি করে মেরে ফেলেছ, এখন তুমি আমার কাছে পানি চাইছ, তোমার সাহস তো কম না! পানি নয়, তোমার মাথার খুলিতে চতুর্থ মাত্রার বিস্ফোরক দিয়ে একটা বুলেট পাঠানো দরকার। বুঝেছ?"

নীলমানবটি ধৈর্য ধরে রিরার কথা শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করল, তারপর আবার ঠিক আগের মতো ভরাট গলায় বলল, "পানি।"

রিরা আবার ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "চুপ কর শয়তানের বাচ্চা। আমি আমার জীবনের শেষ সময়টা তোমার মতো দানবদের সেবা-যত্ন করে কাটাতে পারব না। তোমার গুলি খেয়ে মরার কথা ছিল—তোমার চৌদ্দপুরুষের সৌভাগ্য যে গুলি খেয়ে মরতে হচ্ছে না। সভ্য মানুষের মতো রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছ। বুঝেছ?"

নীলমানবটি আবার ধৈর্য ধরে রিরার কথা শুনে গেল। তার কথা শেষ হবার পর বলল, "পানি। কিশিমারা।"

"কিশিমারা?" রিরা ধমক দিয়ে বলল, "কিশিমারা মানে কী? তিতির পাখির ঝলসানো কাবাব? নাকি আঙুরের রস? গ্যালাক্সির মহাসম্রাটের আর কী কী প্রয়োজন? ঘুমানোর জন্য নরম বিছানা? নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার সুগন্ধি বাতাস? স্নায়ু-উত্তেজক কিছু পানীয়?"

নীলমানবটি মাথা নাড়ল, এবং রিরার প্রথমবার মনে হল তার মুখে খুব সূক্ষ্ম এক ধরনের হাসি ফুটে উঠেছে। নীলমানবেরা যে মানুষের একটি অপভ্রংশ—এই প্রথমবার রিরার মাথায় উঁকি দিয়ে যায়। রিরা জিজ্ঞেস করল, "তা হলে কিশিমারা মানে কী?"

"কিশিমারা।" নীলমানবটি মুখে একটি কাতর ভঙ্গি করে হাত দুটি বুকের কাছে এনে অনুনয়ের ভঙ্গি করে।

"ও!" রিরার রাগ কমে আসে, "তা হলে কিশিমারা মানে অনুগ্রহ করে?"

নীলমানবটি মাথা নাড়ল, "কিশিমারা অনুগ্রহ... কিশিমারা... অনুগ্রহ পানি পানি অনুগ্রহ।"

"ঠিক আছে।" রিরা তার অস্ত্রটা হাতবদল করে বলল, "তোমাকে এক বোতল পানি দিচ্ছি কিন্তু আর কিছু পাবে না। এই বোতল পানি খেয়ে ঝটপট তোমাকে মরে যেতে হবে। বুঝেছ? আমি তোমার সেবা করতে পারব না।"

নীলমানবটি মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।" বুকে হাত দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বলল, "বুঝেছি।"

রিরা পানির একটি বোতলের সাথে কী মনে করে দুই টুকরো রুটি, এক টুকরো কৃত্রিম প্রোটিন আর একটা শুকনো ফল নিয়ে এল। ট্রেটা নীলমানবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "খাও। এবং মনে রেখ এটা হবে তোমার প্রথম এবং শেষ খাবার।"

নীলমানবটির মুখের মাংসপেশি হঠাৎ শিথিল হয়ে সেখানে একটি হাসি ফুটে ওঠে। রিরা প্রথমবার লক্ষ করল, নীলমানবটির বয়স খুব বেশি নয় এবং গায়ের রঙ নীল না হলে এবং চোখ দুটোতে এত অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকলে তাকে সুদর্শন মানুষ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যেত। নীলমানবটি খাবার ট্রেটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "কুগুরা।"

"কুগুরা?" রিরা কঠিন মুখে বলল, "কুগুরা মানে কী? আরো চাই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীলমানবটি খাবারটুকু দুই ভাগ করে এক ভাগ নিজের কাছে রেখে অন্য ভাগ রিরার দিকে এগিয়ে দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "কুগুরা।"

রিরার কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝতে যে নীলমানবটি তার খাবারের অর্ধেক তাকে খেতে দিয়েছে। যখন বুঝতে পারল তখন হঠাৎ সে শব্দ করে হেসে ফেলল, হাসতে হাসতে বলল, "এমনিতে মহাকাশযানের সব মানুষকে গুলি করে মেরে ফেল, কিন্তু খাবার বেলায় সেটা ভাগাভাগি করে খাও! এটা তোমাদের কোন ধরনের ভদ্রতা?"

নীলমানবটি কোনো কথা না বলে বোতলটি মুখে লাগিয়ে ঢকঢক করে অনেকখানি পানি খেয়ে রিরার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "কুগুরা। অনেক কুগুরা।"

"কুগুরা মানে কি ধন্যবাদ?"

"হ্যাঁ।" নীলমানবের মুখে আবার একটু হাসির চিহ্ন দেখা গেল, মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "ধন্যবাদ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

রিরা অর্ধেক করে তার কাছে পাঠানো খাবারের ট্রেটা ধাক্কা দিয়ে নীলমানবের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বলল, "কুগুরা। ধন্যবাদ। আমি খেয়ে এসেছি—এটা তোমার জন্য।"

তারপর দরজাটা টেনে বন্ধ করতে করতে বলল, "আবার যখন আসব, তখন যেন ঝামেলা না থাকে। খাবারটা খেয়ে ঝটপট মরে যাও। মনে থাকবে?"

নীলমানবটি দুই টুকরো রুটির মাঝে প্রোটিনের টুকরোটা রেখে সেটিতে একটা বড় কামড় দিয়ে বলল, "ধন্যবাদ। তোমাকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।"

AMARBOI.COM

কন্ট্রোল প্যানেলে ঝুঁকে পড়ে রিরা বলল, "আমাদের মহাকাশযানের এখন কী অবস্থা?"

মহাকাশযানে মূল প্রসেসর শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিল, "অবস্থা ভালো নয়। গত আঠার ঘণ্টায় আরো কিছু জ্বালানি ক্ষয় হয়েছে। কক্ষপথের পরিবর্তন না করলে আমরা অতিকায় অন্ধকার গ্রহটার মহাকর্ষ বলে আটকা পড়ে যাব।"

"তা হলে কক্ষপথ পরিবর্তন করছি না কেন?"

"দুটি কারণে। মহাকাশযানের ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যথেষ্ট জ্বালানি নেই। জ্বালানি পরিবহন টিউব ফেটে গিয়ে অনেক জ্বালানি নষ্ট হয়েছে।"

রিরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মহাকাশযানের বাতাসের কী খবর?"

"খুব দ্রুত বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে। আমরা রিজার্ভের বাতাস ব্যবহার করতে শুরু করেছি।"

রিরা চিন্তিত মুখে বলল, "এটা খুব খারাপ খবর।"

"হ্যাঁ।" মূল প্রসেসর শুষ্ক কণ্ঠে বলল, "রিজার্ভের বাতাস ব্যবহার করা খুব বিপজ্জনক।"

রিরা টেবিলে শব্দ করতে করতে বলল, "কিছু বাতাস রক্ষা করা যাক। কী বলো?"

"কীভাবে?"

"মহাকাশযানে আমি ছাড়া আর কোনো জীবিত প্রাণী নেই। আমার তো খুব বেশি জায়গার প্রয়োজন নেই। কাজেই অল্পকিছু জায়গা বায়ু নিরোধক করে ফেল।"

"তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না।"

"কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"গোলাগুলিতে দেয়ালে অনেক ফুটো হয়েছে।"

"ফুটোগুলো বন্ধ করা যাক।"

"মহাকাশযানের ফুটো বন্ধ করার কোনো ক্ষমতা আমার নেই।"

"আমি জানি মহাকাশযানে ফুটো বন্ধ করার তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। তুমি হচ্ছ তথ্যকেন্দ্র। তোমার তথ্যগুলো খুব প্রয়োজনীয় যখন সবকিছু ঠিকভাবে কাজ করে। যখন বড় কোনো বিপদ হয়, তখন মানুষকে নিজের চেষ্টায় বেঁচে থাকতে হয়। বুঝেছ?"

"মূল ভাবনাটা অনুমান করতে পারছি।"

রিরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সেটাই যথেষ্ট।"

মহাকাশযানের মূল প্রসেসর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, "তুমি তা হলে কীভাবে ফুটোগুলো বন্ধ করবে?

"অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করে।"

"কোন প্রাচীন পদ্ধতি?"

"ওয়েল্ডিং। ধাতব পাত এনে উপরে লাগিয়ে ওয়েল্ড করব। বাতাস বের হয়ে যাওয়া কমবে।"

"এটি অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার।"

রিরা বলল, "জানি। তোমার কি এর চাইতে ভালো কোনো পদ্ধতি জানা আছে?"

"না, জানা নেই। তবে—"

"তবে কী?"

"এরকম পরিশ্রমসাপেক্ষ একটি কাজ করে ঠিক কী লাভ হবে? মহাকাশযানটি দুদিন পরে ধ্বংস না হয়ে হয়তো তিন কিংবা চার দিন পরে ধ্বংস হবে। মহাকাশযানটিকে তো রক্ষা করা যাবে না।"

রিরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষের সাথে এখানে যন্ত্রের পার্থক্য। মানুষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে। যন্ত্র করে না।"

"কিন্তু যেখানে আশা নেই, সেখানে চেষ্টা করে কী লাভ?"

"আমি সেটা তোমাকে বুঝাতে পারব না। মানুষের ইতিহাস পড়ে দেখ, অসংখ্যবার তারা অসাধ্য সাধন করছে। তবে—" রিরা একমুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "আমার অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা নেই, কিন্তু শুধুমাত্র বসে বসে তো আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। কিছু একটা করে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাই।"

মহাকাশযানের মূল প্রসেসর শুষ্ক কণ্ঠে বলল, "তুমি কি নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য এখনই ওয়েল্ডিং করতে শুরু করে দেবে?"

"হ্যাঁ। ওয়েল্ডিঙের যন্ত্রপাতি কোথায় আছে বলে দাও। এই কাজে সাহায্য করার জন্য কি কোনো নিম্নশ্রেণীর রোবট পাওয়া যাবে?"

"আমি খুব দুঃখিত রিরা। এটি এত প্রাচীন পদ্ধতি যে, কোনো রোবটকে এটা শেখানো হয় না।"

রিরা টানা ছয় ঘণ্টা কাজ করে কন্ট্রোলরুমের আশপাশের দেয়ালগুলোর ফুটোগুলো ওয়েল্ডিং করে বন্ধ করার চেষ্টা করল। পুরোপুরি নিশ্ছিদ্র করতে পারল না, কিন্তু যেটুকু করেছে সেটা খারাপ নয়, বাতাস আগে থেকে অনেক কম বের হবে, মহাকাশযানটি পুরোপুরি বায়ুশূন্য হতে এখন নিশ্চিতভাবে আরো দুদিন বাড়তি সময় পাওয়া যাবে। রিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে মনে আশা করে আছে কোনো একটি উদ্ধারকারী মহাকাশযান তাদেরকে উদ্ধার করতে আসবে—সেজন্য মহাকাশযানটি যত দীর্ঘ সময় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, ততই বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। যদিও সে খুব ভালো করে জানে সুবিস্তৃত এই বিশাল মহাশূন্যে তাদেরকে উদ্ধার করতে যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময়টুকু তারা কোনোভাবেই মহাকাশযানটাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু কখনো কখনো তো অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে—তার জীবনেও কি একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটতে পারে না?

ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়ে খেতে বসে তার হঠাৎ করে নীলমানবের কথা মনে পড়ল। নীলমানবটি কি এখনো বেঁচে আছে? রিরা কী ভেবে খাবারের ট্রেটা সরিয়ে রেখে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা কাঁধে ঝুলিয়ে কার্গো বে'র পাশে করিডরের কাছে তালাবদ্ধ ঘরটির সামনে এসে দাঁড়াল। অস্ত্রটি উদ্যত রেখে সে সাবধানে তালা খুলে দরজাটা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিল, নীলমানবটি মারা যায় নি, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। রিরার মনে হল তাকে দেখে তার মুখে খুব সূক্ষ্ম একটি হাসি ফুটে উঠল। নীলমানবটি পায়ের কাছে ট্রাউজারটি গুটিয়ে এনেছে, রক্ত বন্ধ করার জন্য শরীরের কাপড় ছিঁড়ে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। আগে শরীরের নানা জায়গায় শুকিয়ে যাওয়া কালো রক্তের দাগ ছিল, মনে হল পানি দিয়ে সে সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করেছে।

নীলমানবটি কোনো কথা না বলে এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে রিরার দিকে তাকিয়ে রইল। রক্তক্ষরণে মারা যাবে বলে রিরার যে ধারণাটি ছিল সেটি সত্যি হবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না—ব্যাপারটিতে রিরার রেগে ওঠার কথা ছিল কিন্তু খানিকটা বিস্ময় নিয়ে সে আবিষ্কার করল, সে মোটেও রেগে উঠছে না, বরং নীলমানবটি বেঁচে আছে দেখে সে এক ধরনের স্বস্তিবোধ করছে। যে নৃশংস প্রাণীরা তার মহাকাশযানের সবাইকে হত্যা করেছে, তাদের একজন এখনো বেঁচে আছে বলে সে স্বস্তিবোধ করছে দেখে রিরা নিজের ওপর রেগে ওঠে। সে জোর করে মুখে এক ধরনের কাঠিন্য নিয়ে এসে নীলমানবটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

নীলমানবটি রিরার দিকে তাকিয়ে বলল "ওয়েল্ডিং।"

তার সারা শরীরে কালিঝুলি মাখানো, ওয়েল্ডিঙের এসিডের ঝাঁজালো গন্ধ শরীর থেকে বের হচ্ছে, সে যে ওয়েল্ডিং করে এসেছে সেটা বোঝা খুব কঠিন নয়। নীলমানবটির কথার উত্তরে সে মাথা নাড়ল।

নীলমানবটি নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলল, "আমি ওয়েল্ডিং ভালো। অনেক ভালো।"

রিরা ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি খুব ভালো ওয়েল্ডিং করতে পার?"

নীলমানবটি হ্যাঁ-সূচকভাবে মাথা নাড়ল। রিরা মাথা নাড়ল, বলল, "তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি আশা করো না আমি তোমাকে এখানে ওয়েল্ডিং করতে দেব। বুঝেছ?"

নীলমানবটি মাথা নেড়ে আবার বলল, "আমি খুব ভালো ওয়েল্ডিং। বেশি বেশি ভালো ওয়েল্ডিং।"

"ব্যস, অনেক হয়েছে। নিজের প্রশংসায় এত পঞ্চমুখ হবার কোনো দরকার নেই।" রিরা একটু থেমে বলল, "তোমার পায়ে যে গুলি লেগেছে, সেটা খেয়াল আছে? গুলি-লাগা পা দিয়ে তুমি দাঁড়াবে কেমন করে শুনি?"

রিরার সব কথা নীলমানব বুঝতে পারল না কিন্তু তার কথায় যে তার গুলি খাওয়া পায়ের কথা আছে সেটা সে বুঝতে পারল। নীলমানব তার পায়ের দিকে দেখিয়ে বলল, "কিজুন।"

"কিজুন?"

"হ্যাঁ।" নীলমানবটি হাত দিয়ে তার পায়ের ক্ষতে ইনজেকশন দেবার ভঙ্গি করে বলল, "কিশিমারা... অনুগ্রহ... কিজুন।"

রিরা ভুরু কুঁচকে বলল, "কিজুন মানে ওষুধ? তোমার পায়ের জন্য ওষুধ দরকার?"

নীলমানবটি জোরে জোরে মাথা নাড়ল। রিরা কঠিন মুখে বলল, "এরপর তুমি কী বলবে? ঘুমানোর জন্য নরম বিছানা? নেশা করার জন্য উত্তেজক ড্রাগ? দেশে ফিরে যাবার জন্য স্কাউটশিপ?"

রিরা কী বলছে নীলমানবটি ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু গলার স্বরে ক্রোধটি অনুভব করে এক ধরনের শূন্যদৃষ্টি নিয়ে রিরার দিকে তাকিয়ে রইল। সেই দৃষ্টি দেখে সম্পূর্ণ অকারণে হঠাৎ রিরা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। সে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে বলল, "আমি যে তোমাকে গুলি করে মেরে না ফেলে এখনো বেঁচে থাকার জন্য দুবেলা খাবার দিচ্ছি, সেটা তোমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য। এই ভাগ্যকে টেনে আর লম্বা করার চেষ্টা করো না—বুঝেছ?"

নীলমানবটি কী বুঝল কে জানে, কিন্তু সে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নেড়ে রিরার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রিরা ক্যাপ্টেনের ঘরে দীর্ঘসময় একা একা খাবারের ট্রে নিয়ে বসে থাকে। নিঃসঙ্গ এই মহাকাশযানটি আর কয়েকদিনের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাবে, জীবনের এই শেষ কয়েকটি মুহূর্তে তার কোনো একজন আপনজনের সাথে কথা বলার জন্য বুকের ভেতরটি হাহাকার করতে থাকে। এখানে কোনো আপনজন নেই, একমাত্র জীবিত প্রাণী নীলমানবটির কথা তার ঘুরেফিরে মনে হতে থাকে। গুলিবিদ্ধ অসহায় প্রাণীটির শূন্যদৃষ্টির কথাটি সে ভুলতে পারে না। তার মনে হয় সে খাবারের ট্রে-টি নিয়ে নীলমানবের কাছে যাবে, গিয়ে বলবে, আমি দুঃখিত যে তোমার সাথে এত দুর্ব্যবহার করেছি। এস জীবনের শেষ কয়েকটা মুহূর্ত আমরা ভুলে যাই তুমি নীলমানব এবং আমি মানুষ। দুজনে একসাথে বসে বসে খেতে খেতে কথা বলি।

কিন্তু রিরা নীলমানবের কাছে গেল না, ক্যাপ্টেনের সুদৃশ্য ঘরে একা একা খাবারের ট্রে সামনে নিয়ে বসে রইল।

রিরা মনিটরের সামনে নিঃশব্দে বসে আছে। মহাকাশযানটি একটা নিউট্রন স্টারের গা ঘেঁষে যেতে যেতে গতি সঞ্চয় করছে—দূরে একটা গ্রহাণুপুঞ্জ, তার ভেতর দিয়ে যাবার কথা। রিরা গ্রহাণুপুঞ্জটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মহাকাশযানের মূল প্রসেসরকে জিজ্ঞেস করল, "এই গ্রহাণুপুঞ্জের সব গ্রহ-উপগ্রহ কি নিখুঁতভাবে ক্যাটালগ করা আছে?"

"আছে। এটা আমাদের নিয়মিত রুটের মাঝে পড়ে।"

"তা হলে আমরা এখানকার ভালো দেখে একটা গ্রহে নেমে পড়ি না কেন?"

মহাকাশযানের মূল প্রসেসর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, "এটি একটি অত্যন্ত অবাস্তব পরিকল্পনা।"

রিরা একটু রেগে উঠে বলল, "কেন? অবাস্তব পরিকল্পনা কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই মহাকাশযানটি খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—কোনো গ্রহে নামা বা সেখান থেকে ওঠার ক্ষমতা নেই। নামতে গেলে বিধ্বস্ত হবার আশঙ্কা শতকরা নব্বই ভাগ থেকে বেশি।"

রিরা কাঠকাঠ স্বরে হেসে উঠে বলল, "মহাকাশে যেতে থাকলে এমনিতেই মহাকাশযান বিধ্বস্ত হয়ে যাবে—তা হলে নামার চেষ্টা করে বিধ্বস্ত হওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ না? যদি বেঁচে যাই, তা হলে কী লাভ হবে বুঝতে পারছ?"

"না, বুঝতে পারছি না।"

"তা হলে হয়তো ভবিষ্যতে কখনো কোনো মহাকাশযান এসে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে।"

"তার সম্ভাবনা দশমিক শূন্য শূন্য চার ভাগ।"

রিরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তুমি তোমার সম্ভাবনা হিসাব করে বের করা একটু বন্ধ করবে?"

"আমি দুঃখিত রিরা।" মূল প্রসেসর তার শুষ্ক ধাতবস্বরে বলল, "আমি তোমাকে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে সাহায্য করছিলাম।"

"তোমার যেখানে সাহায্য করার কথা, সেখানে সাহায্য করলেই হবে। সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে না।"

"ঠিক আছে।"

"এখন ক্যাটালগ দেখে আমাকে জানাও কোন গ্রহটাতে নামা সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

মহাকাশযানের মূল প্রসেসর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি সবগুলো গ্রহ পরীক্ষা করে দেখলাম। এর কোনোটাই দীর্ঘ সময় থাকার উপযোগী নয়।"

রিরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাকে খুব সহজ একটা জিনিস বোঝানো যাচ্ছে না! আমি আমার গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এই গ্রহে যাচ্ছি না! আমি এই গ্রহে যাচ্ছি কোনো উপায় না দেখে—হয়তো এই গ্রহে কিছুদিন থাকা যাবে—যে সময়ের ভেতরে কোনো উদ্ধারকারী মহাকাশযান আমাদের খুঁজতে আসবে। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"তা হলে আমাকে বলো কোন গ্রহটা সবচেয়ে কম বিপজ্জনক।"

মহাকাশযানের মূল প্রসেসর বলল, "প্রথম গ্রহটা ছোট—বায়ুমণ্ডল নেই, প্রতিমুহূর্তে উল্কাপাত হচ্ছে—খুব বিপজ্জনক। দ্বিতীয় গ্রহটা এখনো শীতল হয় নি, অসংখ্য আগ্নেয়গিরি—ক্রমাগত লাভা বের হচ্ছে, এটাও বিপজ্জনক। তৃতীয় গ্রহটাতে একটা বায়ুমণ্ডল আছে, তাপমাত্রাও মোটামুটি আরামদায়ক—তবে গ্রহটা পুরোপুরি অন্ধকার।"

রিরা মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, অন্ধকার গ্রহে যাওয়া যাবে না।" মহাকাশযানের প্রসেসর বলল, "চতুর্থ গ্রহটাকে মনে করা যায় বাসযোগ্য, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এর মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ জি-এর কাছাকাছি। গ্রহটি মোটামুটি আলোকিত, একটা কাজ চালানোর মতো বায়ুমণ্ডল আছে, তবে অক্সিজেন সাপ্লাই না নিয়ে তুমি বের হতে পারবে না।"

রিরা টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "চমৎকার!"

"আগেই চমৎকার বলো না। মানুষ প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে এখানে কলোনি করেছিল, কিন্তু—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু কী?"

"কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে কলোনির সবাই মারা পড়েছিল। কারণটা বের করতে পারে নি—মানুষ আর কখনো ফিরে আসে নি।"

রিরা ভুরু কুঁচকে বলল, "আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ?"

"না রিরা। আমি ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি না, তোমাকে শুধু জানিয়ে রাখছি।"

"অনেক ধন্যবাদ সেজন্য।" রিরা অন্যমনস্কভাবে টেবিলে আঙুল দিয়ে কয়েকবার শব্দ করে বলল, "এই গ্রহের সব মানুষ কেন মারা পড়েছিল, সেটা নিয়ে কোনো তথ্য আছে?"

"না নেই।" মহাকাশযানের প্রসেসর তার শুষ্ককণ্ঠে বলল, "তবে অসমর্থিত একটা তথ্য আছে।"

"সেটা কী?"

"এই গ্রহে কোনো এক ধরনের প্রাণের বিকাশ ঘটেছে। বুদ্ধিহীন, ভয়ংকর এবং নৃশংস প্রাণী।

রিরা একটা নিশ্বাস ফেলল, বলল, "আমার জীবনে যেন যথেষ্ট উত্তেজনা নেই—এখন বুদ্ধিহীন ভয়ংকর নৃশংস প্রাণীর সাথে সময় কাটাতে হবে! কপালটা দেখেছ? এর চাইতে ভালো কোনো গ্রহ আছে?"

"না। অন্য গ্রহগুলো বড় এবং অস্থিতিশীল। জি-এর মান এত বেশি যে নিজের শরীরের ওজনেই মারা পড়বে।"

"বেশ, তা হলে বুদ্ধিহীন ভয়ংকর এবং নৃশংস প্রাণীর গ্রহটাতেই নামার ব্যবস্থা কর।"

"কাজটি জটিল এবং বিপজ্জনক।"

"আমি জানি।" রিরা হাসার চেষ্টা করে বলল, "বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াটাই জটিল এবং বিপজ্জনক। তবুও কি আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করি না?"

"মহাকাশযানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়েছে—অবতরণ করাটি প্রায় দুঃসাধ্য।"

"তুমি কিছু চিন্তা করো না—" রিরা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

"তুমি আমাকে সাহায্য করবে?"

"হ্যাঁ। এত অবাক হচ্ছ কেন?"

মূল প্রসেসর শুষ্ক এবং ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, "আমি অবাক হচ্ছি না। সত্যি কথা বলতে কী, অবাক বা রাগ হওয়ার মতো মানবিক ক্ষমতাগুলো আমাদের নেই। তবে ঘোর অবাস্তব পরিকল্পনা আমরা নিরুৎসাহিত করি।"

"আমরা করি না।" রিরা গলায় খানিকটা উৎফুল্ল ভাব ফুটিয়ে বলল, "মহাকাশ একাডেমিতে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে মহাকাশযান অবতরণের ওপরে আমার একটি কোর্স ছিল। দেখা যাক যেসব বিষয় শিখিয়েছে সেটা সত্যি কি না!"

মহাকাশযানের মূল প্রসেসর কোনো কথা না বলে শুধুমাত্র একটা যান্ত্রিক দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করল।

প্রথমে মহাকাশযানটিকে গ্রহের কক্ষপথে আটকে নিতে হল, পুরো কাজটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। নিউট্রন স্টারের পাশ দিয়ে যাবার সময় এটি যে বিশাল গতিবেগ সঞ্চয় করেছে, তার প্রায় পুরোটুকুই কমিয়ে আনতে হল। ক্ষতিগ্রস্ত ইঞ্জিন দিয়ে সেই কাজটি করা খুব কঠিন। প্রথম কক্ষপথটি হল বিশাল, খুব ধীরে ধীরে সেই কক্ষপথ ছোট করে আনতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ঠিক বাইরে পুরোপুরি বৃত্তাকার কক্ষপথে মহাকাশযানটিকে আবদ্ধ করে নেওয়ার পর রিরা গ্রহটির খুঁটিনাটির দিকে নজর দিল। উঁচু-নিচু পাথরে ঢাকা বিশাল একটি গ্রহ, একটা বড় অংশ সাদা বালু দিয়ে ঢাকা। মহাকাশযানটিকে নামানোর জন্য একটা সমতল জায়গা প্রয়োজন। শেষবার মানুষ যেখানে বসতি করেছিল, তার আশপাশে নামতে পারলে সবচেয়ে ভালো, অনেক ভাবনা-চিন্তা করে নিশ্চয়ই জায়গাটা ঠিক করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি কোনো মানুষই বেঁচে থাকে নি—তবে সেটা ভিন্ন কথা। সেটা নিয়ে পরে দুশ্চিন্তা করলেও হবে।

মহাকাশযানটি প্রতি ঘণ্টায় একবার পুরো গ্রহটি প্রদক্ষিণ করছে—শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে রিরা গ্রহটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বুদ্ধিহীন ভয়ংকর এবং নৃশংস প্রাণী থাকার কথা কিন্তু মহাকাশ থেকে সেগুলো চোখে পড়ল না।

গ্রহটিতে বেশ লম্বা একটা সমতল জায়গা খুঁজে বের করে রিরা মহাকাশযানের মূল প্রসেসরের সাথে কথা বলতে শুরু করে। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর প্রচণ্ড ঘর্ষণে মহাকাশযানের বাইরের অংশ ভয়ংকর উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, অন্য সময় সেটি একটি বড় সমস্যা, কিন্তু এখন রিরা সেটি নিয়ে মাথা ঘামাল না—এই মহাকাশযানটিকে অক্ষত রাখার কোনো কারণ নেই, গতিবেগ কমিয়ে কোনোভাবে গ্রহটির শক্ত মাটিতে নামিয়ে স্থির করতে পারলেই হবে—তার ফলে মহাকাশযানের যে ক্ষতি হয় হোক! বিশাল মহাকাশযানের দুই-তিনটি ছোট কেবিন অক্ষত থাকলেই সে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারবে। এই মহাকাশযানটি নিয়ে সে এমনিতেই আর কখনো মহাকাশে উঠতে পারবে না।

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে শুরু করার পর হঠাৎ রিরার নীলমানবটির কথা মনে পড়ল। পরবর্তী এক ঘণ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক সময়—মহাকাশযানের মূল প্রসেসরের হিসেবে ঠিকভাবে অবতরণ করার সম্ভাবনা শতকরা মাত্র দশ ভাগ। এই সময়টিতে মহাকাশযান নানারকম ঝড়-ঝাপটার মাঝে পড়বে, মহাকাশচারীদের বিশেষ পোশাক পরে জীবন সংরক্ষণ মডিউলে বসে থাকার কথা—রিরা নিজেও তার কিছু করে নি। নীলমানবটির অবস্থা আরো খারাপ; একটা ছোট ঘরে তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে। যদি বড় দুর্ঘটনা হয়, নীলমানবটি খাঁচায় আটকে থাকা ইঁদুরের মতো মারা পড়বে। রিরা জোর করে তার মাথা থেকে চিন্তাটি সরিয়ে দিল।

বিশাল মহাকাশযানটি বায়ুমণ্ডলের ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে, বাতাসের ঘর্ষণে মহাকাশযানের বাইরের অংশ উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। রিরা মনিটরে দেখতে পেল, তাপমাত্রা বিপজ্জনক সীমার কাছে পৌঁছে গেছে। বাতাসের ঝাপটাটি এসে লাগছে মহাকাশযানের নিচের অংশে—বিশেষ তাপ অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরি অংশটুকু আগুনের মতো গরম হয়ে উঠেও তাপকে ভেতরে যেতে দিচ্ছে না। রিরা মহাকাশযানের ভেতরে এখনো কোনো বাড়তি তাপমাত্রা অনুভব করছে না।

মহাকাশযানটি থরথর কাঁপছে, রিরা মনিটরে দেখতে পায় আগুনের ফুলকির মতো ছোট ছোট ধাতব কণা মহাকাশযানের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল, ভয়ংকর ঝাঁকুনি দিয়ে পুরো মহাকাশযানটি প্রায় উল্টে যেতে গিয়ে আবার স্থির হয়ে গেল—সম্ভবত একটি এন্টেনা বাতাসের ঝাপটায় ভেঙে উড়ে গেছে, খুব সাবধানে সে বুকের ভেতরে চাপা থাকা একটা নিশ্বাস বের করে দেয়।

রিরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মনিটরের দিকে তাকিয়ে গতিবেগ দেখতে থাকে, ধীরে ধীরে সেটি কমতে শুরু করেছে। ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটারে নেমে আসার পর সে মহাকাশযানের দুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখা বের করে দেবার চেষ্টা করবে। যেহেতু এখানে বায়ুমণ্ডল আছে সে সেখানে ভেসে থাকার সুযোগটা নিতে চায়।

আবার একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ হল, মহাকাশযানটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে যেতে শেষমুহূর্তে নিয়ন্ত্রণে চলে এল। ভয়ংকর ঝাঁকুনি দিতে শুরু করেছে, ভেতরে বিকট শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে বিশাল এই মহাকাশযানটিকে কেউ যেন দুমড়ে–মুচড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে শুরু করেছে, তার সাথে একটা পোড়া গন্ধ। এভাবে বেশিক্ষণ চলতে থাকলে পুরো মহাকাশযানটি জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাবে। রিরা নিশ্বাস বন্ধ করে মহাকাশযানের কন্ট্রোল স্টিয়ারিং ধরে রাখে, খুব ধীরে ধীরে গতিবেগ কমে আসছে, শব্দের গতিবেগের নিচে নেমে আসার পর ভয়ংকর শব্দে সনিক বুমটি শুনতে পেল—রিরা বুকের ভেতর আটকে থাকা নিশ্বাসটি বের করে দেয়, বিপদের প্রথম ধাক্কাটি শেষ হয়েছে—বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সে মহাকাশযানটিকে গ্রহের ভেতরে নিয়ে এসেছে। এখন দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মহাকাশযানটিকে শক্ত মাটির উপরে নামানো। একটু ভুল হলেই এটি মুহূর্তের মাঝে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

রিরা মনিটরের দিকে তাকাল, এটি দ্রুত নিচে নামছে—এই গতিতে নিচে নামতে থাকলে কোনোভাবেই মহাকাশযানটিকে রক্ষা করা যাবে না। রিরা কন্ট্রোলরুমের স্টিয়ারিং টেনে পাখা দুটো বের করার চেষ্টা করল, শক্ত স্টিয়ারিং নড়তে চায় না, পুরো শরীর দিয়ে ধাক্কা দিয়ে শেষ পর্যন্ত টেনে আনতে পারল, প্রায় সাথে সাথে সে ঘরঘর একটা শব্দ শুনতে পায়। মহাকাশযানের মূল ইঞ্জিন তার মোটর চালু করে পাখা দুটো বের করতে শুরু করেছে। রিরা নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে, মোটরের ঘরঘর শব্দ বন্ধ হবার পর সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মহাকাশযানটিকে রক্ষা করার সম্ভাবনা এখন আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

বিশাল পাখা মেলে অতিশয় একটা পাখির মতো এই মহাকাশযানটি নিচে নেমে আসতে শুরু করেছে। পাখার নিচে ছোট ছোট জেট ইঞ্জিন রয়েছে, থেমে যাবার আগের মুহূর্তে সেগুলো চালু হয়ে মহাকাশযানটিকে সাবধানে নিচে নামিয়ে আনার কথা। কতগুলো জেট চালাতে পারবে সেটি রিরা জানে না, নীলমানবদের সাথে সংঘর্ষের সময় তাদের অনেক জ্বালানি নষ্ট হয়েছে।

রিরা তীক্ষ্ণ চোখে মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকে—এতক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু পরিকল্পনা মতো কাজ করেছে—যদিও একেবারে শেষ অংশটুকু হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন এবং সবকিছু পরিকল্পনা মতো কাজ করা পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে যাবে, যদি শেষটুকু ঠিকভাবে সমাপ্ত না হয়। রিরা এই দীর্ঘসময় একটিবারও মূল প্রসেসরের সাথে কথা বলে নি—এই প্রথম সে খানিকটা সময় পেয়েছে। চাপা গলায় সে ডাকল, "প্রসেসর।"

"বলো রিরা।"

"সবকিছু কি ঠিক আছে?"

"প্রায়।"

"প্রায় কেন বলছ?"

"মহাকাশযানের দুটি পাখা অনেকটুকু জায়গা নিয়ে নিয়েছে।"

"সে তো নেবেই। এত বড় মহাকাশযানকে ভাসিয়ে রাখতে হলে কয়েক কিলোমিটার লম্বা পাখা লাগার কথা।"

মূল প্রসেসর শান্ত গলায় বলল, "আমি এরোডিনামিক্স নিয়ে প্রশ্ন করছি না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তা হলে কী নিয়ে প্রশ্ন করছ?"

"মহাকাশযানটিকে সফলভাবে নামার ব্যাপারে প্রশ্ন করছি।"

রিরা নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, "সফলভাবে নামার ব্যাপারে তোমার কী প্রশ্ন?"

"এটি একটি পাথুরে গ্রহ। পুরো গ্রহটিতে উঁচু-নিচু পাথর। তার একটা বড় সমস্যা আছে।"

রিরা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল, "পাথরের আঘাত খেয়ে পাখা ভেঙে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"কত উঁচুতে ভাঙবে?"

"একেবারে নিখুঁতভাবে বলা যাচ্ছে না। গ্রহটাতে এক ধরনের ঝড়ো হাওয়া বইছে, মহাকাশযানটা ঠিক কোথায় নামবে বলা যাচ্ছে না। রাডার জ্বলেপুড়ে গেছে—কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—নিশ্চয়ই জান।"

রিরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি এটা আমাকে আগে কেন বলো নি?"

"বলে লাভ কী? শুধু শুধু তুমি পুরো সময়টা দুশ্চিন্তা করতে। এখন দুশ্চিন্তা করবে শেষ কয়েকটি মুহূর্ত।"

"শেষ মুহূর্ত কি চলে এসেছে?"

"হ্যাঁ। আমার সুপারিশ হবে তুমি এখন মহাকাশযানের নিরাপত্তা পোশাক পরে নাও। আর সময় নেই।"

রিরা উঠে দাঁড়াল। মনিটরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে আতঙ্ক অনুভব করে। গ্রহটির অনেক নিচে নেমে এসেছে। যে গ্রহটাকে মহাকাশ থেকে মোটামুটি সমতল মনে হয়েছে মাটির কাছাকাছি এসে দেখা যাচ্ছে সেটা মোটেও সমতল নয়—বড় বড় পাথর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। হঠাৎ হঠাৎ অনেক পাথর উঁচু হয়ে আছে। নিয়ন্ত্রণহীন একটা বড় পাখির মতো মহাকাশযানটি নিচে নেমে আসছে। ঠিক সোজাসুজি নামছে না, দুলতে দুলতে নামছে। মহাকাশযানের মাঝে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না।

রিরা সাবধানে দেয়াল ধরে অগ্রসর হতে শুরু করে। মূল প্রসেসর বলল, "তুমি উল্টোদিকে যাচ্ছ রিরা, নিরাপত্তা পোশাকগুলো অন্যদিকে রাখা।"

"আমি জানি।"

"তা হলে?"

"একটা নীলমানবকে একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা আছে। তালাটা খুলে দিই।"

"কেন?"

"মহাকাশযান বিধ্বস্ত হয়ে গেলে সে খাঁচায় আটকে পড়া ইঁদুরের মতো মারা যাবে।"

"তাতে কী আসে যায়? নীলমানব মানুষ নয়—তাদের জীবন রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার নয়। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"তা ছাড়া সে মুক্ত হতে পারলে নিশ্চিত তোমাকে হত্যা করবে।"

"রিরা কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, "তোমার তা-ই ধারণা?"

"এটি আমার ধারণা নয়। আমি নিশ্চিতভাবে জানি। আমি চাই তুমি সুযোগ থাকতেই তাকে গুলি করে হত্যা কর। সরাসরি মস্তিষ্কে আট পয়েন্টের একটি গুলি করা হলে হত্যাকাণ্ডটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তুমি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি নিয়ে যাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি নিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ।" মহাকাশযানের মূল প্রসেসর তার যান্ত্রিক কণ্ঠে খানিকটা ব্যস্ততার ভাব ফুটিয়ে বলল, "কোনো একটা উঁচু পাথরে আঘাত লেগে মহাকাশযানটি বিধ্বস্ত হয়ে গেলে বন্দি নীলমানবটির ঘরের দরজা বা দেয়াল ভেঙে যেতে পারে, সে তখন বের হয়ে আসতে পারে।"

রিরা দ্বিধান্বিতভাবে বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"মানুষকে যেসব জিনিস শেখানো হয়, তার একটি হচ্ছে কখনো বন্দি মানুষকে হত্যা না করা। তার চাইতে বড় কোনো কাপুরুষতা হতে পারে না।"

"নীলমানব মানুষ নয়। তাকে ভিন্ন কোনো প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করতে পার।"

রিরা মাথা নাড়ল, বলল, "বন্দি হচ্ছে বন্দি। মানুষ কিংবা অন্য যে কোনো প্রাণীই হোক না কেন।"

মহাকাশযানের মূল প্রসেসর কঠোর কণ্ঠে বলল, "তোমার এই ছেলেমানুষি যুক্তির কারণে তুমি ভয়ংকর বিপদগ্রস্ত হবে।"

রিরা উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করে প্রচণ্ড আঘাতে পুরো মহাকাশযানটি কেঁপে উঠল। ভয়ংকর শব্দে তার কানে তালা লেগে যায়, মহাকাশযানটি পাক খেয়ে উল্টে যেতে থাকে—প্রচণ্ড আঘাতে রিরা ছিটকে পড়ে। বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল সে—মহাকাশযানটি দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। রিরার মনে হতে থাকে সে কোথাও পড়ে যাচ্ছে—হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুই ধরতে পারে না সে। কেউ একজন চিৎকার করছে অমানুষিক গলায়, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে মহাকাশযানটি, পোড়া গন্ধে নিশ্বাস নিতে পারছে না রিরা। কিছু একটা প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ল, আগুনের হলকার মতো কিছু একটা অনুভব করল রিরা। ভয়ংকর অমানুষিক যন্ত্রণায় শরীরের ভেতরে কুঁকড়ে উঠতে থাকে। মহাকাশযানের আলো নিভে গেল হঠাৎ—রিরা ওঠার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু উঠতে পারে না। কোনো একটা ধাতব বিমের নিচে আটকা পড়ে গেছে। প্রাণপণে বের হতে চেষ্টা করছে কিন্তু বের হতে পারছে না, শরীরের একটা অংশ আটকা পড়ে গেছে তার। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করছে রিরা কিন্তু সে কিছুই দেখতে পারছে না। খানিকটা বাতাসের জন্য বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে কিন্তু সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। অমানুষিক যন্ত্রণায় চিৎকার করতে চেষ্টা করে কিন্তু তার গলা থেকে কোনো আওয়াজ বের হয় না।

রিরা হঠাৎ করে অনুভব করে, গাঢ় অন্ধকারে সে তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মনে হতে থাকে আর কখনোই সে এই অন্ধকার থেকে বুঝি উঠে আসতে পারবে না।

খুব ধীরে ধীরে রিরার জ্ঞান ফিরে আসে। মহাকাশযানের ভেতর সব সময়ই অল্প কম্পনের একটা শব্দ হতে থাকে। সেই শব্দটা এখন নেই। যে শক্তিশালী কুরু ইঞ্জিনটি মহাকাশযানটিকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে, এই প্রথমবার সেই ইঞ্জিনটি বন্ধ হয়ে গেছে, হঠাৎ করে পুরো মহাকাশযানে একটি বিস্ময়কর নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে। রিরা মনে করতে চেষ্টা করে সে কোথায়, তার কী হয়েছে। সে মহাকাশযানটিকে অবতরণ করানোর চেষ্টা করছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকাশযানের বিশাল দুটি পাখা বের হয়ে এসেছিল, খুব ধীরে ধীরে সেটি নেমে আসছিল, ঠিক তখন এক ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ হল—

হঠাৎ রিরার সব কথা মনে পড়ে যায়, লাফিয়ে উঠে বসে সে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে ক্যাপ্টেনের ঘরে নরম বিছানায় শুয়ে আছে সে। কে এনেছে তাকে এখানে?

রিরা বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করে হঠাৎ মুখ থুবড়ে নিচে পড়ে গেল, অবাক হয়ে আবিষ্কার করল তার দুই পা শেকল দিয়ে বাঁধা। রিরা হতচকিত হয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, কে তাকে বেঁধে রেখেছে এখানে? রিরা কাঁপা গলায় ডাকল, "প্রসেসর... প্রসেসর...।"

ক্যাপ্টেনের ঘরে প্রসেসর শুষ্ক গলায় উত্তর দিল, "বলো রিরা।"

"আমাকে কে বেঁধে রেখেছে?"

"তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে, তোমার এটি জানার কথা।"

"নীলমানব?"

"হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম তাকে হত্যা করতে—তুমি রাজি হলে না। এখন তার মূল্য দিচ্ছ।"

"সে কেমন করে বের হল?"

"মহাকাশযানটি যখন বিধ্বস্ত হয়েছে, তখন তার ঘরের দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে তখন তার দরজা ভেঙে বের হয়ে এসেছে।"

"কিন্তু... তার পায়ে গুলি লেগেছিল?"

মূল প্রসেসর একমুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "সে খুঁজে খুঁজে মেডিক্যাল কিট বের করে পায়ে ব্যান্ডেজ করেছে। যন্ত্রণা কমানোর জন্য নিওপিলিন ইনজেকশন নিয়েছে, তারপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে হেঁটে সবকিছু করেছে।"

রিরা বড় বড় দুটি নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমাকে টেনে বের করে এনেছে?"

"হ্যাঁ, তুমি একটা বিমের নিচে আটকা পড়েছিলে, অনেক কষ্ট করে সেই বিমের নিচে থেকে টেনে বের করে এনেছে।"

"তুমি বলেছিলে সে আমাকে গুলি করে মারবে।"

মূল প্রসেসর ধাতব গলায় বলল, "তার সময় এখনো শেষ হয়ে যায় নি। তুমি ভুলে যেও না তোমার দুই পা শিকল দিয়ে বাঁধা। তোমাকে হত্যা করতে তার এক সেকেন্ড সময়ও লাগবে না।"

"কিন্তু—"

মূল প্রসেসর রিরাকে বাধা দিয়ে বলল, "নীলমানব এদিকে আসছে।"

রিরার গলার স্বর কেঁপে উঠল, "সে কি সশস্ত্র?"

"হ্যাঁ। তার হাতে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র।"

রিরা একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে তার বিছানায় গিয়ে বসে। একটু আগেই নীলমানব ছিল তার হাতে বন্দি, এখন সে নীলমানবের হাতে বন্দি।

খুট করে একটা শব্দ হল, তারপর খুব ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। রিরা তাকিয়ে দেখল ঘরের দরজায় দীর্ঘদেহী নীলমানবটি পাথরের মতো মুখ করে তাকিয়ে আছে। তার ডান হাতে আলগোছে একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ধরে রাখা। রিরা তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমাকে কেন শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছ?"

নীলমানবটি তার কথা বুঝতে পারল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু সে উত্তর দেবার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো চেষ্টা না করে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রিরা উচ্চকণ্ঠে ডাকল, "প্রসেসর... প্রসেসর..."

"বলো।"

"তুমি কি নীলমানবের ভাষা জান?"

"জানি।"

"তুমি আমার প্রশ্নটি অনুবাদ করে দাও।"

রিরা শুনতে পেল কোনো একটি বিজাতীয় ভাষায় প্রসেসর তার প্রশ্নটি অনুবাদ করে দিচ্ছে। প্রশ্নটি শুনে নীলমানব খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকল, তারপর কিছু একটা উত্তর দিল। রিরা জিজ্ঞেস করল, "কী বলেছে সে?"

প্রসেসর বলল, "সে বলেছে তুমি যে কারণে আমাকে বন্দি করে রেখেছিলে, আমি ঠিক সেই কারণে তোমাকে বন্দি করে রেখেছি।"

রিরা চিৎকার করে বলল, "তাকে বলো এটা আমাদের মহাকাশযান—তার না। আমার তাকে বন্দি করে রাখার অধিকার আছে। তার নেই।"

মূল প্রসেসর রিরার কথাটির অনুবাদ করে শুনিয়ে দিল এবং তখন প্রথমবার নীলমানবটিকে হাসতে দেখল। নীলমানবটির চেহারা নিষ্ঠুর কিন্তু হাসার সময় এটা রিরা স্বীকার না করে পারল না সে অত্যন্ত সুদর্শন।

নীলমানবটি কিছু একটা বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে উদ্যত হল। রিরা জিজ্ঞেস করল, "কী বলেছে সে?"

"তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।"

"কিন্তু আমি শুনতে চাই।"

"সে বলেছে তোমার কথাবার্তা অল্পবয়সী শিশুর মতো।"

রিরা নিশ্বাস আটকে রেখে বলল, "তাই বলেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাকে বলো এই মুহূর্তে আমার পায়ের শেকল খুলে দিতে।"

"বলে কোনো লাভ হবে না রিরা।"

"লাভ না হলে নাই। তাকে বলো।"

মূল প্রসেসর নীলমানবটিকে তার ভাষায় শেকল খুলে দিতে বলল। সাথে সাথে নীলমানবের মুখমণ্ডল কঠোর হয়ে ওঠে, হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঝাঁকিয়ে কিছু একটা বলে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। রিরা জিজ্ঞেস করল, "কী বলেছে নীলমানব?"

"বলেছে অর্থহীন কথা বলে শক্তিক্ষয় না করতে।"

"তাই বলেছে?"

"হ্যাঁ। তারপর বলেছে এই মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করার তার কোনো পরিকল্পনা নেই। কিন্তু তুমি যদি বাড়াবাড়ি কর, তা হলে সে তার মত পরিবর্তন করতে পারে।"

রিরার ভেতরে এক ধরনের অক্ষম ক্রোধ পাক খেতে থাকে। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "সে এখন কোথায় যাচ্ছে? কী করছে?"

"সব সময় যা করে।"

"সব সময় কী করে?"

AMARBOI.COM

"মহাকাশযানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। যত জায়গা ভেঙেচুরে গেছে সেগুলো বন্ধ করছে। অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"কেন?"

"কেউ যেন ঢুকতে না পারে।"

রিরা নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, "কে ঢুকবে এখানে?"

"তোমাকে আগেই বলেছি, এখানে বুদ্ধিহীন নৃশংস ভয়ংকর এক ধরনের প্রাণী থাকে।"

রিরা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে। এখন সেটা খুব কাছের ব্যাপার হয়ে গেছে।"

রিরা বিষদৃষ্টিতে তার পায়ের শেকলের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর দুই হাতে ভর দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেনের ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "প্রসেসর।"

"বলো।"

"এই গ্রহের কি কোনো নাম আছে?"

"আগে ছিল। এখন নেই, এখন শুধু একটি সংখ্যা।"

"এই গ্রহের প্রাণীগুলো কী রকম তুমি জান?"

"না, জানি না।"

"কিছুই জান না?"

"না, কিছুই জানি না। মহাকাশযানটা যখন বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে নামিয়ে এনেছ, তখন প্রচণ্ড উত্তাপে বাইরের দিকের সবকিছু জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে গেছে। সেখানে আমাদের সব সেন্সর ছিল। সেন্সরগুলো থাকলে আমি এই গ্রহটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে পারতাম। এখন আমি কিছু করতে পারি না, কিছু দেখতে পারি না।"

"শুধু মহাকাশযানের ভেতরে দেখতে পার?"

"হ্যাঁ, মহাকাশযানের ভেতরকার ক্যামেরাগুলো নষ্ট হয় নি—ভেতরে দেখতে পারি।"

রিরা একটা নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, "নীলমানব এখন কী করছে?"

"এতক্ষণ মহাকাশযানের সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। কয়েকটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বসিয়ে এসেছে। এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পিছন দিকে যাচ্ছে, ঘাড়ে করে বেশ কয়েকটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে।"

"তুমি বলতে চাও নীলমানবটা কোনো বিশ্রাম নেয় না?"

"না।"

"খায় না?"

"না, এখনো খেতে দেখি নি।"

"ঘুমায় না?"

"এখনো ঘুমায় নি।"

রিরা কোনো কথা না বলে ছাদের দিকে মাথা রেখে দুই হাতের উপর শুয়ে রইল।

নীলমানব খায় না বা ঘুমায় না—কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। ঘণ্টা ছয়েক পরে সে একটা খাবারের ট্রে নিয়ে হাজির হল। মেঝেতে রেখে সে ট্রেটা পা দিয়ে রিরার দিকে ঠেলে দিল। রিরা চাপা গলায় বলল, "প্রসেসর।"

"বলো।"

"ওকে বলো একজন মানুষকে পা দিয়ে খাবার ঠেলে দেওয়া যায় না। সেটা অসম্মানজনক।"

"বলে লাভ নেই।"

"কেন?"

"সে এসব বোঝে না। নীলমানবদের কালচার মানুষের কালচার থেকে ভিন্ন।"

"হোক।" রিরা পাথরের মতো মুখ করে বলল, "তুমি ওকে বলো একজন মানুষকে তার খাবার পা দিয়ে ঠেলে দেওয়া যায় না।"

প্রসেসর বিজাতীয় ভাষায় কিছু একটা বলল এবং নীলমানবকে হঠাৎ একটু বিভ্রান্ত দেখায়। সে কয়েক মুহূর্ত একটা কিছু ভাবল, তারপর হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তাক করে রিরার দিকে এগিয়ে এল। রিরার কাছাকাছি এসে সে খাবারের ট্রেটা হাতে নিয়ে রিরার দিকে এগিয়ে দেয়, নিচু গলায় বলে, "অনুগ্রহ করে। কিশিমারা।"

রিরা স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নীলমানবটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কুগুরা। ধন্যবাদ।"

নীলমানবটি দুই পা পিছনে সরে গিয়ে হেলান দিয়ে বসে রিরার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রিরা খাবারের ট্রেটির দিকে তাকাল, একজন মানুষ যতটুকু খেতে পারে খাবার তার থেকে অনেক বেশি। নীলমানবদের খাবারের অভ্যাস নিশ্চয়ই অন্যরকম, কারণ ট্রেতে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশি। রিরা যেটুকু খেতে পারবে, আলাদা করে সরিয়ে বাকি খাবারসহ ট্রেটা নীলমানবটির দিকে এগিয়ে দেয়। নীলমানবটা অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ রিরার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর এগিয়ে এসে খাবারের ট্রেটা হাতে নেয়। রিরা যখন খেতে শুরু করল তখন নীলমানবটিও খেতে শুরু করল। নীলমানবের খাবারের ভঙ্গিটুকু একটু বিচিত্র, খাবারের টুকরো যত ছোটই হোক কিংবা যত বড়ই হোক—সেটা সে দুই হাতে ধরে খায়। কে জানে এর পেছনে হয়তো কোনো সংস্কার রয়েছে। তবে রিরার কৌতূহলটি হল অন্য ব্যাপারে, যে কোনো কারণেই হোক নীলমানবটি বসেছে তার কাছাকাছি, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা রেখেছে এমন জায়গায় যে রিরা ইচ্ছে করলে সেটা ধরে ফেলতে পারে। রিরা খেতে খেতে পুরো ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখল—নীলমানবটি কিছু সন্দেহ করছে না, অন্যমনস্কভাবে খাবার মুখে তুলছে। রিরা বাম হাত দিয়ে ইচ্ছে করলেই এক ঝটকায় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা তুলে নিতে পারে—সাথে সাথে এই মহাকাশযানে পুরো সমীকরণটি পাল্টে যাবে। যদি তুলতে না পারে তা হলে একটা ঝামেলা হতে পারে—কিন্তু সেটা নিয়ে এখন চিন্তা না করাই ভালো। রিরা চোখের কোনা দিয়ে নীলমানবটিকে লক্ষ করল এবং যখন সে দু হাতে এক টুকরো প্রোটিন হাতে নিয়েছে রিরা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটির ওপর।

নীলমানবটি হকচকিয়ে গিয়ে যখন কী হচ্ছে বুঝতে পেরেছে তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। রিরার হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং ট্রিগারে আঙুল। সে হিংস্র গলায় বলল, "দুই হাত উপরে নীলমানব।"

নীলমানবটি কী করবে বুঝতে পারছিল না, রিরা তখন অধৈর্য গলায় চিৎকার করে উঠল, "হাত উপরে।"

নীলমানবটি ইতস্তত ভাবে হাত উপরে তুলল। রিরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "দেয়ালের কাছে যাও।" নীলমানবটি বিভ্রান্ত হয়ে দুই হাত উপরে তুলে দেয়ালের কাছে এগিয়ে যায়। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে রিরার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রসেসর হঠাৎ শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ করে বলল, "চমৎকার।"

রিরা কোনো কথা বলল না। প্রসেসর আবার বলল, "গুলি কর রিরা। অস্ত্রটি তার হৃৎপিণ্ডের দিকে তাক করে গুলি কর। তুমি আরো একবার সুযোগ পেয়েছ—আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আর এই সুযোগ পাবে না।"

রিরা অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে রইল, প্রসেসর আবার বলল, "গুলি কর রিরা। গুলি কর।"

রিরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি নিজের পায়ের দিকে তাক করে শেকল লক্ষ করে গুলি করল, বন্ধ ঘরের মাঝে ভয়ংকর শব্দে সেই অস্ত্রের বিস্ফোরণের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। নীলমানব নিষ্পলক দৃষ্টিতে রিরার দিকে তাকিয়ে রইল, প্রসেসর আবার বলল, "রিরা, গুলি কর। হত্যা কর নীলমানবকে।"

রিরা নিজেকে মুক্ত করে নীলমানবের দিকে এগিয়ে গেল, পায়ে বাঁধা শেকলের অংশ নূপুরের মতো শব্দ করে ওঠে। প্রসেসর চাপা গলায় বলল, "দেরি করো না, রিরা। এই সুযোগ আর তুমি পাবে না।"

রিরা এক মুহূর্ত দ্বিধা করে তারপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি নীলমানবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও।"

নীলমানবটি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে রিরার দিকে তাকিয়ে থাকে, এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না রিরা কী করতে চাইছে। রিরা আবার বলল, "নাও।"

নীলমানবটি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলল, "আমি অস্ত্র?"

"হ্যাঁ, আমি তোমাকে এই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি দিচ্ছি। আমি আমার পায়ের শেকল খোলার জন্য নিয়েছিলাম, শেকল খুলেছি, এখন আর প্রয়োজন নেই। তোমার অস্ত্র তুমি নাও।"

নীলমানব কী বুঝল কে জানে, সে হাত বাড়িয়ে অস্ত্রটি নিল এবং হঠাৎ হেসে ফেলল। ঝকঝকে সাদা দাঁত এবং এক ধরনের ভালো মানুষের মতো হাসি—রিরা হঠাৎ আবার বুঝতে পারে নীলমানবটি অসম্ভব রূপবান।

নীলমানবটি অস্ত্র হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, সেটি কী করবে যেন বুঝতে পারে না। ইতস্তত করে সে দুই পা এগিয়ে বিছানার উপর অস্ত্রটি রেখে রিরার কাছে ফিরে এল, রিরা তার হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমার নাম রিরা।"

নীলমানবটি রিরার হাত ধরে নরম গলায় বলল, "আমি কুশান।"

"তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম কুশান।"

কুশান বিড়বিড় করে কী যেন বলল, রিরা ঠিক বুঝতে পারল না। রিরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না, বলল, "এই মহাকাশযানে অনেক লাল এবং নীল রক্তক্ষয় হয়েছে। সেটা যথেষ্ট। আশা করছি আমি এবং তুমি সেই নির্বুদ্ধিতার কথা ভুলে যাব।"

নীলমানব তার নিজের বিজাতীয় ভাষায় কিছু একটা বলল, রিরা তার কিছু একটা বুঝতে পারল না। সে গলা উঁচিয়ে বলল, "প্রসেসর।"

"বলো রিরা।"

"কুশান কী বলেছে?"

"সে বলেছে তোমার গায়ের রঙ যদি পচা আঙুরের মতো না হত, তা হলে তোমাকে মোটামুটি সুন্দরী হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যেত।"

রিরা কথাটি শুনতে পায় নি ভান করে হঠাৎ করে নিজের পায়ে বাঁধা শেকলের অংশগুলো খুলতে ব্যস্ত হয়ে গেল।

নীলমানব কুশান এবং রিরা মিলে মহাকাশযানটাকে সুরক্ষিত করতে শুরু করে। মহাকাশযানের যেসব জায়গা ভেঙে ফাঁকফোকর বা ফাটল তৈরি হয়েছিল, সেগুলো বুজিয়ে দিতে শুরু করল—এই গ্রহটিতে বুদ্ধিহীন ভয়ংকর এবং নৃশংস এক ধরনের প্রাণী আছে, এরকম একটা তথ্য তারা জানে। সেই প্রাণী বা প্রাণীগুলো কী রকম সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। কাজেই তারা কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চাইল না। বাইরে থেকে হঠাৎ করে কোনো প্রাণী ঢুকে গেলে তার সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বা ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত করে রাখল।

নীলমানব কুশানের সাথে কথা বলে রিরা আবিষ্কার করল, মানুষ কথা বলার সময় শুধু কণ্ঠস্বর নয়, চোখ-হাত খুলে এমনকি পুরো শরীর ব্যবহার করে। দুজনের পরিচিত শব্দের সংখ্যা খুব বেশি নয়, বেশ কিছু শব্দ অনুমান করে কাজ চালিয়ে নিতে হয় কিন্তু তারপরেও দুজনের কথাবার্তা বলতে খুব সমস্যা হল না। রিরা আবিষ্কার করল, নীলমানব কুশান বুদ্ধিমান এবং ধীরস্থির। এটি কি কুশানের নিজস্ব ব্যাপার নাকি নীলমানবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—রিরা সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারল না।

দুজনে মিলে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হল না—মহাকাশযানটিকে সুরক্ষিত করার জন্য কুশানের নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা ছিল। রিরা দ্বিধান্বিতভাবে তার ভেতরে কিছু কিছু পরিবর্তন করার কথা বলা মাত্রই কুশান সাথে সাথে সেগুলো মেনে নেয়। কুশানের জায়গায় একজন মানুষ হলে এত সহজে মেনে নিত না। মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন বর্কেন বলেছিলেন, নীলমানব বিচ্ছিন্ন প্রাণীসত্তা নয়, তারা সব সময় একসাথে কাজ করে। এখানেও নিশ্চয়ই সেটি হচ্ছে, রিরা যখনই কোনো প্রস্তাব করছে কুশান সাথে সাথে সেটি মেনে নিচ্ছে। নীলমানবদের সে ভয়ংকর দুর্ধর্ষ এবং একরোখা জেনে এসেছে কিন্তু এই মহাকাশযানে দুজনে একসাথে আটকা পড়ে যখন একসাথে কাজ করতে হচ্ছে, তখন কুশানকে মোটেও একরোখা বা দুর্ধর্ষ মনে হচ্ছে না। মহাকাশযানটি দখল করার সময় এই কুশান এবং তার সঙ্গীসাথীরাই যে ভয়ংকর আক্রমণ চালিয়েছিল, কুশানকে দেখে সে কথাটি বিশ্বাসযোগ্যই মনে হয় না। কুশানকে দেখে মনে হয় একজন স্বল্পভাষী সহৃদয় মানুষ—ভয়ংকর একরোখা যোদ্ধা কিছুতেই নয়।

টাইটেনিয়ামের শক্ত দরজা দিয়ে যেসব করিডর এবং টানেল বন্ধ করা সম্ভব হল, দুজনে মিলে সেগুলো বন্ধ করে দিল। বড় বড় ফুটোগুলোতে ধাতব পাত লাগিয়ে ওয়েল্ড করে দেওয়া হল। বড় বড় ফুটোগুলো বন্ধ হবার পর দুজনে মিলে ফাটলগুলোতে ধাতব আকরিকের পেস্ট দিয়ে সেগুলো সিল করে দিতে শুরু করল। মহাকাশযানটি বিধ্বস্ত হবার পর তার প্রায় সব অ্যালার্ম সিস্টেম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, দুজনে মিলে সেগুলোও আবার দাঁড় করাতে শুরু করল। মহাকাশযানটি মানুষের, প্রযুক্তিটিও মানুষের, তাই এ ধরনের কাজের সাথে কুশান পরিচিত নয়। তবে খুব দ্রুত সে কাজ শিখে নিতে পারে এবং আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সে কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। মহাকাশযানে কুশানের মতো একজন মহাকাশচারীকে পেয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই রীতিমতো সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার।

মহাকাশযানটিকে মোটামুটিভাবে সুরক্ষিত করে তারা প্রথমবার ভালো করে গ্রহটির দিকে নজর দেবার সুযোগ পেল। গ্রহটি একেবারেই সাদামাটা গ্রহ, বাইরে রুক্ষ পাথর ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কিছু নেই। বিশাল একটা উপগ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত আলো গ্রহটাকে আলোকিত করে রেখেছে। এই উপগ্রহটির আলো কোথা থেকে আসছে, রিরা ভালো করে বুঝতে পারল না। তবে উপগ্রহের উপরের দিক থেকে কুণ্ডলী পাকানো আলোর বিচ্ছুরণ দেখে মনে হয় শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে ইলেকট্রন এবং আয়ন আটকা পড়ে বিশাল একটা প্লাজমাক্ষেত্রের মতো কাজ করছে। সম্ভবত সেটাই আলো হিসেবে আসছে। আলোটা স্থির নয়, এটি বাড়ছে এবং কমছে। তার রঙেরও পরিবর্তন হচ্ছে, বেশিরভাগ সময়ে এটি উজ্জ্বল সাদা রঙের কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ কমলা রঙে পাল্টে যায়। রিরার মনে হতে থাকে দূরে কোথাও বুঝি আগুন লেগেছে এবং সেই আগুনের কমলা আভা এসে পড়ছে, রিরা তখন ভেতরে ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে। রিরা এক ধরনের হিংসা নিয়ে লক্ষ করেছে নীলমানবের ভেতরে কখনোই কোনো অস্থিরতা নেই। এক ধরনের কৌতূহলী শান্ত চোখে সে সবকিছু গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করে, কোনো কিছু নিয়েই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে না।

প্রথমে কিছুদিন এক ধরনের অমানুষিক পরিশ্রম করে তারা মহাকাশযানটিকে মোটামুটি সুরক্ষিত করার পর অন্য বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে শুরু করে। এখানে তাদের কতদিন থাকতে হবে তারা জানে না, তাই খাবার সরবরাহের ব্যাপারটি নিশ্চিত করে নিল। বিদ্যুৎপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তারা অনেক সময় নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা জ্বালানিটুকু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করল। জ্বালানির যেন অপচয় না হয়, সেজন্য পুরো মহাকাশযান ঘুরে ঘুরে যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে বিদ্যুৎ এবং তাপপ্রবাহ বন্ধ করে দিল। ভেতরে অক্সিজেন সরবরাহের পাম্পটি দুজনে মিলে ওভারহল করে প্রায় নতুন করে ফেলল।

দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারটি নিশ্চিত করে তাদেরকে কমিউনিকেশন্স মডিউলটির দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমবার দেখে মনে হয়েছে পুরো ইউনিটটি ধ্বংস হয়ে গেছে, তার ভেতর থেকে কোনোটা রক্ষা করা যাবে কি না এখনো তারা জানে না। যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা করতে না পারলে এই মহাজগতের কেউ জানবে না যে, তারা এই গ্রহটিতে আটকা পড়ে গেছে—কেউ তাদের উদ্ধার করতে আসবে না। এক-দুইদিনের ভেতরেই কমিউনিকেশন্স মডিউলের ম্যানুয়েল নিয়ে তারা সেগুলো নিয়ে বসবে। যেভাবেই হোক একটা শক্তিশালী ট্রান্সমিটার তৈরি করে মহাবিশ্বে খবর পাঠাতে হবে যে, তারা এখানে আটকা পড়ে আছে, তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে।

নতুন এই গ্রহে রিরা এবং কুশান বেশ কিছুদিন থেকে আছে, এই গ্রহে বুদ্ধিহীন নৃশংস এবং ভয়ংকর এক ধরনের প্রাণী থাকার কথা—তারা সে ধরনের কোনো প্রাণী এখনো দেখে নি। সত্যি কথা বলতে কী তারা এখন পর্যন্ত এই গ্রহে কোনো ধরনের প্রাণীই দেখতে পায় নি। গ্রহটির ওপর নজর রাখার জন্য তারা মহাকাশযানের একেবারে উপরে একটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার তৈরি করেছে, কোয়ার্টজের স্বচ্ছ জানালা দিয়ে তারা বাইরে বহুদূর দেখতে পায়, যখন তাদের কোনো কাজ না থাকে রিরা এবং কুশান এই টাওয়ারে বসে নির্জন নিষ্প্রাণ গ্রহটিকে দেখে। পুরো গ্রহটিতে সব সময় এক ধরনের ভুতুড়ে আলো, আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে একটা বিশাল উপগ্রহ অনেকটা জীবন্ত প্রাণীর মতো তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মহাকাশটি মোটামুটি স্থিতিশীল। হঠাৎ কখনো কখনো এক ধরনের ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে, বাতাসে তখন এক বিচিত্র ধরনের শব্দ হতে থাকে, মনে হয় কোনো অশরীরী ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে, রিরা তখন অত্যন্ত অস্থির অনুভব করতে থাকে কিন্তু কুশানকে কখনোই বিচলিত হতে দেখা যায় না।

যখন রিরা এবং কুশানের দৈনন্দিন জীবন প্রায় রুটিন হয়ে যাবার উপক্রম হয়ে এসেছে, তখন এই গ্রহের প্রথম বিচিত্র রূপটি তাদের চোখে পড়ল।

কমিউনিকেশন্স মডিউল কক্ষে একটা সংবেদী রিসিভারকে প্রায় অনেকখানি সারিয়ে তুলতে গিয়ে রিরা এবং কুশান প্রায় টানা আট ঘণ্টা পরিশ্রম করেছে। এখন দুজনেই ক্লান্ত। কৃত্রিম প্রোটিনের সাথে কয়েকটা শক্ত রুটি, খানিকটা স্নায়ু সতেজকারী পানীয় খেয়ে দুজনে পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে এসে বসেছে। বেশ কিছুদিন একসাথে থেকে তাদের ভেতরকার ভাষার বেশ উন্নতি হয়েছে—দুজনেই দুজনকে বেশ বুঝতে পারে, কোনো একটা কিছু বোঝানোর জন্য আজকাল প্রসেসরের সাহায্য বলতে গেলে নিতেই হয় না।

রিরা টাওয়ারে বসে বাইরের মন খারাপ করা গ্রহটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের না জানি আর কতদিন এই গ্রহে থাকতে হবে!"

কুশান তার কথার কোনো উত্তর দিল না, তার বড় এবং খানিকটা বিচিত্র চোখে রিরার দিকে তাকিয়ে রইল। রিরা আবার বলল, "এই গ্রহটি আমার নার্ভের ওপর উঠে যাচ্ছে।"

কুশান জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"গ্রহটিতে কোনো দিন-রাত নেই, আলো-আঁধার নেই। সব সময়েই এক ধরনের ভুতুড়ে আলো।"

কুশান নিচু গলায় বলল, "মহাকাশচারীদের অনেক লম্বা সময় মহাকাশযানে থাকতে হয়। তাদের দিন-রাতের অনুভূতি থাকে না।"

রিরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার আছে। আমি মনে হয় খাঁটি মহাকাশচারী নই।"

কুশান একটু হেসে বলল, "না রিরা। তুমি খাঁটি মহাকাশচারী। আমাদের নীলমানবদের মাঝে তোমার মতো মহাকাশচারী পাওয়া খুব কঠিন।"

রিরা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "আমার কোন কাজটি দেখে তোমার এই ধারণা হল?"

"তোমার সব কাজ দেখে। তুমি যেভাবে একা এই পুরো মহাকাশযানটাকে রক্ষা করেছ, তার কোনো তুলনা নেই।"

রিরা একটু হেসে বলল, "বেঁচে থাকার তাগিদটা অসম্ভব শক্তিশালী তাগিদ, সেজন্য মানুষ অনেক কাজ করে।"

কুশান গম্ভীর মুখে বলল, "আমার জানামতে তুমি শুধু একটি ভুল করেছ।"

"কী ভুল করেছি?"

"প্রথম যখন আমাকে পেয়েছিলে, তখন সাথে সাথে তোমার আমাকে হত্যা করা উচিত ছিল।"

রিরা শব্দ করে হেসে বলল, "সে কী! এটা তুমি কী বলছ?"

"আমি ঠিকই বলছি। আমাকে হত্যা না করে তুমি নিজের ওপরে অসম্ভব বড় ঝুঁকি নিয়েছিলে।"

রিরা এক ধরনের কৌতুকের দৃষ্টিতে কুশানের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, "তা হলে তুমিও আমাদের মূল প্রসেসরের মতো বিশ্বাস কর তোমাকে হত্যা করা উচিত ছিল?"

কুশান গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি আমাকে হত্যা না করায় আমি এখনো বেঁচে আছি। মানুষ কীভাবে কাজ করে, ভাবনা-চিন্তা করে সেটা বোঝার সুযোগ পেয়েছি।

এটি চমৎকার অভিজ্ঞতা।"

রিরা কথার পিঠে আরেকটি কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। তার কাছে মনে হল হঠাৎ করে গ্রহটির কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে। সে চাপা গলায় ডাকল, "কুশান। আমার মনে হচ্ছে গ্রহটার কিছু একটা পরিবর্তন হচ্ছে।"

"কী পরিবর্তন?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে গ্রহটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।"

"অন্ধকার?"

"হ্যাঁ। দেখ আলোটা কেমন কমে আসছে।"

রিরার সন্দেহ কিছুক্ষণের মাঝেই সত্য প্রমাণিত হল। সত্যি সত্যি হঠাৎ করে গ্রহটা অন্ধকার হতে শুরু করল। বিশাল একটা চোখের মতো যে উপগ্রহটা সব সময় এই গ্রহটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে, তার মাঝে একটা ছায়া পড়তে শুরু করেছে—হঠাৎ করে পুরো গ্রহটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। রিরা বিস্ফারিত চোখে কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল, অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! হঠাৎ করে গ্রহটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।"

কুশান কোনো কথা না বলে একটু বিস্ময়ের ভঙ্গি করে রিরার দিকে তাকিয়ে রইল, তাকে দেখে মনে হতে থাকে হঠাৎ করে আলোকোজ্জ্বল একটা গ্রহ অন্ধকার হয়ে যাওয়া বুঝি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

কিছুক্ষণের মাঝে চারদিক নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে গেল। উজ্জ্বল আলোতে অভ্যস্ত চোখ হঠাৎ করে এই গাঢ় অন্ধকারে কেমন যেন এক ধরনের নির্ভরতা খুঁজে পায়। রিরা খানিকটা বিস্ময় নিয়ে বলল, "এই অন্ধকারটা কেমন অদ্ভুত দেখেছ? কোনো কিছু দেখতে না পাওয়ার মাঝে এক ধরনের আরাম আছে।"

কুশান নিচু গলায় বলল, "তুমি সত্যি কিছু দেখতে পাচ্ছ না?"

রিরা অবাক হয়ে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ? তুমি দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। আমি দেখতে পাচ্ছি।"

হঠাৎ করে রিরার মনে পড়ল কুশানের চোখ ইনফ্রারেড থেকে আলট্রাভায়োলেট পর্যন্ত সংবেদী। রিরার চোখে যখন সবকিছু অন্ধকার, কুশান তখনো দেখতে পারে—কিন্তু তবুও তার কাছে ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হতে থাকে। সে অবাক হয়ে বলল, "তুমি সত্যি দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ রিরা, আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছি।"

"তুমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, আমি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটু নীলাভ রঙ, কিন্তু স্পষ্ট।"

রিরা হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো গলায় বলল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।"

কুশান শব্দ করে হেসে বলল, "তোমাকে আমার সব কথা বিশ্বাস করতে হবে কে বলেছে?"

"আমাকে তুমি ছুঁতে পারবে?"

"কেন পারব না?"

রিরা একটু সরে বসে বলল, "ছোঁও দেখি।"

রিরা হঠাৎ করে অনুভব করে একটা হাত খুব আলতোভাবে তাকে স্পর্শ করল—অনেকটা আদর করার মতো তার গাল স্পর্শ করে হাতটি তার চিবুকের কাছে এসে থেমে যায়। কুশান বলল, "এটা তোমার চিবুক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিরা অনুভব করে হাতটি সরে গিয়ে খুব কোমলভাবে তার চুল স্পর্শ করে বলল, "এই যে তোমার চুল।" রিরা হঠাৎ অনুভব করল কুশানের দুটি হাত খুব ধীরে ধীরে তার দুই গালের কাছে এসে তার মুখটি উপরে তুলেছে—খুব কাছে থেকে সে হঠাৎ কুশানের নিশ্বাস শুনতে পেল। রিরা হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করে, সে ইতস্তত করে বলল, "কুশান, তুমি কী করছ?"

"তোমাকে দেখছি।"

"আমাকে তুমি আগে দেখ নি?"

"অবশ্যই দেখেছি, কিন্তু এখন—"

"এখন কী?"

"এখন সবকিছুতে একটু নীলচে আভা। আর—"

"আর কী?"

"নীলচে আভাতে তোমাকেও নীল দেখাচ্ছে। হঠাৎ করে তোমাকে একটা নীলমানবীর মতো লাগছে। তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে, আমি চোখ ফেরাতে পারছি না রিরা।"

রিরা হঠাৎ একটু লজ্জা পেয়ে যায়, সে সাবধানে কুশানের হাত দুটি সরিয়ে হালকা গলায় বলল, "তার অর্থ কী বুঝতে পারছ?"

"কী?"

"সাধারণ আলোতে আমার চেহারায় কোনো সৌন্দর্য নেই! আমার সৌন্দর্য আসে শুধুমাত্র নীল আলোতে যখন আমাকে নীলমানবীর মতো দেখায়!"

"আমি সেটা বলতে চাই নি রিরা।"

"তুমি তা হলে কী বলতে চাইছ?"

কুশান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি ঠিক জানি না রিরা। আমি খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। হঠাৎ করে নীলাভ আলোতে তোমাকে দেখে আমার পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল।"

"পুরোনো দিনের কথা?"

"হ্যাঁ, আমার শৈশবের কথা, আমার পরিবারের কথা। যুদ্ধে নাম লেখানোর পর থেকে বহুকাল তাদের কারো সাথে যোগাযোগ নেই। তারা কে কোথায় আছে, কেমন আছে কিছু জানি না।"

রিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি যখন একাডেমিতে পড়ছি, তখন তোমাদের ওপর আমাদের একটা কোর্স করতে হত। সেখানে আমাদের শেখানো হয়েছিল—তোমরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এবং একরোখা।"

রিরার কথা শুনে কুশানের কী প্রতিক্রিয়া হল অন্ধকারে ঠিক দেখা গেল না। রিরা বলল, "আলো জ্বেলে দিই।"

কুশান বলল, "আর একটু পর, ছোট ওয়েভলেংথে দেখতে একেবারে অন্যরকম লাগছে।"

"তোমার অন্যরকম লাগছে। আমি যে কিছু দেখছি না? ঘুটঘুটে অন্ধকার।"

"তোমরা মানুষেরা নাকি অসম্ভব কল্পনা করতে পার। তুমি কল্পনা করে দেখ!"

"আমাদের মানুষদের সম্পর্কে তোমরা আর কী কী জান?"

কুশান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের জন্ম থেকে শেখানো হয়েছে মানুষ আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। শেখানো হয়েছে মানুষ আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে বলে ঠিক করেছে। মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের যুদ্ধ করতে হবে।"

"কী আশ্চর্য!"

"হ্যাঁ, মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমরা নিজেদের মাঝে বিবর্তন এনেছি—আমরা নিজেদের শরীরকে উন্নত করেছি। আমরা এখন অন্ধকারে দেখতে পাই। আমাদের ফুসফুসের আকার বড়, সেখানে অক্সিজেন জমা রাখতে পারি।"

রিরা বাধা দিয়ে বলল, "এখন বুঝতে পেরেছি, যখন নিথিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তোমাদের অচেতন করার চেষ্টা করা হয়েছিল তখন তোমরা কেন অচেতন হও নি!"

"হ্যাঁ। আমাদের পরিকল্পনায় তোমরা পা দিয়েছিলে।"

"ক্যাপ্টেন বর্কেন তা হলে ঠিক অনুমান করেছিলেন।"

কুশান কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে রিরার চোখ খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। এখন খুব হালকাভাবে সে কুশানের অবয়ব দেখতে পায়, বাইরে গ্রহের দিগন্তটুকুও হালকাভাবে চোখে পড়তে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে আকাশের এক-দুটি নক্ষত্রও মিটমিট করে দেখতে শুরু করেছে। চোখ অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর অন্ধকারটুকু বেশ লাগছে, তবে সে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু কুশান তাকে স্পষ্ট দেখছে—এই চিন্তাটুকু মাঝে মাঝেই তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে।

রিরা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি একটা জিনিস কখনো বুঝতে পারি না। তুমি বলছ আমরা তোমাদের পরিকল্পনায় পা দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা কখন পরিকল্পনা করেছ? আমাদের মূল প্রসেসর সব সময় তোমাদের চোখে চোখে রেখেছে—তোমাদের প্রত্যেকটি কথা শুনেছে, প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি লক্ষ করেছে।"

কুশান শব্দ করে হাসল। বলল, "আমরা কথা না বলেও তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে শুধু চোখের ভাষায় অনেক কিছু বলে দিতে পারি। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"আমাদের মূল পরিকল্পনাটা করেছি তোমাদের চোখের সামনে, তোমরা বুঝতে পার নি।"

"কীভাবে?"

"মনে আছে মেঝেতে ছক কেটে শুকনো রুটির টুকরো দিয়ে আমরা খেলতাম?"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"সেই খেলাটা আসলে শুধু খেলা ছিল না। খেলাটার আড়ালে আমরা পরিকল্পনা করেছি!"

"তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করেছিলে কে কবজি কেটে আত্মহত্যা করবে?"

"হ্যাঁ, আমরা নিজিতকে বেছে নিয়েছিলাম। সে ছিল আমাদের মাঝে দুর্বল। যুদ্ধে সে একটু আহত হয়েছিল।"

"সে একবারও আপত্তি করে নি?"

কুশান মাথা নাড়ল, বলল, "আসলে আমরা সবাই মিলে একটা প্রাণীসত্তা। আমরা আলাদা না—আমরা কখনো আপত্তি করি না। আপত্তি করা যায়, সেটা আমরা জানিও না।"

"কী আশ্চর্য! মানুষ কখনোই এভাবে চিন্তা করতে পারবে না।"

রিরার কথার উত্তরে কুশান কোনো কথা না বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, অন্ধকারে আবছাভাবে রিরা দেখতে পায়—সে দ্রুতপায়ে কোয়ার্টজের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রিরা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে কুশান?"

AMARBOI.COM

"আসছে!"

"কে আসছে?"

"আমার মনে হয় এই গ্রহের প্রাণী!"

রিরা কোয়ার্টজের জানালার কাছে ছুটে গিয়ে বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকাল। গাঢ় অন্ধকারে কিছুই সে দেখতে পায় না। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে কুশানকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তুমি দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় এখন, কী করছে? দেখতে কেমন?"

কুশান চাপা গলায় বলল, "আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?"

রিরা কান পেতে শুনল, মনে হল ঝড়ের মতো একটা শব্দ হচ্ছে, দূর থেকে শোনা অনেক মানুষের কোলাহলের মতো। খুব ধীরে ধীরে শব্দটা বাড়ছে, তাদের দিকে এগিয়ে আসছে এই গ্রহের প্রাণী। বুদ্ধিহীন, ভয়ংকর এবং নৃশংস প্রাণী।

প্রথমে মনে হল কোনো একটা পাথর এসে মহাকাশযানকে আঘাত করেছে, তারপর মনে হল আরো একটা, তারপর অনেকগুলো। শিলাবৃষ্টির মতো হঠাৎ শব্দ হতে শুরু হয়ে গেল। মনে হল প্রচণ্ড ঝড়ে মহাকাশযানটি থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। অন্ধকারে রিরা আবছা আবছাভাবে দেখতে পেল, কুশান কোয়ার্টজের জানালা থেকে ছিটকে পিছনে সরে এসেছে। রিরার হাত ধরে চাপা গলায় বলল, "পালাও।"

AMARBOI.COM

"কেন? কী হয়েছে?"

"ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।"

"ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে?" রিরা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কেমন করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে?"

"জানি না। ভয়ংকর ধারালো দাঁত মনে হয়—শুনতে পাচ্ছ না?" রিরা শুনতে পেল, মহাকাশযানটিতে একটা কর্কশ শব্দ। মনে হয় ধারালো ফাইল দিয়ে কেউ যেন কাটছে। চারদিক থেকে কর্কশ শব্দ আসছে, মনে হয় কেটে কেটে টুকরো করে ফেলছে। রিরা বলল, "আলো জ্বালাও—আমি একটু দেখব।"

"দেখার মতো কিছু নেই রিরা, বীভৎস।"

"আমি তবু দেখতে চাই।"

কুশান দেয়ালের কাছে গিয়ে আলো জ্বালানোর নিরাপত্তা সুইচে গোপন সংখ্যা প্রবেশ করাতেই অবজারভেশান টাওয়ারে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল—রিরার চোখ ধাঁধিয়ে যায় মুহূর্তের জন্য। কিছু স্পষ্ট দেখতে পায় না সে, শুধু কোয়ার্টজের জানালায় ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকা বীভৎস একটা প্রাণী মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল, কিন্তু সাথে সাথে বিকট আর্তচিৎকারে পুরো এলাকাটা প্রকম্পিত হতে থাকে!

"আশ্চর্য!" কুশান কাঁপা গলায় বলল, "কী আশ্চর্য!"

রিরা দুই হাতে চোখ ঢেকে বলল, "কী হয়েছে?"

"প্রাণীগুলো আলো সহ্য করতে পারে না। সব পালিয়ে যাচ্ছে।"

রিরা সাবধানে চোখ খুলে তাকাল, সত্যি সত্যি কোয়ার্টজের জানালায় ধারালো দাঁত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে কামড়ে ধরে থাকা প্রাণীগুলো নেই...। বাইরে অসংখ্য প্রাণীর আর্তচিৎকার, ছোটাছুটি শোনা যাচ্ছে, একসাথে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে সবগুলো প্রাণী।

"আলো জ্বালিয়ে দিতে হবে আমাদের। মহাকাশযানের সব আলো জ্বালিয়ে দিতে হবে এক্ষুনি।"

"হ্যাঁ, চল তাড়াতাড়ি।"

"মহাকাশযানের ভেতরে আলো জ্বালাতে গিয়ে রিরা আর কুশান আবিষ্কার করল, জ্বালানি বাঁচানোর জন্য তারা মহাকাশযানের বেশিরভাগ অংশের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে রেখেছে। নতুন করে সংযোগ দিয়ে আলো জ্বালাতে জ্বালাতে অনেক সময় লেগে যাবে। এই সময়ের ভেতরে প্রাণীগুলো ধারালো দাঁত দিয়ে মহাকাশযানের দেয়াল কেটে ভেতরে ঢুকে যাবে। মহাকাশযানের যেখানে যেখানে আলো আছে—বাইরে আলো ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে প্রাণীগুলো নেই, কিন্তু অন্ধকার অংশগুলোতে ফাইল দিয়ে ঘষে কাটার মতো শব্দ করে প্রাণীগুলো ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। প্রাণীগুলো কত বড়, দেখতে কী রকম রিরা ভালো করে জানে না—কিন্তু শব্দ শুনে বোঝা যায় অসংখ্য প্রাণী একসাথে এসেছে, কোথাও যদি কেটে ঢুকে যেতে পারে তা হলে রক্ষা পাবার উপায় নেই। মহাকাশযানের চারদিকে এক ধরনের অশুভ কর্কশ শব্দ। রিরা হঠাৎ ভয়াবহ এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে।

কুশানের মুখে উত্তেজনার কোনো চিহ্ন নেই। সে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রিরার হাতে দিয়ে বলল, "এটা তোমার হাতে রাখ। ভেতরে ঢুকে গেলে কাজে লাগতে পারে।"

"আমাদের দরকার সার্চলাইটের মতো আলো। শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট।"

"হ্যাঁ। কোথায় আছে জান?"

"স্টোররুমে। ইমার্জেন্সি কিটের ভেতরেও থাকতে পারে।"

"তুমি দাঁড়াও আমি নিয়ে আসি।"

রিরার হঠাৎ একটা জিনিস মনে হল, বলল, "কুশান! দাঁড়াও।"

"কী হয়েছে?"

"এই মহাকাশযানে ফ্লেয়ার আছে। বাইরে গিয়ে উপরে ছুড়ে দিয়ে জ্বালিয়ে দিলে পুরো এলাকাটা আলোকিত হয়ে যাবে। তীব্র উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো আলো।"

"চমৎকার! কোথায় আছে জান?"

রিরা মাথা নাড়ল, বলল, "জানি। তুমি দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি।"

কিছুক্ষণের মাঝেই রিরা দুটো ফ্লেয়ার হাতে নিয়ে এল। দুটোর পেছনেই ছোট একটি করে রকেট লাগানো রয়েছে। খোলা জায়গায় নিয়ে সুইচটা টিপে ছেড়ে দিলেই স্বয়ংক্রিয় কন্ট্রোল এটা চালু করে কয়েক শ মিটার উপরে নিয়ে যাবে। সেখানে তীব্র উজ্জ্বল আলোয় আশপাশে কয়েক কিলোমিটার আলোকিত করে খুব ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসবে। কুশান চিন্তিত মুখে ফ্লেয়ার দুটোর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "এটা নিয়ে বাইরে যেতে হবে।"

রিরা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

এই মহাকাশযানটিকে এই অজানা গ্রহে অবতরণ করানোর পর এখন পর্যন্ত তারা বাইরে যায় নি। কোনো একটা কিছু প্রথমবার করার সময় একটু অনিশ্চয়তা থাকে। এখানে সেই অনিশ্চয়তা অনেকগুণ বেশি। এই মুহূর্তে বাইরে হাজার হাজার হিংস্র প্রাণী মহাকাশযানটাকে কেটে ঢোকার চেষ্টা করছে—পরিস্থিতিটা শুধু অনিশ্চিত নয়, অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপজ্জনক। মহাকাশযান ঘিরে কর্কশ শব্দ আরো অনেক বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে কোনো এক জায়গা ভেদ করে সত্যি সত্যি প্রাণীগুলো যে কোনো মুহূর্তে ঢুকে যাবে। রিরা একটা ফ্লেয়ার হাতে নিয়ে বলল, "আমি বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি আমাকে কাভার দাও।"

কুশান মাথা নেড়ে বলল, "না–না রিরা। তুমি যাবে না। তুমি ভেতরে থেকে একটা সার্চলাইট নিয়ে আমাকে কাভার দাও। আমি যাচ্ছি।"

রিরা একটু অবাক হয়ে কুশানের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু কুশান, তুমি একজন নীলমানব। তুমি মানুষের মতো বিচ্ছিন্ন সত্তা নও—তুমি সমন্বিত। আমি যা বলেছি তুমি সব সময় সেটা শুনেছ।"

কুশানের মুখে হঠাৎ একটা মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। সে রিরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমার সাথে থাকতে থাকতে মনে হয় মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছি।"

"এটা কি ভালো না খারাপ?"

"এখনো বুঝতে পারছি না।"

রিরা বলল, "এখন সময় নষ্ট করে লাভ নেই—তুমি নীলমানব, আমাদের প্রযুক্তির সাথে অভ্যস্ত নও, আমাকেই করতে দাও।"

"একটা সুইচ টিপে দেওয়ার জন্য কি আর প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত হতে হয়?"

"ঠিক আছে, তা হলে দুজনেই যাই। হাতে অস্ত্র থাকবে, সাথে দু শ লুমেনের সার্চলাইট।"

"সত্যি যেতে চাও?" কুশান দ্বিধান্বিতভাবে বলল, "তুমি যদি ভেতরে থেকে কাভার দাও, আমি পারব।"

"ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। দুজন একসাথে গেলে বিপদের ঝুঁকি কম।"

মহাকাশযানের দেয়ালে প্রচণ্ড কর্কশ শব্দটা মনে হল হঠাৎ বেড়ে গেছে, রিরার মনে হতে থাকে হঠাৎ বুঝি কোনো একটা দেয়াল ভেঙে হুড়মুড় করে বীভৎস কিছু প্রাণী ভেতরে ঢুকে যাবে। রিরা আর কুশান দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিল। পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার, নিশ্বাস নেবার জন্য মুখে একটা মাস্ক, মাথায় শক্ত হেলমেটে তীব্র সার্চলাইট, হাতে অস্ত্র। মহাকাশযানের দরজার সামনে গিয়ে বড় হ্যান্ডেলটা নিচের দিকে চাপ দিতেই ঘটাং করে ভেতরের কুঠুরিটা খুলে গেল। সেখানে ঢুকে ভেতরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের বাতাসের সাথে সমতা আনতে শুরু করল। রিরা কিংবা কুশান কেউই বুঝতে পারে নি গ্রহটা অন্ধকার হয়ে যাবার পর হঠাৎ করে এত দ্রুত এরকম ভয়ংকর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এখন কিছু করার নেই, কনকনে শীতে দুজন অপেক্ষা করতে থাকে, কিছুক্ষণের মাঝেই মূল দরজাটা খোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। রিরা গোল হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে বড় লিভারে হাত রেখে বলল, "কুশান, আমি দরজা খুলছি।"

"খোল। আমি আলো আর অস্ত্র দুটি নিয়েই প্রস্তুত।"

"রিরা পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে হঠাৎ দরজাটা খুলে দিতেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করতে করতে কিছু প্রাণী চারদিকে ছুটে সরে যেতে থাকে। প্রাণীগুলোর আকার বোঝা যায় না—একইসাথে সরীসৃপ কিংবা কীটের মতো মনে হয়। সমস্ত দেহ পিচ্ছিল এক ধরনের পদার্থ দিয়ে ঢাকা, আলো পড়তেই মুহূর্তের মাঝে সেখানে বড় বড় বীভৎস ফোসকার মতো বের হতে শুরু করেছে। প্রাণীগুলো ধারালো দাঁত বের করে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে সরে যাচ্ছে—মাথার কাছে ছোট ছোট কুতকুতে হলুদ চোখে এক ধরনের বোবা আতঙ্ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিরা আর কুশান হাতে অস্ত্র নিয়ে সতর্কভাবে আরো কয়েক পা অগ্রসর হয়, বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা এবং বাতাসে এক ধরনের ঝাঁজালো গন্ধ। প্রাণীগুলো ছুটে দূরে সরে গিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে—অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ ধারালো দাঁত চকচক করে উঠছে। কুশান হাতে অস্ত্র নিয়ে সতর্কভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে ফিসফিস করে বলল, "রিরা। তুমি ফ্লেয়ারটা ছাড়। দেরি করো না।"

রিরা বলল, "হ্যাঁ, ছাড়ছি।"

সে ভেতরকার টাইমারটাকে পাঁচ সেকেন্ডের জন্য সেট করে ফ্লেয়ারটা একটা পাথরের উপর রেখে পিছিয়ে এল। মনে মনে পাঁচ পর্যন্ত গোনার আগেই ফ্লেয়ারের রকেটটা তীব্র শব্দ করে উপরে উঠে গেল, প্রায় সাথে সাথেই পুরো এলাকাটা তীব্র আলোতে ঝলসে ওঠে। আশপাশে কয়েক কিলোমিটার এলাকা উজ্জ্বল সূর্যালোকে আলোকিত মধ্যাহ্নের মতো আলোকিত হয়ে যায়।

মহাকাশযানকে ঘিরে থাকা হাজার হাজার বীভৎস প্রাণীগুলোর ভেতর হঠাৎ করে একটা ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটে যায়। তীব্র স্বরে চিৎকার করতে করতে সেগুলো সরে যেতে থাকে—একটি প্রাণী অন্যটির উপর দিয়ে হুটোপুটি করে আতঙ্ক এবং যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে সেগুলো প্রাণভয়ে ছুটে যেতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝে তারা সবিস্ময়ে দেখতে পায়—আক্ষরিক অর্থে হাজার হাজার প্রাণী গ্রহটির পাথরের উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যাচ্ছে। যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত কুৎসিত প্রাণী কিলবিল করছে। রিরা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি আমার জীবনে কখনো একসাথে এতগুলো প্রাণী দেখি নি।"

কুশান বলল, "আমি দেখেছি।"

"কোথায় দেখেছ?"

"মাইক্রোস্কোপে। কোষের ভেতরে এভাবে ব্যাক্টেরিয়া কিলবিল করে বের হতে থাকে।"

শব্দ করে হাসতে গিয়ে রিরা থেমে গেল, বলল, "ঠিকই বলেছ। এই প্রাণীগুলো ব্যাক্টেরিয়ার মতো। কী ভয়ানক!"

কুশান বলল, "চলো মহাকাশযানের ভেতরে যাই।"

"হ্যাঁ, বাইরে শীতে আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না।"

গ্রহটি কতক্ষণ অন্ধকার থাকবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। দুজনে কোনো ঝুঁকি নিল না। তারা পালাক্রমে পাহারা দিল, যদি প্রাণীগুলো আবার ফিরে আসে, তা হলে আবার ফ্লেয়ারটি জ্বালাতে হবে। অন্ধকার গ্রহটিতে দুজনে অপেক্ষা করতে থাকে আলোর জন্য।

AMARBOI.COM

ক্যাপ্টেনের ঘরে টেবিলের দুইপাশে দুজনে বসে চুপচাপ খাচ্ছে। দুজনের চেহারাতেই এক ধরনের ক্লান্তির ছাপ। গ্রহটিতে তিন দিন পরে আলো ফিরে এসেছে। এই তিন দিন তারা বিশ্রাম নেবার ঝুঁকি নেয় নি। এই গ্রহের প্রাণীগুলো বুদ্ধিহীন নির্বোধ হতে পারে, কিন্তু তাদের সংখ্যা বিশাল। এই বিশাল সংখ্যার সাথে বুদ্ধি বা কৌশল কিংবা কোনোকিছুতেই কেউ পেরে উঠবে না। ফ্লেয়ার জ্বালিয়ে প্রথমবার প্রাণীগুলোকে তারা ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। ফ্লেয়ারের আলো নিভে যাবার পর প্রাণীগুলো আবার ফিরে আসতে পারত—সৌভাগ্যক্রমে ফিরে আসে নি।

রিরা এবং কুশানের খুব সৌভাগ্য যে, প্রাণীগুলো আলো সহ্য করতে পারে না এবং ফ্লেয়ারের মতো একটা তুচ্ছ জিনিস দিয়ে ভয় দেখিয়ে সেগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া গেছে। কিন্তু রিরা এবং কুশান খুব ভালো করে জানে যে, যদি তাদের অনির্দিষ্ট সময় এখানে থাকতে হয়, তা হলে আগে হোক পরে হোক তাদের ফ্লেয়ার ফুরিয়ে যাবে এবং কোনো এক অন্ধকার মুহূর্তে এই লক্ষ লক্ষ প্রাণী এসে তাদেরকে শেষ করে দেবে। অসংখ্য ভাইরাস যেভাবে জীবকোষকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে, এই প্রাণীগুলোও তাদেরকে সেভাবে খেয়ে ফেলবে। পুরো বিষয়টি চিন্তা করে রিরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা একটা বিপদের মাঝে আছি।"

কুশান সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ল। রিরা চোখ বড় বড় করে বলল, "কুশান, তোমাকে আমি সঠিকভাবে মানুষ হিসেবে ট্রেনিং দিতে পারি নি।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"আমি যখন বলব আমরা একটা বিপদের মাঝে আছি, তখন তুমি হেসে পুরো ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়ে বলবে, "কে বলেছে বিপদ? কোনো বিপদ নেই!"

"বিপদ থাকলেও বলব বিপদ নেই?"

"হ্যাঁ। মানুষ এভাবে একজন আরেকজনকে সাহস দেয়।"

কুশান একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "ঠিক আছে রিরা, আমি জেনে রাখলাম। পরের বার আমি বলব কোনো বিপদ নেই। আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে আমাদের এরকম অনেক সুযোগ আসবে!"

রিরা উষ্ণ স্নায়ু-সতেজকারী পানীয়টাতে একটা চুমুক দিয়ে বলল, "আমরা কী করব সেটা খুব ভালো করে ঠিক করে নিতে হবে।"

কুশান মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"এই আজব গ্রহটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ করে এটা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যায় কেমন করে?"

"উপগ্রহের চৌম্বকক্ষেত্রের একটা বিচ্যুতি হয় বলে মনে হচ্ছে।"

"দুদিন পরে পরেই যদি এরকম বিচ্যুতি ঘটতে থাকে, তা হলে আমাদের কী হবে?"

কুশান কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে দুই হাতে ধরে এক টুকরো কৃত্রিম প্রোটিন চিবুতে থাকে।

"যখন গ্রহটা আলোকিত থাকে, তখন প্রাণীগুলো কোথায় থাকে বলে মনে হয়?"

"মাটির নিচে কোনো অন্ধকার গুহা নিশ্চয়ই আছে।"

"কতগুলো প্রাণী দেখেছ? এতগুলো প্রাণী থাকার জন্য বিশাল বড় এলাকা দরকার।"

"হ্যাঁ।" কুশান মাথা নাড়ল, বলল, "আমরা তো আসলে গ্রহটা সম্পর্কে কিছুই জানি না।"

রিরা নিঃশব্দে শুকনো একটা রুটির টুকরো চিবুতে চিবুতে বলল, "আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। গ্রহটা কখন আবার অন্ধকার হয়ে যাবে আমরা জানি না।"

কুশান কোনো কথা বলল না।

রিরা বলল, "এই গ্রহের অধিবাসীরা কীভাবে মারা গিয়েছিল, আমি এখন খানিকটা অনুমান করতে পারি।"

"কীভাবে?"

"নিশ্চয়ই আলোর ব্যবস্থা করতে করতে সমস্ত জ্বালানি শেষ করে ফেলেছিল। আমরা সতর্ক না থাকলে আমাদেরও সেই অবস্থা হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি কীভাবে সতর্ক থাকবে রিরা?"

"খুব যত্ন করে জ্বালানি খরচ করতে হবে। আলো জ্বালিয়ে রাখার নতুন কোনো বুদ্ধি বের করতে হবে।"

কুশান আস্তে আস্তে বলল, "আগে হোক পরে হোক আমাদের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে রিরা।"

রিরা একটা নিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে নিজের হাতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "যেভাবেই হোক আমাদের কমিউনিকেশান্স মডিউলটি ঠিক করতে হবে। আমাদের বাইরের মহাকাশে খবর পাঠাতেই হবে। কারো না কারো এসে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে।"

কুশান কোনো কথা না বলে এক ধরনের বিচিত্র দৃষ্টিতে রিরার দিকে তাকিয়ে রইল। রিরা জিজ্ঞেস করল, "কী হল, তুমি এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?"

কুশান তার চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, "না। এমনিই।"

ভালো করে বিশ্রাম নিয়ে রিরা আর কুশান কমিউনিকেশান্স মডিউলটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মূল প্রসেসরের কাছ থেকে পাওয়া যোগাযোগ মডিউলের ম্যানুয়েলগুলো দেখে রিরা আর কুশান মোটামুটি হতাশ হয়ে পড়ে। অত্যন্ত জটিল সার্কিট, এই বিষয়ে কয়েক বছরের আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা না থাকলে এগুলো নিয়ে কাজ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দুজনে মিলে অনেক কষ্ট করে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত একটা রিসিভারকে কোনোমতে আবার চালু করে নেয়। সুইচ অন করেই অবশ্য তারা হতাশ হয়ে গেল, রিসিভারটি একটু পরে পরেই "বিপ" করে একটি শব্দ করছে। যার অর্থ—সার্কিটে সমস্যা থাকার কারণে এখানে কোনো এক ধরনের ফিডব্যাক হচ্ছে। রিরা কিছুক্ষণ বিষদৃষ্টিতে রিসিভারটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমাদের এত ঘণ্টার পরিশ্রম একেবারে বৃথা গিয়েছে!"

AMARBOI.COM

কুশান বলল, "না রিরা, বৃথা যায় নি।"

"কেন বৃথা যায় নি?"

কুশান বলল, "আমরা যদি ট্রান্সমিটার তৈরি করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতাম, তা হলে বলতে পারতাম পরিশ্রমটা বৃথা গিয়েছে।"

"কেন কুশান? তুমি এটা কেন বলছ?"

"কারণ রিসিভারটি আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা সিগন্যাল পেতে চাই না—আমরা সিগন্যাল পাঠাতে চাই। সিগন্যাল পাঠাতে দরকার ট্রান্সমিটার!"

রিরা শব্দ করে হেসে বলল, "ঠিকই বলেছ। এখন চলো বিশ্রাম নিতে যাই। একদিনের জন্য অনেক পরিশ্রম হয়েছে।"

কুশান বলল, "তুমি যাও। আমি আরো কিছুক্ষণ দেখি।"

"বেশ। দেখি তুমি একটা ট্রান্সমিটার দাঁড় করাতে পার কি না। এই ভয়ংকর প্রাণীগুলো আমাদের খেয়ে ফেলার আগে আমাদের যে করে হোক একটা ট্রান্সমিটার দাঁড় করাতে হবে। যে করেই হোক!"

রিরা ঘুম থেকে উঠে কুশানকে খোঁজ করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, সে এখনো কমিউনিকেশান কক্ষে বসে আছে। রিরা অবাক হয়ে বলল, "সে কী! তুমি ঘুমাতে যাও নি?"

"যাব।"

"কী করছ এখানে একা একা বসে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রিসিভারটার সার্কিট আবার পরীক্ষা করে দেখছিলাম।"

"পরীক্ষা করে কী দেখলে?"

"মনে আছে, রিসিভারটি ঠিক করে কাজ করছিল না? এক ধরনের পজিটিভ ফিডব্যাক হয়ে একটু পরে পরে "বিপ বিপ" শব্দ করছিল?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"আমি তাই সার্কিটটা পরীক্ষা করে দেখলাম। সার্কিটটা ঠিকই আছে। রিসিভারটা আসলে ঠিকভাবেই কাজ করছে।"

রিরা ভুরু কুঁচকে বলল, "বিপ বিপ শব্দ বন্ধ হয়েছে?"

কুশান রিরার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল, "না, বন্ধ হয় নি।"

"তা হলে?"

"এই বিপ বিপ শব্দটা আসলে সত্যিকার সিগন্যাল। এটা এই গ্রহ থেকেই আসছে।"

"কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছি। এখান থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূর থেকে আসছে।"

"কে পাঠাচ্ছে এই সিগন্যাল?"

"কেউ পাঠাচ্ছে না।" কুশান মাথা নেড়ে বলল, "আগে এই গ্রহে মানুষেরা থাকত, এটা সম্ভবত তাদের ট্রান্সমিটার। নিজে থেকে কাজ করছে। ব্যাটারি দুর্বল, তাই সিগন্যালটাও খুব দুর্বল।"

রিরা চোখ বড় বড় করে তাকাল, "সত্যি বলছ তুমি?"

"আমার তা-ই ধারণা।"

"তার মানে ইচ্ছে করলে আমরা সেই ট্রান্সমিটারটা ব্যবহার করতে পারব?"

"হ্যাঁ, আমরা যদি এই গ্রহে ষাট কিলোমিটার ভ্রমণ করে ট্রান্সমিটারে নতুন ব্যাটারি লাগিয়ে আসি তা হলে আমরা নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে পারব।"

"আমরা তা হলে আমাদের অবস্থান জানিয়ে সিগন্যাল পাঠাতে পারব? উদ্ধারকারী কোনো মহাকাশযান এসে আমাদেরকে উদ্ধার করবে?"

কুশান নরম গলায় বলল, "এটি এখন প্রায় নিশ্চিত একটি সত্যিকারের সম্ভাবনা।"

রিরা আনন্দে চিৎকার করে কুশানকে জড়িয়ে ধরল, কুশান একটু বিব্রত হয়ে বলল, "আমি মানুষের মতো আনন্দ প্রকাশ করতে পারি না। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলে কী করতে হয়?"

রিরা কুশানকে জড়িয়ে ধরে রেখে বলল, "যদি সেটা তুমি না জান, তা হলে তোমাকে এখন আর শেখানো সম্ভব নয়!"

"তবু আমি জানতে চাই..."

"তোমার জানার প্রয়োজন নেই কুশান। তোমরা নীলমানবেরা আনন্দ-ভালবাসা—এইসব ব্যাপার প্রকাশ করতে চাও না। আমরা মানুষেরা দরকার না থাকলেও প্রকাশ করে ফেলি।"

"আমি সেটা লক্ষ করেছি।"

"কাজেই যখন আনন্দ এবং ভালবাসা প্রকাশ করার প্রয়োজন হবে, আমি এখন থেকে দ্বিগুণ প্রকাশ করব। আমার এবং তোমার দুজনেরটা একসাথে মিলিয়ে।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ রিরা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিরা কুশানকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "এবারে তুমি ওঠো। গিয়ে টানা একটা লম্বা ঘুম দাও। আমি জানি মানুষ কিংবা নীলমানব কেউই ঘুম ছাড়া ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না।"

কুশান উঠে দাঁড়াল, রিরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আমার নিজের ভেতরে একটা বিচিত্র জিনিস লক্ষ করছি।"

"কী লক্ষ করছ কুশান?"

"আমার নিজের খুশি হওয়া এবং আনন্দ হওয়া নির্ভর করে তোমার ওপরে। তোমাকে খুশি হতে দেখলে আমিও খুশি হয়ে যাই। তোমার মন খারাপ হলে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়।"

রিরা একটু অবাক হয়ে কুশানের দিকে তাকাল। দুর্ধর্ষ এবং একরোখা এই নীলমানব প্রজাতির একজনের মুখে এরকম সহজ-সরল স্বীকারোক্তি রিরা কখনো আশা করে নি। সে একটু চেষ্টা করে মুখে সহজ একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে বলল, "এখন তা হলে আমার ওপর দায়িত্ব বেড়ে গেল! তোমাকে হাসিখুশি রাখার জন্য আমাকেও হাসিখুশি থাকতে হবে!"

কুশান তার ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে বলল, "তুমি মোটামুটিভাবে নিখুঁত—শুধু যদি তোমার গায়ের রঙটা পচা আঙুরের মতো বাদামি না হত, তা হলে তোমাকে নিখুঁত বলা যেত!"

রিরা শব্দ করে হেসে বলল, "ঠিক আছে কুশান, আমি এটা একটা প্রশংসা হিসেবে নিচ্ছি!"

"আমি প্রশংসা হিসেবেই বলেছি।" কুশান অপরাধীর মতো বলল, "আমরা কিছু কিছু বিষয় ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারি না।"

কুশান ঘুমাতে চলে যাবার পর রিরা কমিউনিকেশান কক্ষে রিসিভারটির সামনে গিয়ে বসে। মূল প্রসেসরের সাথে কথা বলে তার দেখতে হবে—এখানে মানুষের আগের বসতিটি কোথায় ছিল, কেমন ছিল সেগুলো জানে কি না। এক-দুদিনের মাঝেই তাদের সেই বসতিতে যেতে হবে ট্রান্সমিটারের ব্যাটারিটি বদলে দিয়ে চালু করে দেবার জন্য।

রিসিভারের সুইচে হাত দিয়ে হঠাৎ করে রিরা একটু আনমনা হয়ে যায়, কী জন্য সে ঠিক বুঝতে পারে না।

চাপা একটা গর্জন করে মাটি থেকে মিটারখানেক উপর দিয়ে বাইভার্বালটা উড়ে যাচ্ছে। বাইভার্বালের সামনে রেলিঙে হাত রেখে রিরা আর কুশান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গরম বাতাসের হলকায় তাদের চুল উড়ছে, গ্রহের সাদা বালিতে দুজনের চেহারাই ধূলি ধূসরিত। রিরা বলল, "পুরো ব্যাপারটা একটা জুয়াখেলার মতো।" তার মুখে অক্সিজেনের ছোট মাস্ক থাকার কারণে এবং বাতাসের শব্দে ভালো করে কথা শোনা যাচ্ছে না বলে প্রায় চিৎকার করে কথা বলতে হল।

কুশান প্রত্যুত্তরে প্রায় চিৎকার করে বলল, "কেন? এটাকে তুমি জুয়াখেলা কেন বলছ?"

"যদি হঠাৎ করে গ্রহটা অন্ধকার না হয়ে যায়, তা হলে পুরো কাজটা পানির মতো সহজ! আমরা বাইভার্বালে করে যাব, ট্রান্সমিটারে নতুন ব্যাটারি লাগাব, ট্রান্সমিটারে প্রোগ্রাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোড করব এবং ফিরে আসব। কিন্তু যদি এর মাঝে গ্রহটা আবার অন্ধকার হয়ে যায়, তখন আমাদের কী অবস্থা হবে কল্পনা করতে পার?"

"কিন্তু আমরা তো তার প্রস্তুতি নিয়েছি। বেশ অনেকগুলো ফ্লেয়ার নিয়েছি, সার্চলাইট নিয়েছি, অস্ত্র নিয়েছি—"

"কিন্তু তুমি খুব ভালো করে জান এগুলো সত্যিকারের নিরাপত্তা না! আমরা যদি এই খোলা গ্রহে কয়েক লক্ষ বীভৎস প্রাণীর মুখোমুখি হয়ে যাই, তা হলে কোনোভাবে বের হয়ে আসতে পারব?"

কুশান বলল, "পারব, নিশ্চয়ই পারব।"

কুশানের কথা শুনে রিরা কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ টিপে হাসল।

কুশান জিজ্ঞেস করল, "তুমি হাসছ কেন?"

"তুমি আমার উপদেশ মেনে মিছিমিছি আশা দিতে শুরু করেছ দেখে।"

কুশান বলল, "যেখানে ঠিক উত্তর জানা নেই, সেখানে মিছিমিছি আশা করে থাকা খারাপ নয়!"

রিরা বাইভার্বালটাকে একটা বিপজ্জনক বড় পাথরের পাশ কাটিয়ে নিয়ে বলল, "মানুষের বসতিটা আর কতদূর হবে বলে মনে হয়?"

"আমরা নিশ্চয়ই খুব কাছাকাছি চলে আসছি। আমার পাওয়ার মিটারে হাই ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যালটা বেশ জোরালো হয়ে গেছে।"

রিরা বাইভার্বালটাকে কয়েক মিটার উপরে নিয়ে বলল, "কুশান, তোমার দৃষ্টিশক্তি ঈগল পাখির মতো—তুমি খুঁজে দেখ, দেখা যায় কি না।"

কুশান সামনে তাকিয়ে বলল, "আমার মনে হয় দেখতে পেয়েছি। সোজা সামনের দিকে যাও। একটা বিধ্বস্ত দালানের মতো দেখছি—উপরে একটা এন্টেনা দেখা যাচ্ছে। আলোতে চকচক করছে।"

রিরা দেখার চেষ্টা করে বলল, "আমি কিছু দেখছি না।"

"আরেকটু কাছে গেলেই দেখবে।"

সত্যি সত্যি কয়েক মিনিট পরেই রিরা মানুষের বসতিটা দেখতে পেল। ধুলায় ঢাকা পড়ে আছে কিন্তু দেখে বোঝা যায় একসময় এটি নিশ্চয়ই বেশ বড় একটা আবাসস্থল ছিল। একপাশে বড় বড় ডোম, দূরে পাওয়ার স্টেশন, মানুষের থাকার আবাসস্থল, পানির ট্যাংক—সবকিছুই ধুলার নিচে আড়াল হয়ে যেতে শুরু করেছে। রিরা বাইভার্বালটি নিয়ে পুরো এলাকাটা একবার ঘুরে এসে বলল, "আর কিছুদিন পার হলে তো পুরোটাই বালুর নিচে ডুবে যেত, আর খুঁজেই পেতাম না।"

কুশান বলল, "খালিচোখে খুঁজে বের করা কষ্ট হত—ঠিক যন্ত্রপাতি থাকলে বের করা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়।"

রিরা বাইভার্বালটি মূল কেন্দ্রের কাছাকাছি থামিয়ে বলল, "হ্যাঁ, সেটা ঠিকই বলেছ। আমাদের মহাকাশযানটা বিধ্বস্ত হয়ে আমরা মোটামুটিভাবে অনাথ হয়ে গেছি।"

দুজন বাইভার্বাল থেকে নেমে কেন্দ্রটির দিকে তাকাল—সবকিছু ভেঙেচুরে বিধ্বস্ত হয়ে আছে। এই গ্রহের প্রাণীগুলো নিশ্চয়ই অসংখ্যবার এই কেন্দ্রটিতে এসে হানা দিয়েছে। রিরা স্পষ্ট দেখতে পায়—মানুষের জ্বালানি শেষ হয়ে গেছে আর আলো জ্বালাতে পারছে না, অন্ধকার রাতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মহাজাগতিক প্রাণী হিংস্র দাঁত নিয়ে ছুটে আসছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে! কী ভয়ংকর একটি পরিণতি। রিরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "চলো কুশান, ভেতরে যাই।"

"চলো।" ভাঙা দেয়াল পার হয়ে তারা ভেতরে ঢুকল। ভেতরে আরো বেশি বিধ্বস্ত অবস্থা। ভাঙা যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে—নোংরা দেয়ালে পোড়া দাগ, ধসে যাওয়া ছাদ, দুমড়ে-মুচড়ে থাকা ধাতব টিউব—সব মিলিয়ে একটা ভয়ংকর পরিবেশ। রিরা নিচু গলায় বলল, "এরকম একটা পরিবেশে ট্রান্সমিটারটা টিকে আছে কেমন করে? প্রাণীগুলো ট্রান্সমিটারটাকে নষ্ট করে নি কেন?"

"আমার মনে হয় কন্ট্রোল প্যানেলটি আলোকিত ছিল, আলো দেখে ভয় পেয়ে আসে নি!"

"হ্যাঁ। তা-ই হবে নিশ্চয়ই। এখন এই জঞ্জালের ভেতরে খুঁজে পেলে হয়।"

কুশান বলল, "ভয় পেয়ো না। আমি খুঁজে বের করে ফেলব।"

"হ্যাঁ, কুশান। তুমি আর তোমার নীলমানবের দৃষ্টি এখন আমাদের একমাত্র ভরসা!"

দুজনে মিলে খুঁজতে শুরু করে। বন্ধ ঘরের দরজা খুলে রিরা চিৎকার করে পেছনে সরে আসে। ভেতরে একজন মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে—কিছু কিছু অংশ ক্ষয়ে গেলেও চোখে-মুখে এখনো এক ধরনের অবর্ণনীয় আতঙ্ক। রিরা নিশ্বাস আটকে রেখে বলল, "আমাদের যদি কেউ উদ্ধার করতে না আসে, তা হলে আমাদেরও এই অবস্থা হবে।"

কুশান রিরাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এসে বলল, "সেটা নিয়ে পরে দুশ্চিন্তা করা যাবে—এখন যেটা করতে এসেছি, সেটা করা যাক।"

ট্রান্সমিটারের কন্ট্রোল প্যানেলটা খুঁজতে গিয়ে তারা আরো কয়েকজন মানুষের মৃতদেহ এবং অনেকগুলো মৃতদেহের অংশবিশেষ খুঁজে পেল। এই গ্রহের প্রাণীগুলো এই মানুষগুলোকে তাদের ধারালো দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। দেখে মনে হচ্ছে কেউ আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ পায় নি।

ট্রান্সমিটারের কন্ট্রোল প্যানেলটি ছিল তিনতলার একটি ঘরে। কুশানের ধারণা সত্যি, প্যানেলটি আলোকিত বলে প্রাণীগুলো এটাকে কখনো স্পর্শ করে নি। দুজনে খুঁজে পুরোনো ব্যাটারিগুলো বের করে সেগুলো খুলে নতুন ব্যাটারি লাগিয়ে দিল। নতুন করে সুইচ অন করার সাথে সাথে কন্ট্রোল প্যানেলটি উজ্জ্বল আলোতে জ্বলে উঠল। রিরা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলল, "চমৎকার! এখন এটাকে যদি উদ্ধার করার জন্য প্রোগ্রাম করতে পারি, তা হলেই আমাদের কাজ শেষ!"

কুশান জিজ্ঞেস করল, "তুমি পারবে?"

"পারার কথা, মহাকাশ একাডেমিতে আমাদের শিখিয়েছে!"

"এটা কিন্তু অনেক পুরোনো সিস্টেম।"

"তা হলেও ক্ষতি নেই। জরুরি অবস্থার কোড কখনো পরিবর্তন করা হয় না। আমাদেরকে সেটাই শিখিয়েছে।"

কিছুক্ষণের মাঝেই রিরা আবিষ্কার করল তাদেরকে ভুল জিনিস শেখানো হয় নি। জরুরি অবস্থার কোড ব্যবহার করে সে সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের মাঝে ট্রান্সমিটারটা প্রোগ্রাম করে ফেলল। প্রতি সেকেন্ডে একবার করে ট্রান্সমিটারটা মহাকাশে সবাইকে জানিয়ে দিতে লাগল—বিধ্বস্ত মহাকাশযানের মহাকাশচারী এই গ্রহে আটকা পড়ে আছে, তাদেরকে উদ্ধার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য এস। এই তথ্যটি কাছাকাছি সব মহাকাশযান থেকে রিলে করা হবে—এক-দুই দিনের ভেতরে মূল মহাকাশ কেন্দ্রে তথ্যটি পৌঁছে যাবে। তখন কেউ না কেউ তাকে উদ্ধার করতে আসবে। এটি এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

রিরা কন্ট্রোল প্যানেলে সিগন্যালের তীব্রতা নিশ্চিত করে ঘুরে কুশানের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাজ শেষ।"

"পুরোপুরি শেষ হয় নি। আমরা মহাকাশযানে ফিরে যাবার পর বলব, কাজ শেষ।"

"হ্যাঁ।" রিরা মাথা নাড়ল, বলল, "মহাকাশযানে গিয়ে আমরা আজকে সত্যিকারের তিতির পাখির মাংস আর যবের রুটি দিয়ে একটা ভোজ দেব। তার সাথে থাকবে আঙুরের রস।"

"খাবার পর থাকবে বুনো স্ট্রবেরি দিয়ে তৈরি ফলের কাস্টার্ড।"

"হ্যাঁ, ফলের কাস্টার্ড।" রিরা মাথা নেড়ে বলল, "তারপর কিহিতার সপ্তদশ সিম্ফনি শুনতে শুনতে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকব।"

কুশান একটু হেসে বলল, "আমার মনে হয় সেজন্য আমাদের সবচেয়ে প্রথম মহাকাশযানে ফিরে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারব, তত তাড়াতাড়ি এই আনন্দোৎসব শুরু করা সম্ভব হবে।"

"তুমি ঠিকই বলেছ কুশান, আর দেরি করে লাভ নেই।"

"চলো যাই।"

দুজনে বাইভার্বালে এসে ওঠে। শক্ত হাতে হ্যান্ডেল ধরে পা দিয়ে চাপ দিয়ে ইঞ্জিন চালু করে দিতেই বাইভার্বালটা একটা চাপা গর্জন করে মাটির উপরে ভেসে উঠল। রিরা হ্যান্ডেলটা টেনে ধরতেই সেটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটে যেতে থাকে।

রিরা দিগন্তে ঝুলে থাকা অতিকায় উপগ্রহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্কভাবে বলল, "মহাকাশে পৌঁছানোর আগে হঠাৎ যদি গ্রহটা অন্ধকার হয়ে যায়, তা হলে কী হবে কুশান?"

"কিছুই হবে না রিরা, আমরা তার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি।"

"আমাদের মহাকাশ একাডেমিতে কী শিখিয়েছিল জান?"

"কী?"

"একজন মানুষ কখনোই একটা বিপদের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারে না। সেটার জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব কখন জান?"

কুশান রিরার দিকে তাকিয়ে বলল, "কখন?"

"সেই বিপদটিতে পড়ে তার থেকে একবার উদ্ধার পেলে।"

কুশান কোনো কথা না বলে দূরে উপগ্রহটির দিকে তাকিয়ে রইল। রিরা বলল, "কী হল কুশান, তুমি চুপ করে আছ কেন?"

কুশান রিরার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "মহাকাশযানে পৌঁছতে আমাদের আর কতক্ষণ লাগবে রিরা?"

"এখনো কমপক্ষে আধাঘণ্টা। কেন?"

"আমার মনে হয় গ্রহটায় অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে।"

রিরা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তুমি কী বলছ কুশান?"

"হ্যাঁ। তাকিয়ে দেখ।"

রিরা তাকিয়ে দেখল গাঢ় একটি অন্ধকার ছায়া উপগ্রহটি ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশুভ একটি অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে পুরো গ্রহটি। কোথা থেকে শীতল একটি বাতাস ভেসে এল, শিউরে উঠল রিরা, শীতে এবং আতঙ্কে।

কিছু বোঝার আগেই গাঢ় অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল।

বাইভার্বালটি থামিয়ে রিরা বলল, "আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না কুশান। তুমি দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।"

"চমৎকার। এই নাও—বাইভার্বালটা তুমি চালিয়ে নিয়ে যাও।"

"রিরা, আমি কখনো তোমাদের এই ভাসমান যান চালাই নি। কেমন করে চালাতে হয় আমি জানি না।"

ঘুটঘুটে অন্ধকারে রিরা কুশানের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল, সে কখনো কল্পনা করে নি যে, একজন বলতে পারে যে সে বাইভার্বাল কীভাবে চালাতে হয় জানে না। মানুষ যেভাবে হাঁটতে শেখে, সেভাবে বাইভার্বাল চালাতে শেখে। রিরা ভুলে গিয়েছিল কুশান মানুষ নয়, কুশান নীলমানব। সে একটু অধৈর্য গলায় বলল, "বাইভার্বাল চালানো খুব সোজা কুশান। হ্যান্ডেলটা টেনে ধরলেই চলে...।"

"জানি। তুমি চালিয়েছিলে, আমি লক্ষ করেছি। কিন্তু সবকিছুরই এক ধরনের ব্যালেন্স দরকার। আমি যদি চালাতে গিয়ে কোনো পাথরে ধাক্কা লাগিয়ে ফেলি খুব বড় বিপদ হয়ে যাবে।"

"তা হলে?"

"একটা ফ্লেয়ার জ্বালানো যাক। ফ্লেয়ারের আলোতে তুমি চালিয়ে নাও।"

"ঠিক আছে।"

রিরা বাইভার্বালের জমাটবাঁধা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল এবং তার মাঝে বুঝতে পারল কুশান একটা ফ্লেয়ার এনে সুইচ টিপে ছেড়ে দিয়েছে। জ্বলন্ত আগুনের হলকা ছড়িয়ে ফ্লেয়ারটা আকাশে উঠে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর পুরো এলাকাটা তীব্র সাদা আলোতে ভরে গেল। অন্ধকারে এতক্ষণ থাকার পর হঠাৎ করে এই তীব্র আলোতে রিরার চোখ ধাঁধিয়ে যায়, সে দুই হাতে চোখ ঢেকে আলোতে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ঝড়ো বাতাসের মতো এক ধরনের শব্দ শুনতে পেল। ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ওটা কিসের শব্দ কুশান?"

"আমার মনে হয় মহাকাশের প্রাণী বের হয়ে আসছে।" ভয়ংকর এক ধরনের আতঙ্কে হঠাৎ রিরার বুক কেঁপে ওঠে। সে কাঁপা হাতে বাইভার্বালের হ্যান্ডেলটা ধরে নিজের দিকে টেনে আনে, একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে বাইভার্বালটা উড়ে যেতে শুরু করে। রিরা তীব্র আলোতে চোখ দুটোকে অভ্যস্ত হতে দিয়ে বাইভার্বালটাকে নিয়ন্ত্রণের মাঝে রাখার চেষ্টা করে। ফ্লেয়ারের কৃত্রিম আলোতে পুরো এলাকাটা এখন অপরিচিত একটা জগতের মতো দেখাচ্ছে, রিরার হঠাৎ করে দিক বিভ্রম হতে শুরু করল। কোনদিকে যাবে সেটা নিয়ে হঠাৎ তার ভেতরে একটা বিভ্রান্তির জন্ম হয়ে গেল। ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কুশান!"

"কী হল?"

"আমি কোনদিকে যাব বুঝতে পারছি না।"

"তুমি ঠিক দিকেই যাচ্ছ রিরা। একটু বাম দিকে ঘুরিয়ে নাও—দশ ডিগ্রির মতো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ফ্লেয়ারের আলোতে সবকিছু অন্যরকম লাগছে—আলোটা উপর থেকে আসছে, কোনো ছায়া নেই, তাই কোনো কিছুর গভীরতা বুঝতে পারছি না।"

"আমি বুঝতে পারছি রিরা। তুমি মাথা ঠাণ্ডা রাখ—ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই।"

"পাথরগুলো কত উঁচুতে বুঝতে পারছি না—মনে হচ্ছে কোথাও ধাক্কা লাগিয়ে দেব।"

"না রিরা।" কুশান শান্ত গলায় বলল, "তুমি ধাক্কা লাগাবে না।"

ফ্লেয়ারটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। এটা যত নিচে নামছে আলোর তীব্রতা তত বাড়ছে—শুধু যে আলোর তীব্রতা বাড়ছে তা নয়, ফ্লেয়ারটি নামছে সামনের দিকে, তাই রিরার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। পুরো এলাকাটি হঠাৎ মনে হতে থাকে একটা বিশাল সাদা পরদার মতো। রিরা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আর পারছি না, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।"

কুশান কোনো কথা বলল না। রিরা জিজ্ঞেস করল, "প্রাণীগুলো কোথায় আছে কুশান?"

"আমাদের ঘিরে রেখেছে। ফ্লেয়ারটা নিভে গেলেই ছুটে আসবে আমাদের দিকে।"

"সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ রিরা, কাজেই যেভাবে হোক আমাদের মহাকাশযানে পৌঁছাতে হবে। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

রিরা সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে বাইভার্বালটা চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকে, কয়েকবার বিপজ্জনকভাবে দুটি পাথরের সাথে ধাক্কা লাগতে লাগতে শেষমুহূর্তে নিজেদের বাঁচিয়ে নেয়। কুশান শান্ত গলায় বলল, "মহাকাশযানটিকে দেখতে পাচ্ছি রিরা। আর মাত্র কিছুক্ষণ।"

"ঠিক আছে।"

"মাথা ঠাণ্ডা রাখ রিরা—"

রিরা মাথা ঠাণ্ডা রাখল।

"আজ ভাগ্য আমাদের পক্ষে, আজ আমাদের কোনো বিপদ হতে পারে না।"

রিরা বিশ্বাস করতে চাইল আজ ভাগ্য তাদের পক্ষে। আজ সত্যিই বিপদ হবে না।

কিন্তু শেষমুহূর্তে ভাগ্য তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফ্লেয়ারটি যখন খুব নিচে নেমে এসেছে, তীব্র আলোতে যখন কিছু দেখা যাচ্ছে না, তখন রিরা বাইভার্বালটিকে একটা বড় পাথরের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে অনুমানে ভুল করে ফেলল, বাইভার্বালটিসহ রিরা আর কুশান আছড়ে পড়ল শক্ত মাটিতে। বাইভার্বালের যন্ত্রপাতি, ফ্লেয়ার, অস্ত্র, সার্চলাইট, ব্যাটারি সবকিছু ছিটকে পড়ল চারদিকে, ঢালু পাথরে গড়িয়ে যেতে থাকল সিলিন্ডারের মতো ফ্লেয়ারগুলো।

চাপা গলায় একটা গালি দিয়ে রিরা উঠে দাঁড়ায়, পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা লেগেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না সে। কুশান কাত হয়ে থাকা বাইভার্বালটা ধরে কোনোমতে উঠে দাঁড়াল, এক ধরনের হতচকিত দৃষ্টি দিয়ে চারদিকে তাকাল সে। রিরা কয়েক মুহূর্ত ফ্লেয়ারটার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার ঔজ্জ্বল্য কমতে শুরু করেছে, বার কয়েক আলোটা কেঁপে কেঁপে উঠল, এটা নিভে যাবার সময় হয়েছে। রিরা ফিসফিস করে বলল, "আমাদের ভাগ্যটুকু আমরা শেষ করে ফেলেছি কুশান।"

কুশান চাপা গলায় বলল, "ভাগ্য তৈরি করে নিতে জানলে কখনো শেষ হয় না।"

"তুমি জান তৈরি করতে?"

"জানতাম না। শিখছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কোথা থেকে শিখছ?"

"তোমার কাছ থেকে।"

রিরা এত কষ্টের মাঝেও একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আশা করি তুমি ভালো করে শিখেছ কুশান। কারণ আমি কিন্তু শিখি নি।"

কুশান বাইভার্বালটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "এটা কি আর যাবে?"

রিরা একনজর দেখে বলল, "কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করতে পারলে আবার চালানো যাবে।"

কুশান চারদিকে একবার তাকিয়ে বলল, "আমাদের সেই কিছুক্ষণ সময় নেই। প্রাণীগুলো ঘিরে ফেলেছে।"

"আরেকটা ফ্লেয়ার জ্বালানো যায় না?"

"না। ফ্লেয়ারগুলো গড়িয়ে নিচে চলে গেছে—এখন খুঁজে বের করার সময় নেই।"

"তা হলে?"

"আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে যদি দৌড়ে মহাকাশযানের কাছে চলে যাই।"

রিরা ফ্লেয়ারটির দিকে তাকাল, সেটা প্রায় নিবুনিবু হয়ে এসেছে, যে কোনো মুহূর্তে নিবে যাবে। জিজ্ঞেস করল, "পৌঁছাতে পারব মহাকাশযানের কাছে?"

"পৌঁছাতে হবে।"

কুশান নিচু হয়ে একটা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে বলল, "দেরি করে লাভ নেই রিরা। দৌড়াও।"

"কিন্তু—"

"এখন কিন্তুর সময় নেই।" কুশান রিরাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "দৌড়াও।"

রিরা দৌড়াতে শুরু করেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কুশান তার হাত ধরে বলল, "কী হয়েছে রিরা?"

"কিছু না। পায়ে ব্যথা পেয়েছি।"

রিরা আবার উঠে দাঁড়াল, পায়ের ব্যথা সহ্য করে সে কোনোভাবে দৌড়াতে চেষ্টা করতে থাকে, কুশান তার পিছু পিছু আসছে, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি হাতে নিয়ে সে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারদিকে।

ফ্লেয়ারটা হঠাৎ দপ করে নিবে গেল; অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক—সাথে সাথে অসংখ্য প্রাণীর এক ধরনের হিংস্র ধ্বনি শুনতে পায় রিরা। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এক ধরনের শব্দ ভেসে আসতে থাকে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু না দেখেও রিরা বুঝতে পারে ধারালো দাঁত বের করে অসংখ্য ক্লেদাক্ত প্রাণী হিংস্র নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ছুটে আসছে তাদের দিকে।

রিরা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আমি কিছু দেখছি না কুশান।"

"আমি দেখছি। আমাকে ধর।"

রিরা হাত বাড়িয়ে কুশানকে ধরার চেষ্টা করল, কুশান এগিয়ে এসে রিরার হাত ধরে তাকে টেনে নিতে থাকে। একটু পরে পরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে চায়, কিন্তু কুশান তাকে শক্ত করে ধরে রাখল, পড়ে যেতে দিল না। হিংস্র চিৎকার আর গর্জন বাড়ছে চারদিকে—পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। অন্ধকারে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে রিরা হঠাৎ পড়ে গেল নিচে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছোট একটা আর্তচিৎকার করে ওঠে সে—দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সহ্য করে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। কাতর গলায় বলল, "আমি আর পারছি না কুশান।"

AMARBOI.COM

"পারতে হবে।" অন্ধকারে কুশানের চাপা গলার স্বর শোনা গেল, "যেভাবে হোক পারতে হবে।"

"আমাদের ভাগ্য আমরা খরচ করে ফেলেছি কুশান।"

"এখনো খরচ হয় নি।" রিরা হঠাৎ অনুভব করল, কুশান তাকে টেনে দাঁড় করিয়েছে, "আমার অংশের ভাগ্যটুকু আমি তোমাকে দিচ্ছি। এখন তোমার কাছে দুজনের ভাগ্য।"

"কী বলছ তুমি?"

"ঐ যে সামনে তাকিয়ে দেখ—আমাদের মহাকাশযানটা দেখতে পাচ্ছ?"

"রিরা আবছাভাবে দেখতে পেল, বলল, "হ্যাঁ।"

"তুমি সেদিকে যেতে শুরু কর। যেভাবে পার। দৌড়িয়ে—হেঁটে—হামাগুড়ি দিয়ে—"

"আর তুমি?"

"আমি আসছি তোমার পিছু পিছু তোমাকে কাভার দিয়ে।"

"তুমি কীভাবে কাভার দেবে?"

"আমার কাছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আছে। আমি আগুন জ্বালাব।"

"তুমি কীভাবে আগুন জ্বালাবে? এখানে অক্সিজেন নেই।"

"আছে, আমার কাছে অক্সিজেন আছে।"

রিরা চমকে উঠে বলল, "কিন্তু সেটা নিশ্বাস নেবার অক্সিজেন।"

"সেটা নিয়ে কথা বলার সময় নেই। প্রাণীগুলো চলে আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি রিরা—আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

"না। আমি একা যাব না।"

"তোমাকে যেতে হবে। তোমাকে যেভাবে হোক বেঁচে থাকতে হবে। তোমাকে উদ্ধার করতে আসবে মনে নেই?"

"না—" রিরা চিৎকার করে বলল, "না।"

"হ্যাঁ।" কুশান রিরাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "যাও। তাড়াতাড়ি।"

রিরা কুশানের পদশব্দকে মিলিয়ে যেতে শুনল। কোথায় গিয়েছে সে?

ভয়ংকর হিংস্র শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রাণী ছুটে আসছে তাদের দিকে। রিরা আর চিন্তা করতে পারছে না। কোনোভাবে সে উঠে দাঁড়াল, তারপর একপায়ে ভর দিয়ে ছুটে যেতে শুরু করল মহাকাশযানের দিকে। পায়ের নিচে শক্ত পাথর, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সে এই পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। তাকে ঘিরে হিংস্র জন্তুগুলি ছুটে যাচ্ছে, খুব কাছে থেকে ভয়ংকর গলায় ডেকে উঠছে হঠাৎ হঠাৎ। রিরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না, অন্ধকারে হঠাৎ কোথা থেকে তার উপরে কিছু ঝাঁপিয়ে পড়বে এরকম একটা আতঙ্কে তার সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে আছে। যন্ত্রণা আর পরিশ্রমে তার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসতে চাইছে। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুকটা ফেটে যেতে চাইছে, তার মাঝে সে মহাকাশযানের দিকে ছুটে যেতে লাগল।

হঠাৎ করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির শব্দ শুনল সে ছাড়া ছাড়াভাবে, সাথে সাথে ভয়ংকর প্রাণীগুলোর হিংস্র চিৎকার বেড়ে গেল কয়েকগুণ—হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল কোথাও। রিরা নিজেকে টেনে নিতে থাকে সামনে, মহাকাশযানের একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে সে, আর কয়েক পা গেলেই পৌঁছে যাবে রিরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার গুলির শব্দ শুনতে পেল, তাকে কাভার দিচ্ছে কুশান। বলেছিল তার ভাগ্যটুকু সে রিরাকে দিয়ে দিচ্ছে—সত্যিই কি একজনের ভাগ্য আরেকজনকে দেওয়া যায়? সত্যিই কি স্বার্থপরের মতো কুশানের ভাগ্যটুকু নিয়ে এসেছে সে? রিরা মহাকাশযানের দরজায় হাত দেয়, গোপন সংখ্যা প্রবেশ করাতেই ঘরঘর শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে টেনে দরজাটা বন্ধ করে দিতেই মূল প্রসেসরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "জীবাণুমুক্ত করার জন্য বাতাস শোধনের প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছি—"

"বাইপাস কর।"

"এটি হবে অত্যন্ত অযৌক্তিক নিরাপত্তাবহির্ভূত কাজ।"

রিরা চিৎকার করে বলল, "আমি যা বলছি তা-ই কর।"

"বাইরের বাতাস ভেতরে ঢুকে সমস্ত মহাকাশযান দূষিত হয়ে যেতে পারে, ভয়ংকর বিপর্যয় হয়ে যেতে পারে।"

রিরা দরজায় লাথি দিয়ে বলল, "আহাম্মক, খুন করে ফেলব আমি। দরজা খোল।"

নিরাপত্তার সব নিয়ম ভঙ্গ করে, ঘরঘর করে মহাকাশযানের মূল দরজা খুলে গেল। রিরা মহাকাশযানের ভেতরে ঢুকে ছুটতে থাকে, তার এখন একটা ফ্লেয়ার দরকার, জরুরি নিরাপত্তার জন্য সে অনেকগুলো আলাদা করে রেখেছে।

ফ্লেয়ারটা হাতে নিয়ে রিরা যখন বাইরে ছুটে যাচ্ছিল, তখন সে আবার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির শব্দ শুনতে পেল, এবারে থেমে থেমে একটানা গুলি হতে লাগল। কুশানকে নিশ্চয়ই আক্রমণ করেছে প্রাণীগুলো—নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে সে। দূরে একটা আগুন জ্বলছে—আগুনটা নড়ছে ইতস্তত, কুশান আগুন দিয়ে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে প্রাণীগুলোকে, আগুনকে ঘিরে ছায়াকে সে ছুটোছুটি করতে দেখে, ভয়ংকর হিংস্র কিছু ছায়া।

ফ্লেয়ারটার সুইচ টিপে ছেড়ে দিতেই আগুনের একটা হলকা বের হয়ে গর্জন করে সেটা আকাশে উঠে গেল, মুহূর্তে দিনের মতো আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক। সাথে সাথে হিংস্র প্রাণীগুলো কাতর আর্তনাদ করে ছুটে পালিয়ে যেতে শুরু করে। ভয়ংকর হুটোপুটি শুরু হয়ে যায় চারদিকে। রিরা চোখ কুঁচকে তাকাল সামনে, একটা বড় পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছে কুশান, নিজের কাপড় খুলে সেটাতে আগুন ধরিয়েছে, নিশ্বাস নেবার অক্সিজেন দিয়ে আগুনটা জ্বালিয়ে রেখেছে কোনোভাবে।

রিরা ছুটে গেল কুশানের কাছে, সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, ধারালো দাঁত দিয়ে খুবলে নিয়েছে তার ডান হাতের একটা অংশ। নীল রক্তে ভিজে যাচ্ছে শুকনো পাথর। রিরাকে দেখে কুশান দুর্বলভাবে হাসল, বলল, "তুমি এসেছ?"

"হ্যাঁ কুশান, আমি এসেছি।"

"বেঁচে গেলাম তা হলে আমরা?"

"হ্যাঁ, কুশান। তোমার জন্য। তুমি তোমার ভাগ্যটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিলে বলে আমরা বেঁচে গেলাম।"

"ভাগ্য খুব বিচিত্র জিনিস" কুশান নরম গলায় বলল, "কাউকে দিয়ে দিলেও সেটা ফুরিয়ে যায় না।"

রিরা নিচু হয়ে কুশানকে স্পর্শ করল, তারপর গভীর মমতায় তার মাথাটিকে নিজের বুকে চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলল, "কুশান, আমার ভাগ্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, আমার জীবনও ফুরিয়ে গিয়েছিল! তুমি সবকিছু ফিরিয়ে এনেছ। তুমি!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুশান অবাক হয়ে দেখল রিরার চোখে পানি চিকচিক করছে। মানুষকে মনে হয় সে কখনোই পুরোপুরি বুঝতে পারবে না।

কুশান প্লেটের খাবারের টুকরোটা দেখে বলল, "তুমি দাবি করছ এটা সত্যিকার তিতির পাখির মাংস?"

রিরা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। খাবারের টিনে পরিষ্কার লেখা আছে এটা সত্যিকার তিতির পাখির মাংস।"

কুশান শুকনো রুটির টুকরোগুলো দেখিয়ে বলল, "আর এগুলো সত্যিকার যবের রুটি?"

"হ্যাঁ। এগুলো সত্যিকার যবের রুটি। বিশাল একটা মাঠে এটা জন্মেছে। এটা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয় নি।"

কুশান রুটির টুকরোর উপর মাখন লাগাতে লাগাতে বলল, "আর এই মাখনটা সত্যিকারের মাখন?"

"সেটা নিয়ে একটু বিতর্ক আছে। দাবি করা হয় কৃত্রিম এবং সত্যিকারের মাখনের মাঝে এখন আর কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই কোনটা সত্যি কোনটা কৃত্রিম বোঝার কোনো উপায় নেই।"

কুশান রুটির টুকরোটা মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, "কিন্তু একটা জিনিস জান রিরা—"

"কী?"

"আমি কিন্তু খাবার সময় সত্যিকার যবের রুটির সাথে কৃত্রিম যবের রুটির মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না।"

রিরা শব্দ করে হেসে বলল, "এটা কাউকে বলো না, তা হলে সবাই তোমাকে ভাববে সাধারণ রুচির মানুষ। যাদের রুচি খুব উন্নত, তারা এই পার্থক্যগুলো ধরতে পারে।"

কুশান বলল, "তুমি বলেছিলে আমাদের এই ভোজের সময় আমরা কিহিতার সপ্তদশ সিম্ফনি শুনব।"

"হ্যাঁ। আমি সেটার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু সেখানে একটা ব্যাপার আছে।"

"কী ব্যাপার?"

"সপ্তদশ সিম্ফনি শুনে যদি তোমার ভালো নাও লাগে, তুমি সেটা বলতে পারবে না।"

কুশান চোখ বড় করে বলল, "বলতে পারব না?"

"না। তুমি ভান করবে তোমার খুব ভালো লাগছে।"

"কেন?"

রিরা চোখে-মুখে একটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল, "এই সিম্ফনিটি আমার খুব প্রিয়। কেউ এটাকে অপছন্দ করলে আমিও তাকে অপছন্দ করি।"

কুশান তিতির পাখির মাংসের ছোট টুকরো মুখে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক রিরা, তুমি যেটাকে ভালো বলবে আমি সেটাকে কখনো খারাপ বলব না। দরকার হলে আমার চোখ-কান বন্ধ করে আমি সেটাকে ভালো বলব।"

"ঠিক তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক।"

রিরা গলা উঁচু করে বলল, "প্রসেসর?"

প্রসেসর তার নিষ্প্রাণ ধাতব কণ্ঠে বলল, "বলো রিরা।"

"কিহিতার সপ্তদশ সিম্ফনিটা শুরু করে দাও।"

খুব সূক্ষ্ম একটা সঙ্গীতের ধ্বনি ভেসে এল, প্রায় শোনা যায় না এরকম। আস্তে আস্তে সেটি ঘরের ভেতরে অনুরণিত হতে থাকে। মহাকাশের মাঝে যে বিশাল শূন্যতা, যে তীব্র নিঃসঙ্গতার বেদনা, সেটি যেন বুকের ভেতর হাহাকার করে যেতে থাকে। মনে হতে থাকে এই জগৎ, এই জীবন, এই বেঁচে থাকা সবকিছু মিথ্যে, সবকিছু অর্থহীন।

সিম্ফনিটা শেষ হবার পরও দুজন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। রিরা নিজের চোখ মুছে জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমি আসলে খুব আবেগপ্রবণ, অল্পতেই খুব কাতর হয়ে যাই। তবে সেটা কখনো কাউকে দেখাই নি। মহাকাশ একাডেমিতে সবাই জানত আমি খুব শক্ত একটি মেয়ে!"

"আমার মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়েও যেদিন তুমি ট্রিগার টান নি, আমি সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম যে তোমার ভেতরটা খুব নরম।"

"আর কী বুঝেছিলে?"

"আর বুঝেছিলাম তুমি—"

"আমি?"

"তুমি হয়তো জীবনে কষ্ট পাবে।"

রিরা একটু অবাক হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন মূল প্রসেসর বলল, "রিরা।"

"বলো।"

"এইমাত্র একটা উদ্ধারকারী মহাকাশযান থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে।"

রিরা চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল, ছুটে গিয়ে কুশানকে জড়িয়ে ধরে বলল, "শুনেছ? কুশান শুনেছ? আমাদের জন্য উদ্ধারকারী মহাকাশযান আসছে।"

কুশান মাথা নাড়ল, বলল, "শুনেছি।"

রিরা জিজ্ঞেস করল, "প্রসেসর? কী বলছে উদ্ধারকারী মহাকাশযান?"

"এখনো কিছু বলে নি। তারা মহাকাশযানের আইডি কোড এসব মিলিয়ে নিচ্ছে। কিছুক্ষণের মাঝে সরাসরি যোগাযোগ করবে। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"তুমি শুধু তাদের কথা শুনতে পাবে। তাদেরকে কিছু বলতে পারবে না।"

"হ্যাঁ।" রিরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "এখানে আমরা একটা দুর্বল রিসিভার দাঁড় করিয়েছি কিন্তু আমাদের ট্রান্সমিটার ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।"

কুশান বলল, "আমার মনে হয় সেটা কোনো বড় সমস্যা নয়। যখন সামনাসামনি দেখা হবে তখন তোমার ট্রান্সমিটার আর রিসিভার কিছুই লাগবে না!"

রিরা মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ।" তারপর হাত নেড়ে উত্তেজিত গলায় বলল, "আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে, সত্যি সত্যি আমাদের উদ্ধার করতে চলে আসছে! কী আশ্চর্য! তাই না কুশান?"

কুশান খুব ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। রিরা উত্তেজিত হয়েছিল বলে লক্ষ করল না মাথা নাড়ার সময় কুশান খুব সাবধানে একটি দীর্ঘশ্বাস গোপন করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিসিভারের কাছে সারাক্ষণ বসে থাকার প্রয়োজন নেই, তারপরেও রিরা কমিউনিকেশান ঘরে ধৈর্য ধরে বসে রইল। প্রাথমিক যোগাযোগের প্রায় তিন ঘণ্টা পর রিরা প্রথমবার উদ্ধারকারী দলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন ভারী গলায় বললেন, "মহাকাশযান ভেগা সাত সাত তিন চারের বেঁচে থাকা মহাকাশচারীদের উদ্দেশে বলছি। আমি আবার বলছি—মহাকাশযান ভেগা সাত সাত তিন চারের অভিযাত্রীরা, আমরা তোমাদের পাঠানো জরুরি উদ্ধারবার্তা পেয়েছি। আবার বলছি, জরুরি উদ্ধারবার্তা পেয়েছি। তোমাদের বার্তা মূল মহাকাশ কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে, সেখান থেকে আমাদের জরুরি বার্তা পাঠিয়ে তোমাদের উদ্ধার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি আবার বলছি, তোমাদের উদ্ধার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি তাই আমার মহাকাশযানের গতিপথ একটু পরিবর্তন করে এদিকে এসেছি। আমাদের একটা স্কাউটশিপ তোমাদের উদ্ধার করার জন্য রওয়ানা দিয়েছে। কিছুক্ষণের মাঝে সেটা এই গ্রহটির কক্ষপথে পৌঁছে যাবে। স্কাউটশিপ থেকে জানানো হয়েছে তারা তোমাদের বিধ্বস্ত মহাকাশযানটি খুঁজে পেয়েছে এবং গ্রহে অবতরণ করেই সেখানে পৌঁছে যাবে।"

ভারী গলার স্বরটি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "তোমাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয় তা হলে আমাদের এই বার্তার প্রত্যুত্তর দাও। আবার বলছি, প্রত্যুত্তর দাও।"

রিরা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রিসিভারের উপর আঘাত করে নিজের হতাশাটা প্রকাশ করে বলল, "কেমন করে দেব? আমি খালি শুনতে পাই, বলতে পারি না।"

রিসিভারে ভারী কণ্ঠস্বরটি বলল, "যদি প্রত্যুত্তর দেবার মতো সুযোগ না থাকে তা হলেও কোনো সমস্যা নেই। আমাদের স্কাউটশিপে উদ্ধারকাজে ব্যবহৃত সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবেই তোমাদের উদ্ধার করবে। স্কাউটশিপের দায়িত্বে আছে ক্যাপ্টেন রিহান, গ্রহটির কক্ষপথে পৌঁছেই সে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। ক্যাপ্টেন রিহান আমাদের সবচেয়ে কর্মদক্ষ তরুণ অফিসার। সে আমাদের মহাকাশযানের বারো জন দক্ষ এবং সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মীকে নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে। আমি নিশ্চিত সে সাফল্যের সাথে তোমাদের উদ্ধার করতে পারবে। তোমাদের জন্য অনেক শুভ কামনা।"

AMARBOI.COM

রিরা উত্তেজিত চোখে কুশানের দিকে তাকিয়ে বলল, "শুনেছ কুশান, সবচেয়ে কর্মদক্ষ তরুণ অফিসার আসছে আমাদের উদ্ধার করতে?"

কুশান মাথা নাড়ল, বলল, "শুনেছি।"

"তোমার কী মনে হয় কুশান, আমরা কি তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য কিছু ব্যবস্থা করে রাখব?"

কুশান একটু হেসে বলল, "তোমার মহাকাশ একাডেমি এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো কোর্স দেয় নি?"

রিরা মাথা নাড়ল, বলল, "না। মজার ব্যাপার হচ্ছে কীভাবে উদ্ধার করতে যেতে হয়, সেটার ওপরে দুটি কোর্স নিয়েছিলাম, কিন্তু উদ্ধার করতে এলে কী করতে হয় তার ওপরে একটি কোর্সও দেয় নি।"

কুশান বলল, "ক্যাপ্টেন রিহান যখন এসে দেখবে তুমি জীবিত, সুস্থ এবং আনন্দে চিৎকার করছ—সে এত খুশি হবে যে সেটাই হবে তার অভ্যর্থনা।"

রিরা মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। একজন মানুষকে জীবিত উদ্ধার করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারাই খুব বড় একটা কাজ। মানুষের জীবন খুব বড় একটি ব্যাপার। অসম্ভব বড় একটি ব্যাপার। তাই না কৃশান?"

কৃশান রিরার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, তারপর ফিসফিস করে বলল, "ঠিকই বলেছ। মানুষের জীবন খুব বড় একটি ব্যাপার।"

ঘণ্টা দুয়েক পর গ্রহটির কক্ষপথ থেকে ক্যাপ্টেন রিহান একবার যোগাযোগ করে তার অবস্থানটি জানিয়ে দিল। কক্ষপথ থেকে রওয়ানা দিয়ে গ্রহটির বায়ুমণ্ডল ভেদ করে দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করল আরো ঘণ্টাখানেক পর। এরপর সবকিছু ঘটতে লাগল খুব দ্রুত। তারা স্কাউটশিপটিকে মহাকাশযানের উপর দিয়ে গর্জন করে উড়ে যেতে দেখল, স্কাউটশিপটি বৃত্তাকার ঘুরে আবার তাদের কাছে ফিরে এল এবং বৃত্তটি ছোট করতে করতে একসময় মহাকাশযানের এক কিলোমিটারের কাছাকাছি একটি সমতল জায়গায় এসে অবতরণ করল। কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে রিরা দেখল, উদ্ধারকারী দল নেমে আসছে। ছোটখাটো মানুষটি নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন রিহান, যোগাযোগ মডিউলে কথা বলতে বলতে সে তার দলটিকে প্রস্তুত করে নেয়। কিছু যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, মেডিকেল টিম নিয়ে তারা দ্রুত মহাকাশযানটির দিকে ছুটে আসতে থাকে। রিরা হাত দিয়ে নিজের চুলগুলোকে বিন্যস্ত করে কৃশানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কৃশান, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?"

কৃশান হেসে বলল, "আমি তোমাকে আগেও বলেছি, তোমার গায়ের রঙ যদি পচা আঙুরের মতো না হত, তা হলে তোমাকে সুন্দরী বলে চালিয়ে দেওয়া যেত।"

"আকাশের জন্য নীল রঙ ভালো হতে পারে কিন্তু গায়ের জন্য পচা আঙুরের রঙ কিন্তু খারাপ না!"

"সেটা নিয়ে বিতর্ক করার সময় আরো পাবে, তুমি এখন যাও, মহাকাশযানের দরজাটা খুলে দাও। তা না হলে তারা ভেঙে ঢুকে যাবে!"

রিরা বলল, "ঠিকই বলেছ। একেবারে সত্যি কথা।"

রিরা দ্রুত মহাকাশযানের দরজার কাছে ছুটে গিয়ে তার হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে সেটা খুলতে শুরু করে। কয়েক মিনিটের মাঝেই উদ্ধারকারী দলটি মহাকাশযানের ভেতরে ঢুকল, সবার আগে ক্যাপ্টেন রিহান, তার পিছনে সশস্ত্র লোকজন। ক্যাপ্টেন রিহান এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে রিরার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মহাকাশযানটি যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে, তার ভেতরে কোনো জীবন্ত মানুষ খুঁজে পাব আমি একেবারে আশা করি নি।"

রিরা তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আশার বাইরেও অনেক কিছু ঘটে যায়। উদ্ধার করতে আসার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"

ক্যাপ্টেন রিহান হাত মিলিয়ে বলল, "আমি রিহান। ক্যাপ্টেন রিহান।"

"আমি রিরা। আর—" কৃশানকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল।

ঠিক তক্ষুনি সে একটা চিৎকার শুনতে পায়। কে একজন চিৎকার করে বলল, "সর্বনাশ! নীলমানব।"

কিছু বোঝার আগে রিরা বিস্ফারিত চোখে দেখতে পেল সশস্ত্র মানুষগুলো একসাথে তাদের অস্ত্রগুলো উপরে তুলেছে, একমুহূর্ত সময় লাগল তার ব্যাপারটি বুঝতে। যখন সে বুঝতে পারল তখন ভয়ংকর আতঙ্কে সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "না—না—না—"

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। রিরার মনে হল তার চোখের সামনে অনন্তকাল নিয়ে মানুষগুলো অস্ত্রগুলো কৃশানের দিকে তাক করেছে। মনে হল খুব ধীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রিগারে টান দিয়েছে। তার মনে হল সে বুলেটগুলোকে ছুটে যেতে দেখল। রিরার মনে হল সে দেখতে পেল একটি একটি বুলেট কুশানকে আঘাত করছে আর সেই আঘাতে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। রিরার মনে হল সমস্ত সৃষ্টিজগৎ বুঝি থমকে দাঁড়িয়েছে, বুঝি সময় স্থির হয়ে গেছে। তার মনে হল কুশান বুঝি দুই হাতে দেয়াল আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে—পারছে না। রিরা দেখল তার বুকের কাছাকাছি কাপড়ে বিন্দু বিন্দু নীল রঙের ছোপ, দেখল কুশানের চোখে এক ধরনের বিস্ময়। রিরা দেখল কুশান খুব ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার মাঝে বুঝি অনন্তকাল পার হয়ে গেছে। রিরা ছুটে যেতে থাকে কুশানের কাছে—মনে হয় সে বুঝি কখনোই আর তার কাছে পৌঁছতে পারবে না।

রিরা কুশানের মাথাটা দুই হাতে চেপে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কুশানের দুই ঠোঁটের মাঝখানে নীল একফোঁটা রক্ত, সে স্থির চোখে রিরার দিকে তাকিয়ে আছে। কুশানের ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। কিছু একটা বলছে সে। রক্তের ফোঁটাটি চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। আবার ঠোঁট দুটি নড়ল কুশানের, কিছু একটা বলছে সে, রিরা শুনতে পাচ্ছে না।

রিরা কুশানের মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে বলল, "না। না কুশান, না... না..."

কুশান ফিসফিস করে বলল, "মনে নেই রিরা—আমি তোমাকে আমার ভাগ্যটা দিয়ে দিয়েছিলাম! দেখেছ সত্যিই দিয়ে দিয়েছি।"

রিরা চিৎকার করে বলল, "না, না, না।"

কুশান বলল, "রিরা, তুমি আমার দিকে তাকাও।"

রিরা কুশানের দিকে তাকাল। কুশান বলল, "আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। কিন্তু আমি যতক্ষণ দেখতে পারি, আমি তোমাকে দেখতে চাই রিরা। তুমি আমার হাত ধরে থাক—তুমি আমার দিকে তাকিয়ে থাক।"

রিরা কুশানের হাত ধরে তার মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে একদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ক্যাপ্টেন রিহান এবং তার উদ্ধারকারী দল অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল, অপরিচিত এই নীলমানবটি মারা যাবার পরও দীর্ঘ সময় মহাকাশচারী রিরা তার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

নাইনা গ্রহের জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে—যে সমাধিটিতে ফুল দেবার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এখনো মানুষ এবং নীলমানবেরা নিয়মিতভাবে উপস্থিত হয়, সেই সমাধিটি মহীয়সী রিরার। জনশ্রুতি আছে তার একক প্রচেষ্টায় চতুর্থ সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে মানুষ এবং নীলমানবের বিরোধের সমাপ্তি ঘটে। মানুষ এবং নীলমানবেরা এখনো গভীর আগ্রহ এবং ভালবাসা নিয়ে এই মহীয়সী মহিলার কথা স্মরণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নায়িকারা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরা ত্রাতিনা গোল জানালা থেকে ভেসে ভেসে সরে যাচ্ছিল, সে হাত বাড়িয়ে জানালার কাচটা স্পর্শ করে নিজেকে থামিয়ে নেয়। জানালার শীতল কাচে মুখ স্পর্শ করে সে দূর পৃথিবীর দিকে তাকায়, দুই হাজার কিলোমিটার দূরের নীল পৃথিবীটাকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! উপর থেকে মহাদেশগুলোকে স্পষ্ট দেখা যায়, সাদা মেঘে বিষুব অঞ্চলটা ঢেকে আছে। এরকম কোনো একটা মেঘের নিচে এই মুহূর্তে তার প্রিয় শহর টেহলিস আড়াল পড়ে গেছে। কতদিন সে তার শহরে যায় নি, মহাকাশে ভেসে ভেসে সে কী গভীর একটা ভালবাসা নিয়েই না মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শহরটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

ফ্লাইট ক্যাপ্টেন রিশান মহাকাশ স্টেশনের শেষ মাথায় বড় টেলিস্কোপটায় চোখ লাগিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। সে টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে ভেতরে তাকিয়ে নীরা ত্রাতিনাকে দেখতে পায়। ছিপছিপে কম বয়সী তরুণী, ঝকঝকে খাপখোলা তলোয়ারের মতো চেহারা। এই কম বয়সেই নিজেকে একজন সত্যিকার মহাকাশচারী হিসেবে পরিচিত করে ফেলেছে। মেয়েটির জন্য রিশান মাঝে মাঝেই নিজের বুকের গভীরে কোথাও এক ধরনের ভালবাসা অনুভব করে। কখনো সেটা সে প্রকাশ করে নি, কিন্তু সেটা কি এই মেয়েটার কাছে গোপন রয়েছে?

রিশান তার টেলিস্কোপটা ছেড়ে দেয়াল স্পর্শ করে ভাসতে ভাসতে নীরা ত্রাতিনার কাছে এগিয়ে এল। কাছাকাছি এসে জানালা স্পর্শ করে নিজেকে থামিয়ে বলল, "নীরা, এত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ তুমি?"

নীরা ত্রাতিনা রিশানের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হাসল, বলল, "এই মহাকাশ থেকে পৃথিবী ছাড়া দেখার মতো আর কী আছে বলো?"

রিশান বলল, "তুমি যেভাবে দেখছ, তাতে মনে হচ্ছে পৃথিবীটা আগে কখনো দেখ নি।"

নীরা ত্রাতিনা মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা তুমি কিন্তু খুব ভুল বলো নি। এখান থেকে আমি যতবার পৃথিবীকে দেখি ততবার মনে হয় আমি যেন প্রথমবার দেখছি।"

রিশান বলল, "আর দু সপ্তাহের মাঝে পৃথিবীটাকে তুমি আরো অনেক কাছে থেকে দেখতে পাবে!"

নীরা ত্রাতিনা বড় বড় চোখে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমি খবর পেয়েছি, নতুন ক্রু আসছে। আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি।"

নীরা ত্রাতিনা অবিশ্বাসের গলায় বলল, "আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না!"

"প্রথমে আমারও বিশ্বাস হয় নি। তখন আমি মহাকাশ কেন্দ্রে যোগাযোগ করেছি, তারা বলেছে এটি সত্যি।"

নীরা একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "দেখবে একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রোগ্রামটা বাতিল করে দেবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, তার সুযোগ নেই। মহাকাশ স্টেশনে টানা ছয় মাসের বেশি কারো থাকার নিয়ম নেই।"

"নিয়ম নেই তাতে কী হয়েছে? হয়তো আমাদের দিয়েই নিয়ম করবে। টানা ছয় মাসের বেশি একটা মহাকাশ স্টেশনে থাকলে মহাকাশচারীদের মেজাজ কেমন তিরিক্ষে হয়ে থাকে সেটা নিয়েই হয়তো গবেষণা হবে।"

রিশান শব্দ করে হেসে বলল, "তোমার ভয় নেই নীরা। সেসব নিয়ে গবেষণা বহুকাল আগে শেষ হয়ে গেছে।"

"তা হলে তুমি বলছ আমরা সত্যি সত্যি পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি?"

"হ্যাঁ নীরা, আমরা দু সপ্তাহের মাঝে পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি।"

"চমৎকার!" নীরা জানালা থেকে হাতটা সরাতেই ভেসে উপরে উঠে যেতে শুরু করে। মহাকাশ স্টেশনের ছাদ স্পর্শ করে নিজেকে থামিয়ে বলল, "এই সুসংবাদটি দেবার জন্য চল একটু স্ফূর্তি করা যাক।"

রিশান হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী রকম স্ফূর্তি করার কথা ভাবছ?"

"উত্তেজক পানীয় খেয়ে সবাইকে নিয়ে খানিকক্ষণ চেঁচামেচি করা যেতে পারে। আমার কাছে খাঁটি প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি একটা কেক আছে, ভালো কোনো ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। মহাকাশ স্টেশনে এর থেকে ভালো কোনো ঘটনা আর কী হতে পারে!"

"ঠিকই বলেছ।" রিশান বলল, "তুমি সবাইকে খবর দিয়ে কেকটা কাটা শুরু কর। আমি আসছি। টেলিস্কোপে একটা গ্রহাণু একটু দেখে আসি।"

নীরা ত্রাতিনা ভুরু কুঁচকে বলল, "হঠাৎ করে এই গ্রহাণু দেখার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

"মহাকাশ কেন্দ্র থেকে বলেছে। গতিপথটা নাকি সুবিধার নয়। পৃথিবীর কক্ষপথে পড়তে পারে।"

নীরা ত্রাতিনা শব্দ করে হাসল, বলল, "পৃথিবীর মানুষের ভয় বড় বেশি। মহাকাশে একটা নুড়ি পাথর দেখলেও তাদের ঘুম নষ্ট হয়ে যায়।"

রিশান মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ। তবে বেচারাদের খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না, পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগেকার ঘটনা মনে হয় ভুলতে পারছে না। পুরো ডাইনোসর জগৎ উধাও হয়ে গেল—সেই তুলনায় মানুষ তো রীতিমতো অসহায় প্রাণী!"

"ঠিক আছে তুমি গ্রহাণুটা দেখে আস। আমি সবাইকে ডেকে আনি।"

আধঘণ্টা পর মহাকাশ স্টেশনের তিরিশ জন ক্রু নিয়ে একটা জমাট পার্টি শুরু হল। নীরা ত্রাতিনার বাঁচিয়ে রাখা কেক, কিছু বেআইনি উত্তেজক পানীয় এবং নিয়মবহির্ভূত গানবাজনায় ছোট মহাকাশযানটা রীতিমতো উদ্দাম হয়ে ওঠে। মহাকাশ স্টেশনের ভরশূন্য পরিবেশে বিচিত্র নাচগানের চেষ্টা করতে গিয়ে ছোট দুর্ঘটনা ঘটিয়ে একটা অবলাল ক্যামেরার মূল্যবান লেন্সটা ভেঙে ফেলার পর সিকিউরিটি অফিসার থুল হাত তুলে পার্টির সমাপ্তি ঘোষণা করল, গলা উঁচিয়ে বলল, "অনেক হয়েছে। সবাই এখন থাম। বাকিটুকু পৃথিবীর জন্য থাকুক।"

আমুদে পদার্থবিজ্ঞানী রিশি বলল, "পৃথিবীতে কি আমরা এই নাচ নাচতে পারব? কখনো পারব না।"

"না পারলে নাই। কিন্তু তোমরা যা শুরু করেছ আরেকটু হলে মহাকাশ স্টেশনের দেয়াল ভেঙে বের হয়ে যাবে।"

জীববিজ্ঞানী কিরি বলল, "আর একটু থুল।"

"উঁহু। আর না। তোমরা যেভাবে বেআইনি উত্তেজক পানীয় খাচ্ছ যদি পৃথিবীতে সেই খবর পৌঁছায় তা হলে নির্ঘাত আমাকে জেলে পুরে রাখবে।"

নীরা ত্রাতিনা খিলখিল করে হেসে বলল, "তুমি সেটা নিয়ে মন খারাপ করো না। কথা দিচ্ছি আমরা প্রতি সপ্তাহে জেলে তোমার সাথে খাবারের প্যাকেট নিয়ে দেখা করতে আসব।"

থুল জোর করে মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি আমাকে দেখতে আসবে না আমি তোমাকে দেখতে আসব সে ব্যাপারে তুমি এত নিশ্চিত হলে কেমন করে?"

রিশি ঠাট্টা করে কী একটা বলতে যাচ্ছিল সিকিউরিটি অফিসার থুল তার সুযোগ দিল না। হাত নেড়ে বলল, "আর ঠাট্টা-তামাশা নয়। পার্টি শেষ—এখন যে যার কাজে যাও।"

কাজেই কিছুক্ষণের ভেতরে যে যার কাজে চলে গেল। নীরা ত্রাতিনার এই মুহূর্তে কোনো কাজ নেই, ভেসে ভেসে নিজের কেবিনের দিকে যেতে যেতে তার রিশানের সাথে দেখা হয়ে গেল, হালকা গলায় বলল, "খুব মজা হল আজকে তাই না?"

রিশান অন্যমনস্ক গলায় বলল, "হুঁ।"

নীরা ত্রাতিনা রিশানকে ভালো করে লক্ষ করল, মুখটায় এক ধরনের দুশ্চিন্তার ছাপ। সে দেয়ালে হাত দিয়ে নিজেকে থামিয়ে বলল, "কী ব্যাপার রিশান, কিছু হয়েছে নাকি?"

"না। কিছু হয় নি।"

"তা হলে তোমাকে এত দুশ্চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন?"

"ঐ গ্রহাণুটা—"

"কী হয়েছে গ্রহাণুটার?"

"পাজি গ্রহাণুটা একেবারে পৃথিবীর কক্ষপথে।"

"কত দূরে আছে?"

"এখনো অনেক দূর, প্রায় সাড়ে চার মিলিয়ন কিলোমিটার।"

"তা হলে এত দুশ্চিন্তা করছ কেন? এত দূরে থাকতে কখনো নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।"

রিশান চিন্তিত মুখে বলল, "না, দুশ্চিন্তা করছি না। তবে—"

"তবে কী?"

"যদি এটা তার গতিপথ না বদলায় তা হলে আমাদের এটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে। তার মানে বুঝতে পেরেছ?"

নীরা ত্রাতিনা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। বুঝতে পারছি। সেটা করতে হবে আমাদের।"

"হ্যাঁ।"

নীরা ত্রাতিনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তার মানে আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া পিছিয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ।" রিশান জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "পার্টিটা মনে হয় আমরা একটু আগেই করে ফেলেছি!"

নীরা ত্রাতিনা বলল, "মোটেও আগে করি নি। ঠিক সময়ে করেছি।"

"কীভাবে ঠিক সময়ে করা হল?"

"যদি পৃথিবীতে ফিরে যেতে না পারি তা হলে এই গ্রহাণুকে আমাদের চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে! তা হলে ধরে নাও পার্টিটা হয়েছে পাজি গ্রহাণুকে চূর্ণবিচূর্ণ করা উপলক্ষে।"

রিশান শব্দ করে হেসে বলল, "মহাকাশে ছুটে আসা গ্রহাণুকে ধ্বংস করা হচ্ছে পৃথিবীর

AMARBOI.COM

সবচেয়ে বিপজ্জনক, সবচেয়ে ভয়ংকর কাজগুলোর একটি! সেটা উপলক্ষে পার্টি করতে হলে বেশ নার্ভের প্রয়োজন!"

নীরা ত্রাতিনা বলল, "আমার নার্ভ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।"

রিশান বলল, "জানি।"

"যদি সত্যি সত্যি নিউক্লিয়ার মিসাইল নিয়ে যেতে হয় আমি কিন্তু যাব।"

"ঠিক আছে।"

"এখন কি তুমি টেলিস্কোপে আবার গ্রহাণুটাকে দেখতে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি কি তোমার সাথে দেখতে পারি?"

"হ্যাঁ। অবশ্যই দেখতে পার।"

নীরা ত্রাতিনা আর রিশান ভেসে ভেসে মহাকাশ স্টেশনের বড় টেলিস্কোপটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

এই মহাকাশ স্টেশনটি পৃথিবী থেকে দুই হাজার কিলোমিটার উপরে একটা কক্ষপথে বসানো রয়েছে। দুই ঘণ্টার কাছাকাছি সময়ে এটা পৃথিবীকে একবার করে প্রদক্ষিণ করে। এই মহাকাশ স্টেশনে সব সময় বিজ্ঞানীদের একটি দল থাকে, মহাকাশ নিয়ে নানা গবেষণা করার জন্য তাদের পাঠানো হয়। দৈনন্দিন কাজের বাইরেও তাদের আরো নানা ধরনের কাজ করতে হয়—কোনো একটি গ্রহাণু পৃথিবীর দিকে ছুটে এলে সেটাকে মাঝপথে থামিয়ে বিস্ফোরিত করে দেওয়া সেরকম একটা কাজ।

টেলিস্কোপের আইপিসে চোখ লাগিয়ে নীরা ত্রাতিনা বলল, "কী বীভৎস দেখতে!"

"হ্যাঁ, এই গ্রহাণুটা দেখতে ভালো নয়।"

"কেমন লালচে রং দেখছ? পচা ঘায়ের মতন।"

রিশান বলল, "হ্যাঁ। এটা এস-টাইপ গ্রহাণু। লোহা আর ম্যাগনেসিয়ামে তৈরি। শতকরা পনের ভাগ গ্রহাণু এরকম।"

নীরা ত্রাতিনা জিজ্ঞেস করল, "গ্রহাণুটা তার কক্ষপথ ছেড়ে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে শুরু করল কেন?"

"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত অন্য কোনো গ্রহাণুর সাথে ধাক্কা লেগে গতিপথ পাল্টে গেছে।"

নীরা ত্রাতিনা খানিকক্ষণ গ্রহাণুটা লক্ষ করে বলল, "গ্রহাণু হিসেবে এটা বেশ বড়।"

"হ্যাঁ। প্রায় বারো কিলোমিটার। সত্যি সত্যি পৃথিবীতে আঘাত করলে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে।"

নীরা ত্রাতিনা টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে বলল, "শুধু শুধু দুশ্চিন্তা না করে চল এর গতিপথটা বের করে ফেলি।"

"হ্যাঁ। আমি সেজন্য এসেছি।"

"আমার এখন সেরকম কোনো কাজ নেই। তোমাকে সাহায্য করতে পারি?"

"অবশ্যই। তুমি যদি শুধু পাশে বসে থাক তা হলেই আমার অনেক বড় সাহায্য হবে। একা একা এই বিদঘুটে গ্রহাণুটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে না।"

"তোমার ভয় নেই রিশান, আমি তোমার সাথে আছি।"

পরবর্তী ছয় ঘণ্টা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে গ্রহাণুর গতিপথটি ছকে ফেলে নীরা ত্রাতিনা আর

রিশান আবিষ্কার করল টোরকা নামের বারো কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটা গ্রহাণু মূর্তিমান বিভীষিকার মতো পৃথিবীর দিকে ছুটে যাচ্ছে। গ্রহাণুটি লালচে, আকৃতি একটু লম্বা এবং পৃষ্ঠদেশ অসমতল। গ্রহাণুটি ঘুরছে এবং সে কারণে গতিপথ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। পৃথিবীর ইতিহাসে একচল্লিশ দিনের মাথায় এই গ্রহাণুটির বায়ুমণ্ডলে ঢোকার কথা।

এরপর যে ঘটনাটি ঘটবে সেটি কেউ চিন্তাও করতে সাহস পায় না।

কিছুক্ষণের মাঝেই মহাকাশযানের সব ক্রু গ্রহাণু টোরকার কথা জেনে গেল, মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন জরুরিভাবে সবাইকে তার কেবিনে ডেকে পাঠাল। গ্রহাণুটা পৃথিবীকে আঘাত করলে কী হতে পারে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। পদার্থবিজ্ঞানী রিশি একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "টোরকা গ্রহাণুটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঘণ্টায় এক শ বিশ হাজার কিলোমিটার বেগে আঘাত করবে।"

উপস্থিত বেশ কয়েকজন বিস্ময়ে শিস দেবার মতো একটা শব্দ করল। রিশি মাথা নেড়ে বলল, "গ্রহাণুটার আকার বারো কিলোমিটার। এটা বায়ুমণ্ডল ভেদ করে যাবে এবং কিছু বোঝার আগে, প্রায় চোখের পলকে, পৃথিবীতে আঘাত করবে। শেষবার এরকম একটা উল্কা আঘাত করেছিল জনমানবহীন সাইবেরিয়াতে—তাই কোনো প্রাণহানি হয় নি। কিন্তু এই গ্রহাণুটা আঘাত করবে এশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল এলাকায়। গ্রহাণুটা যখন পৃথিবীতে আঘাত করবে সেটা পৃথিবীর উপরের স্তর কয়েক কিলোমিটার ভেঙে ভেতরে ঢুকে যাবে। সেই ভয়ংকর বিস্ফোরণটি হবে কয়েক হাজার নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণের সমান। মুহূর্তে প্রায় অর্ধবিলিয়ন মানুষ মারা যাবে।"

যারা উপস্থিত ছিল তারা আবার শিস দেবার মতো একটা শব্দ করল। রিশি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। সেটা হচ্ছে শুরু। এই বিস্ফোরণে পাথর ধুলাবালি বিদ্যুৎগতিতে উপরে উঠে যাবে। কেন জান?"

নীরা ত্রাতিনা জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"কারণ এই গ্রহাণুটা যখন পৃথিবীর দিকে ছুটে যাবে তখন তার পেছনের সব বাতাসকে সরিয়ে নেবে, পেছনে থাকবে একটা শূন্যতা, সেই শূন্য গহ্বর দিয়ে ধুলাবালি পাথর ধোঁয়া আবর্জনা সবকিছু উঠে আসবে। তারপর সেটা ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীর আকাশে। আমাদের কেউ যদি তখন মহাকাশের এই স্টেশনে থাকি তা হলে আমরা দেখব কালো ধোঁয়ায় পৃথিবীটা ঢেকে যাচ্ছে। গ্রহটিকে আর নীল দেখাবে না, এটাকে দেখাবে ধূসর।"

রিশি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "পৃথিবীতে দিন-রাতের কোনো পার্থক্য থাকবে না, পুরোটাই হবে কালো রাত। কুচকুচে অন্ধকারে সবকিছু ঢাকা থাকবে। হিমশীতল ঠাণ্ডায় পৃথিবী স্থবির হয়ে যাবে। আকাশ থেকে কালো ধুলাবালি পৃথিবীতে পড়তে থাকবে, পুরো পৃথিবী ঢেকে যাবে কালো ধুলার স্তরে। প্রথমে যারা মারা যায় নি তখন তারা মারা পড়তে শুরু করবে।"

রিশি একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করল। জীববিজ্ঞানী কিরি বলল, "হ্যাঁ আমার ধারণা পৃথিবীর জীবিত প্রাণীর প্রায় নিরানব্বই শতাংশ মারা যাবে। সমুদ্রের পানি ধুলায় ঢেকে যাবে, জলজ প্রাণীরা নিশ্বাস নিতে পারবে না। গাছপালা কীটপতঙ্গ মারা যাবে প্রচণ্ড শীতে। পশুপাখি মারা যাবে না খেতে পেয়ে। তাদের খেয়ে বেঁচে থাকত যে প্রাণী তখন মারা যাবে সেই প্রাণী! ফুড চেইন ধরে একটি একটি প্রজাতি ধ্বংস হতে শুরু করবে। পরবর্তী এক বছরে পুরো পৃথিবী প্রায় প্রাণহীন একটা গ্রহে পাল্টে যাবে।"

রিশি বলল, "হ্যাঁ। এক দুইজন মানুষ নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও বেঁচে থাকবে। তারা আবার একেবারে গোড়া থেকে পৃথিবীর সভ্যতা শুরু করবে!"

রিশির কথা শেষ হবার পরও সবাই কেমন যেন হতচকিতের মতো বসে থাকে, পুরো বিষয়টি যেন এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সিকিউরিটি অফিসার থুল কিছু একটা বলার চেষ্টা করে থেমে গেল। ঠিক তখন একটা হাসির শব্দ শোনা যায়—সবাই মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে নীরা ত্রাতিনা খিলখিল করে হাসছে।

থুল একটু ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, "কী হল? তুমি হাসছ কেন?"

"তোমাদের সবাইকে দেখে।"

"আমাদের মাঝে হাসির ব্যাপারটা কী?"

"তোমাদের চেহারা দেখেই হাসি পাচ্ছে। তাকিয়ে দেখ সবাইকে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে টোরকা গ্রহাণুটা সত্যি সত্যি পৃথিবীকে আঘাত করে ফেলেছে। সত্যি সত্যি পৃথিবীর সব মানুষ মরে ভূত হয়ে গেছে। মনে রেখ এখনো ব্যাপারটা ঘটে নি এবং আমরা সেটা ঘটতেও দেব না।"

কেউ কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে নীরা ত্রাতিনার দিকে তাকিয়ে রইল। নীরা ত্রাতিনা বলল, "আমরা এখান থেকে একটা মিসাইল দিয়ে গ্রহাণুটাকে আঘাত করব। নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে টোরকাকে টুকরো টুকরো করে দেব।"

রিশান মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমাদের কাছে পৃথিবী থেকে সেরকম একটা নির্দেশ এসেছে।"

"কাজেই তোমরা সবাই এরকম প্যাঁচার মতো মুখ করে থেকো না। তোমাদের দোহাই লাগে—শুধু শুধু কেউ মুখ ভোঁতা করে বসে থাকলে দেখতে খুব খারাপ লাগে!

নীরা ত্রাতিনার কথা শুনে এবারে বেশ কয়েকজন সহজ গলায় হেসে উঠল। রিশি বলল, "নীরা ঠিকই বলেছে। এই বিদঘুটে গ্রহাণুটা তো সত্যি সত্যি পৃথিবীকে আঘাত করে নি! আমরা এটাকে তার আগেই ধ্বংস করব।"

থুল হাত উঁচু করে বলল, "অবশ্যই ধ্বংস করব।"

একসাথে এবারে অনেকে হাত তুলে প্রায় স্লোগানের ভঙ্গিতে বলল, "অবশ্যই ধ্বংস করব।"

একটা স্কাউটশিপে করে ফ্লাইট ক্যাপ্টেন রিশান এবং মহাকাশচারী শুরার গ্রহাণু টোরকার কাছে যাবার কথা ছিল, কিন্তু নীরা ত্রাতিনা বলল সেও যেতে চায়। কাজটি বিপজ্জনক তাই কেউ যদি স্বেচ্ছায় যেতে চায় তাকে অগ্রাধিকার দেবার নিয়ম। নীরা ত্রাতিনার বয়স তুলনামূলকভাবে কম হলেও সে প্রথম শ্রেণীর মহাকাশচারী। তাই পৃথিবী থেকে তার অনুমতি পেতে সমস্যা হল না। স্কাউটশিপটি ছোট, সেখানে তিন জন যাওয়া সহজ নয় তাই শেষ পর্যন্ত রিশান এবং মহাকাশচারী শুরার পরিবর্তে নীরা ত্রাতিনাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

গ্রহাণুটি এখনো অনেকখানি দূরে কিন্তু সেটা কাছে আসার জন্য কেউই অপেক্ষা করতে রাজি নয়। এটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধ্বংস করা দরকার তাই রিশান এবং নীরা ত্রাতিনা খুব তাড়াতাড়ি রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মচারীরা স্কাউটশিপে দুটি হালকা নিউক্লিয়ার বোমা তুলে দেয়। স্কাউটশিপে জ্বালানি ভরতে অনেক সময় লেগে গেল। সেখানকার মূল কম্পিউটারে মহাকাশ স্টেশন এবং পৃথিবী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রবেশ করিয়ে শেষ পর্যন্ত স্কাউটশিপটাকে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত করে নেওয়া হল।

মহাকাশযানের ইঞ্জিনিয়াররা যখন স্কাউটশিপটার যান্ত্রিক খুঁটিনাটি শেষবারের মতো পরীক্ষা করছে তখন বায়ু নিরোধক গোলাকার হ্যাচ দিয়ে রিশান আর নীরা ত্রাতিনা তাদের

স্কাউটশিপে গিয়ে ঢোকে। ধাতব দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে দু জনে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে আরামদায়ক চেয়ারে বসে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নেয়। কিছুক্ষণের মাঝেই কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে যায়। সামনে বড় মনিটরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের অফিসারদের দেখা যায়, তারা গম্ভীর গলায় কিছু রুটিন চেকআপ করে নেয়। নীরা ত্রাতিনা আর রিশান তাদের অভিজ্ঞ হাতে কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ স্পর্শ করে পুরো স্কাউটশিপটাকে সচল করতে থাকে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই একটা চাপা গুম গুম শব্দ করে স্কাউটশিপটা গভীর মহাকাশের দিকে ছুটতে থাকে।

পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে বের হবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি দিয়ে স্কাউটশিপটা তার গতি সঞ্চয় করতে থাকে। মহাকাশযানের ককপিটে বসে রিশান এবং নীরা ত্রাতিনা তার ত্বরণটুকু অনুভব করতে শুরু করে। তাদের মনে হতে থাকে অদৃশ্য কোনো একটা শক্তি তাদেরকে চেয়ারে চেপে ধরেছে। রিশান কন্ট্রোল প্যানেলে চোখ বুলিয়ে বলল, "নীরা, সবকিছু ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই। সবকিছু ঠিক আছে।"

"তুমি যদি সহ্য করতে পার তা হলে গতিবেগ আরো দ্রুত বাড়িয়ে ফেলি।"

"আমি সহ্য করতে পারব।"

"চমৎকার।" রিশান থ্রটল বারটা নিজের কাছে টেনে আনতে আনতে বলল, "তোমার মতো মহাকাশচারীকে নিয়ে উড়ে যাওয়ার একটা আনন্দ আছে। আমার সাথে আসার জন্য ধন্যবাদ নীরা।"

"ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশনে যেতে পারা আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য।"

রিশানের খুব ইচ্ছে হল বলে যে, "তোমার সাথে পাশাপাশি যেতে পারাও আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য!" সে সেটি বলতে পারল না। ইঞ্জিনের গর্জনের সাথে সাথে গতিবেগ বাড়তে থাকে, প্রচণ্ড ত্বরণের কারণে তাদের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, মনে হয় বুকের উপর কেউ একটা বিশাল পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। তাদের চোখের সামনে একটা লাল পরদা কাঁপতে থাকে। মনে হতে থাকে আর একটু হলেই তারা অচেতন হয়ে যাবে। দুজন দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে বসে থাকে, রিশান চোখের কোনা দিয়ে নীরা ত্রাতিনাকে দেখার চেষ্টা করে। তাকে বলার ইচ্ছে করে, "তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি নীরা।" কিন্তু সে সেটাও বলতে পারে না। মহাকাশযানের দুটি ইঞ্জিন প্রচণ্ড গর্জন করছে, পুরো স্কাউটশিপটি থরথর করে কাঁপছে, শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য হৃৎস্পন্দন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এরকম একটা সময়ে কেউ এ ধরনের একটি কথা বলে না। রিশান তাই সেটি বলার চেষ্টা করল না।

ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই স্কাউটশিপটা তাদের কাঙ্ক্ষিত গতিবেগে পৌঁছে যায়। ত্বরণটি বন্ধ করার সাথে সাথে রিশান এবং নীরা ত্রাতিনার নিজেদেরকে ভরশূন্য মনে হতে থাকে। দু'জনেই এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করে। মহাকাশের অন্ধকারে এখন তাদের শুধু ছুটে যাওয়া। যতই সময় পার হবে তাদের যাত্রা হবে আরো বিপজ্জনক। ছোটবড় অসংখ্য গ্রহাণুর ভেতর দিয়ে তাদের উড়ে যেতে হবে। টোরকা গ্রহাণুটা এখনো অনেক দূরে, সেখানে পৌঁছাতে এখনো তাদের অনেক দিন বাকি।

AMARBOI.COM

পরের কয়েকদিন রিশান আর নীরা ত্রাতিনা ছোট স্কাউটশিপটার মাঝে টোরকা গ্রহাণুটাতে পৌঁছানোর পর তার ওপর নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকগুলো বসানোর খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করে কাটিয়ে দিল। পৃথিবীর মহাকাশ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ আছে, মহাকাশ স্টেশনের সাথেও যোগাযোগ আছে। তাদের স্কাউট স্টেশনের গতিপথ আর টোরকা গ্রহাণুর গতিপথ হিসাব করে তাদের স্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ মডিউলের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। রিশান আর নীরা ত্রাতিনা এর মাঝে বেশ কয়েকবার পুরো পরিকল্পনাটা পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছে।

দুজন মানুষ খুব কাছাকাছি একটি জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে থাকলে তাদের মাঝে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতার জন্ম হয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। দুজন যে শুধুমাত্র গতিপথ আর বিস্ফোরক নিয়ে কথা বলল তা নয়, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, প্রিয়-অপ্রিয়, ভালো লাগা এবং না লাগার বিষয় নিয়েও কথা বলল। টোরকা গ্রহের কাছাকাছি যেদিন পৌঁছে গেছে সেদিন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকের ডেটনেটরগুলো শেষবারের মতো পরীক্ষা করতে করতে রিশান নীরা ত্রাতিনাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে কী করবে, ঠিক করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কী করবে?"

"হ্রদের তীরে একটা কটেজ ভাড়া করে সেখানে ওক কাঠের শক্ত একটা বিছানায় ঘুমাব। ভরশূন্য অবস্থায় বাতাসে ঝুলে ঝুলে ঘুমাতে ঘুমাতে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

রিশান হেসে বলল, "অনুমান করছি সপ্তাহখানেকের ভেতরেই তোমার যথেষ্ট ঘুম হয়ে যাবে। তখন কী করবে?"

"বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে। মহাজাগতিক নিউক্লিয়াস নিয়ে একটা জিনিস অনেক দিন থেকে মাথায় কুটকুট করছে। বিষয়টা নিয়ে একটা বড় এক্সপেরিমেন্ট করব ভাবছি।"

"হুম!" রিশান মুখ গম্ভীর করে বলল, "শুধু পড়াশোনা এবং গবেষণা! আমি শুনেছিলাম মেয়েরা নাকি ঘর-সংসার করতেও খুব পছন্দ করে।"

"করি। আমিও করি। ঘর-সংসার বাচ্চাকাচ্চা আমার খুব পছন্দ।" নীরা ত্রাতিনা মুচকি হেসে বলল, "আমি ঠিক করেছি আমি যখন সংসার শুরু করব তখন আমার উনিশ জন বাচ্চা হবে।"

রিশান চোখ কপালে তুলে বলল, "কতজন?"

"উনিশ জন। তার থেকে একজনও কম নয়!"

রিশান শব্দ করে হেসে বলল, "আমি তোমার সাফল্য কামনা করছি নীরা।"

নীরা ত্রাতিনা এবারে রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, "পৃথিবীতে ফিরে তুমি কী করবে?"

"আমি?"

"হ্যাঁ।"

রিশান মাথা চুলকে বলল, "এখনো ঠিক করি নি। তুমি কোন হ্রদের তীরে কটেজ ভাড়া করবে যদি বলো তা হলে সেই হ্রদে মাছ ধরতে যেতে পারি।"

নীরা ত্রাতিনা খিলখিল করে হেসে বলল, "তুমি বুঝি মাছ খেতে খুব পছন্দ কর?"

"উঁহু।"

AMARBOI.COM

"তা হলে?"

"আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি!"

নীরা ত্রাতিনা আবার খিলখিল করে হাসতে গিয়ে থেমে গেল, রিশানের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, "একটা ছোট স্কাউটশিপে কাউকে নিয়ে দিনের পর দিন মহাকাশে ছুটে যেতে হলে পছন্দ না করে উপায় কী?"

রিশান বলল, "আসলে বিষয়টা এত সহজ না।"

"তা হলে বিষয়টা কী?"

"টোরকা গ্রহাণুটা পৃথিবীর জন্য খুব ভয়ংকর একটা বিপদ। আমাদের যে করেই হোক এটা ধ্বংস করতে হবে। আমরা যদি এখন এটা ধ্বংস করতে না পারি পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তুমি বুঝতে পারছ, কাজটা খুব কঠিন। আমরা যেটা করছি এর আগে সেটা কেউ করে নি। যতই কাছে যাচ্ছি ততই বুঝতে পারছি কাজটা কত বিপজ্জনক। গ্রহাণুটা অত্যন্ত বিচিত্রভাবে ঘুরছে, পুরোটা এবড়োখেবড়ো—বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই উঁচু হয়ে আছে, ডক করার সময় আমাদের স্কাউটশিপ টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণটা ঘটার সময় আমাদের স্কাউটশিপটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে। আমরা নিজেদের কাছে নিজেরা স্বীকার করছি না, কিন্তু দুজনেই খুব ভালো করে জানি এখান থেকে জীবন্ত ফিরে যাবার সম্ভাবনা কম!"

নীরা ত্রাতিনা একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, "কেন ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ?"

"আমি মোটেই তোমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি না।" রিশান একটু হেসে বলল, "তোমাকে আমি অনেক দিন থেকে খুব কৌতূহল নিয়ে লক্ষ করছি—তোমার ভিতরে কোনো ভয়ডর নেই! শুধু যে নিজের ভিতরে নেই তা নয়, যারা তোমার আশপাশে থাকে তারাও তোমার সাহসটুকু পেয়ে যায়—তোমাকে ভয় দেখাব কেমন করে? আমি যেটা বলছি সত্যি বলছি। তোমার কিংবা আমার কিংবা আমাদের দুজনেরই কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। তুমি জান?"

নীরা ত্রাতিনা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "জানি।"

"তাই আমি ভাবছিলাম যখন দুজনই বেঁচে আছি তখন তোমাকে কথাটা জানিয়ে রাখি। তুমি খুব চমৎকার মেয়ে নীরা। তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি। কথাটি এখনই বলছি কারণ এই কথাটি হয়তো আর কখনো বলার সুযোগ পাব না।"

নীরা ত্রাতিনা কিছুক্ষণ রিশানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কোন হ্রদের তীরে কটেজ ভাড়া করব সেটা তোমাকে জানিয়ে রাখব রিশান। তুমি মাছ ধরার ফাঁকে ফাঁকে এই কথাগুলো বলার অনেক সুযোগ পাবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।" নীরা ত্রাতিনা একটু হেসে বলল, "সত্যি।"

টোরকা গ্রহাণুটা দেখতে অত্যন্ত বীভৎস। এটি লালচে, দেখে মনে হয় বিশাল কোনো প্রাণীর চামড়া ছিলে ভেতরের মাংস ক্লেদ বের করে রাখা হয়েছে। গ্রহাণুটি দুটি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষে ঘুরপাক খাচ্ছে—মূল অংশ থেকে এবড়োখেবড়োভাবে বের হয়ে থাকা অংশগুলো এত বিপজ্জনকভাবে ঘুরে আসছে যে স্কাউটশিপটা সেখানে নামানো খুব বিপজ্জনক হতে পারে। গ্রহাণুটাতে নামার আগে নীরা ত্রাতিনা আর রিশান টোরকাকে ঘিরে একটা স্থির কক্ষপথ তৈরি করে নিল, তারপর একটা সমতল অংশ দেখে খুব সাবধানে সেখানে নেমে আসতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহাণুটার কয়েকশ মিটার কাছাকাছি এসে তারা মূল ইঞ্জিন বন্ধ করে ছোট ছোট দুটো ইঞ্জিন চালু করে এবং হঠাৎ করে একটি বিপজ্জনক অবস্থার মুখোমুখি হয়ে যায়। কোনো একটা বিচিত্র কারণে গ্রহাণুটা প্রচণ্ড শক্তিতে তাদের স্কাউটশিপটাকে নিচে টেনে নামাতে থাকে। রিশান কন্ট্রোল প্যানেলে বসে চিৎকার করে বলল, "মূল ইঞ্জিন বিপরীত থ্রাস্ট—"

নীরা ত্রাতিনা দ্রুত আবার মূল ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা করে, সেটি চালু হতে খানিকটা সময় নেয়, কিন্তু ততক্ষণে স্কাউটশিপটা প্রচণ্ড গতিতে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। গ্রহাণুটার বের হয়ে থাকা একটা অংশ স্কাউটশিপটাকে একটু হলে আঘাত করে ফেলত, শেষ মুহূর্তে রিশান এটাকে সরিয়ে নেয়। গতি কমানোর জন্য মূল ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা করছে, পারছে না—যখন তারা বাঁচার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে তখন একেবারে শেষ মুহূর্তে ইঞ্জিনটা চালু হয়ে যায়। তারপরেও তারা স্কাউটশিপটা পুরোপুরি বাঁচাতে পারল না। প্রচণ্ড গতিতে ভয়ংকর বিস্ফোরণ করে সেটা গ্রহাণুটাতে আছড়ে পড়ে।

স্কাউটশিপটার গুরুতর ক্ষতি হয়েছে, অনেকগুলো এলার্ম একসাথে তারস্বরে বাজতে শুরু করেছে। বৈদ্যুতিক যোগাযোগে বড় ধরনের সমস্যা হয়ে স্কাউটশিপের আলো নিভে গিয়েছে। পোড়া একটা ঝাঁজালো গন্ধে পুরো স্কাউটশিপটা ধীরে ধীরে ভরে যেতে শুরু করে।

যন্ত্রপাতির নিচে চাপা পড়ে থাকা রিশান এবং নীরা ত্রাতিনা বের হয়ে এল। একজন আরেকজনের দিকে হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে থাকে। নীরা ত্রাতিনা বলল, "এটা কী হল?"

রিশান মাথা নাড়ে, "বুঝতে পারছি না।"

"মনে হচ্ছে গ্রহাণুর মাঝখানে একটা নিউট্রন স্টার হাজির হয়েছে! হঠাৎ করে স্কাউটশিপটাকে এভাবে টেনে নিল কেন?"

"ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আমরা যতটুকু ভেবেছিলাম তার থেকে কয়েক শ গুণ বেশি। গ্রহাণুটা ঘুরছে সেজন্য চৌম্বক আবেশ দিয়ে আশপাশে তীব্র ফিল্ড তৈরি করেছে। আমরা বুঝতে পারি নি।"

নীরা ত্রাতিনা চারদিকে তাকিয়ে বলল, "স্কাউটশিপটা মনে হয় পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে।"

রিশান মাথা নাড়ল, "ফাটল দিয়ে সব বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে। আমাদের স্পেস সুট পরে নেওয়া দরকার।"

একটা স্পেস সুটে বড়জোর দশ-বারো ঘণ্টার মতো অক্সিজেন থাকে। তারপর কী হবে সেটা নিয়ে দুজনের কেউই কোনো কথা বলল না। রিশান এবং নীরা ত্রাতিনা প্রায় নিঃশব্দে স্পেস সুট পরে নেয়। স্কাউটশিপের ক্ষতির পরিমাণটা একটু অনুমান করার চেষ্টা করল। ফাটলগুলো বন্ধ করা সম্ভব নয় কাজেই সেখানে সময় নষ্ট করল না। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কমিউনিকেশান মডিউলটি কাজ করছে না। পৃথিবী বা স্পেস স্টেশনের সাথেও আর কথা বলা যাচ্ছে না।

নীরা ত্রাতিনা বলল, "চল, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকটি তাড়াতাড়ি গ্রহাণুটার মাঝে বসিয়ে আসি।"

"হ্যাঁ। দেরি করে লাভ নেই। চল।"

দুজন স্কাউটশিপের হ্যাচ খুলে সেখান থেকে বিস্ফোরকগুলো বের করে নেয়। ভরশূন্য পরিবেশ, কিন্তু গ্রহাণুটার প্রচণ্ড চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে জুতোর নিচে লাগানো লোহার পাতগুলো তাদের গ্রহাণুটাতে আটকে থাকতে সাহায্য করছিল। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকটি নিয়ে তারা একটা ছোট জেটপ্যাক নিয়ে রওনা দেয়। গ্রহাণুটার মোটামুটি মাঝামাঝি অংশে

তারা নেমেছে, এর মূল কেন্দ্রের কাছাকাছি জায়গায় একটা গভীর গর্ত করে সেখানে বিস্ফোরকটা ঢুকিয়ে দিতে হবে। গর্তটা যত গভীর হবে গ্রহটাকে ধ্বংস করার সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে।

রিশান এবং নীরা ত্রাতিনা একটা ভালো জায়গা বেছে নিয়ে গর্ত করতে শুরু করে। ধারালো ড্রিল মেশিনটি আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে গর্ত করতে শুরু করে, থরথর করে কাঁপতে থাকে কুৎসিত গ্রহাণুটির লালচে পাথর।

ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই প্রায় এক কিলোমিটার গভীর একটা গর্ত তৈরি হয়ে যায়। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকের টাইমারটি সেট করে এখন সেটা নামিয়ে উপর থেকে গর্তটা বন্ধ করে দিতে হবে। নীরা ত্রাতিনা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রিশানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমরা টাইমারটি কতক্ষণ পরে সেট করব?"

রিশান খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে এটি সেট করতে হবে যেন আমরা এর মাঝে স্কাউটশিপটা ঠিক করে দূরে সরে যেতে পারি।"

নীরা ত্রাতিনা বলল, "আবার খুব বেশি সময় দেওয়া যাবে না। যদি কোনো কারণে বিস্ফোরকটা কাজ না করে তা হলে যেন দ্বিতীয় একটা দল আসতে পারে তার সময় দিতে হবে।"

"হ্যাঁ।" রিশান মাথা নাড়ল, "ঠিকই বলেছ।"

টাইমারটিকে বারো ঘণ্টার জন্য সেট করে তারা বিস্ফোরকটার ভেতরে নামিয়ে দিল। ওপর থেকে গর্তটা বুজিয়ে দিয়ে তারা স্কাউটশিপে ফিরে আসতে থাকে। তাদের হাতে এখন বারো ঘণ্টার মতো সময় তার ভেতরে স্কাউটশিপটাকে চালু করে তাদের সরে যেতে হবে। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে পুরো গ্রহাণুটা যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তখন তার টুকরোগুলো চারপাশে যে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করবে তার কয়েক শ কিলোমিটারের ভেতর কোনো জীবন্ত প্রাণীর বেঁচে থাকার কথা নয়।

রিশান এবং নীরা ত্রাতিনা স্কাউটশিপের ভেতর ঢুকে তার ধাতব দরজা বন্ধ করে, পুরোটা এক ধরনের বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে। রিশান চারদিকে তাকিয়ে বলল, "আগামী ছয় থেকে আট ঘণ্টার ভেতর আমাদের স্কাউটশিপটা চালু করতে হবে, তারপর ছয় থেকে আট ঘণ্টায় আমাদের এই গ্রহাণু টোরকা থেকে সরে যেতে হবে। যদি না পারি আমাদের শরীরের একটা পরমাণুও কেউ কখনো খুঁজে পাবে না।"

নীরা ত্রাতিনা চারদিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কী ধারণা? স্কাউটশিপটা যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে সেটাকে কি ছয় থেকে আট ঘণ্টার ভেতরে ঠিক করা যাবে?"

রিশান মাথা নাড়ল, বলল, "মনে হয় না।"

"আমারও তাই ধারণা। তবে—"

"তবে কী?"

"যদি আমরা এটাকে ছয় থেকে আট ঘণ্টার মাঝে দাঁড়া করাতে না পারি তা হলে আর কখনোই দাঁড়া করাতে পারব না। কাজেই মন খারাপ করার কিছু নেই!"

রিশান হাসার চেষ্টা করে বলল, "বিষয়টা নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ নীরা! আমি মোটেও মন খারাপ করছি না।"

"তা হলে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।"

নীরা ত্রাতিনা বলল, "আমি অক্সিজেন সাপ্লাইটা দেখি। তুমি দেখ ইঞ্জিনগুলো।"

রিশান মাথা নাড়ল, বলল, "না, আমি অক্সিজেন সাপ্লাইটুকু দেখি তুমি ইঞ্জিনগুলো

দেখ। ইঞ্জিনটা দেখার আগে বৈদ্যুতিক যোগাযোগটাও তোমাকে দেখতে হবে। আমি ইমার্জেন্সি পাওয়ার ব্যবহার করে স্কাউটশিপের কম্পিউটারটা চালু করার চেষ্টা করি।"

"চমৎকার।"

দুই ঘণ্টার মাথায় নীরা ত্রাতিনা বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ঠিক করে ফেলল। স্কাউটশিপের ফাটলগুলো বুজিয়ে বাতাসের চাপ ঠিক করতে রিশানের লাগল চার ঘণ্টা। নীরা ত্রাতিনা মূল ইঞ্জিনটা চালু করল আরো দুই ঘণ্টায়। রিশান মূল কম্পিউটারটি চালু করতে আরো তিন ঘণ্টা সময় নিল। সবগুলো ইঞ্জিন সমন্বয় করতে এবং জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে নীরা ত্রাতিনার আরো দুই ঘণ্টা সময় লেগে গেল। তখন দুইজন মিলে ঘণ্টাখানেক যোগাযোগ মডিউলটা চালু করার চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হল না। তাদের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে তাই যোগাযোগ মডিউলে পৃথিবী কিংবা মহাকাশ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ না করেই গ্রহাণু টোরকা থেকে তারা বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হল।

নিউক্লিয়ার বিস্ফোরকটি বিস্ফোরিত হবার তিন ঘণ্টা আগে স্কাউটশিপটা গর্জন করে উপরে উঠে যায়, প্রথমে সেটি গ্রহাণুটাকে প্রদক্ষিণ করে কক্ষপথটা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে নেয়, তারপর স্কাউটশিপের শক্তিশালী ইঞ্জিন গর্জন করে পৃথিবীর দিকে ছুটিয়ে নিতে থাকে।

স্কাউটশিপের ভেতরে ককপিটে রিশান এবং নীরা ত্রাতিনা শান্ত হয়ে বসে থাকে, খুব ধীরে ধীরে স্কাউটশিপের গতিবেগ বাড়ছে। তারা ত্বরণটুকু অনুভব করতে শুরু করেছে, মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোনো শক্তি চেয়ারের সাথে তাদের চেপে ধরে রেখেছে। নীরা ত্রাতিনা কন্ট্রোল প্যানেলের নানা ধরনের মিটারগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে। যতই সময় যাচ্ছে ততই তারা এই গ্রহাণুটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যুর মতো যে গ্রহাণুটি পৃথিবীর দিকে ছুটে যাচ্ছে তারা সেটাকে ধ্বংস করার জন্য নিউক্লিয়ার বিস্ফোরক বসিয়ে এসেছে, আর কিছুক্ষণ—তার পরেই মহাকাশে ভয়ংকর একটি বিস্ফোরণে সেটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীর মানুষ কিংবা মহাকাশ স্টেশনের মহাকাশচারীদের সাথে তাদের যোগাযোগ নেই, সত্যি সত্যি যখন গ্রহাণুটি ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তাদের আনন্দধ্বনিটুকু তারা শুনতে পাবে না সত্যি কিন্তু সেটা পুরোপুরি অনুভব করতে পারবে।

গ্রহাণু টোরকা যখন বিস্ফোরিত হল স্কাউটশিপের মনিটরে তারা শুধুমাত্র একটা নীল আলোর ঝলকানি দেখতে পেল। বায়ুহীন মহাশূন্যে সেটি ছিল নিঃশব্দ। পুরো গ্রহাণুটি প্রায় ভস্মীভূত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যায়। স্কাউটশিপের রেডিয়েশন মনিটরে কয়েক মিনিট গামা–রে রেডিয়েশনের শব্দ শোনা গেল তারপর সেটি পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে গেল। নীরা ত্রাতিনা এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে বসে ছিল, এবার বুকের ভেতর থেকে আটকে থাকা একটা নিশ্বাসকে বের করে দিয়ে সে রিশানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমরা তা হলে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পেরেছি!"

"হ্যাঁ।" রিশান মাথা নেড়ে বলল, "পৃথিবীর আট বিলিয়ন মানুষ সেজন্য এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই তোমাকে এবং আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।"

"হতচ্ছাড়া কমিউনিকেশান মডিউলটি ঠিক থাকলে আমরা এখন তাদের কথা শুনতে পেতাম।"

"ঠিক বলেছ।" রিশান বলল, "কথা না শুনলেও কি তাদের আনন্দটুকু অনুভব করতে পারছ না?"

"পারছি।" নীরা ত্রাতিনা বলল, "সত্যি পারছি।"

"এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ধরে রাখার জন্য আমাদের বিশেষ একটা কিছু করা দরকার!"

নীরা ত্রাতিনা হেসে বলল, "তুমি বিশেষ কী করতে চাও?"

"অন্ততপক্ষে দুজনের খানিকটা উত্তেজক পানীয় খাওয়া দরকার।"

"এই স্কাউট স্টেশনে খাবার পানিও পরিশোধন করে খেতে হয়—তুমি উত্তেজক পানীয় কোথায় পাবে?"

রিশান বলল, "এসব ব্যাপারে আমি খুব বড় এক্সপার্ট! আমাকে দুই মিনিট সময় দাও!"

"ঠিক আছে।" নীরা খিলখিল করে হেসে বলল, "তোমাকে দুই মিনিট সময় দেওয়া গেল।"

দুই মিনিট শেষ হবার আগেই রিশান কটকটে লাল রঙের দুই গ্লাস পানীয় নিয়ে আসে। দুজন গ্লাস দুটো উঁচু করে ধরে, রিশান বলল, "পৃথিবীর মানুষের নবজীবনের উদ্দেশ্যে।"

নীরা ত্রাতিনা প্রতিধ্বনিত করে বলল, "নবজীবনের উদ্দেশ্যে।"

তারপর দুজন তাদের পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দেয়। রিশান হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে বলল, "কেমন হয়েছে আমার এই পানীয়?"

"খেতে মন্দ নয়। তবে—"

"তবে কী?"

"কেমন জানি ওষুধ ওষুধ গন্ধ।"

রিশান হাসার চেষ্টা করে বলল, "ওষুধ দিয়ে তৈরি করেছি, একটু ওষুধ ওষুধ গন্ধ তো হতেই পারে।"

দুজন আবার তাদের পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দেয়। নীরা ত্রাতিনা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা শুধু শুধু যে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করেছি তা নয়, আমরা নিজেরাও বেঁচে গিয়েছি।"

রিশান কিছুক্ষণ নীরা ত্রাতিনার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "প্রায়।"

নীরা ত্রাতিনা একটু চমকে উঠে বলল, "প্রায়?"

"হ্যাঁ। নীরা, আমরা এখনো পুরোপুরি বেঁচে যাই নি। তোমাকে যে কথাটা বলা হয় নি সেটি হচ্ছে—" রিশান হঠাৎ থেমে যায়।

"সেটি কী?"

"আমাদের স্কাউটশিপে যথেষ্ট অক্সিজেন নেই।"

"কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। সব মিলিয়ে দুজনের আরো কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকার মতো অক্সিজেন রয়েছে।"

নীরা ত্রাতিনা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রিশানের দিকে তাকিয়ে থাকে, হঠাৎ করে তার মাথাটা একটু ঘুরে ওঠে।

রিশান বলল, "কাজেই যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই তা হলে আমাদের কিছু অস্বাভাবিক কাজ করতে হবে।"

"কী অস্বাভাবিক কাজ?"

"আমাদের শীতল ঘরে ঘুমিয়ে যেতে হবে। শীতল ঘরে শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায় থাকলে মানুষকে নিশ্বাস নিতে হয় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরা ত্রাতিনা প্রায় আর্তনাদের মতো করে বলল, "কী বলছ তুমি? আমাদের স্কাউটশিপে কোনো শীতল ঘর নেই!" তার হঠাৎ করে মনে হতে থাকে সে যেন পরিষ্কার করে চিন্তা করতে পারছে না।

রিশান বলল, "আছে।"

"কোথায় আছে?"

"এই পুরো স্কাউটশিপটাই হবে শীতল ঘর।"

"পুরো স্কাউটশিপটা—" নীরার হঠাৎ মনে হতে থাকে তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, সে যেন ঠিক করে কথা বলতে পারছে না। মনে হতে থাকে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। রিশান কী বলতে চাইছে সে যেন ঠিক করে বুঝতে পারছে না। চোখের সামনে রিশানকেও মনে হতে থাকে যেন অনেক দূরের কোনো মানুষ।

রিশান হঠাৎ একটু এগিয়ে এসে আস্তে করে নীরার হাত ধরে বলল, "নীরা! আমি তোমার পানীয়ের মাঝে খুব কড়া একটা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি।"

নীরা ত্রাতিনা বলতে চাইল, "কেন?" কিন্তু সে বলতে পারল না, টলে উঠে পড়ে যাচ্ছিল, রিশান তাকে ধরে ফেলল।

রিশান তাকে জড়িয়ে ধরে সাবধানে নিচে শুইয়ে দিয়ে বলল, "নীরা, সোনামণি আমার! তোমাকে পরিষ্কার করে কখনো বলি নি, আমি যে শুধু তোমাকে খুব পছন্দ করি তা নয় আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। ভালবাসার মতো সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে কিছু নেই, তুমি আমাকে সেটা অনুভব করতে দিয়েছ। সেজন্য তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।"

নীরা ত্রাতিনা কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না। তার ঠোঁট দুটো শুধু একবার নড়ে উঠল।

রিশান নীরা ত্রাতিনার মাথার চুল স্পর্শ করে বলল, "আমি জানি তুমি ঘুমিয়ে যাচ্ছ। তুমি আবছা আবছাভাবে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ। একটু পরে আর শুনতে পাবে না। তোমাকে আমি অসম্ভব ভালবাসি নীরা, তাই তোমাকে আমি কিছুতেই মারা যেতে দেব না। মনে আছে তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি উনিশ জন সন্তানের মা হতে চাও? তুমি যদি বেঁচে না থাক তাহলে কেমন করে উনিশ জন সন্তানের মা হবে? তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে নীরা। তোমাকে আমি বাঁচিয়ে রাখবই।

"আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। তারপর খুব ধীরে ধীরে তোমার শরীরের তাপমাত্রা আমি কমিয়ে আনব। কেমন করে সেটা করব বুঝতে পারছ? আমাদের এই স্কাউটশিপের বাইরে হিমশীতল, তাই যখনই স্কাউটশিপের তাপ বন্ধ করে দেব এটা ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকবে। কিন্তু সেটা করতে হবে খুব সাবধানে। মানুষের শরীর অসম্ভব কোমল, তাকে খুব যত্ন করে শীতল করতে হয়।

"তোমাকে হিমশীতল করে দেবার পর তোমার আর নিশ্বাস নিতে হবে না। স্কাউটশিপে কোনো অক্সিজেন না থাকলেও তুমি বেঁচে থাকবে। আমি নিশ্চিত মহাকাশ স্টেশনের ক্রুরা এই স্কাউটশিপটা খুঁজে বের করবে। তারপর তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে পৃথিবীতে। পৃথিবীর সেরা ডাক্তাররা তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবে। আমি নিশ্চিত তারা তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবে।"

রিশান নীরার হাত স্পর্শ করে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাইছ আমার কী হবে? জান নীরা, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন লক্ষ লক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নক্ষত্রকে দেখতাম তখন ভাবতাম আহা, আমি যদি একটা নক্ষত্র হতে পারতাম! আজ আমার সেই স্বপ্ন সত্যি হবে। তোমাকে হিমশীতল করে দেবার পর আমি স্পেস সুট পরে এই স্কাউটশিপের দরজা খুলে মহাকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ব! নিঃসীম মহাকাশে যেখানে কেউ নেই, চারপাশে ঘন কালো অন্ধকার সেখানে একা ভেসে থাকতে কী বিচিত্র একটা অনুভূতি হবে! আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব তোমাকে নিয়ে স্কাউটশিপটা দূরে চলে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ছোট একটা বিন্দুর মতো সেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে। আমার স্পেস সুটের অক্সিজেন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমি সেই আশ্চর্য একাকিত্ব উপভোগ করব। তারপর আমি আকাশের নক্ষত্র হয়ে যাব। পৃথিবীতে তুমি যখন তোমার উনিশ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আকাশের দিকে তাকাবে তখন যদি ক্ষণিকের জন্য কোনো একটা অচেনা নক্ষত্রকে দেখ বুঝবে সেটা আমি।"

নীরা ত্রাতিনা কিছু একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না। রিশান দেখল তার অসহায় কালো দুটি চোখ অশ্রুসজল হয়ে আসছে। রিশান ধীরে ধীরে তার মুখ নামিয়ে এনে নীরা ত্রাতিনার ঠোঁট স্পর্শ করল।

নীরা ত্রাতিনার স্কাউটশিপটা মহাকাশ স্টেশনের ক্রুরা উদ্ধার করে ভেতরে তার হিমশীতল দেহটি আবিষ্কার করে। সেটি পৃথিবীতে পাঠানো হয় এবং পৃথিবীর একটি সর্বাধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। রিশানকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি। সম্ভবত সে সত্যি সত্যি আকাশ নক্ষত্র হয়ে হারিয়ে গেছে।

তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। নীরা ত্রাতিনা টেহলিস শহরের কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে গবেষক হিসেবে যোগ দিয়েছে। তার উনিশটি সন্তানের শখ ছিল তার সেই শখ পূরণ হয় নি। রিশানের প্রতি ভালবাসার কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক সে কখনো বিয়ে করে নি—তার স্বামী বা সন্তান কোনোটাই কখনো ছিল না। উনিশটি দূরে থাকুক—একটিও নয়।

তবে সে জানত না মহাকাশের স্কাউটশিপ থেকে উদ্ধার করার পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে কি না সে বিষয়ে খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকার কারণে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তার খানিকটা টিস্যু সংরক্ষণ করেছিলেন—ভবিষ্যতে কখনো কোনোভাবে তাকে ক্লোন করার জন্য। নীরা ত্রাতিনা বেঁচে গিয়েছিল বলে তাকে ক্লোন করার প্রয়োজন হয় নি। তবে নীরা ত্রাতিনা কখনো জানতে পারে নি যে সবার অগোচরে টেহলিস শহর থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্রে খুব গোপনে তাকে ক্লোন করা হয়েছিল। চার দেয়ালে আটকে রাখা একটা গোপন ল্যাবরেটরিতে নীরা ত্রাতিনার ক্লোনেরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে।

নীরা ত্রাতিনা জানলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যেত, তার ক্লোনের সংখ্যা কাকতালীয়ভাবে ছিল ঠিক উনিশ জন।

মনিটরটি স্পর্শ করতেই প্রায় নিঃশব্দে চিঠিটি স্বচ্ছ পলিমারে ছাপা হয়ে বের হয়ে এল। উপরে বিজ্ঞান কেন্দ্রের লোগো, বাম পাশে কিছু দুর্বোধ্য সংখ্যা, ডান পাশে মহাপরিচালকের নিশ্চিতকরণ হলোগ্রাম। চিঠির ভাষা ভাবলেশহীন এবং কঠোর—আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনের বছরের একটি মেয়েকে বিজ্ঞান কেন্দ্রের মূল দপ্তরে পৌঁছে দিতে হবে। কেন পৌঁছে দিতে হবে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, কখনো থাকে না। অন্য চিঠিগুলো থেকে এটা একটু অন্যরকম। নিচে লেখা আছে মেয়েটাকে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হতে হবে যেন টেহলিস শহরের দুর্গম যাত্রাপথের ধকল সহ্য করতে পারে।

চিঠিটার দিকে তাকিয়ে তিশিনা নিজের ভেতরে এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করে। পলিমারের একটা পৃষ্ঠায় এই নিরীহ কয়েকটা লাইন একটি মেয়ের জীবনকে কী অবলীলায় সমাপ্ত করে দেবে। চার দেয়ালের ভেতরে আটকে রাখা গোপন ল্যাবরেটরিতে বড় হওয়া এই ক্লোন মেয়েগুলো যদি আর দশটি মেয়ের মতো হত তা হলে কি এই আশ্চর্য নিষ্ঠুরতায় বিজ্ঞান কেন্দ্র তাদের এভাবে ব্যবহার করতে পারত? নিশ্চয়ই পারত না। আর সেটি ভেবেই তিশিনার ভেতরে ক্রোধ পাক খেয়ে উঠতে থাকে। একসময় এখানে উনিশ জন মেয়ে ছিল। একজন একজন করে বিজ্ঞান কেন্দ্র আট জন মেয়ে নিয়ে গেছে। এখন আছে মাত্র এগার জন।

তিশিনা একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, "আমি এই কাজের উপযুক্ত নই।" ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা ক্লোনকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া হয় নি, তাদের সঙ্গে নিজের একাত্মবোধ করার কথা নয়। ল্যাবরেটরির গিনিপিগ এবং এই মেয়েগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই মেয়েগুলোর ব্যাপারে তার হওয়ার কথা নির্মোহ এবং পুরোপুরি উদাসীন। কিন্তু তিশিনা খুব ভালো করেই জানে, সেটি সম্ভব নয়। যারা দূরে বসে তথ্যকেন্দ্রের সংখ্যা থেকে এদের হিসাব রাখে তারা নির্মোহ হতে পারে, উদাসীন হতে পারে। কিন্তু তার মতো একজন সুপারভাইজার—যাকে প্রায় প্রতিদিন মেয়েগুলোর সঙ্গে সময় কাটাতে হয়, তারা কেমন করে নির্মোহ হবে? কেমন করে উদাসীন হবে? এরকম হাসিখুশি প্রাণবন্ত মেয়েদের জন্য গভীর মমতা অনুভব না করাটাই তো বিচিত্র। যারা ক্লোনদের নিয়ে এই গোপন প্রোগ্রামটি শুরু করেছিল তারা কি বিষয়টি ভাবে নি?

তিশিনা চিঠিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, একটি মেয়েকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। তার এখনই গিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। মেয়েগুলোর সঙ্গে দেখা করে একজনকে বেছে নিতে হবে। কী নিষ্ঠুর একটা কাজ, অথচ তিশিনা জানে কী সহজেই না সে এই কাজটি শেষ করবে!

ক্লোন হোস্টেলের বড় গেটটি খোলার জন্য তিশিনাকে গোপন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হল। ভেতরের দুর্ভেদ্য দরজাগুলো খোলার জন্য পাসওয়ার্ড ছাড়াও তার আইরিস স্ক্যান করিয়ে নিতে হল। লম্বা করিডরের অন্যপাশে একটা বড় হলঘর, সেখানে ক্লোন মেয়েগুলো কিছু একটা করছিল, দরজা খোলার শব্দ পেয়ে সবাই ছুটে এল। ফুটফুটে চেহারা, একমাথা কালো চুল, মসৃণ ত্বক, ঠোঁটগুলো যেন অভিমানে কোমল হয়ে আছে। সব মিলিয়ে এগার জন, সবাই হুবহু একই চেহারার। শত চেষ্টা করেও কখনো তাদের আলাদা করা সম্ভব নয়। তিশিনা তাই কখনো চেষ্টা করে না। মেয়েগুলো তিশিনাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরে। একজন হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে বলল, "ইস! তিশিনা আজকে তোমাকে দেখতে একেবারে স্বর্গের দেবীর মতো সুন্দর লাগছে।"

তিশিনা হেসে ফেলল, যৌবনে হয়তো চেহারায় একটু মাধুর্য ছিল, কিন্তু এখন এই মধ্যবয়সে তার কিছু অবশিষ্ট নেই। তার ধূসর চুল, শুষ্ক ত্বক আর ক্লান্ত দেহে এখন আর কোনো সৌন্দর্য নেই। তিশিনা বলল, "স্বর্গের দেবীরা তোমাদের কথা শুনলে কিন্তু খুব রাগ করবে, মেয়েরা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ে বলল, "কেন রাগ করবে? আমরা কি মিথ্যে কথা বলছি?"

পাশের মেয়েটি বলল, "এতটুকু মিথ্যে বলি নি। তুমি যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আস তখন আমাদের কী আনন্দ হয় তুমি জান?"

প্রথম মেয়েটি বলল, "সেজন্যই তো তোমাকে আমাদের স্বর্গের দেবী বলে মনে হয়।"

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি মেয়ে আদুরে গলায় বলল, "আজকে তোমার আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ থাকতে হবে।"

অন্যরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ।"

"আমরা আজকে একসঙ্গে খাব তিশিনা। ঠিক আছে?"

তিশিনা একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি আসলে এসেছি একটা কাজে।"

"কাজে?"

একসঙ্গে সবগুলো মেয়ের চোখেমুখে বিষাদের একটা ছায়া পড়ে। তাদের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কাজ মাত্র একটিই হতে পারে—তাদের কাউকে বাইরে যেতে হবে। এই গোপন ল্যাবরেটরি থেকে যারা বাইরে যায় তারা আর কখনো ফিরে আসে না।

"হ্যাঁ।" তিশিনা মেয়েগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে বলল, "একটা জরুরি কাজে এসেছি।"

"কী কাজ, তিশিনা?"

"বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে চিঠি এসেছে।" তিশিনা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাদের একজনকে আমার নিয়ে যেতে হবে।"

ফুটফুটে মেয়েগুলো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন খুব কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমার কী মনে হয় জান, তিশিনা?"

"কী মনে হয়?"

মেয়েটি মুখে হাসিটি ধরে রেখে বলল, "আমার মনে হয়, এটি আমাদের খুব বড় সৌভাগ্য।"

তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, অনেক বড় সৌভাগ্য।"

"একজন একজন করে আমরা সবাই বিজ্ঞান কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি।"

"বিজ্ঞান কেন্দ্রে নিশ্চয়ই খুব মজা হয়। তাই না?"

"হ্যাঁ।" প্রথম মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "নিশ্চয়ই খুব মজা হয়। কত রকম মানুষের সঙ্গে দেখা হয়।"

"বাইরের মানুষেরা খুব ভালো, তাই না তিশিনা?"

তিশিনা কী বলবে বুঝতে না পেরে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। মেয়েটি উজ্জ্বল চোখে বলল, "আমাদের এখানেও আমাদের খুব সুন্দর একটা জীবন। সবাই মিলে খুব আনন্দে থাকি। যখন আমরা বাইরে যাই, তখন আমাদের আনন্দের সঙ্গে যোগ হয় উত্তেজনা।"

সবগুলো মেয়ে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। উত্তেজনা, সত্যিকারের উত্তেজনা।"

তিশিনা এক ধরনের গভীর বেদনা নিয়ে মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েগুলো অসম্ভব বুদ্ধিমতী, সত্যিকার ব্যাপারটি তারা বুঝতে পারে না তা নয়, সেটা তারা প্রকাশ করে না। অনেকটা জোর করে এই নিষ্ঠুর বিষয়টির মধ্যে আনন্দ খুঁজে বের করার ভান করে। একটি মেয়ে তিশিনার হাত ধরে বলল, "তিশিনা, তুমি কি জান, বিজ্ঞান কেন্দ্রে আমাদের কী করতে দেবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিশিনা মাথা নাড়ল, বলল, "না, জানি না। তবে—"

"তবে কী?"

"চিঠিতে লেখা আছে আমি যেন সুস্থ, সবল, নীরোগ একজনকে বেছে নিই।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন তিশিনা?"

"কারণ তাকে টেহলিস শহরে যেতে হবে।"

মেয়েগুলো এবারে বিস্ময়ের একটি শব্দ করল, বলল, "সত্যি? সত্যি টেহলিস শহরে যেতে হবে?"

"হ্যাঁ। টেহলিস শহর অনেক দূরে। এখন সেখানে যাওয়া খুব কঠিন।"

"আমাদেরকে এরকম কঠিন একটা অভিযানে নেবে?"

"হ্যাঁ।" তিশিনা মাথা নাড়ল, "তোমাদের একজনকে সেখানে যেতে হবে।"

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি বলল, "আমি বলেছিলাম না, পুরো বিষয়টাই উত্তেজনার।" মেয়েটা তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই দেখ, চিন্তা করেই আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে।"

তিশিনা মেয়েটার হাত স্পর্শ করে বলল, "বিজ্ঞান কেন্দ্র আমাকে খুব বেশি সময় দেয় নি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার একজনকে বেছে নিতে হবে।"

"মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা?"

"হ্যাঁ" তিশিনা এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, "তোমাদের মধ্যে কে যেতে চাও?"

মেয়েগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একজন আরেকজনের দিকে তাকায়। সবাই দেখতে যেমন হুবহু এক, তাদের চিন্তাভাবনাও ঠিক একই রকম। জন্মের পর থেকে তারা পাশাপাশি বড় হয়েছে, এখন তারা এমন একটা পর্যায়ে এসে গেছে যে, একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলতে পারে কে কী ভাবছে। একজন নরম গলায় বলল, "তিশিনা, তুমি আমাদের জন্য এরকম চমৎকার একটা সুযোগ নিয়ে এসেছ, সেজন্য তোমার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা সবাই টেহলিস শহরে যেতে চাই। কিন্তু বিজ্ঞান কেন্দ্র তো মাত্র একজনকে চেয়েছে।"

তিশিনা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। একজনকে চেয়েছে।"

মেয়েটি বলল, "তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তা হলে আমরা কি সেটা নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করতে পারি?"

"হ্যাঁ। পার।"

"তা হলে খুব ভালো হয়, তিশিনা। আগামীকাল তুমি যখন আমাদের একজনকে নিতে আসবে আমরা একজন তখন তোমার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব।"

"চমৎকার।" তিশিনা একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, "মেয়েরা, আমি কি এখন যেতে পারি? বিজ্ঞান কেন্দ্রে যাওয়ার আগে আমার কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ করতে হয়।"

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি বলল, "আমরা ভেবেছিলাম তুমি আজ আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ থাকবে তিশিনা।"

"নিশ্চয়ই থাকব একদিন। আজ নয়। ঠিক আছে?"

মেয়েগুলো মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। তিশিনা করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করে, মেয়েগুলো আজকে আর অন্যদিনের মতো তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল না। তিশিনাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ পেছন ফিরে তাকাল না। সেও জানে, আজ পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাবে ফুটফুটে মেয়েগুলো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, চোখেমুখে কী গভীর বিষাদের ছায়া!

বিজ্ঞান কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল। এই মেয়েগুলো একটা গোপন প্রজেক্ট, তাদের সম্পর্কে কোথাও কোনো তথ্য নেই। নিরাপত্তাকর্মীরা যেন কোনো সমস্যা না করে সেজন্য বিশেষ অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করতে হল। গোপন ল্যাবরেটরির চার দেয়ালের ভেতরে থাকে বলে মেয়েগুলোর বাইরের জীবন সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাই জরুরি কাজে লাগতে পারে সেরকম কিছু জিনিসপত্র একটা ব্যাগে গুছিয়ে নিতে হল। পুরো ব্যাপারটি গোপন তাই তার নিজেকেই একটা গাড়ি করে নিয়ে যেতে হবে, গাড়ির জ্বালানি, নির্দিষ্ট পথে যাওয়ার অনুমতি নেটওয়ার্ক থেকে ডাউনলোড করে নিতে হল। ঠিক কী কাজে এই মেয়েটিকে ব্যবহার করবে জানা নেই, তাই তিশিনা মেয়েটির সকল তথ্য একটা ক্রিস্টালে জমা করে নিল।

পরদিন তিশিনা আবার যখন ল্যাবরেটরির ভারী দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে তখন করিডরে সব কয়টি মেয়ে প্রায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েগুলো সুন্দর করে সেজেছে, চুলগুলো পরিপাটি করে বাঁধা। তাদের জামাকাপড় খুব বেশি নেই, তার মাঝে সবচেয়ে ভালো পোশাকটি তারা পরেছে। দরজার কাছাকাছি একটা ব্যাগ। সেখানে হয়তো দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসগুলো রেখেছে।

তিশিনা কয়েক মুহূর্ত মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কে যাবে সেটা কি ঠিক করেছ?"

মেয়েগুলো একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি নিচু গলায় বলল, "আসলে আমাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনো পার্থক্য নেই। তাই যে কোনো একজন তোমার সঙ্গে যাবে।"

"কিন্তু সেটি কে?"

"সেটি আমরা একেবারে শেষ মুহূর্তে ঠিক করব তিশিনা।"

এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ে বলল, "তোমার যেন সময় নষ্ট না হয় সেজন্য আমরা সবাই পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আছি।"

সামনের মেয়েটি বলল, "আমাদের ব্যাগটিও প্রস্তুত করে রেখেছি। তুমি ডাকলেই আমাদের একজন এসে ব্যাগটি তুলে নিয়ে তোমার সঙ্গে বের হয়ে যাবে।"

তিশিনা কোমল গলায় বলল, "আমি বুঝতে পারছি, মেয়েরা। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকলে মনে হয় এটাই করতাম।"

"আমাদের সবাই একরকম, সবাই একসঙ্গে থাকি, একভাবে কথা বলি, একভাবে ভাবি। এত দিন এভাবে আছি যে, এখন মনে হয় আমরা সবাই মিলে বুঝি একজন মানুষ।"

"তাই আমাদের একজন যখন আমাদের ছেড়ে চলে যায় তখন আমাদের খুব কষ্ট হয়। আমরা কষ্টের মুহূর্তটাকে যতদূর সম্ভব বিলম্বিত করতে চাই।"

তিশিনা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি বুঝতে পারছি।"

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি বলল, "যে তোমার সঙ্গে যাবে তার জীবনটি হবে অন্যরকম।"

"নিশ্চয়ই তার জীবনটি হবে সুন্দর। সুন্দর এবং উত্তেজনাময়।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তাকে স্পর্শ করে রাখতে চাই তিশিনা।"

তিশিনা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "সেই শেষ মুহূর্তটা এসে গেছে। তোমাদের একজন এখন এস আমার সঙ্গে।"

মেয়েগুলো তখন হাত তুলে একজন আরেকজনকে শক্ত করে ধরে ধরে চোখ বন্ধ করল, তাদের দেখে মনে হয় তারা বুঝি উপাসনা করছে। ঠিক কীভাবে তারা ঠিক করল তিশিনা বুঝতে পারল না। কিন্তু হঠাৎ মাঝামাঝি জায়গা থেকে একজন এগিয়ে এসে তিশিনার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "চল তিশিনা।"

"তুমি যাবে?"

"হ্যাঁ।" মেয়েটি ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে বলল, "আমি প্রস্তুত।"

তিশিনা ভেবেছিল মেয়েটি হয়তো অন্য মেয়েগুলোর কাছ থেকে বিদায় নেবে, কিন্তু সেরকম কিছু করল না। এরা একজনের সঙ্গে আরেকজন মুখে কোনো কথা না বলেই অনেক কিছু বলে দিতে পারে, নিশ্চয়ই সেরকম কিছু একটা হয়েছে। সম্ভবত সেভাবেই সে বিদায় নিয়েছে।

অন্য দশজন মেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সামনের মেয়েটি বলল, "আমাদের কখনো কোনো নামের প্রয়োজন হয় না, কারণ আমরা সবাই মিলে আসলে একজন মানুষ। কিন্তু যখন কাউকে চলে যেতে হয় তখন তার একটা নামের প্রয়োজন হয়।"

অন্য পাশ থেকে আরেকটি মেয়ে বলল, "আমরা তাই অনেক ভেবে একটা নাম ঠিক করেছি। নায়ীরা।"

"নায়ীরা, তোমার সঙ্গে অনেক মানুষের পরিচয় হবে। তারা হবে সুন্দর মনের মানুষ। তাদের ভালবাসা পাবে তুমি।"

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি বলল, "তোমার সঙ্গে রাজপুত্রের মতো কোনো এক সুদর্শন তরুণের পরিচয় হবে। সেই রাজপুত্রের মতো সুদর্শন তরুণের হৃদয়ে থাকবে ভালবাসা। তার ভালবাসায় তোমার জীবন পরিপূর্ণ হবে।"

পাশের মেয়েটি বলল, "নায়ীরা, তোমার সঙ্গে সম্ভবত আমাদের আর যোগাযোগ হবে না। আমরা সবকিছু কল্পনা করে নেব। তোমার জীবনে আনন্দের কী ঘটছে, উত্তেজনার কী ঘটছে, ভালবাসার কী ঘটছে আমরা সেগুলো কল্পনা করে নেব।"

তার পাশের মেয়েটি বলল, "আমরা বিদায় কথাটি উচ্চারণ করব না। কারণ আমরা তোমাকে বিদায় দিচ্ছি না। তুমি আমাদের সঙ্গেই আছ। তুমি আমাদের মাঝখানেই আছ নায়ীরা।"

সামনের মেয়েটি বলল, "আমরাও তোমার মাঝেই থাকব। আমাদের সবাইকে তুমি তোমার মাঝে পাবে। সব সময় পাবে।"

নায়ীরা ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি।" তার চোখে পানি টলটল করছে, সে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে তিশিনার দিকে তাকাল। তিশিনা তার হাত ধরে বলল, "চল, নায়ীরা।"

ঘড়ঘড় শব্দ করে পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই নায়ীরা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তিশিনা নায়ীরার পিঠে হাত রেখে বলল, "মন খারাপ করো না নায়ীরা, দেখো, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

আসলে কিছুই ঠিক হবে না, কিন্তু তিশিনার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল যে সত্যিই বুঝি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। নায়ীরা কোনো কথা বলল না, হেঁটে যেতে যেতে একবার পেছন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে তাকাল। গোপন ল্যাবরেটরির ভারী দরজার ওপাশে যাদের সে ফেলে এসেছে তারা ভিন্ন কোনো মানুষ নয়, তারা সবাই সে নিজে। একজন মানুষকে যখন নিজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয় সেই কষ্টটার কথা অন্য কেউ জানে না। পৃথিবীর অন্য কেউ কোনো দিন সেটা বুঝতেও পারবে না।

বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভেতরে ক্লোন গবেষণা বিভাগের দরজায় দাঁড়িয়ে তিশিনা নায়ীরার হাত স্পর্শ করে বলল, "আমাকে এখন যেতে হবে নায়ীরা।"

নায়ীরা নিচু গলায় বলল, "আমি জানি।"

"তোমার জন্য অনেক শুভকামনা থাকল।"

"তোমাকে ধন্যবাদ। আমাদের জন্য তুমি যেটুকু করেছ সেজন্য অনেক ধন্যবাদ।"

"আমি তোমাদের জন্য কিছু করি নি নায়ীরা।"

নায়ীরা ম্লান হেসে বলল, "করেছ, তিশিনা। আমরা আসলে মানুষ নই, আমরা মানুষের ক্লোন। কিন্তু তুমি কখনো সেটা আমাদের বুঝতে দাও নি। তুমি সব সময় আমাদের মানুষ হিসেবে সম্মান দেখিয়েছ, মানুষ হিসেবে ভালবেসেছ।"

তিশিনা ফিসফিস করে বলল, "তোমরা ক্লোন হও আর যা-ই হও, আসলে তো তোমরা মানুষ। একটি কথা জান নায়ীরা?"

"কী কথা?"

"যে মহিলার ক্রোমোজম ব্যবহার করে তোমাদের ক্লোন করা হয়েছে সেই মহিলাটি ছিলেন অসম্ভব রূপসী, অসম্ভব বুদ্ধিমতী এবং অসম্ভব তেজস্বী। তার ভেতরে এমন একটি সহজাত নেতৃত্ব ছিল যে, প্রয়োজনে তার চারপাশের সবাই সব সময় তার নেতৃত্ব মেনে নিত। তিনি একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন।"

নায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, আমি শুনেছি।"

"তিনি এখন কোথায় আছেন জানি না। তিনি যদি তোমাদের দেখতে পেতেন তা হলে খুব কষ্ট পেতেন। তার মতো একজনের জীবনে অনেক বড় কিছু করার কথা। ক্লোন হয়ে গবেষণা কেন্দ্রে গিনিপিগ হওয়ার কথা নয়।"

নায়ীরা মাথা নেড়ে বলল, "সেই অসাধারণ মহিলার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ তিশিনা। কারণ তার নিশ্চয়ই অনেক ধৈর্যও ছিল, আমাদেরও অনেক ধৈর্য। আমরা সবকিছু মেনে নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি।"

তিশিনা খপ করে নায়ীরার হাত ধরে জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "আমি কী চাই জান?"

"কী?"

"আমি চাই তোমাকে যখন টেহলিস শহরে পাঠাবে তখন সেই অভিযানে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটুক।"

নায়ীরা চোখ বড় করে বলল, "সে কী!"

"হ্যাঁ। সেই দুর্ঘটনায় সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাক। তখন তুমি সেখানে নেতৃত্ব দাও, নেতৃত্ব দিয়ে সবকিছু ঠিক করে দাও। বিজ্ঞান কেন্দ্রের সবাই সেটা দেখুক। দেখে হতবাক হয়ে যাক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নায়ীরা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন ঘরের ভেতর থেকে একজন বের হয়ে এসে বলে, "ক্লোন তিন শ নয়, চেকআপ করতে এস।"

নায়ীরা একটা নিশ্বাস ফেলে। এখানে তার পরিচয় ক্লোন তিন শ নয় হিসেবে সে তিশিনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিদায় তিশিনা।"

তিশিনা ফিসফিস করে বলল, "আমি তোমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। সব সময় প্রার্থনা করব।"

নায়ীরা মাথা ঘুরিয়ে ঘরের ভেতরে তাকাল, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিকে বলল, "আমি প্রস্তুত। কোথায় যেতে হবে?"

"আমার সঙ্গে এস।"

তিশিনা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে দেখল, নায়ীরা ধীর এবং অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। গোলাকার একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল, বিজ্ঞান কেন্দ্রের মানুষটির পিছু পিছু নায়ীরা এগিয়ে যায়, দরজাটি আবার বন্ধ হয়ে গেল। তিশিনা তার বুকের ভেতর আটকে থাকা নিশ্বাসটি বের করে নিচু গলায় বলল, "হে ঈশ্বর, তুমি এই মেয়েটিকে দয়া করো। সে বড় দুঃখী। দোহাই তোমার।"

স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো বড় টেবিলে নায়ীরা শুয়ে আছে, তার ওপর একজন বয়স্ক মানুষ ঝুঁকে পড়ে তাকে পরীক্ষা করছে। তার কাছাকাছি আরো দুইজন মানুষ। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। বয়স্ক মানুষটি জিব দিয়ে একটা বিস্ময়ের শব্দ করে বলল, "এই মেয়েটির দেহ আশ্চর্য রকম নিখুঁত।"

মহিলাটি শব্দ করে হেসে বলল, "ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হলে তুমিও এরকম নিখুঁত হতে ড. ইলাক।"

ড. ইলাক নামের বয়স্ক মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, সেটা তুমি ঠিকই বলেছ।"

মহিলাটি বলল, "আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ক্লোন হিসেবে এরকম নিখুঁত একজন মানব কিংবা মানবী তৈরি করা এক ধরনের অপচয়।"

ড. ইলাক বলল, "আমরা যে কাজে একে ব্যবহার করব তার জন্য একটি নিখুঁত দেহ দরকার।"

নায়ীরা নিঃশব্দে তাদের কথোপকথন শুনছিল, সে সত্যিকারের মানুষ নয়, তার হয়তো নিজে থেকে কোনো কথা বলার নয়, কিন্তু সে তবুও কথা বলল। জিজ্ঞেস করল, "আমাকে তোমরা কী কাজে ব্যবহার করবে?"

এক মুহূর্তের জন্য ঘরের তিন জন মানুষ একটু থমকে দাঁড়াল। মনে হল তারা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। ড. ইলাক ইতস্তত করে বলল, "তোমার এখন সেটি জানার কথা নয় মেয়ে।"

"আমার নাম নায়ীরা।"

মহিলাটি খনখনে গলায় বলল, "তোমার কোনো নামও থাকার কথা নয়।"

নায়ীরা একটু চেষ্টা করে তার মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, "কিন্তু আমার নাম আছে। আমার মনে হয় নায়ীরা খুব সুন্দর একটি নাম।"

ড. ইলাক বলল, "নায়ীরা নামটি সুন্দর না অসুন্দর সেটি নিয়ে আলোচনা করার কোনো অর্থ নেই। বিষয়টি তোমাকে নিয়ে। তোমার নিজে থেকে প্রশ্ন করার কথা নয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. ইলাকের কথা শুনে নায়ীরা শব্দ করে হাসল। ড. ইলাক থতমত খেয়ে বলল, "তুমি হাসছ কেন?"

"তোমার কথা শুনে।"

"আমার কোন কথাটি হাস্যকর?"

নায়ীরা মুখ টিপে হেসে বলল, "আমার নিজ থেকে কোনো প্রশ্ন করার কথা নয় সেটি আমার কাছে কৌতুকের মতো মনে হয়।"

ড. ইলাক অবাক হয়ে বলল, "কেন? কেন কথাটি তোমার কাছে কৌতুকের মতো মনে হয়? তুমি মানুষ নও, তুমি একটি ক্লোন—"

"কিন্তু আমি এমন একটি মানুষের ক্লোন, যার বুদ্ধিমত্তা সম্ভবত তোমাদের সবার থেকে বেশি। যার প্রতিভা নিশ্চিতভাবে তোমাদের প্রতিভার চেয়ে বেশি।"

নায়ীরার কথা শুনে উপস্থিত তিন জন মানুষই কেমন যেন থতমত হয়ে যায়। মহিলাটি খনখনে গলায় বলল, "তুমি কেমন করে সেটা জান?"

"আমি আরো অনেক কিছু জানি। হয়তো সবকিছু আমার জানার কথা নয়, তবু আমি জানি। একজন মানুষ জোর করে নির্বোধ হয়ে থাকতে পারে না।"

মহিলাটি খনখনে গলায় আবার কোনো একটা কথা বলতে শুরু করতে চাইছিল কিন্তু ড. ইলাক হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কে বেশি প্রতিভাবান, কে বেশি বুদ্ধিমতী এসব আলোচনা থাকুক। তোমাকে একটা বিশেষ কাজে আনা হয়েছে, সেই কাজের জন্য তোমাকে যেটুকু জানানোর প্রয়োজন হবে তোমাকে সেটুকু জানানো হবে মেয়ে।"

"আমার নাম নায়ীরা।"

ড. ইলাক কোনো কথা না বলে শরীরের অভ্যন্তরে রক্তনালি ও নার্ভতন্তু পরীক্ষা করার যন্ত্রটি নিয়ে নায়ীরার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। নায়ীরা মনে মনে ফিসফিস করে নিজেকে বলতে থাকে, "আমি নায়ীরা। আমি নায়ীরা। ক্লোন প্রক্রিয়ায় আমার সৃষ্টি করা হতে পারে, কিন্তু আমি মানুষ। আমি শতকরা এক শ ভাগ মানুষ। আমি মানুষ নায়ীরা।"

AMARBOI.COM

নায়ীরা তার ঘরের ছোট জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। বিজ্ঞান কেন্দ্রে আসার পর যখন তার শরীরকে নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে বিশ্লেষণ করা না হয় তখন তাকে এই ঘরটির ভেতর থাকতে হয়। ঘরটি অপূর্ব, খুব আরামে থাকার জন্য একটা ঘরে যা যা থাকা প্রয়োজন এখানে তার সবকিছু আছে, কিন্তু তবুও সে হাঁপিয়ে ওঠে। তার খুব সৌভাগ্য যে তাকে একটা ভিডিও স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে, সেটি এখানকার মূল তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে। নায়ীরা নিশ্চিত, তথ্যকেন্দ্রের খুব ছোট এবং অপ্রয়োজনীয় একটি অংশ সে দেখতে পায়। বিজ্ঞান কেন্দ্রের সত্যিকার তথ্য তার কাছ থেকে সযত্নে আড়াল করে রাখা হয়েছে। যেটুকু দেখতে পায় সেটুকুই সে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে।

দরজায় খুট করে একটি শব্দ হল, নায়ীরা ঘুরে তাকিয়ে দেখে মধ্যবয়স্ক পরিচারিকাটি তার জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে বলল, "তুমি কিন্তু ঠিক করে খাচ্ছ না।"

"আমি একা একা খেয়ে অভ্যস্ত নই।" নায়ীরা একটু হেসে বলল, "তুমি আমার সঙ্গে খাবে?"

পরিচারিকাটি হাসল, বলল, "উঁহু। নিয়ম নেই।"

নায়ীরা মাথা নেড়ে বলল, "শুধু নিয়ম আর নিয়ম। এত নিয়ম আমার ভালো লাগে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ভালো না লাগলেও মানতে হয়। আজকে খাওয়া শেষ কর। ফলের রসটুকুতে একটা অন্যরকম ঝাঁজ দেওয়া হয়েছে, দেখবে খুব মজার।"

"দেখব। নিশ্চয়ই দেখব।"

"খাওয়া শেষ করে প্রস্তুত থেকো। তোমার সঙ্গে আজকে দীর্ঘ সেশন হবে।"

"চমৎকার।" নায়ীরা বলল, "এই চার দেয়ালের ভেতর আমি হাঁপিয়ে উঠছি।"

পরিচারিকাটি চলে যাওয়ার পর নায়ীরা আবার জানালার কাছে এগিয়ে যায়। তার এখন খেয়ে প্রস্তুত হয়ে নেওয়ার কথা। কিন্তু তার কিছু করার ইচ্ছে করছে না। ঘুরেফিরে তার শুধু তার বোনদের কথা মনে পড়ছে। এগার জন মিলে ছিল তাদের অস্তিত্ব। এখন সে একা। এই নিঃসঙ্গতাটুকু যে কী ভয়ানক সেটা কি কেউ কখনো জানতে পারবে? গভীর বিষাদে নায়ীরার বুকের ভেতরটুকু হাহাকার করতে থাকে।

একটি কালো গ্রানাইটের টেবিলের একপাশে নায়ীরা বসেছে, তার সামনে চার জন মানুষ। দুজন পুরুষ, দুজন মহিলা। চার জনের ভেতর শুধু ড. ইলাককে সে আগে দেখেছে, অন্যদের এই প্রথমবার দেখছে। চার জন মানুষ পুরোপুরি ভিন্ন মানুষ, কিন্তু তবু তাদের ভেতরে একটি মিল রয়েছে, মিলটি কী সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

কঠিন চেহারার একজন মহিলা কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, "ক্লোন তিন শ নয়—"

নায়ীরা বাধা দিয়ে বলল, "আমার নাম নায়ীরা।"

মহিলাটি কঠিন গলায় বলল, "আমাকে কথা শেষ করতে দাও।" কিছুক্ষণ নায়ীরার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মহিলাটি একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাকে কেন এখানে আনা হয়েছে এবং তোমাকে কী দায়িত্ব দেওয়া হবে সে বিষয়টি তোমাকে জানানোর জন্য এখানে আমরা একত্র হয়েছি। আমরা চার জন ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের। আমি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান রুবা। এ ছাড়াও এখানে আছেন সামরিক বাহিনীর কমান্ডার গ্রুশান এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মহাপরিচালক জিনা। চিকিৎসা কেন্দ্রের ড. ইলাককে তুমি আগেই দেখেছ। যাই হোক, তুমি নিশ্চয়ই টেহলিস শহরের নাম শুনেছ। টেহলিস শহর আমাদের সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। আমাদের শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান বা গবেষণা সব টেহলিস শহরকেন্দ্রিক। টেহলিস শহর এখান থেকে মাত্র দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে। কিন্তু তবু সেটি আমাদের থেকে অনেক দূরে। কারণ টেহলিস শহর আর আমাদের মাঝখানে রয়েছে অবমানবের বসতি।"

বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান কঠিন চেহারার মহিলা রুবা একটি লম্বা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই অবমানবের নাম শুনেছ। তারা একসময় চেষ্টা করেছিল পরামানব হতে। মানুষের বিবর্তনকে দ্রুততর করে তারা এমন কিছু ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছিল, যেটি প্রকৃতি তাদের দিতে রাজি হয় নি। ভয়ংকর সেই পরীক্ষার ফল তারা দিয়েছে নিজেদের পুরো জীবন দিয়ে। তারা বিকলাঙ্গ, অপুষ্ট, অপরিণতবুদ্ধির জটিল একটা প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। তারা অতিমানব বা পরামানব হয় নি। তারা হয়েছে অবমানব। অবমানবের বিভিন্ন রূপ সম্ভবত তোমার একবার দেখা উচিত।"

নায়ীরা বলল, "আমি দেখেছি।"

রুবা একটু অবাক হয়ে বলল, "তুমি কোথায় দেখেছ?"

"আমার ঘরে একটা ভিডিও স্ক্রিন আছে। সেটা মূল তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। আমি সেখানে দেখেছি।"

হাসিখুশি চেহারার একজন মানুষ, যে সম্ভবত সামরিক বাহিনীর কমান্ডার গ্রুশান,

হালকা গলায় বলল, "চমৎকার। তা হলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল। তুমি নিশ্চয়ই অবমানবের সঙ্গে আমাদের বিরোধের বিষয়টি জান।"

"হ্যাঁ জানি।"

"একজন মানুষ যত বড় হয় তত বেশি সে উদারতা দেখাতে পারে। অবমানব বড় হতে পারে নি। তাদের ভেতরে উদারতা বা ভালবাসার মতো বড় কোনো গুণ নেই। তাদের সমস্ত শক্তি সমস্ত ক্ষমতা একত্র করেছে আমাদের ধ্বংস করার জন্য।" কমান্ডার গ্রুশান নামের হাসিখুশি মানুষটিকে হঠাৎ কেমন যেন বিষণ্ন দেখায়, "অবমানবরা আমাদের সমান নয়। কোনো দিক দিয়েই আমাদের সমান নয়, কিন্তু তারপরও আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। আমাদের সীমান্তে সব সময় সশস্ত্র সেনাবাহিনী। আমাদের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয় এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমরা আমাদের প্রিয় শহর টেহলিসে যেতে পারি না। অবমানব আমাদের যেতে দেয় না। যদি কখনো যেতে হয় আমাদের আমরা যাই ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে।"

নায়ীরা একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমাকে সেজন্য টেহলিস শহরে পাঠাতে চাইছ? একজন মূল্যবান মানুষের জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে মূল্যহীন একজন ক্লোনের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া?"

দ্বিতীয় মহিলাটি যে সম্ভবত নিরাপত্তা বাহিনীর মহাপরিচালক জিনা স্থির চোখে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি ইচ্ছে করলে ব্যাপারটাকে এভাবেও দেখতে পার।"

নায়ীরা জিজ্ঞেস করল, "টেহলিস শহরে আমাকে কী নিয়ে যেতে হবে?"

জিনা বলল, "একটি অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য।"

"সেটি আমি কীভাবে নেব?"

"তোমার মস্তিষ্কে করে।"

নায়ীরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমার মস্তিষ্কে করে?"

"হ্যাঁ। আমরা তোমার মস্তিষ্কে সেটা প্রবেশ করিয়ে দেব। তুমি সেটা জানবে না।"

নায়ীরা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। ড. ইলাক মুখে হাসি টেনে বলল, "আমরা তোমার দেহ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি। তোমার দেহ নিখুঁত, নীরোগ এবং সুস্থ। তোমার মস্তিষ্ক এই তথ্য নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তুমি তোমার মস্তিষ্কে করে এই তথ্য নিয়ে সুদীর্ঘ যাত্রা শেষ করতে পারবে বলে আমার ধারণা।"

নায়ীরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমাকে কি একা টেহলিস শহরে যেতে হবে?"

কঠিন চেহারার ক্রানা শব্দ করে হেসে ফেলল এবং হাসির কারণে হঠাৎ করে তার মুখের কাঠিন্য সরে যায়। সে হাসি হাসি মুখে বলে, "না। তোমার পক্ষে একা যাওয়া সম্ভব হবে না। একজন গাইড তোমাকে নিয়ে যাবে।"

"এই গাইড মানুষটিও কি আমার মতো ক্লোন?"

রুবার মুখ থেকে হাসি হঠাৎ সরে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে আগের কাঠিন্যটুকু ফিরে আসে। সে কঠিন মুখে বলে, "আমরা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে যোগ করে, "তোমার কি অন্য কোনো প্রশ্ন আছে?"

নায়ীরা মাথা নাড়ল, "আছে।"

"কী প্রশ্ন?"

"আমি সেই প্রশ্নটি করতে চাইছি না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন?"

"আমার ধারণা, তোমরা সেই প্রশ্নেরও উত্তর দেবে না।"

মহিলাটি কঠিন মুখে বলল, "তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ।"

নায়ীরা একটু হেসে বলল, "তোমরা কেন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছ?"

কয়েক মুহূর্ত ঘরের সবাই চুপ করে থাকে। কঠিন চেহারার রুবা সোজা হয়ে বসে কঠিন গলায় বলল, "আমরা তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছি না, মেয়ে।"

নায়ীরাও সোজা হয়ে বসে বলল, "আমার নাম নায়ীরা।"

ড. ইলাক নায়ীরার মাথায় গোলাকার একটা হেলমেট বসিয়ে বলল, "এটার নাম নিওরোজিনা। এটা তোমার মস্তিষ্কের নিউরনে সিনান্স কানেকশন তৈরি করবে। আমরা যেটাকে স্মৃতি বলি, তোমার মধ্যে সেরকম স্মৃতি তৈরি হবে।"

নায়ীরা কোনো কথা না বলে ড. ইলাকের দিকে তাকিয়ে রইল। ড. ইলাক নিওরোজিনা নামের যন্ত্রটির সঙ্গে কয়েকটা তার জুড়ে দিতে দিতে বলল, "সাধারণ স্মৃতির সঙ্গে এর একটা পার্থক্য আছে।"

কথা শেষ করে ড. ইলাক নায়ীরার দিকে তাকাল। সে আশা করছে নায়ীরা পার্থক্যটুকু জানতে চাইলে সে উত্তর দেবে। নায়ীরা জানতে চাইল না। তার যে জানার কৌতূহল হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু সে ঠিক করেছে, নিজে থেকে কোনো প্রশ্ন করবে না।

ড. ইলাক কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "সাধারণ স্মৃতি আমাদের মনে থাকে। কিন্তু এই স্মৃতি নিওরোজিনা দিয়ে তৈরি কৃত্রিম স্মৃতি, এই স্মৃতি কারো মনে থাকে না।"

মুখটা ভাবলেশহীন করে রাখবে ঠিক করার পরও নায়ীরা খুক করে হেসে ফেলল। ড. ইলাক বলল, "কী হল, হাসছ কেন?"

"তোমার কথা শুনে। মানুষ যদি একটা জিনিস মনে রাখতে না পারে তা হলে সেটা আবার স্মৃতি হয় কেমন করে?"

ড. ইলাক মুখে একটা আলগা গাম্ভীর্য এনে বলল, "এটাই হচ্ছে নিওরোজিনার বিশেষত্ব। পুরো স্মৃতিটা থাকে অবচেতন মনে। আরেকটি নিওরোজিনা দিয়ে এই স্মৃতিটা বের করে নিয়ে আসা যায়।"

প্রশ্ন করার জন্য ভেতরে ভেতরে উসখুস করতে থাকলেও নায়ীরা চুপ করে রইল। পুরো ব্যাপারটিতে নায়ীরার উৎসাহের অভাব দেখে ড. ইলাকও মনে হয় একটু উৎসাহহীন হয়ে পড়ল। একটু দায়সারাভাবে বলল, "আমরা এখানে তোমার মস্তিষ্কে একটা গোপন তথ্য দিয়ে দেব, টেহলিস শহরে সেই তথ্যটি বের করে আনা হবে।"

নায়ীরা শান্তভাবে ড. ইলাকের দিকে তাকিয়ে রইল। ড. ইলাক একটু ইতস্তত করে বলল, "তথ্যটি হবে অত্যন্ত গোপন। অত্যন্ত গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ। এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে তোমাকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা তোমার জন্য খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার।"

একেবারে ভাবলেশহীনভাবে চুপচাপ বসে থাকবে ঠিক করে রাখার পরেও নায়ীরা আবার খুকখুক করে হেসে ফেলল। ড. ইলাক একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "তুমি আবার হাসছ কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পার না।"

"আমি মিথ্যা কথা বলছি না।"

"তুমি যদি আসলেই সত্য কথা বলছ, তা হলে বুঝতে হবে মানবসভ্যতার উন্নতি না হয়ে তার বড় ধরনের অবনতি হয়েছে। আমি যতদূর জানি, প্রায় শ'খানেক বছর আগেই গোপনীয় খবর নিখুঁতভাবে পাঠানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। এই যুগে কেউ যদি কারো মস্তিষ্কে করে অবচেতনভাবে খবর পাঠায়, তা হলে বুঝতে হবে বিজ্ঞান সম্পর্কে তারা বিশেষ কিছু জানে না।"

ড. ইলাক শীতল চোখে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "বয়সের তুলনায় তোমার কথাবার্তা বেশ অমার্জিত এবং উদ্ধত।"

নায়ীরা বলল, "আমি দুঃখিত, ড. ইলাক। আমি একটি ক্লোন। নিজের অন্যান্য ক্লোন ছাড়া আর কাউকে দেখি নি, আর কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলি নি। সুন্দর করে, ভদ্রভাবে, মার্জিতভাবে কীভাবে কথা বলতে হয় আমি সেটা কখনো শিখি নি। যখন মনে যেটা আসে সেটাই বলে ফেলি।"

"সেটাই দেখছি। কিন্তু মেয়ে, তোমাকে বলে রাখি, যখন মনে যেটা আসে সেটা বলার জন্য তুমি বিপদে পড়বে।"

ড. ইলাকের কথা শুনে নায়ীরা আবার শব্দ করে হেসে ফেলল। ড. ইলাক ক্রুদ্ধ চোখে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আবার কেন হাসছ?"

"তোমরা সবাই মিলে নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে সরাসরি সেটা বলতে পারছ না তাই নিওরোজিনা, অবচেতন স্মৃতি এসব কঠিন কঠিন কথাবার্তা বলছ! তা হলে তুমিই বলো, সত্যিকার বিপদে পড়ার সুযোগটি আমি কখন পাব?"

ড. ইলাক নায়ীরার কথার কোনো উত্তর দিল না, নায়ীরাও কোনো কথা না বলে চুপচাপ শুয়ে রইল। হঠাৎ করে সে মাথায় একটা মৃদু কম্পন অনুভব করতে থাকে। তার মনে হতে থাকে বহুদূর থেকে একটা ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটি মধুর এবং বিষণ্ন। তার বুকের ভেতর কেমন এক ধরনের নিঃসঙ্গতার জন্ম দেয়। শব্দটি শুনতে শুনতে তার চোখে ঘুম নেমে আসতে থাকে। কী কারণ জানা নেই, নায়ীরার মনে হতে থাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তার জীবনটি হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম।

নায়ীরার যখন ঘুম ভাঙল তখন সে খুব ক্লান্ত। শুনতে পেল কেউ একজন বলল, "চোখ খুলে তাকাও মেয়ে।"

নায়ীরার মুখের ওপর একজন নার্স ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার এখন কেমন লাগছে?"

নার্সটির মুখে একটা মাস্ক লাগানো, সেই মাস্কটির দিকে তাকিয়ে থেকে নায়ীরা জিজ্ঞেস করল, "তুমি মুখে মাস্ক পরে আছ কেন? আমার কি কোনো অসুখ হয়েছে? আমার শরীরে কি কোনো সংক্রামক জীবাণু আছে?"

নার্সটি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, ইতস্তত করে বলল, "আমরা যখনই কাউকে দেখতে আসি মুখে মাস্ক পরে থাকি। এটা আমাদের অভ্যাস।"

কথাটি সত্যি নয়, কিন্তু নায়ীরা সেটা নিয়ে কথা বলার উৎসাহ খুঁজে পেল না। নার্সটি তার মুখ থেকে মাস্কটি না খুলেই আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার এখন কেমন লাগছে?"

নায়ীরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার খুব দুর্বল লাগছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নার্সটি বলল, "সেটাই স্বাভাবিক।"

নায়ীরার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হল, মস্তিষ্কে স্মৃতি জন্ম দেওয়া হলে শরীর কেন দুর্বল হবে? শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন না করেই সে চোখ বুজে শুয়ে রইল। নার্সটি বলল, "আমি তোমার শরীরে একটা বলকারক ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি শক্তি খুঁজে পাবে।"

নার্সটি নায়ীরার ডান হাতের শিরায় একটি সুচ ঢুকিয়ে একটা বলকারক তরলের প্যাকেট ঝুলিয়ে দেয়। ফোঁটা ফোঁটা করে সেটা তার শরীরে প্রবেশ করতে থাকে এবং খুব ধীরে ধীরে এক ধরনের কোমল আরামের অনুভূতি নায়ীরার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

নায়ীরা নিঃশব্দে তার বিছানায় শুয়ে রইল। তাকে ঘিরে লোকজন যাচ্ছে, আসছে, কথা বলছে, যন্ত্রপাতি দিয়ে তাকে পরীক্ষা করছে, কিন্তু কোনো কিছু নিয়েই সে কৌতূহলী হতে পারছে না। কেউ একজন তার হাত স্পর্শ করে তাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল, চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে ড. ইলাক। নায়ীরা স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। ড. ইলাক বলল, "তোমার এখন কেমন লাগছে মেয়ে?"

"আমার একটু দুর্বল লাগছে।"

"সেটা খুবই স্বাভাবিক।"

"তোমরা কি আমার অবচেতন মনে তথ্যটি প্রবেশ করাতে পেরেছ?"

ড. ইলাককে মুহূর্তের জন্য একটু বিব্রত দেখায়, কিন্তু সে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলে "হ্যাঁ, পেরেছি।"

"আমি কি কোনোভাবে সেই তথ্যটি সচেতনভাবে জানতে পারব?"

ড. ইলাক জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না, পারবে না। কিছুতেই পারবে না।"

"ড. ইলাক, আমি যতটুকু জানি যে মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত রহস্যময়, বিজ্ঞানীরা কখনো সেটা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি। এমন কি হতে পারে না হঠাৎ করে আমি সেটা জেনে গেলাম। স্বপ্নের ভেতরে কিংবা কোনোভাবে সম্মোহিত হয়ে?"

ড. ইলাক জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না, এটা হতে পারে না। নিওরোজিনা দিয়ে তোমার মাথায় তথ্যটি ঢোকানো হয়েছে। শুধু আরেকটি নিওরোজিনা দিয়েই সেই তথ্য বের করা সম্ভব। অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়।"

নায়ীরা কিছুক্ষণ ড. ইলাকের চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হেসে আবার চোখ বন্ধ করল। একজন মানুষ যখন মিথ্যে কথা বলে নায়ীরা সেটা বুঝতে পারে। এটি কি তার বিশেষ একটি ক্ষমতা, নাকি সবার জন্যই এটি সত্যি—সে জানে না। জীবনের পুরোটাই সে তার অন্য ক্লোনদের সঙ্গে কাটিয়েছে। মাত্র গত কয়েক দিন হল সে প্রথমবার অপরিচিত মানুষদের দেখছে, তাদের সঙ্গে কথা বলছে। এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সে আবিষ্কার করছে যে, অনেকেই তাকে সত্যি কথা বলছে না। হতে পারে সত্যি কথাটি তার জন্য ভালো নয়, কিন্তু সে তো সত্যিকারের মানুষ নয়, সে একটি তুচ্ছ ক্লোন। তার ভালো-মন্দে পৃথিবীর কী আসে যায়? ল্যাবরেটরিতে একটা গিনিপিগকে নিয়ে ভয়ংকর একটা এক্সপেরিমেন্ট করার সময় বিজ্ঞানীরা একটুও ইতস্তত করে না, তার বেলায় কেন করবে? এই প্রশ্নের উত্তরটি কি সে খুঁজে পাবে?

চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরই নায়ীরা তার শক্তি ফিরে পেল। কতটুকু তার নিজের আর কতটুকু নানা ধরনের ওষুধপত্রের ফল, সেটা সে জানে না। সেটা নিয়ে সে মাথাও ঘামাচ্ছে না। তাকে টেহলিস শহরে একটি দুর্গম অভিযানে পাঠানো হবে। কত তাড়াতাড়ি সেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযানটুকু শুরু করতে পারবে সেটাই এখন তার একমাত্র ধ্যানধারণা। চার দেয়ালে ঘেরা এই বিজ্ঞান কেন্দ্র, বিজ্ঞান কেন্দ্রের কিছু মিথ্যেবাদী মানুষকে তার আর ভালো লাগছে না। তার সঙ্গে একজন গাইড থাকবে। সেই গাইডটি কেমন মানুষ হবে? দীর্ঘ সময় সেই মানুষটির সঙ্গে সে থাকবে, এই মানুষটি যদি একজন খাঁটি মানুষ না হয় তা হলে সেটা কি খুব দুঃখের একটি ব্যাপার হবে না?

টেহলিস শহরে অভিযানের জন্য তাকে নিশ্চয়ই প্রস্তুত করা হবে। নায়ীরা খানিকটা আগ্রহ নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সেরকম কিছু হল না। যে মহিলাটিকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার নাম ক্রানা। ক্রানা মধ্যবয়স্ক হাসিখুশি মহিলা। নায়ীরার সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা পুরোটাই হল অবমানব নিয়ে। বারবার নায়ীরাকে মনে করিয়ে দিল, "অবমানব কিন্তু মানুষ নয়। তারা মানুষ থেকে গড়ে ওঠা একটি ভয়ংকর প্রাণী। তাদের ভেতরে স্নেহ-মমতা নেই, ভালবাসা নেই।"

নায়ীরা একটু আপত্তি করে বলল, "কিন্তু তাদের নিজেদের জন্যও কি স্নেহ-মমতা নেই? একটা পশুও তো তার সন্তানকে বুক আগলে লালন করে?"

ক্রানা মাথা নেড়ে বলল, "সেটা ছিল প্রকৃতির নিয়ম। অবমানবরা প্রকৃতিকে অস্বীকার করেছে। তারা নিজেদের মধ্যে বিবর্তন ঘটিয়েছে, সেই বিবর্তনটি তাদের ভয়ংকর একটা প্রাণী করে তুলেছে।"

"কী রকম ভয়ংকর?"

"তারা দেখতেও ভয়ংকর। আমি শুনেছি, একটা বিশেষ প্রজাতির দেহ থেকে দুটি মাথা গড়ে উঠেছে।"

নায়ীরা শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করল, "দুটি মাথা?"

"হ্যাঁ। হাতকে আরো কার্যক্ষম করার জন্য সেখানে পাঁচটির বদলে সাতটি করে আঙুল। অনেকের তৃতীয় একটি চোখ রয়েছে।"

"তৃতীয় চোখ?" নায়ীরা অবাক হয়ে বলল, "সেটি কোথায়?"

"কপালের ওপরে। তৃতীয় চোখটি আমাদের চোখের মতো নয়, সেটি সব সময় খোলা থাকে। সেই চোখের পাতি পড়ে না।"

নায়ীরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কী ভয়ংকর!"

"হ্যাঁ। শারীরিকভাবে ভয়ংকর, কিন্তু সেটা সত্যিকারের ভয় নয়। তারা ভয়ংকর, কারণ তাদের চিন্তাভাবনা ভয়ংকর। মস্তিষ্ককে তারা অন্যভাবে ব্যবহার করতে শিখেছে। কৃত্রিমভাবে নিউরনের সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছে। তাদের ভেতরে নতুন নতুন অনুভূতির জন্ম নিয়েছে।"

"নতুন অনুভূতি?"

"হ্যাঁ, নতুন অনুভূতি, যার কথা আমরা জানি না।"

নায়ীরা একটু চিন্তা করে বলল, "সেই অনুভূতিগুলো কী ধরনের?"

ক্রানা গম্ভীর মুখে বলল, "আমার মনে হয় না কোনোদিন সেগুলোর কথা আমরা জানতে পারব। যেমন ধর, কষ্ট করে আনন্দ পাওয়া কিংবা যন্ত্রণার ভেতরে সুখের অনুভূতি।"

"অবমানবদের এ ধরনের অনুভূতি আছে?"

"হ্যাঁ, আছে। তারা মাঝে মাঝে দল বেঁধে নিজেদের যন্ত্রণা দেয়। তাদের বিকৃত এক ধরনের মানসিকতা রয়েছে।"

নায়ীরা অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবমানব সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি নায়ীরাকে সাধারণ কিছু বিষয়ে শিখিয়ে–পড়িয়ে নেওয়া হল—দৈনন্দিন অসুখবিসুখ হলে কী করতে হবে, কী ওষুধপত্র খেতে হবে এই ধরনের গুরুত্বহীন বিষয়। খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরম অবস্থায় পড়ে গেলে নিজেকে রক্ষা করার জন্য নায়ীরাকে কিছু বিশেষ পোশাক দেওয়া হল। নায়ীরা সবচেয়ে আনন্দ পেল এক জোড়া নাইট ভিশন গগলস দেখে, এটি চোখে দিলে অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যায়। সে ভেবেছিল, তাকে হয়তো আত্মরক্ষার জন্য কোনো একটি অস্ত্রচালনা শেখাবে, কিন্তু বিজ্ঞান কেন্দ্রের সেরকম কোনো পরিকল্পনা আছে বলে মনে হল না।

রাতে ঘুমানোর সময় নায়ীরা নিজের হাতের ওপর হাত বোলাতে গিয়ে হঠাৎ বাম হাতে একটু সুচ ফোটানোর মতো ব্যথা অনুভব করে। তার ডান হাতে বলকারক ওষুধের সিরিঞ্জ লাগানো হয়েছিল কিন্তু বাম হাতে কিছু করা হয় নি। বাম হাতে ছোট লাল বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে থেকে নায়ীরা ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে। নিওরোজিনা দিয়ে যখন তাকে অচেতন করে রেখেছিল তখন এই ছোট লাল বিন্দুটি দিয়ে তার শরীরে কোনো কিছু ঢোকানো হয়েছে। কী হতে পারে সেটি?

তার কাছে সেটি গোপন করে রাখা হচ্ছে কেন?

গাইড মানুষটিকে নায়ীরার খুব পছন্দ হল। নীল চোখ, এলোমেলো চুল এবং রোদেপোড়া তামাটে চেহারা। নায়ীরাকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, "আমাকে বলেছে একজন মহিলাকে নিয়ে যেতে! তুমি তো মহিলা নও, তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে!"

নায়ীরা হেসে বলল, "আমাকে বাচ্চা বলা ঠিক হবে না, আমার বয়স পনের।"

"পনের একটা বয়স হল? আমার বয়স তেতাল্লিশ। তোমার তিন গুণ।"

নায়ীরা বলল, "আমি আসলে খুব বেশি মানুষ দেখি নি, তাই দেখে মানুষের বয়স অনুমান করতে পারি না। তবে তোমাকে দেখে মোটেও তেতাল্লিশ বছরের মানুষ মনে হচ্ছে না।"

"কী বলছ তুমি? মানুষের বয়স ঠিক করা উচিত তার অভিজ্ঞতা দিয়ে। যদি সেভাবে ঠিক করা হত তা হলে আমার বয়স হত সাতানব্বই বছর।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। এমন কোনো কাজ নেই যেটা আমি করি নি।"

নায়ীরা বলল, "তোমার পদ্ধতিতে বয়স ঠিক করা হলে আমি এখনো শিশু। আমার অভিজ্ঞতা বলে কিছু নেই। একেবারে শূন্য।"

গাইড মানুষটি বলল, "একেবারে শূন্য কেন হবে? নিশ্চয়ই পড়াশোনা করতে স্কুলে গিয়েছ, সেখানে কত রকম বন্ধুবান্ধব, কত রকম শিক্ষক-শিক্ষিকা, কত রকম অভিজ্ঞতা—"

নায়ীরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "উঁহু, আমি কখনো স্কুলে যাই নি।"

মানুষটি অবাক হয়ে বলল, "স্কুলে যাও নি?"

"না। শুধু স্কুল কেন, কোথাও যাই নি। আমার পুরো জীবন কাটিয়েছি চার দেয়ালঘেরা একটুখানি জায়গার ভেতর।"

"কেন?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নায়ীরা জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "কারণ, আমি একজন ক্লোন।"

মানুষটি কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "ক্লোন?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু, কিন্তু—" মানুষটি বিভ্রান্তের মতো বলল, "আমাকে তো সেরকম কিছু বলে নি।"

নায়ীরা আহত গলায় বলল, "আমি দুঃখিত যে তোমাকে এটা আগে থেকে বলে দেয় নি। আমি সত্যিই দুঃখিত যে, টেহলিস শহরে সত্যিকার একজন মানুষ না নিয়ে তোমার একজন ক্লোনকে নিয়ে যেতে হচ্ছে।"

"না–না–না", মানুষটি তীব্র গলায় বলল, "আমি সে কথা বলছি না। পৃথিবীতে বহু আগে আইন করে ক্লোন তৈরি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তা হলে তোমাকে কেন তৈরি করা হল?"

"আসলে আইনের ভেতর ফাঁকফোকর থাকে। সাধারণত ক্লোন তৈরি করা নিষেধ, কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য বিশেষ প্রয়োজনে বিজ্ঞান কেন্দ্রকে অনুমতি দেওয়া হয়।"

"যদি অনুমতি দেবে, তা হলে তাকে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে দেবে না কেন? তাকে চার দেয়ালের মধ্যে আটক রাখবে কেন? স্কুলে যেতে দেবে না কেন—"

নায়ীরা আবার জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি নিশ্চিত, বাইরের মানুষ যদি আমাদের কথা জানে তা হলে তারা ঠিক তোমার মতো কথা বলত। কিন্তু বাইরের মানুষ আমাদের কথা কোনোদিন জানবে না। আমরা হচ্ছি অত্যন্ত গোপনীয় একটা প্রজেক্ট! তুমিও নিশ্চয়ই কোনোদিন আমাদের কথা বাইরে জানাতে পারবে না—"

মানুষটি হতচকিতের মতো মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলছ। আমাকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে এখানকার কোনো তথ্য কখনো বাইরে জানাতে পারব না। কখনোই না।"

নায়ীরা বলল, "কাজেই আমাদের কথা বাইরের পৃথিবীর কেউ কখনো জানবে না।"

"আমি খুব দুঃখিত—"

"আমার নাম নায়ীরা।"

"আমি খুব দুঃখিত, নায়ীরা।"

নায়ীরা হাসিমুখে বলল, "তুমি আমার অনেকখানি দুঃখ দূর করে দিয়েছ।"

"কীভাবে তোমার দুঃখ দূর করেছি?"

"আমি এখানে এসেছি প্রায় এক সপ্তাহ। এই এক সপ্তাহে আমি সবাইকে বলেছি আমার নাম নায়ীরা, কিন্তু কেউ একটিবারও আমাকে আমার নাম ধরে সম্বোধন করে নি।"

মানুষটি অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"কারণ একজন ক্লোনের নাম থাকার কথা নয়। একটা ক্লোনের পরিচিতি হয় শুধু একটা সংখ্যা দিয়ে।"

"কী ভয়ংকর রকমের অমানবিক একটা নিয়ম।"

"বিচার–অবিচার বিষয়গুলো মানুষের জন্য। আমি মানুষ নই, আমি ক্লোন। একজন ক্লোন আর ল্যাবরেটরির গিনিপিগের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।"

মানুষটি কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ নায়ীরার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাছে এসে তার পিঠে হাত রেখে বলল, "আমি খুব দুঃখিত, নায়ীরা। আমার নিজেকে মনে হচ্ছে একটা দানব—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই—" বাক্যটি অসমাপ্ত রেখে নায়ীরা মানুষটির দিকে সপ্রশ্নভাবে তাকাল।

মানুষটি বলল, "আমার নাম রিশি।"

"তোমার দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই রিশি।"

"আছে। নিশ্চয়ই আছে।"

নায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, "না, নেই। তুমি পুরো বিষয়টুকু দেখছ তোমার মতো করে। একজন মানুষের পক্ষ থেকে একজন মানুষ তার জীবনে যা কিছু পায় আমরা তার কিছু পাই না, তোমাকে সেটা ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।"

রিশি মাথা নাড়ল, বলল, "করবে না?"

"হয়তো করবে। কিন্তু পুরো বিষয়টা আমাদের পক্ষ থেকে দেখলে করবে না। জন্মের পরমুহূর্ত থেকে আমরা জানি, আমরা ক্লোন, আমাদের তৈরি করা হয়েছে ক্লোন গবেষণায় ব্যবহার করার জন্য। আমরা ধরেই নিয়েছি জন্ম হওয়ার পর একসময় আমাদের কেটেকুটে শেষ করে দেওয়া হবে। এর বাইরে আমরা যেটুকু পাই সেটাই আমাদের বাড়তি লাভ। সেটাই আমাদের জীবন।"

রিশি মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু সেটা তো হতে পারে না।"

"কিন্তু সেটাই তো হচ্ছে। আমরা এটা মেনে নিয়েছি। আমি মনে করি, আমি অসম্ভব সৌভাগ্যবান একজন—একজন—" নায়ীরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "একজন মানুষ। হ্যাঁ, মানুষ। ক্লোন শব্দটা আমি ব্যবহার করছি না।"

"কেন তুমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মানুষ ভাবছ?"

"কারণ টেহলিস শহরের দুর্গম অভিযানের সময় তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। তোমার সঙ্গে আমি সময় কাটাতে পারব। মানুষ মানুষের সঙ্গে যেভাবে কথা বলে আমি তোমার সঙ্গে সেভাবে কথা বলতে পারব। তুমি জান আমার জন্য সেটা কত বড় ব্যাপার?"

রিশি কোনো কথা না বলে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে রইল। নায়ীরা বলল, "আমরা সারা জীবন এরকম একটা কিছুর স্বপ্ন দেখে এসেছি। আমার আরো দশটি বোন আছে, তারা তাদের জীবনে কী পাবে আমি জানি না, কিন্তু আমি অন্তত একজন মানুষের কাছ থেকে মানুষের সম্মান পেয়েছি।"

রিশি নিচু গলায় বলল, "তোমাকে প্রথম যখন দেখেছি তখন ভেবেছি তুমি নিশ্চয়ই বাচ্চা একটি মেয়ে। বয়সে তুমি আসলেই বাচ্চা। কিন্তু তুমি একেবারে পরিণত মানুষের মতো কথা বলো।"

নায়ীরা শব্দ করে হেসে বলল, "চার দেয়ালের ভেতরে আটকা পড়ে থেকে আমরা বইপত্র পড়া ছাড়া আর কিছু করতে পারি না। আমার বয়সী একটা মেয়ের কী নিয়ে কীভাবে কথা বলতে হয় আমি জানি না। সেজন্য আমার কথা হয়তো তোমার কাছে অকালপক্কের কথার মতো মনে হচ্ছে।"

রিশি মাথা নাড়ল, বলল, "না। অকালপক্ক একটি জিনিস আর পরিণত মানুষ সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তুমি অকালপক্কের মতো কথা বলো না, তুমি এই অল্পবয়সেই একেবারে পরিণত একজন মানুষের মতো কথা বলো।"

নায়ীরা বলল, "তার জন্য আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। যে মানুষটি থেকে আমাদের ক্লোন করা হয়েছে পুরো কৃতিত্ব তার। শুনেছি সে একজন অসাধারণ মহিলা ছিল। আমি যদি তার সম্পর্কে কিছু একটা জানতে পারতাম! আমার এত জানার ইচ্ছে করে।"

"চেষ্টা করেছ?"

নায়ীরা হেসে ফেলল, বলল, "তুমি বারবার ভুলে যাচ্ছ যে আমি একজন ক্লোন। আমি আমার পছন্দের একটি গান শোনার চেষ্টাটুকুও করতে পারি না।"

রিশি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি দুঃখিত।"

নায়ীরা বলল, "আমি মোটেও দুঃখিত নই। তোমার সঙ্গে খুব বড় একটা অ্যাডভেঞ্চারে যাব চিন্তা করেই আমার মনে হচ্ছে আমার ক্লোন হয়ে থাকার সব দুঃখ মুছে গেছে।"

রিশি কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে রইল।

রিশির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর হঠাৎ করে নায়ীরার জীবনটুকু অন্যরকম হয়ে গেল। এত দিন বিজ্ঞান কেন্দ্রে তাকে তুচ্ছ একজন ক্লোন হিসেবে দেখা হয়েছে। হঠাৎ করে রিশি তাকে পুরোপুরি একজন মানুষ হিসেবে দেখছে। রিশির তুলনায় সে একটি বাচ্চা শিশু ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু রিশি তাকে কখনোই ছোট শিশু হিসেবে দেখছে না। প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছে, পরামর্শ করছে। নায়ীরা প্রথম প্রথম ভেবেছিল, রিশি বুঝি তাকে একটু খুশি করানোর জন্য এগুলো করেছে, কিন্তু কয়েক দিনের ভেতরেই বুঝে গেল, সে সত্যি সত্যি তার সাহায্য চাইছে। টেহলিস শহরের ভ্রমণটুকু শুরু হবে একটা পার্বত্য অঞ্চল থেকে। সেই পার্বত্য অঞ্চলের একটা বড় অংশ তাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে। উঁচু একটা পাহাড়ে একটা গ্লাইডার রাখা থাকবে। সেই গ্লাইডারে করে দুজন অবমানবের এলাকার ওপর দিয়ে ভেসে যাবে। সত্যিকারের একটা প্লেনে না গিয়ে গ্লাইডারে কেন যেতে হবে নায়ীরা সেটা বুঝতে পারছিল না। ফ্লাইট কো-অর্ডিনেটরকে জিজ্ঞেস করার পর মানুষটি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "প্লেনে কেমন করে যাবে? নিচে পুরো এলাকাটাতে অবমানবরা থাকে। তারা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ভয়ংকর সব অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্লেন রাডারে ধরা পড়া মাত্রই মিসাইল ছুড়ে ফেলে দেবে।"

নায়ীরা জিজ্ঞেস করল, "গ্লাইডারকে ফেলবে না?"

"কীভাবে ফেলবে? গ্লাইডার যেসব হালকা জিনিস দিয়ে তৈরি হয় সেগুলো রাডারে ধরা পড়ে না।"

"দেখতেও পাবে না?"

"না। বছরের এই সময়ে এলাকায় মেঘ থাকে। মেঘের ওপর দিয়ে গ্লাইডার উড়ে যাবে, অবমানবরা টের পাবে না।"

নায়ীরা একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু গ্লাইডার তো আকাশে বেশি সময় ভেসে থাকতে পারবে না। কখনো না কখনো নিচে নেমে আসবে।"

ফ্লাইট কো-অর্ডিনেটর মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু আমরা একটু উষ্ণ বাতাসের প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করছি। সেটা এলে বড় একটা এলাকায় বাতাস উপরে উঠে আসবে। তার উপর ভর করে অনেক দূর চলে যাওয়া যাবে।"

"সেটা কত দূর?"

"আমরা এখনো জানি না। রিশি একজন প্রথম শ্রেণীর গ্লাইডার পাইলট, আমাদের ধারণা সে অনায়াসে সাত-আট শ কিলোমিটার উড়িয়ে নিতে পারবে।"

"তারপর?"

"তারপরের অংশটুকু দুর্গম। দুর্গম বলে অবমানবের বসতিও কম। তোমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে। কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামিও না, রিশি ব্যাপারটি দেখবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নায়ীরা একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু আমিও একটু ধারণা করতে চাই।"

হঠাৎ করে ফ্লাইট কো-অর্ডিনেটরের মুখের মাংসপেশি শক্ত হয়ে গেল। সে কঠিন গলায় বলল, "যেসব বিষয়ে তোমার ধারণা থাকার কথা শুধু সেসব বিষয়ে তোমাকে ধারণা দেওয়া হবে। অহেতুক কৌতূহল দেখিয়ে কোনো লাভ নেই মেয়ে।"

নায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

রিশির কাছে এরকম কোনো সমস্যা নেই। যে কোনো বিষয়ে নায়ীরা তাকে প্রশ্ন করতে পারে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রিশি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়। গ্লাইডারে করে তারা কত দূর যেতে পারবে নায়ীরা একদিন রিশির কাছে জানতে চাইল। রিশি চিন্তিত মুখে বলল, "এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আমাকে বাতাসের প্রবাহের যে ম্যাপ দিয়েছে তার থেকে অনুমান করতে পারি যে, ছয় থেকে সাত শ কিলোমিটার যেতে পারবে।"

"বাকিটুকু? বাকিটুকু কেমন করে যাব?"

রিশি হেসে বলল, "হেঁটে!"

"হেঁটে?"

"হ্যাঁ। গোপনে যেতে হলে হেঁটে না গিয়ে লাভ নেই।"

নায়ীরা একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু পুরোটুকু তো হেঁটে যেতে পারবে না। শেষ অংশটুকুতে জলাভূমি রয়েছে। সেখানে?"

রিশি ঠাট্টা করে বলল, "কেন, সাঁতরে যাবে? তুমি সাঁতার জান না?"

নায়ীরা মাথা নেড়ে বলল, "ঠাট্টা করো না। সত্যি করে বলো।"

রিশি তখন গম্ভীর হয়ে বলল, "আমরা সেই অংশটুকু কীভাবে যাব সেটি নিয়ে এখন আলাপ করছি। ওপর থেকে নানারকম পরিকল্পনা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু পরিকল্পনাগুলো বেশিরভাগ সময়ে খুব দুর্বল।"

"দুর্বল?"

"হ্যাঁ।"

নায়ীরা একটু ইতস্তত করে বলল, "আচ্ছা রিশি, এমন কি হতে পারে যে শেষ অংশটুকুর আসলে কোনো পরিকল্পনা নেই?"

রিশি অবাক হয়ে বলল, "পরিকল্পনা নেই?"

"না।"

"কেন থাকবে না?"

"কারণ সেখানে পৌঁছানোর আগেই কিছু একটা হবে।"

রিশি ভুরু কুঁচকে বলল, "কিছু একটা হবে? কী হবে?"

"আমরা মারা পড়ব। নিশ্চিতভাবে মারা পড়ব।"

"কেমন করে মারা পড়ব? কেন মারা পড়ব?"

নায়ীরা বলল, "সেটা আমি জানি না। কিন্তু যারা আমাদের পাঠাচ্ছে তারা সেটা জানে।"

রিশি কিছুক্ষণ নায়ীরার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এরকম অদ্ভুত একটি বিষয় তোমার মাথায় কেমন করে এল?"

নায়ীরা একটু লজ্জা পেয়ে যায়, মাথা নিচু করে বলল, "আমি দুঃখিত রিশি যে বিজ্ঞান কেন্দ্রের এত বড় বড় মানুষকে নিয়ে আমি সন্দেহ করছি। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

"আমি কেন জানি হিসাব মেলাতে পারছি না। তারা বলেছে, আমার মস্তিষ্কে করে একটি গোপন তথ্য পাঠাচ্ছে। কিন্তু সেটি তো সত্যি হতে পারে না। পারে?"

রিশি বলল, "আমি সেটা জানি না।"

নায়ীরা বলল, "আমি তাদের সেটা জিজ্ঞেস করেছি, তারা ঠিক উত্তর দিতে পারে নি।"

রিশি বলল, "হয়তো তারা এর উত্তর জানে না।"

নায়ীরা একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু তারা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে।"

"মিথ্যা কথা বলেছে?"

"হ্যাঁ", নায়ীরা বলল, "কেউ মিথ্যা কথা বললে আমি কেমন করে জানি টের পেয়ে যাই।"

"সেটি কেমন করে হতে পারে?"

"আমি জানি না। আমি আমাদের ক্লোন করা বোনদের সঙ্গে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতাম। তাদের কথা বলার একটা ধরন আছে, সেটা আমরা জানি। আমাদের কখনোই একজনের সঙ্গে আরেকজনের মিথ্যা বলতে হত না। তাই সত্যি কথা বলার ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক। মিথ্যে বললেই অস্বাভাবিক মনে হয়।"

রিশি ঘুরে ভালো করে নায়ীরার দিকে তাকাল। মনে হল তাকে ভালো করে একবার দেখল। তারপর বলল, "আমি কি কখনো তোমার সঙ্গে মিথ্যা বলেছি?"

নায়ীরা হেসে ফেলল, বলল, "না। সেজন্য তোমার ওপর আমি নির্ভর করি। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"তুমি মিথ্যা বলতে পার না। তাই তুমি যখন মিথ্যা বলার চেষ্টা কর, তখন সবাই সেটা বুঝে ফেলে।"

রিশি ভুরু কুঁচকে বলল, "সত্যি? আমি কি কখনো চেষ্টা করেছি?"

"হ্যাঁ।" নায়ীরা মুখ টিপে হেসে বলল, "কদিন আগে একবার চেষ্টা করেছিলে। টেবিল থেকে কী একটা জিনিস তুলে খুব যত্ন করে একটা কাগজে ভাঁজ করে রাখছিলে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কী তুলছ?' তখন তুমি চমকে উঠে আমতা-আমতা করে বললে, 'না মানে ইয়ে—একটা বিচিত্র পোকা।' মনে আছে?"

রিশির মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে।"

নায়ীরা বলল, "সেটা পোকা ছিল না। সেটা অন্য কিছু ছিল। তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছিলে! কিন্তু সেটা অন্যরকম মিথ্যা। তার মধ্যে কোনো অন্যায় ছিল না।"

রিশি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ নায়ীরা। তুমি অসাধারণ একটি মেয়ে।"

নায়ীরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি কিন্তু অসাধারণ মেয়ে হতে চাই নি। খুব সহজ সাধারণ একটি মেয়ে হতে চেয়েছিলাম।"

"যা-ই হোক, তুমি কি জানতে চাও, আমি সেদিন টেবিল থেকে কী তুলেছিলাম?"

"না। তুমি যেহেতু বলতে চাও নি, আমি সেটা জানতে চাই না।"

"ঠিক আছে।"

"তা ছাড়া আমি অনুমান করতে পারি তুমি কী তুলেছিলে এবং কেন তুলেছিলে, তাই জানার প্রয়োজনও নেই।"

রিশি চোখ বড় বড় করে নায়ীরার দিকে তাকাল। নায়ীরা বলল, "পুরো ব্যাপারটা করেছ আমার জন্য, আমার ভালোর জন্য। তাই আমি এখন না জানলেও কোনো ক্ষতি নেই। একসময় আমি জানব। কারণ তুমি আমাকে জানাবে।"

রিশি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "নায়ীরা, তুমি একটি অসাধারণ এবং একটি বিচিত্র মেয়ে।"

নায়ীরা বলল, "আমি যদি অন্য দশজন মানুষের মতো বড় হতে পারতাম তা হলে হয়তো বিচিত্র হতাম না।"

"একটু আগে তুমি যে বিষয়টা বলেছ সেটা অন্য কেউ বললে আমি একেবারেই গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু যেহেতু তুমি বলছ, আমি গুরুত্ব দিচ্ছি। তুমি নিশ্চিত থাক নায়ীরা, আমরা রওনা দেওয়ার পর কীভাবে যাব তার পুরোটুকু আমি ঠিক করে নেব। তোমাকে আমি সুস্থ দেহে টেহলিস শহরে পৌঁছে দেব।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"বিজ্ঞান কেন্দ্র যদি সত্যি সত্যি তোমাকে আর আমাকে মাঝপথে মেরে ফেলার চেষ্টা করে, আমি সেটা হতে দেব না। আমি তোমাকে রক্ষা করব।"

"আমি জানি, তুমি আমাকে রক্ষা করবে।"

"সত্যি সত্যি কেউ যদি তোমাকে হত্যা করতে চায়, তুমি জেনে রাখ নায়ীরা, তোমাকে হত্যা করার আগে আমাকে হত্যা করতে হবে।"

ঠিক কী কারণ জানা নেই নায়ীরা হঠাৎ মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, বলল, "কেউ যদি আমাকে এখন মেরেও ফেলে তবুও আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।"

রিশি এগিয়ে এসে নায়ীরাকে শক্ত করে ধরে বলল, "কেউ তোমাকে মেরে ফেলতে পারবে না, নায়ীরা। কেউ না।"

AMARBOI.COM

ইঞ্জিনটা থামার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে রিশি নেমে আসে। বাইরে অন্ধকার, আকাশে বড় একটা চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলোয় পুরো এলাকাটাকে একটা অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো মনে হচ্ছে। পাহাড়ের শীতল ও সতেজ বাতাসে বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিয়ে রিশি নায়ীরাকে ডাকল, "নায়ীরা, নেমে এস।"

নায়ীরা তার ব্যাকপ্যাক কাঁধে নিয়ে নিচে নেমে এল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী সুন্দর।"

"হ্যাঁ।" রিশি বলল, "দিনের আলোতে জায়গাটা আরো সুন্দর দেখাবে।"

গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে একজন বলল, "আমি তা হলে যাই?"

রিশি বলল, "যাও।"

মানুষটি বলল, "তোমাদের জন্য শুভকামনা।"

"ধন্যবাদ।"

গাড়িটি গর্জন করে উঠে ঘুরে পাহাড়ি পথ দিয়ে নেমে যেতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বহুদূরে হেডলাইটের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল। রিশি আবছা অন্ধকারে নায়ীরার দিকে তাকাল। বলল, "আমাদের দ্রুত এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন?"

"গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনে যদি কোনো অবমানব এসে পড়ে!"

নায়ীরা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "এটি কি অবমানবের এলাকা?"

"না, কিন্তু এরা খুব দুর্ধর্ষ। মাঝে মাঝেই পার্বত্য এলাকায় হানা দেয় বলে শুনেছি।"

নায়ীরা বলল, "চল, তা হলে সরে যাই।"

"হ্যাঁ, চল।"

দুজন তাদের কাঁধে ব্যাকপ্যাক তুলে নেয়। রিশি একবার আকাশের দিকে তাকায়, তারপর পকেট থেকে জি.পি.এস. বের করে কোনদিকে যেতে হবে ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। তার থেকে কয়েক পা পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে নায়ীরা বলল, "আমাদের কতদূর যেতে হবে?"

"দূরত্বের হিসাবে খুব বেশি নয়, কিন্তু পাহাড়ি এলাকা। কখনো উপরে উঠতে হবে আবার কখনো নিচে নামতে হবে। রাস্তা নেই—ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল ভেঙে হাঁটতে হবে, তাই সারা রাত লেগে যেতে পারে।"

"সারা রাত?"

"হ্যাঁ। রাতের মধ্যেই পৌঁছে যেতে চাই। পারবে না?"

"পারব।"

"চমৎকার।"

দুজনই চোখে নাইটভিশন গগলস লাগিয়ে নিয়েছে। সেই গগলসে পুরো এলাকাটাকে অলৌকিক একটা জগতের মতো মনে হয়। চারপাশে ঝোপঝাড়, বড় বড় গাছ। দূরে হঠাৎ হঠাৎ কোনো রাতজাগা প্রাণী দেখা যায়। মানুষের পায়ের শব্দ শুনে ছুটে পালিয়ে গিয়ে দূর থেকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নায়ীরা জিজ্ঞেস করল, "এখানে কি বড় কোনো বন্য প্রাণী আছে?"

"আছে। পাহাড়ি চিতা আর ভালুক।"

"তারা আমাদের আক্রমণ করবে না তো?"

"করার কথা নয়। বনের প্রাণী মানুষকে ভয় পায়। আর যদি কাছাকাছি আসে তুমি অনেক আগেই দেখতে পাবে।"

"তা ঠিক।"

দুজনে আবার নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। রিশি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, "নায়ীরা, তোমার সমস্যা হচ্ছে না তো?"

"না। হচ্ছে না।"

"হলে বলো।"

"বলব।"

"মানুষের শরীর খুব বিচিত্র জিনিস, তাকে দিয়ে যে কত পরিশ্রম করানো যায়, সেটি অবিশ্বাস্য।"

"ঠিকই বলেছ।"

রিশি হালকা কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ বলল, "নায়ীরা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"কর।"

"তোমাকে মাঝে মাঝেই খুব আনমনা দেখি। কী ভাব তখন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ভাবার খুব বেশি কিছু নেই। আমার সঙ্গে যাদের ক্লোন করা হয়েছিল তারা ছাড়া আমার আপনজন কেউ নেই। আমি তাদের কথা ভুলতে পারি না। ঘুরেফিরে আমার শুধু তাদের কথা মনে হয়।"

রিশি নরম গলায় বলল, "খুবই স্বাভাবিক। আমি তোমার বুকের ভেতরকার যন্ত্রণাটা বুঝতেই পারছি।"

পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে নায়ীরা বলল, "না, রিশি। তোমরা সেই যন্ত্রণাটুকু বুঝতে পারবে না। প্রথমে আমরা ছিলাম উনিশ জন। একজন একজন করে সরিয়ে নেয়ার পর হয়েছি এগার জন। শেষ কত দিন এই এগার জন মিলে ছিলাম একটা পরিপূর্ণ অস্তিত্ব। তার মধ্যে থেকে একজনকে সরিয়ে নেওয়া হলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন।"

"আমি দুঃখিত, নায়ীরা।"

নায়ীরা বলল, "আমি প্রতি মুহূর্তে অন্যদের কথা ভাবতে থাকি। আমার মনে হয় তাদের সবাইকে একটিবার স্পর্শ করার জন্য আমি আমার পুরো জীবনটুকু দিয়ে দিতে পারব।"

রিশি দ্বিতীয়বার বলল, "আমি সত্যিই দুঃখিত, নায়ীরা।"

রিশি এবং নায়ীরা যখন তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় তখন পুব আকাশ আলো হতে শুরু করেছে। পাহাড়ের চূড়ায় বিশাল পাখির মতো ডানা মেলে একটা গ্লাইডার শুয়ে আছে। তার পাশে বসে দুজন তাদের পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে নেয়। দুজনে ক্লান্ত দেহে বড় পাথরে হেলান দিয়ে বসে লম্বা লম্বা নিশ্বাস নিতে থাকে। রিশি নায়ীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "কেমন লাগছে তোমার?"

"ভালো।" চারদিকে তাকাতে তাকাতে নায়ীরা বলল, "আমি প্রকৃতির এত সুন্দর রূপ আগে কখনো দেখি নি। শুধু মনে হচ্ছে—"

"কী মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে আমার অন্য বোনগুলোকেও যদি কোনোভাবে এখানে আনতে পারতাম তা হলে কী মজাটাই না হত।"

রিশি একটা নিশ্বাস ফেলে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা বলল না। নায়ীরা তার ব্যাকপ্যাকে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে বলল, "আমরা কখন রওনা দেব রিশি?"

রিশি পাহাড়ের পাদদেশে ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা অবমানবদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। দিনের আলোয় বের হতে চাইছি না। অন্ধকার হওয়ার পর গ্লাইডারটি ভাসিয়ে দেব।"

"তা হলে আমি এখন একটু বিশ্রাম নিতে পারি?"

"হ্যাঁ নায়ীরা, পার।"

"ঠিক আছে, আমি তা হলে একটু ঘুমিয়ে নিই।"

"ঘুমাও। আমি পাহারায় থাকব।"

নায়ীরা গুটিসুটি মেরে শুয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। এই দীর্ঘ পথ বিশাল বোঝা টেনে এনে মেয়েটি সত্যি সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রিশি একটা পাথরে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে। খুব ধীরে ধীরে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠছে। ভোরের প্রথম আলোতে একটা পাহাড়ের চূড়ায় বিশাল একটা গ্লাইডারের পাখার নিচে গুটিসুটি মেরে একটি কিশোরী ঘুমিয়ে আছে। দৃশ্যটি অন্যরকম। রিশি তাকিয়ে থাকে, তার মনে হতে থাকে এটি

আসলে ঘটছে না, এটি কল্পনার একটি দৃশ্য। ভালো করে তাকালেই দেখবে আসলে এটি এখানে নেই।

নায়ীরা যখন ঘুম থেকে উঠেছে তখন সূর্য অনেক ওপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের চূড়ায় এক ধরনের আরামদায়ক উষ্ণতা।

কাছাকাছি রিশি যেখানে বসেছিল সেখানেই চুপচাপ বসে আছে। নায়ীরাকে জেগে উঠতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "ঘুম হল?"

"হ্যাঁ, এভাবে আগে কখনো ঘুমাই নি।"

"এভাবে নিশ্চয়ই আগে কখনো ক্লান্তও হও নি।"

"তুমি একটু বিশ্রাম নেবে না?"

"নিয়েছি।"

"নায়ীরা অবাক হয়ে বলল, "কখন নিয়েছ? তুমি তো এখানেই সারাক্ষণ বসে আছ।"

রিশি হেসে বলল, "এটাই আমার বিশ্রাম। আমার অভ্যাস আছে। যাও, হাত–মুখ ধুয়ে এস, কিছু একটা খাই।"

"হ্যাঁ, খিদে পেয়েছে।"

"পাহাড়ের বাতাস খুব সতেজ। এই বাতাসে নিশ্বাস নিলে এমনিতেই খিদে পায়। যাও, দেরি করো না।"

খাবারের আয়োজনটুকু ছিল সহজ। এলুমিনিয়াম ফয়েলে মোড়ানো যবের রুটি, কিছু প্রোটিন আর গরম কফি। খাওয়া শেষ করে গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে রিশি বলল, "জীবনটা যদি এখানে থেমে যেত, মন্দ হত না। কী বলো?"

নায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল "হ্যাঁ। চারপাশে এত সুন্দর যে চোখ জুড়িয়ে যায়। আমার কী মনে হচ্ছে জান?"

"কী?"

"আমরা যেটাকে সভ্যতা বলছি, সেটা ঠিকভাবে অগ্রসর হয় নি।"

'কেন?" রিশি চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, "এরকম একটা কথা মনে হওয়ার কী কারণ?"

"মানুষ নিশ্চয়ই একসময় প্রকৃতির কাছাকাছি থাকত। এখন প্রকৃতিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছোট ছোট ঘুপচির ভেতরে থাকে। চার দেয়ালের ভেতরে থাকে। সূর্যের আলো বন্ধ করে নিজেরা আলো তৈরি করে। যখন অন্ধকার থাকার কথা, তখনো আলো জ্বেলে রাখে।"

রিশি হেসে ফেলল, বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"মানুষ নিশ্চয়ই আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবে।"

নায়ীরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি একটা জিনিস কখনো বুঝতে পারি নি।"

"সেটা কী?"

"মানুষে মানুষে যুদ্ধ করে কেন?"

"সেটা শুধু তুমি নও, কেউ বুঝতে পারে না।"

নায়ীরা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "আগে পৃথিবীতে ছিল শুধু মানুষ। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেরা নিজেরা দুই ভাগ হয়ে গেছে, মানব আর অবমানব! একজন আরেকজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ভবিষ্যতে কি আরো ভাগ হবে, আরো বেশি যুদ্ধ করবে?"

রিশি মাথা নাড়ল, বলল, "তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না নায়ীরা। আমার ধারণা, কেউই জানে না।"

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে কফির মগে চুমুক দেয়। পাথরে হেলান দিয়ে দূরে তাকায়। ঘন সবুজ বনে দূর প্রান্তর ঢেকে আছে। সেখানে ভয়ংকর অবমানবরা ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

রিশি কফির মগটি নিচে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, "এস নায়ীরা, আমরা গ্লাইডারটা প্রস্তুত করি।"

নায়ীরা উঠে দাঁড়াল। গ্লাইডারটা বিশাল একটা সাদা পাখির মতো দুটো পাখা ছড়িয়ে রেখেছে। হালকা ফাইবার গ্লাসের কাঠামোর ওপর পাতলা পলিমারের আবরণ। পাহাড়ের চূড়ার দমকা হাওয়ায় যেন উঠে চলে না যায় সেজন্য পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। রিশি পুরো গ্লাইডারটা ভালো করে পরীক্ষা করে সন্তুষ্টির মতো শব্দ করে বলল, "চমৎকার জিনিস। এর মধ্যে কোনো ফাঁকিঝুঁকি নেই। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর একেবারে সেরা ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করেছে।"

নায়ীরা গ্লাইডারটার ওপরে হাত বুলিয়ে বলল, "এত হালকা একটা জিনিস আমাদের দুজনকে নিতে পারবে?"

"শুধু আমাদের দুজনকে নয়, আমাদের জিনিসপত্র, খাবারদাবার সবকিছু নিতে পারবে।" রিশি গ্লাইডারের সামনে ছোট ককপিটটা দেখিয়ে বলল, "এখানে বসব আমি, আমার সামনে কন্ট্রোল প্যানেল। আর তুমি বসবে পেছনে।"

নায়ীরা পেছনের ছোট ককপিটটা ভালো করে দেখল। ছোট হলেও সে বেশ আরাম করেই বসতে পারবে। দুজনের মাঝখানের অংশটুকু তাদের খাবারদাবার, জিনিসপত্র রাখার জন্য।

AMARBOI.COM

রিশি তার ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করে গ্লাইডারে তুলতে থাকে। নায়ীরাও তার ব্যাগ খুলে নেয়। শুকনো খাবার, পানি, কিছু জ্বালানি, গরম কাপড়, স্লিপিং ব্যাগ বের করে সাজিয়ে রাখতে থাকে। সবকিছু রাখার পর রিশি ঢাকনাটা বন্ধ করে আবার সন্তুষ্টির মতো শব্দ করল। বলল, "আমাদের কাজ শেষ। এখন শুধু অন্ধকার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা। অন্ধকার হলেই রওনা দিতে পারব।"

নায়ীরা একটু ইতস্তত করে বলল, "আমাকে বলেছিলে একটা উষ্ণ বাতাসের প্রবাহ শুরু হবে, সেটা কি শুরু হয়েছে?"

"গোপনীয়তার জন্য আমাদের কাছে কোনো যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। শর্টওয়েভ রেডিওতে আবহাওয়ার খবর শুনে অনুমান করতে হবে।"

"সেটা শুনবে না?"

"শুনব। গ্লাইডার ভাসিয়ে দেওয়ার পর শুনব। রেডিওটা আছে ককপিটে।" রিশি দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের এখন আর কিছু করার নেই। চল জায়গাটা একটু ঘুরে দেখি।"

"চল।" নায়ীরা উঠে দাঁড়াল। বলল, "এরকম একটা সুযোগ পাব, আমি কখনো ভাবি নি।"

"একটা ঝরনাধারার মতো শব্দ শুনছি। চল দেখি, জায়গাটা খুঁজে পাই কি না।"

"আবার হারিয়ে যাব না তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। হারাব না। জি.পি.এস. আবিষ্কারের পর পৃথিবী থেকে কেউ কখনো হারিয়ে যায় নি।"

ঝরনাটি খুঁজে বের করতে তাদের ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। পাহাড়ের ওপর থেকে বিশাল একটি জলধারা নিচে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে। চারপাশে ভেজা কুয়াশার মতো পানির কণা, নিচে ঘন বৃক্ষরাজি। বড় একটা গ্রানাইট পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে দুজন ঝরনাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। রিশি বলল, "কী সুন্দর!"

একটি সুন্দর দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে নায়ীরা প্রতিবারই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। এবারে এত সুন্দর একটি দৃশ্য দেখেও রিশির কথার প্রতিধ্বনি তুলে নায়ীরা কিছু বলল না দেখে রিশি একটু অবাক হয়ে ঘুরে নায়ীরার দিকে তাকাল। নায়ীরা এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ-মুখ লালচে এবং মনে হল সে অল্প অল্প কাঁপছে। রিশি অবাক হয়ে বলল, "নায়ীরা, তোমার কী হয়েছে?"

নায়ীরা বলল, "বুঝতে পারছি না। কেমন যেন শীত করছে।" রিশি নায়ীরাকে স্পর্শ করে চমকে উঠল, শরীর উত্তপ্ত, যেন পুড়ে যাচ্ছে। বলল, "সে কী? তোমার তো দেখি অনেক জ্বর। কখন জ্বর উঠেছে?"

"আমি জানি না। এই একটু আগে থেকে শরীর খারাপ লাগতে শুরু করেছে।"

রিশি নায়ীরাকে একটা পাথরের ওপর হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। বলল, "তুমি এখানে বস। দেখি, কী করা যায়।"

ছোটখাটো অসুখের জন্য তাদের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র আছে, কিন্তু সঙ্গে করে কিছু নিয়ে আসে নি। রিশি নায়ীরার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "দেখা যাক, জ্বরটা কতটুকু ওঠে। যদি বেশি ওঠে আমি তোমার জন্য ওপর থেকে ওষুধ নিয়ে আসব।"

"না, না—", নায়ীরা কাতর গলায় বলল, "আমাকে একা ফেলে রেখে যেও না।"

রিশি নায়ীরার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমি যাব না। যদি দেখি তোমার খুব বেশি জ্বর উঠে গেছে, তা হলে তোমাকে পাঁজাকোলা করে ওপরে নিয়ে যাব।"

নায়ীরা রিশির কথা ঠিক বুঝতে পারল বলে মনে হল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে রিশির দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে, ঠোঁটগুলো শুকনো এবং কেমন যেন নীল হয়ে আসছে। নায়ীরা থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। রিশি নিজের জ্যাকেটটা খুলে নায়ীরার শরীরকে ঢেকে দিয়ে তাকে শক্ত করে ধরে রাখে। নায়ীরা চাপা গলায় বিড়বিড় করে কিছু বলল, রিশি ঠিক বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "কী বলছ নায়ীরা?"

নায়ীরা ফিসফিস করে বলল, "আমাকে মেরে ফেলবে।"

"কে তোমাকে মেরে ফেলবে?"

"সবাই মিলে।" নায়ীরা শূন্যদৃষ্টিতে রিশির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার শরীরে ওরা বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

নায়ীরা জ্বরের ঘোরে কথা বলছে, তবুও রিশি কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করল। বলল, "কেমন করে বিষ ঢুকিয়েছে?"

"আমাকে অচেতন করে আমার বাম হাতের শিরার ভেতরে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি জানি।"

"তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা করো না নায়ীরা। আমি তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করব।"

নায়ীরা বিড়বিড় করে বলল, "গত পনের বছরে আমার কখনো অসুখ করে নি। আমার কেন এখন অসুখ হল? কেন?"

রিশি নায়ীরাকে শক্ত করে ধরে রেখে বলল, "এটা হয় নায়ীরা। সব মানুষের ছোট–বড় অসুখ হয়। হতে হয়।"

নায়ীরা বিড়বিড় করে বলল, "আমাকে মেরে ফেলবে। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।" তারপর হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে রিশির ঘাড়ে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল।

রিশি সাবধানে নায়ীরাকে পাথরের ওপর শুইয়ে দিয়ে ঝরনা থেকে আঁজলা করে পানি নিয়ে এসে ভেজা কাপড় দিয়ে তার মুখ, হাত–পা মুছে দেয়। তার নাড়ি, নিশ্বাস স্বাভাবিক। জ্বরটুকু কমিয়ে দিতে পারলেই কোনো বিপদের ঝুঁকি থাকে না। কিন্তু রিশি কিছুই করতে পারছে না। সে নায়ীরার হাত ধরে বসে রইল।

ধীরে ধীরে নায়ীরার জ্বর আরো বাড়তে থাকে। ছটফট করতে করতে কাতর গলায় তার বোনদের ডাকতে থাকে সে। আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করে। তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। একসময় শরীরে অপ্রতিরোধ্য এক ধনের খিঁচুনি শুরু হয়ে যায়। রিশি নায়ীরাকে শক্ত করে ধরে রেখে তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, "নায়ীরা একটু সহ্য কর। একটু সহ্য কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখো, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে—সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

সমস্ত শরীরে খিঁচুনি দিতে দিতে একসময় হঠাৎ নায়ীরার শরীর অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে। রিশি তার হৃৎস্পন্দন, নিশ্বাস–প্রশ্বাসের গতি পরীক্ষা করে দেখে, তার সারা শরীর ঘামতে শুরু করেছে। নায়ীরার ওপর থেকে রিশি নিজের জ্যাকেটটি সরিয়ে নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জ্বর নামতে শুরু করে। রিশি নায়ীরার মাথার কাছে বসে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক পর নায়ীরা চোখ মেলে তাকাল। রিশি তার ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "এখন কেমন লাগছে নায়ীরা?"

নায়ীরা ফিসফিস করে বলল, "ভালো।"

"চমৎকার। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।" রিশি জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি আগে কখনো এরকম জ্বর উঠেছিল?"

"না।"

"জ্বরের ঘোরে তুমি তোমার শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা বলছিলে। কথাটা কি তোমার মনে আছে?"

নায়ীরা মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে।"

"কেন বলছিলে সেটা?"

নায়ীরা তার বাম হাত বের করে একটা লাল বিন্দুকে দেখিয়ে বলল, "এই যে এখানে দেখ। এখান দিয়ে তারা আমার শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

রিশি বিন্দুটা ভালো করে পরীক্ষা করল। সেখানে একটা সুচ ঢুকানো হয়েছিল, এত দিন পরেও সেটা বোঝা যাচ্ছে।

রিশি বলল, "তোমার শরীরে কেন বিষ ঢোকাবে?"

"আমি জানি না।"

রিশি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুমি অসুস্থ। তুমি কি টেহলিস শহরের যাত্রা শুরু করতে চাও? নাকি আমরা ফিরে যাব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না।" নায়ীরা মাথা নাড়ল, "আমি ফিরে যেতে চাই না। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"আমার এখন নিজেকে অসুস্থ মনে হচ্ছে না।"

নায়ীরা উঠে দাঁড়াল। ঝরনার জলধারার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "ইস! কী সুন্দর।"

রিশি বলল, "আমাদের এখন যেতে হবে নায়ীরা।"

"চল যাই।"

দুজন পাথরে পা রেখে হাঁটতে হাঁটতে ওপরে উঠতে থাকে। রিশি পকেট থেকে তার ছোট ইলেকট্রনিক ডায়েরিটা বের করল। তাকে কখন কী করতে হবে সেখানে লেখা আছে। বিকেল পাঁচটা তিরিশ মিনিট : গ্লাইডারে উড্ডয়ন। তার নিচে ছোট ছোট করে লেখা : "গোপনীয়; অপরাহ্ণ বা বিকেলে নায়ীরার সমস্ত শরীরে খিঁচুনি দিয়ে প্রচণ্ড জ্বর উঠতে পারে। এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। কোনোভাবেই টেহলিস শহরের অভিযান বন্ধ করা যাবে না।"

রিশি নিঃশব্দে তার ইলেকট্রনিক ডায়েরিটা বন্ধ করে পকেটে রেখে দেয়। নায়ীরার সন্দেহটি তা হলে আসলেই সত্যি?

পাহাড়ের চূড়ার দমকা বাতাসে দেখতে দেখতে গ্লাইডারটি ওপরে উঠে গেল। নায়ীরা তার ককপিটে বসে আছে, বেল্ট দিয়ে সিটের সঙ্গে বাঁধা, তারপরেও সে শক্ত করে ককপিটের দেয়াল ধরে রেখেছে। সামনের ককপিটে বসে থাকা রিশি গলা উঁচিয়ে বলল, "ভয় পেও না নায়ীরা, শুরুটাই একটু ঝামেলার। একবার ভেসে গেলে আর কোনো সমস্যা নেই।"

নায়ীরার বুক ধুকধুক করছিল, কিন্তু সে বলল, "আমি ভয় পাচ্ছি না রিশি।"

"চমৎকার। আরেকটু ওপরে উঠে নিই, তখন ছেড়ে দেব।"

গ্লাইডারটি শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে। রিশি আস্তে আস্তে দড়িটি ছাড়ছে আর গ্লাইডারটি ওপরে উঠছে, অনেকটা ঘুড়ি ওড়ানোর মতো। যখন অনেক ওপরে যাবে তখন দড়ির বাঁধন খুলে গ্লাইডারটি মুক্ত হয়ে উড়ে যেতে শুরু করবে।

নায়ীরা তার ককপিট থেকে মাথা বের করে সাবধানে নিচে তাকাল। তারা পাহাড়ের চূড়া থেকে অনেক ওপরে উঠে গেছে। এখান থেকে ঝরনাধারাটিকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, মনে হচ্ছে সরু সাদা একটি সুতো ঝুলছে। নিচের বনাঞ্চল সবুজ গাছে ঢাকা। সামনে বহুদূরে সবুজ প্রান্তর, যেখানে অবমানবেরা তাদের ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। নায়ীরা বুকের ভেতর এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। তারা কি এই ভয়াল উপত্যকা পার হয়ে সত্যিই টেহলিস শহরে যেতে পারবে?

রিশি তার কন্ট্রোল প্যানেলে চোখ রেখে খুব সাবধানে ওপরে উঠে যাচ্ছে। দুই পাশে গ্লাইডারের ডানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, বাতাসে মাঝে মাঝে থরথর করে কাঁপছে। আকাশে সাদা মেঘ, একটু পরেই গ্লাইডারটা ওই সাদা মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাবে। নায়ীরা নিচে তাকাল। তারা এত ওপরে উঠে এসেছে যে পাহাড়ের চূড়াটুকুও আর আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পুরো এলাকাটাই বুঝি একই সমতলের অংশ।

ককপিট থেকে রিশির গলা শোনা গেল, "নায়ীরা, যেটুকু ওঠার কথা উঠে গেছি।"

"এখন তা হলে আমরা রওনা দেব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। দড়িটুকু কেটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্লাইডারটা কিন্তু খানিকটা নিচে নেমে আসবে। ভরশূন্য মনে হবে নিজেকে, ভয় পেও না।"

নায়ীরা হাসার চেষ্টা করল। বলল, "পেলেও তোমাকে বুঝতে দেব না!"

"তোমার যেরকম ইচ্ছে। দেখতে দেখতে গ্লাইডারের বেগ বেড়ে যাবে, ইচ্ছে করলে ককপিটের ঢাকনাটা টেনে দিতে পার।"

"এমনিতেই ভালো লাগছে।"

"বেশ। তুমি কি প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ রিশি। আমি প্রস্তুত।"

"ককপিটটা শক্ত করে ধরে রাখ, আমরা যাচ্ছি।"

পরমুহূর্তে নায়ীরা একটা ঝাঁকুনি অনুভব করে। তারপর হঠাৎ করে তার মনে হতে থাকে সে নিচে পড়ে যেতে শুরু করেছে। নিজেকে তার ভরশূন্য মনে হতে থাকে, মনে হয় সে বুঝি খোলা ককপিট থেকে উড়ে বের হয়ে যাবে। গ্লাইডারটি গতি সঞ্চয় করছে। তার মুখের ওপর সে বাতাসের তীব্র বেগ অনুভব করতে থাকে।

রিশি চিৎকার করে বলল, "তুমি ঠিক আছ নায়ীরা?"

"আছি।"

"চমৎকার।"

গ্লাইডারটি মাথা নিচু করে খানিকটা নিচে নেমে গতি সঞ্চয় করেছে। রিশি এখন এটাকে সোজা করে নেয়। মেঘের ওপর দিয়ে তখন এটা ভেসে যেতে শুরু করে। একটু আগের সেই ভরশূন্য হয়ে উড়ে যাওয়ার অনুভূতিটা নেই। নায়ীরা মুখের ওপর প্রবল বাতাসের ঝাপটা অনুভব করে। সে সামনের ড্রয়ার খুলে এক জোড়া গগলস বের করে চোখে পরে নেয়।

বিকেলের পড়ন্ত আলোতে চারপাশে এক ধরনের মায়াময় পরিবেশ, তার ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে তারা গ্লাইডারে করে আকাশের মেঘের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত বিস্ময়কর একটা অনুভূতি। নায়ীরা ককপিট থেকে মাথা বের করে সাবধানে নিচে তাকাল। অনেক নিচে গাছপালা, বনবাদাড়, সরু সুতার মতো নদী। নায়ীরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। রিশি ককপিটে তার রেডিওটি চালু করে কিছু একটা শুনছে। একটু পর রেডিও বন্ধ করে দিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, "উষ্ণ প্রবাহটি চলে এসেছে। চোখ বন্ধ করে আট শ কিলোমিটার চলে যাব।"

"কতক্ষণ লাগবে?"

"ধরে নাও, সারা রাত।"

"সারা রাত চুপচাপ করে বসে থাকব?"

"বসে থাকতে হবে। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকবে, নাকি কথা বলতে থাকবে—সেটা তোমার ইচ্ছে।"

"বাতাসের জন্য কথা বলা যায় না। চিৎকার করে আর কতক্ষণ কথা বলা যায়?"

রিশি হাসল। বলল, "ঠিকই বলেছ!"

নায়ীরা তার জ্যাকেটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, "তুমি উষ্ণ প্রবাহের কথা বলছ, কিন্তু এখানে তো দেখছি বেশ ঠাণ্ডা।"

"অন্ধকারটা নামুক তখন দেখবে ঠাণ্ডা কাকে বলে। ককপিটের ঢাকনা ফেলে তখন ভেতরে গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নায়ীরা দুই হাত ঘষে একটু গরম হওয়ার চেষ্টা করতে করতে ককপিটে আরাম করে বসে থাকার চেষ্টা করল। মাত্র কয়েক দিন আগেই তার এক ধরনের নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে জীবন ছিল, এখন হঠাৎ করে পুরো জীবনটি পাল্টে গেছে। মাথায় করে সে একটা তথ্য নিয়ে যাচ্ছে টেহলিস শহরে, কথাটা যদিও সে বিশ্বাস করে না। তবে সে যে কিছু একটা নিয়ে যাচ্ছে, সে কথাটি সত্যি। কী নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে—কে জানে! নায়ীরা দূরে অস্তায়মান সূর্যের দিকে তাকাল। নিচে বিস্তীর্ণ বনভূমিতে এখন নিশ্চয়ই অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশের কাছাকাছি সূর্যটা যাই যাই করেও যেতে পারছে না। চারপাশে সাদা মেঘে সূর্যের রশ্মিটুকুকে কী অপূর্বই না দেখায়! সে কি কখনো ভেবেছিল, তার ধরাবাঁধা ক্লোন-জীবনে কখনো এরকম একটি দৃশ্য দেখার সুযোগ পাবে?

হঠাৎ বহুদূর থেকে গুম গুম শব্দ ভেসে আসে। নায়ীরা চমকে উঠে বলল, "কিসের শব্দ?"

রিশি দূরে তাকানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "জানি না, মনে হয় অবমানব গোলাগুলি শুরু করেছে।"

"আমাদের গুলি করেছে?"

"না। অনেক দূর থেকে শব্দ আসছে। আমাদের দিকে নয়।"

"আমাদের কি ওরা গুলি করতে পারে?"

"সম্ভাবনা খুব কম। অন্ধকার নেমে আসছে, আমাদের আর দেখা পাবে না। নিরাপত্তার জন্য আমরা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন পর্যন্ত ব্যবহার করছি না।"

নায়ীরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষ আর মানুষ যদি যুদ্ধ না করত তা হলে পৃথিবীটা কী সুন্দর হত, তাই না রিশি।"

"হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ।"

"রিশি, তোমার কি মনে হয় যে, একদিন মানুষ এত উন্নত হবে যে তারা বুঝতে পারবে যুদ্ধবিগ্রহ করার কোনো অর্থ নেই। তারা একজনের সঙ্গে আরেকজন যুদ্ধ করবে না?"

"আমার মনে হয় হবে। নিশ্চয়ই হবে।"

AMARBOI.COM

দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল। আকাশে আধখানা চাঁদ এবং অসংখ্য নক্ষত্র। নায়ীরা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবী থেকে কত লক্ষ কোটি মাইল দূরে ওই নক্ষত্রগুলো, সেখানে কি পৃথিবীর মতো কোনো গ্রহ আছে? সেই গ্রহে কি মানুষের মতো কোনো প্রাণী আছে? সেই প্রাণী কি এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে একই কথা ভাবছে? নায়ীরা অকারণে নিজের ভেতরে এক ধরনের শিহরন অনুভব করে।

গ্লাইডারটি হঠাৎ মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁপতে শুরু করে। নায়ীরা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হল?"

"কিছু না। আমি গতিপথটা একটু পরিবর্তন করছি।"

"রিশি।"

"বলো।"

"গ্লাইডার চালানো কি খুব কঠিন?"

"একেবারেই কঠিন না। এটা নিজে ভেসে থাকে। পাখাগুলো নাড়াচাড়া করে গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।"

"বিজ্ঞান কেন্দ্রের একজন বলেছিল, তুমি নাকি পৃথিবীর সেরা গ্লাইডার পাইলট!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিশি শব্দ করে হেসে বলল, "ঠাট্টা করে বলেছে। কারণ কাজটা এত সোজা যে, এর মধ্যে সেরা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।" রিশি হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে বলল, "তুমি গ্লাইডার চালানো শিখতে চাও?"

নায়ীরা অবাক হয়ে বলল, "কে? আমি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি কেমন করে শিখব?"

"তুমি যদি সাহস করে ফিউজলেজের ওপর দিয়ে আমার ককপিটে চলে আস আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

"আমি ফিউজলেজের ওপর দিয়ে চলে আসব?"

"হ্যাঁ। ককপিটে যথেষ্ট জায়গা আছে। একটু চাপাচাপি হবে কিন্তু দুজন বসতে পারব।"

নায়ীরা উত্তেজিত গলায় বলল, "তুমি সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ। আমি সত্যি বলছি। তবে খুব সাবধান, পড়ে যেও না যেন। তা হলে বিজ্ঞান কেন্দ্রের লোকজন আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।"

নায়ীরা সিটবেল্ট খুলে নিজেকে মুক্ত করতে করতে বলল, "আমি পড়ব না।"

ককপিট থেকে শরীরটা বের করে ফিউজলেজটা আঁকড়ে ধরে নায়ীরা সাবধানে সামনে অগ্রসর হতে থাকে, বাতাসে তার চুল উড়ছে, ভয়ে সে নিচে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। মনে হতে থাকে একটু অসাবধান হলেই বুঝি বাতাস তাকে উড়িয়ে নেবে।

কিন্তু সেরকম কিছু হল না, রিশির কাছাকাছি আসতেই সে হাত বাড়িয়ে খপ করে নায়ীরাকে ধরে ফেলে তারপর শক্ত হাতে তাকে টেনে ককপিটে ঢুকিয়ে নেয়। নায়ীরা ছেলেমানুষের মতো খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, "কী মজা হল, তাই না?"

"পড়ে গেলে মজাটা বের হত! অবমানবেরা যখন দেখত আকাশ থেকে পরী নেমে আসছে, কী অবাক হত বলো দেখি!"

"কিন্তু সেই পরী তো উড়তে উড়তে নামত না, ঢেলার মতো পড়েই থেঁতলে যেত!"

"এগুলো হচ্ছে ছোটখাটো খুঁটিনাটি। উড়ে উড়ে নামলেও পরী, ঢেলার মতো নামলেও পরী। আকাশ থেকে ফুটফুটে একটা মেয়ে নামছে, সেটাই হচ্ছে বড় কথা।"

নায়ীরা কৌতূহল নিয়ে ককপিটের দিকে তাকাল। ভেতরে অনেকগুলো মিটার জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। রিশি তার একটা দেখিয়ে বলল, "এই যে এটা দেখাচ্ছে আমরা কত উঁচুতে আছি, আর এটা দেখাচ্ছে আমাদের গতিবেগ। এই এটা দেখাচ্ছে আমরা কোনদিকে যাচ্ছি। আমরা কোনদিকে যেতে চাই সেটা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যখন সেটা থেকে একটু সরে যায় আমাকে আবার নিজের হাতে আবার ঠিক করে নিতে হয়।"

রিশি একটা একটা করে নায়ীরাকে দেখিয়ে দেয়। নায়ীরা কৌতূহল নিয়ে দেখে, রিশির অনুমতি নিয়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্লাইডারটা উড়িয়ে নেওয়ার ছোটখাটো বিষয়গুলো সে শিখে যায়। রিশি তাকে উড়িয়ে নিতে দেয় এবং নায়ীরা ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে গ্লাইডারটি উড়িয়ে নিয়ে যায়।

ছোট ককপিটে দুজন পাশাপাশি বসেছে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। রিশি তাই ককপিটের ঢাকনাটা টেনে দেয়। কিছুক্ষণের ভেতরই ভেতরে একটা আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে। রিশি সামনের ড্রয়ার খুলে তাদের শুকনো খাবারের প্যাকেট বের করে, দুজনে খেতে খেতে হালকা গলায় গল্প করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নায়ীরা তার কফির মগে একটা চুমুক দিয়ে ডান দিকের একটা স্ক্রিন দেখিয়ে বলল, "এটা কী?"

"একটা ভিডিওস্ক্রিন। কেন রেখেছে বুঝতে পারছি না। চালু করার চেষ্টা করেছি, কোনো লাভ হয় নি।"

নায়ীরা উচ্চতার মিটারটির দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব ধীরে ধীরে আমাদের উচ্চতা কমে আসছে রিশি।"

"তুমি ঠিক করে নাও।"

নায়ীরা উচ্চতা বাড়ানোর জন্য গ্লাইডারের পাখাগুলো ঠিক করার চেষ্টা করে বলল, "এখন আগের উচ্চতায় ফিরে এসেছি, কিন্তু আমাদের গতিবেগ কমে এসেছে।"

"যেটুকু কমেছে সেটা এমন কিছু নয়।"

"কিন্তু কেন এরকম হচ্ছে?"

রিশি একটু হেসে বলল, "এটা অসম্ভব হালকা গ্লাইডার। এর কোথায় কতটুকু ওজন হবে সেটা একেবারে গ্রাম পর্যন্ত হিসাব করা আছে। তোমাকে সামনে নিয়ে আসায় ককপিটটায় ওজন বেশি হয়ে গেছে। তাই গ্লাইডারের ওজনের ব্যালেন্স ঠিক নেই, আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসছে।"

নায়ীরা চিন্তিত মুখে বলল, "তা হলে আমি পেছনে আমার ককপিটে চলে যাই।"

"কোনো তাড়াহুড়ো নেই। ধীরেসুস্থে যেও।" রিশি হঠাৎ কী মনে করে বলল, "তার চেয়ে আরেকটা কাজ করা যাক।"

"কী কাজ?"

"তুমি এই ককপিটে বস। আমি পেছনে তোমার ককপিটে বসি।"

"কিন্তু যদি হঠাৎ করে কিছু হয়?"

"কী আর হবে?" রিশি শব্দ করে হেসে বলল, "এটা একটা গ্লাইডার, গাছের পাতা যেরকম বাতাসে ভাসতে ভাসতে নামে, এটাও সেরকম ভাসতে ভাসতে নেমে যাচ্ছে! এর মধ্যে হঠাৎ করে কিছু হওয়ার নেই।"

"ঠিক আছে", নায়ীরা খুশি হয়ে বলল, "আমি তা হলে তোমার ককপিটে বসছি। তুমি আমার ককপিটে যাও।"

রিশি ককপিট থেকে বের হয়ে ফিউজলেজের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে নায়ীরার ককপিটে গিয়ে বসে যায়।

AMARBOI.COM

ককপিটে বসে নায়ীরা গ্লাইডারটিকে কখনো ওপরে কখনো নিচে নামিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। বাতাসের প্রবাহের কারণে কখনো কখনো গতিবেগের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল, নায়ীরা সেটাও ঠিক করে নিতে শিখেছে। ককপিটে বসে সে দেখতে দেখতে প্রায় দুই শ কিলোমিটার উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। বাইরে নিশুতি রাত। চাঁদটি পশ্চিম দিকে খানিকটা ঢলে পড়েছে। জ্যোৎস্নার নরম আলোয় গ্লাইডারটিকে একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো দেখায়। নিচে, বহু নিচে অবমানবেরা হিংস্র চোখে হয়তো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। নায়ীরা একবার পেছনে ফিরে রিশিকে দেখার চেষ্টা করল। রিশি ককপিটে শান্তভাবে বসে আছে, এই কনকনে শীতেও তার ককপিটের ঢাকনা খোলা, বাতাসে তার চুল উড়ছে। নায়ীরা রিশিকে উদ্দেশ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ছোট একটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে রিশি ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে ওঠে। নায়ীরা শুনতে পেল রিশি একটা কাতর

আর্তনাদের মতো শব্দ করেছে। নায়ীরা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "রিশি, কী হয়েছে রিশি?"

রিশি তার কথার উত্তর দিল না। নায়ীরা আবার ডাকল, "রিশি। রিশি—"

রিশি এবারেও তার কথার উত্তর দিল না, শুধু একটা চাপা আর্তনাদের মতো শব্দ করল। এক মুহূর্তের জন্য ভয়ে আতঙ্কে নায়ীরার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, অনেক কষ্টে সে নিজেকে শান্ত করল। ফিউজলেজের ওপর উঠে সে রিশির ককপিটে এগোতে এগোতে বলল, "আমি আসছি রিশি।"

গ্লাইডারটি দুলছে, সামনের ককপিটটি সম্ভবত কখনো খালি রাখার কথা নয়, কিন্তু এখন সেটি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। পেছনের ককপিটের কাছাকাছি গিয়ে নায়ীরা আবার ডাকল, "রিশি।"

ককপিটের ভেতর থেকে রিশি গোঙানোর মতো শব্দ করে বলল, "কাছে এস না নায়ীরা।"

"কেন?"

"এই ককপিটটাতে বুবি ট্র্যাপ বসানো।"

"কী বসানো?"

"বুবি ট্র্যাপ। আমি মারা যাচ্ছি নায়ীরা।"

নায়ীরা আর্তনাদ করে বলল, "কী বলছ তুমি?"

গ্লাইডারটি খুব খারাপভাবে দুলছে, তার মধ্যেই নায়ীরা আরো একটু অগ্রসর হয়ে গেল। রিশি চাপা স্বরে বলল, "খবরদার নায়ীরা, কাছে এস না। খবরদার।"

জ্যোৎস্নার আলোয় নায়ীরা অস্পষ্টভাবে রিশিকে দেখতে পায়। তার শরীরে ছোপ ছোপ কালো রঙ। আসলে রঙটি কালো নয়, সেটা যে রক্তের ছোপ সেটা বুঝতে নায়ীরার একটুও দেরি হয় না।

"তোমার এখানে থাকার কথা ছিল।" রিশি ফিসফিস করে বলল, "এখানে তোমাকে হত্যা করার কথা ছিল। তুমি বেঁচে গেছ নায়ীরা—"

নায়ীরা আর্তনাদ করে বলল, "না। আমি বাঁচতে চাই না —"

"নায়ীরা, তোমাকে বাঁচতে হবে। তোমাকে টেহলিস শহরে যেতে হবে। আমার জ্যাকেটের পকেটে—"

রিশি তার কথা শেষ করতে পারল না, জ্যোৎস্নার আবছা আলোতে হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকের মতো কিছু একটা রিশির দিকে ছুটে যায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা আর্তনাদ করে হঠাৎ রিশি নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

নায়ীরা ফিউজলেজে শুয়ে আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ডাকল, "রিশি, রিশি। আমার রিশি!"

মাটি থেকে পাঁচ হাজার মিটার ওপরে গ্লাইডারটি বিপজ্জনকভাবে দুলতে দুলতে নিচে নেমে আসতে থাকে। তার ফিউজলেজে শুয়ে পনের বছরের কিশোরী একটা মেয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। পৃথিবীর কোনো মানুষ সেই মেয়েটির অসহায় কান্নার শব্দ শুনতে পায় না।

নায়ীরা ককপিটে পাথরের মতো বসে আছে। গ্লাইডারটি খুব ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে, সেটাকে ওপরে নেওয়া দরকার, কিন্তু নায়ীরা তার চেষ্টা করে না। দক্ষিণ দিক থেকে একটা বাতাস এসে গ্লাইডারটাকে তার গতিপথ থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে, নায়ীরা সেটাও

ঠিক করার চেষ্টা করল না—এখন কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। ঠিক তখন খুট করে ককপিটে একটা শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল প্যানেলের ভিডিও মনিটরটি জ্বলে ওঠে। রিশি বলেছিল সে এটা চালু করার চেষ্টা করেছিল লাভ হয় নি। এখন নিজে নিজেই এটা চালু হয়েছে। সেখানে প্রথমে কয়েকটি সংখ্যা ভেসে আসে, তারপর সংখ্যাগুলো সরে গিয়ে একটা নীল আলো দেখা দেয়। প্রথমে এক ধরনের যান্ত্রিক শব্দ এবং তারপর হঠাৎ একজন মানুষের ছবি ভেসে আসে। নায়ীরা মানুষটিকে চিনতে পারে, বিজ্ঞান কেন্দ্রের পরিচালক রুবা।

রুবা তার কঠিন মুখে জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "যদি সবকিছু আমাদের পরিকল্পনা মতো ঘটে থাকে, তা হলে রিশি তুমি সামনের ককপিটে বসে আছ এবং খানিকটা বিস্ময় নিয়ে বোঝার চেষ্টা করছ পেছনের ককপিটে এইমাত্র কী ঘটে গেল। যদি তোমাকে আমরা ঠিকমতো বুঝে থাকি তা হলে তুমি সম্ভবত খানিকটা ক্ষুব্ধ। তিন শ নয় নম্বর ক্লোন মেয়েটি—যে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে নায়ীরা বলে ঘোষণা করে আসছে, তাকে কেন আকাশের এত ওপরে রক্তক্ষরণে নিঃশেষিত করা হল, তুমি নিশ্চয়ই সেটি বোঝার চেষ্টা করছ। ক্লোন তিন শ নয় নিজেকে একটি নাম দিয়ে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার কোনো নাম পাওয়ার অধিকার নেই। সে একটি ক্লোন এবং যেখান থেকে আমরা তাকে এনেছি সেখানে হুবহু তার মতো আরো দশটি ক্লোন রয়েছে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রয়োজনে এই ক্লোনদের প্রস্তুত করা হয় এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রয়োজনে তাদের খরচ করা হয়।

"বিজ্ঞান কেন্দ্রে আমরা লক্ষ করেছি তিন শ নয় নম্বর ক্লোনের জন্য তোমার খানিকটা মমতার জন্ম হয়েছিল। আমরা সেটাকে অস্বাভাবিক মনে করি না। বাড়ির পোষা কুকুরের জন্য যদি মমতা জন্ম নিতে পারে, তা হলে একটি ক্লোনের জন্য মমতার জন্ম হবে না কেন? তবে আমরা নিশ্চিত, তুমি আমাদের সকল মানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজনে একটি ক্লোনকে ব্যবহার করার বিষয়টিকে নিশ্চয়ই খোলামনে দিয়ে গ্রহণ করবে।

"আমরা কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি আমাদের ওপর ব্যবহার করার জন্য অবমানবরা একটি মানববিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করেছে। তাদের যে কোনো মূল্যে নিবৃত্ত করতে হবে। সেজন্য তারা আঘাত করার আগেই আমরা তাদের আঘাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের ল্যাবরেটরিতে আমরা একটি ভাইরাস তৈরি করেছি, যেটি তাদের পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। এই ভাইরাসটির বিশেষত্ব এই যে, সেটি আমাদের আক্রান্ত করতে পারবে না। এই ভাইরাস শুধু অবমানবদের আক্রান্ত করবে। এই ভাইরাসের সংক্রমণের পর অবমানবরা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে ব্যাকটেরিয়ার মতো অত্যন্ত দ্রুত মৃত্যুবরণ করবে। ভাইরাসটি দিয়ে সঠিকভাবে তাদের আক্রমণ করতে পারলে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতরে অবমানব প্রজাতির পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা। আমরা অবমানবদের নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীকে একটি নিরাপদ বাসস্থান হিসেবে রেখে যেতে চাই।

"পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসস্থান হিসেবে রাখার জন্য আমরা ক্লোন তিন শ নয়কে ব্যবহার করছি। আমরা তার শরীরের ভেতরে ভাইরাস জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তার শরীরটিকে ব্যবহার করে কোটি কোটি ভাইরাসের জন্ম দেওয়া হয়েছে। আজ দুপুরে শরীরের কোষ ভেঙে সেগুলো তার রক্ত-স্রোতে মিশে গেছে। সেই সময়টিতে খিঁচুনি দিয়ে তার সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড তাপমাত্রার জন্ম হয়েছিল। ক্লোন তিন শ নয় সেই মুহূর্ত থেকে অবমানবদের জন্য একটি ভয়াবহ মারণাস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছুক্ষণ আগে সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করী মারণাস্ত্রটি অতিমানবদের ওপর নিক্ষেপ করা হয়েছে। পদ্ধতিটি খুব সহজ—গ্লাইডারের ককপিটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ ধমনিগুলো কেটে দেওয়া। তার শরীরের রক্ত গ্লাইডারের বিশেষ টিউব দিয়ে নিচের বায়ুমণ্ডলে মিশে গেছে। উষ্ণ বায়ুপ্রবাহে সেটি অবমানবদের এলাকায় পৌঁছে যাবে। আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতরে প্রকৃতির সবচেয়ে ভয়ংকর এবং বিপজ্জনক পরীক্ষা—অবমানব প্রজন্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

"রিশি, আমি নিশ্চিত তুমি বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ। তোমার প্রতি আমাদের জরুরি নির্দেশ, তুমি ক্লোন তিন শ নয়ের মৃতদেহ নিয়ে গ্লাইডারটিকে নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করাও। গ্লাইডারে রাখা বিকনটি চালু করা হলে তোমাকে উদ্ধার করা হবে।

"আমরা আশা করছি ক্লোন তিন শ নয়ের মৃত্যুর বিষয়টিকে তুমি সহজভাবে নেবে। ভাইরাসে ভরা তার রক্ত অবমানবদের এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এ ছাড়া অন্য কোনো সহজ উপায় ছিল না। শুধু মানবদেহেই এই ভাইরাসটি সজীব থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। তাকে এই প্রক্রিয়ায় হত্যা করা না হলেও আগামী দুই সপ্তাহে তার মৃত্যু ঘটত। এই ভাইরাস আমাদের আক্রান্ত করে না, কিন্তু ক্লোন তিন শ নয়ের দেহের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি অঙ্গ ভাইরাসের জন্মের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যে তিন শ নয় নম্বর ক্লোনটি আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করত, সেটি এখন মৃত্যুবরণ করেছে। এটাই পার্থক্য।

"বিদায় রিশি। তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমরা তোমার সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করব।"

খুট করে ভিডিও মনিটরটি বন্ধ হয়ে গেল। নায়ীরা তখনো নিষ্পলক দৃষ্টিতে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখে মনে হয়, তার আশপাশে কী ঘটছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

খুব ধীরে ধীরে নায়ীরা পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারে। ভয়ংকর অবমানবদের ভাইরাস দিয়ে হত্যা করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে, তার রক্তের মধ্যে রয়েছে সেই ভাইরাস। ঘটনাক্রমে সেই ভাইরাস এখনো মুক্ত হয় নি। রিশির প্রাণের বিনিময়ে অবমানবেরা বেঁচে গেছে, কিন্তু সেটি নিশ্চয়ই সাময়িক। বিজ্ঞান কেন্দ্র যখন জানতে পারবে তারা আবার চেষ্টা করবে, সফল না হলে আবার। আজ হোক কাল হোক পৃথিবী থেকে অবমানবদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। পৃথিবী হবে একটি নিরাপদ স্থান।

সেটি এখনো নিরাপদ হয় নি, তা হলে কি তার নিজের প্রাণ দিয়ে পৃথিবীকে নিরাপদ করা উচিত? ধারালো একটা চাকু দিয়ে তার হাতের ধমনি কেটে দেওয়া উচিত, যেন তার শরীরের ভেতরে বাস করা কোটি কোটি ভাইরাস কিলবিল করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে? নায়ীরা তার হাতের দিকে তাকাল, না, সে নিজের হাতের ধমনি কাটতে পারবে না। দু সপ্তাহ পর সে এমনিতেই মারা যাবে জেনেও সে এখন নিজেকে হত্যা করতে পারবে না। যত ভয়ংকরই হোক, মানবপ্রজাতির একটি অপভ্রংশকে সে এভাবে নিঃশেষ করতে পারবে না। সে খুব সাধারণ একটি মেয়ে। একটি প্রজাতিকে পৃথিবী থেকে পুরোপুরি অপসারণ করার মতো এত বড় একটি সিদ্ধান্ত সে নিতে পারবে না। কিছুতেই সে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

নায়ীরা একটা নিশ্বাস ফেলে ঠিক করল, সে বেঁচে থাকবে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে রিশি তাকে বলেছে, তাকে বেঁচে থাকতে হবে। তার জ্যাকেটের পকেটে কিছু একটা আছে, সেটা তাকে দেখতে হবে। সেটা না দেখে সে মারা যাবে না। কিছুতেই মারা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নায়ীরা একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে সোজা হয়ে বসে। এই গ্লাইডারটাকে এখন সে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ঠিক যেভাবে ভাসিয়ে নেওয়ার কথা। তারপর এটাকে ঠিক জায়গায় সে নিচে নামিয়ে আনবে, ঠিক যেভাবে নামিয়ে আনার কথা। তারপর সে যাবে টেহলিস শহরের দিকে, ঠিক যেভাবে তার যাওয়ার কথা। হতে পারে সেটি অসম্ভব, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তার শরীরে মৃত্যু বাসা বেঁধেছে, তার আর কোনো কিছুতে ভয় পাওয়ার নেই। সে আর কোনো কিছুতে ভয় পাবে না।

দীর্ঘ একটি রাত শেষ হয়ে যখন পূর্ব আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে, উঁচু গাছের কচি পাতায় যখন ভোরের সূর্যের সোনালি রোদ স্পর্শ করেছে, তখন অতিকায় একটি ফিনিক্স পাখির মতো ধবধবে সাদা গ্লাইডারটি নিঃশব্দে নিচে নেমে এল। চাকার ওপর ভর করে সোজা সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে একসময় সেটি থেমে যায়।

নায়ীরা তার ককপিট থেকে নিচে নেমে আসে। সে এখন অবমানবের এলাকায়। হয়তো এই মুহূর্তে কোনো একজন অবমানব তার ভয়ংকর বিকৃত চেহারা নিয়ে, তার তিনটি চোখ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো হাতের সাত আঙুল দিয়ে ধরে রাখা কোনো ভয়ংকর অস্ত্র তার দিকে তাক করে রেখেছে, অদৃশ্য কোনো বুলেট তার মস্তিষ্ককে বিদীর্ণ করে দেবে, নিজের অজান্তে তার শরীরের লক্ষ–কোটি ভাইরাস কিলবিল করে তাদের ধ্বংস করার জন্য ছড়িয়ে পড়বে। নায়ীরা কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো বুলেট তার মস্তিষ্ককে বিদীর্ণ করে দিল না। ভয়ংকর অস্ত্র হাতে দুই মাথার কোনো দানবও ছুটে এল না। নায়ীরা তখন পেছনের ককপিটে গিয়ে ভেতরে তাকাল। সিটবেল্টে বাঁধা রিশির মৃতদেহ রক্তশূন্য এবং বিবর্ণ। ঠোঁট দুটো নীল, চোখ আধখোলা। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। নায়ীরা ফিসফিস করে বলল, "আমি দুঃখিত রিশি। আমি খুব দুঃখিত।"

রিশি বলেছিল তার জ্যাকেটের পকেটে কিছু একটা আছে, সে যেন সেটা দেখে। নায়ীরা সাবধানে জ্যাকেটের পকেটে হাত দেয়, সেখানে দুমড়ানো একটা খাম। নায়ীরা খামটি খুলে দেখে ভেতরে খবরের কাগজের এক টুকরো কাগজ। সেখানে ছোট একটা খবর, নায়ীরা ফিসফিস করে সেটা পড়ল :

মহাকাশ-বিজ্ঞানী নীরা ত্রাতিনা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত

কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানী নীরা ত্রাতিনাকে (৪২) সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, নীরা ত্রাতিনা একাধিকবার দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযানে অংশ নিয়েছেন এবং মহাকাশে নিউক্লিয়াসের বিশ্লেষণ সম্পর্কে তার মৌলিক গবেষণা কাজ রয়েছে। যৌবনে মহাকাশে এক দুর্ঘটনায় তার প্রিয় সহকর্মীর মৃত্যুর পর তিনি তার একাকী নিঃসঙ্গ জীবন মহাকাশ গবেষণায় অতিবাহিত করেন।

ছোট খবরটির ওপরে বিজ্ঞানী নীরা ত্রাতিনার একটি ছবি। নায়ীরা নিশ্বাস বন্ধ করে বিজ্ঞানী নীরা ত্রাতিনার ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। ছবিটি তার নিজের। তার থেকে একটু বয়স

বেশি, কিন্তু মানুষটি যে সে নিজে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার কালো চুল, তার চোখ, ঠোঁটের কোনায় তার হাসি। রিশি টেবিলের ওপর থেকে একবার তার একটি চুল তুলে নিয়েছিল, সেখান থেকে তার ডিএনএ প্রোফাইল বের করে নিশ্চয়ই নীরা ত্রাতিনাকে খুঁজে বের করেছে।

কী আশ্চর্য! মহাকাশ-বিজ্ঞানী নীরা ত্রাতিনা কি জানে তার ক্লোন করা হয়েছে? সে কি জানে তার দুঃসাহসী অস্তিত্বকে এখন ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হয়? যদি জানত তা হলে সে কী করত?

নায়ীরা কাগজের টুকরোটি পকেটে রেখে সাবধানে রিশির দেহটি মুক্ত করে নিচে নামিয়ে আনে। এই মানুষটির মৃতদেহ একটি সম্মানজনক শেষকৃত্য দাবি রাখে। একজন মানুষের মৃতদেহকে কেমন করে সমাহিত করতে হয় সে জানে না। তবু সে চেষ্টা করবে। মাটিতে গর্ত করে সে রিশিকে সেখানে শুইয়ে দেবে। সমাধির ওপরে একটি পাথর রেখে সেখানে লিখে দেবে, "রিশি : পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ।"

নায়ীরা গ্লাইডার থেকে একটা শাবল নিয়ে ছায়াঢাকা একটি সুন্দর জায়গায় মাটি কাটতে থাকে। সে আগে কখনো মাটি কাটে নি, মাটি কাটতে এত কষ্ট সে জানত না। নিঃশব্দে সে শাবল দিয়ে গর্ত করতে থাকে, তাকে খুব সাবধান থাকতে হবে যেন কোনোভাবে শরীরের কোথাও কেটে না যায়। শরীর থেকে যেন এক ফোঁটা রক্তও বের হয়ে না আসে—একটি প্রজাতিকে সে ধ্বংস করতে চায় না। সে প্রজাতি যত ভয়ংকর প্রজাতিই হোক।

রিশির দেহটিকে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার আগে নায়ীরা তাকে শেষবারের মতো স্পর্শ করে ফিসফিস করে বলল, "রিশি। বিদায়। তুমি কোথায় গিয়েছ আমি জানি না। তবে সেখানে আমি আসছি। দু সপ্তাহের মধ্যেই আসছি।"

পুরো দেহটি মাটি দিয়ে ঢেকে সে যখন উঠে দাঁড়াচ্ছে ঠিক তখন তার নজরে পড়ল গাছের নিচে এক জোড়া পা। কোনো একজন মানুষ নিঃশব্দে তাকে দেখছে। নায়ীরা খুব ধীরে ধীরে চোখ তুলতে থাকে—পা, দেহ এবং সবশেষে মাথা। নায়ীরা এর আগে অনেকবার অবমানবের বর্ণনা শুনেছে, কিন্তু নিজের চোখে প্রথমবার একজন অবমানব দেখে নায়ীরা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। বিকৃত কুঞ্চিত ভয়ংকর একটি মুখমণ্ডল, দুটি চোখ ঠেলে বের হয়ে এসেছে। নাক নেই, সেখানে গলিত একটি গর্ত। ঠোঁটহীন একটি মুখ, ধারালো দাঁতের পেছনে লকলকে লাল জিব। মুখ থেকে আঠালো লালা ঝরছে। তীব্র ক্রূর দৃষ্টিতে কুৎসিত অবমানবটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

নায়ীরা আতঙ্কে চোখ বন্ধ করল। এই ভয়ংকর প্রাণীটির দিকে সে তাকাতে পারবে না। কিছুতেই পারবে না। নায়ীরা চোখ বন্ধ করে হাঁটু গেড়ে বসে রইল। প্রাণীটি তাকে আঘাত করুক, তাকে হত্যা করুক। সে রিশির পাশে প্রাণ হারিয়ে শুয়ে থাকবে। কিন্তু সে আর চোখ খুলবে না। কিছুতেই চোখ খুলবে না।

"তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?"

অবমানবটির কথা শুনে নায়ীরা চমকে ওঠে। ভয়ংকর চেহারার এই প্রাণীটির গলার স্বর ভরাট এবং স্পষ্ট। উচ্চারণ একটু অন্যরকম, কিন্তু কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। নায়ীরা দু হাতে মুখ ঢেকে রইল, তার কথা বলার শক্তি নেই।

"চোখ তুলে তাকাও মেয়ে।"

নায়ীরা ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে তাকায়। ভয়ংকর প্রাণীটি তার দিকে এগিয়ে আসে, তারপর গলার কাছে হাত দিয়ে নিজের মুখোশটি খুলে নেয়। মুখোশের নিচে অনিন্দ্যসুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন তরুণের মুখ, নীল চোখ, খাড়া নাক, কুচকুচে কালো চুল। তরুণটি একটু এগিয়ে এসে বলল, "তুমি কি আমার মুখোশ দেখে ভয় পেয়েছ? আমি দুঃখিত। খুব দুঃখিত।"

নায়ীরা কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে এই অনিন্দ্যসুন্দর তরুণের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ধাতস্থ হতে একটু সময় নেয়। বুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি মুখে এই মুখোশটি পরেছিলে কেন?"

তরুণটি অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একটু হেসে বলল, "এখানে কেউ নেই। আমি একা। মানুষ একা থাকলে অদ্ভুত অনেক কিছু করে। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"আমি হরিণ কিংবা একটা পাহাড়ি ছাগল শিকার করতে এসেছি।"

"শিকার?" নায়ীরা অবাক হয়ে বলল, "আমি জানতাম মানুষ প্রাচীনকালে শিকার করত। এখনো করে?"

সুদর্শন তরুণটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমাদের মাঝে মাঝে করতে হয়। তখন আমি এখানে আসি।"

"ও। আচ্ছা।"

"শিকার করার সময় আমি এই মুখোশটা মুখে পরে নিই।"

"কেন?"

"হরিণ কিংবা পাহাড়ি ছাগলের মতো সুন্দর একটা প্রাণীকে হত্যা করতে আমার খুব খারাপ লাগে। তখন আমি মুখে এই মুখোশটা পরে নিয়ে ভান করি যে আমি আমি না। আমি অন্য কেউ। একটা দানব।"

নায়ীরা একটু অবাক হয়ে এই বিচিত্র তরুণটির দিকে তাকিয়ে রইল। এই তরুণটি কি অবমানব? অবমানব সম্পর্কে কত ভয়ংকর কথা শুনেছে কিন্তু তরুণটিকে তো মোটেও ভয়ংকর মনে হচ্ছে না। একটু বিচিত্র কিন্তু মোটেও ভয়ংকর নয়।

তরুণটি এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর সরিয়ে নিয়ে বলল, "তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

নায়ীরা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর কেমন করে দেব জানি না। কারণ এর কোনো উত্তর নেই। আমি কেউ না। আমার কোনো নাম পর্যন্ত নেই। আমি নিজের জন্য একটা নাম ঠিক করেছি, সেই নামে আমাকে কেউ ডাকে না। একজন ডাকত, তাকে আমি এখানে কবর দিয়েছি।"

তরুণটি বিস্মিত হয়ে বলল, "এখানে কবর দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

তরুণটি শিস দেওয়ার মতো এক ধরনের শব্দ করে বলল, "আমি দুঃখিত যে তোমার একজন সঙ্গী মারা গেছে। সে কেমন করে মারা গেল?"

নায়ীরা একটু ইতস্তত করে বলল, "পুরো বিষয়টি আমি যদি তোমাকে খুলেও বলি তুমি সেটা বিশ্বাস করবে না। আমার কথা থাকুক। তুমি কে?"

"আমার নাম তিহান।"

"তিহান?"

"হ্যাঁ।"

"আমার নাম নায়ীরা।"

AMARBOI.COM

"তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম নায়ীরা।" তরুণটি একটু এগিয়ে এসে হাত মেলানোর জন্য তার হাতটি বাড়িয়ে দেয়।

নায়ীরা কিছুক্ষণ বাড়িয়ে দেওয়া হাতটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার সঙ্গে হাত মেলানো ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।"

"কেন?"

"কারণ আমার শরীরে ভয়ংকর একটা ভাইরাস আছে। এই ভাইরাস দিয়ে তোমাদের সবাইকে হত্যা করার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। তোমাকে স্পর্শ করলে যদি তোমার শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ হয়?"

নায়ীরা ভেবেছিল, তার এ কথা শুনে তিহান নামের এই তরুণটি খুব বিস্মিত হবে। কিন্তু তরুণটি বিস্মিত হল না। এগিয়ে দেওয়া হাত সরিয়ে নিয়ে শান্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

নায়ীরা জিজ্ঞেস করল, "আমার কথা শুনে তুমি অবাক হও নি?"

তিহান মাথা নাড়ল, "না।"

"কেন নয়?"

"কারণ আমরা জানি, এরকম একটা কিছু হবে।"

"তোমরা জান?" নায়ীরা অবাক হয়ে বলল, "তোমরা কেমন করে জান?"

"আমরা জানি পৃথিবীর মানুষ আমাদের অবমানব বলে। তারা আমাদের নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা করে।"

"তোমাদের নিয়ে অনেক পরীক্ষা করে?"

"হ্যাঁ। আমার মায়ের কাছে আমরা শুনেছি পৃথিবীর মানুষেরা একসময় আমাদের নিয়ে জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট করেছে। তখন এখানে অনেক বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিয়েছে। তাদের হাতে সাতটি আঙুল। কপালে বাড়তি চোখ। উত্তরের একটা গ্রামে একটা শিশুর দুটি মাথা ছিল।"

"এখন সেরকম শিশুর জন্ম হয় না?"

"না।"

"কেন?"

"মনে হয় তারা সেই এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করেছে। এখন আমাদের নিয়ে অন্য এক্সপেরিমেন্ট করে।"

"কী এক্সপেরিমেন্ট?"

"আমাদের সব পাওয়ার স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের সবকিছু তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা এখন প্রাচীন মানুষের মতো থাকি। চাষ করি। শিকার করি। গাছের বাকলের পোশাক পরি।"

নায়ীরা অবাক হয়ে বলল, "ও।"

"আমার মা বলেন, আমরা আসলে একটা ল্যাবরেটরিতে আছি। আমাদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করে পৃথিবীর মানুষ গবেষণা করে। মানুষের ওপর গবেষণা। সমাজের ওপর গবেষণা।"

নায়ীরা কী বলবে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তিহানের দিকে তাকিয়ে রইল। তিহান একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ভয়ংকর কোনো রোগ এসে আমাদের ওপর ভর করে। আমাদের অনেক মানুষ তখন মারা যায়। আমার মা বলেছে, পৃথিবীর মানুষ

একটা রোগ বের করার জন্য গবেষণা করছে, যে রোগে আমাদের সব মানুষ একসাথে মরে যাবে।"

নায়ীরা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তিহানের দিকে তাকিয়ে রইল। তিহান বলল, "আমি যাই।"

"তুমি কোথায় যাবে?"

আমি আমার গ্রামে যাব। গিয়ে সবাইকে বলব আমরা যে শেষ সময়টার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, সেই সময়টা চলে এসেছে।"

"তোমার কি ভয় করছে তিহান?"

"না। আমার ভয় করছে না। একটু দুঃখ লাগছে, কিন্তু ভয় করছে না।" তিহান কয়েক মুহূর্ত নায়ীরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "বিদায়।" তারপর হাতের মুখোশটা সে মাথায় পরে নিল। মুহূর্তে তাকে দেখাতে লাগল একটা ভয়ংকর দানবের মতো। তিহান ঘুরে দাঁড়াল, তারপর পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে শুরু করল। নায়ীরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, "তিহান দাঁড়াও। শোন।"

তিহান তার ভয়ংকর মুখ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, "কী হল?"

"আমি কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি?"

"কোথায়?"

"তোমাদের গ্রামে।"

"কেন?"

"তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে।"

তিহান কয়েক সেকেন্ড কিছু একটা চিন্তা করল। তারপর মুখ থেকে ভয়ংকর মুখোশটা খুলে বলল, "এস।"

"তুমি এক সেকেন্ড অপেক্ষা কর। আমি একটা জিনিস নিয়ে নিই।"

"কী জিনিস?"

"একটা বিকন। এটা চালু করলে বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে উদ্ধার করতে আসবে।"

"কাকে উদ্ধার করতে আসবে?"

"আমাকে না। রিশিকে। যাকে আমি এখানে কবর দিয়েছি।"

তিহান কোনো কথা বলল না। নিঃশব্দে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে রইল। নায়ীরা গ্লাইডারের ড্রয়ার খুলে ছোট ইলেকট্রনিক বিকনটা খুঁজে বের করে নিজের পকেটে নিয়ে নেয়। তারপর তিহানের কাছে এসে বলল, "চল যাই।"

"চল।"

"তিহান, শুধু একটা বিষয়ে খুব সাবধান।"

"সেটা কী?"

"আমার রক্তে কিলবিল করছে এমন একটা ভাইরাস যেটা আমাকে এত সহজে হত্যা করতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতরে শেষ করে দেবে। কাজেই খুব সাবধান, যেন কোনোভাবে আমার শরীর কেটে রক্ত বের হয়ে না যায়। তা হলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

তিহান কোনো কথা না বলে একটু হাসার চেষ্টা করল। নায়ীরা জিজ্ঞেস করল, "তুমি হাসছ কেন?"

"কারণ কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। পৃথিবীর মানুষ তোমাকে দিয়ে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

আমাদের শেষ করতে না পারে, তা হলে আরেকজনকে পাঠাবে। তাকে দিয়ে সম্ভব না হলে আরেকজনকে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, কাজেই এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। আজ হোক কাল হোক, আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব নায়ীরা।"

নায়ীরা কিছুক্ষণ তিহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি দুঃখিত তিহান।"

"তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই।"

"আমি জানি না, এটা থেকে সান্ত্বনা পাওয়ার কোনো যুক্তি আছে কিনা—আমার শরীরকে ভাইরাস তৈরির জন্য ব্যবহার করেছে বলে আমার আয়ু আর মাত্র দুই সপ্তাহ।"

"আমি দুঃখিত নায়ীরা।"

"তোমারও দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই তিহান।"

কথাটি হাসির কথা নয় কিন্তু কেন জানি দুজনেই একসাথে একটু হেসে ফেলল।

বনের ভেতর দিয়ে নায়ীরা তিহানের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যেতে থাকে। দুই পাশে গাছে বুনো ফুল, বাতাসে ফুলের গন্ধ। পাখি ডাকছে, কাঠবিড়ালী গাছে ছুটোছুটি করছে। নায়ীরা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। তার এখনো বিশ্বাস হয় না প্রকৃতির এত কাছাকাছি যে মানুষগুলো বেঁচে আছে, কী আশ্চর্য নিষ্ঠুরতায় তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

বুনো পথ শেষ হয়ে হঠাৎ একটা খোলা প্রান্তর শুরু হয়ে গেল। লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে দুজন হেঁটে যায়। প্রান্তরের শেষে একটা নদী। একটা গাছের নিচে ছোট একটা নৌকা বাঁধা। একটা গাছের ভেতরটুকু খোদাই করে নৌকাটি তৈরি করা হয়েছে। দুজন কষ্ট করে বসতে পারে। তিহান নৌকাটা খুলে নায়ীরাকে বলল, "ওঠ।"

নায়ীরা নদীর স্বচ্ছ পানিতে পা ভিজিয়ে নৌকায় উঠে বসে। তিহান নৌকাটাকে মাঝনদীর দিকে ধাক্কা দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসল। নদীর স্রোতে নৌকাটা তরতর করে এগোতে থাকে, তিহান বৈঠাটাকে হালের মতো ধরে রেখেছে। তিহান হাত দিয়ে নদীর পানি তুলে এক চুমুক খেয়ে বলল, "স্রোতের টানে যাচ্ছি, দেখতে দেখতে পৌঁছে যাব।"

"তোমার গ্রাম এখান থেকে কত দূর?"

তিহান মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এখন আমাদের কাছে এই প্রশ্নগুলোর কোনো অর্থ নেই। একসময় আমরা মিটার-কিলোমিটার ব্যবহার করেছি। এখন আর প্রয়োজন হয় না। দূরত্ব হচ্ছে কাছে কিংবা দূরে। ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ড বলেও আমাদের কিছু নেই। সময় এখন হচ্ছে সকাল-দুপুর আর সন্ধ্যা!"

নায়ীরা আর কোনো কথা বলে না। দেখতে দেখতে নৌকাটা বুনো অঞ্চল পার হয়ে লোকালয়ের কাছাকাছি আসতে থাকে। নদীর পাশে হঠাৎ করে একটা-দুটো গ্রাম দেখা যায়। মাটির ঘর, ঘাসের ছাদ। নদীর তীরে উদোম গায়ে শিশুরা খেলছে। শক্ত-সমর্থ নারীরা শস্য বাছাই করছে। পুরুষ মানুষেরা মাঠে কাজ করছে। দেখে মনে হয় কয়েক হাজার বছর আগের একটা দৃশ্য। আধুনিক সভ্যতার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু পুরো দৃশ্যটাতে এক ধরনের আশ্চর্য কোমল শান্তির ছাপ খুব স্পষ্ট। নায়ীরা সেদিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একটু বিভ্রান্ত হয়ে যায়, পৃথিবীর সভ্যতা সত্যিই কি ঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে?

তিহান যখন তার গ্রামে পৌঁছল, তখন সূর্য ঢলে পড়ে বিকেল হয়ে এসেছে। নদীর ঘাটে নৌকাটা বেঁধে তিহান নদীর তীরে নেমে এল। স্বচ্ছ নদীর পানিতে পা ভিজিয়ে নায়ীরাও নেমে আসে। গ্রামের ছোট ছোট শিশুরা নদীর ঘাটে ভিড় করেছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু নারী–পুরুষ এগিয়ে এসেছে। এখানকার মানুষের সঙ্গে নায়ীরার চেহারা আর পোশাকের পার্থক্যটুকু খুব স্পষ্ট।

নৌকা থেকে নেমে তিহান সোজা হেঁটে যেতে থাকে। আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন তাকে নিচু স্বরে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল, তিহান তাদের কারো প্রশ্নের উত্তর দিল না। নায়ীরা চারপাশে তাকায়, ছোট ছোট শিশু, কিশোর–কিশোরী আর নানা বয়সের পুরুষ ও রমণী তাকে ঘিরে রেখেছে। তার শরীরের এক ফোঁটা রক্ত এদের সবাইকে হত্যা করে ফেলতে পারে! এর চেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা, এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কী হতে পারে?

একটা বড় খালি উঠোনের চারপাশে ছোট ছোট কয়েকটা মাটির ঘর। তিহান তার একটার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, "মা।"

কয়েক মুহূর্ত পর ভেতর থেকে মধ্যবয়সী একজন মহিলা বের হয়ে আসে। মাথায় কাঁচা–পাকা চুল, মুখে বয়সের বলিরেখা, রোদে পোড়া বাদামি চেহারা, শরীরে হাতে বোনা মোটা ধূসর কাপড়ের পোশাক। মহিলাটি ঘর থেকে বের হয়ে নায়ীরাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। একবার তিহানের দিকে, আরেকবার নায়ীরার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল, "তুমি কে, মেয়ে?"

নায়ীরা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। ধূসর বিবর্ণ কাপড়ে ঢাকা মধ্যবয়স্ক এই মহিলাটির চোখ দুটোর দৃষ্টি কী তীব্র। মনে হয় তার শরীর ভেদ করে চলে যাচ্ছে। মহিলাটি আবার জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

নায়ীরা কী বলবে বুঝতে পারল না। তিহান বলল, "মা, তুমি যার কথা সব সময় বলো, এই মেয়েটি সেই মেয়ে।"

মহিলাটি কেমন যেন চমকে উঠে ঘুরে নায়ীরার দিকে তাকায়। তীব্র স্বরে বলল, "তুমি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?"

নায়ীরা ভাঙা গলায় বলল, "আমি একা আর পারছি না। আমার কারো সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না।"

"তুমি কী বলতে চাও?"

নায়ীরা ক্লান্ত গলায় বলল, "আমি কি তোমার সঙ্গে একা একা কথা বলতে পারি?"

মহিলাটি কিছুক্ষণ নায়ীরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। তুমি বস, তোমাকে আগে আমি কিছু খেতে দিই।"

মহিলাটি ঘরের ভেতর থেকে ঘাসে বোনা একটি কার্পেট এনে বিছিয়ে দিয়ে বলল, "বস।"

নায়ীরা মাটির ঘরে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। সত্যিই সে ক্লান্ত। সত্যিই সে ক্ষুধার্ত। শুধু একজন মা হয়তো সন্তানের মতো কাউকে দেখে সেটা বুঝতে পারে। অন্যেরা পারে না। তার মা নেই। তার কখনো মা ছিল না। নীরা ত্রাতিনা নামে বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানীর শরীরের একটি কোষ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে তাকে ক্লোন করা হয়েছিল। একজন মানুষের শরীরের একটা কোষ নিয়ে যদি কাউকে ক্লোন করা হয় তা হলে কি তাকে মা বলা যায়? একজন মানুষের মা থাকা নিশ্চয়ই খুব বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। নিশ্চয়ই খুব মধুর অভিজ্ঞতা।

তিহানের মা মাটির একটা বাটিতে করে গরম সুপ নিয়ে আসে। সেই গরম সুপে চুমুক দিয়ে নায়ীরা মধ্যবয়স্ক মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, "আমি তোমাকে কী বলে সম্বোধন করব?"

"এই গ্রামে সবাই আমাকে ফুলী-মা বলে ডাকে। এই গ্রামে সবাই আমার সন্তানের মতো।"

"আমিও তোমাকে ফুলী-মা বলে ডাকব?"

"ডাক।"

"আমি একজন ক্লোন। আমার কোনো মা ছিল না। আমি যদি কখনো কাউকে মা ডাকি সেটা হবে একটা মিথ্যাচার।"

"এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। এটি শুধু একটি সম্বোধন।" ফুলী-মা একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি বলো, তুমি কেন আমার কাছে এসেছ।"

"আমি তোমাদের সবার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

"তুমি কেন আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছ?"

"তিহানের কথা থেকে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমার রক্তের ভেতরে রয়েছে তোমাদের সবাইকে হত্যা করার জন্য এক ভয়ংকর ভাইরাস।"

ফুলী-মা কোনো কথা না বলে স্থিরদৃষ্টিতে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে রইল। নায়ীরা বলল, "গত রাতে আকাশে আমার হাতের ধমনি কেটে তোমাদের ওপর এই ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল। ঘটনাক্রমে সেটি ঘটে নি।"

ফুলী-মা বলল, "আজ হোক, কাল হোক সেটা ঘটবে। পৃথিবীর মানুষ সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তোমাকে দিয়ে যদি না পারে তা হলে তারা অন্য কাউকে দিয়ে আমাদের সবাইকে হত্যা করবে।"

নায়ীরা বলল, "আমাকে তুমি সেটা বুঝিয়ে দেবে?"

"তুমি কী বুঝতে চাও মেয়ে?"

"কেমন করে এটা হতে পারে?"

"আমি ছোট থাকতে যখন ইতিহাস পড়েছি তখন দেখেছি, অসংখ্যবার পৃথিবীতে এ ঘটনা ঘটেছে। মানুষ নিজেদের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়েছে, তারপর শক্তিমান মানুষ দুর্বল মানুষকে হত্যা করেছে।"

নায়ীরা বলল, "কিন্তু কেন মানুষের বিভাজন হবে? আমি কেন ক্লোন, অন্যেরা কেন মানুষ? আমরা সবাই কেন মানুষ না? তোমরা কেন অবমানব, অন্যেরা কেন মানব? সবাই কেন মানব না?"

মহিলা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এই আলোচনা থাক মেয়ে। আমরা জানতাম, মৃত্যু আসছে। চারপাশে পাহাড়, এক পাশে নদী, বিশাল এই এলাকায় আমরা আটকা পড়া কিছু মানব। পৃথিবীর মানুষের ভাষায় অবমানব! ভালোই হল, তুমি সঙ্গে করে মৃত্যুকে নিয়ে এসেছ। কখন সেই ভয়ংকর সময় আসবে এখন আমাদের সেটা নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমরা ভেবেচিন্তে আমাদের সময় ঠিক করে নেব।"

"না।" নায়ীরা মাথা নাড়ল, "না, ফুলী-মা, সেটা হতে পারে না।"

"কী হতে পারে না?"

"এভাবে তোমাদের সবার মৃত্যু হতে পারে না।"

"নায়ীরা, তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না।"

"শোন ফুলী-মা, পৃথিবীর মানুষ তোমাদের কথা জানে না। যেটুকু জানে ভুলভাবে জানে, বিকৃতভাবে জানে। আমি তাদের ভুল ভাঙাতে চাই, সত্যি কথা জানাতে চাই।"

নায়ীরার কথা শুনে ফুলী-মা শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, "তুমি কি ভেবেছ আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার চেষ্টা করি নি? কতবার চেষ্টা করেছি! আমাদের কত তরুণ-তরুণী টেহলিস শহরে যেতে চেষ্টা করেছে। কতবার সেই পাহাড় অতিক্রম করতে চেয়েছে। প্রতিবার তাদের ধরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। কেউ যেতে পারে নি। পৃথিবীর মানুষকে বোঝানো হয়েছে আমরা অবমানব। আমরা ভয়ংকর প্রাণী। আমরা নিষ্ঠুর, আমরা হিংস্র, আমরা খুনি!"

"আমরা কি তাই বলে হাল ছেড়ে দেব? পৃথিবীর মানুষকে আমরা আর সত্যি কথা জানাতে চেষ্টা করব না?"

"কীভাবে চেষ্টা করবে?"

নায়ীরা পকেট থেকে ছোট ইলেকট্রনিক বিকনটা বের করে দেখাল, "এই যে দেখছ, এটা একটা ইলেকট্রনিক বিকন। এর সুইচটা অন করলে বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে কেউ আসবে উদ্ধার করতে। নিশ্চয়ই একটা হেলিকপ্টারে আসবে। তুমি এই গ্রামে তোমার সন্তানদের দিয়ে সেই হেলিকপ্টারটি দখল করিয়ে দিতে পারবে?"

"যদি দিই, তখন তুমি কী করবে?"

"আমি সেটা নিয়ে টেহলিস শহরে উড়ে যাব।"

"গিয়ে তুমি কী করবে?"

"আমি সবকিছু বলব।"

ফুলী-মা আবার শব্দ করে হাসল। বলল, "তুমি টেহলিস শহরে উড়ে যেতে পারবে কিনা আমি জানি না। যদি যেতেও পার, সেখানে কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। সত্যি কথা বলতে কি, কেউ তোমার কথা শুনতেও রাজি হবে না।"

"হবে।"

"না, নায়ীরা। পৃথিবী খুব চমৎকার একটা জায়গা। কিন্তু তুমি যদি পৃথিবীতে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাক, তা হলে এই পৃথিবীর থেকে কঠিন জায়গা আর কিছু হতে পারে না।" ফুলী-মা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা এখন ভুল সময়ে ভুল জায়গায় আছি। এখন তুমি একজন মানুষকেও তোমার কথা বিশ্বাস করাতে পারবে না।"

"পারব। পৃথিবীর সব মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করলেও একজন কখনো আমাকে অবিশ্বাস করবে না।"

"সে কে?"

"তার নাম নীরা ত্রাতিনা।"

"কেন সে তোমার কথা অবিশ্বাস করবে না?"

"কারণ আমি তার ক্লোন।"

নায়ীরা ব্যাকুল চোখে ফুলী-মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমাকে সাহায্য করবে? আমার জন্য নয়, তোমার সন্তানদের জন্য। করবে?"

ফুলী-মা আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে, নায়ীরা। আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

নায়ীরা একটা উঁচু বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে প্রায় জনপঞ্চাশেক নারী-পুরুষ। তিহানের মা—যাকে গ্রামের সবাই ফুলী-মা ডাকে, সবাইকে এখানে একত্র হতে বলেছে। তিহানের মা এই গ্রামের সবারই মা, তার কথা কেউ কখনো ফেলতে পারে না। গ্রামের

সবাই দেখেছে বিচিত্র পোশাকের কমবয়সী একটা মেয়ে এখানে এসেছে। কেন এসেছে তারা কেউ জানে না। পৃথিবী থেকে আগেও কখনো কখনো কোনো মানুষ এখানে এসেছে, কিন্তু সেটি কখনো তাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনে নি। রূপসী এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই তাদের জন্য কোনো সৌভাগ্য বয়ে আনে নি, তাদের জন্য নিশ্চয়ই এক ভয়াবহ বিপদ বয়ে এনেছে। সেটি কত বড় বিপদ সেটাই তারা এখন জানতে চায়। যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা চাপা গলায় নিজেদের ভেতর কথা বলছে, নায়ীরা হাত তুলতেই সবাই থেমে গেল।

নায়ীরা বলল, "আমার নাম নায়ীরা। আসলে এটি আমার সত্যিকারের নাম না। আমার সত্যিকারের নাম নেই। আমি একটি ক্লোন। কোনো ক্লোনকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, তাই ক্লোনদের কোনো নাম থাকে না। পৃথিবীর মানুষ আমাকে কোনো নাম ধরে ডাকে না। আমাকে একটা নম্বর দিয়ে ডাকে। আমার নম্বর তিন শ নয়।"

নায়ীরা সবার দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, "পৃথিবীর মানুষ যেরকম আমাকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না, ঠিক সেরকম তোমাদেরও মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না। তোমাদের তারা বলে অবমানব। পৃথিবীর সাধারণ মানুষকে তারা বুঝিয়েছে তোমরা সত্যিকারের মানুষ নও। তোমরা হিংস্র, তোমরা খুনি, তোমরা অপরিণত বুদ্ধির মানুষ। তারা বলে, তোমরা তাদের ধ্বংস করার জন্য মানববিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করেছ। তাই তোমাদের হত্যা করতে হবে। তোমরা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করার আগে তারা তোমাদের হত্যা করবে।

"তোমাদের হত্যা করার জন্য তারা আমাকে পাঠিয়েছে। আমার শরীরের ভেতরে আছে একটি ভয়ংকর ভাইরাস। আমার রক্তে সেই ভাইরাস কিলবিল করছে। তারা আমাকে কেটে সেই রক্ত তোমাদের ওপর ছিটিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা ঘটে নি। আমি এখনো বেঁচে আছি এবং তোমরাও এখনো বেঁচে আছ। পৃথিবীর সেই অল্প কয়জন খারাপ মানুষ যখন সেটি জানবে, তারা আবার কাউকে পাঠাবে। সে যদি ব্যর্থ হয় তখন আবার কাউকে পাঠাবে। এখন তোমাদের বেঁচে থাকার একটিমাত্র উপায়।"

কাঁপা গলায় একটি কিশোরী জানতে চাইল, "কী উপায়?"

নায়ীরা পকেট থেকে ছোট ইলেকট্রনিক বিকনটি বের করে সবাইকে দেখিয়ে বলল, "এই যে আমার কাছে একটা ইলেকট্রনিক বিকন। অন করা মাত্রই এটা থেকে একটা সিগন্যাল বের হবে, তখন একটা হেলিকপ্টার আসবে উদ্ধার কাজে। সেই হেলিকপ্টারটি তোমাদের দখল করে দিতে হবে।"

উপস্থিত নারী–পুরুষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ একটি কথাও বলল না। নায়ীরা বলল, "সেই হেলিকপ্টার নিয়ে আমি যাব টেহলিস শহরে, পৃথিবীর মানুষকে সত্য কথাটি বলতে। আমি যদি তাদের বলতে পারি, তা হলে তোমরা বাঁচবে। যদি না পারি, তোমরা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমরা বলো, তোমরা কি একটিবার শেষ চেষ্টা না করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চাও?"

উপস্থিত সবাই মাথা নাড়ল, "না, চাই না।"

"তা হলে আমাকে সবাই সাহায্য কর। এস, সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা করি।"

নায়ীরাকে ঘিরে সবাই কাছাকাছি এগিয়ে এল।

দীর্ঘ সময় কথা বলে তারা সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা করল। পরিকল্পনা শেষে বিকনের সুইচটি অন করে নায়ীরা সেটি তিহানের হাতে দিয়ে বলল, "এটা এখন তোমার কাছে রাখ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিহান সেটা হাতে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে।"

"বিজ্ঞান কেন্দ্রের মানুষগুলো এই বিকনের সিগন্যাল অনুসরণ করে আসবে। কাজেই তোমার ওপর এখন অনেক দায়িত্ব।"

তিহান বলল, "আমি আমার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

নায়ীরা বলল, "আমার হিসাবে দুই ঘণ্টার ভেতর উদ্ধারকারী দল চলে আসবে।"

"আমরা সবাই প্রস্তুত।"

"উদ্ধারকারী দল আশা করবে একটি মৃত্যু উপত্যকা। তারা ধরে নেবে তোমরা সবাই মারা গেছ।"

"তুমি চিন্তা করো না, নায়ীরা। তারা যা আশা করছে ঠিক সেটাই দেখতে পাবে। আমরা সব জায়গায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ কেউ ঘর থেকে বের হবে না। এখানে কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন দেখতে পাবে না। যারা বের হবে তারা মৃত সেজে পথেঘাটে পড়ে থাকবে।"

"চমৎকার! যাদের মৃতের ভূমিকায় অভিনয় করার কথা তারা সবাই কি বের হয়েছে?"

"হ্যাঁ, বের হয়েছে। মাঠে–ঘাটে, ঘরে–বাইরে তারা আগামী কয়েক ঘণ্টা মৃত মানুষের মতো পড়ে থাকবে। হেলিকপ্টার থেকে দেখে পৃথিবীর মানুষেরা এতটুকু সন্দেহ করবে না।"

"চমৎকার! মনে থাকে যেন, এটা আমাদের শেষ সুযোগ।"

"আমরা এ সুযোগ নষ্ট করব না।"

নায়ীরা একটা মাটির ঘরের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। হেলিকপ্টার দখল করার সময় একটা সংঘর্ষ হতে পারে, গোলাগুলি হতে পারে, সে তার মধ্যে থাকতে চায় না। কোনোভাবে তার শরীরের এতটুকু কেটে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখানে যত বড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হোক না কেন, তার শরীর থেকে কোনো রক্ত বের হতে পারবে না। এক ফোঁটাও না।

নায়ীরা ছোট ঘরটির ভেতর অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে করতে যখন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল, ঠিক তখন অনেক দূরে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেল। বিকনের সিগন্যাল অনুসরণ করে এটা এগিয়ে আসছে। নায়ীরা মাটির ঘরের ছোট জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হেলিকপ্টারটা দেখতে পায়, গ্রামের ওপর দুবার ঘুরে সেটা কাছাকাছি একটা মাঠে নেমে এল। ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দরজা খুলে ডজনখানেক মানুষ নেমে আসে। মানুষগুলোর হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। তারা হেলিকপ্টারটি ঘিরে দাঁড়িয়ে এদিক–সেদিক তাকায়। চারপাশে অসংখ্য মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, অবমানবের মৃতদেহ, ঠিক যেরকম হওয়ার কথা।

সশস্ত্র চার জন মানুষ তাদের যোগাযোগ মডিউল হাতে নিয়ে বিকনটির অবস্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। দলপতি মাইক্রোফোনে কথা বলে সাবধানে অগ্রসর হতে থাকে। সশস্ত্র মানুষগুলো একটা বড় পাথরের আড়ালে হেঁটে যেতে থাকে। তারা তখনো জানে না যে সেখানে তাদের জন্য তিহান আট জন সুঠাম তরুণকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। নায়ীরা নিঃশব্দে তাদের লক্ষ করে, এখনো সবকিছু তাদের পরিকল্পনামতো ঘটছে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চূড়ান্ত আক্রমণটি ঘটে যাওয়ার কথা।

বড় একটা পাথরের আড়ালে ছোট একটা মাটির ঘরের সামনে গিয়ে সশস্ত্র মানুষগুলো থমকে দাঁড়াল, এই মাটির ঘরের ভেতর থেকে বিকনের সিগন্যাল আসছে। সশস্ত্র মানুষদের একজন হাতে অস্ত্র নিয়ে ডাকল, "রিশি, তুমি বের হতে পার। তোমার কোনো ভয় নেই, আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক সেই মুহূর্তে আট জন সুঠাম তরুণ সশস্ত্র মানুষগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কী হচ্ছে বোঝার আগেই তারা নিচে পড়ে গেছে এবং বিদ্যুৎগতিতে তাদের অস্ত্রগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

একই সময় দ্বিতীয় দলটি হেলিকপ্টারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা অন্যদের আক্রমণ করেছে। কিছু বোঝার আগেই তারাও বন্দি হয়ে গেল। হেলিকপ্টারের ভেতরে যারা ছিল তারা গোলাগুলি করার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো লাভ হল না। এই গ্রামের কিছু তরুণ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে গুলি করতে করতে হেলিকপ্টারটি দখল করে নিয়েছে। নায়ীরাকে সেই খবরটি দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণের মাঝেই তিহান নিজে এসে উপস্থিত হল। নায়ীরা নিশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, "হেলিকপ্টারটি দখল হয়েছে?"

"হ্যাঁ, নায়ীরা, দখল হয়েছে।"

"গোলাগুলির শব্দ শুনলাম, কারো গায়ে কি গুলি লেগেছে?"

"আমাদের কারো গায়ে গুলি লাগে নি। তাদের দুজন গুলি খেয়েছে।"

"তাদের কী অবস্থা?"

"অবস্থা খারাপ নয়। চামড়া স্পর্শ করে গেছে। একেবারেই গুরুতর কিছু নয়।"

"সবাইকে বেঁধেছ?"

"হ্যাঁ। সবাইকে বেঁধেছি।"

"চমৎকার! যারা হেলিকপ্টারে তাদের কী করেছ?"

"তাদেরকেও শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। আমার ধারণা, তাদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষও আছে।"

"চমৎকার! হেলিকপ্টারে যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ থাকবে আমাদের জন্য তত ভালো।"

"তুমি এখন হেলিকপ্টারটিতে যেতে চাও?"

"হ্যাঁ, যেতে চাই। কিন্তু আমি খালি হাতে যেতে চাই না। আমাকে একটা ছোট অস্ত্র দাও। কেমন করে সেটা ব্যবহার করতে হয় সেটাও শিখিয়ে দিতে হবে।"

তিহান একটু হাসল। বলল, "অস্ত্র কেমন করে ব্যবহার করতে হয় আমরাও খুব ভালো জানতাম না। একটু আগে চেষ্টাচরিত্র করে শিখে নিয়েছি। এস তোমাকেও শিখিয়ে দেব।"

নায়ীরা হেলিকপ্টারে ঢুকে দেখল ভেতরে চার জন মানুষকে তাদের সিটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। চার জনই খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান রুবা, সামরিক বাহিনীর কমান্ডার গ্রুশান, নিরাপত্তা বাহিনীর মহাপরিচালক জিনা এবং চিকিৎসা কেন্দ্রের ড. ইলাক। পাইলটকে বাঁধা হয় নি, কিন্তু তার মাথায় একজন তরুণ একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ধরে রেখেছে। নায়ীরাকে হেলিকপ্টারে উঠতে দেখে বেঁধে রাখা চার জন মানুষ ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। রুবা বলল, "তু-তুমি?"

নায়ীরা হাসার চেষ্টা করে বলল, "হ্যাঁ। আমি। বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান রুবা, আমি।"

"তুমি কেমন করে?"

"সেটা নিয়ে আলাপ করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।" নায়ীরা পাইলটের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এই হেলিকপ্টারটি নিয়ে টেহলিস শহরে যেতে চাই। তোমার কোনো আপত্তি আছে?"

পাইলট মাথা নাড়ল। বলল, "না। নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চমৎকার! তোমাকে শুধু একটা জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাই, আমি দু সপ্তাহের ভেতর মারা যাচ্ছি। যে দু সপ্তাহের ভেতর মারা যাবে সে দু সপ্তাহ আগেও মরতে খুব একটা ভয় পায় না, তাকে কোনো রকম ভয়ভীতিও দেখানো যায় না। তাই আমি আশা করব তুমি অন্য কিছু করার চেষ্টা করবে না।"

পাইলট মাথা নাড়ল। বলল, "করব না।"

"তুমি যদি তোমার কথা রাখ, তা হলে তুমি তোমার সন্তানদের কাছে বলতে পারবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অবিচারটি দূর করতে তুমি সাহায্য করেছ।"

"আমি বুঝতে পারছি।"

"সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে পারবে যে, পৃথিবীর জঘন্যতম চার জন অপরাধীকে তুমি আইনের হাতে তুলে দিয়েছিলে।"

ড. ইলাক দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তুমি বোকার স্বর্গে বাস করছ। টেহলিস শহরের একটি মানুষও তোমার কথা বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, তোমার কথা শুনতেও রাজি হবে না। হেলিকপ্টারটি মাটিতে নামার তিন মিনিটের মধ্যে কমান্ডো বাহিনী তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। পৃথিবীর কোনো মানুষ তোমাকে খুঁজে পাবে না মেয়ে।"

"আমার নাম নায়ীরা।"

"ক্লোনদের কোনো নাম হয় না।"

নায়ীরা একটু এগিয়ে তার রিভলবারটি ড. ইলাকের মাথায় ধরল। সেফটি ক্যাচ টেনে বলল, "আমার নাম নায়ীরা।"

ড. ইলাক হঠাৎ দরদর করে ঘামতে থাকে। নায়ীরা হিংস্র গলায় বলল, "আমি ট্রিগার টেনে তোমার মতো নরকের কীটকে হত্যা করে এই মুহূর্তে পৃথিবীটাকে আগের চাইতে একটু ভালো একটা গ্রহে পাল্টে দিতে পারি। আমি কখনো একটি পোকাও মারি নি। কিন্তু তোমাকে হত্যা করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না। তুমি দেখতে চাও?"

ড. ইলাক ফ্যাকাসে মুখে বলল, "না, আমি দেখতে চাই না।" তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি দেখতে চাই না, নায়ীরা।"

নায়ীরা রিভলবারটি সরিয়ে এনে বলল, "এটি বিচিত্র কিছু নয় যে পৃথিবীর সব অপরাধীই আসলে কাপুরুষ।" সে হেলিকপ্টারের ভেতর অস্ত্র হাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তরুণদের বলল, "তোমরা এখন নেমে যাও। আমি এখন রওনা দিতে চাই।"

তিহান এগিয়ে এসে বলল, "আমি কি তোমার সঙ্গে আসব?"

"না, তিহান। আমি একা যেতে চাই।"

"যদি তোমার কোনো বিপদ হয়?"

"সেজন্যই আমি একা যেতে চাই।"

"ঠিক আছে। বিদায় নায়ীরা।"

"বিদায়।"

অস্ত্র হাতে তরুণগুলো নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনটি গর্জন করে ওঠে। গ্রামটির ওপরে একবার পাক খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা দক্ষিণ দিকে টেহলিস শহরের দিকে ছুটে যেতে থাকে। নদীতীরের একটি গ্রামে হাতবাঁধা ষোল জন সেনাসদস্য এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা কৌতূহলী শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা শুনে এসেছে অবমানবরা বিকলাঙ্গ এবং হিংস্র। খুনি এবং রক্তপিপাসু। বিকৃত এবং ভয়ংকর। কিন্তু সেটি সত্য নয়, তারা একেবারেই সাধারণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সহজ এবং সরল। তারা সুদর্শন এবং সুঠাম। তারা বুদ্ধিমান এবং কৌতূহলী। একজন বৃদ্ধা তাদের পানীয় দিয়ে গেছে, তাদের ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে। তাদের সাময়িক অসুবিধার জন্য ক্ষমা চেয়ে গেছে। কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছে, সেটি কী সেনাসদস্যরা তা বুঝতে পারছে না।

হেলিকপ্টারের ভেতর পাইলট নায়ীরাকে জিজ্ঞেস করল, "টেহলিস শহরে তুমি কোথায় যেতে চাও?"

"কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।"

পাইলট অবাক হয়ে বলল, "কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে?"

"হ্যাঁ, তুমি কি সেখানে একটি খবর পাঠাতে পারবে?"

"পারব। প্রতিরক্ষা দপ্তরের কমপক্ষে এক ডজন রাডার এই মুহূর্তে আমাদের হেলিকপ্টারটিকে লক্ষ করছে। আমাদের প্রত্যেকটি কথা শুনছে।"

"চমৎকার! তুমি তাদের বলো আমি কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাকাশ-বিজ্ঞান বিভাগের বিজ্ঞানী নীরা ত্রাতিনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

হেলিকপ্টারের পেছনে বসে থাকা চার জন ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল। পাইলট ইতস্তত করে বলল, "তুমি যদি কিছু মনে না কর নায়ীরা, আমাকে বলবে, কেন তুমি একজন মহাকাশ-বিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা করতে চাও?"

"আমি মহাকাশ-বিজ্ঞানী নীরা ত্রাতিনার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। আমি আসলে মানুষ নীরা ত্রাতিনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তার কারণ আমাকে এই মানুষটি থেকে ক্লোন করা হয়েছে। আমার ধারণা, আমি কী বলতে চাই সেটি তার থেকে ভালো করে কেউ বুঝবে না। কারণ আমি আর সে আসলে একই মানুষ।"

পাইলট কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে ছিল বলে জানতে পারল না হেলিকপ্টারে সিটে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের চার জন সর্বোচ্চ কর্মকর্তার মুখ হঠাৎ করে রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

www.amarboi.com

নীরা ত্রাতিনা স্টেইনলেস স্টিলের বায়ুশূন্য চেম্বারে ভাসমান ক্রোমিয়াম গোলকটির দিকে তাকিয়ে থেকে অতিবেগুনি রশ্মির একটি পাল্‌স্‌ পাঠাল। সিলিকন ডিটেক্টরটি পাল্‌স্‌টিকে একটি বৈদ্যুতিক পাল্‌স্‌ হিসেবে তথ্য সংরক্ষণকারী কম্পিউটারে সংরক্ষণ করছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে নীরা ত্রাতিনা সন্তুষ্টির শব্দ করে বলল, "চমৎকার! নিখুঁত ডিজাইন।"

পাশে দাঁড়িয়ে টেকনিশিয়ান বলল, "তোমার ডিজাইন সব সময় নিখুঁত।"

"উঁহু। তিরিশ সালে স্পেসশিপে একটা বায়ুনিরোধক যন্ত্র তৈরি করেছিলাম, ল্যান্ডিংয়ের সময় ভেঙেচুরে ভয়ংকর অবস্থা।"

নীরা ত্রাতিনা ঘটনাটার একটা বর্ণনা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখনই তার টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনের স্ক্রিনে মানুষটির চেহারা অপরিচিত। শুধু যে অপরিচিত তা নয়, দেখে মনে হয় মানুষটি সামরিক বাহিনীর। একটু বিস্ময় নিয়ে সে বলল, "নীরা ত্রাতিনা কথা বলছি।"

"প্রফেসর ত্রাতিনা। তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি? কথা দিচ্ছি এক মিনিট থেকে এক সেকেন্ড বেশি সময় নেব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে। বলো।"

"তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীদের হাইজ্যাক করা একটা হেলিকপ্টার নেমেছে। আমাদের কমান্ডো দল ভেতরে ঢোকার জন্য রেডি। তাদের অর্ডার দেওয়ার আগে তোমার সঙ্গে কথা বলে নিতে চাইছি।"

নীরা ত্রাতিনা অবাক হয়ে বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীরা কেন হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করে নামাবে?"

"সেটা আমাদের জন্যও একটা রহস্য।"

"আর যদি নামিয়েই থাকে আইন রক্ষাকারী তাদের নিয়মমতো সিদ্ধান্ত নেবে। আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ?"

সেনা কর্মকর্তা একটু ইতস্তত করে বলল, "তার কারণ হেলিকপ্টারের হাইজ্যাকার বলেছে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়!"

"আমার সঙ্গে?" নীরা ত্রাতিনা অবাক হয়ে বলল, "আমার সঙ্গে কেন?"

"সেটাও একটা রহস্য। যাই হোক, আমরা আইন রক্ষাকারী দপ্তর আগেও কখনো সন্ত্রাসী বা হাইজ্যাকারদের দাবিদাওয়া মানি নি, এখনো মানব না। আমরা এখনই আক্রমণ করতে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে কর।"

"ধন্যবাদ প্রফেসর।"

"ধন্যবাদ।" নীরা ত্রাতিনা টেলিফোনটা বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গেল। বলল, "অফিসার।"

"বলো।"

"হাইজ্যাকারদের পরিচয় কী?"

সেনা কর্মকর্তা একটু ইতস্তত করে বলল, "সেটা আরেকটা রহস্য।"

নীরা ভুরু কুঁচকে বলল, "কী রকম রহস্য?"

"আমরা তার পরিচয় বের করতে পারি নি।"

নীরা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, "পরিচয় বের করতে পার নি? ডাটাবেসে তার সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই?"

"ডাটাবেসে দেখতেই পাচ্ছি না। তার শরীরে ট্রাকিওশান সিগন্যাল নেই।"

"মানে?"

"মানে সেটাই। এই হাইজ্যাকারের কোনো পরিচয় পৃথিবীতে নেই।"

"সেটা কেমন করে হয়?"

"তা আমরা জানি না। কিন্তু তাই হয়েছে। তবে তুমি এটা নিয়ে চিন্তা করো না। আর দশ মিনিটের ভেতর আমরা এই রহস্যের সমাধান করে ফেলব। জীবিত কিংবা মৃত এই হাইজ্যাকারকে ধরে আনব।"

"হাইজ্যাকারের বয়স কত?"

"গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে পনের-ষোল বছরের বেশি নয়।"

নীরা ত্রাতিনা অবাক হয়ে বলল, "এত ছোট?"

"আরো বেশি হতে পারে। মেয়েদের গলার স্বর শুনে সব সময় বয়স অনুমান করা যায় না।"

নীরা চমকে উঠে বলল, "মেয়ে?"

"ও আচ্ছা! তোমাকে বলা হয় নি? হ্যাঁ, হাইজ্যাকার একটা মেয়ে।"

নীরা শীতল গলায় বলল, "তোমার কমান্ডোদের অপেক্ষা করতে বলো। আমি আসছি।"

সেনা কর্মকর্তা ব্যস্ত হয়ে বলল, "তুমি এসে কী করবে? এটা আইন রক্ষাকারীদের ব্যাপার। আমাদের দায়িত্ব আমাদের পালন করতে দাও।"

"পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ে সেনাদপ্তরের একটা হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করে ফেলেছে, তার অর্থ, তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন কর নি। যাই হোক, কেউ যেন হেলিকপ্টারে না ঢোকে। আমি আসছি।"

সেনা কর্মকর্তা বিরস মুখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, নীরা ত্রাতিনা তাকে সে সুযোগ দিল না। টেলিফোনের লাইন কেটে উঠে দাঁড়াল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টেকনিশিয়ানকে তার যন্ত্রটা দেখিয়ে বলল, "তুমি এটাকে ক্যালিব্রেট কর। আমি আসছি।"

কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে একটা বিশাল হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে। হেলিকপ্টারটি ঘিরে নিরাপত্তা বাহিনীর অসংখ্য গাড়ি। নীরা ত্রাতিনা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা অসহিষ্ণু কমান্ডো দলটিকে দেখতে পেল, সে অনুমতি দেয় নি বলে তারা ভেতরে ঢুকতে পারছে না।

খেলার মাঠটি সেনাবাহিনীর লোকেরা কর্ডন করে রেখেছে, কর্ডনের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কৌতূহলী চোখে দাঁড়িয়ে আছে। নীরা ত্রাতিনা সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তার কাছে নিজের পরিচয় দিতেই তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। হেলিকপ্টারের কাছাকাছি দ্বিতীয় একজন কর্মকর্তা তার দিকে এগিয়ে আসে। নীরা ত্রাতিনা মানুষটিকে চিনতে পারল। একটু আগে এই মানুষটি টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলেছে। মানুষটি কাছে এসে নিচু গলায় বলল, "প্রফেসর, আমি মনে করি তোমার কিছুতেই ভেতরে যাওয়া উচিত নয়। এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তা ছাড়া—"

মানুষটিকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে নীরা ত্রাতিনা বলল, "তুমি ভেতরে বাচ্চা মেয়েটিকে জানাও যে, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

মানুষটি বিরস মুখে টেলিফোনে কার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলল। তারপর তাকে হেলিকপ্টারের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বলল, "এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাও। দরজায় টোকা দিলে খুলে দেবে। তবে আমি শেষবারের মতো বলছি—"

নীরা ত্রাতিনা তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজায় টোকা দিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুট করে খুলে গেল। নীরা ভেতরে ঢুকে চারদিকে তাকাল। বড় একটা হেলিকপ্টারের সামনের চারটা সিটে চার জন মানুষকে বেঁধে রাখা হয়েছে। দুজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। হেলিকপ্টারের দরজা যে খুলেছে সে সম্ভবত হেলিকপ্টারের পাইলট। অন্য পাশে একটা মেয়ে হাতে একটা বেঢপ রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নীরা ত্রাতিনা মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল। মুহূর্তে নীরার মুখ থেকে রক্ত সরে যায়। সে হেলিকপ্টারের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে কোনোভাবে বলল, "তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি। তুমি আমাকে দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছ। তুমি আরো অবাক হবে, যদি শোন আমি একা নই। আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে আমার মতো আরো দশ জন আছে। আমরা ক্লোন তাই আমাদের কোনো নাম থাকতে হয় না। কিন্তু আমরা সবাই মিলে আমার নাম দিয়েছি নায়ীরা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরা ত্রাতিনা কোনো কথা না বলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নায়ীরা নামের মেয়েটি আসলে সে নিজে।

নায়ীরা একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি জানতে যে তোমাকে ক্লোন করা হয়েছে?"

"না।" নীরা ত্রাতিনা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "পৃথিবীর আইনে কাউকে ক্লোন করা যায় না।"

"কিন্তু এরা করেছে।" নায়ীরা হাত দিয়ে বেঁধে রাখা চার জনকে দেখিয়ে বলল, "এরা বলেছে, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না। এরা বলেছে কালো পোশাক পরা কমান্ডোরা এসে আমাকে কোনো কথা না বলার সুযোগ দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলবে।"

নীরা ত্রাতিনা কোনো কথা না বলে বিস্ফারিত চোখে নায়ীরার দিকে তাকিয়ে থাকে। নায়ীরা বলল, "কিন্তু আমি তাদের বলেছি যে, তুমি আসবে। তুমি নিশ্চয়ই আসবে। আমাকে কেউ ডাকলে আমি যেতাম। তুমি নিশ্চয়ই আমার মতন, তাই না?"

নীরা ত্রাতিনা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি এখনো—"

নায়ীরা বাধা দিয়ে বলল, "আমি কেন তোমার কাছে এসেছি সেটা তুমি এখনো শোন নি। সেটা শুনলে তুমি সেটাও বিশ্বাস করবে না।"

"তুমি কেন আমার কাছে এসেছ?"

"তুমি কি অবমানবদের কথা জান?"

"হ্যাঁ, জানি।"

"তারা ভুলভাবে নিজেদের বিবর্তন ঘটিয়েছে। হিংস্র বিকৃত বিকলাঙ্গ হয়ে গড়ে উঠেছে। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য মানববিধ্বংসী অস্ত্র গড়ে তুলেছে। এখন আমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

নায়ীরা জোর করে হেসে বলল, "তুমি কি জান এটা মিথ্যা? তুমি কি জান অবমানব বলে কিছু নেই? তারা সাধারণ মানুষ। নিরীহ মানুষ। অসহায় মানুষ। তুমি সেটা জান?"

নীরা ত্রাতিনা চমকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। আমি সত্যি বলছি। আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

"কিন্তু এটা তো হতে পারে না, এটা অসম্ভব।"

নায়ীরা নিশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ, এটা অসম্ভব। কিন্তু এই মানুষগুলো সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। তুমিও নিশ্চয়ই জান, আমি কখনো মিথ্যা বলব না। আমি তো আসলে তুমি।"

"হ্যাঁ, আমি জানি নায়ীরা। আমি জানি।"

নায়ীরা একটু এগিয়ে এসে হঠাৎ করে কেমন জানি টলে উঠে কাছাকাছি একটা চেয়ার ধরে নিজেকে সামলে নেয়। নীরা ত্রাতিনা জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হয়েছে?"

"আমি আসলে খুব অসুস্থ।"

"অসুস্থ! কী হয়েছে তোমার?"

"এরা বলেছে, আমি দুই সপ্তাহ পরে মারা যাব। কিন্তু আমি জানি, আমি দুই সপ্তাহ টিকে থাকব না। আমি টের পাচ্ছি, আমি তার অনেক আগেই মারা যাব। কিন্তু এখন আমার সেটা নিয়ে কোনো দুঃখ নেই। কারণ আমি জানি, তুমি নিশ্চয়ই অবমানবদের রক্ষা করবে। করবে না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার পক্ষে যেটুকু করার সেটা করব। নিশ্চয়ই করব।"

"আমি জানি, তুমি করবে। আমি হলে করতাম। তুমি আর আমি তো একই মানুষ, তাই না?"

নায়ীরা চেয়ারটা ধরে খুব ধীরে ধীরে বসে। ফিসফিস করে বলে, "আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে দাঁড়া করে রেখেছিলাম। আর পারছি না। আমি খুব ক্লান্ত। খুব অসুস্থ।"

নীরা নায়ীরার কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করে, "তোমার কী হয়েছে নায়ীরা?"

"অবমানবদের হত্যা করার জন্য এরা আমার শরীরে লাখ লাখ কোটি কোটি ভাইরাসের জন্ম দিয়েছে। সেই ভাইরাসগুলো আমার শরীরকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু তাতে এখন আর কিছু আসে যায় না।" নায়ীরা দুর্বলভাবে হেসে হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল।

নীরা ত্রাতিনা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। এই মেয়েটি সে নিজে। কৈশোরে সে ঠিক এরকম ছিল, সাহসী এবং তেজস্বী। মায়াময় এবং কোমল। গভীর আবেগে তার হৃদয় ছিল ভরপুর। কী আশ্চর্য! কৈশোরের সেই মেয়েটি আবার তার কাছে ফিরে এসেছে?

নায়ীরা নীরা ত্রাতিনার হাত ধরে বলল, "আমাকে কোনো মা জন্ম দেয় নি। আমার কোনো মা নেই। কিন্তু আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, মা থাকলে কেমন লাগে।"

নীরা ত্রাতিনা নায়ীরাকে শক্ত করে ধরে বলল, "আমি তোমাকে জন্ম দিই নি, কিন্তু তুমি আমার মেয়ে। নায়ীরা, মা আমার, তুমি এতদিন পর কেন এসেছ?"

নায়ীরা ফিসফিস করে বলল, "মা, তোমার ঠিক আমার মতো আরো দশটি মেয়ে এখনো বেঁচে আছে। তারা খুব দুঃখী মেয়ে। তুমি তাদের দেখবে না?"

"দেখব, নিশ্চয়ই দেখব।"

নায়ীরার মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, সে নীরা ত্রাতিনার হাত ধরে চোখ বুজল।

নীরা ত্রাতিনা নায়ীরার মাথাটা নিজের কোলে রেখে তার পকেট থেকে ফোন বের করে একটি নম্বর ডায়াল করল। কানেকশন হওয়ার পর স্ক্রিনে কঠোর চেহারার একজন মানুষকে দেখা যায়। নীরা ত্রাতিনা নিচু গলায় বলল, "আমি প্রফেসর নীরা ত্রাতিনা। আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"রাষ্ট্রপতি এই মুহূর্তে একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন—"

নীরা তাকে বাধা দিয়ে বলল, "তাতে কিছু আসে যায় না। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা আছে। তাকে তুমি বলো, তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আমি তাকে জানাতে চাই।"

"ঠিক আছে, বলছি।"

নীরা ত্রাতিনা হেলিকপ্টারের মেঝেতে নায়ীরার মাথাটি কোলে নিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে। হেলিকপ্টারের সিটে শক্ত করে বেঁধে রাখা চার জন বিজ্ঞান এবং সেনা কর্মকর্তার হাত-পা শক্ত করে বেঁধে রাখার কারণে সেখানে ঠিকভাবে রক্ত সঞ্চালন না হয়ে সেগুলো অবশ হয়ে আসছিল, কিন্তু কর্মকর্তাদের কেউই সেই বিষয়টি নিয়ে বিচলিত ছিল না। তাদের বিচলিত হওয়ার জন্য অনেক বড় বিষয় অপেক্ষা করছে, সেটি সম্পর্কে তাদের তখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

নায়ীরা যখন চোখ খুলে তাকাল সে তখন হাসপাতালের একটি বিছানায় শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে অসংখ্য মনিটর। শরীরের নানা জায়গা থেকে অনেকগুলো সেন্সর সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনিটরগুলোতে এসেছে। শরীরের রক্ত বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া দিয়ে তার দেহটি ভাইরাসমুক্ত করা চলছে। পদ্ধতিটি কার্যকর, তবে সময়সাপেক্ষ। নায়ীরা মাথা ঘুরিয়ে দেখল, তার মাথার কাছে নীরা ত্রাতিনা দাঁড়িয়ে আছে। নায়ীরাকে চোখ খুলে তাকাতে দেখে সে তার কাছে এগিয়ে এসে তার হাত স্পর্শ করল, জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখন কেমন আছ?"

"মনে হয় ভালোই আছি।" একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "এখন কয়টা বাজে?"

"রাত একটা।"

"এত রাত?"

"হ্যাঁ, অনেক রাত।"

"মা, তুমি কি অবমানবদের রক্ষা করেছ?"

"হ্যাঁ, তাদের রক্ষা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে কয়েক শ হেলিকপ্টার অবমানবদের এলাকায় উড়ে যাচ্ছে তাদের সাহায্য করার জন্য।"

"সেখানে একটা গ্রামে তিহান নামে একটা ছেলে থাকে।"

"কী করে তিহান?"

"হরিণ শিকার করে। কিন্তু সে হরিণকে মারতে চায় না, তাই হরিণ শিকার করার সময় মুখে একটা দানবের মুখোশ পরে থাকে।"

"ভারি মজার ছেলে তো!"

"হ্যাঁ মা, সে খুব মজার ছেলে।" নায়ীরা একটু অপেক্ষা করে বলল, "কিন্তু শুধু মজার ছেলে নয়, সে খুব কাজের ছেলে। আমরা যখন হেলিকপ্টারটা দখল করেছি তখন সে খুব সাহায্য করেছে। তার সঙ্গে যদি তোমার কখনো দেখা হয়, তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে দিও।"

"দেব, নিশ্চয়ই দেব।"

নায়ীরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "মা।"

"বলো, মা।"

"আমার যে আরো দশটি বোন আছে তাদের কী হবে মা?"

"তাদের উদ্ধার করার জন্য বিশেষ কমান্ডো বাহিনী পাঠানো হয়েছে।"

"তুমি তাদের দেখলে অবাক হয়ে যাবে। তাদের কথা আমি এক মুহূর্ত ভুলতে পারি না।"

"আমি সেটা বুঝতে পারি।"

"তারা কি এখানে আসবে?"

"হ্যাঁ। আসবে, অবশ্যই আসবে।"

নায়ীরা উত্তেজনায় উঠে বসার চেষ্টা করল, নীরা ত্রাতিনা তাকে শান্ত করে শুইয়ে রাখে। নায়ীরা জ্বলজ্বলে চোখে জিজ্ঞেস করল, "কবে আসবে?"

"সবকিছু শেষ করে আসতে আসতে তাদের বেশ কয়েক দিন লেগে যাবে।"

"ও!" হঠাৎ করে নায়ীরার উত্তেজনা দপ করে নিভে গেল। ফিসফিস করে বলল, "কয়েক দিন পর তো আমি বেঁচে থাকব না।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি জানি। এই রাতটি আমার শেষ রাত। আমি জানি।"

নীরা ত্রাতিনা কোনো কথা না বলে নায়ীরার হাতটি নিজের হাতে তুলে নেয়। নায়ীরা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি যদি নাও থাকি তুমি তো থাকবে। তারা একটা বোনকে হারিয়ে একটা মা পাবে। তাই না মা?"

ত্রাতিনা কোনো কথা না বলে নায়ীরার হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পর নায়ীরা আবার ডাকল, "মা।"

"বলো নায়ীরা।"

"পৃথিবীর মানুষ কি সবকিছু জেনে গেছে?"

"হ্যাঁ, তারা সবকিছু জেনেছে।"

"তারা কী বলছে, মা?"

"তারা প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপর ভীষণ রেগেছে। তাদের সদর দপ্তর পুড়িয়ে দিয়েছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার মানুষ অবমানবের দেশে যাচ্ছে তাদের দেখতে, তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে।"

"সত্যি?"

"সত্যি মা। সারা পৃথিবীতে সবার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে, তুমি জান?"

"কে?"

"তুমি।"

"আমি?"

"হ্যাঁ।"

নীরা ত্রাতিনা মিষ্টি করে হাসল, বলল, "তুমি কেমন করে অবমানবের দেশে গিয়ে তাদের রক্ষা করেছ পৃথিবীর সব মানুষ সে কাহিনী জানে। টেলিভিশনে এখন তোমার ওপর একটু পরপর বুলেটিন প্রকাশ করছে। পৃথিবীর সব মানুষ তোমার জন্য প্রার্থনা করছে।"

নায়ীরা জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "সত্যি মা? সত্যি?"

"হ্যাঁ। এই হাসপাতালের বাইরে হাজার হাজার স্কুলের ছেলেমেয়েরা তোমার জন্য ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

"তাদের ভেতরে আসতে দেবে না?"

"না। তুমি সুস্থ না হলে কাউকে ভেতরে আসতে দেবে না।"

নায়ীরার চোখ-মুখের ঔজ্জ্বল্য আবার দপ করে নিভে গেল। সে নিচু গলায় বলল, "কিন্তু আমি তো আর সুস্থ হব না মা।"

ত্রাতিনা নায়ীরার হাত ধরে বলল, "তুমি এখন একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা কর।"

নায়ীরা নীরা ত্রাতিনার হাত ধরে চোখ বন্ধ করল।

ড. নিশিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি দুঃখিত প্রফেসর ত্রাতিনা। আমি খুব দুঃখিত।"

নীরা ত্রাতিনা হাসপাতালের ধবধবে সাদা বিছানায় শুয়ে থাকা নায়ীরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী নিষ্পাপ একটি মুখমণ্ডল! সে যখন পনের বছরের একটা কিশোরী ছিল তখন কি তার মুখমণ্ডল এত নিষ্পাপ ছিল? এইটুকুন মেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অবিচারটির মুখোশ খুলে দিয়েছে, এখনো সেটি নীরা ত্রাতিনা বিশ্বাস করতে পারছে না। অথচ এই মেয়েটিকে বাঁচানো যাবে না?

নীরা ত্রাতিনা ড. নিশিরার দিকে তাকিয়ে বলল, "সারা পৃথিবীর মানুষ এই মেয়েটির জন্য প্রার্থনা করছে।"

"আমি জানি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হাসপাতালের বাইরে হাজার হাজার স্কুলের ছেলেমেয়ে ফুল নিয়ে এসেছে, তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"কিন্তু এই মেয়েটিকে বাঁচানো যাবে না?"

"না প্রফেসর ত্রাতিনা। প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভয়ানক মানুষগুলো তার শরীরকে ভাইরাস জন্মানোর জন্য ব্যবহার করেছে। সেই ভাইরাসগুলো মস্তিষ্ক ছাড়া তার প্রত্যেকটি অঙ্গ কুরে কুরে খেয়েছে। তার হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, কিডনি, ফুসফুস কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই মেয়েটি কেমন করে এখনো বেঁচে আছে সেটিই একটি রহস্য।"

"তাকে কোনোভাবে বাঁচানো যাবে না?"

"না।"

"কোনোভাবেই না?"

"না, প্রফেসর ত্রাতিনা, কোনোভাবেই না। এই মেয়েটিকে বাঁচাতে হলে তার শরীরের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বদলে দিতে হবে। তার দরকার নতুন একটি হৃৎপিণ্ড, নতুন যকৃত, নতুন কিডনি, নতুন ফুসফুস—এক কথায় একটা নতুন দেহ। কোথা থেকে সেটা পাবে?"

"যদি কেউ দিতে রাজি হয়?"

"কে রাজি হবে? তা ছাড়া রাজি হলেই তো হবে না। তার শরীরের সঙ্গে সেগুলো মিলতে হবে। সেটি তো সম্ভব নয়। একটি-দুটি অঙ্গ মেলানো যায়, কিন্তু প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ?"

ত্রাতিনা ফিসফিস করে বলল, "তুমি জান নায়ীরা আমার ক্লোন?"

"হ্যাঁ, জানি।"

"তার মানে জান?"

ড. নিশিরা ত্রাতিনার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ প্রফেসর ত্রাতিনা?"

"আমি বলতে চাইছি যে, আমার প্রত্যেকটি অঙ্গ নায়ীরা ব্যবহার করতে পারবে। আমি আর নায়ীরা আসলে একই মানুষ। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে আমি চেকআপ করিয়েছি, আমি সুস্থ সবল আর নীরোগ।"

ড. নিশিরা খপ করে ত্রাতিনার হাত ধরে বলল, "না, প্রফেসর ত্রাতিনা, এটা হতে পারে না! অসম্ভব—"

নীরা ত্রাতিনা ড. নিশিরার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলল, "তোমার ছেলেমেয়ে আছে?"

"হ্যাঁ আছে।"

"কত জন?"

"দুজন। কিন্তু তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?"

"যদি কখনো এরকম হয়, তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তোমার প্রাণ দিতে হয়, তুমি কি তোমার প্রাণ দেবে?"

"কাল্পনিক প্রশ্ন করো না প্রফেসর ত্রাতিনা।"

"এটা কাল্পনিক প্রশ্ন না। আমি জানি তুমি দেবে। একজন মায়ের কাছে তার নিজের জীবন থেকে সন্তানের জীবন অনেক বড়। নায়ীরা আমার সন্তান। তুমি যদি তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তানের জন্য প্রাণ দিতে পার, আমি কেন পারব না?" ত্রাতিনা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "ড. নিশিরা তুমি অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত হও।"

"না, প্রফেসর ত্রাতিনা, এটা হতে পারে না। তুমি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী—"

"একজন মানুষ তার জীবনে যা পেতে পারে আমি তার সব পেয়েছি। নায়ীরা কিছু পায় নি, সে শুধু দিয়েছে। তাকে আমি ছোট একটা জীবন উপহার দিতে চাই।"

"না, ত্রাতিনা, না—"

"আমি আর নায়ীরা আসলে একই মানুষ। আমার নিজের মধ্যে বেঁচে থাকা আর নায়ীরার মধ্যে বেঁচে থাকা আমার জন্য একই ব্যাপার।"

"না, না, প্রফেসর ত্রাতিনা।" ড. নিশিরা কঠিন গলায় বলল, "তুমি এটা করতে পার না।"

"আমাকে তুমি বাধা দিও না।" নীরা ত্রাতিনা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আর বাধা দিয়েও লাভ নেই, নায়ীরাকে পৃথিবীর সবাই মিলে থামাতে পারে নি। আমাকেও পারবে না। আমি আর নায়ীরা আসলে একই মানুষ, তুমি তো জান।"

ড. নিশিরা হতচকিত চোখে নীরা ত্রাতিনার দিকে তাকিয়ে রইল। নীরা ত্রাতিনা মৃদুস্বরে বলল, "বিদায়।"

ড. নিশিরা কিছু বলল না, কিন্তু সে জানে কথাটি মুখে উচ্চারণ করা না হলেও এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নীরা ত্রাতিনাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। চিরদিনের জন্যই।

AMARBOI.COM

প্রফেসর নীরা ত্রাতিনার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে এক রকম চেহারার এগার জন কিশোরী তার কফিনটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। নায়ীরা তখনো পুরোপুরি সুস্থ হয় নি। হুইল চেয়ারে করে তাকে পিছু পিছু ঠেলে নিয়ে গেছে তিহান নামের একজন সুদর্শন তরুণ।

পৃথিবীর অন্য সব মানুষের সঙ্গে একসময় যাদের অবমানব বলা হত তারাও সেই অনুষ্ঠানটি দেখেছিল। নায়ীরাকে তার চোখের পানি মুছে নিতে দেখে পৃথিবীর অনেক মানুষও তাদের চোখের পানি মুছে নিয়েছিল।

সেই চোখের পানি ছিল একই সঙ্গে দুঃখের এবং ভালবাসার।

মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা

আমি জানি, বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করবে না যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী অনিক লুম্বার নামটা আমার দেওয়া। একজন মানুষ, যার বয়স প্রায় আমার বয়সের কাছাকাছি, তাকে হঠাৎ করে একটা নতুন নাম দিয়ে দেওয়াটা এত সোজা না। হেজিপেজি মানুষ হলেও একটা কথা ছিল কিন্তু অনিক লুম্বা মোটেও হেজিপেজি মানুষ নয়, সে রীতিমতো একজন বিজ্ঞানী মানুষ, তাই কথা নেই বার্তা নেই সে কেন আমার দেওয়া নাম নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে? কিন্তু সে তাই করছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে, "ভাই আপনার নাম?" সে তখন সরল মুখ করে বলে, "অনিক লুম্বা।" মানুষজন যখন অবাক হয়ে তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকায় তখন সে একটু গরম হয়ে বলে, "এত অবাক হচ্ছেন কেন? একজন মানুষের নাম কি অনিক লুম্বা হতে পারে না?" সত্যি কথা বলতে কি, একজন বাঙালির এরকম নাম হবার কথা না, কিন্তু সেটা কেউই তাকে বলতে সাহস পায় না। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে, "পারে পারে, অবশ্যই পারে।" বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা তখন দাঁত বের করে হাসে।

কেমন করে এই নামকরণ হয়েছে সেটা বুঝতে হলে সুব্রতের কথা একটু জানতে হবে। সুব্রত হচ্ছে আমার স্কুলজীবনের বন্ধু। আমরা একসাথে স্কুলে নিল-ডাউন হয়ে থেকেছি, কানে ধরে উঠবস করেছি এবং বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেছি। বড় হবার পর আমার সব বন্ধুবান্ধব বিদেশে পাচার হয়ে গেছে, যারা পাচার হয় নি তারা চাকরিবাকরি বা ব্যবসাপাতি করে এত উপরে উঠে গেছে যে আমার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। হঠাৎ কোথাও দেখা হলে তারা না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে। নিতান্তই সেই সুযোগ না হলে অবাক হবার ভান করে বলে, "আরে! জাফর ইকবাল না?"

আমি বলি, "হ্যাঁ। আমি জাফর ইকবাল।" সে তখন আপনি-তুমি বাঁচিয়ে বলে, "আরে! কী খবর? আজকাল কী করা হয়?"

আমি বিশেষ কিছু করি না, সেটা বলা শুরু করতেই তারা ইতিউতি তাকাতে থাকে, ঘড়ি দেখতে থাকে আর হঠাৎ করে আমার কথার মাঝখানে বলে ওঠে, "ইয়ে, খুব ব্যস্ত আজকে। সময় করে একদিন অফিসে চলে আসলে কেমন হয়? আড্ডা মারা যাবে তখন! হা হা হা।"

তারপর সুড়ুৎ করে সরে পড়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই একদিন আমি তাদের অফিসে গিয়ে হাজির হব, তখন দেখি তারা কী করে, কেমন করে আমার কাছ থেকে পালায়! তবে সুব্রত মোটেও এরকম না, তার কথা একেবারে আলাদা। সুব্রতের সাথে আমার পুরোপুরি যোগাযোগ আছে, সত্যি কথা বলতে কি আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগাযোগ না থাকলেই মনে হয় ভালো ছিল। প্রায়ই মাঝরাতে ফোন করে ডেকে বলে, "কী হল? ঘুমাচ্ছিস নাকি?"

একজন মানুষ তো ঘুমাতে ঘুমাতে টেলিফোনে কথা বলতে পারে না, সেজন্যে তো তাকে জেগে উঠতে হবে, তাই আমি বলি, "না, মানে ইয়ে—" সুব্রত তখন বলে, "তোকে কোনো বিশ্বাস নেই। সন্ধে হবার আগেই নাক ডাকতে থাকিস। এদিকে কী হয়েছে জানিস?"

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, "কী?"

সুব্রত গলা নামিয়ে চাপা স্বরে বলে, "একেবারে ফাটাফাটি ব্যাপার!" সে তখন ফাটাফাটি ব্যাপারটার বর্ণনা দেয়, তবে কখনোই সেটা সত্যিকার ফাটাফাটি কিছু হয় না। ব্যাপারটা হয় কবিতা পাঠের আসর, বাউল সম্মেলন, মাদার গাছ রক্ষা আন্দোলন কিংবা সবার জন্য জোছনার আলো এই ধরনের কিছু। কোথাও বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো হলেই সুব্রত মহা উৎসাহে ত্রাণ কাজে লেগে যায়। তাকে দেখলেই মনে হয় তার বুঝি জন্মই হয়েছে অন্য মানুষের কাজ করার জন্যে। মানুষের সেবা করা খুব ভালো ব্যাপার, কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়—তার ধারণা আমাদের সবারও বুঝি জন্ম হয়েছে তার সাথে সাথে দুনিয়ার সব রকম পাগলামিতে যোগ দেওয়ার জন্যে।

রাত্রিবেলা ঘুমাচ্ছি, গভীর রাতে হঠাৎ বিকট শব্দে টেলিফোন বাজতে থাকে। মাঝরাতে টেলিফোন বাজলেই মনে হয় বুঝি ভয়ংকর কোনো একটা দুঃসংবাদ। আমি লাফিয়ে ঘুম থেকে উঠে হাচড়-পাচড় করে কোনোমতে দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন ধরে বললাম, "হ্যালো।"

অন্যপাশে সুব্রতের অমায়িক গলা, "জাফর ইকবাল?"

হঠাৎ করে ঘুম থেকে তুললে আমার ব্রেন শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, আমি অনেকক্ষণ কিছু বুঝতে পারি না। কোনোমতে বললাম, "হাঁহ?"

"কাল কী করছিস?"

আমি আবার বললাম, "হাঁহ?"

সুব্রত নিজেই নিজের উত্তর দিল, "কী আর করিস? তুই কোনো দিন কাজকর্ম করিস? বসে বসে খেয়ে তুই কী রকম খাসির মতো মোটা হয়েছিস খেয়াল করেছিস? সকালবেলা চলে আয়। ওসমানী মিলনায়তনে। সকাল ন'টা শার্প।"

আমি বললাম, "হাঁহ?"

"দেরি করিস না। খুব জরুরি।"

"হাঁহ?" এতক্ষণে আমার ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে—কে ফোন করেছে, কেন ফোন করেছে, কী বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করব, সুব্রত ততক্ষণে ফোন রেখে দিয়েছে। আমি আধো-ঘুম আধো-জাগা অবস্থায় আবার কোনোমতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠেছি তখন আবছা আবছাভাবে মনে পড়ল যে রাতে কেউ একজন ফোন করে কিছু একটা বলেছিল। কিন্তু কে ফোন করেছিল, কেন ফোন করেছিল, ফোন করে কী বলেছিল কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা করতে বসেছি, দুই টুকরা রুটি টোস্ট একটা কলা খেয়ে ডাবল ডিমের পোচটা মাত্র মুখে দিয়েছি, তখন দরজায় প্রচণ্ড শব্দ। খুলে দেখি সুব্রত। আমাকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই এখনো রেডি হোস নাই?"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "কিসের জন্যে রেডি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রাত্রে যে বললাম?"

"কী বললি?"

"ওসমানী মিলনায়তনে। সকাল ন'টায়। মনে নাই?"

"ঘুমের মাঝে কথা বললে আমার কিছু মনে থাকে না।"

সুব্রত অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বলল. "কোনো দায়িত্বজ্ঞান নাই, কাণ্ডজ্ঞান নাই, এই জন্যে তোদেরকে দিয়ে কিছু হয় না। ওঠ। এখনি ওঠ। যেতে হবে।"

আমি দুর্বলভাবে বললাম, "মাত্র নাস্তা করতে বসেছিলাম। তুইও আয়। কিছু একটা খা।"

"সব সময় শুধু তোর খাই খাই অভ্যাস।" টেবিলে আমার ডাবল ডিমের পোচ দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, "খাসির মতো মোটা হয়েছিস আর এখনো ডিম খেয়ে যাচ্ছিস? জানিস না ডিমে কোলেস্টেরল থাকে? আর খেতে হবে না। ওঠ। তোর শরীরে যে মেদ আর চর্বি আছে এক মাস না খেলেও কিছু হবে না।"

কাজেই আমাকে তখন তখনই উঠতে হল এবং সুব্রতের সাথে বের হতে হল। যেতে যেতে সুব্রত বলল যে সে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ওসমানী মিলনায়তনে পদচারী বিজ্ঞানী সম্মেলনে। পদচারী বিজ্ঞানী কী ব্যাপার সেটা জিজ্ঞেস করব কিনা সেটা নিয়ে একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেললাম। সুব্রত তখন ধমক দিয়ে বলল, "তুই কোন দুনিয়ায় থাকিস?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কেন কী হয়েছে?"

"পত্রিকায় দেখিস নি, সারা দুনিয়ায় পদচারী বিজ্ঞানীদের নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে? বিজ্ঞান এখন আর শুধু ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় ল্যাবরেটরিতে থাকবে না। বিজ্ঞান এখন সাধারণ মানুষের কাছে ছড়িয়ে যাবে। গরিব-দুঃখী মানুষও এখন বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবে। চাষী-মজুর গবেষণা করবে। স্কুলের ছাত্র গবেষণা করবে। ঘরের বউ গবেষণা করবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে বেয়ারফুট সায়েন্টিস্টস মুভমেন্ট। আমরা বাংলা করেছি পদচারী বিজ্ঞানী আন্দোলন। গত সপ্তাহে প্রথম আলোতে বিশাল ফিচার বের হয়েছে, পড়িস নি?"

পত্রিকায় যেসব খবর বের হয় সেগুলো দেখলেই মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায় বলে আমি যে বহুদিন হল খবরের কাগজ পড়াই ছেড়ে দিয়েছি সেটা বলে আর নতুন করে সুব্রতের গালমন্দ খেলাম না। বললাম, "নাহ! খেয়াল করি নি।"

"তুই কোন জিনিসটা খেয়াল করিস?" সুব্রত রেগেমেগে বলল, "তুই যে দুই পায়ে দুই রঙের মোজা পরে আছিস সেটা খেয়াল করেছিস?"

মানুষকে কেন দুই পায়ে এক রঙের মোজা পরতে হবে সেটা আমি কখনোই বুঝতে পারি নি। দুই পায়ে এক রকম মোজা পরতে হবে আমি সেটা মানতেও রাজি না। তাই মোজা পরার সময় হাতের কাছে যেটা পাই সেটাই পরে ফেলি। কিন্তু সুব্রতের কাছে সেটা স্বীকার করলাম না। পাগুলো সরিয়ে নিতে নিতে অবাক হবার ভান করে বললাম, "আরে তাই তো! এক পায়ে বেগুনি অন্য পায়ে হলুদ! কী আশ্চর্য! নিশ্চয়ই তাড়াহুড়া করে পরে ফেলেছি।"

"অসম্ভব!" সুব্রত বলল, "তুই নিশ্চয়ই কালার ব্লাইন্ড। কোনো সুস্থ মানুষ দুই পায়ে এরকম ক্যাটক্যাটে রঙের দুটো মোজা পরতে পারে না। ভুল করেও পরতে পারে না।"

আমি আলাপটা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যে বললাম, "তা, তুই পদচারী বিজ্ঞানী নিয়ে কী যেন বলছিলি?"

"হ্যাঁ, এরা হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের বিজ্ঞানী। এরা কেউই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর না। এরা কেউ পিএইচ-ডি না, এরা কেউ বড় বড় ল্যাবরেটরিতে কাজ করে না। এদের কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে গ্রামে, কেউ শহরে। কেউ পুরুষ, কেউ মহিলা। কেউ ছোট, কেউ বড়। কেউ চাষী, কেউ মজুর। এরা নিজেদের মতো বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে। এদের আবিষ্কার হচ্ছে জীবনের সাথে সম্পর্ক নিয়ে আবিষ্কার, প্রয়োজনের আবিষ্কার..."

সুব্রত কথা বলতে পছন্দ করে, একবার লেকচার দিতে শুরু করলে আর থামতে পারে না, একেবারে টানা কথা বলে যেতে লাগল। একবার নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু দম নিতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে কী করব?"

সুব্রত অবাক হয়ে বলল, "কী করবি মানে? সাহায্য করবি।"

"সাহায্য করব? আমি?" এবারে আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমি বিজ্ঞানের 'ব'ও জানি না।"

"তোকে বিজ্ঞানের কাজ করতে হবে কে বলেছে? তুই ভলান্টিয়ারের কাজ করবি। কনভেনশনটা যেন ঠিকমতো হয় সেই কাজে সাহায্য করবি।"

আমি ঢোক গিলে চোখ কপালে তুলে বললাম, "ভলান্টিয়ারের কাজ করব? আমি?"

"কেন, অসুবিধে কী আছে?" সুব্রত চোখ পাকিয়ে বলল, "সব সময় স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কাজ করবি? অন্যের জন্যে কিছু করবি না?"

সুব্রতের সাথে কথা বলে কোনো লাভ নেই বলে আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ করে রইলাম।

তবে আমি যে শুধু স্বার্থপরের মতো নিজের জন্যে কাজ করি অন্যের জন্যে কিছু করি না, সেটা সত্যি না। আমার বড় বোনের ছোট মেয়ের বিয়ের সময় আমি গেস্টদের খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। খাবার পরিবেশন করার সময় টগবগে গরম খাসির রেজালার বাটিটা একজন মেজর জেনারেলের কোলে পড়ে গেল। সাথে সাথে সেই মেজর জেনারেলের সে কী গগনবিদারী চিৎকার! ভাগ্যিস অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল। তা না হলে আমার অবস্থা কী হত কে জানে! আরেকবার পাড়ার ছেলেপিলেরা রবীন্দ্রজয়ন্তী করছে, আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে স্টেজে পরদা টানার জন্যে। প্রধান অতিথি বক্তৃতা শেষ করেছে, আমার তখন পরদা টানার কথা, আস্তে আস্তে পরদা টানছি, হঠাৎ করে পরদা কোথায় জানি আটকে গেল। পরদা খোলার জন্যে যেই একটা হ্যাঁচকা টান দিয়েছি সাথে সাথে বাঁশসহ পরদা হুড়মুড় করে প্রধান অতিথির ঘাড়ে! চিৎকার হইচই চেঁচামেচি সব মিলিয়ে এক হুলস্থূল কাণ্ড। এইসব কারণে আমি আসলে অন্যকে সাহায্য করতে যাই না। তারপরেও মাঝে মাঝে সাহায্য না করে পারি না। একদিন শাহবাগের কাছে হেঁটে যাচ্ছি, দেখি রাস্তার পাশে এক বৃদ্ধ মহিলা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, অসংখ্য বাস-ট্রাক-গাড়ির ভেতর রাস্তা পার হবার সাহস পাচ্ছেন না। আমি তাকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিলাম। রাস্তা পার করার সময় দুর্বলভাবে কী একটা বলার চেষ্টা করলেন আমি ঠিক শুনতে পাই নি। কিন্তু রাস্তার অন্য পাশে এসে ভদ্রমহিলার সে কী চিৎকার। বৃদ্ধ মহিলা নাকি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তার ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, মোটেও রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছিলেন না!

এরকম নানা ধরনের অভিজ্ঞতার কারণে আমি আজকাল মোটেও অন্যের জন্যে কাজ করতে চাই না। নিজের জন্যে কাজ করে নিজেকে বিপদে ফেলে দিলে কেউ তার খবর পায় না। কিন্তু অন্যের জন্যে কাজ করে তাকে মহাগাড্ডার মাঝে ফেলে দিলে তারা তো আমাকে ছেড়ে দেবে না। সুব্রতের সাথে সেটা নিয়ে কথা বলে কোনো লাভ নেই, সে আবার আরেকটা বিশাল লেকচার শুরু করে দেবে। আমি কিছু না বলে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপচাপ বসে রইলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসমানী মিলনায়তনে এসে দেখি হুলস্থুল ব্যাপার। হাজার হাজার মানুষ গিজগিজ করছে। হলের ভেতরে সারি সারি টেবিল, সেই টেবিলে নানা রকম বিচিত্র জিনিস সাজানো। পচা গোবর থেকে শুরু করে জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্র, কী নেই সেখানে! হলে পৌঁছেই সুব্রত আমাকে ফেলে রেখে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। আমি একা একা কী করব বুঝতে না পেরে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। সুব্রত একটু চোখের আড়াল হলে সটকে পড়ার একটা চিন্তা যে মাথায় খেলে নি তা নয়, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সুব্রত এক বান্ডিল কাগজ নিয়ে হঠাৎ আমার কাছে দৌড়ে এল। আমার দিকে তাকিয়ে মুখ খিঁচিয়ে বলল, "তুই লাট সাহেবের মতো এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, মানে?"

আমি আমতা–আমতা করে বললাম, "কী করব আমি?"

"কী করবি সেটা আমাকে বলে দিতে হবে? দেখছিস না কত কাজ? এই পাশে রেজিস্ট্রেশন, ওই পাশে এক্সিবিট সাজানো, ওই দিকে পাবলিক ম্যানেজমেন্ট, ডান দিকে সেমিনার রুম, মাঝখানে ইনফরমেশন ডেস্ক, সব জায়গায় ভলান্টিয়ার দরকার। কোনো এক জায়গায় লেগে যা।"

আমি আমতা–আমতা করে বললাম, "আ-আমি লাগতে পারব না। আমাকে কোথাও লাগিয়ে দে, কী করতে হবে বলে দে।"

সুব্রত বিরক্ত হয়ে বলল, "তোকে দিয়ে দুনিয়ার কোনো কাজ হয় না। আয় আমার সাথে।"

আমি সুব্রতের পিছু পিছু গেলাম, সে রেজিস্ট্রেশন এলাকার একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, "নে, পদচারী বিজ্ঞানীদের রেজিস্ট্রেশনে সাহায্য কর।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "সেটা কীভাবে করতে হয়?"

সুব্রত ধমক দিয়ে বলল, "সবকিছু বলে দিতে হবে নাকি? আশপাশে যারা আছে তাদের কাছ থেকে বুঝে নে।"

সুব্রত তার কাগজের বান্ডিল নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গি করে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় জানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আমার দুই পাশে তাকালাম, বাম দিকে বসেছে হাসিখুশি একজন মহিলা। ডান দিকে গোমড়ামুখো একজন মানুষ। কী করতে হবে সেটা হাসিখুশি মহিলাকে জিজ্ঞেস করতেই আমার দিকে চোখ পাকিয়ে একটা ধমক দিয়ে বসলেন। তখন গোমড়ামুখো মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলাম। মানুষটা গোমড়ামুখেই কী করতে হবে বুঝিয়ে দিল। কাজটা খুব কঠিন নয়, টাকা জমা দেওয়ার রসিদ নিয়ে পদচারী বিজ্ঞানীরা আসবেন, রেজিস্টার খাতায় তাদের নাম লিখতে হবে, তারপর ব্যাজে তাদের নাম লিখে ব্যাজটা তাদের হাতে ধরিয়ে দিতে হবে। পানির মতো সোজা কাজ।

একজন একজন করে বিজ্ঞানীরা আসতে থাকে, আমি রেজিস্টার খাতায় তাদের নাম তুলে, ব্যাজে নাম লিখে তাদের হাতে ধরিয়ে দেই, তারা সেই ব্যাজ বুকে লাগিয়ে চলে যেতে থাকে। বানানের জ্ঞান আমার খুব ভালো না, যার নাম গোলাম আলী তাকে লিখলাম গুলাম আলী, যার নাম রইস উদ্দিন তাকে লিখলাম রাইচ উদ্দিন, যার নাম খোদেজা বেগম তাকে লিখলাম কুদিজা বেগম—কিন্তু পদচারী বিজ্ঞানীরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। মনে হয় বেশিরভাগই লেখাপড়া জানে না, আর যারা জানে তারা নামের বানানের মতো ছোটখাটো জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কাজ করতে করতে আমার ভেতরে মোটামুটি একটা আত্মবিশ্বাস এসে গেছে, এরকম সময় লম্বা এবং হালকা-পাতলা একজন মানুষ টাকার রসিদ নিয়ে আমার সামনে রেজিস্ট্রেশন করতে দাঁড়াল। আমি রসিদটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার নাম?"

AMARBOI.COM

মানুষটার নাকের নিচে বড় বড় গোঁফ, চুল এলোমেলো এবং মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দুই হাতে সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে মানুষটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কী নাম?"

মানুষটা এবারে একটা নিশ্বাস ফেলে কেমন যেন কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "আসলে বলছিলাম কী, আমার নাম অনিক লুম্বা।"

আমি একটু অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকালাম। অনিক লুম্বা আবার কী রকম নাম? মানুষটাকে দেখে তো বাঙালিই মনে হয়, কথাও বলল বাংলায়। তা হলে এরকম অদ্ভুত নাম কেন? অনিক হতে পারে। কিন্তু লুম্বা? সেটা কী রকম নাম? আমি অবিশ্যি মানুষটাকে তার নাম নিয়ে ঘাঁটালাম না, অন্যের নাম নিয়ে আমি তো আর খ্যাচম্যাচ করতে পারি না। নামটা রেজিস্টার খাতায় তুলে ঝটপট ব্যাজে নাম লিখে তার হাতে ধরিয়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম না ঠিক কী কারণে মানুষটা ব্যাজটা হাতে নিয়ে কেমন যেন হতচকিতের মতো আমার দিকে তাকাল। মনে হল কিছু একটা বলবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বলল না। কেমন যেন মুচকি হাসল তারপর ব্যাজটা বুকে লাগিয়ে হেঁটে হেঁটে ভিড়ের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার বাম পাশে বসে থাকা হাসিখুশি মহিলা আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, "কী নাম লিখেছেন?"

আমি বললাম, "অনিক লুম্বা।"

"এরকম বিদঘুটে একটা জিনিস কেন লিখলেন?"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "যে নাম বলেছে সে নাম লিখব না?"

হাসিখুশি মহিলা রাগ-রাগ মুখে বললেন, "ভদ্রলোক মোটেও তার নাম অনিক লুম্বা বলে নাই।"

"তা হলে কী বলেছে?"

"আপনি তাকে নাম বলার সুযোগ পর্যন্ত দেন নাই। তার নামটা একটু লম্বা। তাই আপনাকে বলেছেন, "আমার নাম অনেক লম্বা" আর সাথে সাথে আপনি লিখে ফেললেন অনিক লুম্বা। অনিক লুম্বা কখনো কারো নাম হয়? শুনেছেন কখনো?"

আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম, আমতা–আমতা করে বললাম, "কিন্তু ভদ্রলোক তো আপত্তি করলেন না। ব্যাজটা নিয়ে বেশ খুশি খুশি হয়ে চলে গেলেন।"

হাসিখুশি মহিলা সরু চোখ করে বললেন, "ভদ্রলোক আপনাকে দেখেই বুঝেছেন আপত্তি করে কোনো লাভ নেই। যেই মানুষ বলার আগেই নাম লিখে ফেলে তার সাথে কথা বাড়িয়ে বিপদে পড়বে নাকি?"

আমি থতমত খেয়ে গলা বাড়িয়ে 'অনিক লুম্বা'কে খুঁজলাম কিন্তু সেই মানুষটা তখন ভিড়ের মাঝে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে।

সামনে পদচারী বিজ্ঞানীদের অনেক লম্বা লাইন হয়ে গেছে, তাই আবার কাজ শুরু করতে হল। কিন্তু একটা মানুষের ব্যাজে এরকম একটা বিদঘুটে নাম লিখে দিয়েছি বলে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। আমার পাশে বসে থাকা হাসিখুশি মহিলা সবার সাথে হাসিমুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেও একটু পরে পরে আমার দিকে তাকিয়ে বিষদৃষ্টিতে মুখ ঝামটা দিতে লাগলেন। আমি কী করব বুঝতে না পেরে একটু পরে পরে লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাজ করে যেতে লাগলাম।

রেজিস্ট্রেশন কাজ শেষ হবার পর আমি বিজ্ঞানী 'অনিক লুম্বা'কে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। হলঘরে ছোট ছোট অনেক টেবিল বসানো হয়েছে, সেই টেবিলগুলোর ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদচারী বিজ্ঞানীদের নানারকম গবেষণা সাজানো। গোবর নিয়ে নিশ্চয়ই অনেকগুলো আবিষ্কার রয়েছে কারণ হলঘরের ভেতরে কেমন জানি গোবর গোবর গন্ধ। টেবিলে নানারকম গাছপালা, গাছের চারা এবং অর্কিড সাজানো। অদ্ভুত ধরনের কিছু ছেনি এবং হাতুড়িও আছে। বোতলে বিচিত্র ধরনের মাছ, কিছু হাঁড়ি-পাতিল এবং চুলাও টেবিলে সাজানো রয়েছে। অল্প কিছু টেবিলে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি এবং ইলেকট্রনিক সার্কিট সাজানো। এরকম একটা টেবিলে গিয়ে আমি অনিক লুম্বাকে পেয়ে গেলাম। তাকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় এবং সে খুব উৎসাহ নিয়ে জটিল একটা যন্ত্র কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। বোঝানো শেষ হলেও কয়েকজন মানুষ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, একজন একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "ভাই আপনি কোন দেশী?"

"কেন? বাংলাদেশী।"

"তা হলে আপনার নামটা এরকম কেন?"

"কী রকম?"

"এই যে অনিক লুম্বা। অনিক ঠিক আছে। কিন্তু লুম্বা আবার কী রকম নাম?"

অনিক লুম্বা দাঁত বের করে হেসে বলল, "লুম্বা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস নাম। আরেকটু হলে এটা লুমুম্বা হয়ে যেত। প্যাট্রিস লুমুম্বার নাম শুনেন নাই?" মানুষটি কী বলবে বুঝতে না পেরে একটু দেঁতো হাসি হেসে চলে গেল। যখন ভিড় একটু পাতলা হয়েছে তখন আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, "এই যে ভাই। দেখেন, আমি খুবই দুঃখিত।"

"কেন? আপনি কেন দুঃখিত?"

"আমি রেজিস্ট্রেশনে ছিলাম। আপনার নাম কী সেটা না শুনেই ভুল করে অনিক লুম্বা লিখে দিয়েছি!"

মানুষটা এবারে আমাকে চিনতে পারল এবং সাথে সাথে হা হা করে হাসতে শুরু করল। আমার লজ্জায় একেবারে মাটির সাথে মিশে যাবার অবস্থা হল, কোনোমতে বললাম, "আমাকে লজ্জা দেবেন না, প্লিজ। আপনার ব্যাজটা দেন আমি ঠিক করে দিই।"

মানুষটা গোঁফ নাচিয়ে বলল, "কেন? অনিক লুম্বা নামটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না?"

আমি বললাম, "আসলে তো এটা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার না। এটা শুদ্ধ-অশুদ্ধের ব্যাপার। আপনার নামটা না শুনেই আজগুবি কী একটা লিখে দিলাম। ছি–ছি, কী লজ্জা!"

"কে বলেছে আজগুবি নাম?" মানুষটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "অনিক লুম্বা খুব সুন্দর নাম। এর মাঝে কেমন জানি বিপ্লবী বিপ্লবী ভাব আছে।"

আমি দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বললাম, "কেন আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?"

মানুষটা চোখ-মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না। এই নামটা আসলেই আমার পছন্দ হয়েছে। আমি এটাই রাখব।"

"এটাই রাখবেন?"

"হ্যাঁ। কনভেনশন শেষ হবার পরও আমার এই নাম থাকবে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আর আপনার আসল নাম? সার্টিফিকেটের নাম?"

"সার্টিফিকেটের নাম থাকুক সার্টিফিকেটে।" মানুষটা মুখ শক্ত করে বলল, "আমি সার্টিফিকেটের খেতা পুড়ি।"

আমি বললাম, "কিন্তু—"

"এর মাঝে কোনো কিন্তু–ফিন্তু নাই।" মানুষটি তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি ঘ্যাচঘ্যাচ করে

চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আমার যখন জন্ম হয় তখন আমার দাদা আমার নাম রাখলেন কুতুব আলী। আমার নানা আমার জন্মের খবর পেয়ে টেলিগ্রাম করে আমার নাম পাঠালেন মুহম্মদ ছগীর উদ্দিন। আমার মায়ের আবার পছন্দ মডার্ন টাইপের নাম, তাই মা নাম রাখলেন নাফছি জাহাঙ্গীর। আমার বাবা ছিলেন খুব সহজ-সরল ভালোমানুষ টাইপের। ভাবলেন কার নামটা রেখে অন্যের মনে কষ্ট দেবেন? তাই কারো মনে কষ্ট না দিয়ে আমার নাম রেখে দিলেন কুতুব আলী মুহম্মদ ছগীর উদ্দিন নাফছি জাহাঙ্গীর। সারা জীবন এই বিশাল নাম ঘাড়ে করে বয়ে বয়ে একেবারে টায়ার্ড হয়ে গেছি। আমার এই দুই কিলোমিটার লম্বা নামটা ছিল সত্যিকারের যন্ত্রণা। আজকে আপনি সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন। এখন থেকে আমি আর কুতুব আলী মুহম্মদ ছগীর উদ্দিন নাফছি জাহাঙ্গীর না।"

মানুষটি নিজের বুকে একটা থাবা দিয়ে বলল, "এখন থেকে আমি অনিক লুম্বা।"

আমি খানিকটা বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মানুষটি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম?"

আমি বললাম, "জাফর ইকবাল।"

মানুষটি তখন তার হাত আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুব খুশি হয়েছি জাফর ইকবাল সাহেব।"

আমি তার সাথে হাত মিলালাম এবং এইভাবে আমার বিজ্ঞানী অনিক লুম্বার সাথে পরিচয় হল।

AMARBOI.COM

মশা

পদচারী বিজ্ঞানী কনভেনশনে অনিক লুম্বার সাথে পরিচয় হবার পর আমি একদিন তার বাসায় বেড়াতে গেলাম। কেউ যেন মনে না করে আমি খুব মিশুক মানুষ, আর কারো সাথে পরিচয় হলেই মিষ্টির বাক্স নিয়ে তার বাসায় বেড়াতে যাই। আমি কখনোই কারো বাসায় বেড়াতে যাই না, কারণ কোথাও গেলে কী নিয়ে কথা বলতে হয় আমি সেটা জানি না। আগে যখন পত্রিকা পড়তাম তখন দেশে-বিদেশে কী হচ্ছে তার হালকা মতন একটা ধারণা ছিল, পত্রিকা পড়া ছেড়ে দেবার পর এখন কোথায় কী হচ্ছে সে সম্পর্কে একেবারে কোনো ধারণা নেই। দেশের সেরা মাস্তান কি গাল কাটা বক্কর নাকি নাক ভাঙা জব্বর, সেটাও আমি আজকাল জানি না। কোন নায়ক ভালো মারপিট করে, কোন নায়িকা সবচেয়ে মোটা, কোন গায়কের গলা সবচেয়ে মিষ্টি, কোন কবির কবিতা ফাটাফাটি, এমনকি কোন মন্ত্রী সবচেয়ে বড় চোর সেটাও আমি জানি না! কাজেই লোকজনের সাথে বসে কথাবার্তা বলতে আমার খুব ঝামেলা হয়। কেউ হাসির কৌতুক বললেও বেশিরভাগ সময়ে সেটা বুঝতে পারি না, যদিবা বুঝতে পারি তা হলে ঠিক কোথায় হাসতে হবে সেটা ধরতে পারি না, ভুল জায়গায় হেসে ফেলি! সেজন্য আমি মানুষজন এড়িয়ে চলি, তবে অনিক লুম্বার কথা আলাদা। কেন জানি মনে হচ্ছে আমার এই মানুষটার বাসায় যাওয়া দরকার। মানুষটা অন্য দশজন মানুষের মতো না।

বাসা খুঁজে বের করে দরজায় শব্দ করতেই অনিক লুম্বা দরজা খুলে দিল। আমার কথা মনে আছে কিনা কে জানে, তাই নতুন করে পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম। অনিক লুম্বা তার আগেই চোখ বড় বড় করে বলল, "আরে! জাফর ইকবাল সাহেব! কী সৌভাগ্য!"

আমি চোখ ছোট ছোট করে অনিক লুম্বার দিকে তাকিয়ে সে ঠাট্টা করছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম, এর আগে কেউ আমাকে দেখাটা সৌভাগ্য বলে মনে করে নি। বরং উল্টোটা হয়েছে—দেখা মাত্রই কেমন জানি মুষড়ে পড়েছে। তবে অনিক লুম্বাকে দেখে মনে হল মানুষটা আমাকে দেখে আসলেই খুশি হয়েছে। আমার হাত ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "কী আশ্চর্য! আমি ঠিক আপনার কথাই ভাবছিলাম।"

যারা আমার কাছে টাকাপয়সা পায় তারা ছাড়া অন্য কেউ আমার কথা ভাবতে পারে আমি চিন্তা করতে পারি না। অবাক হয়ে বললাম, "আমার কথা ভাবছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"বসে বসে চিঠিপত্র লিখছিলাম। চিঠির শেষে নিজের নামের জায়গায় কুতুব আলী মুহম্মদ ছগীর উদ্দিন নাফছি জাহাঙ্গীর না লিখে লিখছি অনিক লুম্বা! কী সহজ। কী আনন্দ। আপনার জন্যেই তো হল।"

"সেটা তো আপনি নিজেই করতে পারতেন!"

"কিন্তু করি নাই। করা হয় নাই।" অনিক লুম্বা আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে বলল, "ভেতরে আসেন। বসেন।"

আমি না হয়ে অন্য যে কোনো মানুষ হলে ভাবত ঘরে বসার জায়গা নাই। সোফার উপরে বইপত্র-খাতা-কলম এবং বালিশ। একটা চেয়ারের ওপর স্তূপ হয়ে থাকা কাপড়, শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি এবং আন্ডারওয়্যার। টেবিলে নানারকম যন্ত্রপাতি, প্লেটে উচ্ছিষ্ট খাবার, পেপসির বোতল। ঘরের দেওয়ালে কয়েকটা পোস্টার টেপ দিয়ে লাগানো। কয়েকটা শেলফ, শেলফে অনেক বই এবং নানারকম কাগজপত্র। ঘরের মেঝেতে জুতো, স্যান্ডেল, খালি চিপসের প্যাকেট, কলম, পেন্সিল, নাট-বল্টু এবং নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। দেওয়ালে কটকটে একটা লাইট। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি অন্য যে কোনো মানুষ এই ঘরে এলে বলত, "ইস! এই মানুষটা কী নোংরা, ঘরবাড়ি কী অগোছালো ছি!" কিন্তু আমার একবারও সেটা মনে হল না—আমার মনে হল আমি যেন একেবারে নিজের ঘরে এসে ঢুকেছি। ঘরের নানা জায়গায় এই যন্ত্রপাতিগুলো ছড়ানো-ছিটানো না থাকলে এটা একেবারে আমার ঘর হতে পারত। সোফার কম্বল বালিশ একটু সরিয়ে আমি সাবধানে বসে পড়লাম, লক্ষ রাখলাম কোনো কাগজপত্র যেন এতটুকু নড়চড় না হয়। যারা খুব গোছানো এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ তাদের ধারণা অগোছালো মানুষের সবকিছু এলোমেলো, কিন্তু এটা সত্যি না। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি এই ঘরের ছড়ানো-ছিটানো কাগজগুলো কোনটা কী সেটা অনিক লুম্বা জানে, আমি যদি একটু উনিশ-বিশ করে দেই তাহলে সে আর কোনো দিন খুঁজে পাবে না। আমরা যারা অগোছালো আর নোংরা মানুষ সবকিছুতেই আমাদের একটা সিস্টেম আছে, সাধারণ মানুষ সেটা জানে না।

অনিক লুম্বা জিজ্ঞেস করল, "কী খাবেন? চা, কফি?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না, কোনোটাই খাব না।"

অনিক লুম্বা তখন হা হা করে হাসতে লাগল। আমি বললাম, "কী হল, হাসছেন কেন?"

AMARBOI.COM

"হাসছি চিন্তা করে যদি আপনি বলতেন যে চা না হলে কফি খাবেন, তা হলে আমি কী করতাম? আমার বাসায় চা আর কফি কোনোটাই নাই!"

মানুষটাকে যতই দেখছি ততই আমার পছন্দ হয়ে যাচ্ছে। আমি সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসে বললাম, "আমি যে হঠাৎ করে চলে এসেছি তাতে আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

"আপনি না হয়ে যদি অন্য কেউ হত তা হলে অসুবিধে হত। কী নিয়ে কথা বলতাম সেটা চিন্তা করেই পেতাম না।"

আমি সোজা হয়ে বসলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু আমার সাথে আপনার কথা বলতে কোনো অসুবিধে হবে না?"

"মনে হয় হবে না।"

"কেন?"

"কারণটা খুব সহজ।" অনিক লুম্বা আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার দুপায়ে দুরকম মোজা। যে মানুষ দুপায়ে দুরকম মোজা পরে কোথাও বেড়াতে চলে আসে তার সাথে আমার খাতির হওয়ার কথা!"

আমি অবাক হয়ে বললাম "কেন?"

"এই যে এই জন্যে" বলে সে তার প্যান্টটা ওপরে তুলল এবং আমি হতবাক হয়ে দেখলাম তারও দুই পায়ে দুই রকম মোজা। ডান পায়ে লাল রঙের বাম পায়ে হলুদ চেক চেক। অনিক লুম্বা বলল, "আমি অনেক মানুষের সাথে কথা বলেছি, কাউকে বোঝাতে পারি নাই যে দুপায়ে এক রকম মোজা পরার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। আপনি একমাত্র মানুষ যে নিজে থেকে আমার যুক্তি বিশ্বাস করেন।"

আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, "শুধু মোজা নয়, আপনার সাথে আমার আরো মিল আছে।"

অনিক লুম্বা অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কী রকম মিল?"

"আমার বাসা ঠিক একই রকম। সোফাতে বালিশ-কম্বল। চেয়ারে কাপড়-জামা। ফ্লোরে সব দরকারি কাগজপত্র।"

"কী আশ্চর্য!" অনিক লুম্বা হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, "আচ্ছা একটা জিনিস বলেন দেখি?"

"কী জিনিস?"

"মানুষ যখন গল্পগুজব করার সময় জোক্স বলে আপনি সেগুলো ধরতে পারেন?"

"বেশিরভাগ সময় ধরতে পারি না।"

অনিক লুম্বা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছেন আমাদের দুজনের মাঝে অনেক মিল।"

তার কী কী খেতে ভালো লাগে সেটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন ঘরের ভেতর থেকে হঠাৎ গুঞ্জনের মতো শব্দ হল। শব্দটা হঠাৎ বাড়তে বাড়তে প্রায় প্লেনের ইঞ্জিনের মতো বিকট শব্দ করতে থাকে। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কিসের শব্দ?"

অনিক লুম্বা মাথা নেড়ে বলল, "মশা।"

"মশা!" আমি অবাক হয়ে বললাম, "এটা আবার কী রকম মশা? একেবারে প্লেনের ইঞ্জিনের মতো শব্দ!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অনেক মশা। আমি মশার চাষ করি তো।"

"মশার চাষ?" আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "মশার আবার চাষ করা যায় নাকি?"

"করা যাবে না কেন? মানুষ যদি সবজির চাষ করতে পারে, মাছের চাষ করতে পারে তা হলে মশার চাষ করতে পারবে না কেন?"

আমি দুর্বলভাবে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করলাম, "সবজি আর মাছ তো মানুষ খেতে পারে। মশা কি খেতে পারে?"

ছোট মানুষ অবুঝের মতো কথা বললে বড়রা যেভাবে হাসে অনিক লুম্বা অনেকটা সেভাবে হাসল, বলল, "শুধু খাবার জন্যে চাষ করতে হয় কে বলেছে? গবেষণা করার জন্যেও চাষ করতে হয়। আপনার গলায় ইনফেকশন হলে গলা থেকে জীবাণু নিয়ে সেটা নিয়ে কালচার করে না? সেটা কী? সেটা হচ্ছে জীবাণুর চাষ।"

আমি তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, "জীবাণুর চাষের ব্যাপারটা না হয় বুঝতে পারলাম অসুখবিসুখ হয়েছে কিনা দেখে। মশার চাষ দিয়ে কী দেখবেন?"

অনিক লুম্বা মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের দেশে মশা একটা মহাসমস্যা, সেই সমস্যা কীভাবে মেটানো যায় সেটা নিয়ে গবেষণা করার জন্যে দরকার মশা। অনেক মশা, লক্ষ লক্ষ মশা।"

"আপনার কাছে লক্ষ লক্ষ মশা আছে?"

"আছে। শুনলেন না শব্দ? হঠাৎ করে যখন সেগুলো উড়তে থাকে তখন পাখার শব্দ শুনে মনে হয় প্লেন উড়ছে।"

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, "দেখাবেন একটু?"

"দেখবেন?" অনিক লুম্বা দাঁড়িয়ে বলল, "আসেন। ভেতরে আসেন।"

আমি অনিক লুম্বার সাথে ভেতরে গেলাম। বাইরের ঘরটাই যথেষ্ট অগোছালো কিন্তু ভেতরে গিয়ে মনে হল সেখানে সাইক্লোন বা টাইফুন হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেখানে কোনটা কী বোঝার কোনো উপায় নেই। মাঝামাঝি একটা হলঘরের মতো, সেখানে একমাথা উঁচু একটা কাচের ঘর। আট-দশ ফুট চওড়া এবং নিচে পানি। দূর থেকে মনে হচ্ছিল ভেতরে ধোঁয়া পাক খাচ্ছে, কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম সেগুলো ধোঁয়া নয়—মশা। একসাথে কেউ কোনো দিন এত মশা দেখেছে বলে মনে হয় না। কাচের ঘরের ভেতরে লক্ষ লক্ষ নয়—নিশ্চয়ই কোটি কোটি মশা! ছোট একটা মশাকে দেখে কেউ কখনো ভয় পায় না কিন্তু এই কাচের ঘরে কোটি কোটি মশা দেখে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "যদি কাচের ঘর ভেঙে মশা বের হয়ে যায় তখন কী হবে?"

অনিক লুম্বা মেঝে থেকে একটা বিশাল হাতুড়ি তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নেন, ভাঙার চেষ্টা করেন।"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "সর্বনাশ! ভেঙে গেলে উপায় আছে? সারা ঢাকা শহর মশায় অন্ধকার হয়ে যাবে!"

অনিক লুম্বা হাসল, বলল, "ভাঙবে না। এটা সাধারণ কাচ না। এর নাম প্লেক্সি গ্লাস। কাচের বাবা।"

তারপরেও আমি সাহস পেলাম না। তখন অনিক লুম্বা নিজেই হাতুড়ি দিয়ে এক ঘা দিল। কাচের ঘরের কিছুই হল না সত্যি কিন্তু ভেতরের মশাগুলো যা খেপে উঠল সে আর

বলার মতো না, মনে হল পুরো ঘরটাই উড়িয়ে নিয়ে যাবে! কাচের ঘরের সমস্ত মশা একসাথে উড়তে শুরু করল। প্রচণ্ড শব্দ শুনে মনে হল একটা ফাইটার প্লেন কোনোভাবে ঘরে ঢুকে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এত মশার চাষ করছেন কেমন করে?"

মশার শব্দে অনিক লুম্বা কিছু শুনল না, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আবার জিজ্ঞেস করতে হল। অনিক লুম্বাও উত্তর দিল চিৎকার করে, "নিচে পানিতে মশা ডিম পাড়ে। সেখান থেকে লার্ভা বের হয়, সেখান থেকে মশা। চব্বিশ ঘণ্টা এদের খাবার দেওয়া হয়। মশা বড় হওয়ার জন্যে একেবারে সঠিক তাপমাত্রা, সঠিক হিউমিডিটির ব্যবস্থা আছে।"

আমি বললাম, "মশাগুলোর উচিত শাস্তি হচ্ছে।"

অনিক লুম্বা অবাক হয়ে বলল, "উচিত শাস্তি?"

"হ্যাঁ। কাচের ঘরের ভেতরে আটকা পড়ে আছে, কাউকে কামড়াতে পারছে না—এটা শাস্তি হল না?"

অনিক লুম্বা হা হা করে হেসে বলল, "না না। আপনি যেভাবে ভাবছেন সেভাবে মশার শাস্তি মোটেই হচ্ছে না।"

"তার মানে? এরা এখনো মানুষকে কামড়াচ্ছে?"

"একটা মশা মানুষকে কেন কামড়ায় জানেন?"

এটা আবার একটা প্রশ্ন হল নাকি! আমি বললাম, "অবশ্যই জানি। মশা মানুষকে কামড়ায় তাদেরকে জ্বালাতন করার জন্যে। কষ্ট দেবার জন্যে। অত্যাচার করার জন্যে।"

"উঁহু।" অনিক লুম্বা মাথা নাড়ল, বলল, "মশা মানুষকে কামড়ায় বংশবৃদ্ধি করার জন্যে। মহিলা মশার ডিম পাড়ার জন্যে রক্তের দরকার। সেই জন্যে তারা মানুষকে কামড়ে একটু রক্ত নিয়ে নেয়।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। কাজেই যখন একটা মশা আপনাকে কামড় দেবে আপনি বুঝে নেবেন সেটা মশা নয়, সেটা হচ্ছে মশি।"

"মশি?"

"হ্যাঁ। মানে মহিলা মশা।"

আমি তখনো ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, "তার মানে আপনি বলতে চান মশা আর মশিদের মাঝে মশারা কামড়ায় না, কামড়ায় শুধু মশি?"

"হ্যাঁ।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমার ধারণা ছিল পুরুষ থেকে মহিলারা মিষ্টি স্বভাবের হয়। কামড়াকামড়ি যা করার সেগুলো পুরুষরাই বেশি করে!"

"না না না।" অনিক লুম্বা মাথা নাড়ল, "এটা মোটেও কামড়াকামড়ি নয়। মহিলা মশারা যখন আপনাকে কামড় দেয় তখন সেটা তার নিজের জন্যে না। সেটা সে করে তার সন্তানদের জন্যে। মশার কামড় খুব মহৎ একটি বিষয়। সন্তানদের জন্যে মায়ের ভালবাসার বিষয়।"

"সর্বনাশ!" আমি বললাম, "ব্যাপারটা গোপন রাখা দরকার।"

অনিক লুম্বা অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"দেশের পাগল-ছাগল কবি-সাহিত্যিকেরা এটা জানতে পারলে উপায় আছে? কবিতা লিখে ফেলবে না মশার ওপর!

হে মাশা
সন্তানের জন্যে
তোমার ভালবাসা"

অনিক লুম্বা আমার কবিতা শুনে হি হি করে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, "কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। মহিলা মশারা যেন ঠিক করে বাচ্চাকাচ্চা দিতে পারে সেই জন্যে আমাকে এই কাচের ঘরে রক্ত সাপ্লাই দিতে হয়।"

"সর্বনাশ!" আমি আঁতকে উঠে বললাম, "বলেন কী আপনি? কার রক্ত দেন এখানে?"

অনিক লুম্বা আমাকে শান্ত করে বলল, "না, না, আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। এখানে আমি মানুষের রক্ত দেই না। কসাইখানা থেকে গরু–মহিষের রক্ত নিয়ে এসে সেটা দিই। খুব কায়দা করে দিতে হয়, না হলে খেতে চায় না।"

"গরু–মহিষের রক্ত খায় মশা?" আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, "মানুষের রক্তের স্বাদ একবার পেয়ে গেলে তখন কি আর গরু-মহিষের রক্ত খেতে চাবে?"

"আসলে মশার সবচেয়ে পছন্দ মহিষের রক্ত। তারপর গরু, তারপর মানুষ।"

"তাই নাকি? মশার চোখে আমরা মহিষ এবং গরু থেকেও অধম?"

অনিক লুম্বা হাসল, বলল, "ঠিকই বলেছেন। মশাই ঠিক বুঝেছে। আমরা আসলেই মহিষ এবং গরু থেকে অধম।"

কাচের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ কোটি মশাকে কিলবিল কিলবিল করতে দেখে এক সময় আমার কেমন জানি গা গুলাতে শুরু করল। আমি বললাম, "অনেক মশা দেখা হল। এখন যাই।"

"চলেন।" বলে অনিক লুম্বা ঘরের লাইট নিবিয়ে আমাকে নিয়ে বের হয়ে এল।

বের হয়ে আসতে আসতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি এখনো একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না।"

"কোনটা বুঝতে পারলেন না?"

"মশার চাষ করছেন বুঝতে পারলাম, কিন্তু গবেষণাটা কী?"

"খুব সহজ।" অনিক লুম্বা মুখ গম্ভীর করে বলল, "রক্ত ছাড়া অন্য কিছু খেয়ে মহিলা মশারা বাচ্চার জন্ম দিতে পারে কিনা।"

"তাতে লাভ?"

"বুঝতে পারছেন না। তখন মশারা আর মানুষকে কামড়াবে না। সেই অন্য কিছু খেয়েই খুশি থাকবে। মশা যদি মানুষকে না কামড়ায় তা হলে তাদের ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া ডেঙ্গু এই রোগও হবে না।"

অনিক লুম্বার বুদ্ধি শুনে আমি চমৎকৃত হলাম। বললাম, "মশা যদি মানুষকে না কামড়ায় তা হলে মানুষ মশা নিয়ে বিরক্ত হবে না।"

"ঠিকই বলেছেন।"

"জোনাকি পোকা কিংবা প্রজাপতি এগুলোকে নিয়ে মানুষ কত কবিতা লিখেছে, তখন মশা নিয়েও কবিতা লিখবে।"

অনিক লুম্বা ভুরু কুঁচকে বলল, "সত্যি লিখবে?"

"অবশ্যই লিখবে। জীবনানন্দ না মরণানন্দ নামে একজন কবি আছে সে লাশকাটা ঘরের উপরে কবিতা লিখে ফেলেছে, সেই তুলনায় মশা তো অনেক সম্মানজনক জিনিস।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিক লুম্বা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছেন।"

আমি বললাম, "কবিদের কোনো মাথার ঠিক আছে নাকি? হয়তো লিখে ফেলবে—

হে মশা

তোমার পাখার পিনপিন শব্দে

আমার চোখে আর ঘুম আসে না!"

আমার কবিতা শুনে অনিক লুম্বা আবার হি হি করে হাসল। দুজনে মিলে আমরা কবিদের পাগলামি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করলাম। আমাদের দুইজনের কারোই যে কবি হয়ে জন্ম হয় নাই সেটা চিন্তা করে দুজনেই নিজেদের ভাগ্যকে শাবাশ দিলাম। তারপর সাহিত্যিকদের নিয়ে হাসাহাসি করলাম। তারপর শিল্পী এবং গায়কদের নিয়ে হাসাহাসি করলাম। তারপর উকিল আর ব্যবসায়ীদের নিয়ে হাসাহাসি করলাম। অনিক লুম্বা বিজ্ঞানী আর আমি নিষ্কর্মা বেকার, তাই শুধু বিজ্ঞানী আর নিষ্কর্মা বেকার মানুষদের নিয়ে হাসাহাসি করলাম না। অনিক লুম্বা তখন কয়েকটা চিপসের প্যাকেট আর এক লিটারের পেপসির বোতল নিয়ে এল। দুইজনে বসে চিপস আর পেপসি খেয়ে আরো কিছুক্ষণ আড্ডা মারলাম।

আমি যখন চলে আসি তখন অনিক লুম্বা আমার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "জাফর ইকবাল, যখন ইচ্ছা চলে এস দুইজনে আড্ডা মারব।"

আমি বললাম, "আসব অনিক আসব। তুমি দেখো কালকেই চলে আসব।" খুব একটা উঁচু দরের রসিকতা করেছি এইরকম ভঙ্গি করে আমরা দুইজন তখন হা হা করে হাসতে শুরু করলাম।

বাসায় আসার সময় হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম অনিক লুম্বার সাথে আমার নিশ্চয়ই এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমরা দুইজন খেয়াল না করেই একজন আরেকজনকে নাম ধরে ডাকছি, তুমি করে সম্বোধন করছি! কী আশ্চর্য ঘটনা, আমার মতো নীরস নিষ্কর্মা ভোঁতা টাইপের মানুষের একজন বন্ধু হয়ে গেছে? আর সেই বন্ধু হেজিপেজি কোনো মানুষ নয়—রীতিমতো একজন বিজ্ঞানী?

AMARBOI.COM

অনিককে বলেছিলাম পরের দিনই তার বাসায় যাব কিন্তু আসলে তার বাসায় আমার যাওয়া হল দুদিন পর। সেদিন হয়তো আমার যাওয়া হত না কিন্তু অনিক দুপুরে ফোন করে বলল আমি যেন অবশ্য অবশ্যই তার বাসায় যাই, খুব জরুরি দরকার। তাই বিকেলে অন্য একটা কাজ থাকলেও সেটা ফেলে আমি অনিকের বাসায় হাজির হলাম।

অনিক ছোট ছোট টেস্টটিউবে ঝাঁজালো গন্ধের কী এক তরল পদার্থ ঢালাঢালি করছিল, আমাকে দেখে মনে হল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

বলল, "তুমি এসে গেছ? চমৎকার!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম. "কেন? কী হয়েছে?"

"একজন আমার সাথে দেখা করতে আসবে—আমি একা একা তার সাথে কথা বলতে চাই না।"

"কেন?"

"সে আমার মশার গবেষণা কিনতে চায়।"

"মশার গবেষণা কিনতে চায়?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "গবেষণা কি কোরবানির গরু—মানুষ এটা আবার কেনে কী করে? আর এই লোক খবর পেল কেমন করে যে তুমি মশা নিয়ে গবেষণা কর?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পদচারী বিজ্ঞানী কনভেনশনের কথা মনে নাই? মনে হয় সেখানে আমার মুখে শুনেছে। আমি কাউকে কাউকে বলেছিলাম।"

"কত দিয়ে গবেষণা কিনবে?"

"সেটা তো জানি না। সেজন্যেই তোমাকে ডেকেছি। টাকাপয়সা নিয়ে কথা বলতে পারবে না?"

আমি মাথা চুলকালাম, বললাম, "আসলে সেটা আমি একেবারেই পারি না।"

"কেন? তুমি বাজার কর না? মাছ কেন না?"

"ইয়ে—কিনি। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"যেমন মনে কর গত সপ্তাহে মাছ কিনতে গিয়েছি, পাবদা মাছ, আমার কাছে চেয়েছে এক শ বিশ টাকা, আমি কিনেছি এক শ ত্রিশ টাকায়।"

"দশ টাকা বেশি দিয়েছ!"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"মাছওয়ালা তার মেয়ের বিয়ে নিয়ে এমন একটা দুঃখের কাহিনী বলল যে আমার চোখে পানি এসে যাবার অবস্থা। দশ টাকা বেশি দিয়ে ফেলেছি।"

অনিক মাথা নেড়ে বলল, "ও, আচ্ছা।"

আমি লিখে দিতে পারি অনিক না হয়ে অন্য যে কেউ হলে আমার এই বোকামির কথা শুনে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসা শুরু করত। অনিক শুধু যে হাসল না তা না, আমার যুক্তিটা এক কথায় মেনেও নিল। একেই বলে প্রাণের বন্ধু।

আমি বললাম, "কাজেই আমি টাকাপয়সা নিয়ে কথা বলতে পারব না, আমি বললে তোমার মনে হয় লাভ থেকে ক্ষতিই হবে বেশি!"

"হলে হোক। আমি তো আর বিক্রি করার জন্যে গবেষণা করি না। আমি গবেষণা করি মনের আনন্দের জন্যে।"

"তা ঠিক।" আমিও মাথা নাড়লাম, "মনের আনন্দের সাথে সাথে যদি একটু টাকাপয়সা আসে খারাপ কী?"

"সেটা অবশ্য তুমি ভুল বলো নাই।"

অনিক তার টেস্টটিউব নিয়ে আবার ঝাঁকাঝাঁকি শুরু করে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার মশা নিয়ে গবেষণার কী অবস্থা? মহিলা মশারা খেতে পছন্দ করে এরকম কিছু কি এখনো খুঁজে বের করেছ?"

"উঁহু। কাজটা সোজা না।"

"লেবুর শরবত দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছ?"

"লেবুর শরবত?" অনিক অবাক হয়ে বলল, "লেবুর শরবত কেন?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "তা জানি না। আমার কাছে মনে হল মহিলা মশারা হয়তো লেবুর শরবত খেতে পছন্দ করবে।"

অনিক কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কথা শুনে বোঝা যায় তোমার ভেতরে কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক চিন্তা থাকলে যুক্তিতর্ক দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এমনি এমনি তখন কেউ কোনো একটা কথা বলে না।"

আমি বললাম, "ধুর! যুক্তিফুক্তি আমার ভালো লাগে না। যখন যেটা মনে হয় আমি

সেটাই করে ফেলি।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, সেদিন মতিঝিলে যাব, যে বাসটা এসেছে সেটা ভাঙাচোরা দেখে পছন্দ হল না। চকচকে একটা বাস দেখে উঠে পড়লাম, বাসটা আমাকে মিরপুর বারো নম্বরে নামিয়ে দিল।"

"কিন্তু, কিন্তু—" অনিক ঠিক বুঝতে পারল না কী বলবে। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার না মতিঝিলে যাবার কথা?"

আমি বললাম, "কপালে না থাকলে যাব কেমন করে?"

হাজার হলেও অনিক বিজ্ঞানী মানুষ, তার কাজ-কারবারই হচ্ছে যুক্তিতর্ক নিয়ে, কাজেই আমার সাথে একটা তর্ক শুরু করে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখন দরজায় শব্দ হল। মনে হয় মশার গবেষণা কেনার মানুষটা চলে এসেছে।

অনিক দরজা খুলে দিতেই মানুষটা এসে ঢুকল। মোটাসোটা নাদুসনুদুস মানুষ, চেহারায় একটা তেলতেলে ভাব। ঠোঁটের উপর সরু গোঁফ। সরু গোঁফ আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। গোঁফ রাখতে চাইলে সেটা রাখা উচিত বঙ্গবন্ধুর মতো, তার মাঝে একটা ব্যক্তিত্ব আছে। মানুষটা সুট-টাই পরে আছে, চোখে চশমা, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। গায়ের রং ফরসা, ফরসার মাঝে কেমন যেন অসুস্থ অসুস্থ ভাব। হঠাৎ হঠাৎ এক ধরনের তেলাপোকা দেখা যায় যেগুলো সাদা রঙের, দেখতে অনেকটা সেরকম, দেখে কেমন যেন ঘেন্না ঘেন্না লাগে।

মানুষটা অনিকের দিকে তাকিয়ে তেলতেলে একটা হাসি দিয়ে বলল, "কী খবর বিজ্ঞানী সাহেব? কেমন আছেন?"

অনিক বলল, "ভালো। আসেন, ভেতরে আসেন।"

মানুষটা ভেতরে এসে ভুরু কুঁচকে চারদিকে তাকাল। অনিক বেচারা ঘরটা পরিষ্কার করার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো লাভ হয় নাই। যারা নোংরা এবং অগোছালো মানুষ তারা ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার চেষ্টা করলে সেটা দেখতে আরো বদখত দেখায়। মানুষটা ঘরটার ওপর চোখ বুলিয়ে আমার দিকে তাকাল এবং আমাকে দেখে মুখটা কেমন যেন কুঁচকে ফেলল। তাকে দেখে মনে হল সে যেন আমাকে দেখছে না, একটা ধাড়ি চিকাকে দেখছে। অনিক তখন আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বলল, "এ আমার বিশেষ বন্ধু। নাম জাফর ইকবাল।"

"ও।" মানুষটা কিছুক্ষণ আমাকে পর্যবেক্ষণ করে বলল, "আমার নাম আক্কাস আকন্দ।"

আমি মনে মনে বললাম, "ব্যাটা বুড়া ভাম কোথাকার। তোমার নাম হওয়া উচিত খোক্কস আকন্দ।" আর মুখে বললাম, "আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম আকন্দ সাহেব।"

খোক্কস আকন্দ তখন কেমন জানি দুলে দুলে গিয়ে সোফায় বসে আবার তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে দেখতে লাগল।

অনিক জিজ্ঞেস করল, "আমার বাসা পেতে কোনো ঝামেলা হয়েছে আকন্দ সাহেব?"

"নাহ। বাসা পেতে কোনো ঝামেলা হয় নাই। তবে—" আকন্দ সাহেব নাক দিয়ে ঘোঁত করে একটা শব্দ করে বলল, "বাসায় আসতে একটু ঝামেলা হয়েছে।"

অনিক একটু থতমত খেয়ে বলল, "কী রকম ঝামেলা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাসার গলি খুব চিকন। আমার গাড়ি ঢোকানো গেল না। সেই মোড়ে পার্ক করে রেখে হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে।"

ব্যাটার ফুটানি দেখে মরে যাই। একবার ইচ্ছা হল বলি, "তোমারে আসতে বলেছে কে?" কিন্তু কিছু বললাম না।

অনিক বলল, "চা কফি কিছু খাবেন?"

খোক্কস আকন্দ বলল, "না। আমি চা কফি সাধারণত খাই না। যেটা সাধারণত খাই সেটা আপনি খাওয়াতে পারবেন না!" বলে খোক্কস আকন্দ কেমন যেন দুলে দুলে হাসতে লাগল। ভাব দেখে মনে হল সে বুঝি খুব একটা রসিকতা করে ফেলেছে।

অনিক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, এখন আমিও জানি তার বাসায় চা কিংবা কফি কোনোটাই নাই। খোক্কস আকন্দ একসময় হাসি থামিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, "এখন কাজের কথায় আসা যাক বিজ্ঞানী সাহেব, কী বলেন?"

অনিক অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

"আপনি বলেছেন, আপনি মশা মারার একটা ওষুধ বানাচ্ছেন।"

অনিক মাথা নেড়ে বলল, "না, আমি সেটা বলি নাই, আমি বলেছি মশার সমস্যা দূর করে দেবার একটা সিস্টেম দাঁড় করাচ্ছি।"

খোক্কস আকন্দ বলল, "একই কথা। মশাকে না মেরে মশার সমস্যা দূর করবেন কেমন করে?"

অনিক বলল, "মশা একটা সমস্যা কারণ মশা কামড়ায়। আর মশা কামড়ায় বলেই মানুষের অসুখবিসুখ হয়। আমি গবেষণা করছি যেন মশা আর মানুষকে না কামড়ায়।"

"না কামড়ায়?" খোক্কস আকন্দ তার খোলা-ধরনের চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, "মশা মানুষকে কামড়াবে না?"

"না। সেটাই বের করার চেষ্টা করছি।"

খোক্কস আকন্দ বলল, "আমরা কেমন করে বুঝব যে আপনি ঠিক ঠিক গবেষণা করেছেন? মশা আসলেই কামড়াচ্ছে না?"

অনিক দাঁড়িয়ে বলল, "আসেন, আপনাকে দেখাই। ভেতরে আসেন।"

অনিক খোক্কস আকন্দকে ভেতরে নিয়ে গেল, মশার ঘরের সামনে গিয়ে লাইট জ্বালাতেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মশা ভনভন শব্দ করে উড়তে শুরু করল। খোক্কস আকন্দ মুখ হাঁ করে এই বিচিত্র দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। অনিক মশার শব্দ ছাপিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, "এখন যদি কেউ এই ঘরে ঢোকে তা হলে মশা এক মিনিটের মাঝে তার রক্ত শুষে খেয়ে ফেলবে। খালি মানুষটার ছোবড়া পড়ে থাকবে।"

খোক্কস আকন্দ একবার মুখ বন্ধ করে আবার খুলে বলল, "ছোবড়া?"

"হ্যাঁ। ছোবড়া।" অনিক মাথা নেড়ে বলল, "আর যদি ঠিক ঠিক গবেষণা করে মশাকে অন্য কিছু খাওয়ানো শেখাতে পারি তা হলে যে কোনো মানুষ এর ভেতরে বসে থাকতে পারবে, মশা তাকে কামড়াবে না!"

খোক্কস আকন্দ অনেকক্ষণ মশার ঘরের ভেতর লক্ষ লক্ষ কিলবিলে মশার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার বসার ঘরে এসে বসল। কিছুক্ষণ অনিকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এটা আবিষ্কার করতে আপনার কতদিন লাগবে?"

"আবিষ্কারের কথা কেউ বলতে পারে না। কালকেও হতে পারে আবার এক বছরও লাগতে পারে।"

খোক্কস আকন্দ তার মুখে তেলতেলে হাসিটা ফুটিয়ে বলল, "যদি আপনার এই আবিষ্কারটা হয়ে যায় তা হলে আমি সেটা কিনে নেব।"

অনিক বলল, "কিনে নেবেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কত টাকা দিয়ে কিনবেন?"

খোক্কস আকন্দ কেমন যেন বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, "এইখানে টাকার পরিমাণটা কোনো ইস্যু না। কেনার সিদ্ধান্তটা হচ্ছে ইস্যু।"

অনিক আমাকে খবর দিয়ে এনেছে এই লোকের সাথে কথাবার্তা বলার জন্যে, আমি তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না, জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি ঠিক কী জিনিসটা কিনবেন?"

"সবকিছু। গবেষণার ফল। মশার ঘর। মশা। মশার বাচ্চাকাচ্চা।"

"কেন কিনবেন?"

খোক্কস আকন্দ হা হা করে হাসতে শুরু করল, একটু পরে হাসি থামিয়ে বলল, "আমার কাজ হচ্ছে এক জায়গা থেকে একটা জিনিস কিনে অন্য জায়গায় বিক্রি করা।"

অনিক জিজ্ঞেস করল, "এটা আপনি কার কাছে বিক্রি করবেন?"

"সেটা শুনে আপনি কী করবেন? আপনি বিজ্ঞানী মানুষ বিজ্ঞানের আবিষ্কার করবেন। আমি ব্যবসায়ী মানুষ আমি সেটা দিয়ে ব্যবসা করব!"

আমি বললাম, "কিন্তু কত টাকা দিয়ে কিনবেন বললেন না?"

খোক্কস আকন্দ বলল, "আপনি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এই আবিষ্কার যত টাকা দিয়ে কেনা উচিত ঠিক তত টাকা দিয়ে কিনব।"

অনিক আমাকে ডেকে এনেছে কথাবার্তা বলার জন্যে কাজেই আমি চেষ্টা করলাম ব্যবসায়িক কথা বলার জন্যে। বললাম, "আপনি মশার ঘর আর মশাও কিনবেন?"

"হ্যাঁ।"

"একটা মশার জন্যে আপনি কত দেবেন?"

খোক্কস আকন্দ চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল, বলল, "একটা মশার জন্যে?"

"হ্যাঁ। এতগুলো মশা তো আর এমনি এমনি দেওয়া যাবে না। রীতিমতো চাষ করে এই মশা তৈরি হয়েছে। কী পুরুষ্টু এক একটা মশা দেখছেন? কত করে দেবেন?"

খোক্কস আকন্দ চোখ ছোট করে বলল, "আপনি কত করে চাচ্ছেন?"

আমি কত বলা যায় অনুমান করার জন্যে অনিকের দিকে তাকালাম কিন্তু অনিক হাত নেড়ে বলল, "এসব আলোচনা করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আগে আমার গবেষণা শেষ হোক।"

খোক্কস আকন্দ বলল, "ঠিক আছে।" তারপর সে তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তা হলে উঠি।" অনিক আবার ভদ্রতা করে বলল, "চা কফি কিছু খেলেন না!"

"আপনার আবিষ্কার শেষ হোক। তখন শুধু চা কফি না, আরো অনেক কিছু খাব।" বলে সে এমনভাবে অনিকের দিকে তাকাল যে আমার মনে হল যেন সে তাকে আস্ত গিলে খেয়ে ফেলবে।

আমার মানুষটাকে একেবারেই পছন্দ হল না, এখান থেকে বিদায় হলে বাঁচি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খোক্কস আকন্দ আবার ঘুরে অনিকের দিকে তাকাল, বলল, "আমি যদি আমার দুজন অফিসারকে আপনার এই সেটআপ দেখার জন্যে পাঠাই আপনার আপত্তি আছে?"

আমার ইচ্ছে হল বলি, "অবশ্যই আপত্তি আছে।" কিন্তু অনিক মাথা নেড়ে বলল, "না, না, আপত্তি থাকবে কেন?"

আমি মুখ ভোঁতা করে বললাম, "আপনার অফিসাররা কেন আসবেন?"

খোক্কস আকন্দ বলল, "দেখার জন্যে। শুধু দেখার জন্যে।"

খোক্কস আকন্দ বের হয়ে যাবার পর দরজা বন্ধ করে অনিক ফিরে আসতেই আমি বললাম, "অনিক তোমাকে আমি সাবধান করে দিই। এই মানুষ থেকে এক শ মাইল দূরে থাকতে হবে।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "এক শ মাইল দূরে থাকতে হবে কেন? আমার তো আক্কাস আকন্দ সাহেবকে বেশ পছন্দই হল।"

"আক্কাস আকন্দ নয়। খোক্কস আকন্দ।"

"খোক্কস আকন্দ?"

"হ্যাঁ। রাক্ষসের ভাই খোক্কস। তোমার রক্ত-মাংস চুষে খাবে, তারপর তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে।"

অনিক আমার কথা শুনে চোখ বড় বড় করে বলল, "কী আশ্চর্য! এই ভদ্রলোককে তুমি দশ মিনিট দেখেছ কিনা সন্দেহ অথচ তার সম্পর্কে কত খারাপ খারাপ কথা বলে ফেললে!"

"আমি খারাপ কথা বলি নাই। সত্যি কথা বলেছি। এই লোক মহাধুরন্ধর। মহাডেঞ্জারাস। মহাবদমাইশ।"

অনিক বলল, "না, না জাফর ইকবাল, একজন মানুষ সম্পর্কে এরকম কথা বলার কোনো যুক্তি নেই। যুক্তি ছাড়া কথা বলা ঠিক না। যুক্তি ছাড়া কথা বলা অবৈজ্ঞানিক।"

আমি রেগেমেগে বললাম, "তুমি বিজ্ঞানী মানুষ ইচ্ছে হলে তুমি বৈজ্ঞানিক কথা বলো। আমার এত বৈজ্ঞানিক কথা বলার দরকার নাই।"

অনিক বলল, "আরে, আরে! তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?"

আমি চিৎকার করে পা দাপিয়ে বললাম, "আমি মোটেই রাগি নাই। কথা নাই বার্তা নাই আমি কেন রাগব? কার ওপর রাগব?" এই বলে আমি রেগেমেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

AMARBOI.COM

দুদিন পর আমি আবার অনিকের সাথে দেখা করতে গেলাম। এর আগের দিন আমি রেগেমেগে বের হয়ে গিয়েছিলাম বলে একটু লজ্জা লজ্জা লাগছিল, অনিক সেটা নিয়ে আমার ওপর রেগে আছে কিনা কে জানে। দরজায় শব্দ করার সাথে সাথে অনিক দরজা খুলল, আমাকে দেখে কেমন যেন ঠাণ্ডা গলায় বলল, "ও তুমি? আস, ভেতরে আস।"

আমি ভেতরে ঢুকলাম। আজকে ঘরদোর আগের মতন, অগোছালো এবং নোংরা। টেবিলের ওপর একটা ফাইল, সেখানে কিছু কাগজপত্র। অনিক ফাইলটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এইটা কী?"

অনিক দুর্বল গলায় বলল, "কিছু না।"

আমি বললাম, "কিছু না মানে? আমি স্পষ্ট দেখছি এক শ টাকার স্ট্যাম্পের ওপর কী কী লেখা—তুমি মামলা করছ নাকি?"

"না, না। মামলা করব কেন?"

"তা হলে স্ট্যাম্পের ওপর এতসব লেখালেখি করার তোমার দরকার কী পড়ল?" অনিক আমার কড়া চোখ থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে আমতা-আমতা করে বলল, "না, মানে—আক্কাস আকন্দের লোকজন এসেছিল তো, তারা আমার সাথে একটা কন্ট্রাক্ট করে গেছে। সেই কন্ট্রাক্টটা একটু দেখছিলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "এর মাঝে তুমি কন্ট্রাক্ট সাইন করে ফেলেছ? তুমি দেখি আমার থেকে বেকুব।"

এবারে অনিক রেগে উঠে বলল, "এর মাঝে তুমি বেকুবির কী দেখলে?"

"কন্ট্রাক্টে কী লেখা আছে? কত টাকায় তুমি তোমার আবিষ্কার বিক্রি করে দিলে?"

"টাকার পরিমাণ লেখা হয় নাই।" অনিক মুখ শক্ত করে বলল, "আবিষ্কারটা হওয়ার পর আক্কাস আকন্দ সেটা কিনে নেবে সেটাই লেখা হয়েছে।"

আমি অনিকের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তা হলে তুমি এরকম মনমরা হয়ে বসে আছ কেন?"

"আমি মোটেও মনমরা হয়ে বসে নাই।" বলে অনিক আরো মনমরা হয়ে গেল।

আমি বললাম, "আমার কাছে লুকানোর চেষ্টা করছ কেন? সত্যি কথাটা বলে ফেল কী হয়েছে।"

"কিছু হয় নাই। শুধু—"

"শুধু কী?"

অনিক দুর্বল গলায় বলল, "আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না।"

"কী বুঝতে পারছ না?"

"এই কন্ট্রাক্ট সাইন করার পর আক্কাস আকন্দের লোকগুলো আমাকে একটা পানির বোতল, এক কেজি গুড় আর আধ কেজি লবণ দিয়ে গেল কেন?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী দিয়ে গেল?"

"এক বোতল পানি, এক কেজি গুড় আর আধ কেজি লবণ।" অনিক মাথা চুলকে বলল, "আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম কেন, তখন বলল, কন্ট্রাক্টে নাকি এটা দেওয়ার কথা লেখা আছে। কিন্তু কন্ট্রাক্টে কোথাও সেটা খুঁজে পেলাম না।"

AMARBOI.COM

"দেখি কন্ট্রাক্টটা।"

অনিক কেমন যেন অনিচ্ছা নিয়ে আমাকে কন্ট্রাক্টটা ধরিয়ে দিল। সেটা দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। এই মোটা কাগজের বান্ডিল কমপক্ষে চল্লিশ পৃষ্ঠা, পড়ে শেষ করতে একবেলা লেগে যাবে। আমি অবাক হয়ে বললাম, "এত মোটা?"

অনিক মাথা চুলকে বলল, "হ্যাঁ, আমিও বুঝতে পারলাম না এত মোটা কেন।"

"কী লেখা এখানে, দেখি তো—" বলে আমি সেই বিশাল দলিল পড়ার চেষ্টা করলাম, ছোট ছোট অক্ষরে লেখা শুরু হয়েছে এভাবে :

"কুতুব আলী মুহম্মদ ছগীর উদ্দিন নাফছি জাহাঙ্গীর ওরফে অনিক লুম্বা সাং ১৪২ ঘটিমাছি লেন ঢাকার সহিত আকন্দ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের স্বত্বাধিকারী আক্কাস আকন্দের আইন কৌসুলির পক্ষে কেরামত মাওলা এসোসিয়েটসের আইনজীবী মাওলাবক্স কর্তৃক প্রস্তাবনামা প্রস্তুত নিমিত্তে প্রাথমিক অঙ্গীকারনামায় যথাক্রমে প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ এবং তৃতীয় পক্ষ হিসেবে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ অথবা তাহাদের দেওয়া কর্তৃত্বনামায় উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিবর্গকে ওকালতনামা দেওয়া সাপেক্ষ অঙ্গীকারনামায় সুষ্ঠু প্রস্তাবনার পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষের আইনগত কৌসুলি তৃতীয় পক্ষের সহিত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের অঙ্গীকারনামায় চতুর্থ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে প্রথম পক্ষের সহিত কর্তৃত্ব প্রস্তুতের তালিকা বর্ণিত হইল।"

আমি আমার জীবনে এর আগে এতবড় একটা বাক্য পড়ি নি। বাক্যটা পরপর পাঁচবার পড়েও এর অর্থ বোঝা দূরে থাকুক কী বলতে চেয়েছে বুঝতে পারলাম না। তখন বাক্যটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার উল্টাদিক থেকে পড়লাম আরেকবার আরবি ভাষার মতো ডানদিক থেকে বামদিকে পড়লাম। তারপরও কিছু বুঝতে পারলাম না, উপর থেকে নিচে পড়ে দেখব কিনা ভাবলাম কিন্তু ততক্ষণে টনটন করে আমার মাথাব্যথা করতে শুরু করেছে তাই আর সাহস করলাম না। আমি কাগজের বান্ডিলটা অনিকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "প্রথম বাক্যটা পড়েই মাথা ধরে গেছে, পুরো চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়লে ব্রেনের রগ নির্ঘাত ছিঁড়ে যাবে।"

"পড়ার দরকার কী!" অনিক পুরো বিষয়টা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "বলেই তো দিয়েছে এখানে কী লেখা। আমার আবিষ্কারটা শেষ হবার পর সেটা কিনে নেবে। শুধু—" অনিক ইতস্তত করে থেমে গেল।

"শুধু কী?"

"এক বোতল পানি, এক কেজি গুড় আর আধ কেজি লবণের ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।"

"তোমাকে দিয়েছে খাবারের স্যালাইন বানিয়ে খাওয়ার জন্যে। মনে নাই এক গ্লাস পানিতে একমুঠি গুড়, আর এক চিমটি লবণ দিয়ে খাবার স্যালাইন বানাতে হয়।"

"হ্যাঁ।" অনিক মাথা নেড়ে বলল, "সেটা তো বানায় যখন মানুষের ডায়রিয়া হয় তখন। এখানে কার ডায়রিয়া হয়েছে?"

আমি বললাম, "এখনো হয় নাই। কিন্তু হবে।"

"কার হবে?"

"নিশ্চয়ই তোমার হবে।"

অনিক ভয় পেয়ে বলল, "কেন? আমার কেন হবে?"

"সেটা এখনো জানি না। কিন্তু মানুষ যখন ভয় পেয়ে যায় তখন তার ডায়রিয়া হয়। তুমিও নিশ্চয়ই ভয় পাবে।"

অনিকের মুখটা শুকিয়ে গেল। আমি বললাম, "মনে নাই, আমি তোমাকে বলেছিলাম খোক্কস আকন্দ তোমার রক্ত মাংস চুষে খাবে, তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে! তুমি দেখ, আমার কথা যদি সত্য না হয়।"

আমার কথা শুনে অনিকের মুখটা আরো শুকিয়ে গেল।

এরপর বেশ কয়েক দিন কেটে গেল, অনিকের বাসায় প্রতিদিন না গেলেও আমি টেলিফোনে প্রত্যেক দিনই খোঁজ নিয়েছি। আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলাম যে খোক্কস আকন্দ তার লোকজন পাঠিয়ে অনিকের কিছু একটা করে ফেলবে, কিন্তু সেরকম কিছু হল না। একদিন দুইদিন করে মাসখানেক কেটে যাবার পর আমার মনে হতে লাগল যে আমি হয়তো শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছিলাম। খোক্কস আকন্দ মানুষটাকে যতটা খারাপ ভেবেছিলাম সে হয়তো তত খারাপ না, তাকে খোক্কস না ডেকে আক্কাস ডাকা যায় কিনা সেটাও আমি চিন্তা করে দেখতে শুরু করলাম।

এদিকে অনিক তার গবেষণা চালিয়ে গেল, মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল তার গবেষণা খুব ভালো হচ্ছে। আবার দুদিন পরে মনে হতে লাগল পুরো গবেষণা মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। আমি অনিকের ধৈর্য দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। তার জায়গায় হলে আমি মনে হয় এতদিনে মশার ঘর ভেঙেচুরে আগুন জ্বালিয়ে দিতাম। কিন্তু অনিক সেরকম কিছু করল না, আলকাতরা থেকে শুরু করে রসগোল্লার রস, ডাবের পানি থেকে শুরু করে মাদার গাছের কষ কোনো কিছুই সে বাকি রাখল না, সবকিছু দিয়ে পরীক্ষা করে ফেলল। একসময় যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হল পৃথিবীর আর কিছুই পরীক্ষা করার বাকি নেই, এখন ভেউভেউ করে কান্নাকাটি করে চোখের পানি ফেলার সময়, আর সেই চোখের পানিটাই শুধু পরীক্ষা করা বাকি আছে তখন হঠাৎ করে অনিকের গবেষণার ফল পাওয়া গেল। একদিন বিকালবেলা অনিক আমাকে ফোন করে চিৎকার করতে লাগল, "ইউরেকা ইউরেকা।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "তুমি কাপড়-জামা পরে আছ তো?"

অনিক বলল, "কাপড়-জামা পরে থাকব না কেন?"

আমি বললাম, "মনে নাই, আর্কিমিডিস কাপড়-জামা খুলে ন্যাংটো হয়ে ইউরেকা ইউরেকা বলে রাস্তাঘাটে চিৎকার করছিল?"

অনিক হা হা করে হেসে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ আমারও মনে হচ্ছে সেটা করে ফেলি। পুরো ন্যাংটো না হলেও অন্তত একটা লুঙ্গি মালকোঁচা করে পরে রাস্তাঘাটে ছোটাছুটি করি! পিচকারি দিয়ে সবার ওপরে রঙ ফেলতে থাকি।"

আমি বললাম, "খবরদার! ওরকম কিছু করতে যেও না। পাবলিক ধরে যা একটা মার দেবে, তখন একটা কিলও কিন্তু মাটিতে পড়বে না।"

"তা অবিশ্যি তুমি ভুল বলো নাই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখন বলো তুমি আবিষ্কারটা কী করলে? মহিলা মশারা রক্তের বদলে অন্য কিছু খেতে রাজি হয়েছে?"

"হয় নাই মানে? সাংঘাতিকভাবে হয়েছে!"

"সেটা কী জিনিস?"

অনিক বলল, "সেটা একটা জিনিস না। অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস মিশাতে হয়েছে। সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল। সেটাতেই অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে। তার সাথে মনো সোডিয়াম গ্লুকোমেট, সোডিয়াম বাই কার্বনেট আর—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "এগুলো আমাকে বলে লাভ নাই। এইসব ক্যামিকেল কোনটা কী আমি কিছু জানি না। কোনো দিন দেখি নাই, নাম শুনি নাই—"

অনিক হা হা করে হেসে বলল, "শুনেছ। শুনেছ। অবশ্যই নাম শুনেছ। সবাই ইথাইল অ্যালকোহলের নাম শুনেছে। এইটার গন্ধেই মহিলা মশারা পাগল হয়ে যায়।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। ইথাইল অ্যালকোহল হচ্ছে—"

আমি বললাম, "থাক, থাক। টেলিফোনে বলে লাভ নাই। আমি চলে আসি, তুমি বরং সামনাসামনি দেখাও।"

অনিক জিব দিয়ে চটাস করে শব্দ করে বলল, "সেটাই ভালো। এত বড় একটা আবিষ্কার করলাম, কাউকে দেখানোর জন্যে হাত পা চোখ মাথা চুল নখ সবকিছু নিশপিশ নিশপিশ করছে।"

আমি বললাম, "বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা, তুমি আর একটু ধৈর্য ধর, আমি এক্ষুনি চলে আসছি।"

আমার অনিকের বাসায় যেতে আধা ঘণ্টার মতো সময় লাগল, গিয়ে দেখি সেখানে দুই জন সুট পরা মানুষ বসে আছে। একজন মোটা আরেকজন চিকন। একজন ফরসা আরেকজন রীতিমতো কালো। একজনের মাথায় চকচকে টাক অন্যজনের মাথায় ঘন চুল। একজনের গোঁফ অন্যজনের দাড়ি। কিন্তু কী একটা বিষয়ে দুইজনের মিল আছে, দেখলেই মনে হয় দুইজন আসলে একইরকম। আমাকে দেখে অনিক শুকনো গলায় বলল, "জাফর ইকবাল, এই দেখ, আক্কাস আকন্দ সাহেবের দুই এটর্নি চলে এসেছেন।"

"দুই এটর্নি?" আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

মোটা, ফরসা, মাথায় টাক এবং গোঁফওয়ালা মানুষটা বলল, "কেন? না বোঝার কী আছে? মনে নেই আপনি আমাদের সাথে কন্ট্রাক্ট সাইন করলেন যে গবেষণাটা বিক্রি করবেন?"

চিকন, কালো, মাথায় চুল এবং ঘন দাড়িওয়ালা মানুষটা বলল, "আমরা এখন বিক্রির কাজটা শেষ করতে এসেছি।"

অনিক বলল, "কিন্তু কিন্তু—"

মোটা মানুষ বলল, "কিন্তু কী?"

"আপনি কেমন করে বুঝতে পারলেন আমার আবিষ্কার হয়ে গেছে? এটা তো আমি জাফর ইকবাল ছাড়া আর কাউকে বলি নি।"

চিকন মানুষ চোখ লাল করে বলল, "আমরা সেটা সন্দেহ করেছিলাম যে আপনি আপনার আবিষ্কারের কথা গোপন রাখতে পারেন।"

মোটা বলল, "কন্ট্রাক্টের একুশ পাতায় স্পষ্ট লেখা আছে আবিষ্কারের দুই মিনিট একত্রিশ সেকেন্ডের ভেতরে আপনি আমাদের ফোন করে জানাবেন।"

চিকন বলল, "আপনি জানান নাই। সেইটা কন্ট্রাক্টের বরখেলাপ।"

মোটা বলল, "তের পাতার এগার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা।"

অনিক চোখ কপালে তুলে বলল, "শাস্তিমূলক ব্যবস্থা! আমার বিরুদ্ধে?"

মোটা বলল, "আমরা বুদ্ধি করে আপনার টেলিফোনে আড়ি পেতেছিলাম বলে কোনোমতে খবর পেয়েছি।"

অনিক রেগে আগুন হয়ে বলল, "আপনাদের এত বড় সাহস আমার টেলিফোনে আড়ি পাতেন?"

চিকন বলল, "কী আশ্চর্য! কন্ট্রাক্টের এগার পাতার নয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট লেখা আছে আপনি আমাদের আড়ি পাতার অনুমতি দিয়েছেন।"

মোটা বলল, "আড়ি পাতার জন্যে যত খরচ হয়েছে সেটা আপনার গবেষণার মূল্য থেকে কেটে নেওয়া হবে।"

আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না। আমি মেঝে থেকে একটা লোহার রড তুলে হুংকার দিয়ে বললাম, "তবেরে বজ্জাত বদমাইশ বেশরমের দল। আজ তোদের একদিন কি আমার একদিন। যদি আমি পিটিয়ে তোদের তক্তা না বানাই, ঠ্যাং ভেঙে লুলা না করে দেই, মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে না ফেলি তা হলে আমার নাম জাফর ইকবাল না—"

আমার এই হুংকার শুনে মোটা এবং চিকন এতটুকু ভয় পেল বলে মনে হল না। মোটা পকেট থেকে একটা ছোট ক্যামেরা বের করে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে আমার ছবি তুলতে লাগল, চিকন একটা ছোট ক্যাসেট প্লেয়ার বের করে আমার হুংকার রেকর্ড করতে শুরু করে দিল। আমি বললাম, "বের হ এখান থেকে, বেজন্মার দল।"

মোটা বলল, "ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার অপচেষ্টা। সব প্রমাণ আছে। ক্যামেরায় ছবি। ক্যাসেটে কথা। চৌদ্দ বছর জেল।"

চিকন বলল, "তার সাথে মানহানির মামলা জুড়ে দেব। স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি ক্রোক করে নেব।"

মোটা বলল, "মামলা চলবে দুই বছর। সব খরচপাতি আপনার।"

চিকন বলল, "অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করতে হবে। তা হলে চুয়ান্ন ধারায় ফেলা যাবে—"

আমি আরেকটু হলে লোহার রড দিয়ে মেরেই বসেছিলাম, অনিক কোনোভাবে আমাকে থামাল। ফিসফিস করে বলল, "সাবধান জাফর ইকবাল, এরা খুব ডেঞ্জারাস। তোমার বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। হাত থেকে রড ফেলে শান্ত হয়ে বস। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।"

আমি রাজি হচ্ছিলাম না, অনিক কষ্ট করে আমাকে শান্ত করে বসাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কী চান?"

মোটা তার মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বলল, "এই তো ভালো মানুষের মতো কথা! রাগারাগি করে কোনো কাজ হয় না।"

চিকন বলল, "আমরা এসেছি কন্ট্রাক্টের লেখা অনুযায়ী আপনার আবিষ্কার, মশার ঘর, মশা, মশার বাচ্চাকাচ্চা সবকিছু কিনে নিতে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সবকিছু আপনারা কত দিয়ে কিনবেন?"

মোটা বলল, "হিসাব না করে তো বলতে পারব না।"

আমি বললাম, "করেন হিসাব।"

তখন মোটা আর চিকন মিলে হিসাব করতে লাগল। কাগজের মাঝে অনেক সংখ্যা লিখে সেটা যোগ-বিয়োগ করতে লাগল, পকেট থেকে ক্যালকুলেটর বের করে সেটা দিয়ে হিসাব করে শেষ পর্যন্ত মোটা বলল, "আপনার পুরো গবেষণা, মশার ঘর, মশা, তার বাচ্চাকাচ্চা সবকিছু কিনতে আপনাকে দিতে হবে সাত শ চল্লিশ টাকা।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "সাত শ চল্লিশ টাকা?"

"হ্যাঁ।" চিকন আঙুল দিয়ে অনিককে দেখিয়ে বলল, "আপনি দেবেন।"

অনিক তখনো তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, আবার বলল, "আমি দেব?"

মোটা বলল, "হ্যাঁ। কন্ট্রাক্টের উনত্রিশ পৃষ্ঠার ছয় অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লেখা আছে এই আবিষ্কারের জন্যে আপনাকে আটাশ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। আটাশ দিন পার হবার পর প্রত্যেক দিন আপনার জরিমানা সাত হাজার একুশ টাকা করে।"

অনিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না, কোনোমতে বলল, "আমার জরিমানা?"

চিকন বলল, "আপনার কপাল ভালো। এই আবিষ্কার করতে যদি আপনার আরো মাসখানেক লেগে যেত তা হলে আপনার এই বাসা আমাদের ক্রোক করে নিতে হত।"

অনিক কিছুক্ষণ ঘোলা চোখে মানুষ দুইজনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর কেমন জানি ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, "শুধু একটা জিনিস বলবেন?"

মোটা বলল, "কী জিনিস?"

"আমি আমার বাসায় বসে, আমার ল্যাবরেটরিতে আমার সময় আমার মতো করে গবেষণা করছি, আপনারা আমাকে জরিমানা করার কে?"

চিকন চোখ কপালে তুলে বলল, "কী আশ্চর্য! আপনার পুরো গবেষণাটার অর্থায়ন করেছি আমরা। সবরকম ক্যামিকেল সাপ্লাই দিয়েছি আমরা!"

"ক্যামিকেল সাপ্লাই দিয়েছেন আপনারা?"

"হ্যাঁ। এই দেখেন সাতাশ পৃষ্ঠায় আপনার সিগনেচার। আপনি প্রথম কনসাইনমেন্ট বুঝে নিয়েছেন। দুই লিটার একুয়া। এক হাজার গ্রাম সুকরোস আর পাঁচ শ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড।"

মোটা গরম হয়ে বলল, "আপনি কি এটা অস্বীকার করতে পারেন?"

অনিক কোনো কথা না বলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, "একুয়া মানে হচ্ছে পানি, সুকরোস মানে গুড় আর সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে লবণ। এখন বুঝেছ, কেন দিয়েছিল?"

আমি আবার লোহার রডটা নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। অনিক অনেক কষ্ট করে আমাকে থামাল।

ঘণ্টাখানেকের মাঝে অনিকের বাসায় আক্কাস আকন্দের লোকজনে গিজগিজ করতে লাগল। তারা অনিকের গবেষণার কাগজপত্র, মশার ঘর, মশা, মশার বাচ্চাকাচ্চা সবকিছু নিয়ে যেতে শুরু করল। বিশাল একটা ট্রাকে করে যখন সবকিছু তুলে নিয়ে চলে গেল তখন বাজে রাত এগারটা চল্লিশ মিনিট। মোটা এবং চিকন হিসাব করে দেখেছে তারা অনিকের কাছে সাত শ চল্লিশ টাকা পায়। অনিকের কাছে ছিল দুই শ টাকা আমি ধার দিলাম চল্লিশ টাকা। বাকি পাঁচশ টাকার জন্যে তারা অনিকের বসার ঘরের দেয়াল থেকে তার দেয়ালঘড়িটা খুলে নিয়ে চলে গেল।

সবাই যখন চলে গেল তখন আমি বললাম, "অনিক এখন আমার কথা বিশ্বাস হল?"

অনিক ভাঙা গলায় বলল, "কোন কথা?"

"খোক্কস আকন্দ তোমার রক্ত-মাংস চুষে খাবে আর চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে?"

অনিক মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "আজকে তোমার রক্ত-মাংস চুষে খেল। আর দুই একদিনের মাঝেই দেখবে তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজানো শুরু করেছে।"

সত্যি সত্যি অনিকের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজানোর ব্যবস্থা হল—এক সপ্তাহ পরে দেখলাম সব পত্রিকায় বড় বড় করে খবর ছাপা হয়েছে, 'মশা নিয়ন্ত্রণে যুগান্তকারী আবিষ্কার : আক্কাস আকন্দের নেতৃত্বে নতুন সম্ভাবনা।' নিচে ছোট ছোট করে লেখা আক্কাস আকন্দের ল্যাবরেটরিতে তার গবেষকরা কীভাবে দীর্ঘদিন রিসার্চ করে মশা নিয়ন্ত্রণের যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে। এই আবিষ্কার চুরি করার জন্য কীভাবে দুই দিগ্‌ভ্রান্ত যুবক অপচেষ্টা করেছিল। এবং কীভাবে তার সুযোগ্য আইনবিদরা সেই অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে এবং এখন সেই আবিষ্কারের কথা কীভাবে দেশবাসীকে জানানোর জন্যে আক্কাস আকন্দের ল্যাবরেটরিতে একটা সংবাদ সম্মেলন করা হবে সেটা বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। সেই সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সাথে সাথে উৎসাহী ছাত্র-শিক্ষক এবং আমজনতাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। খবরটা পড়ে অনিক কেমন যেন মিইয়ে গেল। অনেকক্ষণ গুম মেরে থেকে শেষে ফোঁস করে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি যাব।"

আমি বললাম, "কী বলছ?"

"আমি বলেছি যে আমি যাব।"

আমি রেগেমেগে বললাম, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি দেখেছ খবরে লিখেছে দুইজন দিগ্‌ভ্রান্ত যুবক এই আবিষ্কার চুরি করার অপচেষ্টা করেছিল?"

"দেখেছি।"

"তার মানে বুঝতে পারছ?"

"পারছি।"

"কী বুঝতে পারছ?"

"বুঝতে পারছি যে আমি গেলে আমাকে ধরিয়ে দেবে। অন্য সাংবাদিকদের বলবে এই সেই দিগ্‌ভ্রান্ত যুবক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, "তা হলে?"

"তবু আমি যাব।" অনিক মুখ গোঁজ করে বলল, "বদমাইশগুলো কী করে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।"

"তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। পরের দিন সব পত্রিকায় তোমার ছবি ছাপা হবে, নিচে লেখা হবে, এই সেই দিগ্‌ভ্রান্ত যুবক যে যুগান্তকারী আবিষ্কার চুরি করার অপচেষ্টা করেছিল।"

অনিক ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "হোক।"

আমি বললাম, "তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটলে সবাই বলবে এই সেই গবেষণা চোরা।"

অনিক বলল, "বলুক।"

আমি বললাম, "বাড়িওয়ালা তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।"

অনিক বলল, "দিক।"

"এই এলাকায় কারো বাড়িতে চুরি হলে পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। রিমান্ডে নিয়ে ইলেকট্রিক শক দেবে।"

অনিক বলল, "দিক।"

আমি বললাম, "কয়দিন আগে তুমি আমাকে বুঝিয়েছ সব কথাবার্তা কাজকর্ম হবে যুক্তিপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক। এখন তুমি নিজে এরকম অযৌক্তিক কথা বলছ কেন? এরকম অবৈজ্ঞানিক কাজ করতে চাইছ কেন?"

অনিক ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বিজ্ঞানের খেতা পুড়ি।" অনিকের মুখ থেকে এরকম একটা কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম অবস্থা খুব জটিল। এখন তার সাথে ঝগড়া করে লাভ নাই। আমার বুকের ভেতর তখন দুঃখ দুঃখ একটা ভাব ভুটভুট করতে থাকে। আমি বললাম, "ভাই অনিক।"

অনিক একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হল!"

"আমিও যাব তোমার সাথে।"

"তুমিও যাবে?"

"হ্যাঁ। গিয়ে আমি যদি আক্কাস আকন্দের টুঁটি চেপে না ধরি, লাথি মেরে যদি তার সব এটর্নিদের হাঁটুর মালাই চাকি ফাটিয়ে না দিই তা হলে আমার নাম জাফর ইকবাল না।"

আমার কথা শুনে অনিক কেমন যেন ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

পরের রোববার পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে আমি আর অনিক গুলশানের এক বিশাল দালানের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে বড় পোস্টার, 'মশা নিয়ন্ত্রণের যুগান্তকারী আবিষ্কার', সেখানে আক্কাস আকন্দের ছবি, শিকারির বেশে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে বন্দুক, সেই বন্দুক থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে, তার পায়ের কাছে একটা বিদঘুটে রাক্ষসের মতো মশা চিত হয়ে মরে পড়ে আছে। দালানের সামনে মানুষের ভিড়, সাংবাদিকরা ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, টেলিভিশন চ্যানেলের লোকেরা টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে এসেছে। আক্কাস আকন্দের লোকেরা লাল রঙের ব্লেজার পরে ছোটাছুটি করছে। অনেক মানুষের ভিড়ের মাঝে আমি আর অনিকও ঢুকে পড়লাম। কেউ আমাদের লক্ষ করল না।

বড় একটা হলঘরের মাঝখানে অনিকের কাচঘর বসানো হয়েছে। ভেতরে লাখ লাখ মশা। মাঝে মাঝেই মশাগুলো খেপে উঠে গুঞ্জন করছে। তখন মনে হয় ঘরের মাঝে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেট প্লেনের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠছে। ফটোসাংবাদিকরা ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কাচঘরের ছবি তুলছে। টেলিভিশন চ্যানেলের লোকজন ঘাড়ে ক্যামেরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। সাধারণ দর্শকরাও এসেছে অনেক, তাদের কথাবার্তায় সারা ঘর সরগরম। আমি গোপনে পকেটে দুইটা পচা টম্যাটো নিয়ে এসেছি, ঠিক করেছি আক্কাস আকন্দ আসামাত্র তার দিকে ছুড়ে মারব, তারপর যা থাকে কপালে তাই হবে। আমি মাঝে মাঝে চোখের কোনা দিয়ে অনিককে দেখছি, দেখে মনে হয় মরা মানুষের মুখ, তার মুখের দিকে তাকানো যায় না।

হঠাৎ করে ঘরের কথাবার্তা কমে এল। আমি তাকিয়ে দেখি খুব ব্যস্ততার ভান করে আক্কাস আকন্দের দুই এটর্নি মোটা-ফরসা-টাক-মাথা-গোঁফ আর চিকন-কালো-চুল এবং দাড়ি হনহন করে এগিয়ে আসছে। কাচঘরের সামনে দুইজন দাঁড়াল এবং সাথে সাথে ক্লিক ক্লিক করে সাংবাদিকরা তাদের ছবি তুলতে লাগল।

মোটা হাত তুলে সবাইকে চুপ করার ইঙ্গিত করতেই সবাই কথা বন্ধ করে চুপ হয়ে গেল। মোটা বলল, "আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা এবং সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী, আপনাদের সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আজ আপনারা এখানে এসেছেন এক ঐতিহাসিক ঘটনার সন্ধিক্ষণে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মানুষ দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক এবং দারিদ্র্যের সাথে যে জিনিসটির সাথে যুদ্ধ করে এসেছে সেটা হচ্ছে মশা। হ্যাঁ, মশা হচ্ছে মানবতার শত্রু। সভ্যতার শত্রু। দেশের সুখ ও সমৃদ্ধির শত্রু।"

মোটা এই সময় থামল এবং চিকন কথা বলতে শুরু করল, গলা কাঁপিয়ে বলল, "সেই ভয়ংকর শত্রুকে আমরা পরাভূত করেছি। আপনাদের ধারণা হতে পারে এই কাচঘরে আটকে রাখা লাখ লাখ মশা বুঝি ভয়ংকর কোনো প্রাণী, সুযোগ পেলেই বুঝি আপনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে কামড়ে আপনার রক্ত শুষে নেবে। কিন্তু সেটি সত্যি নয়। মহামান্য আক্কাস আকন্দের সুযোগ্য নেতৃত্বে আমাদের হাউজের বিজ্ঞানীরা এই ভয়ংকর মশাকে এক নিরীহ পতঙ্গে পরিণত করে দিয়েছে। তারা আপনাকে কামড়াবে না, তারা আপনার রক্ত শুষে নেবে না।"

চিকন দম নেবার জন্য থামল, তখন মোটা আবার খেই ধরল, বলল, "আমি জানি আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। আপনারা ভাবছেন এটা কেমন করে সম্ভব? কিন্তু আপনাদের এটা দেখাব। এই কাচের ঘরে লাখ লাখ মশা। এরা হয়তো ম্যালেরিয়া-ফাইলেরিয়া বা ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করছে। কেউ যদি এর ভেতরে ঢোকে তা হলে লাখ লাখ মশা এক মুহূর্তে তার সব রক্ত শুষে নিতে পারে—কিন্তু আমি আপনাদের বলছি তারা নেবে না।"

চিকন এবারে থামল, তখন মোটা বলল, "আছেন আপনাদের কেউ যে এর ভেতরে ঢুকবেন? কারো সাহস আছে?"

উপস্থিত সাংবাদিক দর্শক কেউ সাহস দেখাল না। মোটা হা হা করে হেসে বলল, "আমি জানি আপনাদের কেউ সেই সাহস করবেন না। তার প্রয়োজনও নেই, কারণ এই কাচঘরে লাখ লাখ মশার ভেতরে ঢুকবেন আকন্দ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের স্বত্বাধিকারী মহামান্য আক্কাস আকন্দ স্বয়ং।"

মোটা নাটকীয়ভাবে কথা শেষ করতেই প্রথমে চিকন, তার সাথে সাথে লাল ব্লেজার পরা আক্কাস আকন্দের লোকজন এবং তাদের দেখাদেখি সাংবাদিক-দর্শকরা হাততালি দিতে শুরু করল।

ঠিক তখন আমরা দেখতে পেলাম হলঘরের অন্য মাথা থেকে আক্কাস আকন্দ হেঁটে হেঁটে আসছে। হাঁটার ভঙ্গিটা একটু অন্যরকম, মনে হয় টলতে টলতে আসছে, পাশেই একজন মাঝে মাঝে তাকে ধরে ফেলছে। একটু কাছে আসতেই দেখলাম তার চোখ ঢুলুঢুলু এবং মুখে বিচিত্র

এক ধরনের হাসি, শুধু নেশাগ্রস্ত মানুষেরা এভাবে হাসে। আমি পচা টম্যাটো দুইটা শক্ত করে ধরে রেখে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বললাম, "দেখছ? শালা পুরোপুরি মাতাল!"

অনিক কেমন যেন ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল, বলল, "কী বললে?"

"বলেছি বেটা দিনদুপুরে মদ খেয়ে এসেছে!"

অনিক হঠাৎ আঁতকে উঠে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে শুরু করল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, সর্বনাশ!"

ঘরের সবাই ঘুরে অনিকের দিকে তাকাল। সারা ঘরে একটা কথা নাই। আক্কাস আকন্দ একটা হেঁচকি তুলে জড়িত গলায় বলল, "এই মক্কেলডারে এখানে কে এনেছে?"

মোটা চিৎকার করে বলল, "ভলান্টিয়ার। একে বের করে দাও।"

চিকন ততক্ষণে আমাকেও দেখে ফেলেছে, সে খনখনে গলায় বলল, "সাথে তার পার্টনারও আছে, তাকেও বের কর।"

অনিক দুই হাত তুলে চিৎকার করে বলল, "দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার কথা শোনেন—"

কিন্তু কেউ অনিকের কথা শুনতে রাজি হল না, ফটোসাংবাদিকরা ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কিছু ছবি তুলে ফেলল এবং তার মাঝে লাল ব্লেজার পরা লোকজন এসে আমাদের দুইজনকে গোল করে ঘিরে নিয়ে বের করে নিতে লাগল। আমি দুই হাতে দুইটা পচা টম্যাটো শুধু শুধু ধরে রাখলাম, আক্কাস আকন্দের দিকে ছুড়তে পারলাম না।

অনিক তখনো ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে এবং আক্কাস আকন্দের লোকজন আমাদের দুইজনকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাঝে দেখলাম কাচঘরের বাইরে একটা দরজা খোলা হল। আক্কাস আকন্দ সেখানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ভেতরে দ্বিতীয় দরজাটা খুলতেই সে লাখ লাখ মশার মাঝে হাজির হবে। অনিক পাগলের মতো চিৎকার করছে, তার মাঝে আক্কাস আকন্দ দ্বিতীয় দরজাটা খুলে ফেলেছে।

তারপর যে ঘটনাটি ঘটল আমি আমার জীবনে কখনো সেরকম ঘটনা ঘটতে দেখি নি। হঠাৎ করে লাখ লাখ মশা একসাথে আক্কাস আকন্দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—আমরা তার গগনবিদারী চিৎকার শুনতে পেলাম! দেখলাম মশাগুলো কামড়ে তাকে তুলে ফেলেছে, শূন্যে সে লুটোপুটি খাচ্ছে, মশার আস্তরণে ঢাকা পড়ে আছে! তাকে আর মানুষ মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে কালো কম্বল গায়ে দেওয়া একটা ভালুক। বিকট চিৎকার করতে করতে সে হাত-পা ছুড়তে থাকে, তার মাঝে মশার ভয়ংকর গুঞ্জন—সব মিলিয়ে একটা নারকীয় পরিবেশ। কাচঘরের ভেতরে মশাগুলো তাকে নাচিয়ে বেড়ায় এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে, ফুটবলের মতো ছুড়ে দেয়। ছাদে ঠেসে ধরে ঝপাং করে পানিতে ফেলে দিয়ে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে থাকে। আক্কাস আকন্দের লোকজন কী করবে বুঝতে না পেরে দরজা খোলার চেষ্টা করতে থাকে এবং হঠাৎ করে সব মশা কাচঘর থেকে ভয়ংকর গর্জন করে ছুটে বের হয়ে আসতে থাকে।

সাংবাদিক-দর্শকরা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারছিল না কী হচ্ছে। এক দুইজন একটু ছবিও তুলেছিল কিন্তু যেই মুহূর্তে খোলা দরজা দিয়ে বন্যার পানির মতো কালো কুচকুচে মশার সমুদ্র বের হতে শুরু করল তখন সবাই প্রাণের ভয়ে ছুটতে শুরু করল। ঘরের ভেতরে যা একটা হুটোপুটি শুরু হল সেটা বলার মতো নয়। আমি দেখলাম মশার দল আক্কাস আকন্দকে কামড়ে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে, সিঁড়ি দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল তারপর রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। মানুষজন প্রাণের ভয়ে ছুটছে। আমিও ছুটছিলাম, অনিক আমার হাত ধরে থামাল, বলল, "থাম। দৌড়ানোর দরকার নেই।"

"কী বলো দরকার নেই! খোক্কস আকন্দের অবস্থাটা দেখেছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। বেটা মদ খেয়ে এসেছে সেই জন্যে! তুমি কি মদ খেয়েছ?"

"মদ?"

"হ্যাঁ। ইথাইল অ্যালকোহল হচ্ছে মদ। এই মশা রক্ত না খেয়ে এখন মদ খাওয়া শিখেছে। আক্কাসের রক্তে ইথাইল অ্যালকোহল, সেজন্যে ওকে ধরেছে।"

আমি বললাম, "আমাকে ধরবে না?"

"না। তুমি যদি ইথাইল অ্যালকোহল—সোজা বাংলায় মদ খেয়ে না থাক তা হলে তোমাকে ধরবে না।"

আমি বললাম, "আমি মদ খেতে যাব কোন দুঃখে?"

"তা হলে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ।"

আমি তখন দেখলাম কালো মেঘের মতো লাখ লাখ মশা একসাথে ছুটে যাচ্ছে! সেটা একটা দেখার মতো দৃশ্য। না জানি এখন কোন মদ খাওয়া মানুষকে ধরবে। আমি বুকের ভেতর থেকে একটা নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মশাগুলো তখন দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছে, দেখে মনে হল একটা মেঘ বুঝি ভেসে যাচ্ছে।

পরদিন খবরের কাগজে খুব বড় বড় করে আক্কাস আকন্দের খবরটা ছাপা হয়েছিল। তার শরীরের ছিবড়েটা তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাকে নাকি দশ বোতল রক্ত দিতে হয়েছে! এতগুলো সাংবাদিককে ডেকে এনে এরকম ভাঁওতাবাজি করার জন্যে সাংবাদিকরা খুব খেপে পত্রিকাগুলোতে একেবারে যাচ্ছেতাইভাবে আক্কাস আকন্দকে গালাগাল করেছে। শুধু যে গালাগাল করেছে তা না, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নাকি এতগুলো মশা শহরে ছেড়ে দেবার জন্যে আক্কাস আকন্দের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে দেবে। বাছাধনের বারোটা বেজে যাবে তখন।

পত্রিকার বড় বড় খবর নিয়ে সবাই যখন মাথা ঘামাচ্ছে তখন ভেতরের পাতার একটা খবর কেউ সেভাবে খেয়াল করেনি। এক রগচটা কাঠমোল্লা একটা গির্জা ঘেরাও করার জন্যে তার দলবল নিয়ে রওনা দিয়েছিল, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সে যখন সবাইকে উসকে দেবার জন্য গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে হাজার হাজার মশা এসে তাকে আক্রমণ করেছে। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে সেই রগচটা কাঠমোল্লা—

এত মানুষ থাকতে তাকেই কেন মশা আক্রমণ করল কেউ সেটা বুঝতে পারছে না। বুঝতে পেরেছি খালি আমি আর অনিক!

AMARBOI.COM

ইঁদুর

ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে সেটা খোলা রেখেছি কিন্তু আর বেশিক্ষণ সেটা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। আমি অন্তত এক শ বার অনিককে বলেছি যে আমি বিজ্ঞানের কিছু বুঝি না, খামাকা আমাকে এসব বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নাই—কিন্তু বিষয়টা এখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিকের মাথায় ঢোকাতে পারি নাই। যখনই তার মাথায় বিজ্ঞানের নতুন একটা আবিষ্কার কুটকুট করতে থাকে তখনই সেটা আমাকে শোনানোর চেষ্টা করে। আজকে যে রকম সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে কালবৈশাখীর সময় যে বজ্রপাত হয় সেই বজ্রপাতের বিদ্যুৎটা কীভাবে ক্যাপাসিটর না কী এক বস্তুর মাঝে জমা করে রাখবে। বিষয়টা এক কান দিয়ে ঢুকে আমার অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। অনিক যেন সেটা বুঝতে না পারে সেজন্যে আমি চোখে-মুখে একটা কৌতূহলী ভাব ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছে আর পারা যাচ্ছে না। চোখে-মুখে কৌতূহলী ভাব নিয়েই মনে হয় আমি ঘুমে ঢলে পড়ব।

আমার কপাল ভালো, ঠিক এরকম সময় অনিক থেমে গিয়ে বলল, "এক কাপ চা খেলে কেমন হয়?"

আমি বললাম, "ফার্স্ট ক্লাস আইডিয়া!"

"রঙ চা খেতে হবে কিন্তু।" অনিক বলল, "বাসায় দুধ নাই।"

আমি বললাম, "রঙ চা-ই ভালো।"

অনিক একটু ইতস্তত করে বলল, "চিনিও মনে হয় নাই। খোঁজাখুঁজি করে একটা ক্যামিকেল বের করতে পারি যেটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হতে পারে—"

চিনি নাই শুনে আমি একটু দমে গেলাম কিন্তু তাই বলে কোনো একটা ক্যামিকেল খেতে রাজি হলাম না। বললাম, "কিছু দরকার নেই চিনির। চিনি ছাড়াই চা খাব।"

অনিক তার রান্নাঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ খুটুর মুটুর শব্দ করে বাইরে এসে বলল, "চা পাতাও তো দেখি না। খালি গরম পানি খাবে, জাফর ইকবাল?"

এবারে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। বললাম, "তার চাইতে চলো মোড়ের দোকান থেকে চা খেয়ে আসি।"

অনিক বলল, "আইডিয়াটা খারাপ না। তা হলে চায়ের সাথে অন্য কিছুও খাওয়া যাবে।"

তাই আমি আর অনিক বাসা থেকে বের হলাম। অনিকের বাসার রাস্তা পার হয়ে মোড়ে ছোট একটা চায়ের দোকান, সময়-অসময় নেই সব সময়েই এখানে মানুষের ভিড়। আমরা দুইজন খুঁজে একটা খালি টেবিল বের করে বসে চায়ের অর্ডার দিয়েছি। অনিক টেবিল থেকে পুরোনো একটা খবরের কাগজ তুলে সেখানে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, "চা একটা অদ্ভুত জিনিস! কোথাকার কোন গাছের পাতা শুকিয়ে সেটা গরম পানিতে দিয়ে রঙ করে সেটাতে দুধ চিনি দিয়ে মানুষ খায়। কী আশ্চর্য!"

আমি বললাম, "মানুষ খায় না এমন জিনিস আছে? কোনো দিন চিন্তা করেছ জন্তু-জানোয়ারের নিচে লটরপটর করে ঝুলে থাকে যেসব জিনিস সেটা টিপে যে রস বের হয় সেটা খায়?"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "সেটা আবার কী?"

"দুধ! গরুর দুধ!"

অনিক হা হা করে বলল, "সেভাবে চিন্তা করলে মধু জিনিসটা কী কখনো চিন্তা করেছ? পোকামাকড়ের পেট থেকে বের হওয়া আঠা আঠা তরল পদার্থ।"

আমি আরেকটা কী বলতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন পাশের টেবিল থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেলাম। মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি কমবয়সী মাস্তান ধরনের একজন একটা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চিৎকার করছে। তার সামনে রেস্টুরেন্টের বয় ছেলেটি ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাস্তান হুংকার দিয়ে বলল, "তোরে আমি কতবার কইছি চায়ে চিনি কম?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি ভয়ে কোনো কথা বলল না। মাস্তান টেবিলে কিল দিয়ে বলল, "আর তুই হারামির বাচ্চা শরবত বানায় আনছস? আমার সাথে রংবাজি করস?"

টেবিলে তার সামনে বসে থাকা আরেকজন মাস্তান সমান জোরে হুংকার দিয়ে বলল, "কথা বাড়ায়া লাভ নাই বিল্লাল ভাই। হারামজাদার মাথায় ঢালেন। শিক্ষা হউক—"

প্রথম মাস্তান, যার নাম সম্ভবত বিল্লাল, মনে হল প্রস্তাবটা শুনে খুশি হল। মাথা নেড়ে বলল, "কথা তুই মন্দ বলিস নাই।" তারপর রেস্টুরেন্টের বয় ছেলেটার শার্টের কলার ধরে টেনে নিজের কাছে নিয়ে এসে কাপটা তার মাথার ওপর ধরল। চায়ের কাপটা থেকে গরম চা মনে হয় সত্যি ঢেলেই দিত কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে অনিক লাফিয়ে চায়ের কাপটা ধরে ফেলল। মাস্তানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার মাথা খারাপ হয়েছে?"

বিল্লাল মাস্তান একটু অবাক হয়ে অনিকের দিকে তাকাল। বলল, "আপনে কেডা?"

অনিক বলল, "আমি যেই হই না কেন—তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি একটি ছোট বাচ্চার মাথায় গরম চা ঢালতে পারেন না।"

দুই নম্বর মাস্তান বলল, "আপনি দেখবার চান আমরা সেটা পারি কি না?"

অনিক বলল, "না সেটা দেখতে চাই না। আপনার চায়ে যদি চিনি বেশি হয়ে থাকে আপনাকে আরেক কাপ চা বানিয়ে দেবে কিন্তু সেজন্যে আপনি একটা ছোট বাচ্চার মাথায় গরম চা ঢালবেন?"

এরকম সময় রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার দুই কাপ চা, শিঙাড়া আর কয়েকটা মোগলাই পরোটা নিজের হাতে করে টেবিলে নিয়ে এসে বলল, "বিল্লাল ভাই এই যে আপনার জন্যে এনেছি। রাগ করবেন না বিল্লাল ভাই। খান। খেয়ে বলেন কেমন হইছে।"

বিল্লাল নামের মাস্তানটা গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি কি রাগ করতে চাই? কিন্তু আপনার বেয়াদব বেয়াক্কেল বয় বেয়ারা—"

ম্যানেজার বলল, "ছোট মানুষ বুঝে নাই। আর ভুল হবে না বিল্লাল ভাই।" তারপর ছোট ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলল, "যা এখান থেকে।"

দুইজন মাস্তান তখন খুব তৃপ্তি করে খেতে থাকে। খেতে খেতে দুলে দুলে হাসে যেন খুব মজা হয়েছে। দেখে আমার রাগে পিত্তি জ্বলে যায়।

মাস্তান দুইজন যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ রেস্টুরেন্টের কেউ কোনো কথা বলল না। কিন্তু তারা খেয়ে বিল শোধ না করে বের হওয়া মাত্রই সবাই কথা বলতে শুরু করল। ম্যানেজার নিচে থুতু ফেলে বলল, "আল্লাহ্‌র গজব পড়ুক তোদের ওপর। মাথার ওপর ঠাঠা পড়ুক।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কারা এরা?"

"আর বলবেন না। বারো নম্বর বাসায় উঠেছে। দুই মাস্তান। একজন বিল্লাল আরেকজন কাদির। মাস্তানির জ্বালায় আমাদের জান শেষ।"

অনিক জিজ্ঞেস করল, "এরকম মানুষকে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দিল কেন?"

ম্যানেজার বলল, "বাড়ি ভাড়া দিয়েছে মনে করেছেন? জোর করে ঢুকে গেছে।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "জোর করে ঢুকে গেছে?"

"জে।" ম্যানেজার শুকনো মুখে বলল, "বারো নম্বর বাসাটা হচ্ছে মাসুদ সাহেবের। রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার। অনেক কষ্ট করে দোতলা একটা বাসা করেছেন। নিচের তলা ভাড়া দিয়েছেন উপরে নিজে থাকতেন। কয়দিন আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। তার স্ত্রী বুড়ি মানুষ কিছু বুঝেন-সুঝেন না। সাদাসিধে মানুষ। তখন এই দুই মাস্তান ভাড়াটেদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে ঢুকে গেল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেস্টুরেন্টের একজন বলল, "পুরো বাড়ি দখলের মতলব।"

ম্যানেজার মাথা নাড়ল, "জে। বুড়ির কিছু হইলেই তারা বাড়ি দখল করে নিবে।"

রেস্টুরেন্টের একজন বলল, "কিছু না হইলেও দখল নিবে। এরা লোক খুব খারাপ।"

ম্যানেজার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, "জে। বাসায় মদ গাঞ্জা ফেনসিডিল ছাড়া কোনো ব্যাপার নাই। এলাকার পরিবেশটা নষ্ট করে দিল।"

রেস্টুরেন্টে যারা চা খাচ্ছে তারাও এই এলাকাটা কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার বর্ণনা দিতে শুরু করল। দেখা গেল সবারই বলার মতো ছোট-বড় কোনো একটা গল্প আছে।

আমরা চা খেয়ে বের হয়ে বাসায় ফেরত আসছি তখন রাস্তার পাশে হঠাৎ করে অনিক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "বারো নম্বর বাসা।"

আমিও ভালো করে তাকালাম, জরাজীর্ণ দোতলা একটা বাসা। দেখেই বোঝা যায় কোনো রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার তার সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে কোনোভাবে দাঁড়া করিয়েছেন। বহুদিনের পুরোনো, দরজা-জানালার রঙ উঠে বিবর্ণ। পলেস্তারা খসে জায়গায় জায়গায় ইট বের হয়ে এসেছে। নিচের তলায় দরজা তালা মারা, এখানে নিশ্চয়ই বিল্লাল এবং কাদির মাস্তান থাকে। খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে দেখা যায়, সেখানে মোটামুটি একটা হতচ্ছাড়া পরিবেশ।

আমরা ঠিক যখন হাঁটতে শুরু করেছি তখন দোতলা থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। মহিলার গলার আওয়াজ মনে হল, কেউ বুঝি কাউকে খুন করে ফেলছে। আমি আর অনিক একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম তারপর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। দরজা বন্ধ। সেখানে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে বললাম, "কী হয়েছে?"

আমাদের গলার আওয়াজ শুনে ভিতরের চিৎকার হঠাৎ করে থেমে গেল। আমরা আবার দরজায় ধাক্কা দিলাম। তখন ভিতর থেকে ভয় পাওয়া গলায় একজন বলল, "কে?"

অনিক বলল, "আমরা। কোনো ভয় নেই দরজা খুলেন।"

তখন খুট করে শব্দ করে দরজা খুলে গেল। বারো-তের বছর বয়সের একটা মেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় বাসায় কাজকর্মে সাহায্য করে। পিছনে একটা চেয়ারের ওপরে সাদা চুলের একজন বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। মনে হয় এই বুড়ি মহিলাটিই চিৎকার করেছিল। অনিক জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

বারো-তের বছরের মেয়েটি খুক খুক করে হেসে ফেলল। বলল, "নানু ভয় পাইছে।"

"কী দেখে ভয় পেয়েছেন?"

"ইন্দুর।"

ব্যাপারটা এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হল। যারা ইঁদুরকে ভয় পায় তারা ইঁদুর দেখে লাফিয়ে চেয়ার-টেবিলে উঠে পড়তেই পারে। ভয় খুব মারাত্মক জিনিস। গোবদা একটা মাকড়সা দেখে আমি একবার চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলাম।

অনিক বুড়ি মহিলার কাছে গিয়ে বলল, "আপনি নামুন। কোনো ভয় নাই।"

বুড়ি মহিলা অনিকের হাতে ধরে সাবধানে নামতে নামতে রাগে গরগর করতে করতে বলল, "এত করে শিউলিরে বললাম ইঁদুর মারার বিষ কিনে আন, আমার কথা শুনতেই চায় না—"

শিউলি নিশ্চয়ই কাজের মেয়েটি হবে, সে দাঁত বের করে হেসে বলল, "আনছি নানু। কিন্তু বিষে ভেজাল আমি কী করমু? সেটা খেয়ে ইন্দুরের তেজ আরো বাড়ছে। গায়ে জোর আরো বেশি হইছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ি ভদ্রমহিলা চোখ পাকিয়ে শিউলির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঢং করিস না! ইঁদুরের বিষে আবার ভেজাল হয় কোনো দিন শুনছিস?"

শিউলি বলল, "হয় নানু হয়। আজকাল সবকিছুতে ভেজাল। সবকিছুতে দুই নম্বুরি।"

অনিক হাসিমুখে বলল, "আপনাকে যদি ইঁদুরে উৎপাত করে কোনো চিন্তা করবেন না। আমি আপনার সব ইঁদুর দূর করে দিব!"

বুড়ি এবারে ভালো করে একবার অনিকের দিকে আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা কে বাবা?"

অনিক বলল, "আমি এই পাড়াতেই থাকি।"

"তোমার কাছে ভালো ইঁদুরের বিষ আছে?"

"জি না, বিষ নেই। তবে আমি আপনার এখানে লো ফ্রিকুয়েন্সির কয়েকটা সোনিক বিপার লাগিয়ে দেব, ইঁদুর বাপ বাপ করে পালিয়ে যাবে।"

"কী লাগিয়ে দেবে?"

"সোনিক বিপার। তার মানে হচ্ছে মেকানিক্যাল অসিলেশান। আমাদের কানের রেসপন্স হচ্ছে বিশ হার্টজ থেকে বিশ কিলো হার্টজ। এই বিপার—"

আমি অনিকের হাত ধরে বললাম, "এত ডিটেলসে বলার কোনো দরকার নেই। তুমি ছাড়া কেউ বুঝবে না। শুধু কী করতে হবে বলে দাও—"

"কিছু করতে হবে না, ঘরের কোনো এক জায়গায় রেখে দেবেন, দেখবেন পাঁচ-দশ মিটারের ভেতর কোনো ইঁদুর আসবে না। যদি থাকে বাপ বাপ করে পালাবে।"

বুড়ি ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ অনিকের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বাবা, মাস্তানদের জন্যে এরকম একটা যন্ত্র তৈরি করতে পারবে না? যেটা লাগালে মাস্তানেরা বাপ বাপ করে পালাবে?"

শিউলি আবার হি হি করে হেসে উঠে বলল, "নানু, মাস্তানরা ইন্দুর থেকে অনেক বেশি খারাপ! তারা একবার বাড়িতে ঢুকলে কোনো যন্ত্র দিয়ে বের করা যায় না!"

অনিক কোনো কথা বলল না, একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "প্রথমে ইঁদুর দিয়ে শুরু করি। আজকে হয়তো পারব না, কাল না হয় পরশু বিকেলে আমি আসব। এসে সোনিক বিপারগুলো লাগিয়ে দেব।"

বৃদ্ধা মহিলা বললেন, "ঠিক আছে বাবা।"

বাসায় ফিরে অনিক কাজ শুরু করে দিল। তার ওয়ার্কবেঞ্চে নানা যন্ত্রপাতি ইলেকট্রনিক সার্কিট একত্র করে কী যেন একটা তৈরি করতে লাগল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "ইঁদুরের জন্যে এত যন্ত্রপাতি লাগে? আমি দেখেছি আমার মা ভাতের সাথে সেঁকো বিষ মিশিয়ে রান্নাঘরের কোনায় ফেলে রাখতেন—"

অনিক বলল, "শুধু ইঁদুর দূর করতে এত জিনিস লাগে না। আমি এই বাড়ি থেকে ছোট ইঁদুর আর বড় ইঁদুর সব দূর করতে চাই!"

"বড় ইঁদুর?" আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কত বড়?"

অনিক হাত তুলে বলল, "এই এত বড়!"

"এত বড় ইঁদুর হয়?"

অনিক বলল, "হয়।"

আমি তখন হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম অনিক বিল্লাল আর কাদিরের কথা বলছে। আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, "পারবে দূর করতে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিক গম্ভীর মুখে বলল, "দেখি।"

আমি অনিককে কাজ করতে দিয়ে বাসায় চলে এলাম।

দুদিন পর বিকাল বেলা অনিক আমাকে ফোন করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ইঁদুর দূর করার যন্ত্র কতদূর?"

"রেডি।"

"ছোট ইঁদুর না বড় ইঁদুর?"

"দুটোই।"

"ভেরি গুড। কখন যন্ত্রগুলো লাগাতে যাবে?"

"এখনই যাব ভাবছিলাম। তোমার কোনো কাজ না থাকলে চলে এস।"

খাওয়া এবং ঘুম ছাড়া আমার আর কখনোই কোনো কাজ থাকে না। আমি তাই সাথে সাথে রওনা দিয়ে দিলাম।

অনিকের বাসায় গিয়ে দেখি সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে বলল, "চলো যাই।"

আমি বললাম, "চলো।"

"আসার সময় বারো নম্বর বাসাটা লক্ষ করেছ?"

"হ্যাঁ। করেছি। কেন?"

"বড় ইঁদুর দুটি আছে?"

"কে? বিল্লাল আর কাদির?"

"হ্যাঁ।"

"ঘরে তালা নেই। নিশ্চয়ই আছে।"

অনিক সন্তুষ্টির ভাব করে বলল, "গুড।"

দুইজন মাস্তান বাসায় থাকলে কেন সেটা ভালো হবে আমি সেটা বুঝতে পারলাম না। পৃথিবীর বেশিরভাগ জিনিসই আমি অবিশ্যি বুঝতে পারি না, তাই আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

বারো নাম্বার বাসায় গিয়ে আমি আর অনিক যখন ধুপধাপ শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি তখন নিচের তলায় দরজা খুলে একজন মাস্তান বের হয়ে এল। আমরা চিনতে পারলাম, এটা বিল্লাল মাস্তান। আমাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বিল্লাল মাস্তান বলল, "কে? আপনারা কোথায় যান?"

"উপর তলায়।"

"কেন?"

আমাদের ইচ্ছে হলে আমরা উপর তলা-নিচের তলা যেখানে খুশি যেতে পারি, মাস্তানের তাতে নাক গলানোর কী? আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, অনিক আমাকে থামিয়ে বলল, "উপর তলায় খুব ইঁদুরের উৎপাত তাই একটা যন্ত্র লাগাতে যাচ্ছি।"

বিল্লাল মাস্তান তখন হঠাৎ করে আমাদের দুইজনকে চিনতে পারল, চোখ বড় করে বলল, "আপনাদের আগে দেখেছি না?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ। চায়ের দোকানে—"

"বেয়াদব ছেমড়াটা যখন ডিস্টার্ব করছিল আর আমি যখন টাইট দিতে যাচ্ছিলাম তখন—"

AMARBOI.COM

অনিক মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। তখন আমি আপনাকে থামিয়েছিলাম।"

বিল্লাল মাস্তান গম্ভীর মুখে বলল, "উচিত হয় নাই। বেয়াদব পোলাটার একটা শাস্তি হওয়ার দরকার ছিল।"

আমি আর অনিক কোনো কথা বললাম না। কে সত্যিকারের বেয়াদব আর কার শাস্তি হওয়া দরকার সে ব্যাপারে আমার আর অনিকের ভেতরে কোনো সন্দেহ নাই। আমরা যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছি তখন বিল্লাল মাস্তান পিছু পিছু উঠে এল। বলল, "আমাদের ঘরেও ইন্দুরের উৎপাত। শালার রাত্রে ঘুমানো যায় না। আমাদের ঘরেও একটা যন্ত্র লাগায়ে দিবেন!"

"এইগুলি দামি যন্ত্র।"

"কত দাম?"

"টাকা দিয়ে তো আর দাম বলতে পারব না। অনেক গবেষণা করে বানাতে হবে। আমার কাছে বেশি নাই। একটাই আছে।"

"অ।" বিল্লাল কেমন যেন বিরস মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আর অনিক দোতলায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিলাম। শিউলি দরজা খুলে আমাদের দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, "নানু ইন্দুরওয়ালারা আসছে।"

আমি আর অনিক একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। এই বাসায় আমাদের যে ইন্দুরওয়ালা হিসেবে একটা পরিচিতি হয়েছে সেটা জানতাম না। শিউলি যখন আমাদের পিছনে বিল্লাল মাস্তানকে দেখল তখন দপ করে তার মুখের হাসি নিবে গেল।

অনিক তার ব্যাগ থেকে গোলাকার একটা যন্ত্র বের করে বলল, "এটা একটা উঁচু জায়গায় রাখতে হবে। এমনভাবে রাখতে হবে যেন সম্পূর্ণ ঘরটা সামনে থাকে। সামনে কিছু থাকলে কিন্তু কাজ করবে না।"

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা বললেন, "ঐ আলমারির ওপর রেখে দেন।"

অনিক আলমারির ওপর রেখে সুইচ টিপে সেটা অন করে দিতেই একটা ছোট লাল বাতি জ্বলতে থাকল। অনিক সন্তুষ্টির ভান করে বলল, "গুড। এখন আর কোনো চিন্তা নেই। আপনার এই ঘরে কোনো ইঁদুর ঢুকবে না।"

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা খানিকটা সন্দেহের চোখে যন্ত্রটা দেখে বললেন, "দেখি বাবা, তোমার যন্ত্র কাজ করে কিনা।"

অনিক একটা কাগজ বের করে সেখানে তার নাম-ঠিকানা লিখে বৃদ্ধ ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে বলল, "যদি কোনো সমস্যা হয় শিউলিকে দিয়ে আমার কাছে খবর পাঠিয়ে দেবেন। আমি এই এক রাস্তা পরেই থাকি।"

"ঠিক আছে বাবা।"

আমরা যখন বের হয়ে এলাম তখন বিল্লাল মাস্তান আমাদের সাথে বের হয়ে এল। কিন্তু আমাদের সাথে নিচে নেমে এল না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘ্যাস ঘ্যাস করে বগল চুলকাতে লাগল।

রাস্তায় নেমে আমি বললাম, "একটা বোকার মতো কাজ করেছ।"

"কী করেছি বোকার মতো?"

"এই যে বিল্লাল মাস্তানকে ইঁদুর দূর করার যন্ত্রটা দেখালে। এই মাস্তান তো এই যন্ত্র কেড়ে নিয়ে যাবে।"

অনিক আনন্দিত মুখে বলল, "তোমার তাই মনে হচ্ছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ।"

অনিক মাথা নেড়ে বলল, "দেখা যাক কী হয়।"

অনিক বাসায় এসেই আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। অনেক যন্ত্রপাতির মাঝে একটা বড় টেলিভিশন, সুইচ টিপে সেটা অন করে দিয়ে সামনে দাঁড়াল। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হল? এখন টেলিভিশন দেখবে?"

"হ্যাঁ।"

"বাংলা সিনেমা আছে নাকি?"

"দেখি বাংলা নাকি ইংরেজি।"

টেলিভিশনটা হঠাৎ করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সেখানে আমি একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলাম; স্ক্রিনে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বারো নম্বর বাসার বৃদ্ধা মহিলা এবং শিউলিকে। দুজনের চোখে-মুখে একটা ভয়ের ছাপ, কারণ কাছেই দাঁড়িয়ে আছে বিল্লাল মাস্তান। অনিক ভলিউমটা বাড়াতেই আমি তাদের কথাও শুনতে পেলাম। শিউলি বলছে, "না এটা নিয়েন না। এইটা ইন্দুরওয়ালারা নানুরে দিছে।"

বিল্লাল মাস্তান হাত তুলে বলল, "চড় মেরে দাঁত ফেলে দিব। আমার মুখের উপরে কথা?"

আমি অবাক হয়ে অনিকের দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী হচ্ছে এখানে?"

অনিক দাঁত বের করে হেসে বলল, "যে যন্ত্রটা রেখে এসেছি সেটা আসলে একটা ছোট ভিডিও ট্রান্সমিটার। সাথে আলট্রাসোনিক একটা ইন্টারফেসও আছে।"

"তার মানে?"

"তার মানে এটা যেখানে থাকবে সেটা আমরা দেখতে পাব। সেখানকার কথা শুনতে পাব!"

আমি দেখতে পেলাম বিল্লাল মাস্তান হাত বাড়িয়ে টেলিভিশনে এগিয়ে আসছে এবং হঠাৎ করে ছবি ওলটপালট হতে লাগল। অনিক দাঁত বের করে হেসে বলল, "বিল্লাল মাস্তান আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে।"

"মানে?"

"এখন বিল্লাল মাস্তান এই ভিডিও ট্রান্সমিটার তার ঘরে নিয়ে রাখবে। আমরা এখানে বসে দেখব ব্যাটা বদমাইশ কখন কী করে?"

আমি অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি জানতে যে বিল্লাল মাস্তান এটা নিয়ে যাবে?"

"আন্দাজ করেছিলাম।"

"এটা আসলে ইঁদুর দূর করার যন্ত্র না?"

"ইঁদুর ধরার সিগন্যালও এটা দিতে পারে তবে আসলে এটা একটা ভিডিও ট্রান্সমিটার।"

অনিক টেবিলে ছোট ছোট চৌকোনা প্লাস্টিকের কয়েকটা বাক্স দেখিয়ে বলল, "এইগুলো হচ্ছে আসল ইঁদুর দূর করার যন্ত্র। ইনফ্রাসোনিক স্পিকার।"

"তা হলে?" পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে জটিল মনে হতে থাকে, "এগুলো দিলে না কেন?"

"দিব। একটু পরে যখন শিউলি আমাদের কাছে নালিশ করতে আসবে তখন তার হাতে দিব।" অনিক টেলিভিশনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকে উত্তেজিত গলায় বলল, "দেখ দেখ মজা দেখ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ক্রিনে দৃশ্যটা ওলটপালট খেতে খেতে হঠাৎ সেটা সোজা হয়ে গেল এবং আমরা বিল্লাল মাস্তানকে দেখতে পেলাম। সে ভিডিও ট্রান্সমিটারের সামনে থেকে সরে যেতেই পুরো ঘরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘরের এক কোনায় একজন উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে, নিশ্চয়ই এটা কাদির। আমাদের ধারণা সত্যি কারণ বিল্লাল মাস্তান কাছে গিয়ে তাকে একটা লাথি মারতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে, "কী হল বিল্লাল ভাই?"

বিল্লাল মাস্তান আঙুল দিয়ে ভিডিও ট্রান্সমিটারটাকে দেখিয়ে বলল, "আর ইন্দুর নিয়া চিন্তা নাই। ইন্দুর দূর করার যন্ত্র নিয়া আসছি।"

"কোথা থেকে আনলেন?"

"উপর তলার বুড়িরে দুই বেকুব দিয়ে গেছে।"

আমি অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দেখেছ কত বড় সাহস? আমাদের বেকুব বলে?"

"বলতে দাও। দেখা যাক কে বেকুব। আমরা না তারা।"

আমরা দেখলাম বিল্লাল মাস্তান সোফায় বসে সোফার নিচে থেকে একটা বোতল বের করে সেটা ঢক ঢক করে খেতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খাচ্ছে?"

"ফেনসিডিল।"

"কত বড় বদমাইশ দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"এখন পুলিশকে খবর দিলে কেমন হয়?"

অনিক বলল, "এত তাড়াহুড়া কিসের? দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়!"

টেলিভিশন স্ক্রিনে আমরা দুই মাস্তানের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিল্লাল কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, "এই বুড়ি খুব তাড়াতাড়ি মরবে বলে তো মনে হয় না।"

কাদির বলল, "সিঁড়ির ওপর থেকে ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া দেই একদিন?"

"উঁহু।" বিল্লাল আরেক ঢোক ফেনসিডিল খেয়ে বলল, "এমনভাবে মার্ডার করতে হবে যেন কেউ সন্দেহ না করে। কোনো তাড়াহুড়া নাই।"

অনিক হা হা করে হেসে বলল, "দেখেছ? আমাদের যে রকম তাড়াহুড়া নাই, তাদেরও কোনো তাড়াহুড়া নাই।"

ঠিক এরকম সময় দরজায় শব্দ হল। অনিক টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই শিউলি এসেছে।"

দরজা খুলে দেখি আসলেই তাই। আমাদের দেখে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "সর্বনাশ হইছে চাচা—"

"কী হয়েছে?"

"নিচের তলার মাস্তান আপনার যন্ত্র জোর করে নিয়ে গেছে।"

আমি এবং অনিক অবাক এবং রাগ হবার অভিনয় করতে থাকি। শিউলি পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করে এবং আমরা যেখানে যতটুকু দরকার সেখানে ততটুকু মাথা নাড়তে থাকি।

শিউলির কথা শেষ হবার পর অনিক বলল, "তোমার ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। আমার কাছে আরো ইঁদুর দূর করার যন্ত্র আছে।"

অনিক একটা ব্যাগে চৌকোনা প্লাস্টিকের বাক্সগুলো ভরে শিউলির হাতে দিয়ে বলল, "এগুলো সব ঘরে একটা করে রেখে দিও ইঁদুর আর আসবে না।"

শিউলি খুশি খুশি মুখে বলল, "সত্যি!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ।" অনিক গলা নামিয়ে বলল, "সাবধান, বিল্লাল মাস্তান যেন এগুলোর খোঁজ না পায়।"

"পাবে না চাচা। আমি লুকিয়ে নিয়ে যাব।"

"গুড।" অনিক টেবিল থেকে আরেকটা প্যাকেট বের করে দিয়ে বলল, "এইটাও সাথে রাখবে।"

"এইটা কী?"

"ইঁদুরের খাবার। বাসার বাইরে যেখানে ইঁদুর থাকে সেখানে এইগুলো রাখবে।"

শিউলি বলল, "এইটা কি বিষ?"

অনিক সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, "অনেকটা সে রকম। সাবধান, হাত দিয়ে ধরো না। হাতে লাগলে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে।"

"ঠিক আছে। আমি এখন যাই।"

"যাও শিউলি।"

শিউলি চলে যাবার পর আমি বললাম, "এইটুকুন ছোট একটা বাচ্চার হাতে ইঁদুর মারার বিষ দেওয়া কি ঠিক হল?"

অনিক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি মোটেও ওর হাতে বিষ দেই নাই।"

"তা হলে কী দিয়েছ?"

"গ্রোথ হরমোন মেশানো খাবার!"

"মানে?"

"মানে বারো নম্বর বাসায় যত ইঁদুর আছে সেগুলিকে মোটাতাজা করছি!"

"মোটাতাজা?"

"হ্যাঁ। ইনফ্রাসোনিক বিপারের কারণে এখন বাসার ভেতরে কোনো ইঁদুর ঢুকবে না, কিন্তু সেগুলো আস্তে আস্তে খাসির মতো মোটা হবে। তারপর যখন সময় হবে তখন—"

"তখন কী?"

"তখন বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তান বুঝবে কত ইঁদুরের দাঁতের মাঝে কত ধার।"

আমি অনিকের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। অনিক চোখ মটকে বলল, "চলো, আরো কিছুক্ষণ বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তানের নাটক দেখি।"

আমরা গিয়ে টেলিভিশন অন করতেই দুইজনকে দেখতে পেলাম খালি গায়ে টেলিভিশনে হিন্দি সিনেমা দেখে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে। দুইজনের হাতে ছোট ছোট দুইটা বোতল, সেটা চুমুক দিয়ে খাচ্ছে আর ঢেকুর তুলছে, কী বিচ্ছিরি একটা দৃশ্য!

কয়েকদিন পরের কথা। আমি অনিকের বাসায় গিয়েছি। দুইজনে চিপস খেতে খেতে টেলিভিশনে বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তানের কাজ-কারবার দেখছি। এখানে যেসব জিনিস আমরা দেখতে পেয়েছি পুলিশ সেটা জানলেই একেক জনের চৌদ্দ বছর করে জেল হবার কথা। মদ গাঁজা ভাং থেকে শুরু করে হেরোইন ফেনসিডিল সবকিছু নিয়ে তাদের কাজ-কারবার। নানা রকম বেআইনি অস্ত্রপাতিও ঘরের মাঝে লুকানো থাকে। সেগুলো ব্যবহার করে কবে কোথায় কোন ছিনতাই করেছে, কোন মাস্তানি করেছে অনিক সেই সংক্রান্ত সব কথাবার্তা রেকর্ড করে ফেলেছে। বেছে বেছে সেসব জায়গা কপি করে একটা সিডি তৈরি করে পুলিশকে একটা আর খবরের কাগজের লোকদের একটা দিলেই বাছাধনদের শুধু বারোটা না, একেবারে বারো দুগুণে চব্বিশটা বেজে যাবে। কীভাবে সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা যায় আমি আর অনিক সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। এরকম সময় অনিক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "ঐ যে শিউলি যাচ্ছে!"

আমি বললাম, "ডাক ওকে, একটু খোঁজখবর নেই।"

অনিক জানালা দিয়ে মাথা বের করে ডাকল, "শিউলি!"

শিউলি আমাদের দেখে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ছুটে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খবর শিউলি?"

"ভালো।"

"কোথায় যাও?"

"বাজার করতে যাই।"

অনিক জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বাসায় ইঁদুরের উৎপাত কমেছে?"

"জে কমেছে। বাসায় ইন্দুরের বংশই নাই।"

"তাই নাকি?"

"জে। নানু খুব খুশি। প্রত্যেকদিন আপনাদের কথা কয়।"

"কী বলেন আমাদের কথা?"

"বলেন যে যদি ইন্দুরের যন্ত্রের মতো আরেকটা যন্ত্র বানাতে পারতেন যেটা মাস্তানদের দূর করতে পারে তা হলে খুব মজা হত।"

অনিক কিছু না বলে একটু হাসল। শিউলি বলল, "নানু আপনাদের একদিন চা নাস্তা খেতে ডাকবে।"

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, "ভেরি গুড। ভেরি গুড।"

অনিক বলল, "ঠিক আছে শিউলি তুমি তা হলে তোমার কাজে যাও।"

শিউলি চলে যেতে শুরু করে। অনিক পেছন থেকে বলল, "তোমাদের অন্য কোনো সমস্যা হলে আমাকে বোলো।"

"কোনো সমস্যা নাই।" শিউলি হঠাৎ দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে বলল, "শুধু একটা সমস্যা।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "কী সমস্যা?"

"এখন ইন্দুরের কোনো উৎপাত নাই কিন্তু বিলাইয়ের উৎপাত বাড়ছে।"

"বিড়ালের উৎপাত বেড়েছে?"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "বিড়াল কোথা থেকে এসেছে?"

"সেটা জানি না। তয় নানু বিড়ালরে একদম ডরায় না, সেই জন্যে নানু কিছু বলে না। উল্টা প্লেটে করে প্রত্যেক দিন খাবার দেয়।"

অনিক ভুরু কুঁচকে বলল, "কী রকম বিড়াল?"

"সেইটা দেখি নাই। রাত্রিবেলা আসে তাই দেখা যায় না।"

"রাত্রিবেলা আসে?"

"জে।"

"ডাকাডাকি করে?"

শিউলি মাথা চুলকে বলল, "জে না ডাকাডাকি করে না।"

"তা হলে কেমন করে বুঝলে এটা বিড়াল। দেখতেও পাও না ডাকও শোন না—"

"ওপর থেকে নিচে তাকালে দেখা যায়। আবছা অন্ধকারে দৌড়াদৌড়ি করে। বিলাইয়ের সাইজ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিক হঠাৎ কেমন জানি চিন্তিত হয়ে গেল। শিউলি চলে যাবার পরও সে গম্ভীর মুখে হাঁটাহাঁটি করে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে অনিক?"

"শুনলে না—ইঁদুরের উৎপাত কমেছে, কিন্তু বিড়ালের উৎপাত বেড়েছে।"

"বিড়ালকে যদি উৎপাত মনে না করে—"

"না-না-না" অনিক দ্রুত মাথা নাড়ে, "তুমি কিছু বুঝতে পারছ না।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী বুঝতে পারছি না?"

"এগুলো বিড়াল না।"

"তা হলে এগুলো কী?"

"এগুলো ইঁদুর। আমার গ্রোথ হরমোন খাবার খেয়ে বড় হয়ে গেছে।"

"কত বড় হয়েছে?"

"শুনলে না শিউলি বলল, বিড়ালের সাইজ!"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "একেকটা ইঁদুরের সাইজ বিড়ালের মতো? সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ, সর্বনাশ। ডজন খানেক এই ইঁদুর যদি কাউকে ধরে তা হলে তার খবর আছে।"

আমি অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি এগুলোকে এতবড় তৈরি করেছ কেন?"

"বুঝতে পারি নাই। ভেবেছিলাম, মোটাসোটা হবে, হৃষ্টপুষ্ট হবে। বড় হবে বুঝতে পারি নাই।"

"এখন?"

অনিক মাথা চুলকিয়ে বলল, "আগে দেখতে হবে নিজের চোখে।"

"কীভাবে দেখবে? অন্ধকার না হলে বের হবে না।"

"অন্ধকারে দেখার স্পেশাল চশমা আছে, নাইট ভিশন গগলস। সেগুলো চোখে দিয়ে দেখা যেতে পারে।"

আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, "এক কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তানের ঘরে কিছু এসে হাজির হলে আমরা সেটা দেখতে পাই।"

"হ্যাঁ।"

"ওদের ঘরের সেই যন্ত্রটায় ইঁদুর দূর করার শব্দটা বন্ধ করে দাও। তা হলে হয়তো এক দুইটা ভিতরে ঢুকবে, আমরা তখন দেখতে পাব।"

অনিক হাতে কিল দিয়ে বলল, "গ্রেট আইডিয়া। সত্যি কথা বলতে কি আমরা আরো একটা কাজ করতে পারি।"

"কী কাজ?"

"ইঁদুরকে ঘরে ঢোকার জন্য স্পেশাল সাউন্ড দিতে পারি।"

"আছে সে রকম শব্দ?"

"হ্যাঁ, আছে। ইঁদুরের সঙ্গীত বলতে পার।"

"সঙ্গীত? ব্যান্ড সঙ্গীত?"

"ব্যান্ড সঙ্গীত না উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সেটা জানি না, কিন্তু ইঁদুরেরা এই শব্দ শুনতে পছন্দ করে। শব্দ শুনলে কাছে এগিয়ে যায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, "লাগাও দেখি।"

অনিক তার যন্ত্রপাতির প্যানেলে চোখ বুলিয়ে কয়েকটা সুইচ অন করে, কয়েকটা অফ করে। বড় বড় কয়েকটা নব ঘুরিয়ে কিছু একটা দেখে বলল, "এখন ইঁদুরদের ঘরের ভেতরে আসার কথা!"

"ইঁদুরের সঙ্গীত লাগিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ, দিয়েছি। তবে ইঁদুর আসবে কিনা জানি না। হাজার হলেও দিনের বেলা, দিনের বেলা ইঁদুর গর্ত থেকে বের হতে চায় না।"

আমরা বেশ কিছুক্ষণ বসে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম তখন দেখতে পেলাম মোটাসোটা একটা ইঁদুর গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আসছে। টেলিভিশনের স্ক্রিনে ঠিক কত বড় বোঝা যায় না, কিন্তু তারপরেও আমরা অনুমান করে হতবাক হয়ে গেলাম। সেগুলো কমপক্ষে এক হাত লম্বা—লেজ নিয়ে প্রায় দুই হাত। ওজন পাঁচ কেজির কম না। এই বিশাল ইঁদুর ঘরের ভিতরে হাঁটতে লাগল। ঘরের ভিতর জিনিসপত্র শুঁকতে লাগল।

আমি কিছুক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে বুক থেকে একটা লম্বা শ্বাস বের করে বললাম, "সর্বনাশ! এ যে রাক্ষুসে ইঁদুর!"

"হ্যাঁ।" অনিক মাথা নাড়ল।

"ইঁদুর বলে ইঁদুর—একেবারে মেগা ইঁদুর।"

"ঠিকই বলেছ।" অনিক মাথা নাড়ল, "একেবারে মেগা ইঁদুর।"

কিছুক্ষণের মাঝেই আরো কয়েকটা মেগা ইঁদুর ঘরের ভেতর এসে ঢুকল। বিল্লাল আর কাদির এমনিতেই খবিশ ধরনের মানুষ। ঘরের ভেতরে উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে শুরু করে নানা কিছু ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। বিশাল বিশাল ইঁদুরগুলো সেগুলো খেতে লাগল, দাঁত দিয়ে কাটাকাটি করতে লাগল। ঘরের ভেতর এই বিশাল ইঁদুরগুলো কিলবিল কিলবিল করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র দাঁত দিয়ে কেটে কিছুক্ষণের মাঝে সবকিছু তছনছ করে দিল।

বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তান যখন তাদের বাসায় ফিরে এসেছে তখন রাত প্রায় দশটা। তালা খুলে ভিতরে ঢোকার শব্দ পেয়েই ইঁদুরগুলি সোফার নিচে, খাটের তলায়, দরজার কোনায় লুকিয়ে গেল। বিল্লাল আর কাদির ভিতরে ঢুকেই ইতস্তত তাকায়, তাদের চোখে প্রথমে বিস্ময় তারপর ক্রোধের ছায়া পড়ল। বিশাল মেগা ইঁদুরগুলো ঘরটা তছনছ করে রেখেছে।

বিল্লাল বলল, "কে ঢুকেছে ঘরে?"

কাদির বলল, "আমি জানি না।"

"ঘরটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে—"

কাদির মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আর কী রকম একটা আঁশটে গন্ধ দেখেছ?"

বিল্লাল ইঁদুরে কেটে কুটিকুটি করে রাখা তার একটা শার্ট তুলে হুংকার দিয়ে বলল, "আমার শার্টটা কে কেটেছে?"

কাদির তার প্যান্টটায় হাত দিয়ে বলল, "আমার প্যান্ট।"

বিল্লাল বলল, "আমার বালিশ।"

কাদির বলল, "আমার সোফা।"

বিল্লাল হঠাৎ শার্টের নিচে হাত দিয়ে একটা রিভলবার বের করল। সেটা হাতে নিয়ে বলল, "যেই ঢুকে থাকুক, সে এই ঘরে আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাদিরও একটা কিরিচ হাতে নেয়। বলে, "ঠিকই বলেছেন বিল্লাল ভাই, দরজা বন্ধ ছিল। ভিতরেই আছে।"

দুইজন তখন ঘরের ভিতর খুঁজতে থাকে। খুব বেশি সময় খুঁজতে হল না। বিছানার নিচে উঁকি দিয়েই বিল্লাল একটা গগনবিদারী চিৎকার দেয়। তারপর যা একটা ব্যাপার শুরু হল সেটা বলার মতো নয়। ইঁদুরগুলো একসাথে বিল্লাল আর কাদিরের ওপর লাফিয়ে পড়ল। ভয়ে আতঙ্কে বিল্লাল দুই একটা গুলি করে কিন্তু তাতে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। ভিতরে ইঁদুরের সাথে মাস্তানদের একটা ভয়ংকর খণ্ডযুদ্ধ শুরু হতে থাকে! দুইজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খায় আর বিশাল বিশাল লোমশ ইঁদুর তাদেরকে কামড়াতে থাকে। দেখে মনে হয় কিছুক্ষণের মাঝে দুজনকেই খেয়ে ফেলবে।

অনিক বলল, "সর্বনাশ!"

আমি বললাম, "তাড়াতাড়ি তোমার সুইচ অন করে ইঁদুর তাড়িয়ে দাও!"

অনিক দৌড়াদৌড়ি করে সুইচ অন করার চেষ্টা করে। সুইচ খুঁজে বের করে সেগুলো অন অফ করে নব ঘুরিয়ে যখন ইঁদুরগুলোকে দূর করল ততক্ষণে দুইজনের অবস্থা শোচনীয়। তাদের হইচই চিৎকার শুনে বাইরে মানুষজন দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। তার ভিতরে কয়েকজন পুলিশকেও দেখতে পেলাম।

অনিক বলল, "চলো। সরজমিনে দেখে আসি।"

আমি বললাম, "চলো।"

আমরা যখন গিয়েছি তখন পুলিশ দুইজনকে হ্যান্ডকাফ লাগাচ্ছে। ঘরের ভেতরে কয়েক শ ফেনসিডিলের বোতল, মদ, গাঁজা, হেরোইনের সাপ্লাই। নানারকম অস্ত্র গোলাগুলি— হাতেনাতে এরকম মাস্তানদের ধরা সোজা কথা নয়। বিল্লাল আর কাদিরকে চেনা যায় না— সারা শরীর কেটেকুটে রক্তাক্ত অবস্থা।

পুলিশের একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? তোমাদের এই অবস্থা কেন?"

বিল্লাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "এই এত বড় বড়—"

"এত বড় বড় কী?"

"ইঁদুরের মতো—"

পুলিশ অফিসার হা হা করে হাসলেন। বললেন, "এত বড় কখনো ইঁদুর হয় নাকি?"

উপস্থিত মানুষদের একজন বলল, "মদ গাঁজা খেয়ে কী দেখতে কী দেখেছে!"

"নিজেরাই নিজের সাথে মারামারি করেছে।"

কাদির মাথা নেড়ে বলল, "জি না! আমরা মারামারি করি নাই।"

পুলিশ অফিসার দুইজনকে গাড়িতে তুলতে তুলতে বলল, "রিমান্ডে নিয়ে একটা রগড়া দিলেই সব খবর বের হবে।"

সব লোকজন চলে যাবার পর শিউলি আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। দাঁত বের করে হেসে বলল, "এক নম্বুরি কাজ!"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী কাজ এক নম্বুরি?"

"এই যে মাস্তানদের দূর করলেন?"

"কে দূর করেছে?"

"আপনারা দুইজন।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

শিউলি খুক খুক করে হাসতে হাসতে বলল, "আমি সব জানি। খালি একটা কথা—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী কথা?

"বিলাইয়ের সাইজের ইন্দুরগুলো কিন্তু দূর করতে হবে।"

অনিক হাসল। বলল, "মাস্তান দূর করে দিতে যখন পেরেছি—তখন তোমার এই ইঁদুরও দূর করে দেব।"

শিউলি তার সব কয়টি দাঁত বের করে বলল, "এই জন্যেই তো আপনাদের ইন্দুরওয়ালা ডাকি!"

কবি কিংকর চৌধুরী

টেলিফোনের শব্দে সকালবেলা ঘুম ভাঙল। বাংলাদেশে ঘুমের ব্যাপারে আমার চাইতে বড় এক্সপার্ট কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। যদি ঘুমের ওপর কোনো অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থাকত সোনা না হলেও নির্ঘাত একটা রুপা কিংবা ব্রোঞ্জ পদক আনতে পারতাম। এরকম একটা এক্সপার্ট হিসেবে আমি জানি সকালের ঘুমটা হচ্ছে ঘুমের রাজা—এইসময় কেউ যদি ঘুমের ডিস্টার্ব করে তার দশ বছরের জেল হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু দেশে এখনো সেই আইন হয় নি। কাজেই আমাকে বিছানা থেকে উঠতে হল। উঠতে গিয়ে আমি "আউক" বলে নিজের অজান্তেই একটা শব্দ করে ফেললাম। বেকায়দায় ঘুমাতে গিয়ে ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা।

কোনোমতে ব্যথা সহ্য করে গিয়ে টেলিফোন ধরে বললাম, "হ্যালো।"

"ভাইয়া! এতক্ষণ থেকে ফোন বাজছে, ধরছ না, ব্যাপারটা কী?"

গলা শুনে বুঝতে পারলাম ছোট বোন শিউলি, আমাদের পরিবারের সবচেয়ে বিপজ্জনক সদস্য। সবকিছু নিয়ে তার কৌতূহল এবং সবকিছু নিয়ে তার এক্সপেরিমেন্ট করার একটা বাতিক আছে। বিশেষ করে নতুন নতুন যে রান্নাগুলি সে আবিষ্কার করে, সেগুলিকে আমি সবচেয়ে ভয় পাই। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কী হয়েছে? এত সকালে ফোন করছিস?"

"সকাল? কয়টা বাজে তুমি জান?"

"কয়টা?"

"সাড়ে দশটা।"

"সাড়ে দশটা অবশ্যই সকাল।" আমি হাই তুলে বললাম, "কী হয়েছে তাড়াতাড়ি বল। বাকি ঘুমটা শেষ করতে হবে।"

"তাড়াতাড়ি-তাড়াতাড়ি—সব সময় তোমার শুধু তাড়াতাড়ি।" ছোট বোন শিউলি বলল, "কোনো কিছু যে ধীরে ধীরে সুন্দর করে করার একটা ব্যাপার আছে সেটা তুমি জান?"

আমার ঘুম চটকে গেল, সে যে কথাগুলি বলেছে সেগুলি মোটেও তার কথা না। শিউলি সব সময়েই ছটফট করে হইচই করে চিৎকার করে ছোটাছুটি করে! আমাকে উপদেশ দিচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে-সুস্থে কাজ করতে, সুন্দর করে কাজ করতে—ব্যাপারটা কী? আমি বললাম, "তোর হয়েছে কী? এভাবে কথা বলছিস কেন?"

"কীভাবে কথা বলছি?"

"বুড়ো মানুষের মতো। ধীরে ধীরে কাজ করা সুন্দর করে কাজ করা, এগুলো আবার কী রকম কথা?"

শিউলি বলল, "মানুষের জীবন ক্ষণিকের হতে পারে কিন্তু সেটা খুব মূল্যবান। সেটা তাড়াহুড়ো করে অপচয় করা ঠিক না। সেটা সুন্দর হতে হবে, পবিত্র হতে হবে, কোমল পেলব হতে হবে—"

আমার ঘুম পুরোপুরি ছুটে গেল, উত্তেজনায় ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে আবার প্রচণ্ড ব্যথায় ককিয়ে উঠে বললাম, "আউক!"

"আউক?" শিউলি প্রায় আর্তনাদ করে বলল, "ভাইয়া, তুমি এসব কী অশালীন অসুন্দর কথা বলছ? ছি ছি ছি—"

আমি এবারে পুরোপুরি রেগে আগুন হয়ে উঠে বললাম, "আমার ইচ্ছে হলে আউক বলব, ইচ্ছে হলে ঘাউক বলব, তোর তাতে এত মাথাব্যথা কিসের?"

অন্যপাশে শিউলি বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমাকে তুমি রাগাতে পারবে না ভাইয়া। আমি ঠিক করেছি জীবনের যত অসুন্দর জিনিস তার থেকে দূরে থাকব। তোমাকে যে জন্য ফোন করেছিলাম—"

"কী জন্য এই সকালে ঘুম ভাঙিয়েছিস?"

"আজ সন্ধেবেলা আমার বাসায় আস।"

"কী ব্যাপার? খাওয়াদাওয়া—"

"ইস ভাইয়া!" শিউলি কেমন যেন নেকু নেকু গলায় বলল, "তুমি খাওয়া ছাড়া আর কিছু বোঝ না। খাওয়া হচ্ছে একটা স্থূল ব্যাপার। পৃথিবীতে খাওয়া ছাড়া আরো সুন্দর বিষয় থাকতে পারে।"

"সেটা কী?"

"আজকে বাসায় কবি কিংকর চৌধুরী আসবেন—"

"কী চৌধুরী?"

শিউলি স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করল, "কিংকর চৌধুরী।"

"কিংকং চৌধুরী? কিংকং গরিলার নাম, মানুষকে কিংকং ডাকছিস কেন?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "বেশি মোটা আর কালো নাকি?"

"কিংকং না", শিউলি শীতল গলায় বলল, "কিংকর। কিংকর চৌধুরী।"

"কিংকর? কী অদ্ভুত নাম!"

"মোটেও অদ্ভুত না। কিংকর খুব সুন্দর নাম। তুমি বইপত্র পড় না বলে জান না। কিংকর চৌধুরী বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। তার একটা করে কবিতার বই বের হয় সেগুলো হটকেকের মতো বিক্রি হয়। দেশের তরুণ-তরুণীরা তার জন্য পাগল—"

"চেহারা কেমন?"

শিউলি থতমত খেয়ে বলল, "চেহারা?"

"হ্যাঁ। কালো আর মোটা নাকি?"

"মানুষের চেহারার সাথে তার সৃজনশীলতার কোনো সম্পর্ক নাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তার মানে কালো আর মোটা।" আমি সবকিছু বুঝে ফেলেছি এরকম গলায় বললাম, "মাথায় টাক?"

"মোটেও টাক নাই।" শিউলি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "কপালের ওপর থেকে হুবহু রবীন্দ্রনাথ। চোখ দুটো একেবারে জীবনানন্দ দাশের। নাকের নিচের অংশ কাজী নজরুল ইসলাম। আর তোমার হিংসুটে মনকে শান্ত করার জন্য বলছি, কবি কিংকর চৌধুরী মোটেও কালো আর মোটা নন। ফরসা এবং ছিপছিপে। দেবদূতের মতো—"

"বুঝেছি।" আমি চিন্তিত গলায় বললাম, "এই কবিই তোর মাথা খেয়েছে। শরীফ কী বলে?"

শরীফ হচ্ছে শিউলির স্বামী, সেও শিউলির মতো আধপাগল। কোনো কোনো দিক দিয়ে মনে হয় পুরো পাগল। শিউলি বলল, "শরীফ তোমার মতো কাঠখোট্টা না, তোমার মতো হিংসুটেও না। শরীফই কবি কিংকর চৌধুরীকে বাসায় এনেছে—"

"বাসায় এনেছে মানে?" আমি আঁতকে উঠে বললাম, "এখন তোদের বাসায় পাকাপাকি উঠে এসেছে নাকি?"

"না ভাইয়া।" শিউলি শান্ত গলায় বলল, "তার নিজের বাসা আছে, ফ্যামিলি আছে, সেখানে থাকেন। মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসেন।"

"হ্যাঁ, খুব সাবধান।" আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "কবি-সাহিত্যিকরা ছ্যাবলা টাইপের হয়। একটু লাই দিলেই কিন্তু মাথায় চড়ে বসবে—তোর বাসায় পাকাপাকিভাবে ট্রান্সফার হয়ে যাবে।"

"উহ! ভাইয়া—" শিউলি কান্না কান্না গলায় বলল, "তুমি একজন সম্মানী মানুষ নিয়ে এত বাজে কথা বলতে পার, ছি!"

"মোটেও বাজে কথা বলছি না। তুই কী জানিস?"

"অন্তত এইটুকু জানি কবি কিংকর চৌধুরী বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। বিখ্যাত মানুষ। সম্মানী মানুষ। তার সাথে কথা বলে আমরাও চেষ্টা করছি তার মতো হতে—"

"সর্বনাশ!" আচমকা ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে আবার রগে টান পড়ল, আমি আবার বললাম, "আউক!"

শিউলি না শোনার ভান করে বলল, "যদি একজন সত্যিকারের মানুষের সাথে দেখা করতে চাও, কথা বলতে চাও তা হলে সন্ধেবেলা এসো। কবি কিংকর চৌধুরী থাকবেন।"

খাবারের মেনুটা কী জিজ্ঞেস করার আগেই শিউলি টেলিফোন রেখে দিল। মনে হয় আমার ওপর রাগ করেছে। টেলিফোন রেখে দেবার পর আমার মনে হল, কবি কিংকর চৌধুরীকে দেখে বিলু আর মিলি কী বলছে সেটা জিজ্ঞেস করা হল না। বিলু আর মিলি হচ্ছে আমার ভাগ্নে-ভাগ্নি, একজনের বয়স আট অন্যজনের দশ, ঐ বাসায় এই দুইজন এখনো স্বাভাবিক মানুষ—বড় হলে কী হবে কে জানে! শিউলি-শরীফের পাল্লায় পড়ে কবি-সাহিত্যিকের পেছনে যে ঘোরাঘুরি শুরু করবে না কেউ তার গ্যারান্টি দিতে পারবে না। পাগলা-আধপাগলা মানুষ নিয়ে যে কী মুশকিল!

শিউলি ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, তাই আর বিছানায় ফেরত গিয়ে লাভ নেই। ঘাড়ের ব্যথাটাও মনে হয় ভালোভাবেই ধরেছে। দাঁত ব্রাশ করা, শেভ করা, এই কাজগুলো করতে গিয়েও মাঝে মাঝে "আউক" শব্দ করতে হল। বেলা বারোটার দিকে ঘর থেকে বের হয়েছি। বাসার বাইরে একজন দারোয়ান থাকে, আমাকে দেখেই দাঁত বের করে হি হি করে হেসে বলল, "স্যার, ঘাড়ে ব্যথা?"

AMARBOI.COM

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাতে গিয়ে "আউক" করে শব্দ করলাম। পুরো শরীর ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাতে হল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কেমন করে বুঝতে পারলে আমার ঘাড়ে ব্যথা?"

"দশ মাইল দূর থেকে আপনাকে দেখে বোঝা যায় স্যার। দুইটা জিনিস মানুষের কাছে লুকানো যায় না। একটা হচ্ছে ঘাড়ে ব্যথা আরেকটা—"

"আরেকটা কী?"

"সেটা শরমের ব্যাপার, আপনাকে বলা যাবে না।"

"ও।" শরমের ব্যাপারটা আমি আর জানার চেষ্টা করলাম না। আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম, দারোয়ান আমাকে থামাল, বলল, "স্যার। ঘাড়ের ব্যথার জন্য কী ওষুধ খাচ্ছেন?"

"এখনো কোনো ওষুধ খাচ্ছি না।"

"ওষুধে কোনো কাজ হয় না স্যার, যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মালিশ।"

"মালিশ?"

"জে স্যার। সরিষার তেল গরম করে দুই কোয়া রশুন ছেড়ে দিবেন স্যার। সকালে এক মালিশ বিকালে আরেক মালিশ। দেখবেন ঘাড়ের ব্যথা কই যায়!"

"ঠিক আছে।" আমি ঘাড়ের ব্যথার ওষুধ জেনে বের হলাম। মোড়ের রাস্তায় যাবার সময় শুনলাম পানের দোকান থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করল, "ঘাড়ে ব্যথা?"

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে গিয়ে যন্ত্রণায় "আউক" শব্দ করলাম। পুরো শরীর ঘুরিয়ে তাকাতে হল, পানের দোকানের ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। একজনের ঘাড়ে ব্যথা হলে অন্যকে কেন হাসতে হবে? আমি বললাম, "হ্যাঁ। ঘাড়ে ব্যথা।"

"কমলার রস খাবেন। দিনে তিনবার। দেখবেন ব্যথা বাপ বাপ করে পালাবে।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে।"

আমি দশ পাও সামনে যাই নি, একজন আমাকে থামাল, "জাফর ইকবাল সাহেব না?"

"জি।"

"ঘাড়ে ব্যথা?"

মানুষটা কে চেনার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "জি। সকাল থেকে উঠেই ঘাড়ে ব্যথা।"

"ঘাড়ে ব্যথার একটাই চিকিৎসা, ঠাণ্ডা-গরম চিকিৎসা।"

"ঠাণ্ডা-গরম?"

"জি। আইসব্যাগ আর হট ওয়াটার ব্যাগ নিবেন। দুই মিনিট আইসব্যাগ দুই মিনিট হট ওয়াটার ব্যাগ। ব্লাড সারকুলেশান বাড়বে আর ব্লাড সারকুলেশান হচ্ছে সব সমস্যার সমাধান। দুই দিনে সেরে যাবে।"

"ও আচ্ছা।" আমি মানুষটার দিকে তাকিয়ে তার পরিচয় জানতে চাচ্ছিলাম, তার আগেই সে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল। আমাদের দেশের মানুষের মনে হয় রোগের চিকিৎসা নিয়ে উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুর জন্য সময় নেই।

সারা দিন অন্তত শ খানেক পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষ আমার ঘাড়ের ব্যথা কেমনভাবে সারানো যায় সেটা নিয়ে উপদেশ দিল। সবচেয়ে সহজটি ছিল তিনবার কুলহু আল্লাহ পড়ে ফুঁ দেওয়া। সবচেয়ে কঠিনটি হচ্ছে জ্যান্ত দাঁড়াশ সাপ ধরে এনে শক্ত করে তার লেজ এবং মাথা টিপে ধরে শরীরটা ঘাড়ে ভালো করে ডলে নেওয়া। আশ্চর্যের ব্যাপার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই শখানেক মানুষের মাঝে একজনও আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে বলল না। বিকালবেলা আমি তাই ঠিক করলাম ডাক্তারের কাছেই যাব।

কোন ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায় সেটা নিয়ে একটু সমস্যার মাঝে ছিলাম, তখন সুব্রতের কথা মনে পড়ল। আমি কাছাকাছি একটা ফোন–ফ্যাক্সের দোকান থেকে সুব্রতকে ফোন করতেই সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "কে, জাফর ইকবাল?"

"হ্যাঁ।"

"কী হয়েছে তোর? এইরকম সময়ে ফোন করেছিস? কোনো সমস্যা?"

"না-না, কোনো সমস্যা না।" আমি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম, "একটা ডাক্তারের খোঁজ করছিলাম।"

"ডাক্তার?" সুব্রত প্রায় চিৎকার করে বলল, "কেন? কার জন্য ডাক্তার? কী হয়েছে? সর্বনাশ!"

"সেরকম কিছু হয় নাই। আমার নিজের জন্য।"

"তোর নিজের জন্য? কেন? কী হয়েছে তোর?"

"ঘাড়ে ব্যথা।"

"ঘাড়ে ব্যথা?" সুব্রত হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেল, আমার মনে হল আমি যেন ঘাড়ে ব্যথা না বলে ভুল করে লিভার ক্যান্সার বলে ফেলেছি। সুব্রত থমথমে গলায় বলল, "কোন ঘাড়ে?"

"দুই ঘাড়েই। বামদিকে একটু বেশি।"

সুব্রত আর্তনাদ করে বলল, "বামদিকে একটু বেশি? সর্বনাশ!"

"এর মাঝে সর্বনাশের কী আছে?"

"হার্ট অ্যাটাকের আগে এভাবে ব্যথা হয়। ঘাড়ে-হাতে ছড়িয়ে পড়ে। আমার আপন ভায়রার ছোট শালার এরকম হয়েছিল। হাসপাতালে নেবার আগে শেষ।"

এবারে আমি বললাম, "সর্বনাশ!"

"তুই কোনো চিন্তা করিস না। আমি আসছি।"

"আয় তা হলে।"

"কোথায় আছিস তুই?"

আমি রাস্তার ঠিকানাটা দিলাম। সুব্রত টেলিফোন রাখার আগে জিজ্ঞেস করল, "তোর কি শরীর ঘামছে?"

"না।"

"বুকের মাঝে কি চিনচিনে ব্যথা আছে? মনে হয় কিছু একটা চেপে বসে আছে?"

আমি দুর্বল গলায় বললাম, "না, সেরকম কিছু নেই।"

"ঠিক আছে। তুই বস, আমি আসছি। কোনো চিন্তা করবি না।"

আমি ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে বসে রইলাম। দোকানের মালিক খুব বিরক্ত চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগল, আমি বেশি গা করলাম না। সত্যি যদি হার্ট অ্যাটাক হতেই হয় এখানে হোক, সুব্রত তা হলে খুঁজে পাবে। রাস্তাঘাটে হার্ট অ্যাটাক হলে উপায় আছে!

বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হতে লাগল, ঘাড়ের ব্যথাটা আস্তে আস্তে ঘাড় থেকে হাতে ছড়িয়ে পড়ছে। একটু পরে মনে হল, বুকে ব্যথা করতে শুরু করেছে। মনে হতে লাগল হাত ঘামতে শুরু করেছে, খানিকক্ষণ পর মনে হল শুধু হাত না শরীরও ঘামছে।

AMARBOI.COM

আমার শরীর দুর্বল লাগতে থাকে, মাথা ঘুরতে থাকে এবং হাত-পা কেমন জানি অবশ হয়ে আসতে থাকে। জীবনের আশা যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছি তখন সুব্রত এসে হাজির। আমাকে দেখে উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "বেশি ভালো না।"

"তুই কোনো চিন্তা করিস না। ডাক্তারকে ফোন করে দিয়েছি। আয়।"

"ডাক্তারের নাম কী?"

সুব্রত আমাকে ধমক দিয়ে বলল, "তুই ডাক্তারের নাম দিয়ে কী করবি?"

"কোথায় বসে?"

"সেটা জেনে তোর কী লাভ? আয় আমার সাথে।"

আমাকে একটা সিএনজিতে তুলে সুব্রত ধানমণ্ডিতে এক জায়গায় নিয়ে এল। ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে অনেক মানুষজন কিন্তু সুব্রত কীভাবে কীভাবে জানি সব মানুষকে পাশ কাটিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

ডাক্তারের বয়স হয়েছে, চুল পাকা। চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে একবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী সমস্যা?"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "ঘাড়ে ব্যথা।"

"ঘাড় থাকলেই ঘাড় ব্যথা হবে। যাদের ঘাড় নেই, তাদের ঘাড়ের ব্যথাও নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কাদের ঘাড় নেই?"

"ব্যাঙদের। তাদের গলা-ঘাড় কিছু নেই। মাথার পরেই ধড়।"

সুব্রত আমার পাশে বসে ছিল, আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তোর ব্যাঙ হয়েই জন্ম নেওয়া উচিত ছিল।"

ডাক্তার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, "কেন?"

সুব্রত বলল, "দেখছেন না ব্যাঙের মতন মোটা হয়েছে। এ শুধু খায় আর ঘুমায়।"

ডাক্তার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি নাকি?"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিতে গিয়ে যন্ত্রণার কারণে বললাম, "আউক।"

সুব্রত বলল, "আউক মানে হচ্ছে ইয়েস।"

ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আসেন, কাছে আসেন।"

আমি ভয়ে ভয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার আমার ঘাড় ধরে খানিকক্ষণ টেপাটেপি করলেন, ব্লাড প্রেসার মাপলেন, স্টেথিস্কোপ কানে লাগিয়ে কিছুক্ষণ বুকের ভেতরে কিছু একটা শুনলেন তারপর মুখ সুচালো করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"কী হয় নাই?"

"মা-মানে?"

ডাক্তার সাহেব রাগ রাগ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আপনার আমার কাছে না এসে যাওয়া উচিত ছিল দশতলা একটা বিল্ডিঙের ছাদে।"

"কেন?"

"নিচে লাফিয়ে পড়ার জন্য।"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "নিচে লাফিয়ে পড়ার জন্য? নিচে লাফিয়ে পড়ব কেন?"

"সুইসাইড করার জন্য।" ডাক্তার সাহেব আমার দিকে রাগ রাগ চোখে তাকিয়ে থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, "তাই তো করছেন। শুধু খান আর ঘুমান। কোনোরকম এক্সারসাইজ নেই, শারীরিক পরিশ্রম নেই। আস্তে আস্তে ব্লাড প্রেসার হবে, ডায়াবেটিস হবে। কোলেস্টেরল হবে। আর্টারি ব্লক হবে। হার্ট অ্যাটাক হবে। গ্লুকোমা হবে। কিডনি ফেল করবে। স্ট্রোক হয়ে শরীর প্যারালাইজড হয়ে যাবে। বিছানায় পড়ে থাকবেন। বিছানায় খাওয়া, বিছানায় পাইখানা-পিসাব।"

শেষ কথাটা শুনে আমি চমকে উঠলাম, বলে কী ডাক্তার সাহেব? আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বি-বিছানায় খাওয়া। বিছানায় পা পা—"

কথা শেষ করার আগে ডাক্তার সাহেব হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ।" তারপর টেবিলে কিল মেরে বললেন, "বিয়ে করেছেন?"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "এখনো করি নাই।"

"তাড়াতাড়ি করে ফেলেন। বোকাসোকা টাইপের একটা মেয়েকে বিয়ে করবেন।"

সুব্রত বললেন, "সেটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না ডাক্তার সাহেব। যার মাথায় ছিটেফোঁটা বুদ্ধি আছে, সে একে বিয়ে করবে ভেবেছেন?"

সুব্রত কথাটা মিথ্যে বলে নি। কিন্তু সত্যি কথা কি সব সময় শুনতে ভালো লাগে? আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "বোকাসোকা মেয়েকে কেন বিয়ে করতে হবে?"

"যখন স্ট্রোক হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবেন তখন নাকের ভেতর নল দিয়ে খাওয়াতে হবে না? পাইখানা-পিসাব পরিষ্কার করতে হবে না? চালাক-চতুর একটা মেয়ে হলে সেটা করবে ভেবেছেন? করবে না। সেইজন্য খুঁজে খুঁজে বোকাসোকা মেয়ে বের করবেন। বুঝেছেন?"

আমি পুরো ব্যাপারটা কল্পনা করে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, "তা হলে কী হবে আমার ডাক্তার সাহেব?"

"কী আর হবে? মরে যাবেন।"

"মরে যাব?"

"হ্যাঁ। আস্তে আস্তে সুইসাইড করে কী হবে? দশতলা বিল্ডিঙের ওপর থেকে একটা লাফ দেন। একবারে কাজ কমপ্লিট।"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "কিন্তু কিন্তু—"

"আর যদি সুইসাইড না করতে চান, যদি বেঁচে থাকতে চান তা হলে আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা এক্সারসাইজ করবেন।"

"এ-এক ঘণ্টা?"

"হ্যাঁ। এক ঘণ্টা। হাঁটবেন। হাঁটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম। আর যদি না হাঁটেন, যদি না ব্যায়াম করেন তা হলে আজকে ঘাড় ব্যথা, কালকে কোমর ব্যথা, পরশু বুকে ব্যথা, তারপরের দিন—" ডাক্তার সাহেব মুখে কথা না বলে হাত দিয়ে গলায় পোচ দেবার ভঙ্গি করে আমার কী হবে বুঝিয়ে দিলেন।

আমি ফোঁস করে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। ডাক্তার সাহেব তার প্যাডটা টেনে নিয়ে সেখানে খসখস করে কী একটা লিখে দিয়ে বললেন, "ঘাড়ে ব্যথার জন্য একটু ওষুধ লিখে দিলাম, ব্যথা অসহ্য মনে হলে খাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, ঘাড় ব্যথাটা কিন্তু কিছু না! নিয়মিত ব্যায়াম করে শরীরকে যদি ফিট না করেন, তা হলে আপনি শেষ। আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছনে পেছনে কিন্তু গুপ্তঘাতক ঘুরছে, আপনি টের পাচ্ছেন না, কিছু বোঝার আগেই আপনার জীবন শেষ করে দেবে।" খুব মজার একটা কথা বলেছেন এরকম ভান করে ডাক্তার সাহেব আনন্দে হা হা করে হেসে উঠলেন।

সুব্রত বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না ডাক্তার সাহেব, জাফর ইকবাল যেন প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে হাঁটে আমি নিজেই দায়িত্ব নিচ্ছি।"

"ভেরি গুড।" ডাক্তার সাহেব তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর একটা হাসি দিয়ে বললেন, "গুড লাক!"

ডাক্তার সাহেবের চেম্বার থেকে বের হবার পর সুব্রত বেশ কিছুক্ষণ আমাকে যাচ্ছেতাইভাবে গালাগাল করল, আমি মুখ বুজে সেগুলি সহ্য করে নিলাম। আমি যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টা না হাঁটি তা হলে সে আমাকে কীভাবে শাস্তি দেবে সেরকম ভয়ংকর ভয়ংকর পরিকল্পনার কথা বলতে লাগল। আমি তাকে কথা দিলাম যে, এখন থেকে আমি নিয়মিতভাবে দিনে এক ঘণ্টা করে হাঁটব।

অনেক কষ্ট করে সুব্রতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথমেই এক ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে একটা ডাবল হ্যামবার্গার খেয়ে নিলাম। মন খারাপ হলেই আমার কেন জানি খিদে পায়। প্যারালাইসিস হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি এবং আমার বোকাসোকা একটি বউ নাকের ভেতর নল ঢুকিয়ে সেদিক দিয়ে খাওয়াচ্ছে, সেটা চিন্তা করেই আমার ডুকরে কেঁদে ওঠার ইচ্ছে করছে। আরো একটা হ্যামবার্গার অর্ডার দেবার কথা ভাবছিলাম, তখন আমার বিজ্ঞানী অনিক লুম্বার কথা মনে পড়ল, তার সাথে বিষয়টা আলোচনা করে দেখলে হয়।

অনিক বাসাতেই ছিল, আমাকে দেখে খুশি হয়ে গেল, বলল, "আরে! জাফর ইকবাল, কী খবর তোমার?"

আমি উত্তর দিতে গিয়ে মাথা নাড়াতেই বেকায়দায় ঘাড়ে টান পড়ল, যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করে বললাম, "আউক!"

অনিক ভুরু কুঁচকে বলল, "ঘাড়ে ব্যথা?"

আমি মাথা নাড়াতে গিয়ে দ্বিতীয়বার বললাম, "আউক!"

অনিক বলল, "ইন্টারেস্টিং!"

আমি বললাম, "কোন জিনিসটা ইন্টারেস্টিং?"

"এই যে তুমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ আউক শব্দ করে! কোনোটা আস্তে কোনোটা জোরে। একটাই শব্দ ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারণ করছ, উচ্চারণ করার ভঙ্গি দিয়ে অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছ। আমার মনে হয় একটা ভাষা এভাবে গড়ে উঠতে পারে। শব্দ হবে মাত্র একটা কিন্তু সেই শব্দটা দিয়েই সবরকম কথাবার্তা চলতে থাকবে। কী মনে হয় তোমার?"

আমি চোখ কটমট করে অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি মারা যাচ্ছি ঘাড়ের যন্ত্রণায় আর তুমি আমার সাথে মশকরা করছ?"

অনিক বলল, "আমি আসলে মশকরা করছিলাম না, সিরিয়াসলি বলছিলাম। তা যাই হোক—ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কী বলেছে ডাক্তার?"

"ঘাড়ের ব্যথা নিয়ে বেশি কিছু বলে নাই কিন্তু প্রতিদিন এক ঘণ্টা ব্যায়াম করতে বলেছে। যদি না করি তা হলে নাকি মারা পড়ব। ব্লাড প্রেসার হবে, ডায়াবেটিস হবে, হার্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যাটাক হবে, কিডনি ফেল করবে, গ্লুকোমা হবে তারপর একসময় স্ট্রোক হয়ে বিছানায় পড়ে থাকব। নাকের ভেতর নল দিয়ে খাওয়াতে হবে।"

"কে খাওয়াবে?"

"ডাক্তার সাহেব একটা বোকাসোকা টাইপের মেয়ে বিয়ে করতে বলেছেন। সে খাওয়াবে।"

আমার কথা শুনে অনিক হা হা করে হাসতে লাগল। আমি বললাম, "তুমি হাসছ? এটা হাসির ব্যাপার হল?"

অনিক বলল, "ডাক্তার সাহেব বুদ্ধিমান মানুষ। তোমাকে দেখেই বুঝেছেন। এমনি বললে কাজ হবে না, তাই তোমাকে ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন। আর কিছু না—"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। তোমার এত ঘাবড়ানোর কিছু নেই।"

"ঠিক বলছ?"

"হ্যাঁ। তবে ডাক্তার সাহেবের কথা তোমার শুনতে হবে। তুমি যেভাবে খাও আর ঘুমাও সেটা ঠিক না। তুমি একেবারেই ফিট না। কেমন যেন ঢিলেঢালা টাইপের মোটা। তোমার কোনো এক ধরনের ব্যায়াম করা উচিত।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, শরীরে তেল মেখে একটা নেংটি পরে আমি হুম হাম করে বুকডন দিচ্ছি দৃশ্যটা কল্পনা করতেই আমার কষ্ট হল। অনিক মনে হয় আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারল, বলল, "হাঁটাহাঁটি দিয়ে শুরু করতে পার। আগে যেসব জায়গায় রিকশা করে যেতে, সিএনজি করে যেতে, এখন সেসব জায়গায় হেঁটে যাবে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "আইডিয়াটা খারাপ না। আজ রাতে আমার বোনের বাসায় যাবার কথা। এখান থেকে হেঁটে চলে যাব, কী বলো? আজ থেকেই শুরু করে দেওয়া যাক।"

অনিক বলল, "হ্যাঁ। আজ থেকেই শুরু কর। দেখবে তোমার নিজেরই ভালো লাগবে।"

আমি আর অনিক ব্যায়াম নিয়ে, শরীর আর স্বাস্থ্য নিয়ে আরো কিছুক্ষণ কথা বললাম। অনিক নতুন আবিষ্কার কী কী করেছে তার খোঁজখবর নিলাম, তারপর কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-গায়ক-সাংবাদিক-খেলোয়াড় সবাইকে নিয়ে খানিকক্ষণ হাসি-তামাশা করলাম। অনিক কয়েকটা চিপসের প্যাকেট খুলল। সেগুলো খেয়ে দুই গ্লাস পেপসি খেয়ে রাত আটটার দিকে আমি শিউলির বাসায় রওয়ানা দিলাম। অন্য দিন হলে নির্ঘাত একটা রিকশায় চেপে বসতাম, আজ হেঁটে যাবার ইচ্ছা।

শুরুটা খুব খারাপ হল না, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই আমি দরদর করে ঘামতে শুরু করলাম, দশ মিনিট পর আমি রীতিমতো হাঁসফাঁস করতে থাকি, মনে হতে থাকে মাথা ঘুরে পড়ে যাব। আরো পাঁচ মিনিট পর আমার পা আর চলতে চায় না, পায়ের গোড়ালি থেকে নাকের ডগা পর্যন্ত ব্যথায় টনটন করতে থাকে। এমনিতেই ঘাড়ে ব্যথা, সেই ব্যথাটা মনে হয় এক শ গুণ বেড়ে গিয়ে শরীরের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকবার পা ফেলতেই ব্যথাটা ঘাড় থেকে একসাথে ওপরে এবং নিচে নেমে আসে এবং আমি ককিয়ে উঠি, "আউক!"

শেষ পর্যন্ত যখন শিউলির বাসায় পৌছলাম তখন মনে হল বাসার দরজাতেই হার্টফেল করে মরে যাব। জোরে জোরে কয়েকবার বেল বাজালাম, দরজা খুলে দিল মিলি, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে সোফার মাঝে দড়াম করে হাত-পা ছড়িয়ে প্রায় শুয়ে পড়লাম। আমার মুখ দিয়ে বিকট এক ধরনের শব্দ বের হতে লাগল। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলাম এবং দরদর করে ঘামতে লাগলাম। এইভাবে মিনিট পাঁচেক কেটে গেল, বুকের হাঁসফাঁস ভাবটা একটু যখন কমেছে তখন আমি চোখ খুলে তাকালাম এবং আবিষ্কার করলাম পাঁচজোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মিলি এবং বিলুর দুই জোড়া চোখে বিস্ময় এবং মনে হল একটু আনন্দ। শিউলির এক জোড়া চোখে দুঃখ এবং হতাশা। শরীফের চোখে অবিশ্বাস এবং কৌতুক। পঞ্চম চোখ জোড়া একজন অপরিচিত মানুষের, তার লম্বা চুল এবং ঢুলুঢুলু চোখ। সেই চোখে ভয়, আতঙ্ক এবং ঘৃণা। আমি একটু ধাতস্থ হয়ে সোজা হয়ে বসতে গেলাম, সাথে সাথে ঘাড়ে বেকায়দায় টান পড়ল, আমি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বললাম, "আউক।"

শিউলি আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, "ভাইয়া, তোমার এ কী অবস্থা?"

আমি ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, "ঘাড়ে ব্যথা।"

"ঘাড়ে ব্যথা হলে বের হয়েছ কেন?"

"তুই না আসতে বললি!"

"আমি তোমাকে এইভাবে আসতে বলেছি? ছি ছি ছি।"

আমি রেগে বললাম, "ছি ছি করছিস কেন?"

এবারে মনে হল শিউলি রেগে উঠল, বলল, "আয়নায় নিজের চেহারাটা একটু দেখেছ? এভাবে কেউ ঘামে? এভাবে সোফায় বসে? কেউ এরকম হাঁসফাঁস করে? ভাইয়া, তোমার পুরো আচার-আচরণে এক ধরনের বর্বর ভাব আছে।"

"ঢং করিস না।" আমি শার্টের বোতাম খুলে তার তলা দিয়ে পেট এবং বগল মোছার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "এরকম ঢং করে কথা বলা কোন দিন থেকে শিখেছিস? সোজা বাংলায় কথা বলবি আমার সাথে, তা না হলে কিন্তু তোকে কিলিয়ে ভর্তা করে দেব।"

শিউলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ভাইয়া! তুমি এরকম অসভ্যের মতন কথা বলছ কেন? দেখছ না এখানে বাইরের মানুষ আছেন? তিনি কী ভাবছেন বলো দেখি!"

লম্বা চুল এবং ঢুলুঢুলু চোখের মানুষটা নাকি গলায় বলল, "নাঁ নাঁ শিঁউলি তুঁমি আঁমার জঁন্যে এঁকটুও চিন্তা কঁরো নাঁ। আঁমি পুঁরো ব্যাঁপারটা উঁপভোগ কঁরছি।"

শিউলি বলল, "কোন জিনিসটা উপভোগ করছেন কিংকর ভাই?"

এই তা হলে সেই কবি কিংকর চৌধুরী? যার কপালের ওপরের অংশ রবীন্দ্রনাথের মতো, চোখ জীবনানন্দ দাশের মতো এবং থুতনির নিচের অংশ কাজী নজরুল ইসলামের মতো? যে শিউলি এবং শরীফের মাথাটা খেয়ে বসে আছে! আমি ভালো করে মানুষটার দিকে তাকালাম, আমার মনে হল মাথাটা শেয়ালের মতো, চোখগুলো পেঁচার মতো, নাকটা শকুনের মতো এবং মুখটা খাটাশের মতো। মানুষটা যত বড় কবিই হোক না কেন, আমি দেখামাত্র তাকে অপছন্দ করে ফেললাম। মানুষ যেভাবে মরা টিকটিকির দিকে তাকায় আমি সেভাবে তার দিকে তাকালাম।

কবি কিংকর চৌধুরী আমার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ইঁদুরের মতো চিকন দাঁত বের করে একটু হেসে নাকিসুরে বলল, "আঁমি কোঁন জিঁনিসটা উঁপভোগ কঁরছি জাঁনতে চাঁও?"

শিউলি বলল, "জানতে চাই কিংকর ভাই।"

কবি কিংকর চৌধুরী খুব একটা ভাব করে বলল, "আঁমি তো সুঁন্দরের পূঁজারী। সাঁরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীঁবন সুঁন্দর জিঁনিস, শোঁভন জিঁনিস আঁর কোঁমল জিঁনিস দেঁখে এঁসেছি। তাঁই যঁখন কোঁনো অঁসুন্দর জিঁনিস অশাঁলীন জিঁনিস দেঁখি ভাঁরি অঁবাক লাঁগে, চোঁখ ফেঁরাতে পাঁরি নাঁ—"

আমার ইচ্ছে হল এই কবির টুঁটি চেপে ধরি। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করলাম। কবি কিংকর চৌধুরী বলল, "সঁত্যি কঁথা বঁলতে কিঁ, এঁই বিচিত্র মাঁনুষটাকে দেঁখে চঁমৎকার এঁকটা কঁবিতার লাঁইন মাঁথায় চঁলে এঁসেছে। লাঁইনটা হঁচ্ছে—" কবি মুখটা ছুচোর মতো সুচালো করে বলল, "আঁউক শঁব্দ কঁরে জেঁগে ওঁঠে পিঁচ্ছিল প্রাঁণী—"

আমি এবার লাফিয়ে উঠে মানুষটার গলা চেপে ধরেই ফেলছিলাম। শরীফ আমাকে থামাল, খপ করে হাত ধরে বলল, "ভাই, হেঁটে টায়ার্ড হয়ে এসেছেন, হাত-মুখ ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসেন।"

বিলু আর মিলি আমার দুই হাত ধরে টানতে টানতে বলল, "চলো মামা চলো, ভেতরে চলো।"

আমি অনেক কষ্ট করে কয়েকবার আউক আউক করে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কবির দিকে তাকিয়ে বললাম, "কবি সাহেব, আপনার কি সর্দি লেগেছে?"

কবি কিংকর চৌধুরী চমকে উঠে বলল, "কেঁন সঁর্দি লাঁগবে কেঁন?"

আমি বললাম, "ফ্যাঁত করে নাকটা ঝেড়ে সর্দি ক্লিয়ার করে ফেলুন, তা হলে আর নাঁকি সুঁরে কঁথা বঁলতে হঁবে নাঁ!"

আমার কথা শুনে কবি কিংকর চৌধুরী কেমন জানি শিউরে উঠল, মনে হল ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে! কিন্তু তার আগেই মিলু আর বিলু হি হি করে হাসতে হাসতে প্রায় গড়াগড়ি খেতে শুরু করে। শিউলি ধমক দিয়ে বলল, "ভেতরে যাও মিলু-বিলু। অভদ্রের মতো হাসছ কেন?"

আমি দুজনকে দুই হাতে ধরে নিয়ে গেলাম। বিলু আর মিলুর সাথে আমিও তখন হা হা করে হাসতে আরম্ভ করেছি। হাসির মতো ছোঁয়াচে আর কিছু নেই।

মিলু-বিলুর ঘরে আমি ঘামে ভেজা শার্ট খুলে আরাম করে বসলাম। বিলু ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিয়েছে, মিলু তারপরেও একটা পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। আমি পেট চুলকাতে চুলকাতে বললাম, "তারপর বল তোদের কী খবর?"

মিলু মুখ কালো করে বলল, "খবর ভালো না মামা।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"দেখলে না নিজের চোখে? কবি কাকু এসে আমাদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে?"

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, "কেন? কী হয়েছে?"

"আমরা জোরে কথা বলতে পারি না। হাসতে পারি না। টেলিভিশন দেখতে পারি না। আম্মু এই লম্বা লম্বা কবিতা মুখস্থ করতে দিয়েছে।"

আমি হুঙ্কার দিয়ে বললাম, "এত বড় সাহস শিউলির?"

বিলু বলল, "শুধু আম্মু না মামা—আব্বুও সাথে তাল দিচ্ছে।"

বিলু বলল, "তাল দিচ্ছে বলছিস কী? আব্বুই তো প্রথমে কবি কাকুকে বাসায় আনল।"

আমি হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে মাথা নাড়াতে গিয়ে যন্ত্রণায় "আউক" করে শব্দ করলাম। সাথে সাথে মিলু আর বিলু হি হি করে হাসতে শুরু করল। আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, "হাসছিস কেন গাধারা?"

মিলু হাসতে হাসতে বলল, "তুমি যখন আউক শব্দ কর সেটা শুনলেই হাসিতে পেট ফেটে যায়।"

আমি বললাম, "আমি মরি যন্ত্রণায় আর তোরা সেটা নিয়ে হাসিস? মায়া-দয়া বলে তোদের কিছু নেই?"

সেটা শুনে দুজনে আরো জোরে হাসতে শুরু করে। কিন্তু একটু পরেই তাদের হাসি থেমে গেল। মিলু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "এই কবি কাকু আসার পর থেকে বাসায় কোনো আনন্দ নেই, খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে।"

আমি প্রায় আর্তনাদ করে বললাম, "খাওয়াদাওয়া নষ্ট হয়েছে মানে?"

"কবি কাকু খালি শাকসবজি খায় তো, তাই বাসায় আজকাল মাছ-মাংস কিছু রান্না হয় না।"

আমি বললাম, "বলিস কী তোরা?"

"সত্যি মামা। বিশ্বাস কর।"

"এই কবি মাছ-মাংস খায় না?"

"উঁহু। শুধু শাকসবজি। আর খাবার স্যালাইন।"

"খাবার স্যালাইন!" আমি অবাক হয়ে বললাম, "খাবার স্যালাইন একটা খাবার জিনিস হল নাকি? আমি না শুনেছি মানুষের ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইন খায়!"

বিলু মাথা নাড়ল, "উঁহু মামা। কবি কাকু সব সময় চুকচুক করে খাবার স্যালাইন খেতে থাকে। আম্মু-আব্বুকে বুঝিয়েছে এটা খাওয়া নাকি ভালো, এখন আব্বু-আম্মু সব সময় আমাদেরকে স্যালাইন খাওয়ানোর চেষ্টা করে।"

"এত বড় সাহস শিউলির আর শরীফের?"

মিলু একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আম্মু-আব্বুর দোষ নাই মামা। সব ঝামেলা হচ্ছে কবি কাকুর জন্য—"

আমি হুঙ্কার দিয়ে বললাম, "খুন করে ফেলব এই কবির বাচ্চা কবিকে—"

"করতে চাইলে কর, কিন্তু দেরি কোরো না। দেরি হলে কিন্তু আমাদের জীবন শেষ।"

"আর না করতে চাইলে এখনি বলে দাও।" বিলু মুখ শুকনো করে বলল, "আমাদের মিছিমিছি আশা দিও না।"

আমি বিলু আর মিলুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "বিলু, মিলু তোরা চিন্তা করিস না। আমি কোনো একটা হেস্তনেস্ত করে দেব। আমার ওপর বিশ্বাস রাখ। আমি সবকিছু সহ্য করতে পারি কিন্তু খাওয়ার ওপরে হস্তক্ষেপ কোনোভাবে সহ্য করব না।" উত্তেজনায় বেশি জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলেছিলাম বলে যন্ত্রণায় আবার শব্দ করতে হল, "আউক।"

আর সেই শব্দ শুনে বিলু আর মিলু আবার হি হি করে হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর শিউলি এসে বলল, "ভাইয়া খেতে আস। আর তোমার দোহাই লাগে, খাবার টেবিলে বসে তুমি কোনো উল্টাপাল্টা কথা বলবে না।"

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, "আমি কখনো উল্টাপাল্টা কথা বলি না। কিন্তু আমার সাথে কেউ উল্টাপাল্টা কথা বললে আমিও তাকে ছেড়ে দিই না।"

শিউলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "প্লিজ, ভাইয়া, প্লিজ! কবি কিংকর চৌধুরী খুব বিখ্যাত মানুষ, খুব সম্মানী মানুষ। তাকে যা ইচ্ছে তা বলে ফেলো না।"

"সে যদি বলে আমি তাকে ছেড়ে দেব ভেবেছিস? আর পেতনির মতো নাকি সুরে কথা বলে কেন? শুনলেই মেজাজ খাট্টা হয়ে যায়।"

শিউলি বলল, "ওনার কথা বলার স্টাইলই ওরকম।"

"স্টাইলের খেতা পুড়ি। এরপর থেকে বলবি নাক ঝেড়ে আসতে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিউলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "প্লিজ, ভাইয়া প্লিজ!"

খাবার টেবিলে গিয়ে আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। মিলু আর বিলু ঠিকই বলেছে, টেবিলে শাকভর্তা ডাল এরকম কিছু জিনিস। মাছ-মাংস–ডিম জাতীয় কিছু নেই। কবি কিংকর চৌধুরী ঢুলুঢুলু চোখে বলল, "শিউলি তোঁমার হাতেঁর পঁটল ভঁর্তাটা যাঁ চঁমৎকার, এঁকেবারে বিঁষ্ণু দেঁর এঁকটা কঁবিতার মঁতো।"

শিউলি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কী রে শিউলি! শুধু দেখি ঘাস লতা পাতা রেঁধে রেখেছিস। আমাদেরকে কি ছাগল পেয়েছিস নাকি?"

শিউলি বলল, "আজকে নিরামিষ মেনু।"

"মানুষকে দাওয়াত দিয়ে নিরামিষ খাওয়াচ্ছিস, ব্যাপারটা কী?"

কবি কিংকর চৌধুরী বলল, "মাঁছ মাঁংস খাঁওয়া বর্বরতা। ওঁসব খেঁলে পঁশু রিপু জেঁগে ওঁঠে।"

"কে বলেছে?" আমি টেবিলে কিল দিয়ে বললাম, "পৃথিবীর সব মানুষ মাছ-মাংস খাচ্ছে। তাদের কি পশু রিপু জেগেছে? লেজ গজিয়েছে?"

কবি কিংকর চৌধুরী চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "পৃথিবীর সঁব মাঁনুষ মাঁছ-মাঁংস খাঁয় নাঁ। দঁক্ষিণ ভাঁরতের মাঁনুষেরা নিঁরামিশাষী। তাঁদের কাঁছ থেঁকে খাঁদ্যাভ্যাসটি আঁমাদের শেঁখার আঁছে।"

আমি বললাম, "আমাদের নিজেদের খাদ্যাভ্যাস কি খারাপ নাকি যে অন্যদের থেকে শিখতে হবে? আর অন্যদের থেকে যদি শিখতেই চান তা হলে কোরিয়ানরা দোষ করল কী? তাদের মতো কুকুরের মাংস খাওয়া শুরু করেন না কেন? খাবেন নাকি?"

শিউলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ভাইয়া—"

আমি না শোনার ভান করে বললাম, "কিংবা চায়নিজদের মতো? তারা নাকি তেলাপোকা খায়। খাবেন আপনি তেলাপোকা? ডুবোতেলে মুচমুচে করে আনব ভেজে কয়টা তেলাপোকা? মুখে পুরে কচমচ করে খাবেন?"

শিউলি প্রায় আর্তনাদ করে কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই মিলু আর বিলু হি হি করে হাসতে শুরু করল, হাসি আর থামতেই চায় না। শিউলি চোখ গরম করে বলল, "মিলু-বিলু অসভ্যের মতো হাসছিস কেন? হাসি বন্ধ কর এই মুহূর্তে।"

দুজনে হাসি বন্ধ করলেও একটু পরে পরে হাসির দমকে তাদের শরীর কেঁপে উঠতে লাগল। কবি কিংকর চৌধুরীও একটা কথা না বলে বিষ্ণু দে'র কবিতার মতো পটল ভর্তা খেতে লাগল। আমিও জোর করে ঘাস-লতাপাতা খেয়ে কোনো মতে পেট ভরালাম। খাবার টেবিলে আমাদের দেখলে যে কেউ বলবে নিশ্চয়ই খুব বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে—কারো মুখে একটা কথা নাই!

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে খালি এপাশ-ওপাশ করলাম, একটু পরে পরে মিলু-বিলুর শুকনো মুখের কথা মনে পড়ছিল, সেটা একটা কারণ আর হঠাৎ করে হাঁটার চেষ্টা করে পুরো শরীরে ব্যথা—সেটা দ্বিতীয় কারণ।

পরদিন বিকালবেলাতেই আমি বিজ্ঞানী অনিক লুম্বার বাসায় হাজির হলাম। আমাকে দেখে অনিক খুশি হয়ে বলল, "তুমি এসেছ! ভেরি গুড। আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট কারো ওপর পরীক্ষা করতে হবে। তুমিই হবে সেই গিনিপিগ।"

আমি বললাম, "আমি গিনিপিগ, ইঁদুর, আরশোলা সবকিছু হতে রাজি আছি কিন্তু তার বদলে তোমার একটা কাজ করে দিতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী কাজ?"

"একজন কবি, তার নাম কিংকর চৌধুরী, সে আমাদের খুব উৎপাত করছে। তাকে আচ্ছামতো সাইজ করে দিতে হবে।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "কবি আবার কীভাবে উৎপাত করে?"

আমি তখন তাকে কবি কিংকর চৌধুরীর পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম। শুনে অনিক মাথা নেড়ে বলল, "ঠিকই বলেছ, এ তো মহাঝামেলার ব্যাপার।"

"এখন তা হলে বলো তাকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়।"

অনিক মাথা চুলকে বলল, "কীভাবে তুমি শায়েস্তা করতে চাও?"

"সেটা আমি কেমন করে বলব? তুমি হচ্ছ বিজ্ঞানী, তুমিই বলো কী করা যায়।"

অনিক তবুও মাথা চুলকায়, বলে, "ইয়ে—কিন্তু—"

আমি বললাম, "এক কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"এমন একটা ওষুধ বের কর যেটা খেলে তার সাইজ ছোট হয়ে যাবে।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "সাইজ ছোট হয়ে যাবে? কত ছোট?"

"এই মনে কর ছয় ইঞ্চি।"

"ছয় ইঞ্চি?"

"হ্যাঁ, তা হলে তাকে আমি একটা বোতলে ভরে দশজনকে দেখাতে পারি, চাই কি সার্কাসে বিক্রি করে দিতে পারি।"

অনিক মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু। এটা সম্ভব নয়। একটা আস্ত মানুষকে কেমন করে তুমি ছয় ইঞ্চি সাইজ করবে!"

"তা হলে কি কোনো মতে তার মাথায় এক জোড়া শিং গজিয়ে দেওয়া যাবে? গরুর মতো শিং। সেটা যদি একান্তই না পারা যায় তা হলে অন্তত ছাগলের মতো এক জোড়া শিং?"

অনিক চিন্তিত মুখে কী একটা ভাবে, তারপর আমতা-আমতা করে বলে, "ইয়ে সেটা যে খুব অসম্ভব তা না। জিনেটিক্সের ব্যাপার। কোন জিনটা দিয়ে শিং গজায় মোটামুটিভাবে আলাদা করা আছে। সেটাকে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে একটা রেট্রো ভাইরাসে ট্রান্সপ্লান্ট করে তখন যদি—"

আমি বিজ্ঞানের কচকচি কিছুই বুঝতে পারলাম না, চেষ্টাও করলাম না, অন্য একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম, "তা হলে কি তুমি একটা লেজ গজিয়ে দিতে পারবে? ছোটখাটো লেজ না—মোটাসোটা লম্বা একটা লেজ, যেটা লুকিয়ে রাখতে পারবে না?"

অনিক আবার চিন্তিত মুখে মাথা চুলকাতে থাকে, বলে, "একেবারে অসম্ভব তা না, কিন্তু অনেক রিসার্চ দরকার। মানুষের ওপর এইরকম গবেষণা করার অনেক ঝামেলা!"

আমি একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, "তা হলে আমাকে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দাও যেন কবি ব্যাটাকে সাইজ করতে পারি।"

অনিক বলল, "আমাকে একটু সময় দাও জাফর ইকবাল। আমি একটু চিন্তা করি। তোমার এত তাড়াহুড়ো কিসের?" অনিক সুর পাল্টে বলল, "তোমার ব্যায়ামের কী খবর?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "নাহ! ব্যায়ামের খবর বেশি ভালো না।" মাথা নাড়ার পরও আউক করে শব্দ করতে হল না, সেটা একটা ভালো লক্ষণ। ঘাড়ের ব্যথাটা একটু কমেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন? খবর ভালো না কেন?"

আমি হেঁটে শিউলির বাসায় যাবার পর আমার কী অবস্থা হয়েছিল, সারা শরীরে এখনো কেমন টনটনে ব্যথা সেটা অনিককে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলাম। ভেবেছিলাম শুনে আমার জন্য তার মায়া হবে। কিন্তু হল না, উল্টো মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি তো মহা ফাঁকিবাজ দেখি। একদিন দশ মিনিট হেঁটেই এক শ রকম কৈফিয়ত দেওয়া শুরু করেছ!"

আমি বললাম, "ফাঁকিবাজ বলো আর যাই বলো আমি প্রতিদিন এক ঘণ্টা হাঁটতে পারব না।" মুখ শক্ত করে বললাম, "আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"তা হলে?"

"দরকার হলে বোকাসোকা দেখে একটা বউ বিয়ে করে নেব। স্ট্রোক হবার পর যখন বিছানায় পড়ে থাকব, তখন নাকের মাঝে একটা নল ঢুকিয়ে সে খাওয়াবে।"

অনিক আমার দিকে তাকিয়ে কেমন জানি হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "তুমি এত বড় বিজ্ঞানী, তুমি এরকম কিছু আবিষ্কার করতে পার না—একটা ছোট ট্যাবলেট—সেটা খেলেই শরীর নিজে থেকে ব্যায়াম করতে থাকবে!"

অনিক কেমন যেন চমকে উঠে বলল, "কী বললে?"

আমি বললাম, "বলেছি যে তুমি একটা ট্যাবলেট আবিষ্কার করবে সেটার নাম দেবে ব্যায়াম বটিকা। সেটা খেয়ে আমি শুয়ে থাকব। আমার হাত-পা নিজে থেকে নড়তে থাকবে, ব্যায়াম করতে থাকবে, আমার কিছুই করতে হবে না!

অনিক কেমন যেন চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি শুয়ে থাকবে আর তোমার শরীর ব্যায়াম করতে থাকবে? হাত-পা-ঘাড়-মাথা সবকিছু?"

"হ্যাঁ। তা হলে আমাদের মতো মানুষের খুব সুবিধে হয়। মনে কর—"

অনিক হাতে কিল দিয়ে বলল, "ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া!"

আমি উৎসাহ পেয়ে বললাম, "এরকম অনেক আইডিয়া আছে আমার মাথায়। যেমন মনে কর গভীর রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়, খুব বাথরুম পেয়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠতেও ইচ্ছা করে না আবার না গেলেও না। তাই যদি বিছানার সাথে একটা বাথরুম ফিটিং লাগিয়ে দেওয়া যায় যেন শুয়ে শুয়েই কাজ শেষ করে ফেলা যায়।"

আমি আরেকটু বিস্তারিত বলতে যাচ্ছিলাম অনিক বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও দাঁড়াও আগেই অন্য কিছু বোলো না। আগে শুয়ে শুয়ে ব্যায়াম করার ব্যাপারটা শেষ করি। তুমি চাইছ তোমার হাত-পা-ঘাড়-মাথা এগুলোর ওপর তোমার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এগুলো নিজে নিজে ব্যায়াম করবে, নড়তে থাকবে, ছুটতে থাকবে?"

"হ্যাঁ।"

"হার্ট পাম্প করবে? ফুসফুসের ব্যায়াম হবে?"

"হ্যাঁ।"

"সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন হবে?"

অনিক কঠিন কঠিন কী বলছে আমি পুরোপুরি না বুঝলেও মাথা নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ।"
অনিক চকচকে চোখে আমার দিকে মাথা এগিয়ে এনে বলল, "তুমি একটা জিনিস জান?"

"কী?"

"তুমি যার কথা বলছ সেটা আমার কাছে আছে!"

"তোমার কাছে আছে?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুমি এর মাঝে ব্যায়াম বটিকা আবিষ্কার করে ফেলেছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক ব্যায়াম বটিকা না, কারণ জিনিসটা তরল, বোতলে রাখতে হয়। এক চামচ খেলে মস্তিষ্ক নার্ভের ওপর থেকে তার নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নেয়। আমাদের হাত-পা এসব নাড়ানোর জন্য যে ইম্পালস আসে সেটা ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল। এই তরলটা স্থানীয়ভাবে সেই ইম্পালস তৈরি করে। শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্সটা খুব জরুরি।" অনিক উৎসাহে টগবগ করতে করতে একটা কাগজ টেনে এনে বলল, "তোমাকে বুঝিয়ে দেই কীভাবে কাজ করে?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না, না, খামকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমি বিজ্ঞানের কিছু বুঝি না। কীভাবে কতটুকু খেতে হবে বলে দাও।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "কতটুকু খেতে হবে মানে? কে খাবে?"

"আমি।"

"তুমি খাবে মানে? এখনো ঠিক করে পরীক্ষা করা হয় নাই। আগে জন্তু-জানোয়ারের ওপর টেস্ট করতে হবে, তারপর অল্প ডোজে মানুষের ওপরে।"

আমি দাঁত বের করে হেসে বললাম, "জন্তু-জানোয়ার দরকার নেই, সরাসরি মানুষের ওপরে টেস্ট করতে পারবে! একটু আগেই না তুমি বললে আমাকে তোমার গিনিপিগ বানাবে? আমি গিনিপিগ হবার জন্য রেডি।"

অনিক মাথা নাড়ল, বলল, "না না তোমাকে গিনিপিগ হতে বলেছিলাম অন্য একটা আবিষ্কারের জন্য—দ্বিমাত্রিক একটা ছবিকে ত্রিমাত্রিক দেখা যায় কিনা সেটা টেস্ট করব ভেবেছিলাম।"

"দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক এসব কঠিন কঠিন জিনিস পরে হবে। আগে আমাকে ব্যায়াম বটিকা দাও! ও আচ্ছা এটা তো ট্যাবলেট না। এটাকে ব্যায়াম বটিকা বলা যাবে না। ব্যায়াম মিক্সচার বলতে হবে। ঠিক আছে তা হলে ব্যায়াম মিক্সচারই দাও। খেতে কী রকম? বেশি তেতো না তো? আমি আবার তেতো জিনিস খেতে পারি না।"

অনিক বলল, "খেতে কী রকম সেটা তো জানি না। মনে হয় একটু নোনতা ধরনের মিষ্টি হবে। অনেকটা খাবার স্যালাইনের মতো।"

"গুড!" আমি সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লাম, "দেখতে কী রকম? টকটকে লাল হলে সবচেয়ে ভালো হয়। কিংবা গোলাপি।"

অনিক একটু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! তোমার কৌতূহল তো দেখি উল্টাপাল্টা জায়গায়। দেখতে কী রকম খেতে কী রকম এটা নিয়ে কে মাথা ঘামায়!"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "তোমরা বিজ্ঞানীরা এসব জিনিস নিয়ে মাথা না ঘামাতে পার, আমরা সাধারণ মানুষেরা এসব নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাই। বলো কী রঙ?"

"কোনো রঙ নেই। একেবারে পানির মতো স্বচ্ছ।"

"কোনো রঙ নেই?" আমি রীতিমতো হতাশ হলাম। "এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসের কোনো রঙ থাকবে না কেমন করে হয়? এটাতে একটা রঙ দিতেই হবে। আমার ফেবারিট হচ্ছে লাল। টকটকে লাল।"

অনিক হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে, সেটা পরে দেখা যাবে। এক ফোঁটা খাবারের রঙ দিয়ে লাল করে দেওয়া যাবে।"

"এখন তা হলে বলো কখন খাব? কীভাবে খাব?"

অনিক কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি সত্যিই এটা খেতে চাও?"

"হ্যাঁ। খেয়ে যদি মরেটরে যাই তা হলে খেতে চাই না—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। মরবে কেন? এটার মাঝে বিষাক্ত কিছু নেই। আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভেতর শরীর পুরোটা মেটাবলাইজ করে নেবে।"

আমি উৎসাহে সোজা হয়ে বসে বললাম, "দাও তা হলে এখনি দাও। খেয়ে দেখি।"

"না। এখন না।" অনিক মাথা নেড়ে বলল, "যদি সত্যিই খেতে চাও বাসায় গিয়ে শোয়ার ঠিক আগে খাবে। ঠিক এক চামচ—বেশি না।"

"বেশি খেলে কী হবে?"

"বেশি খাওয়ার দরকার কী? নতুন একটা জিনিস পরীক্ষা করছি, রয়ে-সয়ে করা ভালো না?"

"ঠিক আছে। বলো তা হলে—"

অনিক বলল, "খেয়ে সাথে সাথে বিছানায় শুয়ে পড়বে। মিনিট দশেক পরে দেখবে তোমার হাত-পা তুমি নাড়াতে পারছ না, কেমন যেন অবশ হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ দেখবে সেগুলো নিজে থেকে নড়তে শুরু করেছে। কখনো ডানে কখনো বামে কখনো সামনে পিছে। দেখতে দেখতে হার্টবিট বেড়ে যাবে, শরীরের ব্যায়াম হতে থাকবে।"

"সত্যি?" দৃশ্যটা কল্পনা করেই আনন্দে আমার হার্টবিট বেড়ে যায়।

"হ্যাঁ। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাঝে আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"

"ভেরি গুড।" আমি হাতে কিল দিয়ে বললাম, "এখনি দাও আমার ব্যায়াম মিক্সচার!"

অনিক ভেতরে ঢুকে গেল, খানিকক্ষণ কিছু জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা খাবার পানির প্লাস্টিকের বোতলে করে সেই বিখ্যাত আবিষ্কার নিয়ে এল। আমি বললাম, "কী হল? তুমি না বলেছিলে এটাকে লাল রঙ করে দেবে?"

অনিক হাত নেড়ে পুরো বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে বলল, "তুমি একজন বয়স্ক মানুষ, লাল রঙ গোলাপি রঙ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? রঙটা তো ইম্পরট্যান্ট না—"

আমার মনটা একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল কিন্তু এখন আর তাকে চাপ দিলাম না। বোতলটা হাতে নিয়ে ছিপি খুলে শুঁকে দেখলাম, ভেবেছিলাম তীব্র একটা ঝাঁজালো গন্ধ হবে কিন্তু সেরকম কিছু নয়। আমার আরো একটু আশাভঙ্গ হল, এরকম সাংঘাতিক একটা জিনিস যদি টকটকে লাল না হয়, ভয়ংকর ঝাঁজালো গন্ধ না থাকে, মুখে দিলে টক-টক মিষ্টি একটা স্বাদ না হয় তা হলে কেমন করে হয়? বিজ্ঞানীরা মনে হয় কখনোই একটা জিনিসের সত্যিকারের গুরুত্বটা ধরতে পারে না।

আমি প্লাস্টিকের বোতলটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "যাই।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"বাসায়। গিয়ে আজকেই টেস্ট করতে চাই।"

"কী হল আমাকে জানিও।"

"জানাব।"

অনিকের বাসা থেকে বের হয়ে একটা রিকশা নিয়ে মাত্র অল্প কিছু দূর গিয়েছি তখন দেখি রাস্তার পাশে একটা ফাস্টফুডের দোকান। দোকানের সাইনবোর্ডে বিশাল একটা হ্যামবার্গারের ছবি, টসটসে রসালো একটা হ্যামবার্গার, নিশ্চয়ই মাত্র তৈরি করা হয়েছে, গরম একটা ভাপ বের হচ্ছে। ছবি দেখেই আমার খিদে পেয়ে গেল। আমি রিকশা থামিয়ে ফাস্টফুডের দোকানে নেমে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যামবার্গারটা খেতে ভালো, প্রথমটা খাবার পর মনে হল খিদেটা আরো চাগিয়ে উঠল, একটা খাবার দোকানে এসে তো আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় উঠে যেতে পারি না তাই দ্বিতীয় হ্যামবার্গারটা অর্ডার দিতে হল। যখন সেটা আধাআধি খেয়েছি তখন হঠাৎ আমার বিলু-মিলুর কথা মনে পড়ল। কবি কিংকর চৌধুরীর উৎপাতে এখন তাদের মাছ-মাংস–ডিম খাওয়া বন্ধ, ঘাস-লতাপাতা খেয়ে কোনোমতে বেঁচে আছে। তাদেরকে নিয়ে এলে এখানে আমার সাথে হ্যামবার্গার খেতে পারত! নিয়ে যখন আসি নি তখন আর দুঃখ করে কী হবে ভেবে চিন্তাটা মাথা থেকে প্রায় দূর করে দিচ্ছিলাম তখন মনে হল এখান থেকে তাদের জন্য দুটি হ্যামবার্গার কিনে নিয়ে গেলে কেমন হয়? সাথে কিছু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই? আমি আর দেরি করলাম না, কাউন্টারে গিয়ে বললাম, "আরো দুটি হ্যামবার্গার।"

কাউন্টারে কমবয়সী একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, চোখ কপালে তুলে বলল, "আরো দুটি হ্যামবার্গার খাবেন?"

আমি বললাম, "আমি খাব না। সাথে নিয়ে যাব।"

মেয়েটা খুব সাবধানে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে আমার জন্য হ্যামবার্গার আনতে গেল।

শিউলির বাসায় গিয়ে দরজার বেল টিপতেই মিলু দরজা খুলে দিল। তার মুখ শুকনো, আমাকে দেখেও খুব উজ্জ্বল হল না। আমি বললাম, "কী রে মিলু, কী খবর?"

মিলু একটা নিশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বলল, "খবর ভালো না।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"কবি কাকু এখানে চলে এসেছে।"

"এখানে চলে এসেছে মানে?"

"এখন থেকে আমাদের বাসায় থাকবে।"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "বলিস কী তুই?"

মিলু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, শিউলিকে দেখে থেমে গেল। শিউলি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাইয়া। কখন এসেছ? তোমার হাতে কিসের প্যাকেট?"

"হ্যামবার্গার। মিলু-বিলুর জন্য এনেছি।"

শিউলি বলল, "আমাদের বাসায় মাছ-মাংস বন্ধ রাখার চেষ্টা করছি—"

আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, "তোর ইচ্ছে হলে মাছ-মাংস কেন লবণ–পানি এসবও বন্ধ রাখ। দরকার হলে নিশ্বাস নেওয়াও বন্ধ রাখ। কিন্তু এই ছোট বাচ্চাদের কষ্ট দিতে পারবি না।"

"কষ্ট কেন হবে? অভ্যাস হয়ে গেলে—"

"তোদের ইচ্ছে হলে যা কিছু অভ্যাস করে নে। লোহার শিক গরম করে তালুতে ছ্যাঁকা দেওয়া শুরু কর। দেখবি কয়দিন পরে অভ্যাস হয়ে যাবে!"

আমার কথা শুনে বিলুও বের হয়ে আসছে, তার মুখও শুকনো। আমি হ্যামবার্গারের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "নে খা।"

মিলু আর বিলু হ্যামবার্গারের প্যাকেটটা নিয়ে ছুটে নিজেদের ঘরে চলে গেল। আহা বেচারারা! কতদিন না জানি ভালোমন্দ কিছু খায় নি। আমি শিউলিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর কবি নাকি এই বাসায় উঠে এসেছে? মনে আছে আমি তোকে কী বলেছিলাম? কবি-সাহিত্যিক থেকে এক শ হাত দূরে থাকবি। সুযোগ পেলেই এরা বাড়িতে উঠে আসে! আর একবার উঠলে তখন কিছুতেই সরানো যায় না!"

শিউলি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ-স-স-স আস্তে ভাইয়া, কিংকর ভাই শুনবেন!"

"শুনুক না! আমি তো শোনার জন্যই বলছি। কোথায় তোর কিংকর ভাই?" বলে আমি শিউলির জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই তাকে খুঁজতে লাগলাম। বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না, তাকে ড্রয়িংরুমে পেয়ে গেলাম, ধবধবে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে সোফায় পা তুলে বসে আছে। এক হাতে একটা কাগজ আরেক হাতে একটা কলম, চোখে-মুখে গভীর এক ধরনের ভাব। আমাকে দেখে মনে হল একটু চমকে উঠল। আমি তার পাশে বসলাম, হাতে অনিকের আবিষ্কারের বোতলটা ছিল, সেটা টেবিলে রাখলাম। কবি কিংকর চৌধুরী বলল, "আঁ-আঁ-আঁপনি?"

"হ্যাঁ। আমি।"

"এঁত রাঁতে এঁখানে কীঁ মঁনে কঁরে?"

"শিউলি আমার বোন। নিজের বোনের বাসায় আমি যখন খুশি আসতে পারি! আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি এখানে এত রাতে কী মনে করে?"

কবি কিংকর চৌধুরী আমার কথা শুনে একটু রেগে গেল মনে হল। কিছুক্ষণ আমার দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "শিঁউলি আঁর শঁরীফ অঁনেক দিঁন থেঁকে আঁমাকে থাঁকতে বঁলছে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "মনে হয় না। শিউলি আর শরীফ দুজনই একটু হাবা টাইপের, কিন্তু এত হাবা না—"

আমি কথা শেষ করার আগেই শিউলি এসে ঢুকল, বলল, "যাও ভাইয়া ভেতরে যাও। হাত-মুখ ধুয়ে আস। টেবিলে খাবার দিয়েছি।"

আমি বললাম, "আমাকে বোকা পেয়েছিস নাকি যে তোর বাসায় ঘাস-লতা-পাতা খাব? আমি খেয়ে এসেছি।"

"কী খেয়ে এসেছ?"

"দুটি হ্যামবার্গার। শুধু খেয়ে আসি নি মিলু-বিলুর জন্যও নিয়ে এসেছি।"

"তাই তো দেখছি!" শিউলি মুখ শক্ত করে বলল, "ঠিক আছে হাত-মুখ ধুয়ে আমাদের সাথে বস।"

বুঝতে পারলাম আমাকে কবি কিংকর চৌধুরী থেকে দূরে সরাতে চায়। আমি আর ঝামেলা করলাম না, ভেতরে গেলাম বিলু-মিলুর সাথে কথা বলতে।

দুজনে খুব শখ করে হ্যামবার্গার খাচ্ছে। সস একেবারে কানের লতিতে লেগে গিয়েছে। আমাকে দেখে খেতে খেতে বিলু বলল, "গাবা গাবা গাবা।"

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "মুখে খাবার নিয়ে কথা বলিস না গাধা, খাওয়া শেষ করে কথা বল।"

বিলু মুখের খাবার শেষ করে বলল, "তুমি বলেছিলে কবি কাকুকে খুন করবে।"

মিলু বলল, "উল্টো কবি কাকু এখন আমাদের খুন করে ফেলবে।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"কী হয় নাই বলো? আমাদের কথা শুনলে নাকি কবি কাকুর ডিস্টার্ব হয়। তাই আমাদের ফিসফিস করে কথা বলতে হয়।"

বিলু বলল, "টেলিভিশন পুরো বন্ধ।"

মিলু বলল, "আমার প্রিয় কমিকগুলো পুরোনো কাগজের সাথে বেচে দিয়েছে।"

আমি রাগ চেপে বললাম, "আর শিউলি এগুলো সহ্য করছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সহ্য না করে কী করবে? কবি কাকুর মেজাজ খারাপ হলে যা-তা বলে দেয়।"

মিলু একটা নিশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বলল, "এখন বাসায় সবাই কবি কাকুকে ভয় পায়।"

"ভয় পায়?" আমি রেগেমেগে বললাম, "এখন এই মানুষটাকে ধরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া দরকার।"

মিলু বলল, "মামা যেটা পারবে না সেটা বলে লাভ নেই। তোমার সেই সাহস নাই, তোমার গায়ে সেই জোরও নাই।'

"আমার জোর নাই? শুধু অপেক্ষা করে দেখ কয়দিন, আমার শরীর হবে লোহার মতো শক্ত।"

"কীভাবে?"

"এমন ব্যায়াম করার ওষুধ পেয়েছি—" কথাটা বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ল অনিকের দেওয়া ব্যায়াম মিক্সচারটা ড্রয়িংরুমে কবি কিংকর চৌধুরীর কাছে রেখেছি। আমি কথা শেষ না করে প্রায় দৌড়ে ড্রয়িংরুমে গেলাম, গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কবি কিংকর চৌধুরী আমার বোতলটা খুলে ঢকঢক করে ব্যায়াম মিক্সচার খাচ্ছে। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখলাম পুরো বোতলটা শেষ করে সে খালি বোতলটা টেবিলে রেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। আমি তার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থেকে বললাম, "আ-আ-আপনি এটা কী খেলেন?"

"খাঁবার স্যাঁলাইন।"

"খাবার স্যালাইন?"

"হ্যাঁ। শিউলিকে বঁলেছি দিতে। আঁমাকে তৈঁরি কঁরে দিঁয়েছে। খেঁলে শঁরীর ঝঁরঝরে থাঁকে।" বলে সে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। সেটা দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা। অনিক আমাকে বলেছে এক চামচ খেতে আর এই লোক পুরো বোতল শেষ করে ফেলেছে। এখন কী হবে?

আমি ঠিক করে চিন্তা করতে পারছিলাম না, এর মাঝে শিউলি এসে বলল, "খেতে আসেন কিংকর ভাই। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।"

কবি কিংকর চৌধুরী বলল, "চঁলো।" বলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কেমন যেন টলে ওঠে, কোনোভাবে সোফার হাতল ধরে নিজেকে সামলে নেয়।

শিউলি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হল?"

"নাঁ কিঁছু নাঁ।" কবি কিংকর চৌধুরী মাথা নেড়ে বলল, "হঁঠাৎ মাঁথাটা এঁকটু ঘুঁরে উঁঠল।"

শিউলি বলল, "একটু বসে নেবেন কিংকর ভাই?"

"নাঁ নাঁ। কোঁনো প্রঁয়োজন নেঁই।" বলে কিংকর চৌধুরী হেঁটে হেঁটে খাবার টেবিলে গেল। তার জন্য আলাদা চেয়ার রাখা হয়েছে, সেখানে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। আমি চোখ বড় বড় করে তাকে লক্ষ করি। অনিক বলেছিল তার ব্যায়াম মিক্সচার কাজ করতে পনের মিনিট সময় নেবে—কিন্তু কেউ যদি চামচের বদলে পুরো বোতল খেয়ে ফেলে তখন কী হবে?"

কিছুক্ষণের মাঝেই অবিশ্যি আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলাম যে, কবি কিংকর চৌধুরীর মুখে বিচিত্র প্রায় অপার্থিব এক ধরনের হাসি ফুটে উঠেছে। সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে শুরু করেছে এবং হঠাৎ করে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মাথাটা ঘুরতে শুরু করল। টেবিল ফ্যানের বাতাস দেওয়ার জন্য সেটা যেভাবে ঘুরে ঘুরে বাতাস দেয় অনেকটা সেভাবে তার মাথা চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে তার মুখের হাসি বিতরণ করতে শুরু করেছে। দেখে মনে হয় এটা বুঝি তার নিজের মাথা না, কেউ যেন আলাদাভাবে স্প্রিং দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে।

পুরো ব্যাপারটা এত অস্বাভাবিক যে শিউলি এবং শরীফ হাঁ করে কবি কিংকর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম শুধু যে তার মাথাটা ঘুরছে তা না, তার কান, নাক, ঠোঁট, গাল, ভুরু সেগুলোও নড়তে শুরু করল। আমি এর আগে কোনো মানুষকে তার কান কিংবা নাককে নাড়াতে দেখি নি—গরু-ছাগল কান নাড়ায় সেটাকে দেখতে এমন কিছু অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু একজন মানুষ যখন সেগুলো নাড়ায় তখন চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার অবস্থা। শিউলি কিংবা শরীফ বুঝতে পারছে না—ব্যাপারটা কী ঘটছে, শুধু আমি জানি কী হচ্ছে। কবি কিংকর চৌধুরীর শরীরের ওপর তার নিজের নিয়ন্ত্রণ নেই। সব এখন নিজে নিজে নড়তে শুরু করেছে। এখন নাক কান চোখ ঠোঁট ভুরু মায় মাথা নড়ছে সেটা বিপজ্জনক কিছু নয় কিন্তু যখন হাত-পা আর শরীর নড়তে থাকবে তখন কী হবে?

শিউলি ভয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকল, "কিংকর ভাই। এই যে কিংকর ভাই—আপনার কী হয়েছে?"

আমি ভাবছিলাম শিউলিকে একটু সাবধান করে দেব কিন্তু তার সুযোগ হল না। হঠাৎ করে কবি কিংকর চৌধুরী দুই হাত লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল, কিছু বোঝার আগেই হাত দুটো ধপাস করে টেবিলের ওপর পড়ল। টেবিলে কাচের গ্লাস এবং ডালের বাটি ছিটকে পড়ে পুরো টেবিল পানি এবং ডালে মাখামাখি হয়ে গেল।

শিউলি ভয়ে চিৎকার করে পেছনে সরে এল। ভাগ্যিস সরেছিল তা না হলে কী হত বলা মুশকিল। হঠাৎ মনে হল কবি কিংকর চৌধুরী দুই হাতে তার চারপাশে অদৃশ্য মানুষদের ঘুসি মারতে শুরু করেছেন। তার হাত চলতে থাকে ও ঘুরতে থাকে এবং হাতের আঘাত খেয়ে ডাইনিং টেবিলের খাবার শূন্যে উড়তে থাকে। ডালের বাটি উল্টে পড়ে কবি কিংকর চৌধুরীর সারা শরীর, হাত-মুখ এবং জামাকাপড় মাখামাখি হয়ে গেল কিন্তু কবি কিংকর চৌধুরীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। তার মুখে সারাক্ষণই সেই অপার্থিব মৃদু হাসি।

খাবার টেবিলে হইচই শুনে বিলু আর মিলু ছুটে এসেছে। তারা দৃশ্য দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। আমার দুই হাত ধরে বলল, "কী হয়েছে মামা? কবি কাকু এরকম করছেন কেন?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে বললাম, "কবিতার ভাব এসেছে মনে হয়!"

বিলু জানতে চাইল, "এভাবে কবিতার ভাব আসে?"

"সাংঘাতিক কোনো কবিতা হলে মনে হয় এভাবে আসে।"

মিলু বলল, "একটু কাছে গিয়ে দেখি?"

আমি বললাম, "না না। সর্বনাশ!"

"কেন? সর্বনাশ কেন?"

"এখন পর্যন্ত খালি মুখ আর হাত চলছে। যখন পা চলতে শুরু করবে তখন কেউ রক্ষা পাবে না!"

আমার কথা শেষ হবার আগেই আমি পা চলার নিশানা দেখতে পেলাম। হঠাৎ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ডান পা-টা শূন্যে উঠে ডাইনিং টেবিলকে একটা লাথি মারল। কিছু বোঝার আগে এরপর বাম পা-টা, তারপর দুই পা নাচানাচি করতে লাগল। আমি চিৎকার করে বললাম, "সাবধান, সবাই সরে যাও।"

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, হঠাৎ করে কবি কিংকর চৌধুরী তিড়িং করে লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, তারপর তিড়িংবিড়িং করে হাত-পা ছুড়ে নাচতে শুরু করল। তার পায়ের লাথি খেয়ে শরীফ একপাশে ছিটকে পড়ল এবং উঠে বসার আগেই কবি কিংকর চৌধুরী হাত-পা ছুড়ে বিচিত্র একটা ভঙ্গিতে নাচানাচি করে শরীফের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। তার হাতের আঘাতে প্লেট-থালা-বাসন নিচে পড়ে গেল আর পায়ের লাথি খেয়ে টেবিল-ল্যাম্প, শেলফ, শোকেসের ওপরে সাজানো জিনিসপত্র ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল। কবি কিংকর চৌধুরী ডাইনিং রুম থেকে তিড়িংবিড়িং করে নাচতে নাচতে ড্রয়িংরুমে এল, লাথি মেরে বইয়ের শেলফ থেকে বইগুলো ফেলে দিয়ে মাটিতে একটা ডিগবাজি দিল। কিছুক্ষণ শুয়ে হাত-পা ছুড়ে হঠাৎ আবার লাফিয়ে উঠে, দেয়াল খামচে খামচে টিকটিকির মতো ওপরে ওঠার চেষ্টা করল। সেখান থেকে দড়াম করে নিচে পড়ে গিয়ে হাত দুটো হেলিকপ্টারের পাখার মতো ঘুরাতে ঘুরাতে ড্রয়িংরুম থেকে লাফাতে লাফাতে বেডরুমে ঢুকে গেল। আলনার কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ করে টর্নেডোর মতো ঘুরপাক খেতে লাগল, ঘুরতে ঘুরতে আলনার জামাকাপড়, শাড়ি চারদিকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দেখলাম ড্রেসিং টেবিলের ওপরে সাজানো শিউলির পাউডার ক্রিম পারফিউম ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে, সেগুলো ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায়।

কবি কিংকর চৌধুরী বিশাল একটা পোকার মতো তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছোটাছুটি করতে লাগল। কখন কোন দিকে যাবে কী করবে তার কোনো ঠিক নেই, সবাই নিজের জান বাঁচিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে পুরো বাসা একেবারে তছনছ হয়ে গেল।

একজন বয়স্ক সম্মানী মানুষ এভাবে হাত-পা ছুড়ে নেচে কুঁদে লাফিয়ে সারা বাসা ঘুরে বেড়াতে পারে—সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব না। আমরা সবাই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাকে থামানো অসম্ভব একটা ব্যাপার, কেউ সে চেষ্টাও করল না। মিনিট দশেক এইভাবে তিড়িংবিড়িং করে শেষ পর্যন্ত কিংকর চৌধুরী নিজে থেকেই থেমে গেল। ধপাস করে সোফায় বসে সে তখন লম্বা লম্বা নিশ্বাস নিতে শুরু করে। একেবারে পুরোপুরি থেমে গেল সেটাও বলা যায় না কারণ কথা নাই বার্তা নাই মাঝে মাঝে হঠাৎ করে তার একটা হাত বা পা লাফ দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

আমরা ভয়ে ভয়ে কবি কিংকর চৌধুরীকে ঘিরে দাঁড়ালাম। শরীফ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে কিংকর ভাই?"

"বুঝবার পারলাম না।" কবি কিংকর চৌধুরীর কথায় সেই নাকি ভাবটা চলে গেছে। শুধু যে নাকি ভাবটা চলে গেছে তা নয়, ভাষাটাও কেমন জানি চাঁছাছোলা অশালীন। কিংকর চৌধুরী এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "শরীলের উপর কুনো কন্ট্রোল নাই। ঠ্যাং হাত মাথা নিজের মতন লাফায়, হালার বাই হালা দেখি তাজ্জবের ব্যাপার।"

কবি কিংকর চৌধুরীর নর্তন-কুর্দন দেখে যত অবাক হয়েছিলাম তার মুখের ভাষা শুনে আমরা তার থেকে বেশি অবাক হলাম। বিলু আমার হাত ধরে বলল, "মামা! কবি কাকু এইভাবে কথা বলেন কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এইটাই তার অরিজিনাল ভাষা!" আমি ফিসফিস করে বললাম, "আসল ভাষাটা এখন বের হচ্ছে। অন্য সময় স্টাইল করে নাকি নাকি কথা বলত।"

কবি কিংকর চৌধুরী ঘ্যাস ঘ্যাস করে বগল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "বুঝলা শিউলি, এমুন আচানক জিনিস আমি বাপের জন্মে দেখি নাই। একেবার ছ্যাড়াব্যাড়া অবস্থা। তুমার ঘরবাড়িতে একটু ডিস্টার্ব দিছি মনে লয়।"

শিউলি মুখ শক্ত করে বলল, "একটু নয়, আমার পুরো বাসা সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

কবি কিংকর চৌধুরী লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তয় জব্বর পরিশ্রম হইছে। খিদাডা লাগছে ভালো মতন। টেবিলে খাবার লাগাও দেখি। বাসায় আণ্ডা আছে?"

শিউলি বলল, "না কিংকর ভাই। আমাদের বাসায় এখন যে অবস্থা খাবার ব্যবস্থা করার কোনো উপায় নেই। আপনি নিজেই তো করেছেন, নিজেই দেখেছেন!"

"তা কথা ভুল বলো নাই। শরীরের মধ্যেই মনে হয় শয়তান বাসা বানছে।"

শিউলি বলল, "আপনি বরং বাসায় চলে যান।"

"বা-বাসায় যাব?"

"হ্যাঁ।"

কবি কিংকর চৌধুরী ধীরে ধীরে একটু ধাতস্থ হয়েছে, বাসায় যাবার কথা শুনে মনে হয় আরো ধাতস্থ হয়ে গেল। এমনকি আবার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা আরম্ভ করল, "কিন্তু আজ রাতের কবিতা পাঠের আসর?"

শরীফ বলল, "আপাতত বন্ধ।"

"বন্ধ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে কি কাল রাতে?"

"না–না–না" শিউলি দুই হাত নেড়ে বলল, "কবিতা আপাতত থাকুক। মিলু-বিলুর পেছনে সময় দেওয়া হচ্ছে না। আমি ওদের সময় দিতে চাই।"

কবি কিংকর চৌধুরী কিছুক্ষণ শিউলির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমরা সবাই তখন ভয়ে এক লাফে পেছনে সরে গেলাম। শিউলি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "বিলু, তোর কবি কাকুর ব্যাগটা নিয়ে আয় তো।"

বিলু দৌড়ে তার ব্যাগটা নিয়ে এল এবং কবি কিংকর চৌধুরী ব্যাগ হাতে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। মনে হয় জন্মের মতোই।

দরজা বন্ধ করে শিউলি কিছুক্ষণ সারা বাসার দিকে তাকিয়ে থেকে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ভাইয়া, তুমি ঠিকই বলেছ। কবি-সাহিত্যিকদের বইপত্র পড়া ঠিক আছে, কিন্তু তাদের বেশি কাছে যাওয়া ঠিক না।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "একেবারেই না।"

শরীফ চারদিকে তাকিয়ে বলল, "বাসার যে অবস্থা এটা ঠিক করতে মনে হয় এক মাস লাগবে।"

বিলু-মিলু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ আব্বু।"

"চলো সবাই মিলে বাইরে থেকে খেয়ে আসি।"

আমি বললাম, "গুড আইডিয়া। এয়ারপোর্ট রোডে একটা রেস্টুরেন্ট খুলেছে, একেবারে ফাটাফাটি খাবার।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মাংস-মুরগি আছে তো?" শরীফ বলল, "পাগলা কবির পাল্লায় পড়ে ভালো খাওয়া বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এত সুন্দর কবিতা লিখে কিংকর চৌধুরী অথচ—"

শিউলি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এই বাসায় যদি ভবিষ্যতে কখনো কেউ কবি কিংকর চৌধুরীর নাম নেয় তা হলে কিন্তু তার খবর আছে।"

বিলু বলল, "কেন আম্মু কী করবে তা হলে?"

"কিলিয়ে ভর্তা করে দেব।"

রাতে দুটো হ্যামবার্গার খাবার পরেও আমার পেটে খাসির রেজালা আর চিকেন টিকিয়া খাওয়ার যথেষ্ট জায়গা ছিল। বিলু-মিলুর সাথে খেতে খেতে আমি নিচু গলায় তাদের বললাম, "কেমন দেখলি?"

বিলু আর মিলু অবাক হয়ে বলল, "কী দেখলাম?"

আমি চোখ মটকে বললাম, "তোদের কী কথা দিয়েছিলাম? কবি কিংকর চৌধুরী—"

বিলু আর মিলু চোখ বড় বড় করে বলল, "তুমি? তুমি এটা করেছ?"

"তোরা কি ভাবছিস এমনি এমনি হয়েছে?"

শিউলি টেবিলের অন্য পাশ থেকে বলল, "কী হল ভাইয়া? তুমি বিলু-মিলুর সাথে কী নিয়ে গুজগুজ করছ?"

বিলু-মিলু আর আমি একসাথে মাথা নেড়ে বললাম, "না, না, কিছু বলছি না! কিছু বলছি না!"

AMARBOI.COM

জলকন্যা

গভীর রাতে টেলিফোনের শব্দ শুনে আমি প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বসলাম। টেলিফোনের শব্দের মাঝে এক ধরনের আতঙ্ক থাকে, মাঝরাতে সেই আতঙ্ক মনে হয় আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আমি অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে কোনোমতে টেলিফোন ধরে বললাম, "হ্যালো।" এবারেও কোনো শব্দ নেই। টেলিফোনটা রেখে দিয়ে বিছানায় ফিরে যাব কিনা ভাবছি তখন টের পেলাম টেলিফোনটা উল্টো ধরেছি। আমার মতো মানুষের জন্য এটা রীতিমতো সমস্যা। বিজ্ঞানী অনিক লুম্বার সাথে দেখা হলে তাকে বলতে হবে এমন একটা টেলিফোন আবিষ্কার করতে যেটার উল্টোসিধে নেই, যে টেলিফোনে দুইদিকেই কানে লাগিয়ে শোনা যাবে আবার দুইদিকেই কথা বলা যাবে!

আপাতত টেলিফোনের ঠিক দিকটাই কানে লাগিয়ে তৃতীয়বারের মতো বললাম, "হ্যালো।"

অন্যপাশ থেকে একজনের কথা শুনতে পেলাম, বলল, "কী হল শুধু হ্যালো হ্যালো করছ, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?"

কী আশ্চর্য! অনিক লুম্বার কথা ভাবছিলাম আর ঠিক তার টেলিফোন এসে হাজির। আমি বললাম, "এত রাতে কী ব্যাপার?"

"রাত? রাত কোথায় দেখলে?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী বলছ তুমি? চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।"

"ঘুটঘুটে অন্ধকার?"

"হ্যাঁ।"

অনিক লুম্বা বলল, "তুমি নিশ্চয়ই চোখ বন্ধ করে রেখেছ। চোখ খুলে দেখ।"

আমি তখন আবিষ্কার করলাম যে, গভীর রাত মনে করে আসলেই আমি চোখ বন্ধ করে রেখেছি। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি সত্যি সত্যি চারদিকে এক ধরনের হালকা আলো। আবছা আবছা আলোটা অত্যন্ত বিচিত্র, কখনো সকালে ঘুম ভাঙে নি বলে ভোরের আলো দেখি নি, তাই আমার কাছে আরো বিচিত্র মনে হয়। অনিক বলল, "চোখ খুলেছ?"

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "ইয়ে, কয়টা বাজে?"

"ছয়টা। ঘুটঘুটে মাঝরাত মোটেও না।"

আমি হাই তুলে বললাম, "সকাল ছয়টা আমার কাছে মাঝরাতের সমান।"

অনিক লুম্বা ধমক দিয়ে বলল, "বাজে কথা বলো না।"

আমি বললাম, "কী হয়েছে বলো।"

"তুমি এক্ষুনি চলে এস।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "চলে আসব? আমি? কোথায়?"

"আমার বাসায়।"

"কেন কী হয়েছে?"

"এলেই দেখবে। তাড়াতাড়ি।" বলে আমি কিছু বলার আগেই অনিক টেলিফোন রেখে দিল।

সকালবেলাতে এমনিতেই আমার ব্রেন শর্ট সার্কিট হয়ে থাকে, ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে পারি না। অনিক লুম্বার কথাও বুঝতে পারছিলাম না, ঘুমানোর জন্যে বিছানার দিকে যাচ্ছিলাম তখন আবার টেলিফোন বাজল। আমি আবার ঘুম ঘুম চোখে টেলিফোন ধরে বললাম, "হ্যালো।"

অন্যপাশে অনিক লুম্বার গলা শুনতে পেলাম, "খবরদার তুমি বিছানায় ফিরে যাবে না কিন্তু। এক্ষুনি চলে এস, খুব জরুরি।"

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই সে অন্যপাশে টেলিফোন রেখে দিয়েছে। বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখে পানি দিয়ে ঘুমটা একটু কমানোর চেষ্টা করলাম। খুব একটা লাভ হল না। কিছু একটা খেলে হয়তো জেগে উঠতে পারি। এত সকালে কী খাওয়া যায় চিন্তাভাবনা করছি তখন আবার টেলিফোন বাজল। ভয়ে ভয়ে টেলিফোন ধরে কিছু বলার আগেই অন্যপাশ থেকে অনিক লুম্বা বলল, "এখন আবার খেতে বসে যেও না। এক্ষুনি ঘর থেকে বের হও, কুইক।"

আমি কিছু বলার আগেই এবারেও সে আবার টেলিফোন রেখে দিল। আমি তখন বাধ্য হয়ে কাপড়-জামা পরে ঘর থেকে বের হলাম। ভেবেছিলাম এত সকালে নিশ্চয়ই কাঁকপক্ষী পর্যন্ত ঘুম থেকে ওঠে নি। কিন্তু বাইরে বের হয়ে আমি বেকুব হয়ে গেলাম। বাস চলছে, টেম্পো চলছে, রিকশা-স্কুটারে রাস্তা গিজগিজ করছে। মানুষজন ছোটাছুটি করছে। কী আশ্চর্য ব্যাপার! এই দেশের মানুষ কি সকালবেলা শান্তিতে একটু ঘুমাতেও পারে না? আমি আর দেরি করলাম না। একটা সিএনজি নিয়ে অনিকের বাসায় রওনা দিলাম।

অনিকের বাসার গেট খোলা। বাসার দরজাও খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখি টেবিলের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর কিছু ময়লা কাপড় স্তূপ করে রেখে অনিক গভীর মনোযোগে সেদিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, "দেখ জাফর ইকবাল! দেখ।"

ময়লা কাপড়ের স্তূপের মাঝে দেখার কী থাকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না। কাছে গিয়ে দেখেও কিছু বুঝতে পারলাম না, বললাম, "কী দেখব?"

ঠিক তখন পুরোনো কাপড়ের বান্ডিলের ভেতর কী একটা জানি ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করে উঠল, আমি লাফিয়ে পিছনে সরে গিয়ে বললাম, "কী শব্দ করছে?"

"দেখছ না? বাচ্চা—"

"বাচ্চা?" আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "কিসের বাচ্চা?"

"কিসের বাচ্চা মানে?" অনিক বিরক্ত হয়ে বলল, "বাচ্চা আবার কিসের হয়? মানুষের বাচ্চা।"

"মানুষের বাচ্চা?" আমি অবাক হয়ে কাছে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি ময়লা কাপড়ের পুঁটলির ভেতরে ছোট একটা মাথা, প্রায় গোলাপি রঙ, সেটা একটু একটু নড়ছে আর মুখ দিয়ে শব্দ করছে। আমি প্রায় বিশ্বাস করেই ফেলেছিলাম যে সত্যি সত্যি মানুষের বাচ্চা, কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, অনিক ঠাট্টা করছে। একজন মানুষের বাচ্চা এত ছোট হতে পারে না, নিশ্চয়ই এটা তার কোনো একটা আবিষ্কার, কোনো একটা পুতুল বা অন্য কিছু। আমি মুখ শক্ত করে বললাম, "তোমার এই পুতুলের বাচ্চা দেখানোর জন্যে আমাকে এত সকালে ডেকে এনেছ?"

"পুতুলের বাচ্চা কী বলছ?" অনিক রেগে বলল, "এটা সত্যিকারের মানুষের বাচ্চা।"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "দেখ অনিক, আমি বোকা হতে পারি, কিন্তু এত বোকা না। মানুষের বাচ্চা কখনো এত ছোট হয় না।"

"তুমি কয়টা মানুষের বাচ্চা দেখেছ?"

"অনেক দেখেছি।" আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "আমার ছোট বোন শিউলির যখন মেয়ে হল আমি কোলে নিয়েছিলাম। আমি কোলে নিতেই আমার ওপর হিসি করে দিয়েছিল, আমার স্পষ্ট মনে আছে—"

"নাই।" অনিক বলল, "মানুষের বাচ্চা জন্মানোর সময় এইরকম ছোটই থাকে, তুমি ভুলে গেছ। এই দেখ—"

অনিক ময়লা কাপড়ের পুঁটলিটা একটু আগলা করল। এখন আমি ছোট ছোট হাত-পা দেখতে পেলাম। সেগুলো আঁকুপাঁকু করে নড়ছে। নাভিটা নিশ্চয়ই কাঁচা—দেখে মনে হয় সেখানে কী একটা যেন ঝুলে আছে। অনিক তাড়াতাড়ি আবার কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে বাচ্চাটাকে ঢেকে ফেলল। আমি কয়েকবার চেষ্টা করে বললাম, "তুমি কোথায় পেলে বাচ্চাটাকে?"

"বারান্দায়।"

"বা-বারান্দায়?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বারান্দায় বাচ্চা কোথা থেকে এল?"

"সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি। সেই জন্যেই তো তোমাকে ডেকে এনেছি।"

আমি ঢোক গিলে বললাম, "আ-আমি তোমাকে বলতে পারব?"

"হয়তো পারবে না। কিন্তু দুজন থাকলে একটু কথা বলা যায়। একটু পরামর্শ করা যায়। একটা ছোট বাচ্চা, তার ভালোমন্দ বলে একটা ব্যাপার আছে না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আছে।" আমি মাথা নাড়লাম, "তার ভালোমন্দ বলে একটা ব্যাপার আছে। তবে—"
অনিক ভুরু কুঁচকে বলল, "তবে কী?"
"একটা ছোট বাচ্চা যার কাছে চলে আসে, তার কোনো ভালো নেই। তার শুধু মন্দ।"
"তুমি কী বলতে চাইছ?"
"ছোট বোন শিউলিকে দেখেছিলাম। তার প্রথম বাচ্চা হবার পর খাওয়া নেই ঘুম নেই। কেমন যেন পাগলী টাইপের হয়ে গেল। এখনো ঠিক হয় নি।"
অনিক ছোট বাচ্চাটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "সেটা পরে দেখা যাবে। এখন কী করা যায় বলো।"
আমি মাথা চুলকালাম, বললাম, "এর মা-বাবাকে খুঁজে বের করে তাদের কাছে ফেরত দিতে হবে।"
"এর মা-বাবা যদি বাচ্চাটাকে নিজের কাছে রাখতই তা হলে আমার বারান্দায় কেন ফেলে গেল?"
আমি আবার মাথা চুলকালাম। কোনো একটা সমস্যায় পড়লেই আমার মাথা চুলকাতে হয়। আমার কপাল ভালো। আমার জীবনে খাওয়া এবং ঘুম ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপার নেই। সমস্যাও কম, তা না হলে মাথা চুলকানোর কারণে এতদিনে সেখানকার সব চুল উঠে যেত। অনিক বলল, "এই ময়লা কাপড় দিয়ে বাচ্চাটাকে পেঁচিয়ে রেখেছে, তার মানে এর মা-বাবা নিশ্চয়ই গরিব।"
"তাই বলো। আমি আরো ভাবছিলাম তুমি এত ছোট বাচ্চাটাকে কেন এত ময়লা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছ।"
"আমি রাখি নাই।"
"তা হলে খুলে রাখছ না কেন?"
"বাচ্চাটার মাত্র জন্ম হয়েছে। একটা বাচ্চা থাকে মায়ের পেটে, সেখানে শরীরের গরমটুকু থাকে। যখন জন্ম হয় তখন বাইরের পৃথিবী তার কাছে কনকনে ঠাণ্ডা। তাই তাকে গরম করে রাখতে হয়।"
আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "তুমি কেমন করে জান?"
"বাচ্চাটা পাবার পর আমি কি বসে আছি মনে করেছ? ইন্টারনেটে ছোট বাচ্চা সম্বন্ধে যা পাওয়া যায় সব ডাউনলোড করে পড়া শুরু করে দিয়েছি না?"
আমি দেখলাম তার টেবিলের আশপাশে কাগজের স্তূপ। অনিক বলল, "আমি এর মাঝে ছোট বাচ্চার একটা এক্সপার্ট হয়ে গেছি। তুমি জান একটা ছোট বাচ্চার যখন জন্ম হয়, তখন প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা সে অনেক কিছু করতে পারে, যেটা পরে করতে পারে না। হাত দিয়ে ধরে ফেলতে পারে, মুখ ভ্যাংচাতে পারে—"
"মুখ ভ্যাংচাতে পারে?"
অনিক হাসল, বলল, "অনুকরণ করতে পারে। আমি জিব বের করলে সেও জিব বের করবে। কিন্তু বাচ্চাটা বেশিরভাগ সময় চোখ বন্ধ রাখছে।"
অনিকের কথা শুনে কিনা কে জানে বাচ্চাটা ঠিক তখন দুই চোখ খুলে ড্যাবড্যাব করে তাকাল। অনিক বাচ্চাটার কাছে মুখ নিয়ে নিজের জিব বের করতেই এইটুকুন ছোট বাচ্চা তার লাল টুকটুকে জিব বের করে অনিককে ভেংচি কেটে দিল। অনিক জিবটা ভেতরে ঢোকাতেই বাচ্চাও তার জিব ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। অনিক আবার জিবটা বের করতেই এইটুকুন গ্যাদা বাচ্চা আবার তার জিবটা বের করে ফেলল! কী আশ্চর্য ব্যাপার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছ? দেখেছ ব্যাপারটা? ঠিক যেটা বলেছিলাম। জন্ম হবার পরপর ছোট বাচ্চাদের অসম্ভব কিছু রিফ্লেক্স থাকে। মাঝে মাঝে এ সময় এরা খপ করে ধরে ফেলতে পারে।"

অনিক তখন তার একটা আঙুল বাচ্চাটার সামনে নাড়াতে থাকে এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সত্যি সত্যি বাচ্চাটা খপ করে আঙুলটা ধরে ফেলল। অনিক আনন্দে দাঁত বের করে হেসে বলল, "দেখেছ ব্যাপারটা? দেখেছ?"

আমি বললাম, "দেখেছি। কিন্তু—"

অনিক আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, "কিন্তু কী?"

"তোমার বাসার বারান্দায় একটা গ্যাদা বাচ্চা পাওয়া গেছে, সেটা নিয়ে তুমি কিছু একটা করবে না?"

"সেই জন্যেই তো তোমাকে ডেকে এনেছি। কী করতে হবে তুমি কর। আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে একটু গবেষণা করি। বইপত্রে যেসব কথা লিখেছে সেগুলি সত্যি কিনা পরীক্ষা করে দেখি।"

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, "অনিক তুমি গবেষণা করার অনেক সময় পাবে। আগে ব্যাপারটা কাউকে জানাও।"

অনিক বাচ্চাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে নিজের মাথাটা একবার বামে আরেকবার ডানে নিয়ে বলল, "উঁহু গবেষণা করার অনেক সময় পাব না। বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা তাদের এরকম রিফ্লেক্স থাকে। একটু পরে আর থাকবে না।"

আমি বললাম, "তা হলে তুমি কী করতে চাও?"

"বাচ্চাটা চোখ দিয়ে ট্র্যাক করতে পারে কিনা দেখছি।"

আমি বুঝতে পারলাম অনিক এখন কিছুই করবে না, সে তার গবেষণা করে যাবে। যা করার আমাকেই করতে হবে এবং প্রায় সাথে সাথে আমার মনে পড়ল, আমি নিজে নিজে কোনো কাজই করতে পারি না। খাওয়া এবং ঘুমের বাইরে জীবনে কোনো কাজ নিজে করেছি বলে মনে পড়ে না।

ঠিক এরকম সময় আমার সুব্রতের কথা মনে পড়ল। সুব্রতের জন্ম হয়েছে এই ধরনের কাজের জন্যে! আমি অনিকের টেলিফোন দিয়ে সুব্রতকে ফোন করলাম। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর সুব্রত এসে ফোন ধরল, ঘুম ঘুম গলায় বলল, "হ্যালো।"

আমি বললাম, "সুব্রত, আমি জাফর ইকবাল।"

"জাফর ইকবাল?" সুব্রত অবাক হয়ে বলল, "তুই এত ভোরে কী করছিস?"

"একটা জরুরি কাজে—"

"জরুরি কাজ? তোর আবার জরুরি কাজ কী হতে পারে? ঘুমাতে যা।"

আমি বললাম, "না, না সুব্রত, ঠাট্টা নয়। আসলেই জরুরি কাজ।"

"কী হয়েছে?"

আমি তখন সুব্রতকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম। শুনে সুব্রত চেঁচিয়ে উঠে বলল, "বলিস কী তুই?"

আমি বললাম, "ঠিক বলছি। এই এতটুকুন একটা বাচ্চা। গোলাপি রঙের। এই এতটুকুন হাত-পা। এতটুকুন আঙুল।"

"কী আশ্চর্য!"

"আসলেই আশ্চর্য। এখন কী করতে হবে বল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পুলিশে জিডি করতে হবে।"

"জিডি?" আমি অবাক হয়ে বললাম. "সেটা আবার কী জিনিস?"

"জেনারেল ডায়েরি।"

"সেটা কেমন করে করতে হয়?"

"থানায় গিয়ে করতে হয়।"

"থানায়?" আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম, থানা পুলিশ থেকে আমি সব সময় এক শ হাত দূরে থাকতে চাই।

"হ্যাঁ।" সুব্রত বলল, "থানায় যেতে হবে। তবে তুই একা একা যাস না, কী বলতে কী বলে ফেলে আরো ঝামেলা পাকিয়ে ফেলবি। আমি আসছি।"

সুব্রতের কথা শুনে আমি একটু ভরসা পেলাম, কিন্তু তবুও ভান করলাম আমি যেন একাই করে ফেলতে পারব। বললাম, "তোর আসতে হবে না। আমি একাই বিডি করে ফেলব।"

"বিডি না গাধা, জিডি। তোর একা করতে হবে না। আমি আসছি—তুইও থানায় চলে আয়।"

সুব্রত টেলিফোনটা রেখে দেবার পর আমি আবার অনিকের দিকে তাকালাম। সে হাতে একটা ছোট টর্চলাইট নিয়ে ছোট বাচ্চাটার সামনে লাফালাফি করছে। আমি বললাম, "অনিক, আমি থানায় জিডি করিয়ে আসি।"

"যাও।" বলে সে আবার আগের মতো ছোট ছোট লাফ দিতে লাগল। আমি আগেও দেখেছি অনিক একটা টিকটিকির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে। আর এটা তো টিকটিকি না—এটা একটা মানুষের বাচ্চা।

আমি থানার সামনে গিয়ে সুব্রতের খোঁজে ইতিউতি তাকাতে লাগলাম। তার এখনো দেখা নেই, তাকে ছাড়া একা একা আমার ভেতরে ঢোকার কোনো ইচ্ছা নেই কিন্তু থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটা আমার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগল। পুলিশ হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেই আমি নার্ভাস হয়ে যাই আর যখন কটমট করে তাকায়, তখন তো কথাই নেই, আমার রীতিমতো বাথরুম পেয়ে যায়। আমি থানার সামনে থেকে সরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই পুলিশ বাজখাঁই গলায় হাঁক দিল, "এই যে, এই যে মোটা ভাই।"

তুলনামূলকভাবে আমার স্বাস্থ্য একটু ভালো কিন্তু এর আগে আমাকে কেউ মোটা ভাই ডাকে নাই। আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "আমাকে ডেকেছেন?"

"আর কাকে ডাকব? এদিকে শুনেন।"

আমি কাছে এগিয়ে এলাম। পুলিশটা কয়েকবার আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল, দেখে বলল, "আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি আপনি কেমন সন্দেহজনকভাবে থানার সামনে হাঁটাহাঁটি করছেন। ব্যাপারটা কী?"

"না মানে ইয়ে ইয়ে—" আমার গলা শুকিয়ে গেল, হাত ঘামতে লাগল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

পুলিশটা আবার ধমক দিয়ে উঠল, "কী হল, প্রশ্নের উত্তর দেন না কেন?"

আমি ঢোক গিলে বললাম, "আমি ইডি না বিডি কী যেন বলে সেটা করাতে এসেছি।"

"ইডি? বিডি? সেটা আবার কী?"

পুলিশের হম্বিতম্বি শুনে আমাদের ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে উঠেছে। তার ভেতর থেকে একজন বলল, "জিডি হবে মনে হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ জিডি। জিডি করাতে এসেছি।"

পুলিশটা চোখ পাকিয়ে বলল, "জিডিকে আপনি ইডি বিডি বলছেন কেন? পুলিশকে নিয়ে টিটকারি মারেন?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না-না, আমি মোটেও টিটকারি মারতে চাই নাই। শব্দটা ভুলে গিয়েছিলাম।"

"একটা জিনিস যদি ভুলে যান, তা হলে সেটা করাবেন কেমন করে?"

প্রশ্নটার কী উত্তর দেব বুঝতে পারছিলাম না বলে চুপ করে থাকলাম। পুলিশটা ধমক দিয়ে বলল, "আর জিডি করাতে হলে বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন কেন? ভেতরে যান।"

কাজেই সুব্রতকে ছাড়াই আমাকে ভেতরে ঢুকতে হল। কিছুক্ষণের মাঝেই আমাকে আমার থেকেও মোটা একজন পুলিশ অফিসারের সামনে নিয়ে গেল। সে একটা ম্যাচকাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, "কী ব্যাপার?"

আমি বললাম, "ইয়ে, একটা জিডি করাতে এসেছি।"

"কী নিয়ে জিডি?"

"একটা বাচ্চা পাওয়া গেছে।"

"পাওয়া গেছে না হারিয়ে গেছে?"

"পাওয়া গেছে।"

"পাওয়া গেলে আবার জিডি করাতে হয় নাকি? বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেন বাড়ি কোথায়, সেখানে নিয়ে যান। সব কাজ কি পুলিশ করবে নাকি? পাবলিকের একটা দায়িত্ব আছে না? কয়দিন পরে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হলেও আপনারা জিডি করাতে চলে আসবেন। আপনি জানেন জিডি করাতে কত সময় লাগে? কত ঝামেলা হয়? আপনাদের কোনো কাজকর্ম নাই?"

পুলিশ অফিসারটা টানা কথা বলে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যখন থামল তখন বললাম, "বাচ্চাটা খুব ছোট।"

"কতটুকু ছোট?"

আমি হাত দিয়ে বাচ্চাটার সাইজ দেখালাম। পুলিশ অফিসার চোখ কপালে তুলে বলল, "কিসের বাচ্চা? মানুষের না ইন্দুরের?"

"জি মানুষের।"

"মানুষের বাচ্চা এত ছোট হয় কেমন করে? আর অত ছোট বাচ্চাটা এসেছে কেমন করে?"

"সেটা তো জানি না। কেউ একজন রেখে গেছে মনে হয়।"

"কেন রেখে গেছে?"

"সেটা তো জানি না।"

"কখন রেখে গেছে?"

"সেটাও তো জানি না।"

"বাচ্চা ছেলে না মেয়ে?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "সেটাও জানি না।"

পুলিশ অফিসার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "আপনি যদি কিছুই না জানেন, তা হলে এখানে এসেছেন কেন? আমি কি আপনার সম্বন্ধী নাকি দুলাভাই যে আমার সাথে মশকরা করতে আসবেন? বাসাটা কোথায়?"

আমি অনিকের বাসার নম্বরটা জানতাম, কিন্তু পুলিশের ধমক খেয়ে সেটাও ভুলে গেলাম, মাথা চুলকে বললাম, "ইয়ে, মানে ইয়ে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ অফিসার একটা বাজখাঁই ধমক দিয়ে বলল, "আপনারা কি ভাবেন আমাদের কোনো কাজকর্ম নাই? আপনাদের সাথে খোশগল্প করার জন্যে বসে আছি? আপনাদের কোনো কাজকর্ম না থাকলে এইখানে চলে আসবেন। কোনো একটা বিষয়ে জিডি করার জন্যে? শহরে মশা থাকলে জিডি করাবেন? আকাশে মেঘ থাকলে জিডি করাবেন? বউ ধমক দিলে জিডি করাবেন?"

কিছু একটা বলতে হয়, তাই মিনমিন করে বললাম, "ইয়ে বিয়ে করি নি এখনো, বউ ধমক দেবার চান্স নাই—"

"এত বয়স হয়েছে এখনো বিয়ে করেন নাই?" পুলিশ অফিসার ভুরু কুঁচকে বলল, "কী করেন আপনি?"

"ইয়ে সেরকম কিছু করি না।"

"তা হলে আপনার সংসার চলে কেমন করে?"

আমি তখন ঘামতে শুরু করেছি। আমতা-আমতা করে বললাম, "আসলে সেরকম সংসারও নাই—"

পাশের টেবিলে একজন মহিলা পুলিশ বসে ছিল। সে বলল, "স্যার ভেরি সাসপিশাস কেস। দেখেও সেরকম মনে হয়। চুয়ান্ন ধারায় অ্যারেস্ট দেখিয়ে লকআপে ঢুকিয়ে দেন—"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "কী বলছেন আপনি?"

মহিলা পুলিশ বলল, "ঠিকই বলেছি। আমরা এই লাইনে কাজ করি। একজন মানুষকে দেখলেই বুঝতে পারি সে কী জিনিস!"

পুলিশ অফিসার নতুন একটা ম্যাচকাঠি বের করে আবার দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, "ঠিকই বলেছ। চুয়ান্ন ধারায় চালান করে দেই। জন্মের মতো শিক্ষা হয়ে যাবে।"

একজন মানুষকে যে চাউলের বস্তার মতো চালান করা যায় আমি জানতাম না, কিন্তু কিছু বোঝার আগেই দেখলাম সত্যি সত্যি হাজতের মাঝে চালান হয়ে গেছি। ঘরঘর করে লোহার গেটটা টেনে বিশাল একটা তালা ঝুলিয়ে যখন আমাকে হাজতে আটকে ফেলল, আমার মাথায় তখন রীতিমতো আকাশ ভেঙে পড়ল।

হাজতের ভেতরে যে জিনিসটা সবচেয়ে প্রথমে লক্ষ করলাম সেটা হচ্ছে দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধটা কোথা থেকে আসছে সেটাও দেখা যাচ্ছে। ভয়ের চোটে আমার বাথরুম পেয়ে গেছে কিন্তু হাজতের ভেতরে এই দরজাবিহীন বাথরুম দেখে সেই বাথরুমের ইচ্ছাও উবে গেল। ভেতরে গোটা দশেক মানুষ শুয়ে-বসে আছে। দুই-চারজনকে একটু চিন্তিত মনে হল, তবে বেশিরভাগই নির্বিকার। একজন ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আছে?"

কিসের কথা জিজ্ঞেস করছে বুঝতে পারলাম না, বললাম, "কী আছে?"

"সেইটাও যদি বলে দিতে হয় তা হলে হাজতে আমি আর আপনি কথা বলছি কেন?"

আমি বললাম, "আমি মানে আসলে—"

আরেকজন বলল, "বাদ দে। চেহারা দেখছিস না লেন্দু টাইপের।"

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, "কিসের কেইস আপনার?"

আমি বললাম, "কোনো কেইস না। ভুল করে—"

কথা শেষ হবার আগেই হাজতে বসে থাকা সবাই হা হা করে হেসে উঠল যেন আমি খুব মজার একটা কথা বলেছি। একজন হাসি থামিয়ে বলল, "আমাদের সামনে গোপন করার দরকার নাই। বলতে পারেন, কোনো ভয় নাই—"

আমি বললাম, "না, না, আপনারা যা ভাবছেন মোটেও তা না। একটা ছোট বাচ্চা—"

কথা শেষ করার আগেই একজন বলল, "ও! ছেলেধরা!"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম তখন আরেকজন বলল, "লজ্জা করে না ছেলেধরার কাম করতে? বুকে সাহস থাকলে ডাকাতি করবেন। সাহস না থাকলে চুরি করবেন। তাই বলে ছেলেধরা? ছি ছি ছি।"

ষণ্ডাগোছের একজন বলল, "বানামু নাকি?"

মাঝ বয়সের একজন বলল, "এখন না। অন্ধকার হোক।"

ষণ্ডাগোছের মানুষটা বিরস মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কখন অন্ধকার হবে আর কখন আমাকে বানাবে সে জন্যে অপেক্ষা করার তার ধৈর্য নাই। আমার মনে হল আমি ডাক ছেড়ে কাঁদি।

আমার অবিশ্যি ডাক ছেড়ে কাঁদতে হল না, ঘণ্টাখানেকের মাঝে সুব্রত এসে আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল। যে পুলিশ অফিসার আমাকে চালান দিয়েছিল সে-ই তালা খুলে আমাকে বের করে আনল। সুব্রত তার হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "থ্যাংক ইউ গনি সাহেব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।"

গনি সাহেব বললেন, "আমাকে থ্যাংকস দেওয়ার কিছু নাই। আইনের মানুষ, আইন যেটা বলে আমরা সেটাই করি। তার বাইরে যাবার আমাদের কোনো ক্ষমতা নাই।"

থানা থেকে বের হয়েই সুব্রত আমাকে গালাগাল শুরু করল। বলল, "তোর মতো গাধা আমি জন্মে দেখি নাই। জিডি করতে এসে নিজে অ্যারেস্ট হয়ে গেলি? আমার যদি আসতে আরেকটু দেরি হত, তা হলে কী হত? যদি জেলখানায় চালান করে দিত?"

আমি বললাম, "তুই দেরি করে এলি কেন? তোর জন্যেই তো আমার এই বিপদ।"

"আমি রওনা দিয়ে ভাবলাম ছোট বাচ্চাদের একটা হোম থেকে খোঁজ নিয়ে যাই। তোর বন্ধু পুরুষ, ছোট বাচ্চার দেখাশোনা করতে পারবে না। এর জন্যে দরকার একটা হোম। একটা অনাথাশ্রম।"

"আছে এরকম জায়গা?"

"থাকবে না কেন? এই যে ঠিকানা নিয়ে এসেছি। কথাও বলে এসেছি।" সুব্রত আমাকে একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বলল, যে মহিলা দায়িত্বে আছেন তার নাম দুর্দানা বেগম।

"দুর্দানা বেগম? এটা কী রকম নাম?"

সুব্রত বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি কি নাম রেখেছি নাকি? আমাকে দোষ দিচ্ছিস কেন?"

"দোষ দিচ্ছি না। জানতে চাচ্ছি।"

সুব্রত মুচকি হেসে বলল, "তবে নামটা দুর্দানা বেগম না হয়ে দুর্দান্ত বেগম হলে মনে হয় আরো ভালো হত।"

"কেন?"

"আসলেই দুর্দান্ত মহিলা। অনাথাশ্রমটাকে চালায় একেবারে মিলিটারির মতো। পান থেকে চুন খসার উপায় নাই। কী ডিসিপ্লিন—দেখলে অবাক হয়ে যাবি।"

আমি ভীতু মানুষ, নিয়মশৃঙ্খলাকে বেশ ভয় পাই, তাই দুর্দানা বেগম আর তার অনাথাশ্রমের কথা শুনে একটু ভয়ই পেলাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম,, "বাচ্চাদের মারধর করে নাকি?"

"আরে না। দুর্দানা বেগমের গলাই যথেষ্ট, মারধর করতে হয় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুব্রত তার ঘড়ি দেখে বলল, "তুই এখন কোথায় যাবি?"

"অনিক লুম্বার বাসায়। তুইও আয়, বাচ্চাটাকে দেখে যা।"

"নাহ্। এখন সময় নাই। ঢাকা শহর নর্দমা পুনরুজ্জীবন কমিটির মিটিং আছে।"

"নর্দমা পুনরুজ্জীবনেরও কমিটি আছে?"

"না থাকলে হবে? ঢাকা শহর পানিতে তা হলে তলিয়ে যাবে।" সুব্রত আমার দিকে হাত নেড়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে একটা চলন্ত বাসে উঠে গেল। বাস থেকে মাথা বের করে বলল, "আজকেই দুর্দানা বেগমের সাথে যোগাযোগ করবি কিন্তু।"

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, "করব।"

আমি অবিশ্যি দুর্দানা বেগমের সাথে যোগাযোগ না করে অনিকের বাসায় ফিরে গেলাম। এখনো অনিকের গেট খোলা এবং দরজা খোলা। ঢুকে দেখি ভেতরে ল্যাবরেটরি ঘরে একটা বড় টেবিলে একটা বিশাল অ্যাকুরিয়ামের মাঝে অনিক পানি ভরছে। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কী করছ?"

"অ্যাকুরিয়ামে পানি ভরছি।"

"সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি জানতে চাইছি কেন এরকম সময়ে ল্যাবরেটরি ঘরের মাঝখানে একটা অ্যাকুরিয়াম, আর কেন এরকম সময়ে এখানে পানি ভরছ?"

অনিক আমার কথার উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে তাকাল। আমি বললাম, "বাচ্চাটা কোথায়?"

"ঘুমাচ্ছে। একটা ছোট বাচ্চা বেশিরভাগ সময় ঘুমায়। পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য।"

"কোথায় ঘুমাচ্ছে?"

"এই যে। আলমারিতে।"

আমি অবাক হয়ে দেখলাম আলমারির একটা তাক খালি করে সেখানে কয়েকটা টাওয়েল বিছিয়ে বিছানা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে এইটুকুন একটা বাচ্চা তার পিছনটুকু ওপরে তুলে মহা আরামে ঘুমাচ্ছে। এরকমভাবে একটা বাচ্চা ঘুমাতে পারে নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

অনিক বলল, "ছোট বাচ্চাদের তিনটা কাজ—খাওয়া, ঘুম এবং বাথরুম। সে তিনটাই করে ফেলেছে। বাচ্চাটা অত্যন্ত লক্ষ্মী।" অনিক হঠাৎ করে ঘুরে আমার দিকে তাকাল, বলল, "তুমি হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলে?"

আমি রাগ হয়ে বললাম, "আমার কী হল না হল সেটা নিয়ে তোমার খুব মাথাব্যথা আছে বলে তো মনে হল না।"

অনিক একটু অবাক হয়ে বলল, "তোমার কিছু হয়েছে নাকি?"

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, "হয় নি আবার? হাজত খেটে এসেছি।"

অনিক মুখ হাঁ করে বলল, "হাজত খেটে এসেছ। কেন?"

আমি রাগে গরগর করে বললাম, "তোমার লক্ষ্মী বাচ্চার জন্যে।"

"লক্ষ্মী বাচ্চার জন্যে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"কারণ আমি জানি না তোমার লক্ষ্মী বাচ্চা কেমন করে এখানে এসেছে, কেন এসেছে এবং কখন এসেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি জানি না তোমার লক্ষ্মী বাচ্চাটি ছেলে না মেয়ে।"

"সে কী! তুমি জান না?"

"না।"

"কী আশ্চর্য!" অনিক অ্যাকুরিয়ামের পানি ভরা বন্ধ করে আমার কাছে এসে আমায় হাত ধরে টেনে আলমারির কাছে নিয়ে গেল। বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলল, "এর মুখের দিকে তাকাও! দেখছ না এটি একটি মেয়ে। কী সুইট চেহারা দেখছ না? একটা মেয়ে না হলে কখনো চেহারা এরকম সুইট হতে পারে?"

ঘুমের ভেতরে বাচ্চারা হাসাহাসি করে আমি জানতাম না, অবাক হয়ে দেখলাম ঠিক এরকম সময়ে বাচ্চাটি তার মাঢ়ী বের করে একটু হেসে দিল। তখন আমার কোনো সন্দেহ থাকল না যে এটি নিশ্চয়ই একটা মেয়ে। বললাম, "ঠিকই বলেছ। নিশ্চয়ই মেয়ে। তবে—"

"তবে কী?"

"কাপড় খুলে একবার দেখে নিলে হয়।"

অনিক বলল, "হ্যাঁ। সেটাও দেখেছি।"

"গুড। এসব ব্যাপারে শুধু চেহারার ওপরে ভরসা না করে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নেওয়া ভালো।"

অনিক আবার তার অ্যাকুরিয়ামের কাছে গিয়ে পানি ভরতে ভরতে বলল, "সকালবেলা উঠেই তোমার এত ঝামেলা! আমার খুব খারাপ লাগছে শুনে।"

"এখন খারাপ লেগে কী হবে! তবে আমার একটা অভিজ্ঞতা হল!"

"সেভাবেই দেখ। নতুন অভিজ্ঞতা। জীবনে অভিজ্ঞতাই হচ্ছে বড় কথা।"

আমি আলোচনাটা অভিজ্ঞতা থেকে অ্যাকুরিয়ামে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "এখন বলো এত বড় অ্যাকুরিয়ামে পানি ভরছ কেন?"

অনিক একটু ইতস্তত করে বলল, "একটা পরীক্ষা করার জন্যে।"

"কী পরীক্ষা করবে?"

"ছোট বাচ্চারা নাকি জন্মাবার পর সাঁতার কাটতে পারে।"

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, অবাক হয়ে বললাম, "সাঁতার কাটতে পারে?"

"হ্যাঁ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ছোট বাচ্চাদের জন্মের পরপর পানিতে ছেড়ে দিলে তারা সাঁতার কাটতে পারে।"

এবারে পানির অ্যাকুরিয়ামের রহস্য খানিকটা পরিষ্কার হল। আমি বললাম, "তুমি এই বাচ্চাটাকে পানির মাঝে ছেড়ে দিতে চাও?"

অনিক মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই এটা সত্যি কি না।"

আমি মুখ হাঁ করে কিছুক্ষণ অনিকের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, "তুমি বলতে চাও যে এই ছোট বাচ্চাটাকে এই পানির মাঝে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে সে সাঁতার কাটতে পারে কি না?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।"

" না, না, তুমি যা ভাবছ—"

আমি অনিককে বাধা দিয়ে বললাম, "তুমি যদি ভাবো একটা গেদা বাচ্চাকে পানিতে ফেলে দিয়ে তাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবে আর আমি বসে বসে সেটা দেখব, তা হলে জেনে রাখ তুমি মানুষ চিনতে ভুল করেছ।"

অনিক বলল, "আরে আগে তুমি আমার কথা শোন।"

"তোমার কোনো কথা আমি শুনব না। তুমি যদি এই মুহূর্তে এই ছোট বাচ্চাকে পানিতে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা বন্ধ না কর তা হলে প্রথমে আমি গনি সাহেবকে তারপর দুর্দানা বেগমকে ফোন করব।"

অনিক বলল, "এরা কারা?"

"গনি সাহেব হচ্ছে আমার থেকেও মোটা একজন পুলিশ অফিসার। আমি তার কাছে জিডি করাতে গিয়েছিলাম, বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে বলতে পারি নাই বলে আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।"

"আর দুর্দানা বেগম?"

"দুর্দানা বেগমের ভালো নাম হওয়া উচিত দুর্দান্ত বেগম। কারণ এই মহিলার হুঙ্কার শুনলে ছোট বাচ্চাদের কাপড়ে পিশাব হয়ে যায়। সে ছোট ছোট বাচ্চাদের একটা হোম চালায়। তাকে খবর দিলে সে এসে তোমার গলা টিপে ধরবে।"

অনিক বলল, "তুমি বেশি উত্তেজিত হয়ে গেছ। একটু শান্ত হও।"

আমি হুঙ্কার দিয়ে বললাম, "আমি মোটেই উত্তেজিত হই নাই—"

আমার হুঙ্কার শুনে বাচ্চাটা ঘুম থেকে উঠে ট্যাঁ ট্যাঁ করে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। অনিক বলল, "দিলে তো চিৎকার করে বাচ্চাটাকে তুলে—"

অনিক ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "একটা ছোট বাচ্চা ঘরে থাকলে এরকম ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতে হয় না।"

অনেক কষ্টে গলা না তুলে শান্ত গলায় বললাম, "আমি ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতে চাই না। কিন্তু তুমি যেসব কাজকর্ম করতে চাইছ সেটা শুনলে যে কোনো মানুষ ষাঁড়ের মতো চিৎকার করবে।"

বাচ্চাটা একটু শান্ত হয়েছে। অনিক আবার তাকে আলমারিতে বন্ধ করে রাখতে রাখতে বলল, "তুমি কি ভাবছ আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে কোনোরকম বিপদের কাজ করব?"

"একটা বাচ্চাকে পানিতে ফেলে দেওয়ার থেকে বড় বিপদের কাজ কী হতে পারে?"

"তুমি শান্ত হও। আমার কথা আগে শোন। একটা বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থাকে তখন সে কোথায় থাকে?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "এটা আবার কী রকম প্রশ্ন? মায়ের পেটে যখন থাকে তখন তো মায়ের পেটেই থাকে।"

"আমি সেটা বলছি না—আমি বলছি মায়ের পেটের ভেতরে কোথায় থাকে? একটা তরল পদার্থের ভেতর। সেখানে তার নিশ্বাস নিতে হয় না কারণ অ্যামবিলিকেল কর্ড দিয়ে মায়ের শরীর থেকে অক্সিজেন পায়, পুষ্টি পায়।"

অনিক জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে পারলে থামতে চায় না, তাই হাত নেড়ে বলতে লাগল, "জন্ম হবার পর ফুসফুস দিয়ে নিশ্বাস নিতে হয়। অ্যামবিলিকেল কর্ড কেটে দেওয়া হয় বলে মুখ দিয়ে খেতে হয়। মায়ের পেটের ভেতরে তরল পদার্থে তারা খুব আরামে থাকে, তাই জন্মের পরও তাদেরকে পানিতে ছেড়ে দিলে তারা মনে করবে পেটের ভেতরেই আরামে আছে—"

আমি আপত্তি করে বললাম, "ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।"

অনিক বলল, "আমি কি ঠাণ্ডা পানিতে ছাড়ব নাকি?"

"তা হলে কোথায় ছাড়বে?"

AMARBOI.COM

"পানির তাপমাত্রা থাকবে ঠিক মায়ের শরীরের তাপমাত্রা। কুসুম কুসুম গরম—"

"আর নিশ্বাস?"

"মুখে লাগানো থাকবে মাস্ক। সেখানে থাকবে অক্সিজেন টিউব।"

"কান দিয়ে যদি পানি ঢোকে?"

"কানে থাকবে এয়ার প্লাগ।"

"কিন্তু তাই বলে একটা ছোট বাচ্চাকে পানিতে ছেড়ে দেওয়া—"

অনিক বলল, "আমি কি বাচ্চাকে ঝপাং করে পানিতে ফেলে দেব? আস্তে করে নামাব। যদি দেখি বাচ্চাটা পছন্দ করছে আস্তে আস্তে প্রথমে পা তারপর শরীর তারপর মাথা—"

"কিন্তু—"

"এর মাঝে কোনো কিন্তু নেই। এই এক্সপেরিমেন্ট আমাকে আর কে করতে দেবে? তুমি দেখ এর মাঝে বাচ্চাটাকে একবারও আমি বিপদের মাঝে ফেলব না।"

অনিকের ওপর আমার সেটুকু বিশ্বাস আছে, তাই আমি শেষ পর্যন্ত রাজি হলাম।

অনিক অ্যাকুরিয়ামটা পানিতে ভর্তি করে সেটার মাঝে একটু গরম পানি মিশিয়ে পানিটাকে আরামদায়ক কুসুম কুসুম গরম করে নিল। পানিতে একটা ছোট হিটার আরেকটা থার্মোমিটার বসাল। থার্মোমিটারের সাথে অনেক জটিল যন্ত্রপাতি। তাপমাত্রা কমতেই নাকি নিজে থেকে হিটার চালু হয়ে আবার আগের তাপমাত্রায় নিয়ে যাবে। অ্যাকুরিয়ামের পাশে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার। তার পাশে একটা নাইট্রোজেনের সিলিন্ডার। দুটো গ্যাস মাপমতো মিশিয়ে সেখান থেকে একটা প্লাস্টিকের টিউবে করে একটা ছোট মাস্কে লাগিয়ে নিল। এই ছোট মাস্কটা বাচ্চার মুখে লাগাবে।

সবকিছু ঠিকঠাক করে অনিক বাচ্চাটাকে নিয়ে আসে। তার মুখে মাস্কটা লাগানোর সময় সে কয়েকবার ট্যাঁ ট্যাঁ করে আপত্তি করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনে নিল। যখন দেখা গেল সে বেশ আরামেই নিশ্বাস নিচ্ছে তখন অনিক সাবধানে বাচ্চাটার জামাকাপড় খুলে অ্যাকুরিয়ামের পানিতে নামাতে থাকে। আমি পাশেই একটা শুকনো তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, যদি বাচ্চাটা পানি পছন্দ না করে তা হলে অনিক তুলে আনবে, আমি শরীর মুছে দেব।

কিন্তু পা-টা পানিতে ডোবানো মাত্রই বাচ্চাটার চোখ খুলে গেল এবং আনন্দে হাত-পা নাড়তে লাগল। অনিক খুব ধীরে ধীরে বাচ্চাটাকে নামাতে থাকে, কুসুম কুসুম গরম পানি, বাচ্চাটার নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হচ্ছে, সে হাত-পা নাড়তে নাড়তে স্ফূর্তি করতে শুরু করে দিল। অনিক আরো সাবধানে নামিয়ে প্রায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল, তখন বাচ্চাটা একেবারে পাকা সাঁতারুর মতো সাঁতার কাটতে শুরু করে দিল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম অনিকের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে অ্যাকুরিয়ামের ভেতর সাঁতার কাটছে। হঠাৎ করে মাথা পানির ভেতরে ডুবিয়ে পানির নিচে চলে গেল, আমি ভয়ে একটা চিৎকার করে উঠছিলাম কিন্তু দেখলাম ভয়ের কিছু নেই। বাচ্চাটা নির্বিঘ্নে মাস্ক দিয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে পানিতে ওলটপালট খেয়ে সাঁতার কাটছে। এরকম আশ্চর্য একটা দৃশ্য যে হতে পারে আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

অনিক আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, "দেখেছ? দেখেছ তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"ছোট বাচ্চা পানিতে কত সহজে সাঁতার কাটে দেখেছ?"

সত্যিই তাই। এইটুকুন ছোট বাচ্চা পানির নিচে ঠিক মাছের মতো সাঁতার কাটতে লাগল। দুই হাত দুই পা নেড়ে অ্যাকুরিয়ামের একপাশ থেকে অন্যপাশে চলে যাচ্ছে, হঠাৎ

ওপরে উঠে আসছে, হঠাৎ ডিগবাজি দিয়ে নিচে নেমে আসছে! একেবারে অবিশ্বাস্য দৃশ্য। অনিক বলল, "এক্সপেরিমেন্ট কমপ্লিট। এবারে তুলে নেওয়া যাক, কী বলো?"

আমি বললাম, "আহা হা! বাচ্চাটা এত মজা করছে, আরো কিছুক্ষণ থাকুক না।"

অনিক বলল, "ঠিক আছে তা হলে থাকুক।"

ঠিক এই সময় দরজায় শব্দ হল। আমি চমকে উঠে বললাম, "কে?"

অনিক বলল "খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে। তুমি দরজা খুলে কাগজটা রেখে দাও দেখি—আমি বাচ্চাটাকে দেখছি।"

আমি বাইরের ঘরে এসে দরজা খুলতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম, পাহাড়ের মতন একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা বাঘের মতন। চোখ দুটো জ্বলছে, চুল পিছনে ঝুঁটি করে বাঁধা। আমাকে কেউ বলে দেয় নি, কিন্তু দেখেই আমি বুঝতে পারলাম, এই মহিলা নিশ্চয়ই দুর্দানা বেগম। মহিলাটি বাঘিনীর মতো গর্জন করে বলল, "এই বাসায় একটা ছোট বাচ্চা পাওয়া গেছে?"

আমি মিনমিন করে বললাম, "হ্যাঁ।"

"আমি বাচ্চাটাকে দেখতে এসেছি।"

আমি বললাম, "বা-বা-বাচ্চাটাকে দেখতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ" মহিলা গর্জন করে বলল, "আমার নাম দুর্দানা বেগম। আমি ছোট বাচ্চাদের একটা হোম চালাই।"

"ও আচ্ছা।" আমি বললাম, "ভেরি গুড ভেরি গুড—"

মহিলা আবার গর্জন করল, "বাচ্চা কোথায়?"

"আছে ভেতরে।"

"দেখান আমাকে।"

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "বাচ্চার কী দেখতে চান?"

"বাচ্চাকে কীভাবে রাখা হয়েছে, কী খাচ্ছে, কীভাবে ঘুমাচ্ছে—এইসব। বাচ্চার বিপদের ঝুঁকি আছে কিনা, অযত্ন হচ্ছে কিনা—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কিনা—"

দুর্দানা বেগমের লিস্ট অনেক বড়, মাত্র বলতে শুরু করেছিল কিন্তু হঠাৎ করে থেমে গেল, কারণ ঠিক তখন বাসার সামনে একটা পুলিশের গাড়ি থেমেছে, আর সেই গাড়ি থেকে বিশাল একজন পুলিশ অফিসার নেমে এল, একটু কাছে এলেই আমি চিনতে পারলাম, গনি সাহেব, আজ সকালে এই মানুষ আমাকে হাজতে পুরে রেখেছিল।

দরজার সামনে আমাকে দেখে গনি সাহেবের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ক্ষুধার্ত বাঘ যখন একটা নাদুসনুদুস হরিণ দেখে তার মুখে মনে হয় ঠিক এরকম হাসি ফুটে ওঠে। গনি সাহেব তার দাঁতগুলি বের করে বলল, "আপনি এখনো আছেন?"

আমি চি চি করে বললাম, "জি আছি।"

"নিজের চোখে দেখতে এলাম।"

"কী দেখতে এসেছেন?"

"বাচ্চাটা আসলেই আছে কিনা। থাকলেও কেমন আছে—আজকাল কোনো কিছুর ঠিক নাই। হয়তো ছোট বাচ্চাটার ওপর অত্যাচার।"

দুর্দানা বেগমের পুলিশের কথাটা খুব মনে ধরল। বলল, "ঠিক বলেছেন। ছোট বাচ্চাও যে একজন মানুষ সেটা অনেকের খেয়াল থাকে না। এক বাসায় গিয়ে দেখি বাচ্চাকে ভেজা কাঁথার মাঝে শুইয়ে রেখেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গনি সাহেব বলল, "ভেজা কাঁথা কী বলছেন? আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, এই ঢাকা শহরে এমন ঘাঘু ক্রিমিন্যাল আছে যে পারলে বাচ্চাকে পানিতে ডুবিয়ে রাখবে।"

দুর্দানা বেগম চোখ গোল গোল করে বলল, "বলেন কী আপনি?"

গনি সাহেব নাক দিয়ে শব্দ করে বলল, "আমি এই লাইনের মানুষ, চোর-ডাকাত-গুণ্ডা নিয়ে আমার কারবার। দুনিয়ায় যে কত কিসিমের মানুষ আছে আপনি জানেন না। আমি জানি।"

গনি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই বাসা কার?"

আমি মিনমিন করে বললাম, "আমার বন্ধুর।"

"তাকে ডাকেন।"

আমি কিছু বলার আগেই দুইজনে প্রায় ঠেলে বাইরের ঘরে ঢুকে গেল। আমি তাদেরকে বসিয়ে প্রায় দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। বাচ্চাটা তখনো অ্যাকুরিয়ামে মহাআনন্দে সাঁতরে বেড়াচ্ছে, অনিক চোখ-মুখে একটা মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে বাচ্চাটাকে দেখছে। আমাকে দেখে বলল, "কী হল, পেপারটা আনতে এতক্ষণ?"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "পেপার না।"

"তা হলে কে?"

"দুর্দানা বেগম আর গনি সাহেব। বাচ্চা দেখতে এসেছে। এক্ষুনি বাচ্চাকে পানি থেকে তোল। এক্ষুনি।"

বাইরের ঘর থেকে দুর্দানা বেগম আবার বাঘিনীর মতো গর্জন করল, "কোথায় বাড়ির মালিক?"

অনিক ফিসফিস করে বলল, "আমি ওদেরকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখছি। তুমি বাচ্চাটাকে তোল। মাস্ক খুলে একটা টাওয়েলে জড়িয়ে নিয়ে আস।"

"আ-আ-আমি?"

"তুমি নয় তো কে?"

বাইরের ঘর থেকে আবার হুঙ্কার শোনা গেল, "কোথায় গেল সবাই?"

অনিক তাড়াতাড়ি উঠে গেল। আমি তখন বাচ্চাটাকে পানি থেকে তোলার চেষ্টা করলাম। এত ছোট একটা বাচ্চাকে যখন শুকনো জায়গায় রাখা হয় তখন সে নড়তে চড়তে পারে না, এক জায়গায় শুয়ে থাকে। কিন্তু পানিতে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। একটা ছোট বাচ্চা সেখানে তুখোড় সাঁতারু। আমি তাকে চেষ্টা করেও ধরতে পারি না। একবার খপ করে তার পা ধরলাম সে পিছলে বের হয়ে গেল। আরেকবার তার হাত ধরতেই ডিগবাজি দিয়ে সরে গেল। শুধু যে সরে গেল তা না, মনে হল আমার দিকে তাকিয়ে জিব বের করে একটা ভেংচি দিল। এবার দুই হাত ঢুকিয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করলাম, তারপরেও কেমন করে যেন পিছলে বের হয়ে গেল। অনিক কতক্ষণ দুর্দানা বেগম আর গনি সাহেবকে আটকে রাখতে পারবে কে জানে, আমি এবার তাকে ভালোভাবে ধরার চেষ্টা করলাম আর তখন ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটল। বাচ্চাটার নিশ্বাস নেবার টিউবটা আমার হাতে পেঁচিয়ে গেল, বাচ্চাটা আমার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে একটা ডিগবাজি দিতেই তার মুখ থেকে মাস্কটা খুলে যায়। মাস্কটার ভেতর থেকে অক্সিজেনের বুদ্বুদ বের হতে থাকে আর সেটা ধীরে ধীরে পানিতে ভেসে উঠতে থাকে।

আমি অনেক কষ্ট করে চিৎকার চেপে রাখলাম—বিস্ফারিত চোখে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আছি, দেখছি ধীরে ধীরে বাচ্চাটা পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। পাগলের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চাটাকে ধরার চেষ্টা করছি, আর কী আশ্চর্য সেই অবস্থায় আমার হাত থেকে সে পিছলে বের হয়ে গেল! বাচ্চাটার নিশ্বাস নেবার জন্যে অক্সিজেন নেই কিন্তু সেটা নিয়ে তার কোনো সমস্যা নেই। অ্যাকুরিয়ামের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় মাছের মতো সাঁতরে যেতে যেতে দুটো ডিগবাজি দিল। তারপর হাত-পা নাচিয়ে আমার দিকে এগিয়ে জিব বের করে আমাকে ভেংচে দিল। কিন্তু নিশ্বাস নেবে কীভাবে? আমি আবার হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করলাম, বাচ্চাটা আমার হাত থেকে পিছলে বের করে মাথাটা পানির ওপর এনে নিশ্বাস নিয়ে আবার পানির নিচে ডুবে গেল। এই বাচ্চার মতো চালু বাচ্চা আমি আমার জন্মে কখনো দেখি নি। আগে মুখে একটা মাস্ক লাগানো ছিল, সেখান থেকে অক্সিজেনের নল বের হয়েছিল, এত কিছু ঝামেলা নিয়ে সাঁতার দিতে তার রীতিমতো অসুবিধে হচ্ছিল। এখন তার শরীরের সাথে কিছু লাগানো নাই, সাঁতার দিতেও ভারি সুবিধে। তাকে ধরবে এমন সাধ্যি কার আছে? পানির ভেতরে ডিগবাজি দিতে দিতে ছুটে যাচ্ছে, আর যখন নিশ্বাস নেবার দরকার হয় তখন ভুশ করে মাথা বের করে বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিয়ে আবার পানিতে ঢুকে যাচ্ছে। আমি বিস্ফারিত চোখে এই বিস্ময়কর দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। পুরো ব্যাপারটি তখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

হঠাৎ করে আমার মাথা ঘুরে উঠল, আমি পড়েই যাচ্ছিলাম, কোনোমতে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে বসে পড়ার চেষ্টা করলাম। বড় একটা আলমারি ধরে তার পাশে বসে পড়লাম, মনে হচ্ছে এখনই অজ্ঞান হয়ে যাব।

ঠিক এই সময় ঘরটাতে দুর্দানা বেগম আর গনি সাহেব এসে ঢুকল। আলমারির আড়ালে ছিলাম বলে তারা আমাকে দেখতে পেল না কিন্তু আমি তাদের দেখতে পেলাম। তারা পুরো ঘরটিতে চোখ বুলিয়ে অ্যাকুরিয়ামের দিকে তাকাল, বাচ্চাটা সাঁতরে ওপরে উঠে ভুশ করে মাথা বের করে আবার নিচে নেমে এল। আমি নিশ্চিত ছিলাম দুর্দানা বেগম এখন গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দেবে কিন্তু সে চিৎকার দিল না। দুজনেই অ্যাকুরিয়াম থেকে তাদের চোখ সরিয়ে ল্যাবরেটরির অন্য কোনায় নিয়ে গেল। তারা নিজের চোখে দেখেও বিষয়টা বুঝতে পারছে না, ধরেই নিয়েছে অ্যাকুরিয়ামে একটা মাছ সাঁতার কাটছে। কী আশ্চর্য ব্যাপার!

দুর্দানা বেগম বলল, "আপনার বাসায় একটা বাচ্চা অথচ আপনার ঘরবাড়ি এত নোংরা?"

শুধুমাত্র অনিক পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারছে, সে নিশ্চয়ই নিজের চোখকে বিশ্বাস করছে না। উত্তরে কোনো একটা কথা বলার চেষ্টা করে বলল, "ক-ক-করব। প-প-পরিষ্কার করব।"

গনি সাহেব নাক দিয়ে ফোঁৎ করে শব্দ করে বলল, "আপনার মোটা বন্ধুটা বাচ্চাটাকে নিয়ে আসছে না কেন?"

অনিক বলল, "আ-আ-আনবে। আপনারা বাইরের ঘরে বসেন। এ-এ-এক্ষুনি নিয়ে আসবে।"

দুর্দানা বেগম আর গনি সাহেব ঘর থেকে বের হতেই আমি কোনোমতে উঠে আবার অ্যাকুরিয়ামে হাত ঢুকিয়ে ফিসফিস করে বাচ্চাটাকে উদ্দেশ করে বললাম, "দোহাই লাগে তোমার সোনামণি। আল্লাহর কসম লাগে তোমার, কাছে আস! প্লি-ই-জ!"

এত চেষ্টা করে যে বাচ্চাটাকে ধরতে পারি নি সেই বাচ্চা হঠাৎ সাঁতরে এসে দুই হাত দুই পা দিয়ে আমার হাতটাকে কোলবালিশের মতো ধরে ফেলল। আমি পানি থেকে বাচ্চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁকড়ে ধরে রাখা হাতটা বের করে, বাচ্চাটাকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। এর আগে কখনো ছোট বাচ্চা ধরি নি, তাই খুব সাবধানে দুই হাতে ধরে বাইরে নিয়ে এসে দাঁড়ালাম।

দুর্দানা বেগম ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাচ্চাকে গোসল করাতে গিয়ে দেখি নিজেই গোসল করে ফেলেছেন।"

গনি সাহেব বলল, "ছোট বাচ্চাকে পানির কাছে নেবার সময় খুব সাবধান।"

দুর্দানা বেগম বলল, "কিছুতেই যেন পানিতে পড়ে না যায়।"

আমি মাথা নাড়লাম, "পড়বে না। কখনো পড়বে না।"

দুর্দানা বেগম আর গনি সাহেব দুজনেই ভুরু কুঁচকে মুখ শক্ত করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু যেই আমি তোয়ালেটা সরিয়ে বাচ্চাটাকে দেখালাম দুজনের মুখ হঠাৎ করে নরম হয়ে গেল। দুজনেই বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল, আর কী আশ্চর্য, বাচ্চাটা জিব বের করে দুজনকে ভেংচে দিল!

গনি সাহেব দুর্দানা বেগমের দিকে আর দুর্দানা বেগম গনি সাহেবের দিকে তাকাল। তারপর দুজনেরই সে কী হাসি! মনে হয় সেই হাসিতে ঘরের ছাদ উড়ে যাবে।

এই পৃথিবীতে ছোট বাচ্চা থেকে সুন্দর কিছু কি আর আছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~